প্রবাসীর চিঠি

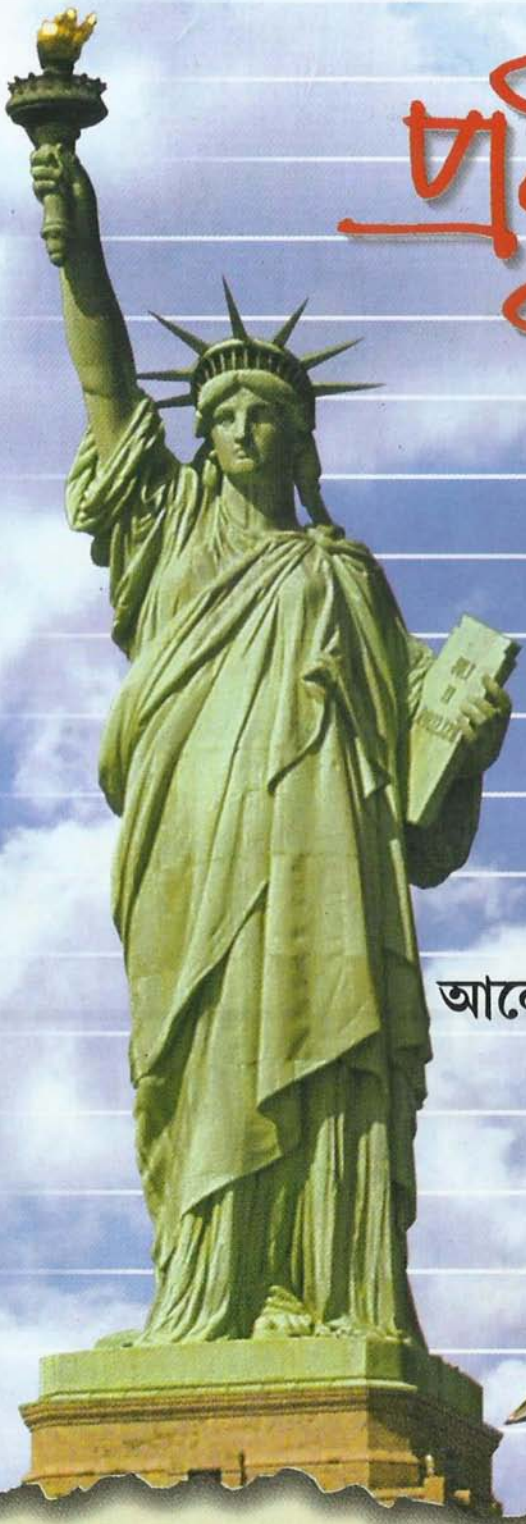

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

প্রবাসীর চিঠি

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

আলোলিকা মুখোপাধ্যায় পেশায় সাংবাদিক নন। কিন্তু তিনি 'সাপ্তাহিক বর্তমান' বা অন্যান্য জায়গায় যে লেখাগুলি লেখেন তা যে কোনও পেশাদার সাংবাদিকের চেয়ে উন্নত স্টাইলের। খুব কঠিন বিষয়কে সহজ-সরলভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা বিষয় নিয়ে লেখেন। চালচলন, আচার-ব্যবহার, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ওখানে বসবাসকারী বাঙালি ও ভারতীয়দের বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে আমি তাঁর বহু লেখা পড়েছি। যে বিষয়ে যখন লেখেন, মনে হয় তিনি একজন বিশেষজ্ঞ! তিনি তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী মানসিকতা থেকে সেই বিষয়টি অনেকটাই বুঝতে পারেন এবং খুব সহজসরল ভাষায় বাঙালি পাঠককে তা বোঝাতে পারেন। অনেক সময় নানা কঠিন চিকিৎসা পদ্ধতি বা নতুন বের হওয়া ওষুধ নিয়েও তাঁর লেখা পড়েছি। খুব সুন্দরভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা করে এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তিনি সবসময় লেখেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ পেশাদার সাংবাদিককে এই ধরনের লেখায় যে তিনি অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দীর্ঘদিন ধরে তিনি 'সাপ্তাহিক বর্তমান'-এ লিখছেন। কিন্তু, কখনও কোনও পাঠকের মুখে শুনিনি, আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখা একঘেঁয়ে। এটা তাঁর আর একটা বড় গুণ। এখানকার পাঠক আমেরিকার কোন কোন বিষয় নিয়ে বেশি আগ্রহী হতে পারেন, আলোলিকা মুখোপাধ্যায় তাও খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন বলেই আমার মনে হয়। দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে আমি দেখেছি, বহু সাংবাদিক এবং লেখক লেখার সময় তাঁদের পাঠকের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করতে বসেন। আলোলিকা মুখোপাধ্যায় কিন্তু কখনওই তা করেননি। আমেরিকার যেসব বিষয়ে বাঙালি পাঠক আগ্রহী হতে পারেন, সেই বিষয়গুলিই তিনি সহজসরল ভাষায় এখানের সকলের সামনে হাজির করেন। আমার নিশ্চিত ধারণা, আলোলিকা দেবী যদি পেশাদার সাংবাদিক হতেন তাহলে বাংলা সাংবাদিকতায় একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিতে পারতেন।

২৯-১২-২০০৫

বরুণ সেনগুপ্ত
সম্পাদক
বর্তমান পত্রিকা

আমেরিকা এখন 'স্টু পট'

মেলটিং পট কথাটা সেভাবে আর ব্যবহার হয় না। অ্যাসিমিলেশনের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। আমেরিকার বিশাল রন্ধন পাত্রের মধ্যে ছত্রিশজাত সুসিদ্ধ হয়ে সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এক তরল পদার্থে পরিণত হবে—এমন ধারণা আর বজায় থাকছে না। আমেরিকা এখন হয়েছে "স্টু পট।" সব উপাদান মাথা তুলে থাকবে। ধরুন, আমরা ভারতীয়রা যদি ওই স্টু-এর মধ্যে ঘন সবুজ মটরশুঁটি হই, তো বিজাতীয় রান্নার মধ্যেও বর্ণের শ্যামলিমা হারাচ্ছি না। কিঞ্চিৎ ফ্যাকাশে হলেও চেনা যাচ্ছে। সেরকম চিনেরা হয়তো সাদাটে ব্যাঙের ছাতা হয়ে ভেসে আছে। স্টুতে একদম মিশে যাচ্ছে না। পাকিস্তানিরা আস্ত রসুন হয়ে আছে। ইতালিয়ানরা লাল টমেটো। অ্যাসিমিলেশনের নামে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে মার্কিন কালচারের সঙ্গে বেশ মাখো মাখো হয়ে থাকা আর কী?

আমেরিকায় মালটি ফেইথ, ডাইভারসিটি, মালটি কালচার, ইন্টার ফেইথ ইত্যাদি চিন্তাধারা ক্রমশ জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। পরমত ও পরধর্মসহিষ্ণুতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান এবং সমন্বয়—এই বিশ্বাস থেকে এদেশে ইউনিটেরিয়ান চার্চ, কোয়েকার্স গ্রুপ অনেকদিন ধরেই তাদের ভাবধারা প্রচারের কাজে নেমেছে। অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় থেকেও যেমন, সেরকম রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিরাও ইউনিটেরিয়ান চার্চের আমন্ত্রণে বিভিন্ন চার্চে "বেদান্ত" বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আসেন।

এদেশে বহু কলেজে ছাত্র ছাত্রী প্রধান বিষয়ের পাশাপাশি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে "তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব" পড়ে। খ্রিস্টান ধর্ম, সুইশ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, দূর প্রাচ্যের 'জেন' (Zen) ধর্ম ছাড়াও পৃথিবীর নানা উপজাতির ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে দীর্ঘ পাঠ্যসূচি থাকে। তুলনামূলক ধর্ম নিয়ে মাস্টার্স, পি. এইচ. ডি করছে, এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। বিষয় নির্বাচনের সপক্ষে এদের যুক্তি হচ্ছে—নিজের এবং অন্যের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক পড়াশোনা করা। অধ্যাপকের ব্যাখ্যা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যেক ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ মতামত জানা। কখনও কখনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুও লেকচার সেশনে আসেন। অধ্যাপক পড়ান পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, ধর্ম ও রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ, ধর্ম ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়।

ক্রিসমাস আমেরিকার জাতীয় উৎসব। সেই হিসেবে, শুধু খ্রিস্টান ধর্মের উৎসবকেই রাষ্ট্র কেন বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আসছে, সরকারি বিল্ডিংগুলিকে অজস্র ডলার খরচ করে আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে—এই নিয়ে সুইসরা মাঝে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। নিউ জার্সিতে বিভিন্ন সুইস অর্গানাইজেশন চার্চ আর স্টেটের বিভাজনের যুক্তিতে প্রতিবাদ,

মামলা, হামলা, নানা চাপ সৃষ্টি করছিল। কিন্তু ইদানীং উত্তেজনা থেমে গেছে। কারণ একই সঙ্গে ক্রিসমাস ট্রি, সুইসদের ধর্মোৎসব "হনিকার" প্রতীক চিহ্ন, রেড ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব ডেকোরেশন—সব সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিব্রু ভাষায় "মেনোরাহ" মানে হচ্ছে মোমদানি। ধনুকের মতো অথবা অর্ধচন্দ্রের আকৃতি ফ্রেমের ওপর লম্বা লম্বা মোমবাতি বসানো। "হনিকার" সময় প্রত্যেক সুইস বাড়ির জানলায় এই বাতিদান বসানো থাকে। কিন্তু ক্রিসমাসের সময় তাঁরা কোনও আলোকসজ্জা বা ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে বাড়ি সাজান না। পাড়া অন্ধকার মানেই সুইসদের রাস্তা। কিন্তু "রাষ্ট্র" যখন ক্রিসমাস নিয়ে এমন মহোৎসব লাগিয়েছে, তখন সরকারি খরচে স্যান্টাক্লজ সাজালেই, ওই "মেনোরাহ"ও দুলিয়ে দিতে হবে। তো তাই করা হচ্ছে। মালটি ফেইথ ডিসপ্লে থেকে সবাইকে খুশি রাখা।

সংবিধান সম্পর্কে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা হচ্ছে—চার্চ আর স্টেটের মধ্যে বিভাজন বজায় রাখতে হবে। বড়দিনের উৎসাহে সকলের সে কথা মনে থাকে না। অনেক শহরেই মিউনিসপ্যাল বিল্ডিং-এর সামনে, বোরো হলের দরজার মুখে মস্ত বড় ছবি টাঙিয়ে দিত। যিশুর ছবি বলাবাহুল্য। কিন্তু নিরীশ্বরবাদীরা স্টেট বিল্ডিং-এ চার্চের প্রভাব পছন্দ করেন না। সুইসদেরও আপত্তি উঠেছে। এ জন্যে ইদানীং শুধু ক্রিসমাস ট্রি রাখা হচ্ছে। তাতে কারও আপত্তি নেই। কিন্তু যিশু স্থান পেয়েছেন চার্চের বাগানে। দোলনায় শিশু যিশু, আস্তাবলে ঘুমন্ত যিশু, মায়ের বুকে পবিত্র সন্তান, ক্রুশে বিদ্ধ রক্তাক্ত যিশু—সব ছবি আর মূর্তি চার্চের বাগানে নয়তো তার ভেতরের চত্বরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কিন্তু "আমেরিকান সেন্টার ফর ল অ্যান্ড জাস্টিস" নামে ভার্জিনিয়াতে একটি ইভান্‌জেলিক খ্রিস্টান অর্গানাইজেশন এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছে। তারা বলছে—আমেরিকান কনস্টিটিউশন-এর ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টে লেখা আছে—কংগ্রেস শ্যাল মেক নো ল রেসপেক্‌টিং অ্যান এসট্যাবলিশমেন্ট অফ রিলিজিয়ন, অর প্রহিবিটিং দ্য ফ্রি একসারসাইজ দেয়ার অফ্; অর অ্যাব্রিজিং দ্য ফ্রিডম অফ স্পিচ। তার মানে ফ্রি স্পিচের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। তাই-ই যদি হয়, তবে পাবলিক প্রপার্টিতে রিলিজিয়াস ডিসপ্লে কেন করা যাবে না?

নিউ জার্সির "আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন"এর প্রতিনিধি বলেছেন—এই যুক্তি সমর্থন করা যায় না। কারণ পাবলিক প্রপার্টিতে কোনও বিশেষ ধর্মের ছবি, মূর্তি সাজিয়ে রাখার অর্থ মার্কিন সরকার সেই ধর্মের প্রচার করছে। এতে অন্য ধর্মের প্রতি অসম্মান দেখান হয়। যিশুর ছবি এবং মূর্তি সাজানোর উপযুক্ত স্থান হচ্ছে চার্চ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কোনও মতেই খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজ করতে পারে না। আলোক সজ্জায় বাধা নেই। ক্রিসমাস ট্রিও বসানো যেতে পারে। শুধু সরকারি সম্পত্তিকে কয়েকদিনের জন্যে হলেও চার্চের মতো করে সাজানো যাবে না।

আবার সেই আইডেনটিটির কথায় ফিরে যাই। আমেরিকায় বাস করার অর্থ এই নয় যে ক্রিসমাসকে সকলেই ধর্মীয় উৎসব বলে মনে করবেন। খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ধর্মের মানুষ এ সময় ছুটির আনন্দ উপভোগের অতিরিক্ত কিছু অনুভব করেন না। হলিডে সেলিব্রেশন বলতে পার্টি, নাচ, গান, উপহার দেওয়া নেওয়া, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ক্রিসমাস স্পেশাল ব্যালে শো দেখতে

যাওয়া—এ ভাবেই হই হুল্লোড় করে সময় কাটান। যে ধর্মের সঙ্গে মানুষের কোনও বন্ধন নেই, তার উৎসব সকলকে সমানভাবে নাড়া দেয় না। ডেসডামস নামে একজন কালো মহিলা একথাই বলেছেন। ছোটবেলা থেকে দেখেছেন বাড়িতে ক্রিসমাস উপলক্ষে খাওয়া দাওয়া হতো। আত্মীয়স্বজন আসত। ক্রিসমাস ট্রির নীচে উপহারের বাক্স জমা হত।

কিন্তু ডেসডামস ওই ছোট্ট বয়স থেকেই ভাবতেন যিশুখ্রিস্ট, তাঁর মা, বাবা, দেবদূত, স্যান্টাক্লজ—সবাই তো ফর্সা। সাদা আমেরিকানদের মতো দেখতে। তবে কীভাবে ডেসডামসদের সঙ্গে যিশুর সম্পর্ক হতে পারে? দেবদূত, স্যান্টাক্লজ এরা কি কালো আমেরিকানদের চেনে যে দয়া করতে আসবে? ডেসডামসের মন খারাপ হয়ে যেত। ঠিক কোনওভাবেই ক্রিসমাস উৎসবের সঙ্গে কালো লোকেদের যোগসূত্র খুঁজে পেতেন না। এই দ্বন্দ্ব ক্রমশই বাড়ছিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণেই শুধু নয়, তারপরেও ডেসডামস ক্রিসমাসের সময় এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ করতেন। যেন জোর করে ক্রিসমাস পালন করতে হচ্ছে। যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে আফ্রিকান আমেরিকানদের কোনও যোগসূত্রই নেই। কিন্তু ১৯৮২ সালে ডেসডামসের নতুন অভিজ্ঞতা হল। সেই বছরই তিনি "কোয়ানজা" নামে আফ্রিকান-আমেরিকান উৎসবের কথা বইতে পড়লেন। সাতদিনের সেই উৎসবে আফ্রিকানরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে ক্রিসমাসের মতোই আনন্দ করে। "কোয়ানজা"র অর্থ হল ফসল উৎপন্ন হওয়ার পর প্রথম যে ফল পাওয়া যায়। আফ্রিকার সোয়াহিলি শব্দ। কোয়ানজা উৎসবের সূচনা করেছিলেন ডক্টর মাউলানা ক্যারেনগা নামে একজন কালো প্রতিবাদী মানুষ। "কোয়ানজা" উৎসবের মাধ্যমে আফ্রিকান-আমেরিকান সমাজ নিজেদের মধ্যে শুভকামনা বিনিময় ছাড়াও একাত্মবোধ, দায়িত্ব সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধকে সুদৃঢ় করবে—এই ছিল ডক্টর ক্যারেনগার উদ্দেশ্য। ১৯৬৬ সাল থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে।

ডেসডামস চোদ্দো বছর আগে আরও কয়েকটি কালো পরিবারের সঙ্গে যোগ দিয়ে কোয়ানজার আয়োজন করেছিলেন। একেক দিন একেক জনের বাড়িতে গিয়ে এঁরা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। খাওয়াদাওয়া, উপহার বিনিময়—সবই হত। এভাবেই ধীরে ধীরে ডেসডামস ক্রিসমাসের সঙ্গে কোয়ানজাকে মিলিয়ে দিলেন। এখন তাঁর স্বামী বিল আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে প্রত্যেক ডিসেম্বর মাসে একদিকে যেমন ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে আমেরিকার জাতীয় মহোৎসবে যোগ দেন, তেমনই কোয়ানজার প্রতীক একটি বাতিদানের ভেতরে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখেন। সাতদিনে মোট সাতটি মোমবাতি জ্বালানো হয়। কোয়ানজা উৎসবের মূল উদ্দেশ্য সাতটি মানবিক গুণের উন্মেষের জন্যে সচেষ্ট হওয়া। গুণগুলি হচ্ছে—ঐক্য, আত্মবিশ্বাস, দলগতভাবে পরিশ্রম ও দায়িত্ব গ্রহণ, যৌথ অর্থ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মহৎ উদ্দেশ্য সাধন, সৃষ্টিমূলক কাজ এবং ধর্মবিশ্বাস।

ক্রিসমাসের মতোই এঁরা একদিন বাড়িতে লোকজন ডাকেন। অন্যদিন কোনও বাড়িতে নেমন্তন্নে যান। এছাড়া কালো সমাজে যে গুণী শিল্পীরা আছেন, তাঁদের নাটক, গান, নাচ ইত্যাদির অনুষ্ঠান দেখতে বড় শহরে যান। কালো শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীতে যান। এই উপলক্ষে কালো গায়ক, নাট্যকার, অভিনেতা, বাদক, চিত্রশিল্পীরা এঁদের জন্যে

সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করেন। অর্থাৎ আফ্রিকান-আমেরিকানদের নিজস্ব উৎসবের মরশুমে তাঁরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়ে ছেলে মেয়েদের সচেতন করতে চেষ্টা করেন। উপহারের ব্যাপারটি ব্যয়সাপেক্ষ হয় না। ক্রিসমাস উপহারের চেয়ে কোয়ানজা-র উপহারের দাম অনেক কম হয়। কালো পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করেই সম্ভবত এই প্রথা চলে এসেছে। অল্প দামের মধ্যে এমন খেলনা বা জিনিস দেওয়ার রীতি আছে, যা সৃষ্টিমূলক এবং শিক্ষামূলক হবে। কালোদের ইতিহাস নিয়ে বই, পাজল গেম, ওয়ার্ড গেম, বাজনা ইত্যাদি উপহার হিসেবে দেওয়া যায়। এছাড়া কালো মহিলারা নিজে হাতে নানা উপহার তৈরি করেন। মেয়েদের হাতের কাজ শিখিয়ে তাদের দিয়েও কম খরচে সুন্দর পুতুল, খেলনা তৈরি করান। আমেরিকায় ক্রিসমাসের বাজার মানে যে বিপুল অর্থব্যয়ের চাপ, সেই ধারণাও এঁরা বদলে দিতে চেষ্টা করেন।

তবে কোয়ানজা উৎসব সম্পর্কে অধিকাংশ কালো মানুষেরই কোনও আগ্রহ নেই। ক্রিশ্চান কালো সমাজে ক্রিসমাসের অর্থ স্বভাবতই ধর্মীয় উৎসব পালন। মুসলমান কালোদের মধ্যে এই উদযাপন নেই। কোয়ানজা তাঁদের কাছেই বিশেষ আবেদন নিয়ে এসেছে। যাঁরা বড়দিনের সময় নিজেদের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল অন্বেষণ করতে চেয়েছেন। আমেরিকার ইতিহাস বইগুলিতে কালো সংস্কৃতি সম্পর্কে যে সামান্য উল্লেখ আছে, এঁরা সে সম্পর্কে ক্ষুণ্ণ হয়ে বলছেন কোয়ানজার মাধ্যমেই আমরা হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছি। আইডেনটিটি না থাকলে কোনও উৎসবে সাড়া দেওয়া যায় না।

যাঁরা খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন, ক্রিসমাসের সময় তাঁদের কী অনুভূতি হয়? ডেবরা নামে একটি মেয়ে প্রটেস্ট্যান্ট পরিবারে বড় হয়েছে। ক্রিসমাসের প্রথা অনুযায়ী ছোটবেলা থেকে চার্চে গেছে। মিড-নাইট ম্যাস-এ যোগ দিয়েছে। আলো দিয়ে বাড়ি সাজিয়েছে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বেলে, মোমের আলোয় সপরিবারে ক্রিসমাস ডিনার খাওয়া, নিউইয়র্কের রেডিও সিটি মিউজিক হলে বড়দিনের স্পেশাল শো দেখতে যাওয়া—প্রতিবছর এইভাবে কাটিয়েছে।

ডেবরা মাইকেল নামে একটি সুইস ছেলেকে বিয়ে করার পর সুডাইজম-এ দীক্ষিত হল। ছেলে-মেয়ে হওয়ার আগে সুইস পরিবারে মায়ের ওপর এই চাপ বেশ প্রবল থাকে। ডেবরা নিজেও পরধর্মকে ভালভাবে বুঝতে চায় বলে ধর্মান্তরিত হল। তার বাবা, মা দুঃখিত হলেন। ক্রিসমাসের সময় মেয়ের বাড়িতে গাছ সাজানো হল না। তার আগে হনিকা, চানুকা ইত্যাদি সুইস উৎসবে যোগ দিল।

কয়েক বছর পর থেকেই ডেবরা আবার ক্রিসমাস পালন করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হল। ওইসময় এলে তার পুরনো স্মৃতি, আনন্দের দিনগুলি মনে পড়ে। প্রার্থনা সঙ্গীত, স্যান্টার হাতে ঘণ্টা নিয়ে ছোটদের ডাকাডাকি, পথের দুপাশে অধিকাংশ বাড়ির জানলার ধারের ঝলমলে ক্রিসমাস ট্রি, মায়ের বাড়িতে ক্রিসমাস পার্টি—এই সবের আকর্ষণ ছাড়াও ডেবরার ছোট মেয়েদুটির প্রশ্নও তাকে মত পরিবর্তনে সাহায্য করল। চিরকাল যে আনন্দ সে নিজে পেয়েছে, মেয়েদুটিকেও তার ভাগ দিতে ইচ্ছে হল। কারণ তারা কেবলই বলে—স্যান্টা কেন আমাদের কিছু দেয় না? কেন ক্রিসমাস ট্রি কিনে আনো না?

প্রথম প্রথম ডেবরা কিছুদিন তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে সুইসদের ধর্ম আলাদা। তাদের ক্রিসমাস নেই। কিন্তু মেয়েরা দিদিমার বাড়িতে গিয়ে মার ছোটবেলার কত ছবি দেখে। মা কখনও স্যান্টাক্লজের কোলে বসে হাসছে। কোনও ছবিতে ক্রিসমাস ট্রির নীচে বসে রাজ্যের উপহার খুলে দেখছে। এ সব ছবি দেখে বাচ্চাদের মন খারাপ হয়ে যায়। মা সব পেয়েছে অথচ তাদের ক্রিসমাস বলে কিছুই নেই? শেষ পর্যন্ত বড় মেয়েটা জেদ ধরল যে এবার ক্রিসমাসে তারা বাড়ির ছাদে স্যান্টাক্লজের জন্যে দুধ আর কেক রেখে পরীক্ষা করবে। দেখবে সুইস বাড়িতে বুড়ো আসে কি-না। ডেবরা আর মাইকেল বাধা দিতে চায়নি। তবু ডেবরাই বলেছিল—সুইস বাড়িতে স্যান্টা আসবে কি? মেয়ের উত্তর—স্যান্টা সব দেশের সব বাড়িতে যায়। সব বাচ্চাকে ভালবাসে।

ছোট মেয়েদুটো দুধ আর কেক সাজিয়ে বাবার হাত দিয়ে ছাদে পাঠিয়ে দিল। ঘুমতে যাওয়ার আগে কী উত্তেজনা! কাল ভোরে কী দেখবে কে জানে? ওরা ঘুমিয়ে পড়ার পর ডেবরা স্যান্টার হয়ে চিঠি লিখতে বসল। মাইকেল খেলনার বাক্স গিফট র‍্যাপ দিয়ে মুড়ে ফেলল। ডেবরা লিখল—আমি জানি তোমরা সুইস, চানুকা সেলিব্রেট করো। কিন্তু তবু আমি এলাম। চানুকার সময় নিশ্চয়ই খুব আনন্দে ছিলে। এবার ক্রিসমাসও আনন্দের মধ্যে কাটাও। তোমরা তো জান, যে কোনও উৎসবের আসল কথাই হল ভালবাসা আর বন্ধুত্ব।

ডেবরার মেয়েরা এখন বড় হয়েছে। নিজেদের ধর্ম বিষয়ে যেমন যেমন অনুশীলন প্রতি ইহুদি পরিবারে বজায় রাখা হয়, এরাও সেই পরিবেশে প্রতিপালিত হচ্ছে। সুইসদের ধর্মীয় উৎসবে মেনোরাহ জ্বালানো, হিব্রুতে মন্ত্র পাঠ—ডেবরা সব ট্র্যাডিশনই বজায় রেখেছে। শুধু ক্রিসমাস এলে নিজের প্রথম জীবনের উৎসবমুখর দিনগুলি মনে পড়ে। মেয়েদের আগ্রহে সে এখন তাই একটি ক্রিসমাস ট্রি সাজায়। কিন্তু স্যান্টা আর আসে না। মেয়েরা বড় হয়ে গেছে তো! যদিও স্যান্টাক্লজের জন্যেই প্রথম তারা সুইস বাড়িতে ক্রিসমাস পালন করতে চেয়েছিল।

এদেশে ভারতীয় পরিবারেও ক্রিসমাসের আগে বেশ তোড়জোড় শুরু হয়। যদিও সব আয়োজনের পেছনেই আছে বাড়ির ছেলে-মেয়েদের আগ্রহ।

দেশের কথা যদি ভাবি, সেখানেও বড়দিন তো বাঙালির জীবনে কখনও বিজাতীয় উৎসব ছিল না। স্যান্টাক্লজের কোলে বসা শৈশবের ছবি না থাক, বড়দিনে সাজানো "রানিশহর"কে কি ভুলেছি? নিউ মার্কেটে নাহুমের দোকানের প্লাম কেক, ময়দানে স্টেট সার্কাস, রাশিয়ান ব্যালে, হলিডে-অন-আইস্..... আমাদের ক্রিসমাস হলিডে তো এরকমই ছিল।

এখানে আমার মেয়েকে ক্যাথলিক স্কুল থেকে ঝকঝকে মলাটের বাইবেল দিয়েছিল। আমার সংগ্রহে আছে নিজের কলেজ থেকে পাওয়া বাইবেল। কলকাতার বাড়ির বই-এর আলমারিতে ছিল উনিশশো ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ সালের বাঁধানো মলাটের একাধিক বাইবেল। বাবা, কাকাদের স্কটিশ চার্চ স্কুলের উপহার। আগ্রহে হোক, অনাগ্রহে হোক, তিনপুরুষ ধরে "সুসমাচারে"র শিক্ষা। ক্রিসমাস/নিউ ইয়ার্স ডে সেদিনও ছিল উৎসবের মতো। নিজেদের "বিচ্ছিন্ন" বলে মনে হয়নি। আমাদের ধর্মোৎসবে ক্রিসমাস নেই, কালচারে আছে। এ

দেশের প্রতিটি রামকৃষ্ণ মঠে, বিবেকানন্দ সেন্টারে আর বেদান্ত সেন্টারে বড়দিনে বিশেষ উৎসব হয়। আইডেনটিটির ভাবনা আমি কেন ভেবে মরি হে? ইংরেজি নববর্ষের দিনে আপনি কি বিচ্ছিন্ন বোধ করেন?

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪

প্রবাসে মন্দির এবং আশ্রম

কানুভাই দেশাই ছেলেদের স্কুলের ছুটিতে আর্য বিদ্যাগুরুকুলে পাঠিয়ে দেন। পেনসিলভানিয়ার বনভূমিতে গড়ে ওঠা এই হিন্দু আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। দেশাইয়ের ছেলেরা গুরুকুলে আশ্রমিক হয়ে থাকার সময় হিন্দুধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করে। পুজো, পাঠ, সংস্কৃত শেখানো, যোগ ব্যায়াম, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ পড়ানো থেকে শুরু করে ভজন, কীর্তন ইত্যাদি সবই আছে আশ্রমের পাঠ্যসূচির মধ্যে। চতুরাশ্রমের প্রথমটি অংশত ভাবে পালন করে কানুভাইয়ের ছেলেরা। গত বছর গরমের ছুটিতে শ্যামল ঘোষদস্তিদারের ছোট ছেলে অর্ণব গেল পোকোনো পাহাড়ে "রাজরাজেশ্বরী পীঠমে"র মন্দিরে। হাইস্কুল পাস করে কলেজে যাবার আগে কয়েক সপ্তাহ আশ্রমে কাজ করে এল। সেখানে কিশোর আশ্রমিকদের 'কাউনসেলর' হবার সম্মানজনক দায়িত্বটি সুষ্ঠুভাবে পালন করে এল অর্ণব। উপরন্তু শিখে এল পুজো, পাঠ, ধ্যান মন্ত্র। একটানা নিরামিষ খাওয়ার অভ্যেসও হল এই প্রথম।

শিবরাত্রির দিন আমাদের চেনাশোনা বাঙালি মহিলারা দুধের বোতল আর ফলমূল নিয়ে চলে যান নানা মন্দিরে। নিউ ইয়র্কের ডাঃ রাখী গাঙ্গুলি গেছেন ফ্লাশিংয়ের হিন্দু মন্দিরে। তো শুক্লা মুখার্জি গেলেন গীতা টেম্পলে। উত্তর নিউ জার্সির চিত্রা গেলেন রামমন্দিরে বিশাল শিবলিঙ্গের মাথায় দুধ, ফল দিতে। ওদিকে মধ্য নিউ জার্সির প্রতিভাদির গাড়িতে চেপে উপবাসী রেবাদি, ডলিদি, বিজয়াদি মহাদেবকে স্নান করাতে গেলেন ইস্ট ব্রানসর্বইকে দেবমন্দিরে। প্রিনসটনের সাঁই সেন্টারে তো রাতভর নাম গান হয়েছিল। কল্পনা তাই আর বাড়িই ফেরেননি সে রাতে। জন্মাষ্টমী, গুরুপূর্ণিমা ইত্যাদি ব্রতের দিনেও মন্দিরে মন্দিরে ভারতীয়দের ভিড় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। একই কারণে আমেরিকাতে মন্দিরের সংখ্যাও প্রতি বছর বাড়ছে।

প্রায় একশো বছর আগে যখন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দিতে আসেন, তখন তিনিই ছিলেন প্রথম হিন্দু, যাঁর প্রভাব স্থানীয় সমাজে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। সাম্প্রতিককালে আমেরিকার বহু শহরে শত শত হিন্দু পরিবারের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম সুপ্রাচীন ধর্মটি প্রভাব বিস্তার করছে।

এদেশে ছোট বড় নানা আকার মিলিয়ে হিন্দু মন্দিরের সংখ্যা এখন চল্লিশটিরও বেশি। ব্যয় হয়েছে এ জন্যে কমপক্ষে ১৫০ লক্ষ ডলার। এছাড়াও এই মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ,

প্রয়োজনমত পরিবর্তন, পরিবর্ধনের সঙ্গেও ধার্য আছে আরও ১৫০ লক্ষ ডলার। যে সব শহরে ৩০০০ জনের চেয়েও কম সংখ্যক হিন্দুর বসবাস, সেখানেও মন্দির গড়ে উঠেছে। মিসিসিপির জ্যাকসন শহরে ৩ লক্ষ ডলার খরচ করে সদ্য তৈরি হল বালাজি টেম্পল।

কিন্তু অভিবাসী সমাজে নেতৃস্থানীয় কিছু ভারতীয় এ বিষয়ে মিশ্র অভিমত পোষণ করছেন। তাঁদের প্রশ্ন—এত খরচ করে এতগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে কি? আর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের কাছে এই মন্দিরগুলি উপযুক্ত মর্যাদা পাবে কি? কোনও বিশেষ উৎসব ছাড়া তারা আদৌ এই ধর্মস্থানগুলিতে যাওয়া আসা করবে কিনা, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবে কিনা, অর্থ ব্যয় করবে কিনা—সেও অনিশ্চিত সম্ভাবনার মতো। আর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে দলাদলিও কম হচ্ছে না কোথাও কোথাও। তবে তার চেয়েও বড় সমস্যা দেখা দিচ্ছে কখনও কখনও স্থানীয় আমেরিকানদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। সীমিত জ্ঞান এবং অজ্ঞতার দরুন অনেক সময় এঁরা বিভ্রান্ত হয়ে যান। হিন্দুধর্ম বলতে এঁদের রজনীশের কীর্তিকলাপ মনে আসে। ওরিগনের রজনীশ আশ্রম যেমন স্থানীয় আমেরিকানদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে জবর দখল কলোনি হয়ে উঠেছিল, বিকৃত যৌন উন্মাদনার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওই অঞ্চলের পরিবেশ নষ্ট করেছিল, সেই রকমই একটা ভীতি ছড়িয়ে আছে এখনও কিছু কিছু স্থানীয় মানুষের মধ্যে। নিউ জার্সিতে যখন বোচা সন্ন্যাসী মন্দির ও আশ্রম গড়ার উদ্যোগ শুরু হল, স্থানীয় অঞ্চলে রীতিমত প্রতিবাদের ঝড় উঠল। হিন্দু বিদ্বেষী প্রচারপত্র বিলি হতে লাগল সেই বিশেষ শহরটির প্রতি ঘরে ঘরে, দোকানে, বাজারে সর্বত্র। ভি ডি ও সিনেমা তৈরি করে প্রচার করা হল হিন্দুধর্ম হিটলারের নাৎসি মুভমেন্টেরই মতো সংকীর্ণ কুসংস্কার বিশেষ। তবে মন্দির প্রতিষ্ঠা বন্ধ করা গেল না। অন্য শহরে জমি কেনা হল।

আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ফিলিপ লাগেনডরফ মন্দিরের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—মন্দির তৈরি যে ক্রমশ বেড়ে যাবে, সে নিয়ে তিনি আদৌ আশ্চর্য হচ্ছেন না। কারণ মন্দির গড়ে ওঠার সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় যে আমেরিকায় ভারতীয় সমাজের শিকড় গভীরভাবে প্রবিষ্ট হচ্ছে। এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তাও ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছে। অবসর জীবনের জন্যেই সম্ভবত এই প্রস্তুতি। কিন্তু তিনিও সেই মূল প্রশ্নে ফিরে গেছেন। সত্যিই কি এতগুলি মন্দিরের জন্যে এত খরচ করার প্রয়োজন আছে? তার চেয়ে যদি এই বিপুল পরিমাণ ডলার দিয়ে আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় বিষয়গুলি পড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়, নিঃসন্দেহে আমেরিকান এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয় ছাত্রদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বিস্তারিত হতে পারে। কলম্বিয়া, শিকাগো বা ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে অন্তত ৫ লক্ষ ডলার দান করলেও, সেখানে "ইন্ডিয়ান স্টাডিজ" কোর্সে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি পড়ানোর প্রোগ্রামগুলি আরও সুষ্ঠুভাবে হবে। ভারতীয়, অভারতীয়—সকলের কাছেই বিষয়টি পাঠক্রমের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে উঠবে। মন্দিরের গণ্ডি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর প্রাঙ্গনে আলোচিত হবে হিন্দুধর্ম এবং ভারতীয় দর্শন।

সত্তর দশকের গোড়ায় যখন আমেরিকায় ভারতীয়দের অভিবাসন শুরু হল, তখনও মন্দির তৈরির পরিকল্পনা এত প্রাধান্য পায়নি। টিকে যাবার প্রশ্নই ছিল বড়। লেখাপড়া,

চাকরি জোগাড়, সংসার প্রতিপালন, বিষয় সম্পত্তির ভাবনা—এই নিয়েই কেটে গেল কয়েক বছর। সত্তর দশকের শেষাশেষি বেশ একটি নিরাপত্তা এবং প্রাচুর্যের স্বাদ প্রায় সর্বজনীনভাবে অনুভূত হতে লাগল। জাগতিক সুখভোগের পাশাপাশি এল অন্য জাতের ভাবনা। দৈনন্দিন খাওয়া পরার ঊর্ধ্বেও চাই বেঁচে থাকার আরও কিছু রসদ। সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম, অনুশীলন—সেই রসদের আর এক নাম। নিজেদের মানসিক আশ্রয়ের তাগিদে এবং ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাবনায় এই গোষ্ঠী গড়ে তুলতে লাগলেন ক্লাব, পুজো কমিটি এবং সবশেষে মন্দির। তখন শুধু প্রভুপাদের হরেকৃষ্ণ মন্দিরই ছিল কয়েকটি শহরে। কিন্তু সেখানে আর যাই হোক, ভারতীয়ত্ব ছিল না। সাহেবদের মন্দির বলেই মনে হত বরাবর। ভারতীয়রা চাইলেন মন্দির হবে ভারতীয় তত্ত্বাবধানে। বিগ্রহ থেকে পুরোহিত পর্যন্ত—সবই এনে দেবে দেশের অনুষঙ্গ।

কিন্তু শুধু চাইলেই তো আর হয় না। মাঝে আছে বিস্তর কচকচি। ভাষা নিয়েই তো মস্ত সমস্যা। গুজরাতিদের মন্দিরকে মাদ্রাজিরা ভাবে আমাদের মতো নয়। সিন্ধিদের মন্দিরে বাঙালি চাঁদা দিতে চায় না। হনুমানজির মন্দিরের পরিকল্পনায় বাগড়া দিচ্ছেন কাশ্মীরি সমাজ। রাজ্যে রাজ্যে ভগবান আলাদা, ভক্ত আলাদা। তার ওপর আছে জাতপাতের গোপন ঘোঁট পলিটিকস। ফলে এই আমেরিকাতেই গড়ে উঠল দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির আর উত্তর ভারতীয় মন্দির।

পিটসবার্গের মন্দির নিয়েই কি কম অশান্তি? চোদ্দো বছর আগে যখন মন্দিরটি তৈরি হল, স্থানীয় যে সব ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার মোটা রকম অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই হলেন অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর সন্তান। মন্দিরের নাম তিরুপতি তিরুমালাই মন্দির। ক্রমশ পিটসবার্গ ও কাছাকাছি এলাকায় বহু ভারতীয় পরিবারকেই নানাভাবে জড়িত করা হয়েছিল মন্দির তৈরির প্রকল্পে। সাধ্যমত দান ও সহযোগিতা অনেকেই করেছিলেন সে সময়। কিন্তু যেদিন প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল, সেদিন বৈষ্ণবদের পঞ্চরাত্রগমিক প্রথা অনুযায়ী অনুষ্ঠান হওয়ায় বেশ কিছু ধনী উত্তর ভারতীয় সন্তান রেগে গেলেন। কারণ দক্ষিণীরা নিজেদের মতে সব কিছু চালাচ্ছে।

ফল হল এইরকম—গভর্নিং বডির সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নেওয়া হল এই মর্মে যে, পিটসবার্গের হিন্দু মন্দির হবে অ-সাম্প্রদায়িক এবং বৃহত্তর হিন্দু সমাজের দেবস্থান। এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি সদস্যের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক, শিক্ষামূলক এবং সামাজিক চাহিদার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া মন্দিরে দেব দেবীর মূর্তিও বসানো হবে বিনা পক্ষপাতিত্বে। কোনও সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতাকে বাদ দেওয়া চলবে না। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা যে সম্প্রদায়ভুক্ত, যে ভাষাভাষী, সেই মতোই তাঁরা মন্দিরে এসে নিজের নিজের রীতি অনুযায়ী পুজো দিতে পারবেন। পুজো, ধ্যান, জপ, তপ—সবই হবে ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী। কোনও রকম আরোপিত প্রথাকে আবশ্যিক করে তোলা যাবে না।

কিন্তু তিরুপতি তিরুমালাই দেবস্থানমের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান আন্না রাও এই প্রস্তাব একেবারেই পছন্দ করলেন না। তিনি কড়া চিঠি দিয়ে জানালেন—ওই প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করছেন না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দল ভেঙে আলাদা হয়ে গেল।

এই ঘটনা অন্যত্রও ঘটেছে। কোনও গোষ্ঠী থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও ঘটেছে, কোনও আশ্রম থেকে উদ্যোগ নিলেও ঘটেছে।

তবে আশার কথা, এই ধরনের উদাহরণ বেশি নেই। সম্প্রতি একসঙ্গে হিন্দু-জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে ভারতের নানা সম্প্রদায়ের মিলিত ধর্মস্থান হিসেবেও কিছু কিছু মন্দির তৈরির প্রচেষ্টা চলছে।

দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে হিন্দু মন্দিরের তাৎপর্য কতখানি, এখনও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তারপরও আছে তৃতীয় প্রজন্ম। তবে আপাতত দ্বিতীয় প্রজন্মের বক্তব্যই শোনা যাক। তাদের মধ্যে অনেকেই বলে—আমাদের বাবা মার ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে লৌকিক আচার আচরণ মিশিয়ে ব্যাপারটি বেশ বিভ্রান্তিকর করে তোলেন। আমরা মন্দিরে না গিয়েও বাড়িতে নিয়মিত প্রার্থনা করে হিন্দু থাকতে পারি। কিন্তু যেহেতু আমাদের আমেরিকান প্রতিবেশীরা প্রতি রবিবার ছেলেমেয়ে নিয়ে গির্জায় যায়, বাবা মাও চান অন্তত মাসে দু'বার আমাদের মন্দিরে যেতেই হবে।

কেউ বলে ক্রিশ্চান ক্যাথলিকদের কাছে রবিবার গির্জায় যাওয়া যেমন অবশ্যকরণীয় কাজ, হিন্দুধর্মে মোটেই সেরকম কোনও রবিবাসরীয় নির্দেশ নেই। তাছাড়া, সত্যি বলতে কি মন্দিরে গিয়েও যে কী কী হচ্ছে, ভালমতো বুঝতেই পারি না। ভীষণ তাড়াহুড়ো করে নানা মন্ত্র বলা হয়। সংস্কৃত ভাষা তো বুঝিই না। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাও জানি না। মন্ত্রের মানে না বুঝে কোনও উৎসাহই পাই না। বাবা মাও যে ভালমতো ব্যাখ্যা করতে পারেন তাও নয়। প্রশ্ন করে দেখেছি, অধিকাংশ জিজ্ঞাসার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন না। ব্যাপারটি বেশ দুঃখের।

কিন্তু ছেলে-মেয়েদের এই অভিযোগকে পূর্ণ সমর্থন করা ঠিক নয়। বাবা মায়ের প্রতি দোষারোপ করার আগে তাদেরও চিন্তা করা প্রয়োজন কেন প্রথাগতভাবে তাদের মন্দিরে যাওয়ার জন্যে বলা হয়ে থাকে। একটি বিশেষ উদ্বেগ থেকে এরকম প্রবণতা আসা স্বাভাবিক। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভেবেছিলেন, এক সময় দেশে ফিরতে পারবেন, তাঁদের সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়নি। আমেরিকাতেই শেষ জীবন কাটবে জেনে ক্রমশ নিজস্ব কৃষ্টি, রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছেন। ছেলেমেয়েরা যে ভারতীয় ভাবধারায় প্রতিপালিত হয়নি, সে সম্পর্কেও সচেতনতা আছে। কিন্তু গোপন দুঃখও আছে। এখন অর্থ চিন্তা নেই, সাফল্যের জন্যে প্রচণ্ড লড়াই শেষ হয়ে আসছে। মনে মনে এই ভাবনাটাই বড় হয়ে উঠছে—এখন পারিবারিক জীবনে ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্যে সক্রিয় হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বন্দনা রামদয়াল বলেছেন—"দশ বছর আগে যখন ফিজি আইল্যান্ড থেকে আমেরিকায় এসেছিলাম, আমার ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রায়ই বাড়ি ফিরে মন খারাপ করত। ক্লাসে নাকি টিচার ভারত সম্পর্কে এমন ভুল-ভাল মন্তব্য করে যে ওদের রীতিমত অপমান লাগে, লজ্জা করে। আরও দুঃখ হয় যখন ক্লাসে ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে হিন্দুধর্ম নিয়ে। ওরা নিজেরাও ভাল করে জানে না কী উত্তর দিতে হবে। ফলে বিশেষ অপ্রস্তুত হতে হয় স্কুলে। এই সব দেখেই আমার ধারণা হয়েছে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকে বাড়িতে নয়তো মন্দিরে হিন্দুধর্ম বিষয়ে পড়ানো উচিত। অনেক বই কিনেছি। গল্প কথার মতো করে লেখা এই সব বই ওদের পড়ে শোনাই। মন্দিরে

গেলেও ওদের অভ্যাস হবে নানা আলোচনা শোনার।"

নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি এবং রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েও দেখেছি—একই উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামীজির বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে যান অনেক বাঙালি পরিবার। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসবে হলগুলিতে একটি আসনও খালি থাকে না।

মন্দিরের আধিক্য নিয়ে যাঁরা অসন্তুষ্ট, তাঁদের যুক্তিকেও অস্বীকার করা যায় না। মাত্র ৫০ মাইল দূরত্বের মধ্যে দুটি মন্দির তৈরি হল। অথচ একটি মন্দিরেই নানা পরিকল্পনার মধ্যে বাকি অর্থ ব্যয় করা যেত। একটি ভূসম্পত্তি কেনা তো সহজসাধ্য নয়। সেই বাড়িতেই নানা অংশে নানা সম্প্রদায়ের প্রার্থনা ঘর করা যেতে পারে। সংস্কৃত ও ইংরেজি জানা পুরোহিত আনিয়ে ছেলেমেয়েদের মন্ত্রের অনুবাদ সহ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নিয়মিত ইংরেজিতে ধর্মসংক্রান্ত বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, পুরাণ, গীতা, উপনিষদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তুলনামূলক ধর্মের অধ্যাপক আছেন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোর ফলে সেমিনারগুলি সমৃদ্ধ হতে পারে। লাইব্রেরি থাকাও জরুরি। আমেরিকায় প্রতিপালিত ভারতীয় ছেলেমেয়েদের কাছে ভারতবর্ষের ছবিটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিচয়টি দেওয়া আবশ্যক। এ কারণে হিন্দুধর্ম ছাড়াও, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, ক্রিশ্চান, জরথুস্টিয়ান ইত্যাদি বিষয়েও পড়ানো হলে তাদের ধারণা একপেশে হবে না। রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ, কাশ্মীর এবং খালিস্তানের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের খবর এদের পরিস্থিতি সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলেছে। ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে পরমত সহিষ্ণুতা এবং প্রসারতার প্রতি গুরুত্ব দেবার কারণেও এই হিন্দু মন্দিরগুলিতে শিক্ষাদানের সুযোগ আছে।

মন্দিরের দেবদেবীর মূর্তি বিষয়েও অভিভাবকদের কিছু বক্তব্য থাকছে। তাঁদের মতে গণেশ মন্দির, রাম মন্দির, এত সব বিশেষ নামকরণ না করে একটি মন্দিরে সকলের আরাধ্য মূর্তিই রাখা হোক এবং সেই শহরের নামে নামকরণ করা হোক। কারণ আর কুড়ি বছর বাদে আমাদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের আলাদা করে গুজরাতি, তেলুগু আর বাঙালি বলে পরিচয় কখনই দেবে না। তাদের একটিই পরিচয় হবে তারা ভারতীয়। সুতরাং বিহার টেম্পল অ্যাসোসিয়েশন আর তিরুপতি তিরুমালাই মন্দির গড়ে আঞ্চলিক বিভেদ না ঘটিয়ে বরং সরাসরি ভার্জিনিয়া হিন্দু মন্দির বা ফিলাডেলফিয়া হিন্দু মন্দির নাম রাখা উচিত। ছেলেমেয়েদের জন্যে দরকার উপযুক্ত নির্দেশ ও অনুশীলন। যুক্তি তর্ক ছাড়া যে প্রজন্ম এক পাও এগোতে রাজি নয়, তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এদেশে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আশ্রমগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে। স্কুল কলেজের ছুটিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা আশ্রমগুলিতে কয়েকদিনের জন্যে তাদের পাঠানো যেতে পারে। আশ্রমিক জীবনের নিয়ম শৃঙ্খলা, শুদ্ধাচার, যোগব্যায়াম, নিরামিষ খাদ্য ব্যবস্থা, ভজন, নামগান ইত্যাদির প্রভাব এবং শিক্ষিত অধ্যাপক, স্বামীজিদের কাছে বসে পড়াশোনার সুযোগ—দুইই তাদের হিন্দুধর্ম বিষয়ে কৌতূহল নিরসনে কিছু সাহায্য করতে পারে। ইদানীং কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রহ বেশ বেড়েছে। "হিন্দুইজম" ক্লাসে আমেরিকান অধ্যাপকের কাছে পড়াশোনার পরে রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামীজির কাছে দেখা করছে নানা প্রশ্ন নিয়ে। আশ্রমগুলিতেও

"বেদান্ত" এবং "গীতা"র ক্লাসে দেখা যাচ্ছে এদের। সেই বিচারেই মন্দির এবং আশ্রমগুলির ভূমিকা ভারতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২২ জুন ১৯৯১

উইক-এন্ড ও দেবীপক্ষ

এ সেই উৎসবের মাস, যখন বোধন থেকে বিসর্জনের পুনরাবৃত্তির মধ্যে প্রবাসী বাঙালির দুই পক্ষকাল কেটে যাবে। এ দেশের কোনও কোনও রাজ্যে 'অকালবোধন' শুধু তিনদিনের নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবার নয়। প্রাচুর্যের পরিবেশে মানুষের অধিকতর প্রাপ্তির অভ্যাস হয়ে যায় তো! বিলম্বিত দুর্গোৎসবের মাসে 'নবমী নিশি পোহায়' ভেবে বিষণ্ণ হবার কোনও কারণ নেই। সাধ আর সাধ্য থাকলে উমাকে বারে বারে বারোয়ারি মণ্ডপে ফিরিয়ে আনা যায়।

ইদানীং দেবী কোথাও আসেন পিতৃপক্ষে। কোথাও বিদায় নেন কৃষ্ণপক্ষে। আর দেবীপক্ষের সঙ্গে উইক-এন্ড জুড়ে নিয়ে তো চিরকালই আমেরিকার বাঙালিরা পুজো করে আসছে। স্থানাভাবে আর সময়ের সমস্যায় ছুটির দিন ছাড়া মাতৃপূজার উপায় নেই। তবে এ বছর খুব যোগাযোগ হয়েছে। উইক এন্ডেই দুর্গাপুজোর দিনক্ষণ পেয়ে যাওয়াতে, এবার অধিকাংশ শহরেই ঠিক সময়ে পুজো হচ্ছে।

মহালয়া থেকে আপনাদের সঙ্গে ঘুরে সুর মিলিয়ে যাব। হ্যাঁ, এখানেও জব্বর কোরাসের দল আছে। আপনারা যখন শেষরাতে ঘুমঘোরে 'যান্ত্রিক' মহালয়া শুনেছেন, আমরা তখন রীতিমতো অযান্ত্রিক। এ অঞ্চলের সেরা গাইয়ে অরুন্ধতী মল্লিকের বাড়িতে হারমোনিয়াম ঘিরে বসে গেছি। যন্ত্রটা নিমিত্ত মাত্র। অরুন্ধতীর চোখের ইশারায় সমস্বরে সুর মেলাচ্ছি—'অভয়া শক্তি বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো...।'

এ তো সবে সূচনা। এ বছর ক্রমাগত দেশের সঙ্গে টেলিপ্যাথিতে সংযোগ রক্ষা করে যাব। আপনারা যখন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে সতত সঞ্চারমান, আমরাও তখন খড়মড়ে তসর, মুগা পরে চার্চে ঢুকে পড়ছি। নয়তো কোনও কমিউনিটি সেন্টারে। নয়তো কোনও স্কুল কলেজের ক্যাম্পাসে। যেখানে যখন পুজো হয় আর কি! অবাঙালিদের তৈরি মন্দির ভাড়া নিয়েও দুর্গাপুজো হচ্ছে। এদেশে মণ্ডপ কেমন সাজানো হয়, ছবিতে দেখতে পাবেন। আমরাই 'মডার্ন ডেকরেটার্স'! কাগজ, কাপড়, শোলা আর রং নিয়ে যা কিছু কারুকার্য।

ক্রমশ কত ব্যবস্থাই হচ্ছে। এককালে বনবাদাড় থেকে তুলে আনা বিস্তর ঘাস, পাতা মুঠোয় ভরে নিয়ে 'সচন্দন বিল্বপত্র, তুলসীপত্র' বলে কাগজের মণ্ডের তৈরি ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছি। আর এখন কুমোরপাড়ার বিশাল প্রতিমার হাঁটু পর্যন্ত রক্তজবার মালা দোলে। কর্ষণজীবী বাঙালির যত্নের ফুল। প্রতিদিন দুর্গাঠাকুর, তস্য পরিবার ও অসুরকে গাঁদাফুলের 'মাল্যদান'। এক একটি বাড়ি থেকে এই হেমন্তের মরশুমেও এতরকম ফুল

আসে যে বাইরে থেকে বিশেষ কিনতে হয় না।

পুজোর ফুল কিনতে গিয়ে, বারোয়ারি পুজোর প্রচুর উপচার সংগ্রহ করতে গিয়ে কত রকম যে অভিজ্ঞতা হয়েছে! আমরা প্রতি বছর ঘুরে ফিরে কোনও একটি কমিটির দায়িত্ব পাই। কোনওবার কালচারাল কনভেনর, কোনওবার ব্রোশিওর এডিটর, কখনও ফুড কনভেনর, কখনও ডেকরেশন, কখনও 'পূজা' অর্থাৎ উপচারের কনভেনর। এইরকম আর কি। পরপর দু'বছর আমি আর দীপা পাল নামে এক বান্ধবী পুজো কমিটির কনভেনর হয়েছিলাম। কখনও দু'জনে মিলে, কখনও যে যার সুবিধেমত বাজার হাট করেছি। দেশের 'দশকর্মা ভাণ্ডার' থেকে যাবতীয় 'পূজা দ্রব্য', এমনকি শিশি শিশি 'মহাস্নানের জল' পর্যন্ত এসে গেছে। শুধু একেবারে দুর্গাপুজোর মুখে এখানকার কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল সেবার। পুরোহিতমশাই ফর্দে লিখে দিয়েছেন—হোমের জন্যে বালি আর কাঠ লাগবে। একদিন দুপুরে একা একাই সেসব সেরে ফেলতে গেলাম।

বাড়ি ঘর তৈরি আর সারানোর মালমশলার বিরাট দোকান। গিয়ে দেখি খুচরো বালি কেনার কোনও উপায় নেই। মিনিমাম ষাট পাউন্ডের বস্তা সাজিয়ে রেখেছে। সেলস পার্সন থেকে ম্যানেজারকে কত বোঝালাম, কয়েক মুঠো বালি হলেই 'রিলিজিয়াস পারপাস সার্ভড' হয়ে যাবে, কে কার কথা শোনে? শেষে ম্যানেজারের কথায় ঠোঙা ছেঁড়া আলগা বালির সন্ধানে একটা ফচকে মতো আমেরিকান ছেলের সঙ্গে ওদের ওয়্যার হাউসে ঢুকলাম। সেখানে আধভেজা কালচে মার্কা বালির পাহাড় একটুও পছন্দ হল না। যজ্ঞের বালি বলে কথা। ফচকে ছেলেটা বলল—একবার বলছ গোলাপি রঙের বালি চাই। আবার বলছ স্যান্ড কালারের...। আরে দূর! রং নিয়ে ভাবছি নাকি? ওজন নিয়েই ভয়। আমি নেহাতই ছোটমাপের মানুষ। ষাট পাউন্ড বালির বস্তা বইতে গিয়ে শেষে দেবীপক্ষে অপঘাতে মরব নাকি? পায়ে হাই হিল, মাথায় যজ্ঞের বালির বস্তা। অবস্থা চিন্তা করুন! শেষ পর্যন্ত ষাট পাউন্ডের পিংক বারমিউডা স্যান্ডের বস্তা বয়ে বয়ে গাড়িতে হেঁইও বলে তোলা এবং সাময়িক শূলবেদনা।

এরপর হোমের কাঠ কেনা। 'লাম্বার স্টোরে' চলে গেলাম। আগেই লিখেছি এরা অধিকে বিশ্বাসী। কোনও জিনিস কম করে পাওয়া যাবে না। খুচরো কাঠের টুকরো কিনতে এসেছি। তা পাউন্ড দরে কুচো কাঠ দিবি তো আমায়? আবার বলে দশ পাউন্ডের চেয়ে কম ওজনের কাঠের প্যাকেট নেই। এত হোম করবে কে? একবার পুরুতমশাই মনের সুখে এত কাঠ, ঘি জ্বালিয়েছিলেন যে পুজোবাড়িতে ধোঁয়া উঠে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে এলাহি কাণ্ড! তাঁকে এবার একটু আধটু কাঠ জ্বেলে আর নামমাত্র ঘি দিয়ে আহুতি দিতে বলা হয়েছে। তবে এত কাঠ কী করতে বয়ে নিয়ে যাব? অথচ দোকানে কিছুতেই দু'মুঠো শুকনো জ্বালানি কাঠ দেবে না। শেষে ফায়ার প্লেসের জন্যে রাখা প্যাকেটবন্দি দামি কাঠ একগাদা দাম দিয়ে কিনতে হল। ও বাবা, আবার পুজোর ফর্দে দেখি লেখা আছে—'চারকোল ফর ধুনুচি ড্যান্স।' মরেছে! নাচের কাঠকয়লাও বইতে হবে? চারকোলের ব্যাগগুলো লক্ষ করে দেখলাম। সেখানেও অধিকন্তু ন দোষায় : ব্যবস্থা। কী করব? কনভেনর হয়ে কর্তব্যে অবহেলা করব? কিন্তু ধুনুচি নৃত্য বিশারদরা হল্লা করতে পারে। পুজোর পরে মিটিঙে দাঁড়িয়ে আমাকেই কৈফিয়ত দিতে হবে তখন। ষাট পাউন্ড বালির বস্তা বইতে পারলাম

আর কাঠকয়লা তো হাতের ময়লা! সেবার বালি, কাঠ, ধুনুচি নাচের চারকোল—সব বস্তাই ঘাড়ে নিয়েছিলাম। পরের বার নিঃশব্দে দীপার ঘাড়ে। কারণ আমার ফুল আর ভুজ্যির সবজি কেনার মহৎ কর্ম বাকি ছিল।

পুজোর ফুল কিনতে আমেরিকান ফ্লোরিস্টের দোকানে যাওয়া মানে বাজেট ফেল করে যাবে। একটা ছোট্ট তোড়াও পাঁচ, ছ ডলারের কমে পাব না। তাও সব এ দেশের মরশুমি ফুল। কলা বউ-এর জন্যে একটা ঢ্যাঙামার্কা পাতাবাহার টব সুদ্ধু আগেই সুপার মার্কেট থেকে কিনে নিয়েছি। টাঙাইল শাড়ি কুচিয়ে পরিয়ে একগলা ঘোমটা টেনে দিলেই হবে। গণেশের পাশে গা, মাথা মুড়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকবে। এখন শুধু কয়েক ঝুড়ি পুজোর ফুল চাই। পুজোর শুরু থেকেই তো লোকের বাগানের ভরসায় থাকা যায় না। সে যারা পরে আনবে, দেখা যাবে। ভেবেচিন্তে এক বুড়ির বাগানে গেলাম। প্রায় দু' একর জমি নিয়ে তাদের নার্সারি। বুড়ো বুড়ি সেখানেই ছোট্ট বাড়িতে থাকে। বুড়ো খুব মিশুকে। বুড়ি ইতালিয়ান অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলে। তাদের ফুলের ব্যবসা। তরকারিও বিক্রি করে। একবার তরকারি কিনতে গিয়ে ওদের গাঁদাফুলের চাষ দেখেছিলাম। অর্ধেক বাগান জুড়ে হলুদে, কমলায় মেশামেশি। সেই থেকেই ইচ্ছে ছিল দুর্গাপুজোর ফুল কিনতে আসব।

দুর্গাপুজোর দিন সাত সকালে গিয়ে দেখি মিশুকে বুড়ো বাগানে নেই। সেমিজ পরা বুড়িকে কিছু বোঝাতেই প্রাণান্ত! যাই হোক, কাঁচি হাতে বুড়ি গাঁদার ঝোপে ঢুকে গেল। সহজে আর বেরোয় না। এদিকে মৌমাছির তাড়া খেয়ে দৌড়ে এধার ওধার পালাচ্ছি। দেখি পাশে এক কুমড়োর মাচা। সেখানে ঢুকে পড়লাম। আরে, গাদা গাদা কুমড়ো গড়াগড়ি যাচ্ছে! বুড়ি জমিয়ে রেখেছে মনে হয়। ভুজ্যিতে কুমড়ো দেয় না? নাঃ, বুড়িকে আজ ফুল, তরকারি কিনে বড়লোক করে দিয়ে যাব। সপ্তমীর দিন ক্লাবের দেওয়া ডলারে জনসেবা দিয়ে শুরু করব।

আহা! বুড়ি প্লাস্টিকের বড় বড় ব্যাগভর্তি গাঁদার জন্যে দাম চাইল মাত্র দশ ডলার। যা ফুল দিয়েছে, তিনদিনে দুর্গাপুজো হয়ে যাবে। তখন ইচ্ছে হল জিনিয়া আর কসমসও কিনে নিই। আবার সেমিজ পরা বুড়ির কাঁচি হাতে অন্তর্ধান। টাটকা জিনিয়া আর কসমস তুলে নিয়ে এল। সর্বসাকুল্যে দাম হল পনেরো ডলার। বুড়িকে কুড়ি ডলারের নোট দিলাম। ভাঙানি দিতে পারে না। বাধ্য হয়ে দুর্গাপুজোর ভুজ্যি হিসেবে দুটো কুমড়ো কিনলাম। বুড়ি হাই তুলে দাম চাইল মাত্র এক ডলার। মহা মুশকিল! এখন সবে ষোলো ডলার হয়েছে। বাকি চার ডলারের কী কিনব? বুড়ি ধুলোমাখা টমেটো এনে জিজ্ঞেস করল—টমেটো কিনবে? ভাঙানি ফেরত পাচ্ছি না বলে শেষে দুর্গাঠাকুরকে কাঁচা টমেটো খাওয়াব? দূর! ভুজ্যিতে কেউ টমেটো দেয়? বাধ্য হয়ে আবার একটা কুমড়ো কিনলাম। কোজাগরি লক্ষ্মী পুজোর অ্যাডভান্স বাজার! কিন্তু তবু কুড়ি ডলার হয় না। শেষে আরও কটা ফুল নিয়ে কুমড়োর শাখা প্রশাখা কাটিয়ে নিয়ে বুড়িকে বললাম—হয়ে গেছে কুড়ি ডলার। নাও বিল করো। বুড়ি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বাগানের ফুল, তরকারি বেচে রসিদ দেওয়ার কথা ভাবতেই পারছে না। কিন্তু আমার তো বিল চাই। ক্লাবের কাছে হিসেব নিকেশ ঠিক রাখতে হবে না? আমাদের নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন। বছর বছর ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসের জন্যে ফান্ডের অডিট করানো হয়। এই যে পুজোর মুখে আমরা কনভেনররা

সব অ্যাডভান্স পেয়েছি, পরে রসিদ সমেত সব হিসেব মেলাতে হবে। সেমিজ পরা বুড়িকে কি এত সাতকাহন বোঝানো যায়? শেষে নিজেই কাগজ পেন বার করে গাঁদা, কসমস, জিনিয়া, কুমড়ো আর ডাঁটার আইটেম লিখলাম। কুড়ি ডলার দাম লিখলাম। বুড়ি ভয়ে ভয়ে সই করে দিল। আজও সেই চিরকুট আমাদের ক্লাবের পুরনো খাতায় হয়তো রাখা আছে। সপ্তমীর সকালের ব্যয়ভার।

এবার আসি এ বছরের পুজোর কথায়। অক্টোবর মাসের নয় আর দশ তারিখে জার্সিসিটিতে গার্ডেন স্টেট পুজো কমিটি থেকে দুর্গাপুজো হচ্ছে। ১৬ আর ১৭ অক্টোবরে নিউ জার্সিতে নতুন দলের পুজো হচ্ছে মরিসটাউনে। গোষ্ঠীর নাম 'ইন্ডিয়ান কমিউনিটি সেন্টার।' নিউ জার্সিতে চারটি পুজো হওয়া সত্ত্বেও এঁরা আবার নতুন পুজো শুরু করেছেন কেন জানতে চেয়েছিলাম। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য—উত্তর নিউ জার্সিতে তো দুর্গাপুজো হয় না। এদিকেও বহু বাঙালির বাস। সরস্বতী পুজো তো আগেই আরম্ভ করেছি। এবার দুর্গাপুজোও শুরু হচ্ছে। এঁরা দেশ থেকে প্রতিমা আনিয়েছেন। পুরোহিতও বাঙালি। দু'দিনের উৎসবে অন্তত শ'পাঁচেক লোক হবে আশা করছেন। ব্রোশিওর প্রকাশিত হবে। অনুষ্ঠানের তালিকাও পেয়েছি। অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, শিবাজি চট্টোপাধ্যায় আর 'বাংলাদেশ' থেকে জাহেদা বেগম গান গাইতে আসছেন। এ পর্যন্ত যতগুলি কার্ড পেয়েছি, এঁদেরটি সবচেয়ে সুন্দর। স্থানীয় শিল্পীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এঁদের সদস্য এবং স্থানীয় নৃত্যশিল্পী মিত্রা পুরকায়স্থ জানালেন—ছোটদের নিয়ে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হবে। যন্ত্রসঙ্গীতের শিল্পীরা আসছেন মেরিল্যান্ড থেকে। এছাড়া 'রিদম অফ ড্যান্স অ্যান্ড মিউজিক' অধিবেশন করবে 'তাণ্ডব' ও 'লাস্য' থিমের ওপর ওড়িশি ও মণিপুরী নাচ। আমাদের 'কল্লোল' ক্লাব পুজো করছে ২২, ২৩, ও ২৪ অক্টোবর। ১৯৭৭ সাল থেকে এত বছর রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুজো করার পর এবার অন্য শহরে চলে যেতে হল। কারণ রাটগার্সের যে হলে পুজো হত, সেখানে এখন থেকে আর খাবার পরিবেশন করা যাবে না। পুজোর হলে যদি প্রসাদ, ভোগ কোনও কিছুই না দেওয়া যায়, তো হাজার, দেড় হাজার লোক খাবে কোথায়? এই সব ভেবে আমরা ওই অঞ্চলেই সমারসেট শহরে ইউক্রেনিয়ান কনভেনশন সেন্টারে কল্লোলের দুর্গাপুজো করছি। প্রতিদিন প্রায় হাজার খানেকের ওপর লোক হয়। সেদিক থেকে খুবই ভাল জায়গা পাওয়া গেছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছোটদের নিয়ে এবার নৃত্যনাট্য হচ্ছে। আর বড়রা করছেন 'অ্যান্টনি কবিয়াল' নাটক। এছাড়া বিচিত্রানুষ্ঠান থাকছে দু'দিনই। শুক্রবারের শ'তিনেক লোকের জন্যে মেয়েরাই রান্না করছেন। শনি আর রবিবার ভারতীয় রেস্তোরাঁ থেকে নিরামিষ কেটারিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই একই সময়ে দুর্গাপুজো হচ্ছে দক্ষিণ নিউ জার্সির চেরিহিলে। আর অক্টোবর মাসের শেষে ৩০ ও ৩১ নিউ জার্সির মধ্য অঞ্চলে পুজো করছে 'দ্য গার্ডেন স্টেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন।' এঁদের বাজেট প্রায় ষোলো হাজার ডলার। বিজ্ঞাপন আর চাঁদা থেকেই পুজোর খরচ ওঠে। এঁরা প্লেনফিল্ড শহরের হাইস্কুলে পুজো করেন। শনিবারে প্রায় বারোশো/তেরোশো লোক হয়। রবিবারে আটশো মতো। এঁদের রান্নাবান্না বাইরে থেকে আসে না। সদস্যরাই রান্না করেন। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে ডঃ খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি জানালেন—এবার ওঁদের অনুষ্ঠানে বোস্টন থেকে বিদেশে স্বদেশি নামে একটি নাটক

করতে আসছেন ও স্বপ্না চক্রবর্তী। মেরিল্যান্ড থেকে মণিপুরী নাচের দল নিয়ে আসছেন নবঘনশ্যাম সিং। তাঁরা 'রাসলীলা' আর হিন্দিতে 'চণ্ডালিকা' করবেন। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীদের এবং ছোটদের নাচগানের অনুষ্ঠান থাকবে। নিউ ইয়র্কের পুজোর সংখ্যা এখন চারটি। লং আইল্যান্ডের ফ্র্যাংকলিন স্কোয়ারে ১৬ আর ১৭ অক্টোবরে পুজো করছে 'নিউ ইয়র্ক সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি' এঁদের পুজোতে দু'দিনই পাঁচশো মতো লোক হয়। রান্নাবান্নাও নিজেরাই করেন এখনও পর্যন্ত! এছাড়া ব্রুকলিনে বহুদিন আগেই দুর্গাপুজো শুরু হয়েছে। আর নিউ ইয়র্ক শহরে প্রথম এসে যে আদি দুর্গাপুজো দেখেছি, সেও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। সে সময় ম্যানহাটনের কোনও চার্চে নয়তো কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্গাপুজো হত। 'ইস্ট কোস্ট দুর্গা পূজা অ্যাসোসিয়েশন' আর 'ইস্ট কোস্ট পূজা অ্যাসোসিয়েশন'—এখন দুটি দলের দুটি আলাদা পুজো হচ্ছে।

'ইস্ট কোস্ট দুর্গাপূজা অ্যাসোসিয়েশনে'র পক্ষ থেকে বনশ্রী ঘোষ জানালেন—আগামী বছর দুর্গোৎসবের পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে খুব বড় উৎসবের আয়োজন করা হবে। এটি আমেরিকার সবচেয়ে পুরনো পুজো। এঁদের বাজেট এখন পৌঁছেছে বাইশ হাজার ডলারের ঊর্ধ্বে। এ বছর ২২, ২৩ ও ২৪ অক্টোবরে কুইন্সে 'গুজরাতি সমাজ কমিউনিটি সেন্টারে'-এদের পুজো হচ্ছে। নতুন প্রতিমা এ বছরেই আনানো হয়েছে। হলভাড়ার খরচও কম নয়। 'গুজরাতি সমাজ কমিউনিটি সেন্টারকে' শুধু পুজোর জন্য হলভাড়া দিতে হয় সাড়ে তিন হাজার ডলার। এরপর তিনদিনের খাওয়া দাওয়া আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বড় খরচ তো আছেই। বনশ্রী ঘোষ জানালেন—প্রত্যেক বছর দেশের নামকরা শিল্পীরা পুজোয় অনুষ্ঠান করতে আসেন। সাধারণত শনিবারে তাঁদের প্রোগ্রাম দেওয়া হয়। আর রবিবারে স্থানীয় শিল্পীরা নাটক, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি করার সুযোগ পান। গত বছর এসেছিলেন যোগেশ দত্ত, প্রমিত সেন, বম্বের শারদা। শনিবারের পুজোতে হাজার দেড়েক লোক আসেন। তিনদিনের পুজোর প্রথম দিনের দায়িত্ব গত চার বছর ধরেই দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয় ছেলে মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুজো থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও তারাই পরিচালনা করে। স্টেজ সাজানো, স্টল সাজানো, বিচিত্রানুষ্ঠানের সময় বাংলায় ঘোষণা করা—এসব তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই করে আসছে। ইস্ট কোস্ট দুর্গাপূজা অ্যাসোসিয়েশনের গত বছরের ব্রোশিওরটি দেখেছিলাম। পূজা সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকাটির গেট-আপ এবং লেখাগুলির মান বেশ উন্নত।

ইদানীং নিউ ইয়র্ক শহরে 'বাংলাদেশে'র বাঙালিরা দুটি আলাদা পুজো করছেন। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি হিন্দুদের অস্তিত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্য নিয়েই এঁরা স্বতন্ত্রভাবে পুজো করছেন। তবে পুজোর ব্যবস্থাপনায় হিন্দু বাঙালিরা উদ্যোগ নিলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি মুসলমানরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকেন। গত বছর 'বাংলাদেশ পুজো সমিতি'র আমন্ত্রণ পেয়েও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছে আছে এবার ওঁদের পুজো দেখতে যাব এবং সে সম্পর্কে কিছু লিখব। এত অল্প সময়েই বাংলাদেশি দলও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে দুটি আলাদা পুজো শুরু করল কেন? মনে হয়, সেই একই কারণ। সমিতি ভাঙা গড়ার ব্যাপার।

বস্টনের পুজো হচ্ছে আগামী ২২, ২৩, ২৪ অক্টোবরে। 'প্রবাসী'-র উদ্যোগে প্রথম '৭৩ সালে কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। সে সময়

ম্যাসাচুসেটস-এর ওয়ালথ্যাম শহরে ওয়াই এম সি এ-র হলে পুজো হয়েছিল। তারপর থেকে কুড়ি বছর ধরে বস্টনের কাছাকাছি নানা শহরে প্রবাসীর পুজো হওয়ার পর '৯২ সাল থেকে উইনচেস্টার হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে পুজো হচ্ছে। প্রবাসী পক্ষ থেকে গোপা কুমার জানালেন—তিনদিনের দুর্গাপুজো আর বিজয়া সম্মেলন মিলিয়ে এঁদের বাজেট আট থেকে দশ হাজার ডলার। শনিবারে প্রায় ছশো মতো লোক হয়। নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাঙালিরা আসেন। নিউ হ্যাম্পশায়ার, ভারমন্ট, মেইন স্টেট থেকেও বস্টনের পুজো দেখতে লোক আসেন। কারণ আমেরিকার উত্তর পূর্ব সীমান্তের ওইসব শহরগুলিতে বাঙালির সংখ্যা নেহাতই নগণ্য বলা যায়। দুর্গাপুজো করার মতো জনবল কোথায়? প্রবাসে তাঁদের 'প্রবাসী'-ই ভরসা। প্রবাসীর ঠাকুর গড়েছেন কলকাতার শিল্পী বাঁধন দাস। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের পুরনো ছাত্র। আগে পুরোহিত ছিলেন হিমাংশু ভট্টাচার্য। এখন বাঙালি পুরোহিত মণি শর্মা পুজো করেন। পুজোর সময় শাড়ির স্টল, গয়নার স্টল, বাংলা বই-এর স্টল দেওয়া হয়। তিনদিনের নিরামিষ রান্নার যাবতীয় দায়িত্ব উদ্যোক্তারাই ভাগ করে নেন। রবিবারে চার হাজার লুচি তৈরির পর্ব থাকে। ছোটরাও ওই তিনদিন নিরামিষ খায়। স্প্যাগেটিতে নিরামিষ টমেটো সস দিয়ে পরিবেশন। নয়তো পিৎজা। পুজো মণ্ডপে এই নিয়মই চলে আসছে।

'প্রবাসী'র পুজোতে শুক্রবারে বাংলা সিনেমা দেখানো হয়। শনিবারে সন্ধেবেলা দেশের শিল্পী, স্থানীয় শিল্পীরা অনুষ্ঠান করেন। বস্টনের দ্বিতীয় প্রজন্মের ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয় রবিবারে। নাচ, গান ছাড়াও তারা ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। পুজোর সময়ই 'প্রবাসী'র বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এঁদের বিজয়া সম্মেলন হয় কালীপুজোর সময়। তখন বড়রা নাটক করেন। খাওয়া দাওয়াও আর নিরামিষে সীমাবদ্ধ থাকে না।

ম্যাসাচুসেটসে বহুকাল আগে 'টেগোর সোসাইটি' হয়েছিল। আর '৭০ সালে 'প্রবাসী'র জন্ম। '৮০ সাল নাগাদ আর একটি দল নিজেরা পুজো শুরু করেছেন। নাম 'বাংলা ও বিশ্ব।'

মেরিল্যান্ডে 'সংস্কৃতির' পুজো হচ্ছে ২২, ২৩ ২৪ অক্টোবর। সিলভার স্প্রিং শহরে ব্লেয়ার হাইস্কুলে পুজো হয় এখন। কুড়ি বছরের পুরনো দুর্গোৎসব। বাজেট নয় দশ হাজার ডলার। এঁদেরও শ'পাঁচেক লোক হয়। ওয়াশিংটন ভার্জিনিয়ার বাঙালিরা যোগ দেন। নবমীর দিন পাঁঠার মাংস বিশেষ আকর্ষণ। বাঙালি পুরোহিতের নাম প্রবীর চক্রবর্তী। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক সময়ের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন ড. মনীন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁরই ছেলে।

শিকাগো শহরে '৭৭ সাল থেকে পুজো শুরু হয়েছে। মিলওয়াকি আর ডেট্রয়েটেও পুজো হয়। তবে শিকাগোর পুজো এখনও একটিতে সীমাবদ্ধ আছে। হাইস্কুল ভাড়া করতেই হয়। শনিবারে প্রায় ১২০০ লোক, আর রবিবারের ছ'শোর মতো। ব্রোশিওর প্রকাশিত হয়। বাজেট এগারো হাজার ডলার। হলের জন্যেই পাঁচ হাজার ডলার খরচ পড়ে। তিনদিনই কেটারিং করে আমিষ, নিরামিষ সবরকম খাওয়ানো হয়। এবেলা ওবেলা ভুরিভোজন। এ বছর ২২, ২৩ ২৪ অক্টোবর পুজো হচ্ছে। বড়দের নাটক, ছোটদের নৃত্যনাট্য ও বিচিত্রানুষ্ঠান হবে। শিকাগোর পুজোর খবর দিয়েছেন অপর্ণা চক্রবর্তী।

ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে এখন তিনটি বারোয়ারি পুজো হচ্ছে। তবে উত্তরে এখনও একটিই বড় পুজো। সানফ্রানসিসকোর কাছাকাছি বাঙালি ক্লাব 'বে এরিয়া প্রবাসী ইনকরপোরেটেড'-এর উদ্যোগে বাইশ বছর ধরে এই দুর্গোৎসব হয়ে আসছে। পুরোহিতের নাম রমেন চক্রবর্তী। তাঁর বাড়িতেই প্রথম নিজে পুজো আরম্ভ করেছিলেন। এরা শুক্র,শনি দু'দিন পুজো করেন। এ বছর ২২ আর ২৩ তারিখে হবে। শুক্রবারে সাধারণত দুশো আড়াইশো লোক হয়। শনিবারই বেশি ভিড়, সাড়ে ছ'শো মতো। স্যাক্র্যামেন্টো থেকে ম্যানহোজে পর্যন্ত প্রায় ১২০ মাইলের ব্যাসার্ধের মধ্যে যে সব বাঙালির বাস, তাঁরাই যোগ দেন। ওয়ালনাট ক্রি-ক, মেরিন কাউন্টি, বার্কলে, ফ্রিমন্ট, কনকর্ড, পালো অ্যালটো, ওকল্যান্ড থেকে সপরিবারে এঁরা ফ্রিমন্টের হিন্দু মন্দিরে প্রবাসীর পুজো দেখতে আসেন। বাজেট দুর্গাপুজোর জন্যে সাড়ে সাত হাজার ডলার। আর একমাস বাদে বিজয়া সম্মিলনীর বড় উৎসবের জন্যে চার হাজার ডলার। দেশের প্রতিমা আনিয়েছেন। তবে প্রথমবার যখন পুজো শুরু হয়েছিল, সে সময় উদয় সেনগুপ্ত নামে একজন আর্কিটেক্ট ঠাকুরের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তিনি অসময়ে মারা গেছেন। এখন এক বছর তার আঁকা ছবি পুজো করা হয়, অন্য বছরে দেশের প্রতিমা। পুজোর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এককালে নিজেদের করতে হত। তখন বাড়ি থেকে সবাই রান্না করে আনতেন। তারপর পুজো বাড়িতেই কিচেন ভাড়া করে দু'দিনের রান্না হত। এখন দু'দিনই কেটারিং-এর ব্যবস্থা। শুক্রবারে মহালয়ার গান, ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান থাকে। শনিবারে বিচিত্রানুষ্ঠান। ওই অঞ্চলে কাছাকাছি তিনটি বাংলা স্কুল আছে। প্রতি বছর একটি করে স্কুলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ছোটদের নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি শেষ হলে রাতের খাওয়া দাওয়া শুরু হয়। তারপর দেশের শিল্পীরা এবং স্থানীয় প্রতিভাদের সুযোগ আসে। ক্যালিফোর্নিয়ার বাঙালিদের বড় আকর্ষণ সেখানকার আলি আকবর খান এসে বাজিয়েছেন। লক্ষ্মীশঙ্কর গান গেয়েছেন। চিত্রেশ দাস কথকের অনুষ্ঠান করেছেন। সানফ্রান্সিসকো ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এই দুর্গোৎসবে দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ার বয়স পর্যন্ত নিয়মিতই উপস্থিত থাকে। তবে পরবর্তী সময়ে তাদের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ লক্ষ করা যায় না। 'বে এরিয়া প্রবাসী'র পক্ষ থেকে শিবানী ভট্টাচার্য এই বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। একটি চিঠিতে সব রাজ্যের পুজোর খবর দেওয়া সম্ভব হল না। হয়তো সামনের বছর ফিলাডেলফিয়া, কানেকটিকাট, ক্লিভল্যান্ড, অ্যাটল্যান্টা, হিউস্টন, ডালাস, লস এঞ্জলস আর মরুভূমির রাজ্য অ্যারিজোনার বাঙালিদের মাতৃবন্দনা নিয়ে লিখব। যে সব স্টেটে বাঙালির সংখ্যা বেশি, সেখানে বারোয়ারি পুজো একটি/দুটি নিয়মিতভাবে হয়ে চলেছে। পুরোহিতদের নামাবলিও দীর্ঘ বলা যায়। প্রভাত ভট্টাচার্য, দেবু ভট্টাচার্য, নির্মল ভট্টাচার্য, প্রবীর চক্রবর্তী, রমেন চক্রবর্তী, অনিল চক্রবর্তী, ভবানী মুখার্জি, স্বপন চ্যাটার্জি, হিমাংশু ভট্টাচার্য, মণি শর্মা, অমিতাভ বাগচি—পুজোর তিনদিন প্রত্যেকের গায়ে নামাবলি।

বিদেশে পুজো সংক্রান্ত সমস্যার কথা যদি জানতে চান, সে নিয়েও দীর্ঘ চিঠি লেখা যায়। এখন শুধু একটি বিষয়ে লিখছি। সে সমস্যা চিরকাল আছে, এবং থাকবে। আবাহনে যতই আমরা শাস্ত্রীয় বিধি, দেশাচার, লোকাচার অনুসরণ করতে চেষ্টা করি, 'বিসর্জনে' প্রথা আনুগত্যের উপায় নেই। আমেরিকার জলে প্রতিমা ভাসান দেওয়া যাবে না। দিলে

জল 'কলুষিত' করার দায়ে পড়ব। লেখার শুরুতে বারোয়ারি পুজোর জাঁকজমক নিয়ে আপনাদের সঙ্গে পাল্লা টানতে চেষ্টা করেছিলাম। শেষে বিসর্জনে এসে ঠেকে গেছি। আপনারা দশমীর রাতে ভাসানের ঠাকুর দেখে দেখে কত প্রতিমার মুখই মনে রাখতে পারেন না। আমরা ভিড়ের মধ্যে মাথা নীচু করে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে ছোট্ট দর্পণে সেই নথ পরা বিষণ্ণ মুখখানির প্রতিবিম্ব দেখতে পাই।

২৩ অক্টোবর ১৯৯৩

শহরে নগরে দুর্গোৎসব

দেশের পুজোমণ্ডপে আমরা এখন অপরিচিত দর্শক। নীরব সাক্ষীও বলতে পারেন। নিউ ইয়র্কের পুজো আমাদের বাড়ির পুজোর মতো। চারদিন ধরে শুধু কাজের মধ্যে থাকি, তবু ক্লান্ত হই না...। নিউ ইয়র্কে 'ইস্টকোস্ট দুর্গাপুজা'র অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা প্রবীর রায় বলছিলেন। আমেরিকায় দুর্গোৎসবের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে নিউ ইয়র্কের আদি পুজো কমিটি "ইস্টকোস্ট দুর্গাপূজা" এ বছর সাড়ম্বরে উৎসবের আয়োজন করেছেন। এঁদের অকাল বোধনের তারিখ—৬, ৭, ৮, ও ৯ অক্টোবর। '৭০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ল হল ভাড়া করে মুষ্টিমেয় বাঙালি প্রথম যে বারোয়ারি পুজো শুরু করেছিলেন, '৯৪ সালে তার পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। সংস্থার নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টার না থাকায় গত পঁচিশ বছরে পুজো স্থান থেকে স্থানান্তরে গেছে। আমরা কলম্বিয়ার আর্ল হলের পুজো দেখেছি। ম্যান্‌হাটনে আপ-টাউনে চার্চের হলে দুর্গোৎসবে গিয়েছি। এক সময় নিউ ইয়র্ক শহর ছেড়ে আপ স্টেট নিউ ইয়র্ক রাজ্যে হোয়াইটপ্লেনস শহরেও এঁরা পুজো করেছেন। ইদানীং আবার বেশ কয়েক বছর ধরে নিউ ইয়র্ক শহরেই পুজো হচ্ছে। কুইন্‌স্ বরোতে গুজরাতি সমাজের মন্দিরে পুজো আর তার কাছেই পাবলিক স্কুলের অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ বছরেও সেখানেই হচ্ছে। রজতজয়ন্তী উৎসব প্রসঙ্গে এই পুজো কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও আদি সদস্য আশিস সেনগুপ্ত ও তুলসী সেনগুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তুলসী সেনগুপ্ত জানালেন—"বিশেষ বছর বলে নতুন প্রতিমা আনানো হয়েছে। আশা করছি পুজোর চারদিনই অনেক লোকজন আসবেন। অন্তত শনি, রবিবারে এক হাজার থেকে দেড় হাজার লোক হবে মনে হয়। সেই রকমই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা কেটারিং-এর ওপর পুজোর খাওয়া দাওয়াটা ছাড়তে পারি না। প্রত্যেক বছর পুজো-বাড়িতেই রান্না হয়। এর ফলে খাবার কম পড়ার টেনশন থাকে না। কাঁচা বাজার প্রচুর করা থাকে। লোকের ভিড় বুঝে সময়ে সময়ে খিচুড়ি, তরকারি, নামিয়ে ফেলা যায়। আর মিষ্টি তো আমরা মেয়েরা আগে থেকেই করে রেখে দিই। না ঃ চাঁদার ব্যাপারে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু ধার্য করা থাকে না। লোকেরা যেমন দেবেন, সেরকম। তাছাড়া কত ছাত্রছাত্রী আসে। দেশ থেকে আসা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে চাঁদার আশাও করি না!

তারা বিদেশে পুজো বাড়িতে এসে খুশি হয়। সেটাই বড় কথা। এ বছর ক্লাবের পুরনো সদস্যদের মধ্যে যাঁরা কোনও কোনও বার পুজোর প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ব্রোশিওরে তাঁদের ছবি থাকছে। এবছরও মহালয়া উপলক্ষে ২ অক্টোবরে সকাল ৯টার সময় নিউ ইয়র্কের রেডিও স্টেশন থেকে আমাদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। দ্বিতীয় প্রজন্ম পুজোতে নানাভাবে যোগ দেয়। সকাল থেকে পুজো-বাড়িতে তাদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া সন্ধেবেলায় হাইস্কুল, কলেজের ছেলে, মেয়েরা মিলে নিজেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠান করে। এবারও করছে। তবে তাদের ওপর ধর্মের প্রভাব কতখানি পড়েছে, এ নিয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। আমি তো সাংস্কৃতিক সম্মেলনই বলি আমাদের পুজোকে। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ধর্মের অনুশীলন কতটুকু? পুজোর নামে এত বছর ধরে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক উৎসবই বাড়িয়ে চলেছি। নয়তো দেড় মাস প্রতি উইক এন্ডে এতগুলি করে পুজো হয়? বিদেশে আমাদের সর্বভারতীয়ত্ব বলে যেমন কিছু নেই, সেরকম সর্ববাঙালিত্ব বলেও কিছু নেই। যদি দুর্গাপুজোর তিথির কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট উইক এন্ডে আমেরিকার প্রত্যেকটি বারোয়ারি পুজো হত, তবে ধর্মীয় উৎসবের যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারত। এ বছর বি. এ. এস. সি ৭, ৮, ৯ অক্টোবরে পুজো করছে। আর "দক্ষিণী" করছে ১৪, ১৫, ১৬ তারিখে। আদি পুজোটিতে শুক্রবারে তিনশো সাড়ে তিনশো, শনিবারে সাতশো মতো আর রবিবারে শ'চারেক লোক হয়। "দক্ষিণীতে" তার চেয়ে সামান্য কিছু কম। এতদিন বাঙালিরা পুজোর জন্যে নিজেরা একসঙ্গে রান্না করতেন। এ বছর "বি. এ. এস. সি" ক্যেটারিং করাচ্ছেন। এঁদের পুজোর চাঁদা নির্ধারিত থাকে। যে কোনও নন-মেম্বার এলে পরিবার পিছু সত্তর ডলার চাঁদা নেওয়া হয়। আর আমরা ক্লাব মেম্বাররা দিই একশো ডলার। কিন্তু "দক্ষিণী"তে এতদিন পর্যন্ত চাঁদার কোনও নির্দিষ্ট হার ছিল না। এর জন্যে মাঝে মাঝে সদস্যদেরই অতিরিক্ত আর্থিক চাপ নিতে হত। গত বছর থেকে তাই পরিবার পিছু ৫৫ ডলার পুজোর চাঁদা ধার্য করা হয়েছে।

প্রবীর রায় জানিয়েছেন—"পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা ট্রাইস্টেটের বহু বাঙালি ক্লাবকে ইস্টকোস্ট দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। দুর্গাপুজো নিয়ে মতান্তর, মনান্তর ভুলে গিয়ে নিউ ইয়র্কের অন্য পুজো কমিটিকেও সংঘবদ্ধ হতে ডেকেছিলাম। মিশ্র সাড়া পেয়েছি। তবে সিনিয়ররা সকলেই রজত জয়ন্তীর নামে এগিয়ে এসেছেন। আমরা যারা পঞ্চাশ পার হয়েছি, তাদের এবার তুচ্ছ নিন্দা, কলহ উপেক্ষা করে বিদেশে পরস্পরের কাছাকাছি আসার সময় হয়েছে। রজত জয়ন্তী হচ্ছে তারই উপযুক্ত সময়। আশা করছি, পুজোতে নতুন, পুরনো সকলেই উপস্থিত থাকবেন। সেই '৭০, '৭১, '৭২ সালে যাঁরা খুব সক্রিয় ছিলেন, সেরকম ৩৯০টি পরিবারের নাম ব্রোশিওরে দিয়েছি। আমাদের বাজেট হয়েছে ৫০ থেকে ৬০ হাজার ডলার। "আজকাল" শারদীয়া পত্রিকার সঙ্গে ইস্টকোস্ট দুর্গাপূজার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার জন্যে। এদেশের বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁদের রচনাসহ সংস্থার সদস্যদের বিশেষ রচনা সেখানে ছাপা হয়েছে। হ্যাঁ, আর একটি কথা। লং ডিসট্যান্স টেলিফোন কোম্পানি "এম সি আই" পুজোমণ্ডপে বুথ নিয়েছে। তাদের

সৌজন্যে যে কোনও ভারতীয় নিখরচায় তিন মিনিটের জন্যে পৃথিবীর যে কোনও দেশে ফোন করতে পারবেন। চাইলে বিজয়ার প্রণাম ওইভাবেই জানিয়ে দিতে পারবেন। এবছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জাঁকজমকও অনেক বেশি। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আসার সম্ভাবনা আছে। রবি ঘোষ ভিসা পেলে আসবেন। মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত আর "মহাভারতের" নেপথ্য শিল্পী রাজেন্দ্র জৈন আসছেন। অনুপ জালোটার ডেট নিয়ে একটু সমস্যা আছে। দেখা যাক।"

এবার পশ্চিম উপকূলে যাওয়া যাক। লস এঞ্জেলেসের দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান হচ্ছেন, ডঃ অজিত রক্ষিত। সেখানকার পুজোর বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন—লস এঞ্জেলসে দুটি বারোয়ারি পুজো হয়। "বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া" সংক্ষেপে বি. এ. এস. সি-র ব্যানারে গত পনেরো বছর ধরে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। ৯ বছর আগে দ্বিতীয় পুজো শুরু করেছে "দক্ষিণী" গোষ্ঠী। লস এঞ্জেলস খুব বড় এলাকা। দূরত্বের কারণেও বটে, পুজো কমিটির মধ্যে মতানৈক্যের ফলেও বটে, পুজো ভাগ হয়ে গেছে। দক্ষিণীর পুজো কমিটি বেশ কয়েক বছর আগে দেশ থেকে প্রতিমা আনিয়েছেন। "বি. এ. এস. সি."-র ঠাকুরও দেশের। সাত/আট বছর আগের মূর্তি। তবে প্রতি বছর প্রয়োজনীয় সংস্কার, রূপারোপের পরে নতুনের মতোই সুন্দর দেখায়। আদি পুজোর পুরোহিত হলেন ইঞ্জিনিয়ার পিনাকী চক্রবর্তী। দক্ষিণীর পুরোহিতও ইঞ্জিনিয়ার, নাম কমলেন্দু গাঙ্গুলি। প্রতি পুজোর সময় বাংলা নাটক হয়। এ বছর বি. এস. সি. করছে "কাঞ্চনরঙ্গ"। '৯২ সালে দক্ষিণীতে হয়েছিল "নরক গুলজার"। একবার রবীন্দ্রনাথের বশীকরণ হয়েছে। তবে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য হয় না। বিচিত্রানুষ্ঠানে নাচ, গান হয়। এ বছর সঙ্গীত শিল্পী স্বপন গুপ্তর আসার সম্ভাবনা আছে। রুদ্রপ্রসাদ, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত যেহেতু অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক/নিউ জার্সির পুজোয় অনুষ্ঠান করছেন, তাই ওঁদের নিয়ে (লস এঞ্জেলসের পুজোর পরে) বি. এস. এস. সি আলাদা অনুষ্ঠান করবেন। শারদীয়া উপলক্ষেই সেই অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। দ্বিতীয় প্রজন্মের আগ্রহ প্রসঙ্গে অজিত রক্ষিত একটু হতাশভাবেই জানালেন—মনে হয় না, আমাদের পরে দুর্গাপুজো এভাবে হবে। ছেলে-মেয়েরা বেশির ভাগই আলগা আলগা থাকে। দায়িত্ব নেওয়ার মতো উৎসাহ আর অভিজ্ঞতা দুয়েরই অভাব। হয়তো আমরা তাদের সেভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারিনি। ধর্মবোধ বিষয়ে আমাদের নিজেদের চেতনাও তো সংশয়জড়িত। এই সংশয় থেকেই পরবর্তী প্রজন্মকে হিন্দুধর্ম বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারি না। এ আমাদেরই ব্যর্থতা। ওরা রিচুয়্যালস-এর মানে বুঝতে পারে না বলে ক্রমশ আগ্রহ হারাতে থাকে। পুরোহিতদের বলেছি—পুজোর সময় পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র আর কিছু বিশেষ অংশ একবার করে ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করে দিতে। যাতে ছেলেমেয়েরা বোঝে, তারা কী বলে যাচ্ছে। কালচারাল প্রোগ্রামেও ওদের কথা কতটুকু বিবেচনা করি? একমাত্র নাচটাই ওরা দেখতে ভালবাসে। বাংলা নাটক, গান, কোনওটাই বসে দেখে না। বোর হয়ে বাইরে গিয়ে গল্প করে। আসলে নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তো নিজেদের রিলেট করতে পারে না। আমরা দেশের ঘটনা নিয়ে নাটক করি। চরিত্র, সংলাপ, সমস্যা, সবই তো সেই সমাজের। এরা অন্য গ্রহের মানুষ। হয়তো আমেরিকার জীবন, চরিত্র, অভিবাসী সমাজের কাহিনী নিয়ে, ওদের চেনা জগৎ নিয়ে নাটক করলে, তখন

নিজেদের চিহ্নিত করতে পারবে। দেখার উৎসাহ আসবে। বড়দের নাটকে ওদের অভিনয়ের সুযোগ থাকলে, তখন বন্ধুরা মিলে দেখতে আসবে। একেবারে ছোটদের অনুষ্ঠানে তবু কিছু দর্শক থাকেন। অভিভাবক এবং তস্য বন্ধুরা। কিন্তু ১২-২০ বছর যাদের বয়স, তাদের কালচারাল অ্যাট্রাকশন বলতে পুজোতে বিশেষ কিছু নেই। বিদেশে পুজো করার উদ্দেশ্য আর সার্থকতা প্রসঙ্গে এ কথাই বলতে পারি—অধিকাংশ বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো সামাজিক মিলনক্ষেত্রের চেয়ে বড় কিছু নয়।

আবার চলুন পূর্ব উপকূলে। ওহায়ো স্টেটের ক্লিভল্যান্ডের পুজোর খবর দিয়েছেন ডঃ অমিয় ব্যানার্জি। "বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি অফ ক্লিভল্যান্ড"-এর তিনি বোর্ড অফ ট্রাস্টি। অমিয় ব্যানার্জি জানিয়েছেন—"বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি অফ ক্লিভল্যান্ড" -এর এ বছর সতেরো বছরের দুর্গাপুজো। ১৪, ১৫, ১৬ অক্টোবর এঁরা পুজো করছেন। ওহায়োর "ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের" উদ্যোগে ভারতীয়দের যে নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টার কেনা হয়েছে, সেখানেই গত সতেরো বছর ধরে দুর্গোৎসব হয়ে আসছে। ভারতী চৌধুরী নামে এক মহিলা ২, ৩ বছর অন্তর অন্তর অপূর্ব সুন্দর প্রতিমা তৈরি করে দেন। গত তিন বছর এই ঠাকুর রাখা হয়েছে। ক্লিভল্যান্ডে কম বয়সী বাঙালি ছেলেমেয়েরা পুজোতে খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতি পুজোয় এরা হয় নাটক নয়তো নৃত্যনাট্য করে। সঙ্গে পুজোর কাজেও সমান উৎসাহী। ১২-১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা প্রসাদ বিতরণ থেকে শুরু করে অনেক কাজ করে। পুজো চলাকালীন মণ্ডপে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনমত বড়দের সাহায্য করে। বড়দের নাটক হয়। নৃত্যনাট্য হয়। দেশের শিল্পীরাও অনেকবার অনুষ্ঠান করে গেছেন। এ বছর স্বপন গুপ্তর আসার কথা আছে। মাসখানেক পরে আমরা বড় করে বিজয়া সম্মিলনী করি। তখন আমিষ খাওয়া-দাওয়া, বিরাট ভিড় হয়। এমনিতে পুজোর তিনদিন আমরা নিরামিষ রান্না পরিবেশন করি। বিজয়া সম্মিলনী হয় ক্লিভল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে। দু'ঘণ্টার কালচারাল প্রোগ্রামে দেশের শিল্পীরা ছাড়া আমরা স্থানীয় সদস্যরাও গান-বাজনা, নাটক, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি করি। তারপর বিরাট খাওয়া-দাওয়া। চাঁদা ওই একবারই পুজোর সময় যা নেওয়া হয়।

ক্লিভল্যান্ডের মতো ওহায়োর অন্য একটি পুজোর খবর দিয়েছেন কলাম্বাস শহরের বারোয়ারি পুজোর প্রধান কর্ম কর্তাদের একজন, মনোজ গুহ। তিনি "বেঙ্গল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সেন্ট্রাল ওহায়ো কলম্বাস"-এর দুর্গোপুজোর সঙ্গে জড়িত। মনোজ গুহ জানিয়েছেন—ওহায়ো স্টেটে মোট তিনটি পুজো হয়। '৮৩ সালেরও আগে থেকে "ট্রাইস্টেট দুর্গাপুজো" শুরু হয়েছে ওহায়ো, ইন্ডিয়ানাপোলিস আর কেন্টাকির বাঙালিদের সম্মিলিত উদ্যোগে। একেক বছর একেক স্টেটে হয়। '৯২ সালে ইন্ডিয়ানাপোলিসে, '৯৩ সালে ওহায়োর ডেটন শহরে হওয়ার পর এ বছর কেন্টাকি স্টেটের লুইভিল শহরে হচ্ছে। প্রায় ৬০০-৭০০ মতো লোক হয়। মাত্র একদিনের উৎসব। ভোর থেকে পুজো শুরু হয়। খুবই সুষ্ঠুভাবে এঁরা পুজো করে আসছেন।

আমি কলাম্বাসের পুজোর শুরুর থেকেই আছি। '৮৫ সালে "বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সেন্ট্রাল ওহায়ো" ছোট একটি হিন্দু মন্দিরে প্রথম দুর্গাপুজো আরম্ভ করেছিল। আমাদের এই প্রথম পুজো করার উৎসাহ, আর পরিশ্রম করার ক্ষমতা—দুইই

অপর্যাপ্ত ছিল বলতে পারেন। মন্দিরে পুজো করার জন্যে ভাড়া লাগত না। এখন সেই মন্দির অনেক বড় হয়েছে। দুর্গা পুজোও সেখানেই হয়ে আসছে। তিনদিনে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী উদ্‌যাপন করি। রান্নাবান্না নিজেরাই করে আসছি বরাবর। কমিটি মেম্বার হিসেবে এখনও আমাকে তিন দিনের খাওয়া দাওয়ার মূল দায়িত্ব নিতে হয়। শুক্রবারে বেশি ভিড় হয় না। শনি, রবিবার দেড়শো কি তার চেয়ে সামান্য বেশি লোক হয়।

এখানে তিনটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ আছে। তাদের কাছ থেকে পুজোর সময় রান্না কেটার করি না বটে, তবু তারা ব্রোশিওরে বিজ্ঞাপন দেয়। এবার আমরা ১৪, ১৫, ১৬ অক্টোবরে পুজো করছি। কালচারাল প্রোগ্রাম বলতে শনিবারে গান বাজনার অনুষ্ঠান থাকে। এখানে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে নিবেদিতা চ্যাটার্জি খুব ভাল গান করেন। ছোটদের গান বাজনা হয়। আসলে পুজোর মধ্যে সেভাবে প্রোগ্রাম করানোর সময় পাই না। মাস খানেক বাদে বিজয়া সম্মিলনীতে বড়দের নাটক, ছোটদের নাটক, নাচের প্রোগ্রাম হয়। আমি ছোটদের নাটকের ভার নিই। মিউজিক্যাল প্রোগ্রামও ওদের দিয়ে করাই। পুজোর বাজেট আমাদের তিন হাজার ডলারের নীচেই থাকে। প্রত্যেক ফ্যামিলি প্রথমে তিরিশ ডলার চাঁদা দেন। পুজোর খরচে টান পড়লে ক্লাবের ফান্ড থেকে মিটিয়ে দেওয়া যায়। প্রতিমা এনেছিলাম প্রথমবার ডেট্রয়েট থেকে। তাদের পুরনো ঠাকুর দিয়ে দিয়েছিল। তারপর প্রত্যেকে চল্লিশ ডলার করে দিয়ে দেশ থেকে নতুন ঠাকুর আনালাম' ৯১ সালে। আড়াই থেকে তিন ফুট উচ্চতার শোলার প্রতিমা। আনার খরচ ইত্যাদি নিয়ে মোট ১৭০০ ডলার লেগেছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মের দুর্গাপুজোর ব্যাপারের আগে তো একেবারেই আগ্রহ ছিল না। আমরা খুব চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওদের যেভাবেই হোক ইনভলভ করা দরকার। পুজো যদি শুধু সোস্যাল ইভেন্ট হয়, আমরা মোটামুটি সফল হয়েছি। কিন্তু যদি ওর কোনও রিলিজিয়াস পারপাস থাকে, তবে আমরা টোটালি ফেলিয়র। কারণ ছেলে, মেয়েদের সেভাবে বোঝাতে পারছি না। আসলে নিজেরাই যে বড্ড কম জানি।

ওহায়োর বারোয়ারি পুজো থেকে এবার নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাফেলো শহরের পুজোর মধ্যে চলে যাই। বাফেলোর সংস্কৃতির পক্ষ থেকে ইন্দিরা মুখার্জি জানিয়েছেন—'৮৫ সাল থেকে আমাদের পুজো শুরু হয়েছে। গ্রেটার বাফেলো, রচেস্টার আর ওয়েস্টার্ন নিউ ইয়র্কের কিছু বাঙালি পুজোতে যোগদান করেন। প্রথম দিকে তো নিজেদের কোনও কমিউনিটি সেন্টার ছিল না। সে সময় ভি এফ ডবলিউ হলে, উইলিয়ামস ভিলের স্কুলের হলে, ইন্টারন্যাশনাল হাউসে পুজো করতাম। তারপর হিন্দু কালচারাল সেন্টার তৈরি হল। গত দু তিন বছর থেকে সেখানেই পুজো হচ্ছে। পুরোহিত হলেন ড. অরুণ ভট্টাচার্য। তিন দিনের উৎসবে প্রতিদিনই ৩০০-৩৫০ মতো লোকজন আসেন। রবিবার দিন দুর্গাপুজো আর দশেরার উৎসব একসঙ্গে পালন করা হয়। বাঙালি মেয়েরা বেনারসী পরে প্রতিমা বরণ করেন। সিঁদুর খেলার শেষে মিষ্টিমুখ করান। অবাঙালি বন্ধুদের নতুন অভিজ্ঞতা হয়। আমাদের প্রতিমা দেশ থেকে আনা হয়েছে। শোলার প্রতিমা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আনা হল। রবিবারে দশেরার কীর্তন হয় দশমী পুজো শেষে। অবাঙালিরা এ পুজোতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন। এমনিতে সারা বছর প্রতি রবিবারে এঁরা "হিন্দু কালচারাল সেন্টারে" এসে কীর্তন করেন। শুধু দশমীর দিনে যে কীর্তন হয়, "সংস্কৃতি" পুজো কমিটি

তার ব্যবস্থা করে। পুজোর খাওয়া দাওয়া নিরামিষ। কিচেনে যাবতীয় রান্না হয়। মহিলারা রান্নাতে খুবই দক্ষ। দ্বিতীয় প্রজন্ম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ পায়। তারা নাচ গান ছাড়াও অবাক জলপান, পূজারিণী ইত্যাদি করেছে। ওই সময়েই ফ্যান্সি ড্রেস, গো অ্যাজ ইউ লাইক, এসবও করে ওরা। পুজোর হলেই সব অনুষ্ঠান করি। বড়রা পুজোতে গত কয়েক বছরে বউদির বিয়ে, শ্রীমতী ভয়ংকরী, সলিউশন এক্স নাটক করেছেন। রচেস্টারে তো দুর্গাপুজো হয় না। ওঁরা আমাদের পুজোতে আসেন। প্রোগ্রাম করে যান। দেশের শিল্পীরা এ সময় আসেন না। যখন পরে বড় করে বিজয়া সম্মিলনী হয়, তখন যদি কেউ আসেন তো প্রোগ্রাম হয়। বিজয়া সম্মিলনীতে বিরাট খাওয়া দাওয়ার আয়োজন থাকে। আমাদের দুর্গাপুজোর পরিবেশ খুব ঘরোয়া। যেন একান্নবর্তী পরিবারের দুর্গোৎসব। "স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক"-এর ক্যাম্পাস থেকে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা আসে। ছাত্রদের অল্প বয়সী বউরা এসে পুজোর কাজ করে। পুজো উপলক্ষে আমাদের বাংলা পত্রিকা "প্রতিভা" ছাপা হয়। চাঁদাও বেশ ভাল ওঠে। সব মিলিয়ে সুষ্ঠুভাবে পুজো হয়ে আসছে। কোজগরী লক্ষ্মী পুজো পূর্ণিমা তিথিতেই হয়। উইক ডে পড়ে সাধারণত। আমরা তিথি অনুযায়ী করে আসছি। সেই রাতে সকলকে প্রসাদ আর ভোগ পরিবেশন করা হয়। পুজো প্রসঙ্গে একটি কথা—একশো আটটি মোমবাতি জ্বালিয়ে আগে আরতি হত। এখন বম্বে থেকে ১০৮টি সুন্দর মাটির প্রদীপ আনানো হয়েছে। এ জন্যে মায়ের আরতির শোভা আরও বেড়েছে।

কানেকটিকাট স্টেটেও এখন দুটো দুর্গাপুজো হয়। হার্টফোর্ড শহরের পুজোর উদ্যোক্তা হলেন "এয়ার ইন্ডিয়ার" অমিত রায়। পঁচিশ বছর আগে ইস্টকোস্ট দুর্গাপুজো যখন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল, সে সময় অমিত রায়, অনাদি দত্ত, কাশীনাথ রায়, সুব্রত ইত্যাদিরা ছিলেন এই পুজোর প্রধান আহ্বায়ক। এই লেখার জন্যে অমিত রায়কে যখন কানেকটিকার্টের পুজোর বিষয়ে প্রশ্ন করছিলাম, তিনি আগে নিউ ইয়র্কের প্রথম পুজোর অভিজ্ঞতার কথাই বলছিলেন..."আমরা কয়েকজন সে সময় ম্যানহার্টনের আপটাউনে থাকি। কারুরই হাতে বিশেষ পয়সাকড়ি নেই। কেউ ছাত্র, কেউ নতুন চাকরি পেয়েছি। আমার মাইনে ছিল মাসে ছশো ডলার। সবে মাত্র বিদেশে এসেছি। মন পড়ে আছে দেশে। ম্যানহাটনের ওই হোটেলেই আমাদের ঘর সংসার, আড্ডা, সব কিছু। '৭০ সালে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যেভাবেই হোক, আমরা বারোয়ারি দুর্গাপুজো শুরু করব। আমার এয়ার ইন্ডিয়ার চাকরি। নিজে হাতে করে প্লেনে ঠাকুর নিয়ে ফিরলাম। ছোট্ট শোলার ঠাকুর। প্লেনে সারাপথ পাশের সিটে প্যাসেঞ্জার থাকাতে ঠাকুর আমার কোলে বসেই প্রায় এলেন। নিউ ইয়র্কের ঘরে এনে তাঁকে প্যাকিং বক্সের ওপর বসিয়ে রেখেছিলাম। পুজোর অ্যাডভান্স খরচের জন্যে নিজেদের পকেট থেকে একটা ফান্ড করেছিলাম। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অর্লহল ভাড়া নিয়েছি। ক্রমশ খরচ বেড়ে যাচ্ছে। নিজের মাইনের ছশো ডলার থেকে অর্ধেকের বিসে পুজো ফান্ডে চলে গেছে। কারণ কাঁচা বাজার, পুজোর জিনিস, সবই তো কিনে বেশি আছি। মনে খুব আশা—পুজোর সময় নানা স্টেট থেকে অনেক লোক বাঙালি আসবে। সবাই চাঁদা দেবে। পুরোহিত হলেন পরিচিত এক বাঙালি ব্রাহ্মণ। পুজোর দিন প্রতিমা স্থাপন করে বোধন শুরু হল। এদিকে আন্দাজে আন্দাজে ছুরি দিয়ে তরকারি

কেটে যাচ্ছি। গাদা গাদা খিচুড়ি নামাচ্ছি। আশিসদা, তুলসী বউদি মস্ত ভরসা আমাদের। ওঁদের দুই মেয়ে তখন ছোট ছোট। ভাবতে পারবে না, সেই প্রথম দুর্গাপুজোতে বিকেলের পর থেকে কী প্রচণ্ড ভিড় হতে লাগল। আমেরিকায় তখন কাছাকাছি কোনও স্টেটে কেউ দুর্গাপুজোর কথা ভাবতেও পারেনি। নিউ ইয়র্কের পুজোয় দূর দুর থেকে বাঙালিরা চলে এল। শনিবারে আর রবিবারে সবসুদ্ধ পঁচিশ শো লোক হয়েছিল। তারপরও কয়েক বছর ওই পুজোর সঙ্গে খুবই জড়িত ছিলাম। ক্রমশ যা হয়, অন্য দল এসে কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিল। কিছু কিছু অপ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে দূরে দূরে থাকাই ভাল মনে হল...। এখন নিজে কানেকটিকাটে থাকি। এখানেই হার্টফোর্ডে পুজো শুরু করেছি।

এবছর ৭, ৮, ৯ অক্টোবর ইস্ট হার্টফোর্ডের চার্চে পুজো হচ্ছে। প্রথম '৮৫ সালে যখন পুজো আরম্ভ হয়েছিল, সে সময় থেকে ওয়েস্ট হার্টফোর্ডের আমেরিকান স্কুলেই পাঁচ বছর ধরে হয়েছিল। তারপর থেকে এই চার্চে হচ্ছে। প্রথম পাঁচ বছর যে প্রতিমা আমাদের বারোয়ারির জন্যে পেয়েছিলাম, সেটি স্থানীয় বাঙালি ডক্টর বসুর ঠাকুর। তিনি ডি. সি. পি. এল.-এর সাধন দত্তর আত্মীয়। ফিলাডেলফিয়াতে যে বছর ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া হয়েছিল, সাধন দত্ত তখন ওই শোলার প্রতিমা কিনেছিলেন। এখন দেশ থেকে নতুন প্রতিমা আনিয়েছি। কুমোরটুলির মূর্তি। তিন দিনের পুজোর মধ্যে শুক্রবারে পঞ্চাশজন মতো মেম্বার মিলে যাবতীয় ব্যবস্থা করি। প্রতিমা স্থাপন, ডেকোরেশন ইত্যাদি হয়ে যায়। শনি, রবি পুজো হয়। মোট ত্রিশটি পরিবার ২৫, ৩০ ডলার করে চাঁদা দেন। বাজেট তিন থেকে চার হাজার ডলার মতো। শনিবারে দুশোর কিছু বেশি আর রবিবারে শ'খানেক লোক হয়। খাওয়া দাওয়া অবশ্যই নিরামিষ। আগে আগে নিজেরা রেঁধেছি। এ বছর কেটারিং করার ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ বড় পরিশ্রম হয়। আমাদের সংগঠনের নাম—"বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার হার্টফোর্ড"। অবাঙালিরা পুজোতে আসেন শতকরা দশ ভাগ মতো। অনুষ্ঠানে অনেক বারই ভাল ভাল বাংলা নাটক হয়েছে। বিচিত্রানুষ্ঠানে ছোটরা অংশ নেয়। ব্রোশিওরের দায়িত্ব প্রথম পাঁচ বছর নিজেই নিয়েছি। এখন অন্য কেউ ভার নেন। আমি ঠাকুরের ডেকরেশনের দায়িত্ব নিই। আমাদের বারোয়ারি পুজোতে বাঙালির রাজনীতি এখনও প্রবেশ করেনি। বেশ মিলে মিশে আছেন সকলে। ছোটখাটো মত বিরোধ যে হয় না, বলব না, তবে যে কোনও বড় কাজে, তা হতেই পারে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের কানেকটিকাটের এই ন বছরে পুজোয় আন্তরিকতার ভাবটি যথেষ্টই বজায় আছে।

অমিত রায় ছাড়াও কানেকটিকাটের দ্বিতীয় দুর্গোৎসবের বিবরণ দিয়েছেন প্রধান উদ্যোক্তা অরবিন্দ দাস। আমরা স্ট্যানফোর্ড শহরের চার্চে গত দু বছর ধরে পুজো শুরু করেছি। দেশ থেকে নতুন শোলার প্রতিমা আনিয়েছি। তবে প্রথম বছর স্থানীয় শিল্পীর হাতের তৈরি ঠাকুরের পুজো হয়েছে। আগে শুক্র আর শনিবারে পুজো হত। এ বছর ১৫ আর ১৬ অক্টোবরে করছি। ভবিষ্যতে তিনদিন ধরে পুজো করার পরিকল্পনা আছে। বাজেট প্রথম বছর ছিল ছ হাজার ডলার। এখন সামান্য বেশি হয়েছে। প্রথম বছর মহারাষ্ট্রীয় পুরোহিত বিনা দক্ষিণায় পুজো করেছিলেন। গতবছর থেকে বাঙালি পুরোহিত হিমাংশু চৌধুরীকে পেয়েছি। আসলে দুর্গাপুজোর জন্যে বাঙালি পুরোহিতই চেয়েছিলাম। আমাদের দুশো থেকে তিনশো মতো লোক হয়। রান্নাবান্না নিজেরাই করি। অ্যাসোসিয়েশন

অফ ইন্ডিয়ান ইন আমেরিকা সংক্ষেপে এ. আই. এ-র ব্যানারে দুর্গোৎসব করার কারণ—শারদীয় উৎসবকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া যায়। এ আই এ-র কানেকটিকাট চ্যাপ্টারের সদস্য হিসেবে নন-প্রফিট অর্গানাইজেশনের সুবিধে পাওয়া যায়। অবাঙালিরা অনেক আসেন। শুক্রবারে ছোটদের অনুষ্ঠান হয়। শনিবারে বড়দের নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান। বাংলা নাটক এখনও করিনি। আসলে অবাঙালিদের কথা ভেবে নাচ, গান ইত্যাদির পরিকল্পনা করা হয়। এবারও ছোটদের নৃত্যনাট্য হচ্ছে। আসলে বড়দের নাটকের প্রস্তুতি এবং দর্শকও এখনও তৈরি হয়নি। হয়তো পরে নাটক করব। ব্রোশিওর ছাপা হয়। ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে বিজ্ঞাপন পাই। জনার্দন উপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোকের নিজের ভারতীয় মশলাপাতির ব্যবসা। দুর্গামায়ের ভক্ত লোক। তিনি আমাদের পুজোতে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস দান করেন। এমনকি দুদিনের খাওয়া দাওয়ার জন্যে চাল, ডাল, তরি তরকারি, মশলাপাতি ইত্যাদিও দেন। অনুষ্ঠানে দেশের শিল্পী আনার মতো আর্থিক অবস্থা এখনও হয়নি। দেড় হাজার ডলার দিয়ে ঠাকুর আনিয়েছি। দুদিনের হল ভাড়া লাগে আরও দেড় হাজার ডলার। এ বছর কালচারাল বাজেট করেছি সাতশো ডলার মতো। জানি না দেশের শিল্পী আনতে পারব কিনা। বিজয়া সম্মিলনী হয় বেশ ঘরোয়াভাবে। পুজো কমিটির মেম্বারদের কোনও একজনের বাড়িতে। ভবিষ্যতে বড় করে করার ইচ্ছে আছে। আমাদের স্ট্যানফোর্ডের পুজোর ছবি স্থানীয় কাগজে বেরিয়েছিল। নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে '৯৩ সালের দুর্গোৎসবে এসেছিলেন সেনেটর জর্জ জেপসেন, কংগ্রেস ম্যান ক্রিস্টোফার শেস্ আর শহরের মেয়র স্ট্যানলি এসপসিটো। আমাদের পুজোতে মেম্বারদের স্কুলে, কলেজে পড়া ছেলে-মেয়েরা খুবই উৎসাহ নিয়ে যোগ দিচ্ছে।

আমেরিকার দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে এ বছরে সর্বশেষ তথ্য নিয়েছি বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি অফ সাউথ জার্সি-র অন্যতম উদ্যোক্তা মৃণাল সোমের কাছে। তিনি গত বছর পর্যন্ত ওই সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কুলজিয়ানে কর্মরত মৃণাল সোম নিউ-জার্সির দক্ষিণ অঞ্চলের এই পুজোর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। তিনি জানিয়েছেন—'৭৪ সাল পর্যন্ত সাউথ জার্সির বাঙালিরা ফিলাডেলফিয়ার পুজোতেই যেতেন। তখনও আমাদের নিজেদের পুজো শুরু হয়নি। তারপর অজিত সামন্ত, বিজয় গুপ্ত, তাপস সোম, কল্যাণ নিয়োগী, ধীরাজ চন্দ ইত্যাদিরা মিলে আরও কিছু বাঙালির সঙ্গে এই সংগঠনের ব্যানারে বারোয়ারি পুজো শুরু করেন। প্রায় দু'দশক ধরে দক্ষিণ নিউ জার্সির ৫০ মাইল ব্যাপ্তির মধ্যে ভুরহিস্, মাউন্ট লরেল, ওয়াশিংটন টাউনশিপ, উইলিয়ামস টাউন ইত্যাদি শহর থেকে প্রায় দুশো বাঙালি ও কিছু অবাঙালি পরিবার এই সংগঠনে এবং দুর্গাপুজোয় যোগ দিয়ে আসছেন। পুরোহিত প্রভাত ভট্টাচার্য কুলজিয়ানেই চাকরি করেন। আমাদের প্রতিমা কলকাতা থেকে আনার ব্যাপারে ডি. সি. পি. এল.-এর সাধন দত্ত আর তাঁর কন্যা শান্তা খুব সাহায্য করেছেন। তাঁরা এই সংগঠনের লাইফ মেম্বার। পুজোর তিথি অনুযায়ী তার আগের বা পরের শনি, রবিবারে দুর্গোৎসব পালন করা হয়। পুজো কমিটির সদস্য হিসেবে দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা খুবই কাজকর্ম করে। ডেকরেশন, প্রসাদ বিতরণ, সবেতেই তারা আছে। দেড়শোটি পরিবার আমাদের ক্লাবের সদস্য হলেও পুজোর সময় অন্তত আড়াইশো বাঙালি পরিবার যোগ দেন। বাজেট হচ্ছে আট থেকে দশ হাজার ডলার। পুজো

কমিটিতে ৭০% ভাগই হচ্ছেন মহিলা কর্মী। ব্রোশিওরও ছাপা হয়। এ বছর ১৫ আর ১৬ পুজো করছি। পুজোর রান্নাবান্না এখনও আমরা নিজেরাই করছি। বিজয়া সম্মিলনী হয় এক সপ্তাহ পরে। সেও বেশ বড় উৎসব। পুজোর প্রধান আকর্ষণ কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীদের অনুষ্ঠান। গত আঠারো বছরে সুচিত্রা মিত্র, ফিরোজা বেগম, রেবা মুহুরী, গীতা ঘটক, সুবিনয় রায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অজয় চক্রবর্তী, সলিল চৌধুরী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী চাকী, বিশ্বজিৎ, তরুণ, দীপান্বিতা রায়ের নাটকের গ্রুপ, হৈমন্তী শুক্লার মতো প্রখ্যাত শিল্পীদের আনানোর সৌভাগ্য হয়েছে। পুজোকে কেন্দ্র করেই এই প্রবাসী বাঙালিদের সোসাইটি থেকে ফান্ড রেইজিং প্রোগ্রাম রিদম অফ ইন্ডিয়া করেছিলাম। আড়াই হাজার ডলার তুলে কলকাতায় নারী সেবা সংঘ, মাদার টেরেজার হোমে ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে। বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি অফ সাউথ জার্সি-তে আমরা কুলজিয়ানের অধিকাংশ বাঙালিরা জড়িত আছি। এই পুজোই আমাদের বাড়ির পুজোর মতো আকর্ষণ করে।—শারদীয়া সংবাদ আর বিজয়ার শুভকামনা সহ এবারের সুদীর্ঘ চিঠি শেষ করলাম।

৮ অক্টোবর ১৯৯৪

শুভেচ্ছার হরির লুঠ

পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি রেখে ঢ্যাঙা মতো পুলিসটা আমার আগে আগে যাচ্ছিল। মাঝে গুটি গুটি পায়ে আমি। সানফ্রানসিসকোর গোল্ডেন গেট কিংবা বিদ্যাসাগর সেতুর স্টাইলে আগে পিছে খাম্বা আর মাঝখানে খুব এলানো ভাব—এমনই দৃশ্যরচনা করে জোড়া পুলিস নিয়ে পোস্ট অফিসে ঢুকে গেলাম।

বড়দিনের বাজারের যেখানে যাও, লাইন লাগাও। অপরেশ লাহিড়ীর উপদেশ মতো আমি, পুলিস ও তার সখা হাতে ক্রিসমাস কার্ডের গাদা নিয়ে পর পর দাঁড়িয়ে পড়লাম। লাঞ্চ আওয়ারে আসাই ভুল হয়েছে। কাউন্টারে লম্বা লাইন। বড় বড় ক্রিসমাস প্যাকেজ নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামনের পুলিস আর পেছনের পুলিস আমার মাথার ওপর দিয়ে গল্প করছিল। একটার মুখ চেনা চেনা। যতদূর মনে হয়, যেবার বাড়িতে মাইক্রোয়েভে আস্ত কাঁচা আলু বেক করতে গিয়ে আমার মেয়ে বোমা ফাটানোর ব্যবস্থা করেছিল, আর ফায়ার অ্যালার্ম শুনে পুলিস ছুটে এসেছিল, সেবারই একে দেখেছি।

ঢ্যাঙা পুলিস কাউন্টারে পৌঁছেই বায়না শুরু করল। বত্রিশ সেন্টের সাদামাটা স্ট্যাম্প সে নেবে না। ক্রিসমাস কার্ডের জন্যে ক্রিসমাস স্পেশাল স্ট্যাম্প কিনবে। পোস্টাল ক্লার্ক দুটো ড্রয়ার হাটকে চকচকে নতুন স্ট্যাম্পের পাতা নিয়ে এল। পুলিসের আবদার বলে কথা! শেষমেশ ছোট্ট ছোট্ট পাখাওলা ন্যাংটো দেবদূতের স্ট্যাম্প কিনে নিয়ে পুলিস কাউন্টার ছাড়ল।

স্ট্যাম্প নিয়ে বায়নাক্কা অবশ্য আমারও আছে। আমেরিকার মধ্যে যতগুলো কার্ড পাঠাব, তার জন্যে বত্রিশ সেন্টের যে কোনও পাতা হলেই হবে। সে ন্যাংটো দেবদূতই হোক, কি টাকমাথা আইসেন হাওয়ারের ছবিই হোক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইন্ডিয়ার কার্ডের জন্যে একটি স্ট্যাম্পও চাই না। কারণ স্ট্যাম্প পাগলাদের জন্যে বহু চিঠি খোয়া গেছে। অনেকবার লেখা হারিয়েছে। তারপর থেকে মিটার স্ট্যাম্পের শরণ নিয়েছি। ঝকঝকে ছবিওলা স্ট্যাম্পের বদলে মামুলি স্টিকার। পোস্ট অফিসের ক্লার্ক চিঠি ওজন করে মিটার স্ট্যাম্প সেঁটে দেয়। পাশে রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ মারে। সময় একটু বেশি লাগে। তবে রোজ তো আর গাদা খানেক চিঠি ফেলতে আসি না।

আজ খান পনেরো ইন্ডিয়ার কার্ড ধরিয়ে দিতে পোস্টাল ক্লার্ক বেশ সময় নিচ্ছিল। পেছনের পুলিস দু'হাত কোমরে রেখে ঝুঁকে পড়ে বলল—চারটের পর থেকে স্লো পড়বে। মনে মনে বললাম—পড়ুক গে। ইন্ডিয়ার কার্ডে ধপাধপ রাবার স্ট্যাম্পের বাড়ি পড়ছে। আমার কোনও তাড়া নেই।

মিটার পর্ব চুকিয়ে, লোকাল স্ট্যাম্প আর এয়ার লেটার কিনে বিল মেটাতে যা সময় লাগল, তার মধ্যে প্রথম পুলিস কোণের টেবিলে ঠেস দিয়ে ক্রিসমাস কার্ডের খামের ওপর প্রায় সব দেবদূতদের বসিয়ে দিয়েছে। এরপর ট্রেতে সাজিয়ে রেখে যাবে। কারণ সকাল থেকে চিঠির ঠাসাঠাসিতে মেইল বক্সের মুখ বন্ধ। দুপুরের ক্লিয়ারিং না হওয়া পর্যন্ত চিচিং বন্ধ। মিটার স্ট্যাম্পের দৌলতে আমার কার্ডগুলো অবশ্য সরাসরি এয়ার মেইলের ডাব্বায় ঢুকে গেছে।

ক্রিসমাস কার্ড আর নিউইয়ার্স কার্ড পাঠানো নিয়ে আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে আবার খুব বাছ বিচার আছে। যে কার্ডে শুধু ক্রিসমাস গ্রিটিংস লেখা থাকে, অধিকাংশ ভারতীয় তা কিনতে চায় না। সিজনস গ্রিটিংস নয়তো হ্যাপি নিউ ইয়ার ইত্যাদি শুভেচ্ছাবাণী থাকতে হবে। এ ধরনের কার্ডের চাহিদা অবশ্য শুধু আমাদের কাছেই নয়, ইহুদি, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের মানুষের কাছেও আছে। যেহেতু বছরের শেষে শুভেচ্ছা বিনিময় ক্রিসমাসে ট্রি সাজানোর মতোই সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা হয়ে গেছে, সেহেতু কার্ডের আদান প্রদান তো হবেই। তবে কার্ডে কোনও ধর্মীয় উৎসবের কথা না থাকলেও চলবে।

ইংরেজরাই প্রথমে ক্রিসমাসে কার্ড পাঠানো শুরু করেছিল। যথাকালে আমেরিকানরা সে প্রথা গ্রহণ করেছে। এদেশে ক্রিসমাসের সময় সব বয়সের মানুষ, এমনকি পোষা কুকুর বেড়ালের নামেও কার্ড আসে। মিসেস হিগিনস-এর কুকুর টুটসি ক্রিসমাস কার্ড পাঠায় অ্যানামেরির কুকুর পাফিনকে। "পেট স্পেশাল" ক্রিসমাস কার্ড বিক্রি হয় নিশ্চয়ই। নইলে দোকানে রাখবে কেন? গিফট তো দেওয়াই হয় ক্রিসমাসে।

আমার মেয়ে সেই ধুমসো বেড়ালটা চলে যাওয়াতে এখন এক কুকুর ছানা পুষেছে। ছোট্ট বিগল। শুনেছি ক্রিসমাসে তাকে একটা সবুজ কম্বল আর চেক কাটা সোয়েটার উপহার দিতে হবে। মেয়ের রুমমেট ক্যারেলিনের মা নাকি কুকুরটার জন্যে স্যান্টাক্লজের টুপি আর পেটে ফিতে বাঁধা লাল গরমজামা পাঠাচ্ছেন। কার্ডের কথা কিছু শুনিনি। পাঠালেও আশ্চর্য হব না।

আমেরিকায় এখন বছরে ২.৬ বিলিয়ন মতো ক্রিসমাস কার্ড বিক্রি হয়। যদি জানতে

চান, কেন এত কার্ড পাঠানোর ঘটা, তবে বলি—দুটি কারণ অথবা মনস্তত্ত্ব এর পেছনে কাজ করছে বলে মনে হয়। প্রথমত হার্দিক কারণ। এ সময় আত্মীয়, বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাতে ইচ্ছে হয়। সারা বছর যোগাযোগ না থাকলেও বছরে অন্তত একবার পরস্পরকে মনে পড়ে। আমাদের বিজয়ার চিঠির মতো। কিছু নাহি ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি...। পৃথিবীর যেখানেই থাকি, বেঁচে আছি। এই জরুরি খবরটা দেওয়ার জন্যেই বিজয়ার চিঠি, বড়দিনের কার্ড। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সামাজিক কর্তব্যের চাপ। অনেকে বলেন—কার্ড পাঠানোর পেছনে ভদ্রতা আর লৌকিকতার ব্যাপারটি প্রধান। লোকেদের দেখাদেখি কার্ড পাঠাতে হয়। প্রত্যেক বছর নতুন নতুন লোকের কার্ড আসে। তখন আবার তাকেও পাঠাতে হয়। এখানে ইচ্ছে, অনিচ্ছের চেয়ে ভদ্রতাবোধই কাজ করে।

একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী ক্রিসমাসে মোট তিনশো কার্ড পাঠান। তাঁর বক্তব্য—শতকরা ৯০টি কার্ড পাঠাই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে। সেখানে লৌকিকতার কোনও দায় নেই। কিন্তু বাকি দশভাগ হচ্ছে ভদ্রতাবজায় রাখা আর ব্যবসার খাতিরে। চেম্বার অফ কমার্সের মেম্বারদের সঙ্গে খাতির বজায় রাখতে গেলেও ক্রিসমাস কার্ড আদান প্রদান করতে হয়।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, ক্রিসমাস কার্ড পাঠানোর ক্ষেত্রে সকলেই এক ধরনের মনোভাব পোষণ করছেন। বহু লোক মহা উৎসাহে প্রতি বছর ঝাঁকে ঝাঁকে কার্ড বিলি করেন। তবে শ'খানেক কার্ড কিনে নাম ধাম লিখে পাঠানোর পর্ব কিছু কম নয়। সাধারণত এক একটি বাক্সে আঠেরো থেকে কুড়ি খানা করে কার্ড আর খাম থাকে। প্রথম একটি দুটি বাক্স ঝটপট খতম হয়ে যায়। তারপরেই ঢিমে তাল। অথচ বড়দিন বড় তাড়াতাড়ি চলে আসছে। কার্ডের বাক্স, স্ট্যাম্পের পাতা, লোকেদের নাম ঠিকানার ফর্দ, নিজের ঠিকানা লেখা স্টিকার—আনুষঙ্গিকের বহরই কত। তার মধ্যে এই মোবাইল সোসাইটিতে ঘন ঘন লোকে চাকরি বদলায়। বাড়ি বদলায়। কে কবে তার ঠিকানা বদল জানিয়েছিল, সেই চিরকূট খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। এ বছর তার কার্ড এলে তবে হদিশ পাওয়া যাবে।

ইনসিওরেন্স কোম্পানি, কোনও কোনও বিউটি স্যালোন, শহরের রেস্তোরাঁ থেকেও ক্রিসমাসে কার্ড পাঠায়। এক বিউটি স্যালোনের মালিক বলেছিল প্রতি ক্রিসমাসে সে সব খদ্দেরদের ঠিকানায় গ্রিটিংস কার্ড পাঠায়। হয়তো তারা আর আসেও না। কখনও কার্ড ফেরতও এসেছে। "মুভড। অ্যাড্রেস আননোন" লিখে দিয়েছে পোস্ট অফিস থেকে। এক বুড়ি বহুদিন চুল সেট করতে আসছিল না। ম্যানিকিওর করতেও আসেনি। ক্রিসমাস কার্ড ফেরত এল—সিনিয়র সিটিজেন হোম থেকেই লিখে দিয়েছিল—বুড়ি বেঁচে নেই।

বিউটি স্যালোন যেমন খদ্দেরদের ক্রিসমাস কার্ড পাঠায়, সেরকম হেয়ার ড্রেসারদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্যেও কার্ড পাওয়া যায়। ক্রিসমাস ইভ-এ চুল সেট করে, কিছু ডলার সমেত কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হল। ভেতরে ছাপা আছে—থ্যাংকস ফর দ্য গুড হেয়ার ডেজ। হলিডেজ-এর মতো গুড হেয়ার ডেজ।

কার্ড ব্যবসায়ীরা কম গবেষণা করে? সারা বছর লোকের মনস্তত্ত্ব বুঝে বুঝে কার্ডের খসড়া বানায়। প্রতি ক্রিসমাসের জন্যে নতুন নতুন কার্ড ছাপায়। যারা চোখে কম দেখে, তাদের খাতিরে মোটা মোটা হরফের বাণীসুদ্ধ গ্রিটিংস কার্ড ছাপে। টেকসাসের অস্টিন

শহরে আমেরিকান এথিইস্ট প্রেস আছে। তারা বড়দিনের সময় "নাস্তিক স্পেশাল" কার্ড ছাপায়। ভেতরে ক্রিসমাস, নোয়েল, ওয়াইজ মেন, স্টার কিংবা সিজনস গ্রিটিং-এর নাম গন্ধ নেই। তার বদলে লেখা আছে—অ্যানাদরে ইয়ার অ্যারাউন্ড দ্য সান—টাইম টু হ্যাভ সাম রিয়েল ফান। বলতে চাইছে—অগলে বরস সূরজকে সাথ বড়ে মজে মে রহো! নকল হাত পা লাগানোর ডাক্তার আর দাঁতের ডাক্তাররাও অনেকে ক্রিসমাসে স্পেশাল কার্ডের অর্ডার দেন। রোগী, সহকর্মী আর আত্মীয়, বন্ধুরাই টার্গেট অবশ্য। দাঁতের ডাক্তারের কার্ডে নববর্ষের শুভকামনা সহ অট্টহাসির বিকাশ। অর্থোটিস্ট আর প্রসথেটিস্টদের অর্ডারি কার্ডগুলো তৈরি করে ইলিনয় স্টেটের এক আর্টিস্ট। কোথাও আঁকা হয়েছে—স্যান্টাক্লজের কারখানায় কাঠের হাত, পা, উপহারের বাক্সে ভরা হচ্ছে। কোনও কার্ডে আঁকা আছে বামনরা নকল হাঁটুতে স্ক্রু আঁটছে। এরকম কার্ডও বছরে ত্রিশ হাজার মতো বিক্রি হয়। শুভেচ্ছা, ব্যবসা এবং রসিকতার খাতিরেই অবশ্য।

এদেশে ক্রিসমাস কার্ডের মধ্যে সব থেকে বেশি বিক্রি হয় ধর্মের বাণী লেখা সচিত্র কার্ড। ইদানীং স্যান্টাক্লজ আর রেইন ডিয়ারের ছবিওলা কার্ডের চাহিদা একটু কমে গেছে। গত দশ বছর ধরে লাল টুকটুকে পাতাওলা পয়েনসেটাস গাছের ছবি দেওয়া কার্ড খুব চলছে। কিন্তু এ বছর মন্দা দশা। পাখির ছবিসুদ্ধু কার্ডের খুব রমরমা এ বছর।

পারিবারিক ছবি দেওয়া ক্রিসমাস কার্ডের ঝোঁক ইদানীং কমেছে। আগে আগে বাঙালিরাও সুখী গৃহকোণের ছবিসুদ্ধু নিউ ইয়ার্স কার্ড অনেককেই পাঠাতেন। পেছনে ফায়ার প্লেস, পাশে ক্রিসমাস ট্রি, এক কোণে পয়েনসেটাস লাল, সবুজ পাতা ছড়িয়ে ঘর আলো করে আছে। ছেলের গায়ে ঘন সবুজ সোয়েটার। মেয়ের পরনে লাল স্কার্ট। মা সবুজ শাড়ি। বাবা ইট রঙের ভি নেক সোয়েটার। চারটি হাসি মুখের নীচে সোনালি রঙের ছাপানো গ্রিটিংস। তারও নীচে ছাপা নামাবলী—তপন, রূপালী, জয় অ্যান্ড পিংকি। এরকম অনেক কার্ড অ্যালবামে রেখে দিয়েছি। স্মৃতিটুকু থাক।

সাধারণত অল্প বয়সের স্বামী, স্ত্রীরাই ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার্স কার্ডে নিজেদের পারিবারিক ছবি ছাপাতে ভালবাসেন। বয়সের সৌন্দর্য, আনন্দ, উচ্ছ্বাস নিয়ে সে ছবি ভারী প্রাণবন্ত হয়। কিন্তু একটু বয়স বাড়লেই ওই সব ইচ্ছে টিচ্ছে কমে যায়। তখন হয়তো শুধু ছেলে-মেয়েদের ছবি তুলে ক্রিসমাস কার্ড পাঠাতে চান। ছেলে-মেয়েরাও আবার ওই বয়সে ছবি তোলাতুলি পছন্দ করে না। কার্ডে ছবি ছাপাতে প্রবল আপত্তি জানায়। এ জন্যে টিনএজার ছেলে-মেয়ে নিয়ে সপরিবারে ক্রিসমাস কার্ডের জন্যে ছবি তোলার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

তবে কিছু কিছু আমেরিকান আছে, নাছোড়বান্দা। মেরে ধরে বাড়ির সবাইকে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলায়। এক ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ আর তাঁর ঊনআশি বছরের গিন্নি গত চুয়াল্লিশ বছর ধরে শাখা প্রশাখা পরিবৃত হয়ে ক্রিসমাস কার্ডের জন্যে ছবি তুলিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের ভাগ্নে তাসের প্যাকেটের মতো করে চুয়াল্লিশ খানা ছবি রাবার ব্যান্ডে আটকে রেখেছে। মায়া করে ফেলতে পারে না। ছবিতে কুচো কুচো বাচ্চারা এর তার কোলে বসে আছে। বুড়ো মামা মামির তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মদের কুচিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যায় না। অতএব বছর বছর ছবি জমছে। তবে গতবছর অন্যরকম কার্ড এসেছে। বুড়ো বুড়ি

ইতালি বেড়াতে গিয়েছিলেন। পিসার লিনিং টাওয়ারের সামনে হাত ধরাধরি করে ছবি তুলিয়ে ক্রিসমাস কার্ড করেছেন। তলায় ক্যাপশন দেওয়া—হেলেপড়া পুরনো তিনজন! ভাগ্নে এ কার্ড-খানাও যত্নে তুলে রেখেছে।

ক্রিসমাস কার্ড পাঠানোরও কতরকম তরিকা। একদল ঝটপট কার্ড কেনে। পটাপট নাম সই করে। যে কোনও ছবিওলা স্ট্যাম্প সেঁটে ডাক বাক্সে ফেলে দেয়। আবার কেউ কেউ ভেতরে দু'কলম লিখতে ভালবাসে। হাতে সময় থাকলে এরকম আন্তরিক সংযোগ বজায় রাখা সম্ভব। কেউ স্ট্যাম্প নির্বাচনের ওপরেও গুরুত্ব দেয়। যেমন ওই লম্বা পুলিস খুদে খুদে দেবদূতদের চাইছিল। অনেকে মানবিক কারণে বিশেষ ধরনের স্ট্যাম্প দিয়ে ক্রিসমাস কার্ড পাঠায়। এইডস সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইডস অ্যাওয়ারনেস লেখা ও রিবন আঁকা পোস্টাল স্ট্যাম্প কেনে।

খুব খরচ করে দামি কার্ড অর্ডার দেন অনেকে। যে কার্ডে নামসই করারও দরকার পড়ে না। তাঁদের সই এমবস করা থাকে। ভেতরের লেখাও তাঁদের পছন্দ মতো ছাপা হয়। এ ধরনের কার্ডের আভিজাত্য আছে বটে, কিন্তু সৌজন্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, সরাসরি এই কার্ড পাঠানোর মধ্যে অহংকার আর আন্তরিকতাবোধের অভাবও ধরা পড়তে পারে। সেজন্যে ওই কার্ডেই কলমের এক আঁচড়ে নাম সই করে দেওয়া ভাল। আভিজাত্য, আন্তরিকতা—দুইই বোঝানো হল।

ক্রিসমাস লেটার নামে মহাভারতও পাই মাঝে মাঝে। বাঙালিদের মধ্যে এক আধজনের কাছ থেকেও। সেই চিঠি হচ্ছে তাঁদের সারা বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ক্রিসমাস কার্ডের সঙ্গে ছাপা চিঠি। অনেক খবর পাওয়া যায়। যে ছেলেটিকে তিন বছরের দেখেছিলাম, সে এখন কর্নেল্ ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ায়, তার দিদি আছে প্যারিসে, দিদির মেয়ে যেন ফুটফুটে পরী।... এই সব খবরের সঙ্গে অন্যান্য কথাও থাকে। তবে কখনও কখনও কেউ এত ফলাও করে নিজেদের সৌভাগ্যের বিবরণ দেয়, যেন বিজ্ঞাপনের মতো শোনায়। এ ক্ষেত্রে ছাপা চিঠির বিষয়বস্তু সামান্য বিবেচনার সঙ্গে লিখলে আর দু'কলম হাতের লেখা থাকলে ভারসাম্য রক্ষা হয়। সুখবর দেওয়া আর পারিবারিক প্রচারের মধ্যে যে তফাত, সেটি খেয়াল রাখা দরকার।

রবার্ট র‍্যামসে নামে এক ভদ্রলোক ভাল চিঠি লেখেন। গত চল্লিশ বছর ধরে ক্রিসমাস চিঠি লিখে লিখে বেশ ভারসাম্য রাখতে শিখেছেন। এর মধ্যে তিনবার শহর বদল করেছেন। প্রথম দিকের চিঠিতে লিখতেন—আমাদের ছোট মেয়ে হাঁটছে, সোফাতে আইসক্রিম মাখায়...। ...একটা কচ্ছপ পুষেছি...কচ্ছপটা পালিয়েছে...পুলিস একেবারে অপদার্থ...। এ বছর ডিজনিল্যান্ডে সুটকেস কিনতে হল—এত জিনিস কিনেছে বাচ্চারা...। ...এ বাড়িটা জঙ্গলের কাছাকাছি...দুটো র‍্যাকুন ট্রাপে ধরা পড়েছে...। এবছর একটা নেভি স্টেশন ওয়াগন কিনেছি।...এই চিঠির মাঝখানে আঙ্কল জনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মেইনে চলে গিয়েছিলাম।...ফিরে এসে লিখতে বসেছি...জীবন এক আশ্চর্য রহস্য! ...মৃত্যুও! ...আঙ্কল জন মারা যাবার আগের দিন অ্যান্ট বারবারাকে বলেছিলেন—প্রিপেয়ার্ড বাট নট রেডি।

এই সব লিখতে লিখতে কত বছর কেটে গেছে। রবার্ট র‍্যামসে বরাবর ভেবেছেন ক্রিসমাসের চিঠি যেন উপভোগ্য হয়। চেষ্টা করেছেন চিঠি যেন পারিবারিক কৃতিত্বের

প্রচার কাহিনী না হয়। ছেলে মেয়ে যখন ছোট ছিল, সে ইচ্ছে বজায় রাখতে পেরেছেন। কিন্তু কালে কালে তারা সব এমন দিকপাল হয়ে উঠল যে বার্ষিক চিঠিতে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গেলেও সাফল্যের কথা এসে যায়। ছেলে ডাগলাস হচ্ছে ডেন্‌টিস্ট এম. ভি, পি. এইচ. ডি., রিসার্চ সায়েন্টিস্ট। '৮৬ সালে তাকে দু'বার টেলিভিশনে ইন্টারভিউ করেছিল। ওই বছরেই হল্যান্ডে নাইট্রাস অক্সাইড নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে এল। সুতরাং '৮৬-র ক্রিসমাসের চিঠিতে ডাগলাসের খবর তো লিখতেই হল তার বাবাকে। মেয়েও বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর। ইউ. এস. এ. টুডে পত্রিকায় তার কথা ছাপা হয়েছে। একটি হাওয়াইয়ান পত্রিকার মলাটে মেয়ের ছবি বেরিয়েছে। শিল্পীকে নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী। সুতরাং রবার্ট র‍্যামসেকে ক্রিসমাসের চিঠিতে মেয়ের খবরও একটু লিখতে হয়েছে সে বছর। তেমনি মুশকিল করেছে জামাই। সেও নাম করে ফেলেছে। একাধারে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, লেখক এবং অধ্যাপক। নিউজ উইক পত্রিকার মলাটে তার জ্ঞানগর্ভ বাণীর কিয়দংশ ছাপা হয়েছিল। এই সব কারণে "চাল মারব না" ভেবেও রবার্ট র‍্যামসেকে ক্রিসমাসের চিঠিতে ছেলে, মেয়ে, জামাই-এর কথা একটু ছুঁয়ে যেতে হচ্ছে। এরপর আছে করপোরেট কার্ড পাঠানোর রীতি। "প্রুডেন্ট পাবলিশিং কোম্পানি" শুধু অফিসের জন্যেই কার্ড ছাপায়। এরকম আরও এগারোটি কোম্পানি আছে। সারা আমেরিকার বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কেনে এবং পাঠায়। নিজেদের কর্মিদের এবং বাইরের সংস্থার জন্যে এক ধরনের কার্ড ছাপা হয়। এছাড়া যাঁরা উচ্চপদে আছেন, তাঁরাও কোম্পানি থেকে কয়েক বাক্স কার্ড পান। তাঁদের নাম সই করা কার্ড কোম্পানির খরচে ছাপা হয়। তাঁরা বিলি করেন। তবে কোনও করপোরেট কার্ডে ক্রিসমাস কথাটি ব্যবহার হয় না। কারণ একই অফিসে ইহুদি, মুসলমান, হিন্দু কর্মী আছেন। নিরীশ্বরবাদী আছেন। অফিসের সকলের কথা বিবেচনা করে, বাইরের ক্লায়েন্টদের ধর্ম বিশ্বাসের কথা চিন্তা করে, কোম্পানিগুলি এই ধরনের কার্ড ছাপায়—ডিউরিং দ্য হলিডে সিজন মোর দ্যান এভ্যার, আওয়ার থটস টার্ন গ্রেটফুলি টু দোজ হু হ্যাভ মেড আওয়ার প্রগ্রেস পসিবল। অ্যান্ড ইন দিস স্পিরিট উই সে, সিম্পলি বাট সিনসিয়ারলি থ্যাংক ইউ অ্যান্ড বেস্ট উইশেস ফর দ্য হলিডে সিজন অ্যান্ড এ হ্যাপি নিউ ইয়ার।

আমিও ধন্যবাদ জানাই, ধৈর্য ধরে চিঠি পড়েন অনুমান করে নিয়ে। আপনাদের নতুন বছরের শুভেচ্ছার সঙ্গে ছোট্ট দেবদূতের ছবিই পাঠালাম। পুলিসের সঙ্গে এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়নি। শুভ নববর্ষ।

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৫

প্রবাসে রবীন্দ্রচর্চা

প্রবাসী বাঙালি যেখানেই থাকুন, দেশাচার, লোকাচার তথা কালচারের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠার তাগিদে কিছু অলিখিত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নেন। একই কারণে আমেরিকাতেও গড়ে উঠেছে অসংখ্য গোষ্ঠী। চলছে বারো মাসে তেরো পার্বণ। সারা বছরের লাগাতার অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে যে যার পছন্দমত দিনগুলি চিহ্নিত করে রাখছেন। সকলেই যে সব জায়গায় যাচ্ছেন, এমন নয়। তবে যে কোনও উৎসবে অন্তত শ' তিনেক বাঙালি দর্শক জোগাড় করা যাচ্ছে অনায়াসে।

গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমরা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনা নিয়ে বহু অনুষ্ঠান করে চলেছি। ১৯৮৬ সালে নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে 'টেগোর সোসাইটি' আর 'বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ' যৌথভাবে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণে আমরা নিউ জার্সি থেকে দলবল নিয়ে নদী পার হয়ে 'বাল্মীকি প্রতিভা' করতে গিয়েছিলাম। আমাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে ইংরেজি রচনা লেখার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পুরস্কার এবং মানপত্র নিয়ে ঘরে ফিরেছিল। কেউ কেউ সেমিনারে স্বরচিত প্রবন্ধ পড়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন কয়েকজন। এখানে মুষ্টিমেয় যে কজনের কাছে রবীন্দ্র রচনাবলী আছে তাঁরা বাড়ি এসে 'কোটেশন টুকে নাও' গোছের ফরমান জারি করে বইগুলিকে অতি ব্যবহারের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন। যাই হোক, প্রধাসে রবীন্দ্রচর্চার সম্ভবত সেই সময়ে হল যথার্থ সূত্রপাত। আমেরিকার নানা স্টেট থেকে বাঙালি এবং অবাঙালি গোষ্ঠী এসেছিল নিজেদের উপস্থাপনা নিয়ে। শনি এবং রবিবার সকাল থেকে প্রায় মধ্য রাত পর্যন্ত চলেছিল দীর্ঘ অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে অভিবাসী বাঙালির উৎসাহ উদ্দীপনার আরও উদাহরণ জমা হতে থাকল মাঝে ক' বছরে। দ্বিতীয় প্রজন্মকেও প্রভাবিত করা দরকার। একটি প্রতিযোগিতায় বসে শুনলাম সাত বছরের মেয়ে হারমোনিয়ামের আড়ালে ঢাকা পড়ে বিচারকদের মুখের দিকে উঁকি মেরে গাইছে 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা'। সে কাজ সেরেই বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমরা চা সিঙাড়া খেয়ে দিনভর বসে বসে অগুন্তি কচি কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি শুনে শুনে খাতায় নম্বর দিয়েছিলাম।

এরপর '৮৮-র শীতের সন্ধ্যায় আমাদের ডেকে পাঠালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বনানী ঘোষ। নিজে নিউ ইয়র্ক স্টেটে থাকেন। প্রতিমাসে তাঁর গানের স্কুল 'অন্তরা'য় রবীন্দ্র সঙ্গীত ও অন্যান্য গান শেখাতে নিউ জার্সিতে আসেন। বনানী ঘোষ প্রস্তাব দিলেন '৮৯ সালের মে মাসে নিউ জার্সিতে 'রবীন্দ্রমেলা' করা সম্ভব কি না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী আরও কয়েকজন।

রবীন্দ্রমেলা আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উত্তর আমেরিকায় রবীন্দ্রচর্চার প্রচার ও প্রসার। রবীন্দ্র প্রতিভার নব মূল্যায়ন এবং ইংরেজি ভাষাভাষী দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে তাঁর

ভাবমূর্তিটি তুলে ধরার প্রয়াস। সেই সূত্রে সাহিত্য মনস্ক এবং সংস্কৃতি সচেতন কিছু আমেরিকান পাঠকের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবনদর্শনের যথাসাধ্য পরিচয় ঘটনোর তাগিদও অনুভব করছিলেন এঁরা। যদিও মাত্র দু'দিনের অনুষ্ঠানের সময়সীমার মধ্যে কাজটি নিঃসন্দেহে ছিল দুরূহ।

নিউ জার্সিতে 'রবীন্দ্রমেলা' হল—এ বার্তা রটে গেল প্রায় রাতারাতি। উৎসব তো শুধু নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ জন্যে আমেরিকার অন্যান্য স্টেটে বাঙালি সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হল। সাংস্কতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী ইত্যাদি নানা বিভাগে যোগ দেবার জন্য বেশ সাড়া পড়ে গেল।

কলকাতা এবং বাংলাদেশ এবং গুণিজন না এলে উৎসবের মান হানি হতে পারে। তাছাড়া টিকিট বিক্রি হওয়া দরকার। ইদানীং স্থানীয় মানুষজন সম্ভবত স্থানীয় শিল্পীদের অবিরাম প্রতিভার ভার আর নিতে পারছে না। তাই পাঁচ ডলারের টিকিট কাটতে গিয়েও জেরা করেন, 'দেশ থেকে কেউ আসছেন তো? নাকি আবার তোমাদের নাচ, গান শোনাবে?' আমরা সেজন্যে রবীন্দ্রমেলার প্রচার তালিকায় বড় বড় অক্ষরে ঘোষণা করে দিলাম—গানে সনজিদা খাতুন (ঢাকা), শ্রুতি নাটকে পার্থ ও গৌরী ঘোষ (কলকাতা), কথিকা ঃ অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরি, প্রফেসর উইলিয়াম র‍্যাডিচে (অক্সফোর্ড) ও আরও অনেকে...

যে কোনও বড় উৎসবে নেতৃত্বে দেবার জন্যে অনেকেরই আগ্রহ থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রমেলায় তো যে সে লোককে নেতৃত্ব করার ভার দেওয়া যায় না। এ দেশে সে অর্থে বনানী ঘোষ আছেন। শান্তিনিকেতনে এবং রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলে যাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে। এখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করছেন আমেরিকা ও কানাডার কিছু শহরে। তাই তাঁকেই আমাদের সভানেত্রী করা হল। এ ছাড়া যার যেমন অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ পরিচালনায়, স্মারক পুস্তিকা প্রকাশনায়, প্রদর্শনী বিভাগে, মঞ্চসজ্জা ও অলংকরণে, অতিথি অভ্যর্থনায়, শব্দ যন্ত্র ও আলোক সম্পাতের কাজে, আয় ব্যয়ের হিসেব রাখতে, প্রচার বিভাগে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাপনায়—সেই ভাবে নানা জনকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ছাড়াও দ্বিতীয় প্রজন্মের কয়েকজন দায়িত্ব নিল তারা উৎসব চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর দর্শকদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

চারদিকে সাজসাজ রব শুরু হয়েছে। জানুয়ারিতে কলকাতায় গিয়ে এক কানাডাবাসিনীর কাছে খবর পেলাম কানাডার গাইয়ের দল নাকি জোর রিহার্সাল চালাচ্ছে। ফিরে এসে আমাদের 'কল্লোল' ক্লাবকে গঞ্জনা দিলাম তখনও হাত গুটিয়ে বসে আছে দেখে। তারা নিমেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু করে দিল 'ভানু সিংহের পদাবলী'র মিটিং। প্রস্তাব পাশ হবার পর প্রতি রবিবার এক এক বাড়ি থেকে খোল খঞ্জনি সহযোগে ভেসে আসতে লাগল 'সজনী সজনী রাধিকা লো দেখ অবহু চাহিয়া'।

সে সময় অন্যান্য স্টেটে কিরকম প্রস্তুতি চলছে টের না পেলেও আমাদের সারা নিউ জার্সি জুড়ে যে বাঙালির ঘরে ঘরে সংস্কৃতির ঢল নেমেছে তা নিয়মিত অনুভব করা যাচ্ছিল। কেউ কেউ আবার সপরিবারে নানা দলে ভিড়ে গেছেন। বাবা তবলা ও খোল বাজাচ্ছেন।

তিনটি ক্লাবের সঙ্গে। মা গ্রন্থনা, গান ও তানপুরা বাজানোর উৎসাহে চার জায়গায় নাম দিয়ে বসেছেন। বাচ্চাগুলো এন্তার ঢুকে গেছে নানা নাচের দলে। ফলে প্রতি উইক এন্ডে ভোর বেলায় দুধ পাউরুটি খেয়ে এদের সাংস্কৃতিক অভিযান শুরু হচ্ছে। গাড়ির পেছনে গীতবিতান, সঞ্চয়িতা, গানের ক্যাসেট, গ্রন্থনার মোটা খাতা, নাচের মন্দিরা, বর্ষা ও বসন্তের শাড়ির নমুনা এবং নাচের দিদিমণির ইংরেজিতে বোল লেখা জেরক্স করা পৃষ্ঠা। গাড়িতে ক্যাসেট বাজিয়ে গান তোলা হচ্ছে। পেছনের সিটে বসে ছোট মেয়ে মন দিয়ে হাতে হরিণের মুদ্রা প্র্যাকটিস করছে। ভোজনং যত্রতত্র। রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে যার যেখানে যেমন বরাদ্দ, তার সেখানে তেমন জুটছে। তুচ্ছ খাওয়া দাওয়া নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাচ্ছে না। অসম্ভব নিষ্ঠাভরে নাচ, গ্রন্থনা, অভিনয় চলেছে যাতে রবীন্দ্রমেলার অনুষ্ঠানে মান বজায় থাকে। বেশ একটা ঘোর লেগেছে। ভুলে যাওয়া গান, হারিয়ে যাওয়া উদ্ধৃতি মুখে মুখে ফিরছে।

এতসব ভাল লাগা, উন্মাদনার মাঝেও যে ছন্দপতন ঘটছিল না এমন নয়। ব্যক্তিত্বের সংঘাত থেকে একটি দুটি পদত্যাগ পত্র জমা পড়েছিল কমিটির কাছে। তবে সমবেত উদ্দীপনার জোয়ারে এ সব সাময়িক ক্ষোভ এসে ভেসে গিয়েছিল। পাঁচ মাস ধরে চলেছিল প্রস্তুতি। প্রায় প্রায়ই মিটিং। যে যার নিজের ভাবনা চিন্তা প্রয়োগ করতে উন্মুখ। রবীন্দ্র মেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐতিহ্য প্রাধান্য পাবে, নাকি অভিনবত্ব? এ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। মঞ্চ সাজানোর দায়িত্ব যাঁর, তিনি নিজে অসমের মেয়ে। তাঁকে বলা হয়েছে মঞ্চে বীরভূমের খোয়াই থাকবে পটভূমি হিসেবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে তিনি বিশেষ কুণ্ঠিত। এই কুণ্ঠা এবং উৎকণ্ঠা ছিল আমাদের অনেকেরই। কে জানত অভিবাসী সমাজে কৃষ্টির প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথকে পরিচয় করানোর অসমসাহসিকতা ও গুরুভার নিয়ে আমাদের জ্ঞানের দৈন্য এমনভাবে প্রকট হয়ে উঠবে? তবু গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজো হবে—এই আশা ভরসা নিয়ে আমরা নিজেদের নিজের দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করতে লাগলাম। কোথাও কোথাও রবীন্দ্রচর্চার অভ্যাস এমন প্রবণতায় এসে পৌঁছল যে ধাঁধার আসর বসে গেল। কেউ কেউ কোথা থেকে কী সব জোগাড় করতে লাগলেন। কবে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে কী লিখেছিলেন, আমেরিকার কোন হোটেলে খেয়েছিলেন, কোন ঘটনা থেকে কী গান লিখেছিলেন—এ সব নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের খেলা চলতে লাগল। রবীন্দ্রমেলার আসন্ন মুহূর্তে এঁদের জ্ঞানের পরিধি প্রতিদিন এমনভাবে বেড়ে যেতে লাগল যে আমরা সাধারণ মানুষেরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু এই সুবাদে কিছু রত্নাকর ক্রমশ বাল্মীকি হতে চলেছেন ভেবে রবীন্দ্রমেলার পরোক্ষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি নিয়ে আমাদের একটু আত্মপ্রসাদও যে হয়নি তা নয়।

সে বছর মে মাসের শেষে নির্ধারিত সময়েই রবীন্দ্রমেলা হয়েছিল। নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা ছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়া, কানাডার টোরেন্টো ও অন্যান্য শহর থেকে বহু লোক এসেছিলেন। বিশিষ্ট শিল্পী ও অধ্যাপকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সনজিদা খাতুন অমিতাভ চৌধুরি, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও অমিতাভ ঘোষ। মেলায় বেশ অনেকখানি সময় নির্ধারিত ছিল রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের কথিকা পাঠ, আলোচনা এবং ওয়ার্কশপের জন্যে। রবীন্দ্র চিন্তার মহামানবের সংজ্ঞা, রবীন্দ্রনাথের জীবনে কয়েকজন নারীর ভূমিকা, রবীন্দ্র

কাব্য নাটক উপন্যাস চিত্রকলা বহির্বিশ্বে তাঁর মূল ভাবনার প্রতিফলন গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে ও পারস্পরিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমন্ত্রিত বক্তারা বিশদ আলোচনা করেছিলেন। ওয়ার্কশপে কানাডার অধ্যাপক ও কর্নেল। রবীন্দ্র অনুরাগী সাংবাদিক ফ্রেড ডেভিস, কানাডার রবীন্দ্র অধ্যাপক কল্যাণ কুমার সরকার, ডঃ প্রশান্ত বসু ইত্যাদি কয়েকজন উত্তর আমেরিকায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ান। রবীন্দ্র রিসার্চ সেন্টার গড়ে তোলা, রবীন্দ্র রচনার নিয়মিত অনুবাদ, ভারত ও বাংলাদেশ থেকে রবীন্দ্র অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রমেলার সন্ধ্যায় ছিল আমেরিকান দর্শকদের জন্যে ইংরেজি মাধ্যমের অনুষ্ঠান। স্থানীয় স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা নিজেদের লেখা গ্রন্থনার সঙ্গে নাচে গানে অংশগ্রহণ করে। স্লাইড শো দেখিয়ে মঞ্চস্থ করল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কিছু নির্বাচিত অংশ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম র‍্যাডিচের অনুবাদ করা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে ছিল নাচের অনুষ্ঠান—'পোয়েট্রি ইন মোরাল'। এ সময় রবীন্দ্র বিষয়ক বক্তৃতাগুলি ও ইংরেজি মাধ্যমেই রাখা হয়েছিল।

রবীন্দ্রমেলার প্রদর্শনী বিভাগটিতে ছিল সুচিন্তিত পরিকল্পনার যথাসাধ্য রূপায়ণ। স্বল্প পরিসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক জীবন, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাপঞ্জীর উল্লেখ। সমগ্র রচনা সম্ভারের পরিচয়, পারিবারিক ছবি, বিভিন্ন পুরস্কার ও মানপত্রের প্রতিলিপি, রচনার পরিবেশ তথা ভৌগোলিক স্থান নির্দেশ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কুটির শিল্পের কিছু নিদর্শন, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রতিলিপি ইত্যাদি সাজিয়ে বিভাগটি একই সঙ্গে দৃষ্টিনন্দন এবং তথ্যভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। আমেরিকান দর্শকরা প্রদর্শনীর ঘরে দীর্ঘ সময় দিয়েছেন।

সে সময় উপস্থিত সকলেই দুদিন ধরে বেশ একটি রবীন্দ্র পরিবেশের প্রভাব অনুভব করেছিলেন। বাংলাদেশী এবং পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট শিল্পী এবং অধ্যাপকদের পাশাপাশি আমেরিকা, কানাডার স্থানীয় শিল্পী, অধ্যাপক, বক্তা, শ্রোতা সকলেই যেন রবীন্দ্র ভাবনার শরিক হয়ে উঠেছিলেন।

রবীন্দ্রমেলার পর অনেকদিন কেটে গেছে। উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিক অর্থে সফল হয়ে থাকলেও এ মুহূর্তে তার কোনও প্রয়োগ আছে কিনা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে কি সবই ছিল সামরিক উচ্ছ্বাস? রবীন্দ্রমেলার বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার তাৎপর্য আমাদের অভিবাসী সমাজে যথার্থভাবে অনুভূত হবে কি না, আমেরিকার বাঙালিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে রবীন্দ্রভবন গড়ে উঠবে কি না অথবা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ানো হবে কি না—এখনও সবই আছে অনুমানের স্তরে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এদেশে আগ্রহ কত খানি? আমরা রবীন্দ্রনাথকে বৃহত্তর গণ্ডীতে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা নেব, তাঁর সৃষ্টির গভীরে সমবেতভাবে অবগাহনের জন্য অন্য দেশ, অন্য ভাষার মানুষকে আমন্ত্রণ জানাব, উত্তরসূরিকে রবীন্দ্ররচনার যৎসামান্য অনুবাদের প্রসাদ কণিকামাত্রও ধরে দেব—এ আকাঙ্ক্ষা যদি সমষ্টির অনুভব বলে স্বীকৃত হয়, তবেই হয়তো কোনদিন প্রবাসে রবীন্দ্রচর্চার প্রকৃত সার্থকতা আসবে। আর যদি অনুকূল বায়ুর

অভাবে সে অনুভবের অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে আসে, তবে আরও কয়েক বছর হয়তো টিকে থাকবে বাৎসরিক রবীন্দ্রজয়ন্তী নামে বিচিত্রানুষ্ঠান।

তারপর? আমরা কি কোনও কিশোর কিশোরীর হাতে প্রবাসী সাংস্কৃতিক ছোট্ট পতাকাটি তুলে দিয়ে বলে যেতে পারব—তোমার হল শুরু, আমরা হলাম সারা। রবীন্দ্রমেলায় আমন্ত্রিত আমেরিকান সাংবাদিক ফ্রেড ডেভিস বলেছিলেন, তাঁর বর্তমানের অবসর জীবন কাটে একটি হাসপাতালে অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রীর সাহচর্য দেবার কাজে। বেদনা ও মৃত্যু প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ফ্রেড যে গভীর সান্ত্বনা এবং উপলব্ধির কথা পড়েছেন, তারই ব্যাখ্যা থেকে রোগীদের বিষণ্ণতা দূর করতে চেষ্টা করেন। বলেছেন—এক একটি গান যেন থেরাপির মতো মনে হয়, আমার।

সেই প্রসঙ্গে ভাবি, প্রবাসে বাঙালির সেই পতাকাটির ভার নিতে যদি উত্তরাধিকারী নাই আসে, তখনও কি থাকবে না রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিণত বয়সের জীবন বোধে! হয়তো নাচ, গান, নাটক, সেমিনার নিয়ে ব্যস্ততার দিনগুলি শেষ হয়ে যাবে। ঘরে ঘরে আর সমবেত গানের সুর শোনা যাবে না। কিন্তু এক সময়ে শুরুতে গান শেখার আনন্দে, নাটক করার উৎসাহে, প্রবন্ধ লেখার তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে প্রয়োজন মতো নির্বাচন করেছিল, তাদেরই 'সারার' পর্বে রবীন্দ্রনাথের বইগুলি হয়ে উঠবে অবসরের সঙ্গী। দেশান্তরী সেই সব মানুষের নিঃসঙ্গ, নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রতিধ্বনিত হবে সেই গান—জীবন মরণে নিখিল ভুবনে, যখনি যেখানে লবে, চিরজীবনের পরিচিত ওহে, তুমিই চিনাবে সবে...।

৪ মে ১৯৯১

সাদা ছবি, কালো ছবি

কেশ পাকিলে কান্নার দাওয়াই হিসেবে হেয়ার ডাই আজকাল ঘরে ঘরে তেল সাবানের মতো ব্যবহার হচ্ছে। চুল খোলতাই যে কালো রঙের জন্যেই—এ ধারণাকে আমরা এখনও অতিক্রম করে উঠতে পারিনি। কালোর মধ্যে আলো আবিষ্কার নিয়ে প্রাচীন পদকর্তারা তো বটেই, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাটকে কত তত্ত্ব রেখে গেলেন। অথচ ব্যবহারিক জগতে কালোর সমাদর নিয়ে ধন্দ ঘুচল না।

আমেরিকায় 'এবনি অ্যান্ড আইভরি' গানে যে বলা হল হল পিয়ানোর সাদা কালো দুটি রিড নিয়েই সুর বেজে ওঠে, অর্থাৎ আবলুশ কাঠ আর হাতির দাঁত পাশাপাশি যদি পিয়ানোতে মিলে মিশে বাজে, তবে মানুষ কেন পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি—প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ কোথায়? আমেরিকায় সিভিল রাইট্‌স্ আন্দোলনের পর দু'যুগ কেটে গেল। অথচ এখনও বিজ্ঞাপনের ছবিতে মডেল হিসেব শুভ্রার দল প্রথম সারিতে। কৃষ্ণাদের খুঁজে পেতে বার করতে হয়।

এদেশে মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়। সারা আমেরিকার পাঠক সমাজের মধ্যে ১১ ভাগেরও বেশি হল কালো সমাজ। মার্কিন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ছবিতে মাত্র ৪-৫ ভাগ কালো মডেলদের সুযোগ দেওয়া হয়। সারা বছর যত রকম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ কালোদের ছবি ছাপা হয়। বাকি সাতানব্বই ভাগ ছবিতেই সাদা মানুষের মুখ অথবা দেহ সৌন্দর্য। এই তথ্য অনুমান নির্ভর নয়। নিউ ইয়র্ক শহরের "কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট"-এর একটি সমীক্ষা সূত্রে পাওয়া। সম্প্রতি এই বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং নামী পত্রপত্রিকাগুলিকে এ ব্যাপারে সচেতন করার চেষ্টা চলেছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে আমেরিকার বড় বড় পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ছবিতে কালোদের আরও বেশি সংখ্যায় উপস্থিত করা দরকার। তাদের ভূমিকারও কিছু পরিবর্তন দেখানো উচিত।

দেখা গেছে টাইম ম্যাগাজিন, এনকোয়ার, ভোগ ইত্যাদি নামকরা পত্রিকাগুলিতে গত কুড়ি বছরে কালোদের ছবির বিজ্ঞাপন রীতিমত কমে গেছে। তাছাড়া এগুলি ছাড়াও অন্যান্য ধরনের পত্রিকাতেও কালো মডেলদের নিয়ে কতগুলি গতানুগতিক বিজ্ঞাপন চলে আসছে। শুধুমাত্র খেলোয়াড়, নয় গাইয়ে বাজিয়ে, নয়তো করুণার পাত্র হিসেবে কোনও চ্যারিটি সংস্থার বিজ্ঞাপনে তাদের মুখ দেখানো হচ্ছে। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স বিভাগের মতে—কালোদের জন্যে এই বাঁধাধরা ভূমিকা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। এতে তাদের ঠিকমত উপস্থাপন করা হয় না। বিজ্ঞাপন মারফৎ জনসাধারণকে বোঝানো যে মাত্র সীমিত ভূমিকাতেই কালোদের জগৎ থেমে আছে এবং মডেল হিসেবেও সাদার প্রাধান্য মানে তারাই বর্ণ শ্রেষ্ঠ—এরকম প্রচার বন্ধ করা দরকার। সেজন্যে এই কমিটি সারা দেশের পত্রিকা প্রকাশক সংস্থাগুলিকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠাচ্ছে—বিজ্ঞাপনে কালো এবং অন্যান্য এথ্‌নিক গোষ্ঠীদের ছবি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় হতে হবে এবং তাদের ভাবমূর্তির মধ্যেও বৈচিত্র্য আনতে হবে।

বিজ্ঞাপনে কালোদের অনুপস্থিতির পেছনে মার্কেটিং বিশেষজ্ঞদের কিছু ভূমিকা আছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ প্রকাশকরা বলছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের সরাসরি কোনও দায়িত্ব নেই। পত্রিকার মালিক বা সম্পাদক বিজ্ঞাপন তৈরি করেন না। বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপন সরবরাহ করে। তারাই স্থির করে কী জিনিস বিজ্ঞাপনে যাবে, কাদের চোখে পড়বে অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্রেতা কারা এবং সেই বিচারে বিজ্ঞাপনের বিষয় এবং মডেল নির্বাচন করে। মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নামী এবং দামি পত্রিকার ক্রেতাদের অনুমান করতে চেষ্টা করেন। ফলে সেই সব ক্রেতার কথা মনে রেখে বিজ্ঞাপনের বিষয় ও মডেল সংগ্রহ করা হয়। প্রকাশক এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থার মুখপাত্ররা বলছেন, পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ওপর খবরদারি করার অধিকার কি সত্যিই কন্‌জিউমার অ্যাফেয়ার্স কমিটির আছে? এ প্রসঙ্গে কমিটির উত্তর—এই বিভাগের অবশ্যই দেখার এক্তিয়ার আছে যে বিজ্ঞাপন মারফৎ ক্রেতারা আহত হচ্ছেন কিনা।

নিউ ইয়র্ক শহরে কালো বাসিন্দার সংখ্যা কিছু কম নয়। আর এই শহরেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রধান অফিসগুলি জমিয়ে ব্যবসা করছে। নামকরা প্রকাশনা কেন্দ্রগুলিও নিউ ইয়র্কেই। সুতরাং নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের ভূমিকাটি অবশ্যই অবহেলা

করার বিষয় নয়। সুপার বাজারে সাপ্তাহিক খাদ্য বাবদ একটি কালো পরিবার সবথেকে বেশি খরচ করে। সুতরাং ক্রেতা হিসেবে বিজ্ঞাপনে তার ভূমিকাও নগন্য নয়। অথচ ক্রমাগত সাদা ক্রেতার ছবি দেখানোর ফলে সাদা, কালো—উভয় সমাজকেই বিভ্রান্ত করা হয়। কমিটি সম্প্রতি ১৭টি পত্রিকা দপ্তরে চিঠি দিয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে প্রকাশকরা পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপনের বিষয় এবং মডেল নিয়ে যেন নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখেন। তারপর এর পরিবর্তন সম্পর্কে নিজেরাই কিছু পরিকল্পনা স্থির করেন। বর্ণবিভেদমূলক বিজ্ঞাপনের পরিবর্তে আমেরিকার সকল সম্প্রদায়ের ছবি এবং সব রকম পেশাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষকে দেখানোর চেষ্টা করেন।

কিন্তু পত্রিকা দপ্তরের বক্তব্য—তাদের পক্ষে বিজ্ঞাপনী সংস্থার ওপর হুকুমজারি করা ঠিক নয়। একথা ঠিক যে, পাঠকদের যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা আছে। বিজ্ঞাপনের মারফৎ কী বলতে চাওয়া হচ্ছে, সেটিও তাঁরা ভালোমতোই বোঝেন। নতুন কিছু প্রচারের চেষ্টা হলে, সেই বক্তব্যও তাঁদের বোধগম্য হবে। আর বিষয়টি তো উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। পক্ষপাতিত্ববিহীন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটি তাঁদেরও মনোমত।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রকৃত লাভ হয় কার? বিক্রেতা কোম্পানির এবং তারপরে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলির। সুতরাং কমিটির উচিত তাঁদের কাছেই নির্দেশ পাঠানো। ক্রেতার মনোরঞ্জনের দায়িত্ব পত্রিকার নয়। এখানে পাঠক এবং কনজিউমারকে পৃথকভাবে দেখছেন পত্রিকার মালিকরা। অর্থাৎ টাইম ম্যাগাজিন হুইস্কি বিজ্ঞাপনে ক্রমাগত কালো মডেল দেখালে যদি কালোরা নিজেদের শুধু "মদো মাতাল" বলে রেগে গিয়ে ওই ব্র্যান্ডের হুইস্কি বয়কট করে, তো সে ক্ষতি হুইস্কি কোম্পানির। টাইম ম্যাগাজিনের তো নয়। সুতরাং এ কচকচির মধ্যে যাবে কেন? সাদা কালো মডেলের ব্যাপারটি মদ্য কোম্পানি বুঝবে। কন্‌জিউমার্স অ্যাফেয়ার্স্ কমিটি যদি একটি মাত্র প্রশ্ন তোলে যে—তোমরা বিজ্ঞাপন দেবার সময়ে আমেরিকার সব মানুষের কথা ভাবছ কি? তার উত্তর দেবার দায়িত্ব এবং বিজ্ঞাপন মারফৎ সব মানুষের কথা বিবেচনা করার দায়ও ব্যবসায়ী এবং বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারীদেরই থাকা উচিত।

নিউ ইয়র্ক, বাল্‌টিমোর, শিকাগো ইত্যাদি বড় বড় শহরের কালো প্রধান অঞ্চলগুলিতে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে বেশ প্রতিবাদ উঠেছে। শহরের বড় বড় বিজ্ঞাপন বিল বোর্ডে সিগারেট আর মদের বিজ্ঞাপনের ছবির ওপর তারা রং ঢেলে সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছে। কারণ দু'টি নেশার বস্তু নিয়েই মডেল হিসেবে দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছে কালো ছেলে মেয়ে।

গত জানুয়ারি মাসে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় অ্যাপিল কোর্ট থেকে চিঠি গেল। সেই বর্ণ বিদ্বেষের অভিযোগেই পত্রিকার নামে মামলা ঠুকে দিতে পারে "ফেডারেল ফেরার হাউসিং অ্যাক্ট।" কারণ লক্ষ করা যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার বিষয়, সম্পত্তি, বাড়ি কেনা বেচার বিজ্ঞাপনে শুধু সাদা ব্যবসায়ী বা এজেন্টদের প্রাধান্য থাকছে। সে তুলনায় কালো এজেন্সির নাম থাকছে না। ১৯৮৯ সালে পত্রিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগে মামলা এনেছিল আরও কজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট। তাঁদের অভিযোগ ছিল বিজ্ঞাপন মারফৎ বাড়ি কেনাবেচার ব্যাপারে কালো এজেন্টদের ঠিক মতো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা এই অভিযোগের উত্তরে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে

অ্যাপিল করেছে। 'সিন্‌সিলটি ইন্‌কোয়ারার' কাগজটিও এরকম ভাবে মামলায় জড়িয়ে গেছে। সেখানেও বর্ণবিভেদমূলক বিজ্ঞাপন প্রচারের অভিযোগ এসেছে।

বিজ্ঞাপনে কেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুখ বেশি দেখানো যায় না? সে সম্পর্কে বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞদের কিছু যুক্তি আছে। কারও মতে সাদাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতাই এর কারণ। ক্রেতা বা পাঠকের সংখ্যাও সেই অনুপাতে ধরে নিয়ে বিজ্ঞাপনের বস্তুটিকে তাদেরই জন্যে আকর্ষণযোগ্য করার চেষ্টা হয়ে থাকে। তখন ছোট কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে মডেল বেছে নিতে তারা দ্বিধাবোধ করে। এই প্রবণতা থেকে একটি দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হয় যাকে এক অর্থে সংকীর্ণতা বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কালো ক্রেতাদের দিকে লক্ষ রেখে নিউ ইয়র্কে যে বিজ্ঞাপন এজেন্সি আছে, তারা বলছে—বড় বড় পত্রিকাগুলি গ্রাহক হিসেবেও সাদাদেরই চায়। বিজ্ঞাপন দাতারাও একই চিন্তার শরিক। তারা বাজারে কী ধরনের ক্রেতা থাকা সম্ভব সে নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা নিজেরা কেমন ক্রেতা পছন্দ করে, তাদের অভিরুচি কী, সেই হিসেবেই বিজ্ঞাপন তৈরি করে। কী ক্রেতা তারা পেতে পারে সেই নিয়ে ভাবেই না। অথচ চায় জিনিস সর্বস্তরেই বিক্রি হোক।

তবে দূরদর্শনের ক্ষেত্রে কালোদের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের ছবিতে। স্ক্রিন্ অ্যাকট্‌রস্ গিল্ডের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে দূরদর্শনে যত বিজ্ঞাপন দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ৭.৫ ভাগ ছিল কালো অভিনেতা অভিনেত্রী। এই গিল্ডের সঙ্গে আছে আর একটি সংস্থা, যেটিও ইউনিয়নের দ্বারা সংঘবদ্ধ। নাম "আমেরিকান ফেডারেশন অফ্ টেলিভিশন অ্যান্ড রেডিও আর্টিস্টস্।" এদের সঙ্গে একটি শর্তে চুক্তিবদ্ধ আছে "আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিজ।" শর্তটি হল—দূরদর্শনের বিজ্ঞাপনে সংখ্যালঘু মডেল বা শিল্পীদের যথাসাধ্য সুযোগ দিতে হবে।

"আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ্ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি"র বক্তব্য—পত্র পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তার সীমা অনেক ব্যাপক। অর্থাৎ একটি মাত্র ছবি বহুবার করে থাকে। সুতরাং এই বিপুল পাঠক সমাজের কথা ভেবে তারা এমন একটি ছবি ছাপতে চায়, যা আমেরিকার বৃহত্তর সমাজকে চিহ্নিত করতে পারে। সেই অর্থে আবার সেই সাদা রঙের মডেলই সমাজের অধিকাংশ মানুষের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হয়। ক্রেতা হিসেবে ও অধিক সংখ্যক মানুষ যদি সাদা হয়, অবশ্যই সেই বিশেষ জিনিসটি তাদের কাছেই বেশি পরিমাণে বিক্রি হবে।

তবে কিছু কিছু বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞর ধারণা পত্রপত্রিকায় কালোরা বিজ্ঞাপনে অনুপস্থিত থাকছে বলে এখন আর অভিযোগ আনা যায় না। সত্তর দশকে এ প্রবণতা ছিল ঠিকই। মডেলিং-এ কালোদের তেমন সুযোগ ছিল না সে সময়। বিজ্ঞাপনেও পক্ষপাতিত্ব থাকত। কিন্তু আশির দশক থেকে দৃষ্টিভঙ্গি অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। ফলে ব্যবসাগত ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী লাভবান হয়েছেন। বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি ক্রেতাদের রুচি বলতে অনেক ধরনের মানুষের রুচির কথা বিবেচনা করছে। সম্ভবত কালো সমাজ সম্পর্কে সাদাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে—এরকমও এঁরা আশা করছেন।

বহুজাতিক দেশ হিসেবে আমেরিকার ইতিহাসটি যথেষ্ট বর্ণময়। আদর্শ মার্কিন পরিবারের ছবি হিসেবে শুধু সাদা পরিবারকেই দু'টি ছেলে মেয়ে ও একটি কুকুর সমেত

অভিজাত শহরতলির বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা ছবির মাধ্যমে চিহ্নিত করা চলে না। এদেশে হিস্‌প্যানিক জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এশিয়ান আমেরিকানের সংখ্যাও নিয়মিত হারে বাড়ছে। ক্রেতার বাজারে কালোদের ব্যয় করার ক্ষমতাও রীতিমত উল্লেখযোগ্য। এখন ব্যবসায়ী এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থার ক্ষেত্রে এই সমাজের মানুষদের ক্রেতা হিসেবে গণ্য করা দরকার। বিজ্ঞাপনে তাদের তুলে ধরা দরকার। বিশেষভাবে 'জ্ঞাপন'-এর দায়িত্ব নিয়ে এই বিশেষ মানুষদেরই কাছে পৌঁছনো চাই।

এজন্যে কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স কমিটি একেবারে কোমর বেঁধে নেমেছে। মোট ২৭টি নামকরা পত্রিকার গত তিন বছরের সমস্ত ইস্যু পরীক্ষা করে দেখেছে। বিজ্ঞাপনের সব ছবি খুঁটিয়ে দেখেছে। এক একটি পত্রিকার ৯টি ইস্যু ইচ্ছেমত বেছে নিয়েছে এই সমীক্ষার জন্যে। মোট এগারো হাজার, তিনশো একানব্বুই বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে একুশ হাজার ছ'শো সাতজনকে এই বিপুল সংখ্যক মডেলদের মধ্যে মাত্র ৬৭৪ জন কালো। অর্থাৎ মোট সংখ্যার মাত্র ৩.১৫ ভাগ। আমেরিকায় মোট এশিয়ান আছে তিন শতাংশ। তার মধ্যে এক শতাংশেরও কম জন বিজ্ঞাপনে মুখে দেখাতে পেরেছে। মোট মডেলের সংখ্যা ১৯৫। বাদবাকি দশ হাজার, সাতশো পঁচিশ জনই হচ্ছে সাদা মডেল।

এদেশে ডাকযোগে বাজারটি বেশ জনপ্রিয়। জলন্ধর সিটির মতো বশীকরণ রুমাল বা মাদুলির বন্দোবস্ত নেই বটে। তবে পোশাক আশাক, গয়নাগাটি থেকে শুরু করে বই-পত্র, খেলনা পুতুল, বাসন কোসন—বহু জিনিস ডাকে অর্ডার দিয়ে কিনে আনানো যায়। দেখা গেছে তার মধ্যে বিনে পয়সায় যেসব সুন্দর সুন্দর ক্যাটালগ্‌ বাড়িতে বাড়িতে পাঠানো হয়, তার মধ্যেও থাকে অধিকাংশ ছবি সাদাদেরই। ১৫৭ রকমের নমুনা বইতে মোট বাইশ হাজার ছশো পঁচাশি জন মডেল সেজে গুজে, বসে আছে। কালোরা মুখ অথবা শরীর দেখানোর সুযোগ পেয়েছে মাত্র ৪.৬ জন।

কিছু কিছু পত্রিকা আছে, যেখানে পাঠকদের সংখ্যা সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দাতাদের কোনও আন্দাজ নেই। "জি.কিউ" নামে একটি পত্রিকার এক চতুর্থাংশ হচ্ছে কালো পাঠক-পাঠিকা। অথচ তার বিজ্ঞাপনের ছবিগুলিতে মাত্র ২.৯ শতাংশ কালো মডেলদের দেখানো হয়। মেয়েদের নামকরা ফ্যাশন পত্রিকা "ভোগ"-এর কালো পাঠিকার সংখ্যা হচ্ছে ১৪.৬ শতাংশ। অথচ সেখানে কৃষ্ণা সুন্দরীদের ছবি থাকে মাত্র ১.৬ শতাংশ।

গত দশ বারো বছরের মধ্যে কিছু কিছু পত্রিকা আবার কালোদের ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপন বেশ কমিয়ে দিয়েছে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ এর মধ্যে টাইম ম্যাগাজিনের অন্তত ২৪টি সংখ্যা ঘেঁটে দেখা গেছে মাত্র ৭.৬ শতাংশ বিজ্ঞাপনে কালোদের দেখানো হয়েছে। অথচ ১৯৮০ সালে ওই টাইম ম্যাগাজিনেই ১১.৪ শতাংশ ছবিই ছিল কালো মডেলের বিজ্ঞাপন সমেত।

এ পর্যন্ত যত পত্রিকা ঘেঁটে দেখা হয়েছে তার মধ্যে আমেরিকার নামকরা সব পত্রিকাই আছে। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স কমিটি মোটামুটি নিউ ইয়র্ক শহরের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিকেই এ ব্যাপারে সচেতন হবার নির্দেশ দিচ্ছে।

একটি খেলনার কোম্পানি তাদের পুতুলের বিজ্ঞাপনে একই ধরনের পুতুল দুই রঙে তৈরি দেখায়। একবারে সদ্যোজাত শিশুর মতো দেখতে এক জোড়া পুতুলের ছবি থাকে।

একটি সাদা বা হালকা গোলাপি রঙের পুতুল, নীল চোখ, মাথায় চিকন লালচে রোঁয়ার মতো চুল। আর একটি কালো পুতুল। মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। ঘন কালো ভুরু, মোটা নাক ও পুরু পুরু ঠোঁট। ছবি দেখে যে যা পছন্দ তাই ডাক যোগে কিনছে মোটা ঘন কালো ভুরু, এবং কালো পরিবারের মেয়ে কালো পুতুল। এবং ভারতীয় পরিবার থেকে যা কেনাকাটি হচ্ছে, সেও ওই সাদা ছোট্ট পুতুল। এশিয়ান পুতুল যতদিন না তৈরি হচ্ছে; সাদা পুতুলই তো ঘরে ঘরে শোভা পাবে। কারণ? বাঙালির ভাষায় "কাল্লু"দের আফ্রিকায় থাকাই উচিত ছিল।

৩১ *আগস্ট* ১৯৯১

আমেরিকায় ভারত-উৎসব

ম্যাক্সমুলার বিশ্বাস করেছিলেন—যদি আমাকে সারা বিশ্বের মধ্যে এমন এক দেশের সন্ধান করতে হয়, যে দেশ প্রকৃতির দানে, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, তবে আমি ভারতকে চিহ্নিত করব। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, কোন আকাশের নীচে মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় এবং জীবনের বহু সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ পাওয়া যায়, তবে আমি ভারতকে চিহ্নিত করব। যদি আমার নিজেকেই প্রশ্ন করতে হয়—কোন দেশের সাহিত্যে আমরা সেই পরম সত্যের সন্ধান পাব, যা আমাদের অন্তর্জীবনকে গভীরতর উপলব্ধির ক্ষেত্রে, বিশ্বজনীনতাবোধে, প্রকৃত পক্ষে যথার্থ মনুষ্যত্বের পথনির্দেশ দেবে, আবারও আমি সেই ভারতকেই চিহ্নিত করব।

পাশ্চাত্যের দার্শনিক প্রাচ্য সম্পর্কে যা লিখে গিয়েছিলেন, সেইসব বাণী এ যুগের সাধারণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে বলে ধরে নিয়েও আমরা প্রবাসী ভারতীয়রা ভাবি—দারিদ্র্য দোষে গুণরাশি নাশে। না হলে কি আর 'নব দিনমণি উদিবে আবার' গেয়ে গেয়ে অবিশ্বাসের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যুগক্ষয় করে চলেছি! কান্নাকাটির দায়টা যেন আমাদের বাঙালিদের আরও বেশি। একে তো ভাবপ্রবণ জাত, তায় চাকরিগত প্রাণ এবং স্বদেশে, বিদেশে স্থায়ী সংসার প্রতিপালনের দায়। এক কোম্পানি থেকে আর এক কোম্পানির গণেশ উলটে দিয়ে লাগাতার নিউ ইয়র্ক থেকে টেকসাস, টেকসাস থেকে ক্যালিফোর্নিয়া। ডিগ্রি আর সার্টিফিকেটের বস্তা ঘাড়ে নিয়ে এই ক্যারাভান চলছে, চলবে। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো আছে বাঙালি কালচারের কচি চারাগুলো নিয়ে অসংখ্য ফুল ফোটানোর বাসনা। 'দেশ' বলতে ভূগোলের মানচিত্রে ওই পশ্চিমবাংলাই বড় আদরের। 'ভারত' আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে কিনা এসব নিয়ে তর্কটর্ক বহুকাল থেমে গেছে। সাধ আর সাধ্যে তফাৎ আর কি?

কিন্তু আমেরিকার গুজরাতিরা আক্ষরিক অর্থে কাজের লোক। ভারতের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি এদেশে গড়ে তোলার কাজে বাঙালিদের পাণ্ডিত্যের অবদান যতই থাক, তাঁদের

"গুজুভাইরা" একেবারে কামাল করে দিয়েছেন। এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ছত্রছায়ায় একত্র হয়ে এতকালের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত অর্থ ঢেলে একেবারে রাজকীয় ভারত উৎসব করে ছেড়েছেন। কাছাকাছি তিনশো চারশো মাইলের মধ্যে থেকে উৎসব দর্শনার্থী আমেরিকানরা এসে এক কথায় অভিভূত হয়ে গেছেন। স্বচক্ষে না দেখলে এবং দীর্ঘদিন ধরে এঁদের ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির খবর নিতে না গেলে বুঝতেই পারতাম না—কী অসম্ভব অর্থবল, জনবল এবং উদ্দীপনা নিয়ে স্থানীয় ধনী ও গুজরাতি সমাজ এমন বিশাল কর্মযজ্ঞটি সফল করে তুলেছেন।

উৎসবের উদ্যোক্তা সংঘের নাম "বোচা সন্ন্যাসী স্বামীনারায়ণ সংস্থা।" ধর্মীয় ও সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক গোষ্ঠী হিসেবে এঁদের সারা পৃথিবীতে মোট তিন হাজার কেন্দ্র আছে। আমেরিকাতেই আছে বাহান্নটি কেন্দ্র। শিষ্য সংখ্যা কয়েক লক্ষ। এঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নানা কর্মযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে সমাজের উন্নতি সাধন। আধ্যাত্মিক উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে আরও যা যা কাজ এই সম্প্রদায়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে তা হল রক্তদান কেন্দ্র স্থাপন, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সময় আর্থিক সাহায্য দান, মাদকাসক্তি নিবারণ ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। এ পর্যন্ত ভারতে দু'বার এবং লন্ডনে একবার এঁরা "ভারত উৎসব" করেছেন। এবার আমেরিকায় উৎসবের উদ্দেশ্য হল—আমেরিকান সমাজ ও বিদেশে প্রতিপালিত ভারতীয় ছেলে মেয়েদের কাছে বৃহত্তর ভারতের যথার্থ ছবিটি তুলে ধরা এবং ভারতীয় কৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃত ধারণা জন্মাতে সাহায্য করা।

কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক প্রধান অঙ্গ হিসেবে হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করা কি সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুধর্মের প্রাধান্যের প্রভাব সারা উৎসব ঘিরেই অনুভব করা গেছে। আন্তর্জাতিক অধিবেশনের উপলক্ষ ছিল এঁদের ধর্মগুরু ব্রাহ্মস্বরূপ যোগজি মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী পালন। তিনি ছিলেন এঁদের আদি প্রবর্তক ভগবান স্বামী নারায়ণের চতুর্থতম প্রতিনিধি এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। যোগীজির জীবন মানুষের সেবার জন্যে উৎসর্গীকৃত ছিল। গুজরাতের আম্রেলি জেলায় ১৮৯২ সালে জন্মেছিলেন এবং ১৮ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে ১৯ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী নারায়ণের মন্ত্রে দীক্ষিত যোগীজি বিভিন্ন আশ্রমের কার্যভার নিয়েছিলেন এবং ১৯৫১ সালে এই সংস্থার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর ওপর এসেছিল। ১৯৫৫ সালে যোগীজি মহারাজ হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য পূর্ব আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে গুজরাতি সম্প্রদায় তাঁর প্রভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণের ফলে আবার ১৯৬০ সালে পূর্ব আফ্রিকায় যান। পরবর্তী বছরে গুজরাতে ৫১ জন শিক্ষিত গুজরাতি যুবক তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে আমেদাবাদে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯ সালে তাঁরই উদ্যোগে সেখানে প্রথম আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলন (ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে) এবং অন্যান্য মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৭০ সালে তৃতীয়বার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে পূর্ব আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডে যাবার পর লন্ডনে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর আমেরিকার নিউ ইয়র্কে কুইনস অঞ্চলে যে স্বামী নারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মূল প্রেরণা ছিলেন স্বয়ং যোগীজি মহারাজ, যদিও তার আগেই ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি দেহরক্ষা করেন। এখন যোগীজির উত্তরাধিকারী হয়েছেন সন্ন্যাসী প্রমখ স্বামী। এবারের ভারত উৎসবের তিনিই প্রধান প্রেরণা। আর "ভারত

উৎসবের" জন্যে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে, প্রভূত জনবল এবং শ্রমদানের প্রতিশ্রুতি আন্তরিক ভাবে পাওয়া গেছে। তার মূলে আছেন পূর্ব আফ্রিকার প্রথম পর্বের বাসিন্দা গুজরাতিদের অবদান। আমেরিকার গুজরাতিরা তো আছেনই। তবে দু/তিন প্রজন্মের উপার্জন এঁদের যে পরিমাণ ধনী করেছে, তারই সঙ্গে ধর্মের প্রভাব মিলে মিশে "ভারত উৎসব" নিউ জার্সির মাটিতে যেন ভারতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হয়ে উঠেছিল।

এ বছরের শুরু থেকে কয়েক মাস ধরে সংস্থাটি বেশ কয়েকটি বড় হোটেলে কিছু স্থানীয় ভারতীয় এবং আমেরিকানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে উৎসবের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ইত্যাদি বলেছিলেন। আতিথেয়তা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ বলে এঁরা আমেরিকার বিভিন্ন শহরের এই সব হোটেলগুলিতে মোট ২০০০ গুজরাতি কিশোর কিশোরীকে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিলেন। আমি দুটি আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের শীতের সন্ধ্যায় পৌঁছে দেখেছি তারা ওভারকোট, দস্তানা খুলে নিয়ে, কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। আবার জুলাইয়ের প্রচণ্ড বর্ষায় ভিজে প্রায় স্নান করে পৌঁছে দেখেছি দরজা থেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এসে জলে ভেজা ছাতা হাত থেকে নিয়ে দূরে জল ঝরিয়ে রেখেছে। শুকনো তোয়ালে এনে দিয়েছে। ভেতরে আলোচনা, স্লাইড শো চলাকালীন-চা, শরবৎ এনে দিয়েছে। দু'বারই নিরামিষ ডিনার খাইয়েছে। প্রায় দুশো আড়াই শো অতিথিকে পরিবেশন করেছেও ওই ছেলেমেয়েরা। রান্না করেছেন গুজরাতি স্বেচ্ছা সেবক-সেবিকার দল। "ভারত উৎসব" চলাকালীন প্রায় দেড়মাস ধরে স্কুলে গরমের ছুটি থাকায় এরা প্রতিটি বিভাগে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছে। উদ্যোক্তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উৎসবের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের পারিবারিক বন্ধনটি দৃঢ় করা।

নিউ জার্সির এডিসন শহরের 'মিডলসেকস কাউন্টি কলেজ'-এর বিশাল ক্যামপাস জুড়ে ভারত উৎসব চলেছিল ১২ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। প্রথম দিনের উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট মার্কিন অতিথির সঙ্গে নিউ জার্সির রাজ্যপাল জিম ফ্লোরিও। বিশ্ব শান্তির প্রতীক হিসেবে সাদা পায়রা উড়িয়ে উৎসবের সূচনা। তার আগে ক্যামপাসে দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রতিটি প্রদর্শনী, মঞ্চ, বিশাল বিশাল শামিয়ানার নীচে ছ'হাজার চেয়ারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, প্রতিদিন তিন হাজার কর্মীর জন্যে ম্যারাপ বাঁধা দেড় মাসের জন্যে তৈরি রান্নাঘরে খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি, সব শেষ হয়ে গেছে। ভোর থেকে কাতারে কাতারে মহিলা বসে বসে লুচি, পরোটা বেলছেন, মিষ্টি তৈরি করছেন, শুকনো খাবার করে করে কিছু দূরের একটি কারখানা ঘরে জমা করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দিন থেকে বেশ কয়েকবার উৎসবে গিয়েছিলাম। ক্যামপাসে ঢোকার আগে হাইওয়ে থেকে ময়ূর আঁকা লোগো সমেত ভারত উৎসবের পোস্টার শুরু হয়েছে। ভেতরে ঢোকার আগে পর্যন্ত আমেরিকান পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভেতরে গুজরাতি স্বেচ্ছাসেবকরা গাড়ি পার্কিং ইত্যাদির সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার দর্শক। একেক প্রান্তে এক একটি বিশাল তোরণ। ময়ূরদ্বার, সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার আর হংসদ্বার। মোট ৯০টি প্যাভিলিয়নে সারা ভারতের যাবতীয় দ্রষ্টব্যের নমুনা ছড়িয়ে আছে। পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যকে

বিদেশির কাছে তুলে ধরার সামান্যতম প্রয়াস হলেও পরিকল্পনাটি তো সামান্য নয়। একদিকে রয়েছে বেশ কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন। মন্দিরে মন্দিরে হরপার্বতী, রামসীতার মূর্তি। কোথাও বিশাল নটরাজ, কোথাও ঝলমলে পোশাক পরা সারথী সূর্যের সাত ঘোড়ার রথে বসে আছে, রাধাকৃষ্ণ লীলা, কোথাও বা মহারাষ্ট্রের মন্দিরের নৃত্যরত গণপতি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে এসেছিলেন পণ্ডিত যশরাজ, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, অনুরাধা পড়োয়াল, শিবকুমার শর্মা, জাকির হুসেন, সুরেশ ওয়ার্ধা ইত্যাদি নামী শিল্পী। একমাত্র প্রদর্শনীর বিশাল ঘরটির জন্যে মাত্র পাঁচ ডলার প্রবেশ মূল্য রেখেছিলেন উদ্যোক্তারা। কারণ না হলে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হত। বাদবাকি উৎসবের জন্যে কোথাও কোনও প্রবেশমূল্য নেওয়া হয়নি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিখ্যাত শিল্পীরা থাকলেও শ্রোতারা বিনা প্রবেশমূল্যে সে সব শোনবার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত উৎসব চলেছিল। অভিরুচি অনুযায়ী মানুষ গন্তব্য ও দ্রষ্টব্য বেছে নিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বাবা মা বসে আছেন ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা চক্রগুলিতে, যেখানে হিন্দিতে বক্তৃতা চলছে। ইংরেজি বক্তৃতার সময়ে স্বামী চিন্ময়ানন্দ ইত্যাদিরা বক্তা ছিলেন। রামনবমী, নবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, শ্রীহরি জয়ন্তী, গুরুজয়ন্তী, শিবরাত্রি, গণেশ চতুর্থী, উপনয়ন, বিবাহ—সব কিছুই দেখার জন্যে দর্শকরা ব্যস্ত। আমেরিকান দর্শকরা সর্বত্র সমান উৎসাহে বসে আছেন। ধর্ম আলোচনার জন্যে প্রতিদিন নানা সময়ে বিভিন্ন সম্মেলন হয়েছে। হৃষীকেশের চিদানন্দ স্বামী, প্রমুখ স্বামী মহারাজ, চিন্ময়ানন্দ স্বামী, আচার্য সুদীন কুমারজি এঁরা এবং অন্যান্য সাধুরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিনে বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। সর্বধর্ম সমন্বয় ও অহিংসা প্রসঙ্গেই ছিল প্রধান প্রচার। গুজরাত থেকে "বোচা সন্ন্যাসী স্বামী নারায়ণ সংস্থার" সাধুদের একটি বিরাট দল এই উৎসব উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। অন্যান্য আলোচনা চক্র এবং বক্তৃতার বিষয় ছিল সমসাময়িক সমস্যা ও জিজ্ঞাসাগুলির ওপর ভিত্তি করে। আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন, আন্তর্জাতিক যুবতী সম্মেলন, আন্তর্জাতিক কিশোর কিশোরী সম্মেলন, আন্তর্জাতিক ঐক্য সম্মেলন, ড্রাগের নেশা ও মদ্যপানের আসক্তির কুফল ও প্রতিকারের উপায়, বিদেশে সন্তান প্রতিপালনের সমস্যা, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক পরিস্থিতি, জীবনে মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশীলনের প্রভাব ইত্যাদি। ঐতিহ্য, বর্তমান সমস্যা এবং আধুনিক জগতে ভারতীয় অভিবাসী সমাজ সমবেতভাবে আমেরিকার বিভিন্ন স্তরে প্রযুক্তিগতভাবে, শিক্ষাগতভাবে, ব্যবসায় বিনিয়োগে কতখানি অবদান রাখছে, তাঁরও বিশেষ উদাহরণ রাখার প্রচেষ্টা হয়েছে।

নিউজার্সিতে 'ভারত উৎসব'-এর উদ্যোক্তা কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া এবং প্রধানত "বোচা সন্ন্যাসী স্বামী নারায়ণ সংস্থার" দীক্ষিত গুজরাতি সম্প্রদায় হলেও এর সমর্থনে ছিলেন বহু বিশিষ্ট মানুষ।

এত বড় কর্মযজ্ঞের ৪০০,০০০ লোকের মধ্যে শুধু মুগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ানো আর মাঝে মাঝে জনান্তিকে 'গুজরাতিরা ভারত উৎসবের নামে গুজরাতের প্রচার বৃদ্ধি করছে' বলা ছাড়া বাদ বাকি ভারতীয়রা কী করলেন? হ্যাঁ একথা ঠিক যে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের প্যাভিলিয়ন দেখানোর সময় গুজরাত রাজ্যের জাঁকজমক কিছু বেশি ছিল। তবু এ কথা

তো স্বীকার করতেই হবে ভারতের ভাবমূর্তির জন্যে তাঁরা যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে একমাস ধরে আমেরিকার মাটিতে বিনা সরকারি সাহায্যে এবং বৃহৎ পরিকল্পনাটি রূপায়িত করলেন, ভারত সম্পর্কে আগ্রহ এবং মমত্ববোধ না থাকলে তা কোনওদিনই সম্ভব হত না। ধর্মভিত্তিক সংস্থা বলেই হয়তো ব্যক্তিগত ক্ষমতার লড়াই মাথা তুলতে পারেনি। কারণ সবাই গুরুভাই হিসেবে কাজ করেছেন।

'ভারত উৎসবে' গুজরাতি প্রভাব ছিল, কিন্তু ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবার প্রশ্ন ছিল না। লোকগীতি, লোকনৃত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি কোনও রাজ্যের বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করেনি। মাঠের ও প্রান্তে ভাঙড়ার ঢোল বাজছে, তো এ প্রান্তে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী নৃত্য জমে উঠেছে। হ্যাঁ, বাঙালির যে কী অসামান্য অবদান ছিল এই সম্পূর্ণ উৎসবে, ছবির মাধ্যমে তার আংশিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। যে প্রধান আকর্ষণ ছিল এই উৎসবের তা হল একটির পর একটি প্যাভিলিয়ন, বিশাল তোরণ, মন্দির, মূর্তি, প্রদর্শনীর হলে অসংখ্য মডেল, রামায়ণের অসংখ্য পুতুল চরিত্র থেকে শুরু করে যাবতীয় স্থাপত্য আর বাঁশ ও বেতের কাজ করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা আমাদের কলকাতার বাঙালি। মোট সাতচল্লিশজন মৃৎশিল্পী, স্থপতি আর শিল্পী এসেছিলেন কুমোরটুলি আর রামবাগান থেকে। স্টলে স্টলে কুমোরের চাক ঘুরছে। মূর্তি তৈরি হয়েছে দর্শকদের আগ্রহে। আলাপ হয়েছে রামবাগানের সহদেব ধাড়া আর গৌর পোড়েলের সঙ্গে। সিংহদ্বার, ময়ূরদ্বার অথবা হস্তীদ্বারের অসাধারণ শিল্প সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এই বেত ও বাঁশ নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদেরই। এ সম্পর্কে বনমালী সরকার স্ট্রিটের স্থপতি প্রদীপ পাল আমাকে অনেক তথ্য দিয়েছেন। এঁরা গত বছর মে মাস থেকে আমেদাবাদে গিয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে একে একে সমস্ত মন্দির, মূর্তি, মডেল, তোরণ ইত্যাদির কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর এ বছরের শুরু থেকে বিদেশে আসার প্রস্তুতি। যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যয়ভার বহন করেছেন উদ্যোক্তা সংস্থা। বাঙালি শিল্পীরা এককালীন পারিশ্রমিক দেশে থাকতেই পেয়ে গিয়েছেন। এয়ার ইন্ডিয়াতে মে মাসে এখানে এসে পৌঁছনোর পর সঙ্গে আনা পঞ্চাশটি বিশাল বাক্স থেকে সেইসব তৈরি জিনিস দিয়ে বাদবাকি কাজ শেষ করেছেন নিউ জার্সির ব্যারিট্যান সেন্টার নামে ভাড়া করা কারখানায়। প্রদীপ পাল ১৯৮৫ সালে লন্ডনে "ভারত উৎসবে"এও কাজ করেছিলেন। সে সময় তিন মাস লন্ডনে থেকেছিলেন। আমেদাবাদের সঙ্গে সেই সূত্রেই যোগাযোগ। এবারে তাঁরই মাধ্যমে এই সংস্থা কলকাতার রামবাগানের শিল্পীদেরও কাজ দেন। ফলে আমেরিকার "ভারত উৎসব" এই সাতচল্লিশ জন বাঙালি শিল্পীর হাতের কাজ ছাড়া সার্থকভাবে শিল্পমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারত না। বিভিন্ন উপাদান এঁরা ব্যবহার করেছেন। ফাইবার গ্লাসের তৈরি রামসীতার মূর্তি অথবা বাঁশ ও বেতের কাজের নটরাজ, পশ্চিমবাংলার প্যাভিলিয়নে অপূর্ব দশভুজা মূর্তি অথবা সরস্বতী মূর্তি—প্রতিটি সৃষ্টি যেন আক্ষরিক অর্থে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছিল। প্রদীপ পালকে প্রশ্ন করেছিলাম—যত ড্রাগ অ্যাডিক্ট, মাতাল, চোর, বাটপাড় দেখাতে আমেরিকান মডেল তৈরি করেছেন কেন? আমাদের দেশে এ সব সমস্যা নেই? নাকি উদ্যোক্তাদের কথায় কাজ করেছেন? প্রদীপ পাল বলেছিলেন—'জানি, এনিয়ে কিছু কথা উঠেছে। আসলে বেশিরভাগ কাজ তো আগেভাগেই দেশে থাকতে শেষ করে এনেছি। ওঁরা যেভাবে বলেছিলেন সে সময়। তারপর

এখন আবার তো রাতারাতি কিছু সাদা মানুষের মূর্তিকে খয়েরি রং দিয়ে অন্যরকম করতে হল। চুল বদলাতে হল। কিন্তু তাতে কি শুধু চেহারা পালটানো যায়? ভারতীয় মুখের ছাঁচই তো আলাদা রকম হয়। সে তো আর ভেঙেচুরে গড়ার সময় নেই এখন।'

বাঙালি শিল্পীরা উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনায় মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত নিউ জার্সিতেই ছিলেন। উৎসবের আগে আগে প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। বিশাল বিশাল তোরণকে ভাগে ভাগে তৈরি করে আনলেও সেটা জোড়া দিয়ে বসানো, মন্দিরের ফ্রেম খুলে তার থাম মিলিয়ে মিলিয়ে, কারুকার্য মিলিয়ে মূর্তি বসিয়ে সম্পূর্ণ করা, স্ট্যাচু অফ লিবার্ট দেখে এসে হুবহু তার সংস্করণ বানানো, দেবদেবীর মূর্তি সাজানো, রামায়ণের ছোট্ট ছোট্ট সুগ্রীব, জাম্বুবান, বালি ও হনুমানের জায়গা এবং ঘটনা বুঝে বসানো—নেহাৎ সহজ কাজ নয়। ঘটনার চাপে পড়ে হনুমানরাই যে এতরকম মুখভঙ্গি করতে পারে—ছোট ছেলেমেয়েরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। প্রদীপ পাল হাসছিলেন। প্রায় ঘোরের মধ্যে কাজ করে গেছেন একটানা প্রায় এক বছর ধরে। এবং একটানা নিরামিষ গুজরাতি খাদ্য খাওয়া। একটি জিনিসও ফর্দ অনুযায়ী আনতে ভুল হয়ে গেলে মহা সমস্যা। পুজোবাড়ির প্যাভিলিয়নের কাজ শেষ করে ভারত উৎসবের আগের রাত্রে আবিষ্কার করলেন, দুর্গা ঠাকুরের সামনে বসে আলপনা দিচ্ছে যে মেয়েটি, তার পরচুলার মাপ ভীষণ ছোট হচ্ছে। নিউ জার্সিতে কুমোরটুলি কোথায়? আবার জোড়া তালি দিয়ে বড় উইগ বসালেন সেই সুন্দরীর ন্যাড়া মাথায়। ধুনুচি নাচের ধুনুচি তৈরির কথা খেয়াল ছিল না। কাগজের বাটি রং করে এমন চেহারা বানালেন, বোঝে কার সাধ্য? নিরামিষাশী জগৎ দেখতে পেল্লায় এক হাতি আর জলহস্তী বানিয়েছেন এমন, মনে হয় জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি। প্রদর্শনীর মূল সৃষ্টিই হয়েছে প্রদীপের হাতে। ওঁর খাতিরও দেখলাম খুব। অন্যান্য শিল্পীদেরও বিশেষ সম্মান দিয়েছেন।

"ভারত উৎসব"-এ বাঙালির ভূমিকা কী ছিল বোঝানোর জন্যে এত কথার অবতারণা। ম্যাক্সমুলার যা লিখেছিলেন, সে উপলব্ধির জন্যে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল আমরা সামান্য বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে সে কোথায় পাব? তবে 'বলো বলো বলো সবে' গাইবার আবেগ নিঃসন্দেহে আমাদের একচেটিয়া থাকবে। "ভারত উৎসব" সেই প্রেরণা জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাকো

আমেরিকান ভারতীয়দের মধ্যে হাউজ ওয়ার্মিং পার্টির জনপ্রিয়তা এক সময় তুঙ্গে উঠেছিল। এ ব্যাপারে বাঙালিরাও রীতিমত রুটিন ফলো করে গেছে। নতুন বাড়ি কেনার পর সত্যনারায়ণ সেরেই মাস দুই/তিন অজ্ঞাতবাস পর্ব। তারপর বাড়িঘর হোয়াইট হাউসের স্টাইলে সাজিয়ে ফেলে আবার আত্মপ্রকাশ। তখন আবার বিস্তর লোকজন ডাকাডাকি করে মস্ত হাউজ ওয়ার্মিং পার্টি দেওয়া। নতুন বাড়ি সরগরম করার জন্যে আড্ডা আর ভুরি ভোজনের এলাহি ব্যবস্থা।

কিন্তু আমাদের শান্তনু বরাবরই অভিনবত্বের পূজারী। জনতার দেখাদেখি সব কিছু করে যাওয়া তার ধর্ম নয়। শান্তনুকে আপনাদের মনে পড়ছে? একবার ওর কথা লিখেছিলাম। যাঁরা নিঃসন্তান থাকা পছন্দ করেন তাঁদের প্রসঙ্গেই ওর কথাও লিখেছিলাম। তা, সেই শান্তনু বাড়ি কিনেছিল আশি সালে। হাউজ ওয়ার্মিং পার্টির সময় ওর বাড়িতে ছোট ছেলে মেয়েদের ডাকল না। পার্টির সপ্তাহ খানেক আগে এক ছুটির দুপুরে নিমন্ত্রিত বাবা-মাদের তাবৎ কুচো-কাচাদের আলাদা করে জুটিয়ে নিয়ে গেল ম্যাকডন্যাল্ড রেস্তোরাঁয়। তাদের জন্যে করল হ্যামবার্গার আর আইসক্রিম পার্টি। শান্তনুর যুক্তি ছিল—ওর নিজের বাড়িতে ছোট ছেলে মেয়ে নেই বলে শুধু শুধু এই বাচ্চাদের ডেকে 'বোর' করার মানে হয় না। তার চেয়ে বরং হ্যামবার্গার পার্টিতে ডেকে ওদের আনন্দ দেওয়া যাক। পরের শনিবারে ওদের বাড়ির হাউজ ওয়ার্মিং পার্টিতে ওদের মা, বাবাদের জন্যে শান্তনু নাকি অন্য আনন্দের আয়োজন করছে। গভীর সাসপেন্স!

যথারীতি আমার মেয়ে আগের সপ্তাহের বাল্যভোজের নেমন্তন্নয় গিয়ে শান্তনুর দৌলতে খুব হইচই করে এল। তাকে বাড়িতে রেখে পরের শনিবারে আমাদের 'আনন্দিত' হবার কথা। শান্তনুর চমক দেখতে সন্ধে নাগাদ ওর বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

বেসমেন্টের হলঘরে সবাই জড় হয়ে গল্পগুজব করছিলাম। হঠাৎ আলো নিভে গেল। শুরু হল স্টিরিওতে আলিবাবা ও চল্লিশ চোর মার্কা 'সন্তুর' বাজনা। দেওয়ালে, সিলিঙে ঘুরন্ত রঙিন আলোর প্রতিফলন। আর তখনই হাতে কটকটি বাজাতে বাজাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল মুখে নীল ওড়না জড়ানো এক নিশিকন্যা। তারপর সে কী মোহিনী নৃত্য! যেন হারানো দিনের বেইরুটের নাইট ক্লাবে ঢুকে পড়েছি। শান্তনুর বেসমেন্টে এক সন্ধ্যার জন্যে ভাড়া করা সেই লেবানিজ বেলি ডান্সার বাড়ি গরম করেছিল বটে। তার সুঠাম দেহের যাবতীয় ঢেউ, পেটের পেশির দ্রুত সঞ্চালন আর বিলোল কটাক্ষে রঞ্জিত সেন প্রায় আত্মহারা। মুঠো ভর্তি ডলার নিয়ে সুন্দরীর বুকে গুঁজে দেবার সময় কী নিষ্ঠা! বার কতক ইনাম দেবার পরেও উৎসাহের শেষ নেই।

কিন্তু শান্তনু তখন আর অত আনন্দের সাপ্লাই দিতে রাজি নয়। এই অপরূপ নৃত্য ভঙ্গিমা শুধু নাকি দর্শনযোগ্য। স্পর্শনযোগ্য মোটেই নয়। আড়ালে নীলুদা আর ডঃ যাদুগোপালকে ডেকে নিয়ে বলে দিল—দাদা, রঞ্জিতদার টাই ধরে কন্ট্রোল করুন। বেশি গায়ে পড়লে মেয়েটা শেষে আমাকেই স্যু করে দেবে। নাচের জন্য ভাড়া করেছি। আর

কিছুর জন্যে নয়।

নীলুদা বড় কর্তব্যপরায়ণ মানুষ। শান্তনু তাঁকে কাজের ভার দিয়ে ওপরে চলে যেতেই তিনি রঞ্জিত কন্ট্রোল প্রজেক্টে নেমে গেলেন। সফল হলেন নিশ্চিত। কারণ রঞ্জিত সেন আর নজরানা দিতে উঠলে না। শুধু সুন্দরীকে নজরবন্দি করে রাখলেন। কিন্তু সে কি আর এক জায়গায় থাকে? কখন গিয়ে বসেছে ডঃ যাদুগোপালের হাঁটুর ওপর। কিন্তু যাদুকে যাদুটোনা করা অত সহজ নয়। নিশিকন্যা নীল ওড়না দিয়ে তাঁর টাক মাথা জড়িয়ে ফেলেছে বুঝে দু'হাত ছড়িয়ে ছড়িয়ে সরু গলায় গান ধরলেন—ছুইওনা-ছুইওনা বন্দু, অই হানে থাইক্যো। মুকুর লইয়া চান্দ মুখখানি দেইখ্যোঁ...ছুইও না ছুইও না...।

এতরকম উত্তেজনার মধ্যে বেলি ডান্সার তার লাস্য নৃত্যের ডিউটি শেষ করে যথাসময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ছিল শান্তনুর কায়দায় আমেরিকায় হাউজ ওয়ার্মিং-এর ডেফিনিশন। বাড়ি গরম আর অতিথি গরম। তার রুচিবোধ প্রসঙ্গে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে যেহেতু ও নাচে পোশাক উন্মোচেনের কোনও ব্যাপার ছিল না আর নৃত্যশৈলীর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্ভবত সেই কারণে দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠান হিসেবেই সেটি ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল।

নারীর লাস্য নৃত্য দেখে পুরুষের আনন্দ পাওয়া সম্পর্কে শান্তনুর কোনও সংশয় ছিল না। আমেরিকার নাইট ক্লাবগুলির জনপ্রিয়তা থেকে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করাও যুক্তি-যুক্ত হয় না। পাঁচ বছর আগে এদেশের ৪৫টি রাজ্যে সবসুদ্ধ ৮০০টি নামকরা টপলেস নাইট ক্লাব ছিল। এখন ৪৭টি রাজ্য মিলিয়ে মোট এক হাজারের ওপর নাইট ক্লাবের রমরমা। এখানে শুধু অনাবৃত নারীর বক্ষের সৌন্দর্য দেখতেই পুরুষ আসেন সমাজের উচ্চস্তর থেকে। আমাদের নিউ জার্সিতে আছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় টপলেস নাইট ক্লাব। মোট ১১০টি। তারপরেই টেকসাস, ফ্লোরিডা, পেনসিলভানিয়া আর নিউ ইয়র্কে।

এসব ক্লাবে সাধারণত কারা আসেন? ধরুন একজন ব্যস্ত উকিল, বয়স তাঁর তিরিশের কোঠায়। তিনি সারাদিনের সওয়াল জবাব আর নথিপত্রের কচকচির শেষে নিজেকে কিঞ্চিৎ শিথিল করতে চান। চলে গেলেন ম্যানহাটনের কোনও টপলেস নাইট ক্লাবে। হাতে ঠাণ্ডা বিয়ার, কানে মধুর সঙ্গীত আর চোখের সামনে একদল বক্ষবাসবিহীন রমণী। কাছে আসছে, গল্প করছে, গান শোনাচ্ছে, নাচ দেখাচ্ছে আর দৃষ্টিসুখের উল্লাসে পরিতৃপ্ত উকিলের দেওয়া কিছু ডলার কৌপিনের আড়ালে গুঁজে নিচ্ছে। এরকম ভাবে আরও নানা পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত, ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পুরুষদের আনাগোনার ফলে ক্লাবগুলো রীতিমত মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে স্ট্রিং ফেলোস নামে এরকম একটি টপলেস নাইট ক্লাব আশির দশক থেকেই বেশ ভাল ব্যবসা করছিল। সেখানে যাঁরা নিয়মিত যান, তাঁদের বক্তব্য—বান্ধবী নিয়েও অনায়াসে গিয়ে বসা যায়। এমনই নাকি ভদ্র পরিবেশ। অর্থাৎ এঁরা বলতে চাইছেন স্ট্রিং ফেলোস মোটেই খেলো জাতের আমোদ প্রমোদের জায়গা নয়। এর বেশ মান মর্যাদা আছে। এসব জায়গায় কোট, টাই ছাড়া ঢোকার নিয়ম নেই। ঢুকলেই কম পক্ষে ১৫ ডলারের মতো দিতে হবে। তাছাড়া মদ্য, খাদ্য এ সবের দাম আলাদা। একটু দামি জায়গা বলে মনে না হলে বড় চাকুরেরা আসবেন কেন?

আশির দশকের শেষ পর্যন্তও টপলেস নাইট ক্লাবগুলোর অধিকাংশই আরও স্থূল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করত। বক্ষবাসমুক্ত দুই মহিলা রিং-এ নেমে বক্সিং শুরু করল। ঘুসোঘুসি উপলক্ষ মাত্র। রুচি বিকৃতি আর নিষ্ঠুরতা মিলিয়ে সমাহারে দ্বিগু সমাস। আর এক কদর্য দৃশ্য ছিল কাদা যুদ্ধ। শুধু কৌপিন মাত্র সম্বল করে একদল মেয়ে কাদার মধ্যে কুস্তি আরম্ভ করল। বীভৎস মারধোর, চুলের মুঠি ধরে ছেঁড়া কামড়া, কাদার মধ্যে দুই মাতঙ্গিনীর জাপটা-জাপটি। দর্শকরা সেই কাদাযুদ্ধ দেখে উল্লাসে, উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। একদল পয়সার লোভে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে কাদা মাখছে। মার খেয়ে কাঁদছে। আবার নৃশংসভাবে আর একজনের বুকে চেপে বসছে। অন্যদল পয়সার জোরে দর্শক আসনে পোশাক পরে বসে প্রভূত যৌন উত্তেজনা ভোগ করছে। এই ছিল সস্তার নাইট ক্লাবগুলোর টপলেস আকর্ষণ।

কিন্তু নব্বই-এর শুরুতে যে সব অভিজাত নাইট ক্লাব জমিয়ে বসেছে, তারা ওইসব সস্তার উপকরণ দিতে নারাজ। যেমন, স্ট্রিং ফেলোস ক্লাবে খাবারের দাম খুব বেশি করা হয়েছে। সাতসজ্জায় প্যারিস নয়তো লস ভেগাসের নাইট ক্লাবের ছাপ। আর নাচের মেয়েরা যে একে একে পোশাক কমাতে থাকবে, সে পোশাকগুলোও কিছু সাদা মাটা সস্তার জিনিস নয়। তাতে আগাগোড়া চুমকির খেলা। আভিজাত্য সৃষ্টি করতে গেলে এরকমই করা দরকার।

ম্যানহাইনের আপার ইস্ট সাইডে আছে 'স্কোরস' নামে আর একটি অভিজাত টপলেস নাইট ক্লাব। এরা আবার দাবি করে যে এদের বৈশিষ্ট্য মুক্তবক্ষ খেলার আসর। মানে এক ভাবে উন্মুক্ত দেহ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এক ঘেয়েমি আসা বিচিত্র নয়। তাই মাঝে মাঝে একটু অন্য ঘরে গিয়ে রাইফেল শ্যুটিং করে নিশানা ঝলিয়ে আসা যায়। নয়তো আর এক ঘরে ঢুকে টিভির বিশাল স্ক্রিনে হকি খেলা দেখা যায় কিছুক্ষণ। আবার নয়ন তৃষ্ণার্ত হলেই টপলেস বারে গিয়ে বসা। যাকে বলে 'ভ্যারাইটি শো'।

অ্যাটলান্টার গোল্ড ক্লাব, হিউসটনের মেনস ক্লাব, ডালাসের ক্যাবারে রয়্যাল—এদের বন্দোবস্ত আরও বড় রকমের। গাড়ি নিয়ে ঢুকলে নিজেকে পার্কিং-এর কষ্টও করতে হবে না। ক্লাবের কর্মচারী গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাবে। এদের নিজেদের লিমোজিন আছে, শাটলবাস আছে। নাইট ক্লাবের মধ্যে বড় অফিস একজিকিউটিভদের মধ্যে আলাদা ডাইনিং রুম, ফ্যাক্স মেশিন বসানো কনফারেন্স রুম। আর টপলেস মেয়ের দল বসে বসে কর্তাব্যক্তিদের জুতো পালিশ করছে, কফি করে আনছে। দরকার মতো ফোন ধরা, টাইপ করা, এমনকি কমপিউটার চালিয়ে সেক্রেটারির কাজও করে যাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে আমেরিকাতে ডিসকো জয়েন্টের বদলে টপলেস ক্লাবগুলো ধীরে ধীরে ব্যবসা গুছিয়ে বসছে। গান বাজনার পরিবেশকে গ্রাস করছে ব্যয়বহুল নাইট ক্লাব। এই যে নামী দামি টপলেস ক্লাবের সূচনা হল, এর মূলে আছে কানাডার নৈশ সংস্কৃতির প্রভাব। বছর দশ বারো আগে কানাডাতে প্রথম টপলেস ক্লাব এমনভাবে জাতে উঠেছিল। তারপর ক্রমশ ফ্লোরিডা আর টেকসাসে এই ধরনের নাইট ক্লাব গড়ে উঠতে লাগল। টেকসাসের অস্টিনে 'জেন্টেলমেনস ক্লাব ম্যাগাজিন' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাতে শুধু মুক্তবক্ষ সাম্রাজ্যেরই যাবতীয় খবর থাকে। আমেরিকা টপলেস ক্লাব আর তাদের নানা

পত্রিকা মিলিয়ে ওই সাম্রাজ্যে প্রতি বছর তিন কোটি ডলারের লেনদেন হয়।

টপলেস ক্লাবকে অভিজাত শ্রেণীর মানুষের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পেছনে ব্যবসায়ীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নতুনত্ব সৃষ্টি। তাছাড়া এইডস-এর আতঙ্ক এখন এমন ছড়িয়েছে যে সিঙ্গলস বার গুলোতে ভিড় কমে যাচ্ছে। নেশার ঘোরে খেজুরে আলাপের জের টেনে কেউ আর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চায় না। যাঁরা নাইট ক্লাবের মালিক, তাঁদের বক্তব্য—'স্কোরস' বা 'স্ট্রিং ফেলোস' হচ্ছে নিঃসঙ্গ পুরুষের ক্ষণিক বৈচিত্র্যের জায়গা। এখানকার পরিবেশের সঙ্গে যৌনতার কোনও সম্পর্ক নেই। যে সব কর্ম ক্লান্ত নিঃসঙ্গ মানুষ এখানে আসেন, তাঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে ভালোবাসার কোনও মানুষ নেই। সাময়িকভাবে এখানে এসে মেয়েদের কাছে সহজ ব্যবহার পেয়ে এঁরা ভাবেন এরই নাম বোধহয় ভাল লাগা। সেই অর্থে এঁরা সাময়িকভাবে মানসিক সঙ্গী খুঁজে পান, হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। এই ব্যবসাতে নারী দেহ ব্যবহৃত হয় না। পুরুষের দুর্বলতাকে ব্যবহার করেই ব্যবসা চালানো হয়।

ভাবতে অবাক লাগে আমেরিকার সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও কী ভাবে রাজ্যে রাজ্যে এই ক্লাবগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। গত বছর আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট 'বার্নস ভার্সেস, গ্লেন থিয়েটার' মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রায় দিয়েছিলেন যে—যে কোনও এলাকাতেই মানুষ এই ধরনের প্রতিবাদের সামিল হতে পারে। প্রত্যেক অঞ্চলের বাসিন্দাকে এরকম সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া হল যে, সে কোনও নারীকে প্রকাশ্যে বক্ষ উন্মুক্ত করতে দেখলে প্রতিবাদ জানিয়ে সেই প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে পারে। তবে এখানেও আইনের সামান্য ফাঁক থেকে গেছে। আংশিক উন্মোচনে আপত্তি তোলা চলবে না। আর সম্পূর্ণ উন্মোচিত বক্ষ যদি নামমাত্র আবরণে অথবা দৃষ্টি বিভ্রমকারী রং দিয়ে সামান্য আবৃত থাকে, তবে হয়তো আন্দোলন না টিকতেও পারে। কিন্তু সেই সামান্য মোহ আবরণ ঘুচিয়ে দিলেই সর্বনাশ। তখন আন্দোলন খুব জোরদার করে সুপ্রিম কোর্টের বারণ নিয়ে সেই মহিলাকে জামা পরতে বাধ্য করা যাবে।

সারা আমেরিকাতেই টপলেস বার বন্ধ করার জন্যে প্রতিবাদ, স্লোগান মুখরিত মিছিল কিছু কম হয় না। স্ট্রিং ফেলোস আর অন্যান্য ২৩টি বারের মালিক গত দেড় বছরের মধ্যে অন্তত দু লক্ষ ডলার শুধু উকিলের পেছনেই খরচ করেছেন। ক্লাবগুলোকে আইন বাঁচিয়ে চালু রাখতে গেলে এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। এক তো উকিলের খরচ প্রচণ্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর স্থানীয় লোকেদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে দান ধ্যানও প্রচুর করতে হচ্ছে। জনসেবার কাজে, ত্রাণ তহবিলে নিয়মিত মোটা অংকের ডলার সরবরাহ করে ক্লাব মালিকরা ব্যবসা চালাতে পারছেন। তবে ব্যবসা থেকে রোজগারও হচ্ছে প্রচুর। এক একটি ক্লাবে শুধু মদ বিক্রি হয় সপ্তাহে তিরিশ হাজার থেকে এক লক্ষ ডলারের।

এখনকার টপলেস নাইট ক্লাবের মালিকরা অনেকেই বেশ শিক্ষিত। অন্তত পক্ষে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করে ব্যবসায় নেমেছেন। নাইট ক্লাব চালানোর সঙ্গে আবার নানা খুচরো কারবারও করেন কেউ কেউ। নিশিকন্যাদের দেহসৌন্দর্যের ছবি দিয়ে তাসের ব্যবসা, বিজনেস কার্ডের ব্যবসা ইত্যাদি।

আমেরিকার মহিলামহল কি একেবারে নীরব হয়ে আছেন? না থাকাই স্বাভাবিক। তাঁরা

স্পষ্টই অভিযোগ করছেন যে—ওই ধরনের বারগুলিতে মেয়েদের অপমানজনক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মেয়েদের ভাবমূর্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে তাদের শুধুমাত্র যৌনতার প্রতীক হিসাবে দেখানো হচ্ছে। ওয়াশিংটনের নারী প্রগতি দলগুলির অন্যতম হল "কনসার্নড উইমেন অফ আমেরিকা।" তাঁরা জানিয়েছেন ওই নাইট ক্লাবগুলির একমাত্র কাজ হল নারী পুরুষের মধ্যে বিকৃত সম্পর্ককে সমর্থন করা এবং সেই সুযোগে চুটিয়ে ব্যবসা করা।

তবে এমন অনেক মহিলাও আছেন যাঁদের কাছে এসব কাজের কোনও অবমাননাকর মূল্য নেই। বিশেষ করে টপলেস নাচিয়েরা তো এক বাক্যে বলছেন—অন্য অনেক পেশার চেয়ে এখানে তাঁরা অপেক্ষাকৃত বেশি সম্মান পান। মেয়েদের ব্যবহার করার নানা ক্ষেত্র আছে। সে তুলনায় তাঁদের পরিস্থিতি অনেক ভালো। অফিসে, দোকানে চাকরি করে কত জোরগার হয়? তাঁরা গো গো ডান্সিং বারে এক রাত্রের টিপস থেকেই অন্যান্য চাকরিতে যা সারা মাসের রোজগার তাই তুলে নেন। সেরকম পরিশ্রম করলে এক রাত্রে প্রায় হাজার ডলার পর্যন্ত রোজগার করা যায়। আমেরিকাতে এখন অন্তত দুশো পঞ্চাশ হাজার মহিলা আছেন, যাঁরা কোনও বা কোনও সময়ে টপলেস ডান্সিং করে রোজগার করেছেন।

এমন বহু পুরুষ আছেন যাঁদের কাছে এ ধরনের ক্লাবগুলি সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে হয়। তাঁরা বলেন—নারীদেহের বিশেষ অংশ প্রকাশ্যে প্রদর্শন এবং তার জন্যে পুরুষের দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে কুরুচিকর প্রবণতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ফ্যামিলি রিসার্চ কাউনসিল নামে ওয়াশিংটনে একটি সংগঠন আছে। তাঁরা সম্মিলিত প্রতিবাদের মাধ্যমে এ কথাই বলেছেন যে—ডান্সিং বারে নারীকে পুরুষের উদগ্র কামনার-বস্তু হিসেবে উপস্থিত করা হয়। পুরুষের চোখ যখন তাকে শুধুমাত্র বিকৃত বাসনার মধ্যে দিয়ে দেখে, তখন সমগ্র নারী সমাজের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। সেই পরিবেশ ধর্ষণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। শুধু বারের মধ্যে নয়, তার বাইরেও যৌন আবেগের তাড়নায় তারা শিকার খুঁজে বেড়ায়। ফলে যে কোনও পিতার পক্ষে তার কন্যার জন্যে আতঙ্কিত হওয়ার কথা। যে কোনও ভাইয়ের তার বোনের জন্যে দুশ্চিন্তা হবার কথা। কারণ তাদের জন্যে পথে ঘাটে অপেক্ষা করছে কিছু বিকৃতরুচির অসুস্থ মানুষ। নাইট ক্লাবগুলো তাদের বিকৃত বাসনার ইন্ধন জোগাচ্ছে।

টপলেস বার প্রসঙ্গে সকলের অভিমত এক হওয়া সম্ভব নয়। কোনও কোনও পুরুষের মতে নীতিবোধের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কে কোথায় সন্ধে কাটাবে, কী করবে, সে তার নিজের রুচির ব্যাপার। মেয়েদেরও জবরদস্তি করে এ পেশায় আনা হয় না। সুতরাং এ সব ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকরা তাদের খুশি মতো চলতে পারে। আইন করে বন্ধ করার কোনও প্রশ্ন নেই। কারণ নাইট ক্লাবে যাওয়ারও তো কোনও সামাজিক চাপ নেই।

'গো গো ডান্সিং বারে' মাঝে মাঝে মহিলা দর্শকদেরও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা প্রধানত যান কৌতূহল মেটাতে। এক আধবারের পরেই অনেকের শখ মিটে যায়। কেউ আবার আফসোস করেন—পুরুষদের দিগম্বর নৃত্য দেখা হলনা বলে। সে জন্যে অবশ্য অন্য ক্লাব আছে। কোনও কোনও মহিলা বলেন—এসব নাচ হচ্ছে আধুনিক শিল্পকলার যথার্থ বিকাশ। শান্তনুর হাউজ ওয়ার্মিং পার্টিতে অনসূয়া বলেছিল—আর্ট হিসেবেই দেখা

উচিত আমাদের।

অভিজাত টপলেস নাইট ক্লাবে নাচিয়ে মেয়েদের নির্দিষ্ট কিছু ডিউটি থাকে। এক তো নিচু স্টেজের ওপর নেচে বেড়াতে হবে। তারপর ফ্লোরে নেমে এসে টেবিলে টেবিলে ঘুরে অতিথিদের মনোরঞ্জন। কণ্ঠে যৎপরোনাস্তি মাদকতা ঢেলে প্রশ্ন করতে হবে।—ডিনারের পর শুধু তোমার টেবিল ঘেঁষে আলাদা নাচব তো? অতিথি যদি রাজি হন তো বাড়তি কুড়ি ডলার দেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। তখন টপলেস থেকে বটমলেস। টেবিল ঘিরে দিগবসন নৃত্য। এর ওপরেও আছে। তার নাম কোল ঘেঁষা নৃত্য। দর্শকের দুই হাতের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে মোহিনী আট্টম্। কিন্তু আসলে ধরি মাছ না ছুঁই পানির ট্রেনিং। কুড়ি ডলার কবুল করেও এদের ধরা ছোঁয়া যাবে না। নাইট ক্লাবের নিয়ম হচ্ছে লাস্যময়ী দিগম্বরী যতই কোল ঘেঁষে ঘেঁষে নাচুক, দর্শককে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। হাত বাড়ালেই শ্লীলতাহানির মামলা ঠুকে দেওয়া যাবে। রামের অগ্নিপরীক্ষা। এর পরেও ক্লাইম্যাক্স পর্ব। কোল ঘেঁষতে ঘেঁষতে ইভ্ কুমারী একেবারে স্যুট পরা আদমকুমারের কোলে বসে পড়বে। আদমকুমারের তাতেও কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার রাইট নেই। উলটে ধ্যান মুদ্রায় বসে থাকা। আর্ট হিসেবে দেখতে দেখতে শিল্পকলার পুজোয় যেন তার নিবেদিত প্রাণ।... দেহের সীমা গেল পারায়ে...।

ধ্যান ভঙ্গ হলে দেখা যাবে মেনকা কৌপিন পরে ফেলেছে। তখন সেই কৌপিনের আনাচে কানাচে বখশিসের ডলার গুঁজে দিয়ে আনমনে বাড়ি ফেরা। মেনকা, রম্ভারা আর তার সঙ্গে আমড়াগাছি করতে আসবে না। নাইট ক্লাবের বাইরে তারা কোনও মুনি-ঋষির সঙ্গেই সম্পর্ক রাখার অনুমতি পায় না। জানতে পারলে চাকরি খতম। অতএব নিঝুম রাতে সঙ্গ পাওয়ার উপায় নেই।

ইদানীং বড় বড় ব্যবসায়ী, অফিসের কর্তা ব্যক্তিরা দিন দুপুরে অভিজাত টপলেস ক্লাবে এসে মিটিং করছেন। লাঞ্চ মিটিং-এ নয়তো কনফারেন্স চলাকালীন যা কিছু দৃষ্টিসুখের উল্লাস। তবে ভুলেও তাঁরা সহকর্মিনী, সেক্রেটারি বা ব্যবসায়িক সূত্রে জড়িত কোনও মহিলাকে সঙ্গে আনেন না। সুস্থ রুচি সম্পন্ন কোনও মহিলা চাকরি খাতিরেও এখানে আসতে চাইবেন না। নেহাত যদি ভুজুং ভাজুং দিয়ে আনা যায়, তো ভদ্রলোককে সেক্শুয়্যাল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগে ফাঁসিয়ে দিতে কতক্ষণ? ভদ্রমহিলাকে পাশে নিয়ে কাজের কথা আলোচনা করার ছুতো করে অন্য মেয়ের উন্মুক্ত বক্ষ দর্শন—এর ফলে নারীত্বের অবমাননা, তাকে স্থূল এবং নগ্ন ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা রুচি বিকার—কতরকম অভিযোগ তো আনা যায় লোকটির বিরুদ্ধে। সুতরাং ও সব ঝুঁকি কেউ নেবে কেন? "ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর ফিমেল একজিকিউটিভস" থেকে দিনদুপুরে মিটিং করা নিয়ে ভীষণ প্রতিবাদ উঠেছে। তাদের মতে—আইন করে টপলেস বারে কোম্পানির মিটিং বন্ধ করা উচিত। ওখানে কোনও কাজের পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব নয়। যা হয়, সে সবই পুরুষের দৃষ্টিসুধা নিরসনের ঢালাও বন্দোবস্ত।

কেন এত সম্ভ্রান্ত মানুষজন ওই সব জায়গায় নিছক সময় কাটাতে যান? নিজেকে পুরনো ভূমিকায় ফিরে দেখতে চান বলে? নারী আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে তাঁদের অধিকার বোধের ভিত্তি দুর্বল হয়ে আসছে—এই অনিশ্চয়তা থেকেই কোনও আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা

কি? একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ক্রমশ আমেরিকার মেয়েরা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ভীষণভাবে সচেতন, সক্রিয় এবং অংশত সফল হয়ে উঠছেন। নারীমুক্তি আন্দোলন অব্যাহত থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের বহু অনুশাসন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত মেয়েদের ওপর সেভাবে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে না পারার দরুন পুরুষের মনে ক্ষমতা হারানোর প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ থেকে এ ধরনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁরা ফিরে পেতে চাইছেন এমন এক জগৎ, যেখানে এখনও পৌরুষের বিশেষ আবেদন আছে। বিশেষ অর্থ আছে। সেখানে নারীকে একমাত্র 'রমণী' হিসেবেই পাওয়া যেতে পারে, যে তাঁর চোখের ইশারায় কাছে আসবে, অর্থের বিনিময়ে দেহ সম্ভার মেলে আসবে, অর্থের বিনিময়ে দেহ সম্ভার মেলে দেবে। নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর উদ্বেগ থেকে এক অস্থায়ী জগতে ফিরে গিয়ে, আবার তাকেই ভোগ্য বস্তু হিসেবে সেখানে দেখে স্বস্তি পাচ্ছেন। এই সম্পর্কটিই তাঁদের পরিচিত। মারমুখী নারীমুক্তি সংগ্রামীরা যেভাবে প্রতিপদে তাঁদের পুরনো অভ্যাসে এবং কায়েমি স্বার্থে ঘা দিয়ে চলেছে—সংসারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র 'সেকশুয়াল হ্যারাসমেন্ট' আর 'সেকশুয়াল ভায়োলেন্সের' নামে তাঁদের অপরাধী প্রতিপন্ন করছে, এর পরে আর নারীর মাধুর্য বলে কী অবশিষ্ট থাকে? অন্যদিকে, হঠাৎ হঠাৎ বিয়ে ভেঙে যায়। এইডস-এর ভূত তাড়া করে ফেরে শয়নে স্বপনে। নারীসঙ্গ বলতে যা একটু আনন্দ, তা যদি পাওয়া যায় এই টপলেস নাইট ক্লাবগুলোতে, তো মন্দ কি? এদের খানা দানি পরিবেশে ঢুকলে তো মনেও হয় না কোনও সস্তার মজা লুটতে এসেছি। তবে এই ভাল এই ভালো। শুধু চোখের আলোয় দেখা ছাড়া তো কিছু নয়। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাকো...।

যাদুগোপালের নাচ মনে পড়ছে।

৩১ অক্টোবর ১৯৯২

টিভি বর্জন নয়, নির্বাচন

টিভির আর এক নাম ইডিয়ট বক্স। যারা সকাল সন্ধে ওই বাক্সর সঙ্গে গঁদের আঠার মতো সেঁটে থাকে, তারা হচ্ছে টিভি গ্লু। আমিও খুব 'বোকা বাক্স' দেখি। দূরের জানলা থেকে রিমোট টিপে বিশ্বরূপ দর্শন। এই দেখছি তুষারঝঞ্ঝা, তো ওই দেখলাম দাবানল। এই বসনিয়ার লড়াই, তো ওই রক্তাক্ত হেব্রন। শুধু লিখিত রক্ত খরচের হিসেব নিতেই প্রহর পার হয়ে যায়। দায় অনেক। রবিবারের সকালে আপনাদের হাল হকিকতের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ভারতীয় প্রযোজকদের চ্যানেলে মন দিয়ে দেখি—হরষদ মেহতার স্যুটকেস আর অপরিমেয় ঘেরের মুখচ্ছবি। এলোকেশী অনুরাধা পড়োয়াল চুলে ক্লিপ লাগিয়ে মন্দিরে মন্দিরে গান গাইতে বেরিয়েছেন। মনমোহন সিং-এর বাজেটের খবর। ওই বোকা বাক্স আছে বলেই চার দেওয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে, সাজিয়ে নিয়ে দেখি বাহির বিশ্বকে।

অবশ্য এ আসক্তি এমন প্রবল নয় যে, আমাকে সরাসরি টিভির আঠা বলা যাবে। সময়ের একটা ব্যাপার আছে তো? কর্মময় জগৎ। সংসার ডাকে—তোমার কর্ম তুমি করো মা। একই সঙ্গে বাইরে পাল্লা টানতে না পারলে সম-অধিকারের মুখে চুনকালি। সামান্য লেখালেখির বাসনা। তবু, আমার কাজের মাঝে মাঝে, দূরদর্শনে যা কিছু দর্শনযোগ্য, দেখা হয়ে যায়।

এদেশে বোকা বাক্সের পাল্লায় পড়া আমার মতো লোকই বেশি। হয়তো বাড়িতে তিনটে টিভি ঢুকিয়ে বসে আছে। সন্ধের পর যে যার মনোমত চ্যানেল খুলে, একমনে দেখে যাচ্ছে। একই পরিবারের মধ্যে অন্তত তিন, চার রকম দর্শক পাবেন। ধরুন, আমাদের বাড়িতে প্রতি সোমবার রাতে যদি কেউ কুস্তির নামে গজ-কচ্ছপ লড়াই দেখে, আমি কেন তা দেখতে বাধ্য হব? গামবুট আর জাঙ্গিয়া পরা দৈত্যদের বদলে আমি তখন পাবলিক ব্রডকাস্টিং চ্যানেলে ইতালিয়ান অপেরা দেখার প্রেরণা পেতে পারি। আমার মেয়ে একদিকে মন্থরা-ঝুঁটি বাঁধা জাপানিদের শুম্ভ নিশুম্ভ লড়াই আর অন্যদিকে অপেরার কোকিলকণ্ঠী গায়িকার 'মড়াকান্না'—দুই অনুষ্ঠানকেই অসহ্য বিবেচনা করে সাপ্তাহিক সিরিয়াল দেখার জেদ ধরতে পারে। ত্র্যহস্পর্শ সংঘাতের ফলে বোকা বাক্স নিয়ে টানাটানি। যে বাড়িতে ছেলে মেয়ে বেশি, তাদের মতানৈক্যের সমস্যাটা চিন্তা করুন। শিশুরা সহজেই জেতে। সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে জীবনে কম কার্টুন শো দেখেছি? বছরের পর বছর কার্টুন দেখতে দেখতে দৃষ্টিভঙ্গির সর্বনাশ হয়ে গেছে। আত্ম-পর নির্বিশেষে কত মানুষকে যে কার্টুনের চরিত্র বলে মনে হয়। বোকা বাক্স এই যা ক্ষতি করেছে।

এবারে লিখছি এমন কয়েকটি পরিবারের কথা, যাঁরা দূরদর্শন থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী। তাঁরা অন্যভাবে অবসর কাটানোর অভ্যাস করছেন। এঁদের শিশু সন্তানরা মিকি মাউস আর ডনাল্ড ডাকের কীর্তিকলাপ দেখার সুযোগ পায় না।

এরকমই এক মহিলার নাম ডেবরা। বছর দশেক আগের ঘটনা। কোলের মেয়েকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে লক্ষ করতেন, সে কেবলই ঘাড় মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিভি দেখার চেষ্টা করছে। এক বছরও মেয়ের বয়স নয় তখন। অথচ মায়ের দুধ খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে টিভি দেখছে। ডেবরা তখনই বুঝেছিলেন এ মেয়ে সময়কালে টিভি-র সামনে থেকে নড়বে না। তারপর থেকে মেয়েকে আর টিভি দেখার সুযোগ দেননি। টিভি না দেখেই মেয়ে দশ বছরের হয়ে উঠেছে। অবশ্য সামাজিক জীবনে তার একটু মুশকিল হয়। কারণ স্কুলের বন্ধুরা যখন টিভি সংক্রান্ত গল্পগুজব চালায়, সে যোগ দিতে পারে না। কিন্তু সে জন্যে তার কোনও আপত্তি নেই। তার ধারণা ওই বোকা বাক্সের সামনে রোজ ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকার চেয়ে বই পড়ে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। বাইরে খেলাধুলোর সময় পাওয়া যায়। মেয়েটি পড়াশোনায় খুবই ভাল। সব বিষয়ে 'এ' গ্রেড পায়। এর ওপর স্কুলের নাটকের গ্রুপে আর কোরাস গানের গ্রুপে সুযোগ পেয়ে নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যায়। তার ছোট বোনের বয়স পাঁচ বছর। সেও বিনা টিভি-তেই অভ্যস্ত। শুধু বছরে একবার দুই বোনে যখন দাদু, দিদিমার কাছে বেড়াতে যায়, সেই দু'সপ্তাহ সেখানে টিভি দেখতে পায়। তাও নাকি ওদের একঘেয়ে লাগে। ওইটুকু মেয়েদের মাথা ধরে যায়। দূরদর্শন তাদের মোটেই আপন করতে পারছে না।

এক ভদ্রলোকের নাম রিচার্ড। ছটি ছেলেমেয়ের টিভি দেখার জ্বালায় তাঁর বাড়িতে সর্বক্ষণ অশান্তি। ঠিকমত পড়াশোনা হচ্ছে না। অনবরত নানা শো দেখা নিয়ে তর্কাতর্কি। বছর তিনেক আগে ভদ্রলোক রেগেমেগে এক ছুটির দিনের সকালে টিভি বন্ধ করে দিলেন। ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। এদিকে রিচার্ড নিজেই হাঁপিয়ে উঠছেন। ছুটির দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে টিভিতে খেলা দেখার অভ্যাস। ছেলেমেয়েকে দাবড়ে রেখে, নিজে কোনমুখে টিভি খুলে বসবেন? অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলেন। আর সেদিনই বুঝলেন, তাঁর নিজেরই যদি এত নেশা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আর ছেলেমেয়েদের দোষ কী? তারপর টানা এক মাস বাড়িতে আর টিভি চলে না। ১৪ বছরের মেয়ে আর তার ভাই-বোনেরা মিলে বাবার বিরুদ্ধে আন্দোলনও চালিয়েছিল। লুকিয়ে কেবল কোম্পানিকে ফোন করে আবার কানেকশন করিয়ে দেওয়ার জন্যে কাকুতি মিনতি করেও ফল হল না। বাবার মত ছাড়া কেউ কিছু লাগাতে আসবে না। বাধ্য হয়ে ভাই বোনেরা বাবার জেদ মেনে নিল। দিনে ৫/৬ ঘণ্টা করে যাদের টিভি দেখার অভ্যেস ছিল, তারা নিরুপায় হয়ে অন্যদিকে মন দিতে চেষ্টা করল। আগে তো একজনও গল্পের বই বা ম্যাগাজিন পড়তে চাইত না। ক্রমশ দু-তিনজন বই পড়ার অভ্যেস করতে শুরু করল। দেখা গেল, টিভি দেখা বন্ধ করে দেওয়াতে ছ-ভাইবোনের অনেক সময় হাতে থাকছে। তারা কেউ স্যাকসোফোন বাজাতে শিখল। কারও জ্যাজ-মিউজিক শোনার আগ্রহ বেড়ে গেল। তাদের বাড়িতে সংস্কৃতির চর্চা বলতে আগে তেমন কিছু ছিল না। অথচ এই তিন বছরে বই পড়া, গান, বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার ফলে বাড়ির পরিবেশই বদলে গেছে। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করা, নানারকম ইনডোর গেম নিয়ে সময় কাটানো চলছে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবার কথাবার্তা অনেক বেশি হচ্ছে। আগে তারা সাতসকালে বাবাকে কাজে বেরিয়ে যেতে দেখত। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে তিনি সমানে টিভি দেখতেন। রাত হলে শুধু শুভরাত্রি বিনিময় করে শুতে যাওয়া। এখন টিভি দেখা বন্ধ। প্রত্যেক সন্ধেয় বাবা তাদের সঙ্গে নানাভাবে সময় কাটান। পড়াশোনায় সাহায্য করেন। দুটি মেয়ের স্কুলের রেজাল্ট এখন অনেক ভাল হচ্ছে। তারা নাকি নিজেরা যখন বড় হয়ে সংসার করবে, বাড়িতে টিভি ঢোকাবে না। বাবার একদিনের রাগারাগি থেকে পুরো পরিবারটির অভ্যেস বদল হয়ে গেল।

হেলেন নামে এক মহিলার বাড়িতেও টিভি দেখা নিয়ে কান্নাকাটি। তিনি বাচ্চাদের নিয়ম করে দিয়েছিলেন, ঠিক কতক্ষণ তারা টিভি-তে কী কী শো দেখবে। কিন্তু বাচ্চারা নাছোড়বান্দা। কেবলই অনুনয় বিনয় করে সময় বাড়িয়ে নিচ্ছিল। মারামারি, কাটাকাটির বই হলে তো কথাই নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে দেখবেই। শেষে হেলেন রেগে গিয়ে টিভি বিক্রি করে দেওয়াতে বাচ্চারা প্রথমে খুব দমে গেল। তারপর অন্যান্য খেলাধুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্কুলের হোম ওয়ার্ক সময়মত শেষ করা, গল্পের বই পড়া—দিনে দিনে তাদের সৎ গুণ বাড়তে লাগল।

আমেরিকায় বহু বাড়িতে অবশ্য টেলিভিশন দেখার সময় নির্ধারিত থাকে। দিনদিন যে ধরনের অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে, তার মধ্যে যৌন আবেদনমূলক ছবি, খুন, জখমের ঘটনা অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কদের উপযুক্ত বিষয়ের ছড়াছড়ি। দুপুরবেলা সি. বি. এস, এ. বি. সি ইত্যাদি নামী দামি চ্যানেলে 'সোপ অপেরা'-তে যে সব দৃশ্য দেখায়, তা সপরিবারে বসে দেখা

বেশ অস্বস্তিকর। অথচ স্কুলের ছুটি থাকলে যে কোনও বয়সী ছেলে, মেয়ে বাড়িতে একা একা অনায়াসে ওই সোপ অপেরাগুলি দেখতে পারে। এবং দেখেও থাকে। এজন্যে দূরদর্শনের সময় ও বিষয় নির্বাচনের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই অভিভাবকরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। প্রতিবাদে ফল একেবারে হয় না, এমনও নয়। যে জন্যে রাত ন'টা পর্যন্ত যা যা অনুষ্ঠান চলতে থাকে, তার মধ্যে আপত্তিকর দৃশ্য বিশেষ থাকে না। ধরে নেওয়া হয়, এরপরে ছোটরা শুতে চলে যাবে। কারণ সকালে স্কুলে যাওয়ার পর্ব আছে। তা ওই সন্ধের সময়ও তারা কী দেখবে, না দেখবে, তাই নিয়েও অনেক বাড়িতে কড়া নিয়ম জারি করা থাকে। তবে টিন এজারদের তো আর মেরে ধরে ঘুম পাড়ানো যায় না। তারা কেউ কেউ জাঁকিয়ে বসে অধিক রাতের শোগুলি দেখার চেষ্টা করে। বাবা, মার আপত্তিতে সব সময় কাজ হয় না। নির্ভর করে বাড়ির ডিসিপ্লিনের ওপর। 'শো' সংক্রান্ত ব্যাপারে টেলিভিশন কোম্পানিদের বেশি দোষারোপ করেও লাভ নেই। তাদের সোজা উত্তর—যে 'শো' আপত্তিকর বলে মনে হবে, দেখো না। ব্যস্। ল্যাঠা চুকে গেল।

যাঁরা টিভির বিরুদ্ধে, তাঁদের বক্তব্য—বাড়িতে টিভি না রাখাই সবচেয়ে ভাল। আর রাখলেও অল্প বয়সের জন্য নির্বাচিত ভাল অনুষ্ঠান ছেলেমেয়েদের দেখতে দেওয়া যেতে পারে। ক্রমশ এইভাবেই ছেলে-মেয়েদের মন থেকে টিভির কুপ্রভাব দূর করতে হবে। এর নাম বিষক্ষয়। মস্তিষ্ক শোধন হয়ে গেলে বাইরের সংস্কৃতির আকর্ষণে সে সাড়া দেবে। খেলাধুলো, পড়াশোনায় উৎসাহ পাবে।

সাধারণত টিভি যারা বেশি সময় ধরে দেখে, তাদের তুলনায় যারা একেবারেই দ্যাখে না, তাদের কি শেষ পর্যন্ত পড়াশোনায় খুব তফাত হয়? আসলে টিভি দেখা ব্যাপারটি এতই স্বাভাবিক ঘটনা যে, এসব নিয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণও সেভাবে হয়নি। তবে কানাডিয়ান রক্সি অঞ্চলের একটি ছোট্ট শহরে দেখা গেছে—টেলিভিশন আসার আগে পর্যন্ত স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার সামগ্রিক ফলের হার অনেক উন্নত ছিল। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সেখানে টিভি এসেছিল। তার দু'বছরের মধ্যে স্কুলের পরীক্ষার ফল খারাপ হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ সামগ্রিক ফলের হারের অবনতি হয়েছে। তবে মার্কিন সরকারের শিক্ষাদপ্তর কয়েক বছর আগে ওই একই উদ্দেশ্যে যে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংগ্রহ করেছিল, সেখানে কিন্তু অন্যরকম বলা হয়েছে। জানা গেছে—টিভি দেখার অভ্যেসের সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ফল ভাল না করার কোনও যোগসূত্র নেই। শিশুর ধারণাশক্তি অথবা পাঠ সংক্রান্ত বোধশক্তি তার মেধার ওপর নির্ভরশীল। টিভি দেখার জন্যে তার উন্নতি, অবনতি কিছুই হয় না। ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে গবেষণাও হয়ে গেছে। সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ টেলিভিশন অন চিলড্রেন—এই গবেষণা কেন্দ্রের সহ-পরিচালক জানিয়েছেন—দূরদর্শনের ভূমিকাকে কখনই অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে না। এই মাধ্যম থেকে ক্রমশ ক্রমশ ছাত্রছাত্রীরা বহু সাহায্য পাবে। বইপত্র থেকে যে ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, দূরদর্শনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান থেকেও সেই ভাবে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। স্কুল, কলেজের পাঠ্য বিষয়ের ওপর আমেরিকার দূরদর্শনে যে সব অনুষ্ঠান হয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা। এছাড়া রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও দূরদর্শনের অবদান অনেক।

অভিভাবকরা যদি মনে করেন, টিভি বন্ধ রেখে ছেলেমেয়েদের মস্ত উপকার করবেন, তবে খুবই ভুল হবে। একশতক পিছিয়ে গিয়ে হয়তো নিজেরা নস্টালজিক আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সমকালীন পরিবেশ থেকে বঞ্চিত করার দায় থেকে যাবে।

আমেরিকার টিভি কালচারের ওপর প্রাকৃতিক আবহাওয়ার কিছু প্রভাব আছে নিশ্চয়ই। বছরের মধ্যে চার, পাঁচ মাস শীতের সন্ধেয় ঘরে বসে টিভি দেখা, নয়তো মুভি হলে যাওয়া। কোনওদিন শহরের স্কেটিং রিংকে গিয়ে পায়ে চাকা বেঁধে চক্কর দেওয়া। ছোট ছোট শহরে শীতকালের উইক ডে-তে ভাল মন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও তেমন হয় না। গ্রীষ্মকালের জন্যেই যতকিছু আয়োজন। ছেলেমেয়েরা সে সময় ক্যাম্পিং, হাইকিং, ফিশিং, আউটডোর গেম ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। টিভি দেখার ঝোঁক সাময়িকভাবে কমে যায়। তবে টিভি এদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

শিকাগোতে ওয়ালডর্ফ স্কুল নামে একটি প্রাইভেট স্কুল আছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের দুরদর্শন দেখতে বারণ করা হয়। এক মহিলা তাঁর যমজ ছেলেদের সেখানে ভর্তি করেছেন। উইক ডে তে তাদের টিভি দেখার নিয়ম নেই। কিন্তু ছুটির দিনে যেই তারা টিভি দেখার অনুমতি পেল, সঙ্গে সঙ্গে গঁদের আঠার মতো সেঁটে বসে গেল। তারপর অনবরত ঝগড়া, ঘুসোঘুসি এবং পাঠে অমনোযোগ। সৃষ্টিমূলক কোনও কাজই নাকি তারা করতে রাজি নয়! এদিকে মার সে সময় রাজ্যের কাজ। ছেলেরা একটু নিজের মনে থাকবে ভেবে টিভি দেখতে বসিয়ে রান্নাঘরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের চুলোচুলির জ্বালায় কাজকর্ম মাথায় ওঠার জোগাড়। শেষ পর্যন্ত মহিলা দেখলেন—টিভি না দেখার দিনে এরা একরকম ব্যবহার করছে আর ছুটির দিনে সম্পূর্ণ অন্যরকম। ভূতে পাওয়া হাবভাব মোটেই বরদাস্ত করা উচিত নয়। তিনি টিভি-র প্লাগ খুলে রেখে দিয়েছেন। যমজ ছেলে দুটো নাকি ইদানীং ভীষণ ছবি আঁকছে!

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন—টিভি আর ভিডিও গেমস শিশুমনে আগ্রাসীভাব সৃষ্টি করে। তাদের স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে। মনসংযোগের ক্ষমতা আর কল্পনাশক্তিকে প্রতিহত করে।

গল্প শোনার জন্যে আমাদের ছোটবেলায় কী ভীষণ ঝোঁক ছিল মনে পড়ে? ভাল গল্প বলার ক্ষমতা যাঁর থাকত, তাঁকে ঘিরে যেন আসর বসে যেত। ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনার আগে অপরূপ রূপকথা দিয়েই আমাদের হাতে খড়ি। এদেশেও ফেয়ারি টেল শুনিয়ে ঘুম পাড়ানোর প্রয়াস চলে। তবে টিভি-র দর্শক হওয়ার মতো বয়সে পৌঁছলে, শিশুদের মধ্যে ধৈর্যের অভাব চোখে পড়ে। আমেরিকায় অডস বডকিন নামে একজন প্রফেশনাল গল্পদাদু আছেন। তিনি প্রত্যেক বছর দশ হাজার শিশু সমাবেশে গল্পের আসর খুলে বসেন। বডকিন একটি মজার জিনিস লক্ষ করেছেন। গল্প শুনতে শুনতে প্রত্যেক সাত মিনিট অন্তর অন্তর বাচ্চারা উশখুশ করতে থাকে। এর কারণ কী বলুন তো? টিভি-তে কমার্শিয়াল ব্রেক দেখার অভ্যেস। একটানা কোনও বিষয় তারা বেশিক্ষণ দেখতে পারে না। মাঝে বিজ্ঞাপনের মুখ বদল চাই। গল্পদাদুর পক্ষে কীভাবে সেই বৈচিত্র্য আনা সম্ভব? সাবান আর বিস্কুটের বিজ্ঞাপন দেওয়া তো আর তাঁর কাজ নয়? বডকিনও অভিজ্ঞ মানুষ, জানেন কীভাবে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখতে হয়। তিনি তাই গল্প বলার মাঝে মাঝে হঠাৎ বিরতি দেন। কিন্তু থেমে যান না। গান, বাজনা চালিয়ে দেন। নয়তো নিজেই গান

ধরেন। তবে সবচেয়ে জমে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর নকল করার আসরগল্পের ফাঁকে হরবোলা সেজে সেজে তাঁর সৃষ্টি করা একশোটি চরিত্রের গলায় কথা বলতে থাকেন। গল্পদাদুর নিজের তিনটি ছেলে আছে। তাঁরা শুধু ছুটির দিনে টিভি দেখার অনুমতি পায়।

ছোটদের টিভি দেখার সময় ঠিক করে দেওয়া অথবা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে যত উপদেশই দেওয়া হোক, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায়, কাজটি তত সহজ নয়। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছেলেমেয়েদের ওইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল। অনেক অভিভাবকের ধারণা—জনসাধারণ যা দেখছে, তার কিছু সম-সাময়িক আবেদন আছে। টিন এজারদের তা থেকে দূরে রাখার কোনও যুক্তি নেই। ভাল হোক, মন্দ হোক, নানা অনুষ্ঠান দেখতে দেখতেই তাদের বিচারশক্তি, রুচিবোধ নিজে থেকে গড়ে ওঠে। অধিকাংশ টিন এজার যে কালচারের সংস্পর্শে আসছে, তার বাইরে রেখে দেওয়ার মানে ওই বিশেষ কিশোর বা কিশোরীকে তার গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কম বয়স থেকে একেবারে নিজের মনে থাকতে পারার প্রবণতা তো সকলের থাকে না। হয়তো একটি মেয়ে ষোলো বছর বয়স পর্যন্তও টিভি না দেখে কাটিয়ে দিতে পারছে। কারণ তার বাড়িতে টিভি নেই। বন্ধুরা আশ্চর্য হয়ে যায়। মেয়েটি কী করে যে ভাল ভাল 'শো' না দেখেই বছরের পর বছর কাটিয়ে যাচ্ছে, তারা তো ভেবেই পায় না। কিন্তু মেয়েটির কোনও অভাব বোধ নেই। বাড়িতে সবাই গল্পের বই-এর ভক্ত। একসঙ্গে বসে কখনও কবিতা পড়া হচ্ছে, কখনও রহস্য উপন্যাস। একজন পড়ছে, বাকিরা শুনছে। মেয়েটির বক্তব্য—টিভি না থাকার ফলে তারা পারিবারিক জীবনে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তবে, ওই মেয়েটি ব্যতিক্রম। ওর বয়সী অন্যান্য ছেলেমেয়েদের অবসর বিনোদন বলতে টিভি দেখার ঝোঁকই প্রধান।

এদেশে বেবি সিটারের কাছে ছেলেমেয়ে রাখছেন মানে, সর্বক্ষণ টিভি-র সামনেই তাদের সময় কাটছে জানবেন। হয় আপনার বাড়িতে, নয় বেবি সিটারের বাড়িতে, একই পরিবেশ। বরং ডে-কেয়ার সেন্টার বা নার্সারি-তে দিলে সে সুযোগ নেই। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে কিছু শিশু-শিক্ষামূলক টিভি শো দেখতে দেওয়া হয়। এছাড়া শিশুদের জন্যে কার্টুন শো ইত্যাদিও বরাদ্দ থাকে। কিন্তু বেবি সিটারের কাছে রাখলে, সেই মহিলার ইচ্ছে অনুযায়ী টিভি চলবে। ভরদুপুরে সোপ অপেরা-তে যে সব নিবিড় আলিঙ্গন ও শয্যাদৃশ্য দেখানো হয়, বেবি সিটারের সঙ্গে বসে আপনার শিশুটিও মহা উৎসাহে সেসব উপভোগ করতে পারে। চাই কি নেশাও ধরে যেতে পারে। সেখানে আপনার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কাজের লোকের ওপর বেশি খবরদারি করলে কী হয় জানেন তো? বিশেষ করে, যার কাছে বাচ্চাকে সারাদিনের জন্যে রাখছেন, তাকে সন্তুষ্ট রাখতেই হয়। অনেকের ধারণা—বয়স্কা বেবি সিটাররা নাকি ওই সব উত্তেজনামূলক দুপুরের শো দেখতে চান না। বরং তাঁরা শিশুদের উপযোগী চ্যানেল খুলে রাখেন। কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। এক তো আমেরিকায় 'বয়স্কা' বলতে কী বোঝায়, সেই এক ধাঁধা। আর যাবতীয় জাগতিক ব্যাপারে এদেশের প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মহিলাদের বিপুল আগ্রহ যদি বজায় থাকে (লাস ভেগাসে বা অ্যাটলান্টিক সিটির ক্যাসিনোতে সবচেয়ে বেশি জুয়া খেলেন বৃদ্ধারা) তবে ভরদুপুরে 'ইয়াং অ্যান্ড রেস্টলেস' অথবা 'লাভ অফ মাই লাইফ' তাঁরা দেখবেন না কেন? অতএব

বেবি সিটারের বয়স কোনও বাধা নয়। যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা যিনিই সারা সপ্তাহ আপনার সন্তানের দায়িত্ব নিন, দিনমানে নিজের পছন্দের 'শো' তিনি অন্তত ঘণ্টা দুই তো দেখতেই পারেন। ছুটির দিনে টিন এজার বেবি সিটারের কাছে রেখে যদি কোথাও বেড়াতে যান, তখন বরং তার ওপর একটু চাপ সৃষ্টি করা যায়। তাকে বলে যাওয়া যায়—টিভি-র বদলে বই পড়ে শোনাবে। বাচ্চার সঙ্গে গেম খেলবে ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে কাজও হয়। কিন্তু সারা সপ্তাহের জন্যে কারও ওপর নির্ভর করতে হলে, পরিণত বয়সী সেই মহিলাকে নিজের ছেলেমেয়ের স্বার্থেও অত উপদেশ দেওয়া চলে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছোটদের টিভি দেখার সুযোগ নানাভাবে বজায় থাকছে।

গত বছরে একটি এলিমেন্টারি স্কুলে টিভি না দেখার সপ্তাহ পালন করা হয়েছিল। কিন্তু গোড়াতে প্রস্তাবটি মোটেই আমল পায়নি। এক সপ্তাহ বাড়িতে, স্কুলে, কোথাও একবারও টিভি খোলা যাবে না শুনে—ছাত্র-ছাত্রী, তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা আর অভিভাবকদের মাথায় হাত! কতভাবে কতজনকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ভাবা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেই কথা দিলেন! সপ্তাহ শেষে দেখা গেল মোট ৪০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শতকরা সত্তর জনের বাড়িতে টিভি চালানো হয়নি। পরে অভিভাবকরা জানিয়েছিলেন—ওই এক সপ্তাহ পরীক্ষা চালানোর ফলে কিছু কাজ হয়েছে। তাঁদের বাড়িতে টিভি দেখার নেশা একটু কমে গেছে। এক সপ্তাহ টিভি না দেখে থাকার পরে ছেলেমেয়েরা নাকি বুঝেছে, অন্যভাবে সময় কাটানোর মধ্যেও মজা আছে।

দ্য প্লাগ-ইন-ড্রাগ নামে একটি বইতে টেলিভিশনের নেশাকে মাদকাসক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লেখিকার খুব রাগ হয়েছে সারা দেশের বাবা-মায়েদের ওপরে। কারণ, তাঁরাই বেশি নেশাগ্রস্ত। ছেলে, মেয়েদের দোষ দিলে কী হবে? টিভি তো বাবা, মা-ই কিনে এনেছেন। সন্ধে লাগতে চালিয়ে দিয়ে বসছেন। হেন অনুষ্ঠান নেই দেখছেন না। শুধু মাত্র খবর শুনে আর কে টিভি বন্ধ করে দেয়? এ জন্যই ছেলেমেয়েদেরও ঝোঁক বেড়ে চলেছে। যতদিন না বাবা, মায়ের চেতনা হবে, ততদিন ছেলেমেয়েদের স্বভাব শোধরানোর প্রশ্ন ওঠে না।

লেখিকা খুব সত্যি কথা বলেছেন। আপনি আচরি ধর্ম সন্তানে শিখাও। আমার কী কর্তব্য? সত্যি ধর্ম সন্তানে শিখাও। আমার কী কর্তব্য? সত্যি বলতে কি, না আমার প্রবল নেশা আছে, না আমার সন্তানের বয়ে যাওয়া বয়স। বরং ইদানীং টিভি দেখার জন্যে কতভাবে উপকৃত হচ্ছি। ছুটির দিনের সকালে ভারতীয়, পাকিস্তানি চ্যানেল বদলে বদলে এমন ব্যস্ত থাকি যে, তুচ্ছ খাওয়া-দাওয়ার দিকে মন দেওয়ার সময় পাই না। জলখাবারের বদলে ফলখাবার চালু করে দিয়েছি। ডিম, হ্যাম, বেকন, সসেজ আর কেন? তারচেয়ে আপেল, কলা, আঙুর অনেক বেশি উপকারী। ঝুড়ি থেকে নাও আর খাও। বাসনেরও দরকার নেই। পাঁউরুটি টোস্টারে দিয়ে এক ছুট্টে পাকিস্তানি 'খবরনামা' শুনে আসি। ইন্ডিয়াকে কী গালাগাল কী গালাগাল! 'হিন্দুস্থান কে ফৌজের' বাপান্ত! আবার জ্যামের শিশি হাতে চ্যানেল বদলেই দেখি নরসিমা রাও-এর চোখের কোল ফুলে ঢোল। বোধহয় ফল খাওয়া দরকার। টিভি আমাকে ক্রমশ পরিবারের ও দশের সু-স্বাস্থ্য রক্ষার শিক্ষা দিচ্ছে। পরিশ্রমসাপেক্ষ জলখাবারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করছে।

তা বলে চিরকাল তো আর এত কিছু জানিনি। যখন আমেরিকায় ভারতীয় প্রোগ্রাম হত না, তখন যে কত তেলেভাজা ভেজেছি। প্রথম ভিশন অফ এশিয়া আমাদের রক্ষা করল। এক রবিবার সকালে পথের পাঁচালি-র কিয়দংশ দিয়ে বউনি করেছিল। এদিকে লুচির ময়দা মাখা। তারপর যা হল, সে এক অশ্রুসজল কাহিনী। কিয়দংশ শেষ হতে না হতে বাঙালির ফোনাফুনি। পাবলিক ব্রডকাস্টিং চ্যানেলে নাকি পুরোটাই দেখাচ্ছে। আবার চ্যানেল চেঞ্জ। অবিরাম অশ্রুধারা। সদ্য আসা প্রবাসী কন্যারা তখন রোগা 'অপুর' মধ্যে সহোদরকে খুঁজে পাচ্ছে, নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামে ফেলে আসা ভারতবর্ষ। আর লুচি ভাজা যায়? হরিহর আর সর্বজয়ার দারিদ্র্য, শোক সব কিছু আমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। এমনই চলতে থাকল প্রতি রবিবার। সকাল হলে সত্যজিতের কিয়দংশ, আর পরে পাবলিক ব্রডকাস্টিং চ্যানেলে 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', নয়তো 'পোস্ট মাস্টার', শ্রমসাপেক্ষ জলখাবার আর শক্তিতে কুলোয় না। 'অশনি সংকেত' দেখে সামান্যই জলযোগ। বিষণ্ণতা এমন জিনিস! দুঃখ দিতে হিন্দি ছবিও কিছু কম যায় না। সাতসকালে 'আনন্দ' দেখিয়ে সারাদিন নিরানন্দ রাখার ফন্দি। বেলা এক প্রহরে 'দিওয়ার' দেখিয়ে হাহাকার সৃষ্টি। ওদিকে পাকিস্তানি প্রোগ্রামে গালিগালাজ খতম। ফনকার মেহেদি হাসান গাইছেন—জিন্দগি মে সবহ পেয়ার কিয়া করতেঁ হ্যাঁয়...ম্যায় তো মর কর ভি তুঝে চাহুঙ্গা...ম্যায়নে কিসমৎ কি লকিরোঁ সে চুরায়া তুঝে...।

এরপর রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকের একটি মাত্র সংলাপই বলা যায়—লুচি? লুচি তো আমি ভাজিনি!

এদেশের টেলিভিশনে এমন বহু অনুষ্ঠান হয়, যার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব নেই। শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাচক্র থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে যে ধরনের অনুষ্ঠান প্রতিদিন হয়ে থাকে, তার মান খুবই উন্নত। রাজনৈতিক তর্কবিতর্কমূলক অনুষ্ঠান, ভৌগোলিক তথ্যচিত্র, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সাম্প্রতিক পর্যালোচনা ইত্যাদি সর্বক্ষণই কিছু না কিছু হয়ে চলেছে। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের নিবেদন এতই বেশি যে, আপনার রুচি অনুযায়ী বেছে নেওয়ার সমস্যা নেই। কেবল চ্যানেল থাকলে দিগন্ত আরও প্রসারিত। টেলিভিশনে এমন অনুষ্ঠান তো নিশ্চয়ই দেখবেন, যা আপনার 'ভিশন'কে সম্প্রসারিত করে। ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও সেই নীতি অবলম্বন করতে পারেন। টিভি বর্জন নয়, নির্বাচন।

৯ এপ্রিল ১৯৯৪

শিশু বনাম রবীন্দ্রনাথ

মাস বৈশাখ। সদ্য লীলা মজুমদারের 'পাকদণ্ডী' শেষ করেছি। মে মাসে লেখা চিঠিতে একবারও রবীন্দ্রনাথের কথা থাকবে না—এ হয় না। পরশু ভোররাতে দাড়িওলা ভারী সুপুরুষ একজনকে স্বপ্ন দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য স্বপ্নের চাররকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথম শনিবারে নিউ ইয়র্কে গিয়ে বেদান্ত সেন্টারের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান দেখলাম। বিবেকানন্দের জীবন নিয়ে চার অঙ্কের নাটক হল। দুই অঙ্ক জুড়ে দক্ষিণেশ্বরের দৃশ্য। যে ছেলেটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেজেছিল, তাকে নকল দাড়িতে খুব মানিয়েছিল। বার বার স্পট লাইটে তার মুখ দেখিয়েছে। আমেরিকায় বড় হওয়া গুজরাতি ছেলের অভিনয় দেখে বেদান্ত সেন্টারের স্বামীজিরাই মুগ্ধ। আমরা তো 'একেবারে ছোট গুরুদাস' বলতে বলতে বাড়ি এলাম। তা সেই দাড়িওলা মুখ স্বপ্নে দেখতেও পারি। দ্বিতীয়ত 'পাকদণ্ডী' পরিক্রমা হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোরের দাড়িওলা ছবির সঙ্গে সত্যজিতের আদল আছে কি নেই—এমত গবেষণায় ছবিটি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছি। সব মিলিয়ে ভোরের স্বপ্নে দাড়িওলা মহাপুরুষ ও মনীষীদের সমাহার হয়ে থাকবে।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময় হল। ৮মে রবিবার পড়েছিল। যাকে বলে দিনক্ষণ দেখে উৎসব করার কথা। কিন্তু দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিবাহ এবং মাতৃত্ব। না, একদিনে এমন কাণ্ড হয় না। বিবাহ হল আমাদের পরিচিত একটি ছেলের। সারা নিউ-জার্সির শ আড়াই লোক নেমন্তন্ন পেয়ে 'আকবর' রেস্তোরাঁয় যাচ্ছি। আর মাতৃত্ব হল অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ওইদিন মাদার্স ডে। ক্যালেন্ডারে যেমন যেমন লিখবে, তেমন তেমন হবে। ছেলে-মেয়েরা বিয়ে বাড়িতে মাকে পেয়ে যাবে বলে ওই দিনের মতো আমেরিকান রেস্তোরাঁয় গিয়ে মাদার্স ডে সেলিব্রেশন মুলতবি রেখেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শাজাহানকে করায়ত্ত করলেও আকবরের সঙ্গে পেরে ওঠেননি। আচ্ছা, দুপুরে রবীন্দ্র জয়ন্তী আর সন্ধ্যায় বিয়ে বাড়ি হতে পারত না? অসম্ভব? একদিনে এত উচ্ছ্বাস সামাল দেওয়া যায় না। কটকটে রোদে কক্‌টেল পার্টির জন্যে আগাম সাজগোজ করে বেরনো যায়? তসর, মুগা থেকে ঝট করে তাঞ্চোই, জামেয়ারে শিফট করো, জুতো বদলাও, ব্যাগ বদলাও—ঝঞ্ঝাট অনেক।

তাই আমরা ১৪মে রবীন্দ্রনাথের দিন ফেলেছিলাম, যারা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন পায়নি, তাদের মধ্যে ছোট্ট একটা দল ৮ তারিখে 'কবি বন্দনা' করেছে। বাদ বাকিরা, মানে নিউ ইয়র্কেও কোথাও কোথাও ওইদিন হয়েছে। আর যে সব ক্লাবে মায়ের দাবি অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত, তারা 'মাদার্স ডে' দিনটি বাদ দিয়ে পরের উইক এন্ডই প্রশস্ত মনে করেছে।

এবার আমাদের খবর বলি। রবীন্দ্র জয়ন্তীর শুরু সেই ক্লাব প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই। ষোলো, সতেরো বছর ধরে কখনও চার্চের হলে, কখনও ইউনিভার্সিটির হলে অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। দু'বার সুচিত্রা মিত্র, একবার বনানী ঘোষ ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন গান গেয়েছেন। এছাড়া স্থানীয় অনুষ্ঠান বলতে নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাটকের অংশ বিশেষ অভিনয়, শ্রুতি নাটক, গীতি আলেখ্য, রবীন্দ্র সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি যেমন সচরাচর হয় আর কি! হ্যাঁ, দেশের শিল্পী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও গত রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ভাল

গান গেয়ে গেছেন।

শিশুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যে কত মধুর ছিল, সে কথা তো তাঁর আজীবনের সাহিত্য কর্মেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আমার লেখার নামকরণে সে কথা প্রকাশ পাচ্ছে কি? 'বনাম' আবার কী কথা? শিশু ভোলানাথদের সঙ্গে রবি ঠাকুর কি যুদ্ধে নেমেছেন? না ক্রিকেট খেলেছেন? এরকম কষ্টকল্পনা করা উচিতও নয়। সব কথা খোলসা করে বলি আগে, তবেই নামকরণের কারণ অনুধাবন করতে পারবেন।

ক্লাবের গোড়াপত্তনের পর বরাবরই দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিভার স্ফুরণের দিকে কড়া নজর দেওয়া হত। যদিও তখন সদস্য ছিল সর্বসাকুল্যে ছাব্বিশজন। ছোট ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও হাতে গোনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তাদের চেনা দরকার। ক্লাব থেকে একটা ঢালাও চিঠি দেওয়া হত। যাঁরা ছোটদের প্রতিভা বিকাশে আগ্রহী, তাঁরা যেন অমুক তারিখে রবীন্দ্র জয়ন্তীর রিহার্সালে সসন্তানে উপস্থিত থাকেন। গুট গুট করে যে কটি বাচ্চা আসত, কি পাঁচ/সাত জন টিন-এজার, তাদের অপূর্ব অনুবাদ সহযোগে, নাচ, গান শিখিয়ে বেশ সুন্দর অনুষ্ঠান করানো হত। মনে আছে, সচিত্র শিক্ষাও দিয়েছি। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন প্রথম পর্বে তারা নেচে, গেছে, হাততালি পেয়ে স্টেজ ছেড়ে দেওয়ার পর, বাবা, মায়েদের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত পটুত্বের যথেচ্ছ প্রকাশ। সবশেষে কচুরি, আলুর দম আর বাড়ির তৈরি পান্তুয়া। তারপর স্টেজ পরিষ্কার, রবীন্দ্রনাথের ছবি চাদর দিয়ে মোড়া, হারমোনিয়াম, তবলা ফেরত দেওয়া, ধূপের ভস্মাবশেষ নিশ্চিহ্ন করা, সাদা চাদর, লাল কার্পেট গুটিয়ে পাশ বালিশের স্টাইলে তুলে দেওয়া, উদবৃত্ত পান্তুয়া ভাগাভাগি। পেল্লায় ট্রে ভর্তি খয়েরি রস লুকিয়ে লুকিয়ে চার্চের রান্নাঘরের সিংকে ঢালার ফলে বনস্পতি জমে গিয়ে রসের বানভাসি, প্রবল বেগে গরম জল চালিয়ে দিয়ে হাতা সহযোগে পাইপের মুখে আন্দোলন সৃষ্টি, বিদায় বেলায় হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া ফুলদানি যুগল থেকে পরস্পরকে ফুল বিতরণ—এই ছিল বার্ষিক অনুষ্ঠান। কদম ছাঁট দেওয়া গোলগাল ছেলেগুলো আমাদের হাতে আঁকা চোখ, ভুরু, গোঁপ, লিপস্টিক মুছে ফেলে দৌড় দিত। ঝুঁটি বাঁধা মেয়েগুলো আইশ্যাডো মুছতে দিত না। একবার কার যেন ছোট্ট মেয়ে আনমনে গান ধরেছিল—পেমের যোগাড়ে ভাসাবো ডোয়ারে...।

মাঝে অনেক বছর চলে গেছে। যথাকালে তার প্রেমের জোগাড় হয়ে বিয়েও হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তদ্ভব বাণী নিয়ে অত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেশে এক নাচের মাস্টারমশাই 'শ্যামার' রিহার্সালে বজ্রসেনকে 'জেনো প্রেম চিরঋণী' নাচটি শেখাতে গিয়ে 'কালিমার' পরশের সময় দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে মাকালীকে স্মরণ করেছিলেন। আর এরা তো শিশু! আহা! আরও তদ্ভব শব্দ শুনেছি। একবার বঙ্গ সম্মেলনের সময় শিশুদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আর আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। পরীক্ষা চলার মধ্যেই উদ্যোক্তারা দূর থেকে আসা বিচারকদের চা আর স্ন্যাকসের প্লেট ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বকর্ণে শুনেছিলাম বছর পাঁচেকের একটা মেয়ে 'সোনার হরিণ চাই' গাইতে বসে অন্তরায় বড় উদাস সুরে বলেছিল—'তোরা খাবার জিনিস হাতে কিনিস। রাকিস ঘরে ভরে...' আমরা জলখাবার নিয়ে অপ্রস্তুত। পরে আবার অন্য এক বিচারক বললেন, তিনি নাকি শুনেছেন মেয়েটা গাইছিল—'তোরা বাবার জিনিস হাতে কিনিস।' শিশুদের কী সংযম! বিচারকদের

বলছে—হয় তোরা নিজে হাতে কিনে খা, নয় বাবার জন্যে কিনে আন্। তদ্ভব বাণীর এই ভাবেই উদ্ভব হয়।

হ্যাঁ, আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে যাই। ওই যে বছর বছর ছোটদের নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। ক্রমাগতই তার জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। পপুলারিটি মানেই পপুলেশন বৃদ্ধি। সদস্য সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। ব্যাচেলাররা বিয়ে করে সংসার বড় করছে। যারা নববিবাহিত ছিল, তাদের ছেলে, মেয়ে হতে আরম্ভ করেছে। কারও একটি থেকে দুটি। মোটমাট অবস্থা এমন দাঁড়াল যে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে ওদের নিয়ে ঘণ্টাখানেক নৃত্যনাট্য না করলে সবাইকে স্টেজে তোলা যায় না। আমরা তিন ডলার করে টিকিট করে দিলাম। তাতেও উৎসাহী বাবা মায়ের আপত্তি নেই। দখিন দুয়ার খোলাতে জগাই মাধাইরা এসো হে এসো হে করে গোঁপ নাচিয়ে হাসছে। কচি কচি কণ্ঠের আবৃত্তি, গান, বেশ লাগছে সকলের।

কিন্তু বেশিদিন এ ধারা বজায় রাখা গেল না। একটু বড় হলে ছেলেরা মোটেই নাচতে, গাইতে রাজি হয় না। মেরে ধরে তো আর রবীন্দ্রচর্চা হয় না। 'তোতাকাহিনীর' পাঠকরা পাখির ছানার গলায় বাংলা কালচার ঠুসে দেওয়া পছন্দ করে না। ভেবেচিন্তে অন্য উপায় স্থির হল। ইচ্ছুক ছেলে-মেয়েরা সবাই বড়দের শেখানো রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্যে অংশ নেবে। বাকিরা পাঁচ মিনিট করে সময় পাবে। যে যা কিছু অন্যত্র শিখেছে, তাই করে দেখাবে। ট্যালেন্ট শো আর রবীন্দ্রজয়ন্তী একদিনে।

বিচিত্রানুষ্ঠান কাকে বলে দেখলাম। শিব্রাম চক্রবর্তীর 'আবার হাঁসের ডাক' কিংবা হারমোনিয়ামের কালো রিডগুলো বাজাতে জানার বিশেষ ক্ষমতা সহযোগে 'আকাশে চাঁদ ছিল রে' গানের জলসার মতো বৈচিত্র্যের ছড়াছড়ি। দুপুর বারোটার মধ্যে নির্ধারিত শিল্পীরা এসে উপস্থিত। আমরা নেহরু দিবসের স্টাইলে রবীন্দ্রনাথের শিশুপ্রীতির ওপর আবেগমথিত ভূমিকা দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করে দিতাম। খেরোখাতা খুলে মাইকে নাম ডাকা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মঞ্চে আবির্ভাব। যন্ত্রপাতি নিয়ে বাবা, মা ঝড়ের বেগে পৌঁছে যাচ্ছেন। নয়তো পাঁচ মিনিটের থেকে এক মিনিট নষ্ট হয়ে যাবে। সময়ের ব্যাপারে নির্মম হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তারপর কয়েক ঘণ্টা ধরে স্বতঃস্ফূর্ত নিনাদ। কেউ ট্রামপেট বাজাচ্ছে, কেউ সাকসোফোন, কেউ সিন্থেসাইজার, কেউ টুঁই টুঁই করে হাওয়াইয়ান গিটারের সঙ্গে গাইছে। একদল জোর মহড়া দিয়ে ব্যান্ড তৈরি করেছে। দমাদ্দম ড্রামের সঙ্গে সোমের মাথায় ঝাঁই করে কাঁসরে লাঠির বাড়ি। তাদের লিড সিঙ্গার দুর্দান্ত রক মিউজিক গাইছে। মাইকের তার টানতে টানতে স্টেজের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো সতত সঞ্চরমান। অথচ এই ছেলেটাকে গত বছর 'আমার মা না হয়ে তুমি আর কারো মা হলে' আবৃত্তি শেখাতে গিয়ে তার মা নাস্তানাবুদ। যাইহোক, বিচিত্রানুষ্ঠানে মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেনি। যারা নৃত্যনাট্যে ঢুকে পড়েছিল তারা ছাড়া অন্যেরা ট্যাপ ডান্স, ব্যালে, বেহালা, বাঁশি, পিয়ানো—সুরের সুরধুনি বইতে দিল। কেউ নিজের লেখা কবিতা, ইংরেজি গল্প, চুটকি পড়ে শোনাচ্ছে। সদস্যদের আত্মীয়স্বজনের ছেলে-মেয়েরা অন্য স্টেট থেকে এসে ট্যালেন্ট শো করে যাচ্ছে। আমরা ঝপাঝপ কড়ি ডলারের রসিদ কেটে তাদের ক্লাবে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। একদিনে লক্ষ্মী সরস্বতীর আরাধনা। অনুষ্ঠান সূচির দৈর্ঘ্য বাড়তে বাড়তে এমন দাঁড়াল যে বড়দের গীতিআলেখ্য ছাঁটাই করলেই সময়ে কুলোনো যায়। দিকে

দিকে ক্লাবের জয়গান। ছোটদের জন্যে এমন 'জয়' (Joy) ও গানের বন্দোবস্ত কোথাও নেই। আবার দুর্গাপুজোতেও তাদের নিয়ে বড় করে অনুষ্ঠান হয়। বছরে দু'বার প্রতিভার বিচ্ছুরণ।

কিন্তু একটানা কোনও ধারা বেশিদিন বজায় থাকেনি। ব্রেকডান্সের মহিমাও ক্রমশ ম্লান হয়ে এল। দেখা গেল ট্যালেন্ট শোর শতকরা আশিভাগেই ভারতীয় গান বাজনায় দাঁড়িয়েছে। প্রথমত আমাদের দুই গুণী সদস্য—বিজয়লক্ষ্মী ব্যানার্জি আর পূরবী হোড় নিজেরা ভাল গান করেন। তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে সম্মেলক সঙ্গীতানুষ্ঠানের সূচনা করলেন। বড়দের নিয়ে বিজয়লক্ষ্মী আগেই সঙ্গীত পরিচালনা করতেন। এবার স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে চমৎকার সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। ট্যালেন্ট শোয়ে বিজয়লক্ষ্মী আর পূরবীর ছাত্রীরা একক ও সম্মেলক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে অন্যদের মধ্যেও উদ্দীপনার সঞ্চার করল। বেহালায়, বাঁশিতে, ক্ল্যারিওনেট, সিন্থেসাইজারে দুটি দুটি করে বাংলা গানের সুর ছেলে-মেয়েরাই বাজাতে শিখল। আমাদের বিশেষ গুণী সদস্য অরুণ ভৌমিক একাধারে গান, তবলা, বেহালায় পারদর্শী। তাঁর শিক্ষায় কটি ছেলে, মেয়ে বছরের পর বছর চমৎকার অনুষ্ঠান করছে। স্বপ্না দত্ত আর এক শিক্ষিকা। তার ছাত্রছাত্রীরা (বাঙালি অবাঙালি মিলিয়ে) বাংলা গানের দলে যোগ দেয়। এছাড়া আমাদের ক্লাবের বাইরে বিভিন্ন গান বাজনার স্কুল হয়েছে। বনানী ঘোষের গানের স্কুল ছাড়াও বালটিমোর থেকে হামিদ হোসেন বলে একজন সঙ্গীত শিক্ষক মাসে মাসে নিউ জার্সিতে গান, তবলা ও সেতার শেখাতে আসেন। বাবা, মায়ের আগ্রহে বেশ কিছু ছোট ছেলে-মেয়ে ওইসব ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। ক্লাবের ট্যালেন্ট শোতে তারা ভজন, গীত, ঠুমরি, রাগপ্রধান গান, সেতার, তবলা লহরা শোনাবার সুযোগ পেল। কবিতা বলার প্রবণতাও ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সময় নিয়েই মহা সমস্যা। কাউকে না বলা চলবে না। কারণ সংবিধান অনুযায়ী ক্লাব ছোটদের সংস্কৃতি উন্মেষের ওপর ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে রেখেছে। বাধ্য হয়ে একটু কাটছাঁটের চেষ্টা যে করা হয়নি, তা নয়। মাথা পিছু এক মিনিট কমিয়ে দিতে গানের দল যদি বা মেনে নিল, সেতারের শিশু শিল্পীর মা-বাবার প্রবল উৎকণ্ঠা। চার মিনিটে আলাপ, প্রলাপ, ঝালা, মীড় বাজানো যায়? তখন সেতারে কনসেশন দিতে হল। তবলা লহরার শিল্পীদের অন্য দিকে ভিড়িয়ে দিতে গিয়ে মহা অবিচার করছিলাম। তাদের অন্যদের গানের সঙ্গে শুধু সঙ্গত করতে বলাতে মায়েরা খুব ব্যথিত হলেন। আমরা যুক্তি দিয়েছিলাম—'রবীন্দ্র জয়ন্তী হচ্ছে তো। ওরা মেয়েদের গানের সঙ্গে বারবার দাদরা, কাহারবা বাজিয়ে দিক। চাই কি ঝাঁপতালেরও স্কোপ আছে। অন্যদের গানের সঙ্গেও একতাল, তিনতাল কত রকম ঠেকা দিতে পারবে। কতবার স্টেজে উঠতে পারবে... ।' এই সব কনসোলেশন প্রাইজ তারা নেবে কেন? বরং তবলা লহরার জন্যে বরাদ্দ চার মিনিটই তাদের যথেষ্ট। অতএব পঞ্চাশজন শিশু বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী নিয়ে ছ/সাত ঘণ্টা ধরে রবীন্দ্রজয়ন্তী চলতে লাগল। নতুন দুটো নাচের স্কুলের দৌলতে গণেশ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, কুচিপুড়ি, মোহিনী আট্যম, গরবা, গীত গোবিন্দ, মণিপুরী, ছৌনৃত্য, মহিষাসুর বধ, আধখানা চণ্ডালিকা, সিকিভাগ চিত্রাঙ্গদা, সংকুচিত ভানুসিংহ, কবিতার সঙ্গে নাচ, নাচের সঙ্গে বাদ্যবৃন্দ—গোটা ভারতবর্ষের ছায়া অবলম্বনে আমাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপিত হতে লাগল। বড়দের গান বাজনা ত্যাগের মহিমায় ততদিনে নেহাত নিয়ম রক্ষার্থে এসে ঠেকেছে। সে নিয়েও আক্ষেপ, সমালোচনা কানে আসে। রবীন্দ্র

জয়ন্তীর নামে 'আন প্রফেশন্যাল' ব্যাপার স্যাপার নিয়ে খুচরো মন্তব্য। আমরা কান দিই না। দীর্ঘ অনুষ্ঠানে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই যথোচিত শিক্ষিত হয়ে নাচ, গান, আবৃত্তি, বাজনা, যা করার করছে। বঙ্গ সম্মেলনে বছর বছর গিয়ে সারা আমেরিকার বাঙালি ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে। প্রথম, দ্বিতীয় হয়ে ক্লাবের মান মর্যাদা বাড়াচ্ছে। দু'চারজনের বাজে কথায় ক্লাবের ঐতিহ্য নষ্ট করা যায় না। মাঝে নিউ জার্সিতে দু'বার বনানী ঘোষের উদ্যোগে রবীন্দ্রমেলা হয়ে গেল। আমাদের ক্লাবের ছেলে-মেয়েরাই তো ছিল প্রধান ভূমিকায়। নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে ওরা 'বাল্মীকি প্রতিভা' করে এসেছিল। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত নিজে হাতে পুরস্কার দিয়েছিলেন। বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। একদিনে কি আর কিছু হয়? বাড়ির উৎসাহে আর ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বীজ রোপণ হয়েছিল। রবীন্দ্র জয়ন্তীর বিচিত্রানুষ্ঠানে আমরা ক্ষান্ত দিই না। চেষ্টা করি ওই একটি দিন ছোটরা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে কিছু করুক। অন্তত যতজনকে উৎসাহিত করা যায় আর কি!

একদল স্কুল পেরিয়ে কলেজে চলে যাচ্ছে। অন্য দল নতুন করে ক্লাবে নাম লেখাচ্ছে। এখন আমাদের সদস্য সংখ্যা আড়াইশো। ছেলেমেয়ের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেড়েছে। 'ট্যালেন্ট শো' চলছে, চলবে বলেই মনে হয়। বছর দুই আগে ফোনে এক ভদ্রলোক যোগাযোগ করলেন। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে কবিতা বলবে। নাম, ধাম টুকে নিলাম। বরাদ্দ চার মিনিট সময়ের কথাও বলে দিলাম। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন দেখা হল। রোগা, শ্যামলা বরণ ছেলে। চোখ দুটি ভাবালু। নাম—মহারাজ পাল। কবিতার নাম—রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। সর্বনাশ! মে মাসের দুপুরে চার মিনিট হাতে পেয়েছে। ধান কাটতে কাটতে তো বর্ষা পার করে দেবে! মহারাজের বাবাকে বললাম—অত বড় কবিতা বেছে দিলেন! সময় তো অত দেওয়া মুশকিল।

অভয় দিয়ে তিনি বললেন—সবটা বলবে না। দেখুন না, এক্ষুনি ভুলে যাবে।

কী অপূর্ব আশ্বাস। আমরাও সেই ভরসায় ছোট্ট চোস্ত আর কারুকার্যকরা পাঞ্জাবি গায়ে 'মহারাজ'কে সভায় বসিয়ে দিলাম। সে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ভক্তিভরে নমস্কার করল। তারপর অস্ফুট স্বরে...'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা...। নাহি ভরসা—' পর্যন্ত বলে কিয়ৎক্ষণ নীরবতা। আবার রবীন্দ্রনাথের ছবিকে নমস্কার এবং 'গগনে গরজে মেঘ...।' 'ভরসা'র পর তার মৌনব্রত দেখে বাবা-রাশি রাশি, ভারা, ভারা'—তখন মহারাজ—'ধান কাতা হোলো সারা' এবং সুদীর্ঘ নীরবতা। বাবার তাড়না, দর্শকদের নির্মল হাসি এবং সহযোগিতা। সে রবীন্দ্র জয়ন্তী ভুলব না। মহারাজের উতোর আর দর্শকদের চাপান। মহারাজ বলছে—'এক্কানি ছোতো খেত আমি এ'কেলা।' বলেই দর্শকদের সুযোগ দিতে চুপ করে যাচ্ছে। তাঁরা সম স্বরে ক্যাচ লুফে নিয়ে—'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।'...হঠাৎ মহারাজ আপন মনে—'বাকা জল, বাঁকা জল কইছে খেলা।' বড় করতালি সহযোগে মহারাজ সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। বাবা সগর্বে বললেন—বলেছিলাম না, সবটা বলবে না?

এ বছর ক্লাবের নতুন কমিটি তাঁদের পরিকল্পনা মতো রবীন্দ্র জয়ন্তীর তোড়জোড় করেছেন। 'ট্যালেন্ট শো'-র শিল্পী সংখ্যা নাকি গত বছর থেকে একটু কমে গেছে। যারা

নিয়মিত অংশ নিত, তাদের মধ্যে বেশ বড় একটি দল হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তাই এবার বড়দের গান বাজনার সময় পাওয়া গেল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভার নিয়েছিলেন যিনি, তিনি নিজেও সুগায়িকা। দেশে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করে এসেছেন। সুপর্ণা গুহর নাম শুনেছেন কি? গীতবিতানের ছাত্রী ছিলেন। শান্তিনিকেতনেরও বটে। দেশে থাকতে সুপর্ণা লাহিড়ি নামে রেডিওতে গেয়েছেন। এখানে ওঁর 'সঙ্গীত সংসদ' নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নৃত্যশিক্ষার স্কুল আছে। সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও শেখানো হয়। বহু বছর ধরে সুপর্ণাদির প্রয়োজনায় ও পরিচালনায় যে সব রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য হয়ে আসছে, তাতে স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও দেশ থেকে বাণী ঠাকুর, ঋতু গুহ, রমা মণ্ডল নৃত্য শিল্পী অমিত চ্যাটার্জি, গায়ত্রী চ্যাটার্জি, অলকানন্দা রায় প্রমুখ আরও অনেকেই আমন্ত্রিত হয়ে এসে যোগ দিয়েছেন।

সুপর্ণাদি ক্লাবের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে এ বছর বড়দের গীতি আলেখ্য পরিচালনা করলেন। বিশাল বাহিনী নিয়ে যে কোরাস হবে, সেটি প্রথমে ঠিক হয়েছিল—এই তো ভালো লেগেছিল। সুপর্ণাদি কলেজে আমাদের সিনিয়র। পারিবারিক সূত্রেও বহুদিন পরিচয়। তাই 'রবীন্দ্র জয়ন্তীর' কোরাস বাহিনীতে শামিল হব না বলার সাহস পাইনি। ফোনে বললেন—কেমন গানটা বেছেছি বল তো? আন্দাজ কর! তু-ই-ই বলতে পারছিস না! কী রে?

সোৎসাহে উত্তর দিলাম—ওই যে। আমার নাম আছে বলে! আলোর নাচন পাতায় পাতায়।

—ইয়ার্কি হচ্ছে? শোন, আসলে ছোটদের জন্যে পুরো ফাংশনটা ডেডিকেট করে দিচ্ছি। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ওরাই আসল। লাইনটা বুঝতে পেরেছিস? 'ছোটো মেয়ে ধূলায় বসে, খেলার সাজি একলা সাজায়...।'

নিশ্চিন্ত হয়ে বলি—জানা গানই ভাল সুপর্ণাদি। সকলের তো রিহার্সালের সময়ও নেই।

—আরে শোন! সাংঘাতিক ভাল একটা কবিতা বলবি। মানে, মানে, কী বলব? এমন একটা কবিতা! তুই তো জানিস...।

আমি কিছুই জানি না সুপর্ণাদি। রবীন্দ্রনাথের সাংঘাতিক ভাল কবিতার সংখ্যা যে অসংখ্য। আমি কিবা বুঝি। আমি কেন খুঁজে মরি হে? তুমিই বলে দাও বরং। অবশ্য ফোনে এসব কিছু বলিনি। মনে মনে ভেবেছি, যথাকালে খুঁজে নেব।

আবার সুপর্ণাদির ফোন। ভাবলাম রিহার্সালে ডাকছেন বোধহয়। সুপর্ণাদির ফতোয়া—শোন। কোরাসের গান বদলে দিলাম।

—সে কী? ছোটো মেয়ে ধূলায় বসে—হবে না? বললে যে ছোটদের জন্যেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর ফাংশন ডেডিকেট করবে?

—তাই তো করছি! ও গানটা বেশির ভাগ লোক জানে না। এই লাস্ট মোমেন্টে কজনকে তোলাব বল?

—আহা! আমি রোজ নিজের মনে প্র্যাকটিস করছিলাম গো—লাগলো ভালো, মন ভোলালো...।

—জানিরে জানি। গানটা বড্ড ভাল! কিন্তু উপায় নেই। অর্ধেক লোক জানে না।

—তাহলে কোনটা ঠিক করলে?

—ঝর ঝর, ঝর ঝর, ঝরে রঙের ঝরণা।

—প্লিজ সুপর্ণাদি, ওটা রেখো না। ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকে নেচে আসছি...।

—ওটা অনেকে জানে যে! দেখবি কোরাস খুব ভাল হবে।

কোলাহলে থাকব ভেবে আর প্রতিবাদ করি না। কিন্তু তখনও সুপর্ণাদির কথা শেষ হয়নি—তোর কবিতাটাও ঠিক করে ফেললাম।

—কোনটা বলো তো?

—খেলা ভোলা। ছোটদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একেবারে সহজ ভাবে বলবি।

—সে কী? আমার যে 'কৃপণ' আবৃত্তি করার বড্ড ইচ্ছে ছিল।

—না, না, খেলা ভোলা। খেলা ভোলা। মনে থাকবে তো? বাই।

টকাশ করে ফোন রাখার শব্দ। সুপর্ণাদি ট্যালেন্ট শোর দিনে সংখ্যাগুরু দর্শক আর শিল্পীদের বয়স বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথের শিশু আর শিশু ভোলানাথের শরণ নিয়েছেন। ক্লাবের সংবিধানও তো সেই কথাই লিখে দিয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মর সঙ্গে বাংলার ভাষা সংস্কৃতির পরিচয় ঘটাতে হবে। ওরা উপলব্ধি না করলে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সার্থকতা কোথায়? অতএব রবীন্দ্রনাথের সাংঘাতিক ভাল ভাল কবিতা থেকে সহজবোধ্য কিছু বেছে নিতে হবে। কিন্তু মহারাজ পাল? বাল্যকালে তার ধান কাটা সারা হয়ে গেল। পাঁচ বছরের শিশু যদি আমাদের মনোরঞ্জনের আশায় তার বাবার বুদ্ধিতে ওই কবিতা বলে থাকে, তবে ওর কাছেই আমার শিক্ষা নেওয়া উচিত। বড়দের ইমপ্রেস করবে বলেই তো স্টেজে উঠেছিল? সহর্ষ হাততালি ভুলিনি। তাহলে, আমাকেও কিছু ফিরিয়ে দিতে হবে। খোকাবাবুকে কবিতা প্রত্যর্পণের জন্যে আমার খুকিত্বে প্রত্যাবর্তন! সুপর্ণাদির প্রেরণায় সহজভাবে গল্প বলার মতো করে 'তুই কি ভাবিস দিন রাত্তির খেলতে আমার মন? কক্ষণো তা সত্যি না মা, আমার কথা শোন্...।' নাঃ, ক্লাস ফোরের কবিতা এ বয়সে মুখস্থ থাকে? মাঝখান থেকে মেয়েকে ছোটবেলায় জবরদস্তি শেখানো 'অন্য মা' কবিতাটা মনে পড়ে যাচ্ছে। সুপর্ণাদির কাছে অ্যাপিল করব? 'সন্ধেবেলা মিলে যেতো অবুতে আর মাতে'...আহা! রবির তদ্ভব শব্দ অবু নয়? হ্যাঁ, এই কবিতাই বলব। তার আগে সহজ করে একটু ভূমিকা দেব— আমরা যারা মাকে ছেড়ে অন্য পারে চলে এসেছি, মাঝে অ্যাটলান্টিক ওশান, আমাদের, যাদের মার জন্যে খুব মন কেমন করে, ইচ্ছে করলেও সন্ধে হলে নদী পার হয়ে মার কাছে যেতে পারি না, তাদের মাকে ভালোবাসার কবিতা। রবীন্দ্রনাথ মাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট বুঝতেন। ছোট বয়সে ওঁর মা মারা গিয়েছিলেন তো...।

২৮ মে ১৯৯৪

নায়িকার উপার্জন

সম্প্রতি আমাদের শহরের 'ইয়ং উইমেনস হিব্রু অ্যাসোসিয়েশনের'র আমন্ত্রণে বেটি ফ্রিড্যান এসেছিলেন। আমেরিকায় নারী আন্দোলনের পুরোধা এই বৃদ্ধার নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন। বেটি ফ্রিড্যান এদেশের নারী-পুরুষ উভয় সমাজেই এখন কিংবদন্তি বিশেষ। '৬৩ সালে বেটি ফ্রিড্যানের লেখা প্রথম বই 'দ্য ফেমিনিন মিসটিক' আমেরিকায় বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। 'ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর উইমেন' এবং 'ন্যাশনাল উইমেনস পলিটিক্যাল ককাস' এর প্রতিষ্ঠাত্রী এই মহিলা তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে অধ্যাপনা ও লেখালেখির পাশাপাশি নারীর সম অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে সংগঠনমূলক কাজ করে চলেছেন। একই পেশায় নারী ও পুরুষের সম উপার্জনের অধিকার প্রসঙ্গে সেদিন তাঁর বক্তৃতা শুনে আমার ধারণা হল এখনও আমেরিকায় এই তারতম্য বজায় থাকলেও পরিস্থিতির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। 'অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন' নীতির প্রয়োগ বাধ্যতামূলক হওয়ার ফলে চাকরিক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপার্জনের মধ্যে বড় রকম প্রভেদ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না।

আগে এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকবার লিখেছি। এবার লিখছি হলিউডের নায়িকাদের সঙ্গে নায়কদের উপার্জনের তারতম্য নিয়ে। সেলুলয়েডের জগতের বৈষম্যের কাহিনী।

হলিউডে নামকরা শিল্পীদের মধ্যে পুরুষরা বরাবরই মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি পারিশ্রমিক পেতেন। তবে ইদানীং সেখানেও সমঅধিকারের হাওয়া গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে, পাল্লা সমান সমান না হলে, নায়িকারা আগের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। গত বছর পর্যন্ত যে কোনও বড় ছবির নায়িকা আট মিলিয়ন ডলারের বেশি দক্ষিণা পেতেন না। তাও বহুমূল্য বাজেটের ছবির মূল ভূমিকার জন্যে। বাকিরা সবাই ছিলেন আটের নীচে। কিন্তু এ বছরে নায়িকাদের বৃহস্পতির দশা শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে হলিউডের নামী অভিনেত্রী ডেমি মুরের দাম রাতারাতি বেড়ে গেছে। 'কাসল রক এন্টারটেনমেন্ট' কোম্পানি তাঁকে নতুন ছবি 'স্ট্রিপটিজ' এর চুক্তি সই করানোর জন্যে ১২.৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে।

কালো অভিনেত্রী হুপি গোলডবার্গেরও বৃহস্পতি তুঙ্গে। তিনি 'ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি'র দু খানি ছবির জন্য সই করেছেন। পারিশ্রমিক নিচ্ছেন কুড়ি মিলিয়ন ডলার।

এ তো গেল প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীদের কথা। কম বয়সী উঠতি নায়িকারাও কিন্তু আগের চেয়ে বেশি উপার্জন করছেন। স্যান্ড্রা বুলক তাঁর আগামী ছবি 'এ টাইম টু বিল'-এর জন্যে ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এর কাছ থেকে ছয় মিলিয়ন ডলার নিয়েছেন। অথচ গত বছরে তাঁর হিট ছবি 'স্পিড'-এর জন্যে প্রোডিউসার দিয়েছিলেন মাত্র পাঁচশো হাজার ডলার। অবশ্য একবারে পাঁচশো হাজার থেকে ছয় মিলিয়নে পৌঁছে যাওয়া যায় না। মাঝে অবশ্যই একটু উন্নতি হয়েছিল। 'ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি' স্যান্ড্রাকে 'হোয়াইল ইউ আর স্লিপিং' ছবির জন্যে ১.২ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। ছবিটি সদ্য মুক্তি পেয়েছে। এছাড়া সোনি পিকচার্স দিয়েছে 'দ্য নেট' ছবির জন্যে ২.৫ মিলিয়ন ডলার। স্যান্ড্রা বুলক এভাবেই ছ মিলিয়নে পৌঁছেছেন।

দেখেশুনে লস অ্যাঞ্জেলেসের ট্যালেন্ট ম্যানেজারদের চক্ষুস্থির। অভিনেত্রীদের এমন ঊর্ধ্বগামী উপার্জনের হার তাঁদের চমকে দিয়েছে। এক বছর আগেও এই ঢালাও বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করা যায়নি। ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টস এজেন্সির প্রেসিডেন্ট রন মায়ার অবশ্য খুবই আনন্দিত। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে—ক্রমশই হলিউডের অভিনেত্রীরা প্রমাণ করছেন যে কেবলমাত্র তাঁদের অভিনয়ের গুণেই বহু ছবি 'হিট' করছে।

সাধারণত কীভাবে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিকের অঙ্ক নির্ধারণ করা হয় দেখা যাক। প্রোডিউসাররা বলছেন—জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে অভিনেতা, অভিনেত্রীর দাম ওঠে, পড়ে। বক্স অফিসের সাফল্য থেকেই শিল্পীর জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চিত্র সমালোচকের মতামতের তেমন মূল্য নেই। তাঁরা কাকে মহানায়ক বলছেন আর কাকে তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রী বলছেন—সে নিয়ে প্রোডিউসাররা মাথা ঘামান না। দর্শকরা যাঁকে নেবেন, তাঁর ওপরেই ছবির ব্যবসা নির্ভর করছে। ছবি মুক্তি পাওয়ার পরে ভিড় আর টিকিটের বিক্রি দেখে পারিশ্রমিকের হার বাড়ানো হয়। অবশ্য পরবর্তী ছবির জন্যে। শুধু আমেরিকার মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক দর্শক মহলে এই শিল্পী কতখানি জনপ্রিয় হয়েছেন, সেই বিচারেও পারিশ্রমিকের হেরফের হয়ে থাকে। কারণ বিদেশে মার্কিন ছবির রমরমা ব্যবসা থেকেই প্রযোজকের ঘরে মোটা অঙ্কের ডলার ফেরত আসছে। অর্থাৎ নায়িকাদের পদোন্নতির মূলে আছে তাঁদের দর্শকদের অনুমোদন। মিলিত লক্ষ লক্ষ করতালি থেকে লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন।

তবে এমন সুদিন আসতে ঢের সময় লেগেছে। এদেশে ছবির 'বরাত খোলা' বলে একটা কথা আছে। মানে, যে ছবি একেবারে মার-মার, কাট-কাট হবে আর কী? তা সেই রকম ছবির জন্যে নায়িকাদের ভরসা মোটেই করা হত না। সে ছিল নায়ক সর্বস্ব ছবির যুগ। যে যে মাল মশলা ঠেসে দিলে ছবি একেবারে নির্ঘাৎ দর্শকদের বুকে গিয়ে বোমা ফাটাবে, সেই সব মালমশলার মধ্যে প্রধান ছিল অ্যাকশন আর অ্যাডভেঞ্চার। নায়ক ছাড়া কে পারবে? এই ধরনের ব্লক-বাস্টার মুভির জন্যে বিশেষ ধরনের অভিনেতা চাই। সিলভেস্টার স্ট্যালোন-এর মতো লাগাতার ঘুষি খেতে খেতে পার্ট করা কোনও নায়িকার পক্ষেই সম্ভব নয়। 'রকি' কিংবা 'র‍্যাম্বো'র মতো ছবির জন্যে মারমুখো নায়ক দরকার। স্ট্যালোন প্রচুর পারিশ্রমিক পেয়েছেন। ঘুষোঘুষির জন্যে তো বটেই, কারণ অ্যাকশন মুভির জন্যে নায়কের ওই বিরল প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত ওই জাতের ছবি ভীষণ জনপ্রিয় হয় বলেই প্রোডিউসার খুশি মনে স্ট্যালোনের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোনও নায়িকা ওই রকম ঘুষি খাওয়া গোবদা মুখ দিয়ে পার্ট করতে রাজি হবেন? নাকি 'র‍্যাম্বোর' নায়কের মতো আধ পাগল সেজে ঘুরতে চাইবেন? এই জন্যেই নায়ক নায়িকার মধ্যে পারিশ্রমিকের তফাত হয়ে গেছে। হলিউডের অভিনেত্রীরা সাধারণত কমেডি, রোমান্সধর্মী সামাজিক ও পারিবারিক ছবিতে অভিনয় করেন। আন্তর্জাতিক বাজারের জন্যে এই সব ছবির সাব-টাইটল ইত্যাদি তৈরি করতে সময় লাগে। ওদিকে অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার এবং কিছু কিছু জটিল মনস্তাত্ত্বিক ছবি এদেশে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেও দেখানো শুরু হয়। দর্শকদের চাহিদা বুঝে আগে থেকে অনুবাদের কাজ সেরে ফেলাতে, আন্তর্জাতিক বাজারে বহু দর্শক মিলে যায়। প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটর—কাউকেই আর শুধুমাত্র আমেরিকার

মুভি থিয়েটারের টিকিট বিক্রির ওপর নির্ভর করতে হয় না। এ জন্যেই নায়কদের এত কদর হয়েছে এতকাল। মেগ রায়ান-এর মতো বড় অভিনেত্রী যেহেতু রোম্যান্টিক কমেডির নায়িকা হন, সেহেতু তাঁর পারিশ্রমিক হচ্ছে ছয় মিলিয়ন থেকে সাত মিলিয়ন ডলার। অথচ মেগ রায়ানের তুলনায় অনভিজ্ঞ কমেডি অভিনেতা জিম ক্যারি এখন অ্যাকশন ছবিতে নেমে দশ মিলিয়ন ডলার পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। 'দ্য ম্যাস্ক', 'ব্যাটম্যান ফর এভার' ইত্যাদি ছবি করার জন্যে জিম ক্যারি ওই রকমই পারিশ্রমিক নিয়েছেন।

বহুদিন পর্যন্ত হলিউডে নায়ক প্রধান-ছবি তৈরি হত। নায়িকারা থাকতেন সহ-অভিনেত্রী হিসেবে। কোনও কোনও ছবিতে থাকতেন দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ। আর একজন নায়িকা। সেখানেও নারীচরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ছবি মুক্তি পাওয়ার পরে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তার বিচার করার সময়, অভিনেত্রীদের অভিনীত চরিত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না।

কিন্তু ক্রমশ সেই ধারা বদলে যাচ্ছে। কয়েকজন অভিনেত্রী বিভিন্ন ছবিতে এমন দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন যে, তাঁদের একার অবদানেই বিখ্যাত ছবিগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জনপ্রিয় হয়েছে। সমসাময়িকদের মধ্যে মেরিল স্ট্রিপ, স্যালি ফিলড প্রমুখ তো আছেনই, আরও কম বয়সী অভিনেত্রীদের মধ্যে জোডি ফস্টার, জেসিকা ল্যাঙ্গ, জুলিয়া রবার্টস, বিশেষ করে জোডি ফস্টার একাই যে কোনও ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণ হতে পারেন। অবশ্য অনেক আগেই সোফিয়া লোরেন, শার্লি ম্যাকলেন, এলিজাবেথ টেলর, অড্রে হেপবার্ন, বারবারা স্ট্রাইফেন্ড এর মতো প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেত্রীরা হলিউডের সফল ছবি নায়িকা হিসেবে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং বহু ছবি তাঁদের অভিনয়ের জন্যেই ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছিল, কিন্তু তখনও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে নায়কদের তুলনায় তাঁদের কমই দেওয়া হত।

এখন নায়িকারা অনেক বেশি উপার্জন করছেন। ডেমি মুরের কথা প্রথমেই লিখেছি। আগে পেতেন একটি ছবির জন্যে খুব বেশি হলে ৮ মিলিয়ন ডলার। এখন তাঁর দর উঠেছে ১২.৫ মি মিলিয়ন ডলার। কারণ, গত পাঁচ বছরে মোট চারটি ছবি করেছেন। প্রত্যেকটি বক্স অফিস হিট। একশো মিলিয়ন ডলারের বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে এক একটি ছবিতেই। কোনও ছবিতে তারও বেশি পাওয়া গেছে। এ তো শুধু আমেরিকার মধ্যে মুক্তি পাওয়া ছবির বক্স অফিসের খবর। সুতরাং নায়িকার জনপ্রিয়তা মানতেই হবে। আগে আগে ডেমি মুরের দু'চারটি ছবি সফল হয়নি বটে, কিন্তু গত পাঁচ বছরের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে প্রোডিউসাররা এখন নিশ্চিন্ত। বিগ-বাজেট কমার্শিয়াল ছবিতে ডেমি মুরকে নায়িকার ভূমিকায় রাখলে বক্স অফিস হিট করবেই। এ জন্যেই তাঁর পারিশ্রমিকও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর দিগম্বরী হয়ে ডেমি নিজেকে আরও আকর্ষণীয়া করে তুলেছেন। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' পত্রিকার মলাটে সন্তানসম্ভাবা ডেমির বসনবিহীন ছবি খুব দর্শক টেনেছে। ওই সংখ্যাটি ঝপাঝপ বিক্রি হয়ে গেছে। প্রেডিউসাররা তখনই আগাম হিসেব কষে নিয়েছিলেন। তারপর 'স্ট্রিপটিজ' ছবির জন্যে সই করিয়েছেন। নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, সে ছবিতেও এক আধবার বস্ত্রহরণ পালা আছে।

হলিউডে নায়িকাদের উপার্জন বেড়েছে বটে, কিন্তু এখনও তাঁরা প্রতিষ্ঠিত

অভিনেতাদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি। টম ক্রুজ, টম হ্যাংকস (দুবার অস্কার বিজয়ী), মেল গিবসন, আরনল্ড শোয়ারসেনেগর—এঁরা সব গত বছর পর্যন্ত প্রতি ছবি বাবদ ১৫ মিলিয়ন ডলারের মতো পারিশ্রমিক পেয়েছেন। কিন্তু এ বছরে তাঁদেরও দর বেড়ে গেছে। এপ্রিল মাসে সিলভেসটার স্ট্যালোন নতুন একটি ছবির জন্যে কুড়ি মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সই করেছেন।

সম্প্রতি হলিউডের সাতশো শিল্পীর উপার্জন ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে একটি সমীক্ষা নেওয়া হয়েছে। হলিউড রিপোর্টার, নামে একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে ওই সমীক্ষা নেওয়ার ফলে জানা গেছে—শুধুমাত্র পাঁচজন বিখ্যাত অভিনেতার ছবি আন্তর্জাতিক ছবির বাজারে নিশ্চিত সাফল্য আনতে পারে। তাঁরা হচ্ছেন হ্যারিসন ফোর্ড, টম ক্রুজ, টম হ্যাংকস, মেল গিবসন আর আরনল্ড শোয়ারসেনেগর। তার মানে অভিনেত্রীরা জনপ্রিয়তার শীর্ষসারিতে স্থান পাননি। এমনকি ওই পাঁচজনের পরেও নয়। মোট আটজন অভিনেতার পরে তাঁদের নাম উঠেছে। তাও মাত্র একজন অভিনেত্রী জনপ্রিয়তার বিচারে নবম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি জোডি ফস্টার। ওই তালিকার নাম 'এ-প্লাস লিস্ট।' সেখানে আর এক অভিনেত্রীর নাম একটুর জন্যে বাদ চলে গেছে। তিনি জুলিয়া রবার্টস। দু বছর আগেও তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু গত বছরে 'আই লাভ ট্রাবল' আর 'রেডি টু ওয়ার' ছবি দুটি বক্স অফিসে মার খেয়ে যাওয়ার ফলে জুলিয়া রবার্টস নীচের তালিকায় চলে গেছেন। পারিশ্রমিকও জোডি ফস্টারের তুলনায় কম পাচ্ছেন।

নায়িকাদের উপার্জন বাড়াতে হলে অ্যাকশন্ ছবির মুখ্য ভূমিকায় নামতে হবে। নয়তো তফাৎ থেকেই যাবেই। এছাড়া 'হাইলি কমার্শিয়াল' ছবি বলতে যা বোঝায়, সেরকম ব্যবসায়িক অর্থে সফল ছবি করা চাই। যাঁরা তা করতে পারছেন না, তাঁদের পারিশ্রমিক ওপর দিকে উঠছে না। যেমন—মেরিল স্ট্রিপের পক্ষে ওই ধরনের চরিত্রে রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দু বার অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়া অসাধারণ অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপ তাঁর এক একটি ছবির জন্যে চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের বেশি পারিশ্রমিক নেন না। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'দ্য রিভার ওয়াইল্ড' তুলনাগতভাবে বাণিজ্যভিত্তিক হলেও বক্স অফিসে তেমন কিছু সাড়া জাগায়নি। সর্বসাকুল্যে ৪৬ মিলিয়ন ডলার প্রযোজকের ঘরে এসেছে। অথচ এর দ্বিগুণ অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছেন ডেমি মুর। গত বছর ডেমির 'ডিসক্লোজার' ছবি ব্যবসায়িক অর্থে দারুণ সফল হয়েছে। '৯৩ সালে 'ইনডিসেন্ট প্রপোজাল' আর '৯২ সালে 'এ ফিউ গুডমেন'-এর মতো ছবি করে ডেমি মুর একই সঙ্গে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক সাফল্যের নিদর্শন রেখেছেন। সমালোচকের দৃষ্টিতে মেরিল স্ট্রিপ অনেক উঁচু দরের অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও ডেমি মুরের মতো তাঁর বাজার দর বাড়েনি। কারণ ওই ধরনের ছবির মুখ্য ভূমিকায় তাঁকে মানাচ্ছে না। তবে এ বছর গ্রীষ্মকালে তাঁর একটি নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে। নাম 'ব্রিজেস্ অফ ম্যাডিসন কাউন্টি'। শোনা যাচ্ছে বক্স-অফিস হিট করবে। যদি তা হয়, তবে মেরিল স্টিপের পারিশ্রমিক বেড়ে যেতে পারে।

হলিউডে শিল্পীদের নানা সংস্থা আছে। 'উইমেন ইন ফিল্ম'-এর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জোন হাইলার। তাঁর বক্তব্য—অভিনেত্রীরা যদি সম উপার্জনের চেষ্টা করেন, তবে তাঁদের সিনেমার বাজার বুঝে ছবিতে সই করতে হবে। অধিকাংশ দর্শক অ্যাকশন ছবি দেখতে

ভিড় করেন। ঘটনা-দুর্ঘটনার মালমশলায় তৈরি ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকবে। সুতরাং পারিশ্রমিক বেশি পাওয়ার জন্যে অভিনেত্রীদের ওই ধরনের বাজার চলতি ছবির ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। চমক সৃষ্টি বা প্রযোজক পরিচালকের ঝোঁকের ব্যাপার হওয়ার কথাই নয়। জীবনে যা ঘটে, চলচ্চিত্র যদি তার শিল্পসঞ্জাত প্রতিফলন হয়, তবে কাহিনীতে নারী এবং পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা সমানভাবেই সংযোজিত হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে সাময়িক প্রাধান্যের জন্যে নয়, নিয়মিতভাবে মুখ্য ভূমিকায় থাকবেন বলেই অভিনেত্রীরা নির্বাচিত হবেন। পারিশ্রমিকের পার্থক্য আদৌ ঘুচবে কিনা বলা কঠিন। বাণিজ্যভিত্তিক ছবির সাফল্য, বক্স অফিস আর দর্শকের প্রগাঢ় ভালবাসার কথা বিবেচনা করলে 'অ্যাকশন' ছবিই হচ্ছে প্রভূত উপার্জনের একমাত্র পথ। সমঅধিকার অর্জনের জন্যে লাগাতার ঘুষি খাওয়া, ঝড় তুফানের মধ্যে মাঝে মধ্যে মাঝ সমুদ্রে ডিঙি নিয়ে অভিযান, নায়াগ্রার প্রপাতের নীচে পিঁপে আঁকড়ে ভেসে থাকা কিংবা বরফের পাহাড় থেকে ঘোড়া শুদ্ধ উলটে পড়ে জরদ্‌গব হয়ে রিটায়ার করা—নায়িকারা কে কোন ভূমিকা বেছে নেবেন, সে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিটের ওপর নির্ভর করছে। নারী আন্দোলনের প্রধান নেত্রী বেটি ফ্রিড্যান যাই বলুন, হলিউডে আপন ভাগ্য জয় করবার উৎসাহে মেরিল স্ট্রিপের মতো 'শান্তশ্রী' টাইপের মহিলা কি সত্যি সত্যি দু'চার মিলিয়নের জন্যে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বক্সিং-এর রিং-এ নামবেন? সিলভেস্টার স্ট্যালোন যা পারেন, মেরিল স্ট্রিপ তা পারেন না। অভিনয়ের খাতিরেও নয়। স্ট্যালোনকে এখনও অসাধারণ অভিনেতা বলে অন্তত আমি তো মনে করি না। মেরিল দু বার অস্কার পেয়েছেন। অস্কারের জন্য নমিনেশন পেয়েছেন তারও বেশিবার। বাড়তি উপার্জন থেকে কি পুরস্কার কেনা যায়?

২৪ জুন ১৯৯৫

বই-এর বাজার

শিকাগো শহরে মে মাসের শেষে মার্কিন প্রকাশকদের বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল। বই ব্যবসায়ীরা খুব খুশি। আমেরিকায় বই-এর চাহিদা আবার বেড়ে যাচ্ছে। টেলিভিশন আর ভিডিও গেমের দাপটে মাঝে এক সময় কমবয়সী ছেলে মেয়েদের বই পড়ার নেশা ছুটে গিয়েছিল। এখন তারা অনেকেই বই নিয়ে সময় কাটাচ্ছে। এছাড়া সনাতন পাঠক অর্থাৎ বয়স্ক মানুষের তো বই পড়ার অভ্যেস বরাবরই আছে। ছেলে, বুড়ো মিলিয়ে আপাতত মার্কিন পাঠকরা দলে বেশ ভারী। গত বছরে তারা এক বিলিয়ন সংখ্যক বই কিনেছে।' '৯১ সালের পর থেকে বই বিক্রির হার শতকরা ৩১ ভাগ বেশি হয়েছে। বই ব্যবসায়ীরা একটি সমীক্ষা নেওয়ার জন্যে মার্কেট রিসার্চ কোম্পানির সাহায্য নিয়েছিলেন। সেই কোম্পানি এ দেশের ষোলো হাজার পরিবারের মাসিক খরচের খাতা পরীক্ষা করে বই কেনার হিসেব পেয়েছে। সুতরাং খাই খরচের সঙ্গে বই খরচও যখন টুকে রাখা ছিল, সন্দেহ

নেই—পাঠকরা মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্যে খরচ পত্র করেছেন।

কিন্তু কী ধরনের বই-এর চাহিদা বেড়েছে? বিদগ্ধ প্রকাশকরা একটু হতাশ হয়ে জানিয়েছেন, রান্নার বই-এর চাহিদা অসম্ভব বেড়ে গেছে। এরপরেই আছে হাস্যকৌতুক সংগ্রহ। রসময়ের রসিকতা কালেকশন। নানা কমেডিয়ানের ব্যবহার করা এক এক লাইনের হাসির কথা। জনপ্রিয় বই-এর তালিকায় এর পরেই আছে একেবারে সাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা চটজলদি উপন্যাস। এছাড়া 'অফ বিট ক্যাটেগরি' বলতে যা বোঝায়, সেই ধরনের বই বিক্রির হারও বেড়ে গেছে। কমিক কালেকশনের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে 'র‍্যানডম বুক হাউসে'র ভিলার্ড বুকস ইউনিট থেকে প্রকাশিত—'ও জেস লিগাল প্যাড' বইটি ও. জে. সিম্পসন মামলা নিয়ে লেখা। জজ আর উকিলের রঙ্গ, জুড়ি আর সাক্ষীর রঙ্গ রসিকতায় ছয়লাপ। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে আড়াইশো হাজার কপি নিঃশেষিত!

পাঠকরা কী বই কিনছেন, না কিনছেন, সে নিয়ে অবশ্য সব প্রকাশকই যে মাথা ঘামাচ্ছেন, তা নয়। তাঁরা ব্যবসায়ী লোক। বই-এর চাহিদা উর্ধ্বগামী, এতেই তাঁদের মহা আনন্দ। কে রান্নার বই কিনে ভাঁড়ারের তাক সাজাচ্ছে, আর কে ভাঁড়ামোর বই কিনে পড়ার ঘরের দেওয়াল আলমারি ভরাচ্ছে—সে নিয়ে তাঁদের আহত হওয়ার কী আছে? যার যেমন জ্ঞান পিপাসা। প্রত্যেককেই যে কালজয়ী উপন্যাস আর বিখ্যাত মানুষের জীবনকথা দিয়ে তাক সাজাতে হবে—এমন কোনও কথা নেই।

তবে পাঠকরা বই কোন দোকান থেকে কিনছেন, সে নিয়ে বই-এর দোকানের মালিকরা একটু বিচলিত। কারণ সকলেই নাকি ভাল ভাল বই-এর দোকানে ঢুকছেন না। ডাক-যোগে বই আনাচ্ছেন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ছোট্ট বই বিভাগ থেকে বই কিনছেন। এমনকি বাসনের দোকানেও রান্না আর ঘর গৃহস্থালী সংক্রান্ত বই পেলে কিনে নিচ্ছেন। অবশ্য এর পিছনে রান্নার বই-এর প্রকাশকদের হাত আছে। যাঁরা রান্না, খাওয়া, বাড়ি সাজানো, আর পার্টির সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের কালজয়ী প্রবন্ধ, উপন্যাস সংগ্রহের বাতিক নেই বলেই যেন ধরে নেওয়া হচ্ছে। তাই তাঁদের মনপসন্দের জায়গা 'উইলিয়াম-সোনেমা' 'কুক-ওয়্যার স্টোর,' 'ফরচুন-অফ', 'হবি সেন্টার' ইত্যাদি দোকানে অন্য ধরনের বই মজুদ রাখা হচ্ছে। কুকিং অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট নিয়ে লেখা বই ওখানেই বেশি বিক্রি হচ্ছে। 'র‍্যানডম হাউস' প্রকাশনার ক্রাউন পাবলিশিং নামে যে শাখা আছে তার মাথা স্টুয়ার্টস কুক বুক বিক্রির জন্যে ওই সব দোকানের ওপর বেশি নির্ভর করে। ওই, আগে যে কথা বলছিলাম, প্রকাশকদের কাছে বই বিক্রির হিসেব আর পাঠকদের বই পড়ার আগ্রহ-ই হচ্ছে প্রধান কথা। এ-প্রসঙ্গে আমেরিকার 'লিটেরারি গিল্ড' আর 'ডবল ডে বুক ক্লাব'-এর প্রাক্তন সম্পাদক এবং বর্তমানে 'ডবল ডে পাবলিশিং'-এর প্রকাশক আরলেন ফ্রিডম্যান বলেছেন—হাসির চুটকির সংকলন, টি ভি শো থেকে নেওয়া সাময়িক উত্তেজনামূলক কাহিনী যদি বেশি বিক্রি হয় তো ক্ষতি কী? সুপার বাজারে নয়তো বাসনের দোকানে বই বিক্রি হলেই বা আপত্তি কিসের? আসল উদ্দেশ্য হল লোকেদের বই পড়ার সুযোগ দেওয়া। তাঁরা বই কিনছেন, পড়ছেন, আনন্দ পাচ্ছেন—প্রকাশকদের কাছে এর চেয়ে সুসংবাদ আর কী হতে পারে?

এদেশে নানা নামের বুক ক্লাব আছে। তারা লোকের বাড়িতে বাড়িতে ডাকে বই-এর

ক্যাটালগ আর বিজ্ঞাপন পুস্তিকা পাঠায়। প্রথম বইটি মাত্র এক সেন্ট (এক পয়সা) দামে পাওয়া যাবে। তারপর থেকে অর্ডারি বইগুলির জন্যে মাসে মাসে নিয়মিত বিল পাঠাবে আর চেক নেবে। ইদানীং বছরে শতকরা ছয় ভাগ বই বিক্রি হয় এই ধরনের বুক ক্লাব মাধ্যমে। মনে করুন, শিশু পাঠ্য বই, রঙিন ছবি ও ছড়ার বই ইত্যাদি কিনতে চান। এ-জন্যে প্রথমেই আপনার একগাদা ডলার খরচ করার দরকার নেই। ওই বুক ক্লাব-এর সদস্য হয়ে দেড়-দু'বছর ধরে কিস্তিতে বই কিনতে পারেন। ডক্টর স্যুস্ হলেন এদেশের শিশু সাহিত্য সম্রাট। তাঁর অনেক বই আমি চিলড্রেনস বুক ক্লাব-এর ক্যাটালগ আর বিজ্ঞাপন দেখে দেখে মেইল অর্ডারে আনিয়েছিলাম। প্রথম ছড়ার বই-এর জন্যে ওই এক পয়সা আর তারপর থেকে মাসে মাসে আড়াই, তিন ডলার করে দিতে হত। যতদূর মনে পড়ছে ৩৫ কিংবা ৩৬ ডলার মতো খরচ করে এক বছরে প্রায় খান পঁচিশেক বই পেয়েছিলাম। সুদৃশ্য বাঁধানো মলাট, দামি কাগজ, পাতায় পাতায় রঙিন ছবি আর ছড়া। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই'-এর মতো মলাট। ভেতরের ছবি আর লেখা দেখে সুর্নিমল বসুকে মনে পড়ত।

আমেরিকায় টম ক্ল্যানেসি ড্যানিয়েল স্টিল আর স্টিফেন কিং-এর মতো জনপ্রিয় লেখকের বই অবশ্য আগের মতোই বিক্রি হচ্ছে। তবে প্রকাশকরা লক্ষ্য করছেন—যেসব বইতে জীবন সম্পর্কে অনুপ্রেরণামূলক বিষয় থাকে আর সরস ভাষা ও কৌতুকপ্রদ ঘটনা থাকে, সেই সব বই-ই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।

'ক্রাউন পাবলিশিং' থেকে যে দুটি বই প্রকাশিত হয়ে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে, তার একটি হল 'মিলটন বার্লেস প্রাইভেট জোক্ ফাইল' আর দ্বিতীয় বইটির লেখক দীপক চোপড়ার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমাদের শরীর, মন, কোনও কিছুই যে সময়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ে না, সময়ের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তারই ব্যাখ্যা সম্বলিত বইটির নাম 'এজলেস বডি, টাইমলেস মাইন্ড।' পেশায় চিকিৎসক দীপক চোপড়ার অন্যান্য বিখ্যাত বই-এর নাম 'পারফেক্ট হেলথ', 'কোয়ানটাম হিলিং', 'ক্রিয়েটিং হেলথ', 'রিটার্ন অফ দ্য ঋষি', 'আনকন্ডিশনাল লাইফ' ইত্যাদি। সাম্প্রতিক বই 'এজলেস বডি, টাইমলেস মাইন্ড', ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে। গত বছর হার্ডকভার কপি বিক্রি বিক্রি হয়েছে এক মিলিয়নেরও বেশি। শীতকালে পেপার ব্যাক কপি ছাপা হল। চার মাসের মধ্যে তারও তিনশো হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে। অলটারনেটিভ মেডিসিনের বই এখন বাজারে খুব চলছে।

ওদিকে কমেডিরও রমরমা ব্যবসা। '৯৪ সালের বই বিক্রির হিসেব দেখলে বোঝা যায় টিভিতে যাঁরা রঙ্গ রস পরিবেশন করেন, তাঁদের লেখা কৌতুক রচনাগুলির চাহিদা কিছু কম নয়। পল রাইজার, টিম অ্যালেন টিভিতেও যেমন দর্শক ধরে রাখেন, বইতেও তেমনি রসগ্রাহী পাঠক ধরে রাখতে পারেন। মহিলা কৌতুক শিল্পীদের মধ্যে খুব নাম করে এলেন ডিজেনেরস। তাঁর নিজস্ব টিভি সিরিজ বেশ চালু অনুষ্ঠান। 'ব্যানট্যাম বুকস' তাঁকে দিয়ে 'দ্যাটস মাই পয়েন্ট' নামে বই লিখিয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরে বাজারে আসবে। আশা করা যায় সে বইও খুব বিক্রি হবে।

প্রকাশকরা, বাজার বুঝে মাল মশলা ছাড়ছেন। 'ভাইকিং-পেঙ্গুইন' এর মতো নামকরা সংস্থা এতকাল শুধু সাহিত্যরস সমৃদ্ধ ভাল বই প্রকাশ করেছে। আর ইদানীং তাদের প্রধান

মশলা হচ্ছে রান্নার মালমশলা। এ বছর তারা অনেকগুলি রান্নার বই প্রকাশ করছে। আগে বছরে পাঁচটি রান্নার বইও প্রকাশিত হত না। এ বছর ভাইকিং পেঙ্গুইন দশটি রান্নার বই ছাপাচ্ছে। বিদগ্ধ সমাজের জন্যে মননশীল রচনার পাশাপাশি দগ্ধ না করে সুসিদ্ধ রান্নার প্রণালীও তারা ছাপাতে চাইছে আর কী! 'উওম্যানস্ ডে কুক বুক' নাম দিয়ে এক বই শিগগিরই বাজারে ছাড়ছে। যদিও নামটা থেকে কিছুই স্পষ্ট হচ্ছে না। 'উওম্যানস্ ডে' মানে কী? একটি মহিলা সারাদিনে কী কী রাঁধবেন? এদেশে ক'জন দিনের বেলা রাঁধেন? সেই তো মাঝবেলাতে দশভূজা হচ্ছে ভাজাভুজি আর বেকিং। উওম্যানস্ ডে কুক বুক্ না ছাপিয়ে পেঙ্গুইন-এর ছাপা উচিত ছিল 'হাফ ডেড উওম্যানস ইভনিং কুক বুক।' তবে কি অন্য কোনও মানে আছে? উওম্যানস ডে বলতে নারী দিবসের ডাল, তরকারি বোঝাচ্ছে? দূর! নারী দিবসে কেউ রাঁধে? সে তো আমার মুক্তি আলোয় আলোয় বলে হাত ছড়িয়ে বেরিয়ে পড়ার দিন। সভায় গিয়ে জিগির দেওয়ার দিন। রাতে ফান্ড-রেইজিং ডিনারে বসে আমরা কত পথ পার হয়ে এলাম, তার হিসেব নিকেশ দেওয়ার দিন। তাহলে? 'উওম্যানস ডে কুক-বুক'-এর নামকরণের রহস্য উদ্ধার করা গেল না।

'গ্রোভ অ্যাটল্যান্টিক ইনকরপোরেটেড' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা থেকে বেশ সিরিয়াস রচনা সমৃদ্ধ বই ছাপা হয়। ফিকশন, নন-ফিকশন দুয়েরই ব্যবসা। যেমন ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক উইল সেলফ-এর লেখা 'দ্য কোয়ানটিটি থিওরি অফ ইনস্যাটিনিটি' এদের প্রকাশনায় ছাপা হয়েছে। এদের বক্তব্য—তাৎক্ষণিক বিষয় নিয়ে বই লেখা আর ছাপানোর ফলে সৎ সাহিত্য সৃষ্টির কাজে বাধা পড়ছে। ও.জে সিম্পসন মামলা এখনও মাঝপথে, অথচ 'ও জেস লিগাল প্যাড' নাম দিয়ে কৌতুক নকশা ছাপা হয়ে গেল! এর কোনও সাহিত্যমূল্য আছে? আজকাল নিছক ব্যবসার খাতিরে এই ধরনের বই লেখা এবং ছাপা হচ্ছে। রাতারাতি বিখ্যাত কোনও লোককে নিয়ে, সদ্য ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিয়ে, হাল আমলের কেচ্ছা নিয়ে ঝকঝকে মলাটের বই বেরিয়ে গেল। গ্রন্থপ্রকাশনার মতো সৎ ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে এতদিন পর্যন্ত এ ধরনের মালমশলা ব্যবহারের তেমন প্রবণতাই ছিল না। অথচ, প্রকাশকরা এখন বই-এর গুণাগুণের চেয়ে বাড়তি ডলার রোজগারকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। তবে ভরসা এই যে, পাঠকরা ভাল মন্দ বেছে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। দশরকম বই পড়তে ভালবাসেন। একই দোকানে ওই 'ও. জেস লিগাল প্যাড' কিনতে এসে, সেই সঙ্গে সিরিয়াস উপন্যাস 'দ্য কোয়ান্টিটি থিওরি অফ ইনস্যানিটি'-ও কিনে ফেলতে পারেন। সচরাচর তাই-ই হয়। আমেরিকান পাঠক বই কিনতে গিয়ে একটির বেশি বই কিনবেন না, এমন কোনও কথা নেই।

এদেশে বই বিক্রির হার যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তার জন্যে বই-এর দোকানগুলির সুন্দর সাজসজ্জা, ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করতে হয়। সম্প্রতি বই-এর দোকানের আয়তন যা হয়েছে, বেশ বড়সড় সুপার বাজারের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অবশ্য সব দোকান নয়, নামকরা বই-এর দোকানগুলির কথা বলছি। এদের সারা আমেরিকা জুড়ে শাখা আছে। যেমন 'বার্নস অ্যান্ড নোবল ইনকরপোরেটেড' কোম্পানি! এরাই প্রথম ১৯৯০ সালে সুপার বুক স্টোর ধরনের প্রশস্ত দোকান তৈরি করতে আরম্ভ করে। আমেরিকার ঐতিহ্যপূর্ণ এই বই-এর দোকানের চেহারা এতদিন পর্যন্ত মোটামুটি একইরকম ছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে

অনেক বড় হয়েছে। মোট ২৭৯টি শাখায় আছে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে প্রশস্ত বিভিন্ন বিভাগ। প্রচুর হাঁটা চলার জায়গা আর দোকানের পিছন দিকে কফি বার। বই-এর সংখ্যাও অনেক বাড়ানো হয়েছে। ক্রেতাদের বেশ মনঃসংযোগ করে বইপত্র বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে 'বানর্স আন্ড নোবল' সুপারস্টোরের মোট বই বিক্রির হার বেড়েছে শতকরা ৮৬.৩ ভাগ। এ বছরের জানুয়ারির শেষে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী গত বছরে ওই দোকানগুলিতে সব সুদ্ধ ১.৬ বিলিয়ন ডলারের বই বিক্রি হয়েছে। এছাড়া 'বর্ডারস গ্রুপ' নামে আর একটি সুপার বুক স্টোর চেইনস আছে, যাদের ওই নতুন ব্যবস্থার ফলে গত বছরে বই বিক্রির হার শতকরা ৮৭ ভাগ বেড়ে গেছে।

কিন্তু ছোট ছোট বই-এর দোকানগুলির ক্ষতি হয়েছে। তাদের মালিকরা বড় দোকানের সঙ্গে পাল্লা টানতে পারছে না। অনেক ছোট ছোট বই-এর দোকান উঠে যাচ্ছে। বই বিক্রেতাদের যে সংগঠন আছে, তারা জানিয়েছে—১৯৯১ সালে ছোট দোকানে বই বিক্রির হার যা ছিল, গত বছরে তার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। আমেরিকান বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ সালে শতকরা ২২.১ জন ক্রেতা চেইন বুক স্টোর থেকে বই কিনেছেন। ১৯৯৪ সালে বই কিনেছেন শতকরা ২৭ জন। ছোট ছোট বই-এর দোকানে ১৯৯১ সালে বই কিনেছেন শতকরা ৩২.২৫ ক্রেতা। গত বছর সে সংখ্যা নেমে গেছে শতকরা ১৯ জনের কাছাকাছি। বুক ক্লাব-এর মেম্বার হয়ে কিস্তিতে বই কিনেছেন শতকরা ১৬.৬ জন (১৯৯১ সালে)। গত বছর কিনেছেন শতকরা ১৭ জন। ডিসকাউন্ট স্টোর অর্থাৎ সস্তাগণ্ডার দোকান থেকে বই কিনেছেন শতকরা ৭.১ জন (১৯৯১ সালে) ১৯৯৪ সালে কিনেছেন শতকরা ৮ জন। ডাকযোগে বই কিনেছেন শতকরা ৩.৬ জন (১৯৯১ সালে)। ১৯৯৪ সালে কিনেছেন শতকরা ৫ জন। পুরনো বই-এর দোকান থেকে ব্যবহৃত বই কিনেছেন শতকরা ২.৭ জন (১৯৯১ সালে)। ১৯৯৪ সালে কিনেছেন শতকরা ৪ জন। ওষুধের দোকান আর মুদির দোকান থেকে শতকরা ৫.৪ জন ১৯৯১ সালে বই কিনেছেন। গত বছর কিনেছেন শতকরা চারজন। অন্যান্য দোকান, অর্থাৎ কার্ডস্টোর, গিফট স্টোর, হবি স্টোর, ক্র্যাফট স্টোর, ডিপার্টমেন্ট স্টোর ইত্যাদি থেকে বই কিনেছেন মোট ৭.৪% ক্রেতা (১৯৯১ সালে)। গত বছর ওই দোকানগুলি থেকে বই কিনেছেন মোট ১০% ক্রেতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে—এই কয়েক বছরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছোট ছোট বই-এর দোকানের ব্যবসা। গত দেড় দু'বছরে পঞ্চাশটিরও বেশি বই-এর দোকান হয় উঠে গেছে, নয়তো শাখাগুলি বন্ধ করে দিয়ে মূল দোকানটি খোলা রেখেছে। অধিকাংশ মালিকই জানিয়েছেন, তাঁরা ওই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না।

প্রকাশকরা বেশ চিন্তিত। তাঁরা মনে করেন আমেরিকার মতো এত বড় দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় বই-এর দোকান যথেষ্ট সংখ্যায় না থাকলে, পাঠকরা নানাভাবে বঞ্চিত হবেন। কারণ, দোকানে সংগ্রহের তালিকায় ব্যক্তিগত রুচি ও বিষয় বৈচিত্র্যের প্রভাব কমে যাবে। চেইন বুক স্টোরগুলি হুবহু একই কায়দায়, একই ধরনের সংগ্রহ দিয়ে সাজানো থাকে। যেহেতু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগে পুষ্ট, সেহেতু বইপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও করপোরেট প্রেশার অর্থাৎ ওপর মহলের চাপ সৃষ্টির ব্যাপার থাকে। এ জন্যে বহু বিতর্কিত কোনও কোনও বই দোকানের তাক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ মূল সমাজের কোনও

বিশেষ শ্রেণীকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না। কিন্তু ছোট ছোট বই-এর দোকানের মালিক এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীন। তিনি নিজের ইচ্ছে মতো সংগ্রহ সাজাতে পারেন। বই-এর তালিকায় বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেন। ক্রেতার পক্ষে তেমন দোকানই ভাল, যেখানে তিনি বিতর্কিত চিন্তাধারার বই কেনার সুযোগ পাবেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে—'ওয়ালডেন বুক স্টোর', বা 'বার্নস অ্যান্ড নোবল'-এও এই ধরনের বই-এর অভাব আছে। তবু, ছোট ছোট বই-এর দোকানের সংগ্রহ সম্পর্কে প্রকাশক এবং বই বিক্রেতাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এ জন্যেই তাঁরা কিছু উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

এই হল মোটামুটি এদেশের বই-এর বাজারের সাম্প্রতিক অবস্থার খবর। এবারে বেস্ট সেলিং বুকস-এর নামধাম জানিয়ে লেখা শেষ করব। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের পর্যবেক্ষণ ও বিক্রি অনুযায়ী বেস্ট সেলিং লিস্ট দিচ্ছি। এক সপ্তাহে সারা আমেরিকার মোট আড়াই হাজার বই-এর দোকানে কোন বই কত বিক্রি হয়েছে দেখা যাক। হ্যাঁ, বই-এর দোকানগুলির নাম হচ্ছে—বি ডালটন, বার্নস অ্যান্ড নোবল, বুক ল্যান্ড, বুকস-এ মিলিয়ন, বুকস অ্যান্ড কোম্পানি, বুকস স্টার, বুক স্টপ, বর্ডারস্, ব্রেনট্যানোস্, কোলস, কুপার স্মিথ, ক্রাউন, ডাবলডে সুপার ক্রাউন, ওয়ালডেন বুকস স্টোরস ইত্যাদি।

বেস্ট সেলিং বইগুলি হচ্ছে (জনপ্রিয়তা ও বিক্রি অনুসারে) (১) দ্য রেইন মেকার (লেখক জন গ্রিশাম্) ৮৬ কপি বিক্রি হয়েছে, (২) দ্য ব্রিজেস অফ ম্যাডিসন কাউন্টি (রবার্ট জেমস্,) ৭২ কপি বিক্রি হয়েছে (৩) দ্য অ্যাপোক্যালিন্স ওয়াচ্ (রবার্ট লাডলাম) ৫৬ কপি বিক্রি হয়েছে (৪) লেট মি কল ইউ 'সুইট হার্ট' (মেরিহিগিনস্ ক্লার্ক) ৪০ কপি বিক্রি হয়েছে (৫) সেলেসটাইন প্রফেসি (জেমস রেডফিলড্) ৩৪ কপি বিক্রি হয়েছে, (৬) স্ট্রেঞ্জ হাইওয়েজ (ডিন কুন্স) ২৭ কপি বিক্রি হয়েছে, (৭) ওয়স্ আপ-অন্ আ মোর এনলাইটেনড (জেমস ফিন গার্নার) ২৩ কপি বিক্রি হয়েছে। (৮) মাইন্ড প্রে (জন্ স্যানফোর্ড, ২২ কপি বিক্রি হয়েছে, (৯) পলিটিক্যালি করেক্ট বেড টাইম (জেমস ফিন গার্নার) ২০ কপি বিক্রি হয়েছে। (১০) রিডেমপশন (লিওন ইউরিস্) ১৭ কপি বিক্রি হয়েছে, (১১) ল্যাডার অফ ইয়ার্স (অ্যান টাইলার) ১৬ কপি বিক্রি হয়েছে, (১২) আওয়ার গেম (জনলি কার) ১২ কপি বিক্রি হয়েছে, (১৩) বর্ডার মিউজিক (রবার্ট জেমস্ ওয়ালার) ১২ কপি বিক্রি হয়েছে, (১৪) থিন এয়ার (রবার্ট বি পার্কার) ১২ কপি বিক্রি হয়েছে, (১৫) ফ্রিডমস ল্যাডিং (অ্যান ম্যাকাফ্রে) ৯ কপি বিক্রি হয়েছে।

ওপরের বইগুলি হচ্ছে ফিকশন তালিকার ওই সপ্তাহের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বই। এবার বেস্ট সেলার লিস্টে নন-ফিকশন তালিকায় কী কী উঠেছে দেখা যাক। (১) মেন আর ফ্রম মারস, উইমেন আর...' (জন গ্রে) বিক্রি হয়েছে ৪৮ কপি (২) কেটো কেলির ঃ দ্য হোল ট্রুথ্। (মার্ক এলিয়ট) ৩০ কপি বিক্রি হয়েছে, (৩) দ্য হট্ জোন। (রিচার্ড প্রেস্টন) ২৮ কপি বিক্রি হয়েছে (৪) সেভেন স্পিরিচুয়াল লজ অফ সাকসেস (দীপক চোপড়া) ২৮ কপি বিক্রি হয়েছে। (৫) ইন্ দ্য কিচেন উইথ রোসি। (রোসি ড্যালি) ২৩ কপি বিক্রি হয়েছে। (৬) হাউ টু আর্গ্য অ্যান্ড উইন্ এভরি...(জেরি স্পেন্স) ২১ কপি বিক্রি হয়েছে, (৭) স্পন্টেনিয়াস হিলিং (অ্যান্ড্রু ওয়াইল্) ১৭ কপি বিক্রি হয়েছে। (৮) মারস্ অ্যান্ড ভিনাস্ ইন দ্য বেডরুম (জন্ গ্রে) ১৫ কপি বিক্রি হয়েছে, (৯) ডেভ ব্যারিস

কমপ্লিট গাইড টু...(ডেড ব্যার) ১৪ কপি বিক্রি হয়েছে, (১০) ইন রেট্রোসপেক্ট (রবার্ট ম্যাকনামারা) ১৩ কপি বিক্রি হয়েছে, (১১) মিডনাইট ইন দ্য গার্ডেন অফ গুড...(জন বেরেন্ট) ১২ কপি বিক্রি হয়েছে, (১২) দ্য ডিসিপ্লিন অফ মার্কেট লিডারস্। (এম ট্রেসি অ্যান্ড এফ ওয়ারসিমা) (১৩) সিসটারস (সি-স্যালাইন অ্যান্ড এস ওয়লমুথ্) ১১ কপি বিক্রি হয়েছে, (১৪) ডেথ অফ কমন সেন্স (ফিলিপ্ কে হাওয়ার্ড) ১১ কপি বিক্রি হয়েছে। (১৫) এ গুড ওয়াক সয়েল্ড (জন্ ফাইনস্টাইন) ১০ কপি বিক্রি হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে ডক্টর দীপক চোপড়ার লেখা বই নন ফিকশন লিস্টে জনপ্রিয়তার চতুর্থ সারিতে আছে। বেস্ট সেলার লিস্ট অনুযায়ী সেরা বই-এর বিচার হয় কিনা এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। জনপ্রিয়তার সঙ্গে শিল্পের গুণগত মানের খুব নিকট সম্পর্ক আছে বলে সমালোচকরা মনে করেন না। নন ফিকশন লিস্ট থেকেই উদাহরণ দিই। দু'নম্বরে উঠে গেছে 'কেটো কেলিনের' পাঁচালী। ও. জে সিম্পসন হত্যা মামলার সঙ্গে জড়িত একজন নিষ্কর্মা লোকের সত্যিমিথ্যের মিশেল দেওয়া গল্প, যাকে 'গুল গল্পের' সঙ্গেই তুলনা করা চলে। কিন্তু কপালগুণে তাঁর বই এখন বাজার ধরে ফেলেছে। তাঁর লেখা অবশ্য নয়, ওই 'অনুলিখন' যাকে বলে। লেখকও খুব লাভবান হচ্ছেন। আসলে পাঠক যে কখন কী খায়, সে তাদের ওই খাই-খরচের পাশে বই-খরচ-এর হিসেব দেখলে আন্দাজ করা অসম্ভব। যাঁরা আন্দাজ করতে পারেন, তাঁরা ঠিক ঠিক রেঁধে ফেলেন। 'মাদার টেরেজা'কে ডিপ ফ্রিজে তুলে রেখে 'কমপ্লিট গাইড টু...' 'মশল্লা দিয়া রান্ধেন। পাঠক ভালই খায়।'

৮ জুলাই ১৯৯৫

সেমিনারের জলসাঘরে

আমরা এখন সেমিনার কালচারে আছি। যখন থেকে বঙ্গ সম্মেলনে, রবীন্দ্রমেলা, বাংলাদেশ সম্মেলন ইত্যাদি আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকেই সেমিনার বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। সেমিনার কমিটি তৈরি করার কাজে নিউ ইয়র্কের চিকিৎসক ডঃ খোন্দকার আলম্গীরকে আমরা খুবই উপযুক্ত বলে মানি। বাংলাদেশের মানুষ, দীর্ঘদিন আমেরিকায় আছেন। পেশায় চিকিৎসক হলেও সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ বিজ্ঞান—সব বিষয়েই তাঁর সমান আগ্রহ। আর আছেন দুই রণজিৎ দত্ত। দু'জনেই প্রেসিডেন্সি আর সায়েন্স কলেজে একসঙ্গে পড়েছেন। দুই ডক্টরেটের মধ্যে একজন থাকেন নিউ ইয়র্কে। "বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের" ফাউন্ডার মেম্বার। অন্য রণজিৎ দত্ত আগে ছিলেন ওহায়োর ক্লিভল্যান্ডে। এখন ভার্জিনিয়ায় অধ্যাপনা করেন। সেমিনারকে অভিবাসী বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বলে এঁরা বিবেচনা করেছেন। বিভিন্ন বঙ্গ সম্মেলনে সেমিনারের বিষয়সূচি নির্ধারণ, বক্তা ও নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা—ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা এঁরা করে আসছেন।

সেমিনারের বিষয়সূচির বৈচিত্র্য সম্পর্কে আগে বঙ্গ সম্মেলনের বিবরণ দিতে গিয়ে কয়েকবার লিখেছি। এবার সেই সুদীর্ঘ তালিকায় যাব না। মোটামুটিভাবে বলতে পারি মার্কিনবাসী ভারতীয় সমাজের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে নানা ইস্যুর ওপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেরকমই গুরুত্ব পায় পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতিমূলক আলোচনা। সেখানে আমন্ত্রিত সাহিত্যিক, শিল্পীরা থাকেন মূল বক্তা। যাই হোক, এ প্রসঙ্গে আর বিস্তার করব না। সেমিনার সম্পর্কে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখব। রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিউ ইয়র্কে দু'দিন ধরে উৎসব হয়েছিল। ডক্টর ভবতোষ দত্ত এসেছিলেন। চমৎকার ভাষণ দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় দিনে সাত সকালে ছিল আমাদের দু'চারজনের নোট খাতা উগরে দেওয়া "বাণীর" ব্যবস্থা। ডক্টর আলমগীর সময় দিয়েছিলেন কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট। সে তো মেলা সময়। এখন আর আমরা অত দিই না। দশ মিনিট হয়ে গেলে চিরকুট ধরাই। আসলে বক্তার সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে তো! আগে আগে 'বাণীকুমার'দের একটু আকাল ছিল বলে অনায়াসে কুড়ি/পঁচিশ মিনিট বকবক করা যেত।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আলমগীরকে "জো হুকুম" বলে বেশ দিস্তে খানেক কাগজ নিয়ে বসলাম। "রবীন্দ্রসাহিত্যে অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদ ও মানবতাবাদ নিয়ে" ক'দিন ধরে খস খস করে অনেক পাতা লিখে ফেললাম। কোটেশনে কোটেশনে ছয়লাপ। তারপর সেমিনারের দিন পাতা উলটে উলটে পড়ে গেলাম। গোরা, চণ্ডালিকা, অচলায়তন আর প্রবন্ধ থেকে কোটেশন টোটেশন দেওয়ার সময় শ্রোতাদের দিকে তাকানোর চেষ্টা করছিলাম। যেন ও সব আমার কণ্ঠস্থ। সময়ের মধ্যেই শেষ করেছিলাম। বাংলা জানা আধ ডজন সাহেব, মেমসাহেব নিয়ে সর্বসাকুল্যে জনা পঞ্চাশেক শ্রোতা পেয়েছিলাম। তাঁরা যেমন বলেন, সেইরকমই বলেছিলেন—আহা! বেশ, বেশ, বেশ।

কিন্তু গানে ভুবন ভরিয়ে দিইনি বলে ডক্টর যাদুগোপাল একটু সমালোচনা করেছিলেন। গান নাকি শুকনো বিষয়ে প্রাণ সঞ্চার করে! ধাবমান জনতাকে চেয়ারে এনে বসায়। বাণী শেষ করে যখন ক্যাফেটেরিয়াতে চা খেতে গেছি, যাদুগোপালের সঙ্গে দেখা। বললেন—সব কিসুরে ইনটারেস্টিং করা যায়। গোরার প্যাসাল বাদ দিয়া আপনের উসিৎ ছিল দুই খান করুণ গান গাওয়া। ওই সুয়োনা সুয়োনা সিঃ, আর ঘৃণা কইরাসো তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে—যদি গাইয়া দিতেন, দ্যাখতেন ইম্প্যাকট্ কারে কয়?

যাদুগোপালের পরামর্শ আমি না শুনলেও উড়িয়ে দিতে পারি না। ডেমনস্ট্রেশন সহযোগে সেমিনার কানাডার বঙ্গ সম্মেলনে গিয়ে শুনেছি। গান নিয়েই সেমিনার অবশ্য। শুকনো বিষয়কে হারমোনিয়মের সাহায্যে ঝংকৃত করে চিত্তাকর্ষক করতে চাওয়া হয়েছিল।

তবে হ্যাঁ, সেমিনারে বক্তৃতা শেষ করার পরে জনতার দাবিতে গান গেয়েছিলেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। বস্টনের বঙ্গ সম্মেলনে আধুনিক গদ্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে আমরা তাঁর টপ্পা শুনেছিলাম। বুদ্ধদেব গুহকে ঘিরে খুব ভিড় হয়েছিল। গান যা গেয়েছিলেন, মোটেই চান ঘরে গানের মতো নয়, রীতিমতো হলঘরে গাওয়ার মতো দারুণ গলা।

শিকাগো বঙ্গ সম্মেলনে সেমিনার শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। আলোচনার বিষয়

ছিল—পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা। সেখান থেকেই বুদ্ধিজীবীরা প্যানেলিস্ট হিসেবে এসেছেন। বিষয় যে উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো নয়, সে কথা সম্যক অনুধাবন করেই বোধহয় স্থানীয় শিল্পী গাইলেন—"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে মঙ্গল আলোক", তারপর "আর রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও।" আমার ধারণা দ্বিতীয়টা লোডশেডিং-এর সময় ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবেই শিল্পী নির্বাচন করেছিলেন। এমন প্রাণ ঢেলে গাইলেন যে প্যানেলিস্ট, মডারেটর সবাই অভিভূত! এই যে একটা বিমর্ষভাব ছড়িয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার আবহসঙ্গীত হিসেবে তা অনেকক্ষণ চালু থাকল। নবনীতা দেবসেন ভারাক্রান্ত হয়ে বলেছিলেন আমাদের ছেলেমেয়েরা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সবই যেন সিসিফাসের মতো পাথর বহন করে চলেছে...

সেমিনারে নাচ দেখেছেন? আমি দেখেছি। এক বঙ্গ সম্মেলনে "অভিবাসী বাঙালি ছেলেমেয়েদের বিবাহ" ছিল আলোচনা চক্রের বিষয়। নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দেখি সেমিনারের হলে টেবিল চেয়ারের কোনও ব্যবস্থা নেই। চারজন বসব বলে শুনেছি। বাকি তিনজন এসেও গেছেন। কিন্তু স্টেজে কোনও গীতি আলেখ্য টালেখ্য হবে বলেই মনে হচ্ছে। সেমিনারের কনভেনর বললেন, এই টপিক্টা ভীষণ সেন্সেশন ক্রিয়েট করেছে! টিন এজাররা, পেরেন্টস্, ইয়াং কাপল—সবাই জয়েন করতে চাইছে। তাই ভাবলাম বিয়েই যখন টপিক, তখন আরম্ভটা একটু ইন্টেরেসটিং করা যাক। দু/তিনটে নাচ থাকছে প্রথমে। বিয়ের কন্সেপ্ট দিতে চাইছি বুঝলেন?

সে আর বুঝিনি? একদল মেয়ে হাত, পা ঘুরিয়ে কোমর দুলিয়ে "সোহাগ চাঁদ বদনি ধনি" নাচতে লাগল। সেকেন্ড জেনারেশনকে বিয়ের কনসেপ্ট দেওয়া হল। বালারা সব হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নাগকেশরের ফুল বলে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নাচ শেষ করার পরে উইংসের পাশে আরও একটা "বউ" মুখ বাড়াচ্ছিল। তখনই জানি আরও "বউ নাচ" বাকি আছে। কিন্তু আচমকা ক্যাসেটের বিশ্বাসঘাতকতায় কোনও এক গাঁয়ের বধূ—ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোচনাচক্র বসিয়ে দিয়ে কনভেনর বউদের মেইন অডিটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিলেন।

সেমিনারে মডারেটরের সঙ্গে প্যানেলিস্টদের ধুন্ধুমার ঝগড়া হয়েছিল একবার। এই নিউ জার্সিতেই। দ্বিতীয় প্রজন্মের সঙ্গে প্রথম প্রজন্মের তুমুল তর্ক। আলোচনার বিষয় ছিল—আমেরিকায় বাঙালি দ্বিতীয় প্রজন্মের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান।

যখন থেকে টপিক জানানো হয়েছে, তখন থেকেই আশাতীত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। সামাজিক নয়, পারিবারিক ইস্যু নিয়েই অধিকাংশ ছেলেমেয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক।

সময় উপযোগী বিষয় বলে বহু ছেলেমেয়ে যোগ দিতে এসেছিল। প্রায় বারো, তেরো জন টিন এজার প্যানেলে বসেছিল। অনেকে ফ্লোর থেকে কথা বলতে উঠছিল। অভিভাবকদের ভিড়ে হলে আর দাঁড়ানোরও জায়গা ছিল না।

প্রশ্ন হল এরা তো নিজেদের কথা বলবে, কিন্তু মডারেটরের কাজটা কী? সাধারণত তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে—প্রথমে প্যানেলিস্টদের পরিচয় দেওয়া, বিষয়ের উল্লেখ করা, সেমিনার পরিচালনা, সময় নিয়ন্ত্রণ, বক্তা অথবা শ্রোতার অবান্তর কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে মূল আলোচনায় ফিরিয়ে আনা, শ্রোতাদের কাছ থেকে বেছে বেছে প্রশ্ন নেওয়া, প্যানেলিস্টদের

দিয়ে উত্তর দেওয়ানো এবং সব শেষে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার জানানো। তিনিই ভাল মডারেটর হতে পারেন, যাঁর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে। নয়তো সারাংশ দেবার সময় অসুবিধে হতে পারে। তবে সবচেয়ে দরকার হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

ওই সেমিনারের জন্যে একজন বাঙালি সাইকোলজির প্রফেসরকে ধরে এনেছিলাম। মধ্যবয়সী ওই ভদ্রলোক মনোবিজ্ঞানের ওপর ডক্টরেট করেছেন, বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের মন মেজাজ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন, ভেবেছিলাম উনিই হবেন উপযুক্ত মডারেটর।

ওঃ কী ভুল যে হয়েছিল! ভদ্রলোক নিয়ন্ত্রক হবেন কি, ভীষণ বকাবকি শুরু করলেন। আঠারো বছরের মেয়েরা বলছে তাদের ডেট করা নিয়ে, আমেরিকান ছেলে বন্ধু থাকা নিয়ে বাঙালি বাবা, মা খুব আপত্তি করেন। বাধা দিতে চেষ্টা করেন। আমেরিকার জন্মে, বড় হয়ে কী করে তারা পুরোপুরি বাঙালি বাড়ির ভাবধারা মেনে চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। ফ্লোর থেকেও কেউ কেউ সুর মেলাচ্ছে। অভিভাবকরাও কথা বলার জন্যে অস্থির। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ছোট ছোট মেয়েদের তীর্যক কথাবার্তা শুনে এত রেগে গেলেন যে এক ধমক—বাবা মারা যা বলেন ভালর জন্যে বলেন। কম বয়স থেকে ডেট করা, রাত করে বাড়ি ফেরা এসব কখনও অ্যালাও করা যায় না।

টিন এজাররা সব এককাট্টা হয়ে গেল। চোখা চোখা প্রশ্ন করল—কেন? আমেরিকানরা কিসে খারাপ? ইন্ডিয়াতে তো সব কিছুই লুকিয়ে লুকিয়ে চলে। বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে মেয়েরা ডেট করতে যায়।

মডারেটর ধমকে বললেন, কেন বাধা দেওয়া হয় জানো না? বিয়ে হলে ক'টা টিকবে? ডিফোর্সের রেট কত বেড়ে যাচ্ছে দেখছ না?

ছেলেমেয়ের দঙ্গল গলা মিলিয়ে বলছে—ইন্ডিয়ানদেরও ডিভোর্স হয়। যদি ডিভোর্স নাও হয়, কমপ্যাটিবিলিটি যে কত কম থাকে, তাও জানি। ওইসব আন-হ্যাপি ম্যারেজগুলো কেউ কাউন্ট করে না তাই...।

সে এক দক্ষযজ্ঞ। আলোচনা মাথায় উঠল। বাবা, মারা বিক্ষুব্ধ! কেউ কেউ চিৎকার করে বললেন—আমরা তোমাদের ভালবাসি। তোমরা সেটা রিয়েলাইজ করো না...ছেলেমেয়েরা বলতে লাগল—অফ কোর্স উই ডু...বাট ইউ পিপল ডোন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড...

মাঝখান থেকে মডারেটরের নাম হয়ে গেল 'জ্যাঠামশাই'। তাঁর বউই রেগে গিয়ে নাম দিয়ে দিল। ভদ্রলোক পরে আমাকেও ধমকেছেন—আমাকে ডাকার কী দরকার ছিল ডেঁপো ডেঁপো সব কথা! বাবা, মারা কিছু জানে না। তোরা সব বুঝিস! দিয়েছি ঠাণ্ডা করে।

প্যানেলিস্টদের নিয়েও সমস্যা হয় মাঝে মাঝে। ধরুন একটি আলোচনাচক্রের জন্যে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। তিনজন বক্তা থাকলে বারো মিনিট করে যদি দেওয়া যায়, তবেই আগে পিছে হাতে একটু সময় থাকে। পনেরো মিনিট করে দিলে সময়ে টান পড়ে যায়। প্রশ্নোত্তর পর্বে বেশি সময় না দিলে শ্রোতারা রেগে যান। তাঁরা একটানা বক্তৃতার চেয়ে শেষ দিকের এই বাদানুবাদ বেশি উপভোগ করেন। অবশ্য বারো মিনিট বক্তাদের কাছে পর্যাপ্ত সময় নয়। এইসব কারণে একটু মানিয়ে নিতেও হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছু

উৎসাহী লোক প্যানেলে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করেন। সরাসরি বসতে না পেলে ফ্লোর থেকে মাইকের সামনে এসে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চলেন। সারবস্তু থাকলে সময়ের অভাব বুঝেও থামানো হয় না। অবান্তর হলে অবশ্য শ্রোতারাই মাঝে মাঝে থামিয়ে দেন। যেমন সম্প্রতি উত্তর আমেরিকায় বাঙালি মহিলার জীবন-প্রসঙ্গে একটি আলোচনাচক্রে এক মহিলা খাতা হাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বসে গেলেন। আমন্ত্রিত প্যানেলিস্টদের তিনজনকে নির্ধারিত সময় দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থজন বলতে শুরু করলে প্রশ্নোত্তরের সময়ই থাকবে না। তাছাড়া প্রতি বছর ইনি প্রত্যেক সেমিনারেই কিছু বলতে চান, এবং বিশেষ কোনও সারবস্তু থাকে না। যাই হোক; এবারও এলেন। মধ্যবয়স্কা, নিঃসন্তান মহিলা। খুবই সাচ্ছন্দ্যের জীবন। তিনি আমেরিকায় বাঙালি মেয়েদের সমস্যা প্রসঙ্গে নানা উদাহরণ দিচ্ছিলেন। বারবারই বললেন—বাচ্চা মানুষ করার কী ভীষণ চাপ, চাকরি বাকরি করার পরেও বাড়িতে সত্যনারায়ণ, লক্ষ্মীপুজো করার চাপ—মেয়েদের এত কঠোর জীবন! এত কষ্ট! সত্যি! কীভাবে যে তারা চালিয়ে যাচ্ছে! এইসব পুজো টুজোও নাকি করতে হচ্ছে আজকাল! শুধু প্রেশার! সব শেষে আমি বলব তোরা যেন দশভূজার কাছে শক্তি চেয়ে নেয়, যাতে দশভূজা হয়ে এত কাজ করতে পারে...।

যখন তিনি নিমীলিত চক্ষে দশভূজাকে ডাকার সাজেশন দিচ্ছিলেন, তখনই একজন শ্রোতা ধ্যান ভাঙিয়ে চেপে ধরলেন—আপনি দু'রকম কথা বলছেন যে! একবার বলছেন আমেরিকার বাঙালি মেয়েদের ওপর পুজো টুজো ভীষণ প্রেশার ক্রিয়েট করছে। আবার তাদেরই বলছেন দশভূজাকে ডাকতে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করা, কিংবা নিজের বাড়িতে পুজো করা, সে তো তাঁরা নিজেদের ইচ্ছেতেই করছেন। পরিশ্রম হতে পারে, কিন্তু ভীষণ কষ্টের কী দেখলেন?

মহিলা হাসলেন। কাগজটা মুড়িয়ে নিতে নিতে বললেন—আসলে সব সময় ইংলিশ-এ লিখি তো। বাংলায় বোধহয় ঠিকমতো বোঝাতে পারলাম না।

এরকম প্যানেলিস্ট প্রত্যেক সেমিনারে পাবেন। আবার উলটোও হয়। নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে মাথায় হাত পড়ে। আমার এবারেই সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। বঙ্গ সম্মেলনে রবিবার দুপুরে ছিল উত্তর আমেরিকায় বাংলা পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ও প্রয়োজন বিষয়ে সেমিনার। ছ' মাস আগে ডক্টর আলমগীর চিঠি পাঠিয়েছেন, প্যানেলিস্টদের সঙ্গে যেন কথা টথা বলে মডারেটরের কাজকর্ম পাকা করে রাখি। ইদানীং সব কাজেই গড়িমসি করি, ভুলে যাই। তারপর শিয়রে সংক্রান্তি এলে টনক নড়ে। আলমগীর সাহেবের কথা মতো প্যানেলিস্ট ধরতে একটু দেরিই হল। নিউ ইয়র্কে বাংলা পত্রিকা চালান বাংলাদেশের কৌশিক আমেদ। '৮৯ সালে নিউ ইয়র্কের বঙ্গ সম্মেলনে একসঙ্গে সেমিনার করেছি। এবার যোগাযোগ করাতে কৌশিক বললেন—বারো মিনিটে কী বলব বলেন? আমেরিকায় বাংলা পত্রিকা বার করি। আমার অভিজ্ঞতার কথা মাত্র বারো মিনিটে! অসম্ভব।

—কিন্তু আরও যে বক্তা আছেন কৌশিক। রণজিৎদা আছেন, মীরা দাস, জ্যোতির্ময় দত্ত...।

—ওঁরা তো বাংলাদেশের কথা জানেন না। আমি নিউ ইয়র্কে থেকে বাংলাদেশের খবর দিয়ে কাগজ বার করি। গ্রাহক গোষ্ঠী সম্পূর্ণ আলাদা। আমাকে অন্তত পনেরো মিনিট দেন।

কথা দিলাম। কৌশিক তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বঙ্গ সম্মেলনের প্রথম দিনেই লিখে আনবেন বললেন। তৃতীয় দিনে সেমিনার। অসুবিধের কিছু নেই। এর মধ্যে ইন্ডিয়া অ্যাব্রড পত্রিকায় দু' দিনের চেষ্টার পরে সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্তকে পেলাম। হ্যাঁ, বুদ্ধদেব বসুর জামাই জ্যোতির্ময়। এখন নিউ ইয়র্কে সাপ্তাহিক পত্রিকা "ইন্ডিয়া অ্যাব্রড"-এ সম্পাদক-মণ্ডলীর একজন। খবরের কাগজের অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্যে ওঁর যা রসদ আছে, ভেবে দেখলাম বারো মিনিটের প্রস্তাব দেওয়া যাবে না। তাই পনেরো মিনিট ধরে নিলাম।

কিন্তু যথাকালে দুই বক্তাই অনুপস্থিত। ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে। সেমিনারের লোকজন অপেক্ষা করছেন। চারজন প্যানেলিস্টের মধ্যে দু'জনের দেখা নেই। কৌশিক তাঁর পনের মিনিট চেয়ে নিয়ে গরহাজির। জ্যোতির্ময় দত্তকে জরুরি কাজে "ইন্ডিয়া অ্যাব্রড"-এর অফিসে যেতে হয়েছে। খবরটা পেলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে। এখন আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে কী করি? রণজিৎ দত্ত বঙ্গ সম্মেলনের ঠিক আগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নয়তো ওঁর চেয়ে অভিজ্ঞ আর কে আছেন? নিজেদের বলেন "আঠক", যেহেতু নানা খবরের কাগজের ক্লিপিং কেটে কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে, তার কপি হিসেবে সংবাদ বিচিত্রা বার করেন। তবু কুড়ি বছরের ওপর এই কাজ করছেন তো! আমাদের সেমিনারের যা বিষয়, সে সম্পর্কে ভালই বলতে পারতেন। অসুস্থতার জন্যে রণজিৎদাকে প্যানেলে বসানো যাচ্ছে না। একমাত্র মীরা দাসকে বুঁদির কেল্লা রক্ষা করতে হবে। সে আমার সহপাঠিনী। ওই সংবাদ বিচিত্রায় আঠকের কাজ করেছে বহু বছর।

অবস্থা বুঝে মীরা বলল—আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম ঠিক সাত মিনিট বলব। এখন মেরে কেটে দশ মিনিট। বাকিটা তুমি সামলাও।

কী মুশকিল! ব্রোশিওরে একরকম ছাপা হয়েছে। আর আমি এখন পাগলা দাশুর মতো মডারেটর থেকে প্যানেলিস্ট হয়ে লাগাতার ফিরে ফিরে আসব? তাছাড়া কৌশিকের অভিজ্ঞতা তো জানি না। বাংলাদেশের মানুষ, নিউ ইয়র্কে পত্রিকা বার করেন, এমন কাউকে চিনি অবশ্য। অন্যান্য সেমিনারে তাঁদের সঙ্গে কাজও করেছি। যেমন "প্রবাসী"র সম্পাদক মহম্মদ উল্লাহ ভাল বলেন। কিন্তু এখন তাঁকে কোথায় পাব?

হঠাৎ দেখি দূরে মোহন গোমেজ আসছেন। ওঃ কী অপূর্ব যোগাযোগ। বাংলাদেশ, কলকাতা নিয়ে মোহনের ডবল ব্যাকগ্রাউন্ড। বহুদিন আগে থেকে বাংলা সাহিত্য পত্রিকা বার করার জন্যে প্রয়াত মনোজ ভৌমিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অতলান্তিক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে লেখালেখি সূত্রে যুক্ত ছিলেন। এঁর চেয়ে অভিজ্ঞ আপাতত আর কাকে পাব? কৌশিকের বদলে মোহন গোমেজকে বসিয়ে দিলাম। প্রথমে অপ্রস্তুত থাকলেও ক্রমশ নিউ ইয়র্কে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় মর্মবেদনার কাহিনী, (যার মধ্যে দলাদলি আর অর্থাভাবই প্রধান কারণ) বেশ মর্মস্পর্শী ভাষাতেই বলে গেলেন। পত্রিকার অভাব গেল, দুঃখ গেল না—বলে মোহন গোমেজ এমন আবেদন সৃষ্টি করলেন যে শ্রোতারা প্রায় শোকসভায় বসে থাকার মতো কিয়ৎক্ষণ নীরবতা পালন করলেন। বেশ একটা পরিবেশ সৃষ্টি হল। কিন্তু আমার বাকি পনেরো মিনিট? অবশ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত বক্তারা ইতিমধ্যেই আবেদন করে গেছেন। জনা চারেক প্রায় টেবিলের কাছেই বসে আছেন। ভাবছিলাম, পরে প্রশ্ন যখন চাইব, তখন এঁরাই নিশ্চয়ই ফ্লোর থেকে যোগ দেবেন, তাহলে এ মুহূর্তে কী করা যায়?

ইতিমধ্যে ডক্টর রণজিৎ দত্ত হুইল চেয়ারে বসে সেমিনার শুনতে এসেছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও বঙ্গ সম্মেলনের ডাক উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মীরার সঙ্গে ফিশ ফিশ করে কথা সেরে নিয়ে রণজিৎদাকেই অনুরোধ করলাম, যদি কিছু বলেন।

প্রথম বক্তা শেষ পর্যন্ত সেমিনারের শেষ বক্তা হলেন। রণজিৎদা একেবারে টানা বলে গেলেন। শ্রোতারা ওঁর উপস্থিতি আশা করেননি বলে আরও খুশি। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব এমন দীর্ঘ হল যে, পরের সেমিনারের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত বক্তাদের জন্যে এই সময়ই প্রশস্ত বলে আরও মিনিট কুড়ি দেওয়া হল। মোট কথা নির্ধারিত বক্তাদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে আমাদের খানিক টেনশন সত্ত্বেও, সেমিনার তর তর করে এগিয়ে গেল। "শুধু পড়ে যাওয়ার" কোনও ব্যাপারই ছিল না সেদিন।

হ্যাঁ! সেমিনারে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল বটে সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সময়। '৮৯ সালে নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে মিলনী ক্লাবের উদ্যোগে বঙ্গ সম্মেলন হয়েছিল। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আর শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। সেমিনারে "দুই বাংলার উপন্যাসের ধারা" বলে একটি বিষয় নির্বাচন করেছিলাম। পশ্চিমবাংলার উপন্যাস প্রসঙ্গে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় একমাত্র প্যানেলিস্ট। ওদিকে বাংলাদেশের উপন্যাস আলোচনার জন্যে ওমর শামস, কৌশিক আমেদ ছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু মডারেটর।

দর্শকরা খুব আগ্রহ নিয়ে এসেছেন। নভেলিস্ট সঞ্জীবকে আমরা প্যানেলিস্ট করেছি, সে আলোচনা তো আকর্ষণীয় হবেই। তো, প্রথমদিকে সঞ্জীব বাংলা উপন্যাসের জন্ম, ইতিহাস, ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য, যুগধর্মের প্রভাব, বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব, পৌরাণিক রচনার প্রভাব, উপন্যাসে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব, আঞ্চলিকতা, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করতে করতে চলেছিলেন। একেবারে শেষ পর্বে এসে ঘোষণা করলেন শ্রীম রচিত "কথামৃত" হল পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

ব্যস! আগুনে ঘি পড়ার অবস্থা! এক তো বঙ্গ সম্মেলনে ধর্ম আলোচনা নাস্তি। তার ওপর হল ভর্তি দুই বাংলার মানুষ। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, ক্রিশ্চান বাদ দিলেও নিরীশ্বরবাদীর দল গিজ গিজ করছেন। ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিরা সঞ্জীবকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছেন। তাঁর সমর্থকরা চিৎকার করে বলছেন—ধর্মই যদি বাধা হয়, তবে রামায়ণকে এপিক বলে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করেছেন কেন?

তখনকার মতো কোলাহল থামিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের উপন্যাসের আলোচনা শুরু করা হল। সে পর্ব চুকলে প্রশ্নবাণের আসর। বাঙালি সমস্বরে চ্যালেঞ্জ দিল—কথামৃত উপন্যাস হল কবে? উপন্যাসের আলোচনায় ধর্মের কথা আনছেন কেন?

সঞ্জীব বিনীতভাবে বললেন—আমার যা বিশ্বাস কিংবা বিচার বুদ্ধি, সেই অনুযায়ী বলেছি। আপনারা না মানতেই পারেন। হলের মধ্যে গুঞ্জন বেড়েই যাচ্ছিল। আবার হট্টগোল শুরু হতে শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন—ও ভাবে বললে তো হবে না। তোমাকে যুক্তি, ব্যাখ্যা আর উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে। তারপর দর্শকদের উৎসাহ দিলেন—আপনারা করছেন কী? এত সহজে মেনে নিলেন? সঞ্জীবকে ভাল করে চেপে ধরুন।

আবার হই হই শুরু হল। ব্যাখ্যা চাই, প্রমাণ চাই, উদাহরণ চাই। সঞ্জীবকে খোলসা

করে বলতে হবে "কথামৃত"-র মধ্যে উপন্যাসের কোন ডেফিনিশন খুঁজে পেয়েছেন? ক্রমশ সেমিনার হলে দলে দলে লোক ঢুকে পড়ছে।

সঞ্জীব নড়ে চড়ে বসলেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর দিকে শীতল চাউনি দিয়ে বললেন—আমি আপনার কী করেছি শঙ্করীদা? যেখানে যাচ্ছেন, পেছন পেছন যাচ্ছি। আর এখন সবাইকে বলছেন সঞ্জীবকে আক্রমণ করুন। আক্রমণ করুন। কেন? আমি কি বেড়াল? না কুকুর? নাকি এঁরাই তাই?

শঙ্করীপ্রসাদ হাসলেন—আহা! রেগে যেয়ো না। এত বড় একটা স্টেটমেন্ট দিলে, নিশ্চয়ই তার পেছনে যুক্তি আছে। সে কথা খুলে বলতে হবে তো।

তখনই জানি শঙ্করীবাবু কী চাইছেন। তিনি বিলক্ষণ জানতেন সঞ্জীবকে একবার মুখ খোলাতে পারলে কী ঘটবে। তথ্য, তত্ত্ব, বিশ্বাস, উপলব্ধি আর দৃষ্টিভঙ্গি যদি "বিষয়" হয়, যদি দর্শকদের মুখোমুখি বসে বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়বদ্ধতা থাকে, তবে একজন কথাশিল্পী কী করেন? মসীর বদলে যুক্তি, তর্ক আর ব্যাখ্যার অসি ধরেন তো? সঞ্জীব সেই অর্থে সশস্ত্র অভিযানেই নেমেছিলেন। প্রতিপক্ষ ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন, ধরাশায়ী। উপন্যাসের সংজ্ঞা মিলিয়ে মিলিয়ে ধেয়ে যাচ্ছেন। তরোয়াল উঁচিয়ে ফিরে আসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের "নায়ক" বলে চিহ্নিত করেছিলেন বলেই বোধহয় শেষমেশ শান্ত হলেন। শঙ্করীবাবু প্রসন্ন চিত্তে বললেন—মনে হচ্ছে আপনারা পালটা আক্রমণের জন্যে তৈরি নন। আর তো সময়ও নেই।

সেমিনার প্রসঙ্গে কত ঘটনা মনে পড়ছে। কানাডায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মহিলার "ধূলি বসন" নিয়ে টানাটানি! বস্টনে এক বৃদ্ধা "বার্ধক্যে আমেরিকা" বিষয়ে তাঁর মনের কথা আর সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাবেন বলে এসেছিলেন। প্যানেলে বসে শুধু মজফ্‌ফরপুরের স্মৃতি চারণ করে গেলেন। কাগজে লিখে দিলাম—আর চার মিনিট আছে। এবার আমেরিকার কথা বলুন।

ঝাপসা চোখে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন—ভাগলপুরের কথা কিছুই বলা হল না। এদেশে তো এলাম অনেক পরে।...ভাল লাগে না। সারাদিন একটা মানুষের মুখ দেখতে পাই না...।

এই আমাদের সেমিনার। এ মিনার শুধু পড়ে যাওয়া নয়। মস্তিষ্কের ধূসর উপাদান আর হৃদয়ের যাবতীয় অনুভূতির মিশ্রণ দিয়ে যা দাঁড়িয়ে যায়—তাকে 'কুতুব' বলবেন কি 'চারমিনার'—সে নামকরণের ভার আপনাদের ওপর দিলাম।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

জ্ঞান অঞ্জনের শলাকা

ইদানীং পারসপেকটিভ, ডায়মেশন—এইসব শব্দের নিহিতার্থ খোঁজার চেষ্টা করছি। জীবনের থ্রি-ডায়মেনশন্যাল ছবি দেখার জন্য বিশেষ চশমা নয়, দৃষ্টিভঙ্গির তিনদিকে প্রসারণ আর সংকোচনের ব্যায়াম শিখছি। নয়তো সম্যকভাবে কিছুই দেখা যায় না। অনেক ঘটনা আধেক ধরা পড়বে। আধেক বাকি থেকে যাবে। প্রসারণের জন্য যদিও বেশ চেষ্টা চরিত্রের দরকার হচ্ছে, সংকোচনের কাজটি দেখছি একেবারে সহজাত। প্রায় মজ্জাগত বলা যায়। দুয়ে মিলিয়ে তিনদিক থেকে দেখা। মনের চোখ দিয়ে যোগ ব্যায়াম আর কি? যত অনুকূল ততই সহজ হওয়ার কথা।

একই ঘটনার কত দিক আছে দেখুন। এই যে প্রবাসে বাঙালির এত সাধের অভিবাসন, যোলো আনা বিজাতীয় পরিবেশে চোদ্দো আনা পুনর্বাসন, সে তাদের কাছে যতই আকাঙ্ক্ষিত এবং স্বাভাবিক ঘটনা হোক, সকলের বিচারে তো নয়? দেশে তাদের চাকরির সুবিধে হয়নি, কিংবা জুটে থাকলেও হঠাৎ অসম্ভব বড়লোক হবার লোভ হয়েছিল—প্রকাশ্যে এত দূর না বললেও কেউ কেউ জনান্তিকে বলেন। যাঁরা দেশত্যাগী হননি, তাঁদের কারুর কারুর স্টেটমেন্ট আর কী! তাঁদের ডায়মেনশন অনুযায়ী অনাবাসীরা এতই সামান্য মাপের মানুষ, যে, কোনও কালে ফলাও করে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা টাত্রার কথা ছাপিয়ে থাকলে প্রভূত লজ্জা পাবেন। 'দেশে কিছু হচ্ছিল না দেখে মাইগ্রেশন নিয়ে চলে গেল। আমেরিকায় যা ডিসক্রিমিনেশন, বড় চাকরি দিচ্ছে কে? সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়েও পড়ে আছে। বাঙালগুলো গেছে সবচেয়ে আগে। যাদবপুর, নাকতলা, বেহালা, বাঘাযতীন—সব গাঁ উজাড়। এক রিফিউজি থেকে আর এক রিফিউজি।'

নিশ্চয়ই গভীর স্বদেশপ্রীতি থেকেই তাঁদের ওই বিশ্লেষণ ক্ষমতা বা দৃষ্টিভঙ্গি খুলে গেছে। অনাবাসীরা নিজেদের পলায়ন দেখতে পাননি, কিন্তু তাঁরা দেখেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে ইমিগ্র্যান্টদের দুর্ভাগ্যের কথা, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর নাগরিকরা উপলব্ধি করেছেন।

তৃতীয় দৃষ্টিকোণের অধিকারী হয়েছেন আমেরিকার ত্রিশঙ্কু সম্প্রদায়। কেন যে এসেছিলেন, কেন যে থেকে গেলেন, আর কেন যে স্বদেশে ফিরতে পারছেন না—তিন বিশ্লেষণে সদাব্যস্ত। প্রবাসে অ্যাডভেঞ্চারের বশে চলে এসে কনফিউশন থেকে গভীর পারসেপশন। যে অর্থহীন দিন যাপনের ক্লান্তি আবার আপাত সুখসন্ধানী স্থূল মানসিকতায় ধরা পড়ছে না, ত্রিশঙ্কু দল সে জীবন লইয়া কী করিবেন ভাবছেন। সারাদিন গুণ গুণ—'ও...ই মহাসিন্ধুর ওপার হতে...।' রাতে নাগাড়ে হাই ওঠা পর্যন্ত—'যে জ...ন আছে মাঝখানে'...। দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র এন. আর. আই সঙ্গীত।

উপলব্ধি ছাড়া বিষাদ সঙ্গীতের অনুরণন হয় না। 'রবি'-র উপলব্ধি রবার্টে (আসল নাম প্রভাত) হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রের উপলব্ধি রমেনের। হয়তো অনুশীলন থেকে আমারও হতে পারে। জীবনের প্রতি ত্রিপার্শ্বিক দৃষ্টি সম্পাতের চেষ্টা কি বৃথা যাবে? কখন কীভাবে যে মানুষের তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয়! দুই বৃদ্ধ, কানাডা বেড়িয়ে ফিরে গেছেন। পাড়ার

ছেলেরা ধরেছিল—'কী দাদু? কেমন ঘুরলেন?' প্রথম বৃদ্ধ বিরসমুখে উত্তর দিলেন—'ধ্যুর। সব নন বেঙ্গলি।' তাঁর বোধহয় ধারণা ছিল কানাডা বাঙালিদের রাজ্য। না এলে মোহভঙ্গ হত না। কিন্তু দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললেন অন্য কথা—'তোরাও ঘুরে আয়। বাইরে গেলে চোখটা খুলে যাবে।' বলার সময় নিজের চোখের পাতা টেনে ধরে ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছিলেন।

আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলনের ছবিটাও যে অনেকের কাছেই বিশেষ পছন্দের নয় তা জেনেছিলাম কলকাতারই একজনের কাছ থেকে। তিনি নাকি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জেনেছেন সাংস্কৃতিক সমাবেশের নামে হাজার পাঁচেক আমেরিকান বাঙালি এখন তিনদিন ধরে 'ফিস্টি' করে।

এ-বিবরণ কি কোনও লেখকই তাঁকে দিয়েছিলেন? প্রশ্নটা করা হয়নি। এ পর্যন্ত যে যে সাহিত্যিক এসেছেন তাঁদের অধিকাংশের কলমে বঙ্গ সম্মেলন প্রসঙ্গে প্রশস্তির ভারই বেশি ছিল। শংকর, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সঞ্জীব, বুদ্ধদেব গুহর পরবর্তী লেখালেখির মধ্যে বঙ্গ সম্মেলন প্রসঙ্গে অপ্রিয় অনুষঙ্গ কিছু এনেছিলেন বলে তো জানি না!

তবু, প্রকাশকের মন্তব্যে সারবস্তু খোঁজার চেষ্টা করি। বঙ্গ সম্মেলনের আমন্ত্রণে দেশ থেকে যে সাহিত্যিক ও শিল্পীরা আসেন, গত কয়েক বছরে তাঁদের প্রত্যাশা অথবা সমাদর কি কমে যাচ্ছে? সেই বিচারেই সাহিত্য সম্মেলন শেষ পর্যন্ত চড়ুইভাতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে? তাঁদের মনোভাব ততটুকুই আমরা জানতে পারি, যতটুকু তাঁরা লিখিতভাবে প্রকাশ করেন। শুনেছিলাম লস এঞ্জেলসের কিছু অব্যবস্থা ছিল। নিজে উপস্থিত ছিলাম না। আন্দাজে মতামত দেওয়া ঠিক নয়। তবে সে বছর যাঁরা এদিক থেকে লস এঞ্জেলস বঙ্গ সম্মেলনে গিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, দেশের কবি, সাহিত্যিকদের জন্যে বড় অডিটোরিয়ামে দুদিনই বড় অনুষ্ঠান রাখতে পারতেন ওঁরা।

শিকাগো বঙ্গ সম্মেলনেও দেখেছি সাহিত্যিকদের মেইন অডিটোরিয়ামে প্রায় পাওয়াই যায়নি। উদ্বোধন সন্ধ্যায় শ্রোতাদের ধৈর্যের অভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠও নির্বিঘ্নে শেষ হয়নি। নবনীতা দেবসেন ছিলেন ছোট হলের সেমিনারে। সাহিত্য বাসরের সময় অন্য দুটি বড় হলঘরে দুটি সমান্তরাল অনুষ্ঠান চলেছে এবং সেখানে ভিড় ভেঙে পড়েছে। রীতা মিত্র মুস্তাফীর পরিচালনায় নৃত্যজ্যোতি ডান্স একাডেমির "ক্ষুধিত পাষাণ" শুরু হয়েছে। সাহিত্য ক্ষুধা নেহাত প্রবল না হলে, কে 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছেড়ে ছোট ঘরের সাহিত্য সভায় গিয়ে বসে? ওয়াশিংটনের বঙ্গ সম্মেলনে পশ্চিমবাংলার কোনও সাহিত্যিক আসেনি। ওই সময় বাংলাদেশ থেকে শামসুর রহমান আমেরিকায় এসেছিলেন বলে উদ্যোক্তাদের মান রক্ষা হয়েছিল।

গত বছরের কথা তো লিখেছি। নিউ ইয়র্কের ওয়েস্টচেস্টারে দিব্যেন্দু পালিত, শিবনারায়ণ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী আর জয় গোস্বামী এসেছিলেন। তবে কি এঁরাই কেউ বঙ্গ সম্মেলনের অব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন? ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলে অবাক হব না। তাঁরা মেইন অডিটোরিয়ামে একবার করে সুযোগ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু 'হট্টমালার দেশে' কি কেউ কবিতা শোনে? তত্ত্বকথা কানে নেয়? ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির কনসেশন সেন্টারের বিশাল হলে, যেখানে তিনদিকে খাবারের স্টলের জন্যে ক্রমাগত চলমান জলস্রোতকে দর্শকের সিংহভাগ বলে ভুল হচ্ছিল, সেখানে গণবিবাহের বাসর ছাড়া কোনও

আসর জমানো শক্ত। শুধু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আর সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—ওই দুই মহিয়সী রমণী ছাড়া কেউ অডিয়েন্সকে কবজা করতে পারেননি। খাবারের ঠোঙা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত এবং সতত সঞ্চরমান পাঁচ হাজার জনতাকে শুধু ওঁরাই খানিকক্ষণ ঝুঁটি ধরে বসিয়ে রেখেছিলেন, বাদ বাকি কারুর সে এলেম দেখিনি। ছাপার কালিদাসরা বরং ছোট অডিটোরিয়ামে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। সাহিত্য আলোচনা খুবই জমেছিল। তবে ওই টেনে টুনে ষাট-সত্তর জন লোক।

লক্ষ্য করছি, আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলনে যাঁরা এক সময় ছিলেন স্পেশ্যাল অ্যাট্র্যাকশন, ক্রমশ তাঁরা হয়ে উঠছেন 'স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপের' আকর্ষণ। সাহিত্যিকদের কথাই বলছি। যে বছর থেকে সিনেমা জগতের লোকজন আমন্ত্রণ পেয়ে আসছেন সে বছর থেকেই আকর্ষণের মোড় ঘুরতে শুরু করেছে। শুধু সিনেমা নয়, পেশাদারী নাট্য গোষ্ঠীরও যথেষ্ট চাহিদা এখন।

ভেবে দেখতে গেলে—আমাদের সেই প্রথম কয়েক বছরের বঙ্গ সম্মেলনগুলিতে স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই প্রধান ছিল। দর্শকের সংখ্যা প্রথম বছরে তিন-চারশো ক্রমশ পরের দিকে হাজার-দু-হাজারে পৌঁছেছিল। মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন সাহিত্যিকরা। প্রফেশনাল আর্টিস্টের মধ্যে ছিলেন বনানী ঘোষ আর লক্ষ্মীশংকর, যাঁদের আমরা আমেরিকায় বসবাসের সূত্রে পেতাম। শীর্ষেন্দু, শংকর, সুনীল, যাযাবর, বুদ্ধদেব গুহর ভাষণের সময় মেইন অডিটোরিয়াম ভরে যেত। সঞ্জীবকে নিয়ে টানাটানি। সবাই বাড়িতে নিয়ে যাবে। সঞ্জীব উদ্যোক্তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। শর্ত শুধু একটাই, 'শংকরীদাকে ফার্স্ট প্রেফারেন্স না দিলে যাব না।'

সে সময় দর্শকদের আগ্রহ ছিল একমুখী। সংস্কৃতি সম্মেলন মানে সাহিত্য সম্মেলন। অনুষ্ঠানের আগে পরে, তাঁদের নিয়ে ঘরোয়া আসর, ক্লাব থেকে সম্বর্ধনা, অন্যান্য স্টেট থেকে প্লেনের টিকিট দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা—মাস দেড়েক ধরে এই পর্ব চলত। এখনও একদল এরকম আয়োজন করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এখন বঙ্গ সম্মেলনের আকর্ষণ বলতে প্রতি বছর এত কিছু যোগ হচ্ছে যে বাংলা সাহিত্য অনুরাগী মানুষজন স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ বলে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন। এখানে অনেকে বলেন—দেশ থেকে লেখক, সাহিত্যিক এনে ডলার খরচ করার দরকার কী? ওঁদের লেখার বিষয়বস্তু আলাদা। চরিত্র আলাদা। আজকাল আর রিলেট করতে পারি না। যাঁরা আমাদের নিয়ে লিখবেন আমাদের কথা বুঝবেন, তাঁদের খুঁজে নিয়ে আসুন।

খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা যায়? আমরা কোথায় পাব তাঁরে? এ ব্যাপারে এন. আর. আই. বাঙালির বায়নাক্কা কিছু কম মনে করছেন? আমাদের কথা আন্দাজে লেখাও বিপদ। প্রত্যেক বছর কলকাতায় শারদীয়া সংখ্যাগুলো বেরুবে, আর এখানে মার মার রব।... 'লেখাগুলো পড়ব কী? খালি আমাদের নিয়ে গুলগল্প। ঝড়ের মতো ঘুরে গিয়ে আন্দাজে কী যে ছাইভস্ম লেখে! সমাজ দেখা অতই সোজা নয়?' অতএব উভয় সঙ্কট। কোথা কবি অখ্যাত জনের? কথাশিল্পী এন. আর. আই. জীবনের?

এখন বঙ্গ সম্মেলনে লোক হয় হাজার পাঁচেকের ওপর। সিনেমার নায়ক-নায়িকা, নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী, বেশ কয়েকজন পেশাদার সঙ্গীত শিল্পী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

শিল্পী, যন্ত্রশিল্পী—ইত্যাদি নিয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অথচ সময় তো মাত্র সেই আড়াই দিন এবং রাত। এ জন্যে সমান্তরাল জলসা চলে। যে যার আগ্রহ অনুযায়ী নির্ধারিত হলে গিয়ে বসছে। কবি, সাহিত্যিকদের ঘিরে আড্ডা জমাচ্ছে—এমন বাঙালির সংখ্যা কি সেই অনুপাতে বেড়েছে? বোধহয় না। টালিগঞ্জের অন্য টান আছে। অন্য টান আছে। প্রফেশনাল নাটকের আবেদন আছে। সরাসরিভাবে শিল্পীদের সাহচর্যের জন্যে আগ্রহ না থাক, পেশাদারি নাটক যেখানে, জনতাও সেখানে। কিন্তু সেইসব নাট্যবস্তুর সঙ্গেই কি অভিবাসী জীবনকে রিলেট করতে পারি? পারি না। ক্ষতি নেই। 'বিনোদন' অন্য জিনিস। নাটকের মান যেমনই হোক, বঙ্গ সম্মেলনে দেশের নাটক না আনার ঝুঁকি এখন কোনও উদ্যোক্তা নিতে চাইছে না। আগামী সপ্তাহে হিউস্টনের বঙ্গ সম্মেলনে যাচ্ছি। দেখা যাক, কলকাতার নাটক কেমন দর্শক টানে?

ইদানীং সাহিত্যিকরা 'স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপের' জন্যেই আসছেন কিনা এ সম্পর্কে অবশ্য দ্বিমত থাকতে পারে। তাঁদের সর্বজনীন আবেদন নিয়ে উদ্যোক্তাদেরও তেমন মাথাব্যথা নেই। তবে একথাও সম্মেলন উদ্যোক্তারা বলেন, বঙ্গ সম্মেলন মানে তো আর শুধু সাহিত্য সম্মেলন নয়।

খুব সত্যি কথা। বঙ্গ সম্মেলন নিশ্চয়ই অহোরাত্র গল্প কবিতা আর প্রবন্ধ পাঠের আসর নয়। যেখানে জলসাঘরে জলসা হয়, সভাঘরে সভা। একশো আটবার 'চিত্রাঙ্গদা' দেখার বদলে কেউ নবনীতা দেবসেনের সরস গল্প পাঠের আসরে গিয়ে খুব একচোট হেসে নেয়। কেউ অষ্টপ্রহর কাঁথার শাড়ি বেচে। এ ঘরে হাসি রাশি, ও বারান্দায়—কাঁথা নক্‌শি। উদ্দেশ্য যখন বহুমাত্রিক, তখন এরকমটাই তো স্বাভাবিক। গল্প, কবিতা, সেমিনার, এক্‌জিবিশন একদিকে, গিটারে লঘু সঙ্গীতের সুর অন্যদিকে। এবেলা ভানুসিংহের পদাবলী, ওবেলা নীচের ক্যাফেটেরিয়ায় বসে বাসমতি চাল, চালানি কই মাছের ঝালসহ বাড়তি দুটি পদাবলী। শাড়ির নামে হলদে সিল্কের নামাবলী। ওদিকে চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণ নায়ক সেজেছে আধ বুড়ো এক আমেরিকান সাহেব। শ্রীকৃষ্ণ গালে রুজ, লিপস্টিক মেখে মেনস টয়লেটের দিকে সখীভাবে হেঁটে যাচ্ছে! বঙ্গললনার নাচের ইস্কুলের সুবলসখা। প্রেমের ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে...। সেবারে শিকাগো বঙ্গ সম্মেলনে রঙ্গের ছড়াছড়ি! সাহেব কালোচাঁদ সেজে মোহন বাঁশি কানে ঠেকিয়ে পা তুলে তুলে নাচছে। ওদিকে অন্য হলে গোলাপি ফাউন্ডেশন খতম। 'অ্যান্টনি কবিয়াল' নাটকে অ্যান্টনি আর তার ভাই কেলি সাহেব প্রচুর ফাউন্ডেশন মেখে ছাই ছাই মুখে পার্ট করছে। ভীষণ রাগারাগির সিন। অ্যান্টনিকে ধিক্কার দিয়ে কেলি বলল, 'টুমি সমাজে হামাডের বড্‌লাম করিটেছো। টুমি ভুলিয়া গিয়াছো হামাডের বাবা বিডেশি ছিল।' আবেগকম্পিত স্বরে অ্যান্টনি ভাইকে জ্ঞান দিচ্ছে—'টুমি ভুলিয়া গিয়াছ, হামাডের মা বেঙ্গলি ছিল।'

অডিয়েন্সের মধ্যে থেকে কে চেঁচিয়ে উঠলো—'দুজনেই বাঙালি ছিল।'

অ্যান্টনি পাত্তা দিল না। নায়কের মস্ত পার্ট। পরের সিনে পুষিয়ে নিল। কিন্তু কেলির কী মন খারাপ? একটা সিন, তাও অডিয়েন্স বারোটা বাজিয়ে দিল। একেই বোধহয় বলে মুখে চুন-কালি। অত চুন মেখেও কেলির কালিমা ঘুচল না। বাবা 'বিডেশি' ছিল প্রমাণ করা গেল না। পরে মেক্-আপ আর্টিস্টকে কী গালাগালি!

বঙ্গ সম্মেলন মানে ডাইভারসিটির চূড়ান্ত। এবার টেকসাসে আরও কত নতুনত্ব অপেক্ষা করে আছে কে জানে! একটা তো জানি, প্রচণ্ড গরম। তবে হোটেলের মধ্যে টের পাওয়া যাবে না। বাদবাকি বৈচিত্র্যের খবর ক্রমশ প্রকাশ্য, ফিরে এসে এক কিস্তিতেই নামাতে পারব আশা করি। হ্যাঁ, জুলাই-এর পাঁচ তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত এ বছর হিউস্টনে ষোড়শ বঙ্গ সম্মেলন হচ্ছে। বাঙালির ফিস্টিকে কৃষ্টি ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ধারাবিবরণী লেখার আগে এবার তিনদিকে বেশ দৃষ্টি দিতে হবে। সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার, স্যাপার কষ্ট করে কী কী ঘটছে, মিষ্টি ভাষায় জানালে বছর বছর আসতে পারি। আমাদের ইষ্টির জন্যে আমরা না ভাবলে কে আর ভাববে? কিন্তু এমন অ-ভূতপূর্ব সমন্বয়কে স্রেফ বাঙালির চড়ুইভাতি বলে যিনি রটিয়েছেন, অদৃশ্য সেই মেঘনাদকে কোত্থেকে ধরব? তবে বোধশক্তি বলছে তিনি কোনও কবি, সাহিত্যিক নন। তাঁরা বহুদর্শী মানুষ। বড় মাপের দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ভেবেই না তাঁদের জন্যে আমাদের স্পেশাল ইন্টারেস্ট, যাবতীয় শ্রদ্ধা ভালবাসা। পৃথিবীর বৃহত্তম বঙ্গ মেলাকে অবহেলা করে 'চড়ুইভাতি' বলবেন—ডায়মেনশন সম্পর্কে এমন অসম্পূর্ণ ধারণা তাঁদের কাছে আশা করা যায় না।

৬ জুলাই ১৯৯৬

মেহেন্দি থেকে ভাঙড়া

নিউ জার্সির টিনা আনন্দ বিয়ের কনে সাজায়। নিউ ইয়র্কের চিত্রা দোসিরও একই পেশা। এরা স্বদেশে, বিদেশে বিউটিশিয়ানের কোর্স নিয়েছে। মেহেন্দি থেকে বিয়ের রূপসজ্জা, সবের জন্যেই এদের ডাক পড়ছে আমেরিকার কিছু কিছু ভারতীয় আর পাকিস্তানি পরিবারের উৎসবে।

পাঁচ বছর আগেও এমন সুবিধা ছিল না। অনেক বিয়ে তো দেখেছি। হয় বাড়িতেই কনে সাজানো হত। নয়তো আমেরিকান বিউটি স্যালনে গিয়ে কেশবিন্যাসে আর ফেশিয়াল, মেক-আপ এর পরে আবার এক প্রস্থ টিপ, চন্দন পর্ব। তাও, মেয়েরা চন্দন-টন্দন পরতে চাইত না।

এখন সাজগোজের বহর বেড়েছে। মেহেন্দি সেরিমনিরই কী ঘটা! টিনা আনন্দ বিয়ের আগের দিন এসে কনের হাতে, পায়ে, মেহেন্দি আঁকতে বসে। দেখাদেখি আরও ক'জন হাত বাড়িয়ে দেয়। শুধু মেহেন্দির জন্যে, টিনার রেট হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার। আর একটু 'টিপ্‌স'। বিয়ের দিন কনের সাজের জন্য আড়াইশো ডলার। শেষ মুহূর্তে মা, মাসিদের চুল সেট করতে হলে, সে তাঁরা পঁচিশ-তিরিশ ডলার যা দেবেন। এ একরকম নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। হাতে সময় থাকলে বিয়েবাড়ির সাজের সঙ্গে মানানসই করে টিনা দিব্যি চুল সেট করে দেবে। আমেরিকান বিউটি স্যালন ও ফ্রেঞ্চ রোল কিংবা মাথার ডগা থেকে লম্বা বিনুনি (ফ্রেঞ্চ ব্রেইট) বেঁধে সুন্দর করে ফুল লাগিয়ে দেয়। কিন্তু বেশি কিছু দাবি করলেই মুশকিল।

আন্দাজে রামমোহন রায় কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র সাজিয়ে দেবে। সেও দেখেছিলাম এক বিয়েবাড়িতে। কনের চুল বাঁধতে আসা আমেরিকান হেয়ার ড্রেসারকে কারা যেন ভিকটোরিয়ান স্টাইলে নিজেদের চুল বেঁধে দিতে বলেছিল। সেই কথা অনুযায়ী হেয়ার ড্রেসার বঙ্গবালাদের মাথার চুল মটকে মটকে গুটিয়ে ফেলেছে। তার ওপর পিন আটকে খুব স্প্রে দিয়েছে। কারুর দেখলাম টাইট্ পাগড়ি স্টাইল। কারুর শামলা স্টাইল। কেউ মারাঠি ব্রাহ্মণ। কেউ ছত্রপতি শিবাজী। কেউ বঙ্কিমচন্দ্র। কেউ রামমোহন রায়। ফিচার অনুযায়ী নানা ফড়নবিশের মতোও লাগছিল একজনকে। পরনে জামেয়ার। কানে ঝাড়লণ্ঠন। আসলে কাকে যে চুলের কোন কায়দা মানায়, বোঝা মুশকিল। মন্থরা অ্যাপিলের আশঙ্কায় এ জীবনে 'টপ নট' বাঁধাই হল না।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, টিনা এখন বেশ কাজ পাচ্ছে। বিয়ের দিন অন্তত চার ঘণ্টা আগে চলে আসে। সাজগোজ শেষ করে কনের সঙ্গেই বসে থাকে। কেন না দ্বিতীয় পর্ব বাকি আছে। বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে কনের সাজপোশাক খুলিয়ে আবার নতুন করে রিসেপশনের পোশাক পরায়। চুলের কায়দা পালটে দেয়। টিপ, চন্দন মুছিয়ে পার্টির স্টাইলে সাজায়। আমেরিকান বর হলে কনে তখন ফিল্ডের লং ড্রেস পরে। দিশি বর হলে, তাদের বাড়ি থেকে দেওয়া শাড়ি বা সিল্কের চোলি। নয়তো অন্য পোশাক। টিনা সে সব আগেই নিজের কাছে গুছিয়ে রাখে। বাড়ির লোককে ব্যতিব্যস্ত করে না। এমনিতে বেশ খুঁতখুঁতে। বিয়ের বেশ কিছুদিন আগে অ্যালবাম ভর্তি ছবি নিয়ে আসবে। কনের সাজ পছন্দ করাবে। তারপর একদিন নিখরচায় ট্রায়াল হবে। চুল বাঁধা আর মেক-আপ। শাড়ি, গয়নাও দেখা যাবে। সেইমতো বিয়ের দিন 'ফাইনাল প্রোডাকশন' নামাবে।

নিউ ইয়র্কের কুইন্স অঞ্চলে জ্যাকসন হাইটস হচ্ছে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মূল কেন্দ্র। দোকানপাট ভর্তি। কারা যেন নাম দিয়েছে জয়কিশন হাইটস। সেখানে দু-একজন ভারতীয় বিউটি স্যালন খুলেছে। হেনা, মেহেন্দি, ভেষজ রূপচর্চা, কেশবিন্যাস—সবেরই বিজ্ঞাপন দেখেছি। নিউ জার্সির ভারতীয় ব্যবসা কেন্দ্র এডিসনের কাছে ইসলিন শহরেও একটি স্যালন চোখে পড়েছে। তবে লোকজন দেখতে পাইনি। কারা যায় জানি না। আমেরিকান বিউটি স্যালনে যেতে অভ্যস্ত ভারতীয় বা পাকিস্তানি মেয়েরা হয়তো মেহেন্দি বা চুল বাঁধার জন্যে যায়।

নিউ ইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস্-এর মেহেন্দি ও রূপচর্চার দোকানটির নাম 'মেনকা বিউটি স্যালন'। সেখানে ওয়্যাক্সিং, থ্রেডিং সবই করে। আমেরিকান বিউটি স্যালনে থ্রেডিং এর বদলে শুধু ওয়্যাক্সিং করে। মেনকা বিউটি স্যালনে হেনা পেস্ট দিয়ে হাতে, পায়ে মেহেন্দির আলপনা দেয়। মালিকের নাম অনিল মার্চেন্ট। সে ভীষণ খুশি। কারণ অ-ভারতীয়রাও তার দোকানে মেহেন্দি লাগাতে আসছে। পাশেই 'ঈগল মুভি থিয়েটারে' "বর্ডার" এর উইক-এন্ড শো চলছে। ওই রাস্তাটাকেই আমেরিকা আর ইন্ডিয়ান বর্ডার বলে চালানো যায়। এ পারে সাহেব, ওপারে দলে দলে মাদ্রাজি। দোসার দোকান 'উডডুপি'-তে ঢুকে খাচ্ছে। উদুপী বানান ওভাবেই লেখা দেখি। হ্যাঁ, মেহেন্দির ফুলছাপ হলিউডের বিউটি স্যালনেও জনপ্রিয় হচ্ছে। অভিনেত্রী ডেমি মুর, মীরা সরভিনো, প্রিন্স নামে পূর্বপরিচিত গাইয়ে, যার এখনকার নাম রো, এরাও নাকি হাতে মেহেন্দি লাগাচ্ছে। প্রিন্স-এর এক পুরুষ বন্ধু ডেনিলো

নাকি মুখেও হেনা মেখেছিল। এইসব মেহেদি হাসানদের খবর অনিল মার্চেন্টই দিল অবশ্য। হয়তো আশায় আছে তার 'মেনকা'তেও হলিউডের কোনও রম্ভা, উর্বশী হঠাৎ উড়ে আসতে পারে।

"মেহেন্দি লগাকে রাখনা" থেকে 'হেই জমালো, টুটুক টুকুক টুটিয়াঁ'...। এবার গণনৃত্যে চলে যাই। ভাঙড়ার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার খবর দিই। নিউ জার্সিতে থাকে মিহির ম্যাজিক মাইক মারফাতিয়া। আসলে তার নাম মিহির। পদবী মারফাতিয়া। বম্বের ছেলে। এখানে ডিসক জকি হয়ে ভারতীয়/পাকিস্তানিদের উৎসবে খুব ডাক পাচ্ছে। ছত্রিশ গণ্ডা রেকর্ড আর মাইকের মারফতে করে খাচ্ছে বলে নিশ্চয়ই অমন নাম নিয়েছে। এনগেজমেন্ট পার্টি, সুইট-সিক্সটিন পার্টি, মেহেন্দি আর সঙ্গীত নাইট, বিয়ে, অ্যানিভার্সারি, রাস-গরবা ড্যান্স—হেন উৎসব নেই যে সে জমিয়ে দেয় না। দিওয়ালিতে তো হেভি বুকিং। এ বছর ভারতের সুবর্ণ জয়ন্তীতে মিহিরেরও সুবর্ণয় সোহাগা। আগস্ট মাস ভর পার্টিতে পার্টিতে গান বাজনার রেকর্ড আর মাইক নিয়ে চলে গেছে। এবং সবচেয়ে বেশি বাজিয়েছে ভাঙড়ার ক্যাসেট। ১৫ আগস্ট বেশ কিছু ভারতীয় ছাত্রছাত্রী আর সদ্য চাকরিতে ঢোকা ছেলে মেয়ের দল এরকমই একটি পার্টিতে গিয়ে মাঝরাতে ভাঙড়া নেচেছে। নিউ ইয়র্কে সাউথ এশিয়ান কলেজ স্টুডেন্ট ক্লাব হয়েছে। সেখানে অন্যান্য গান, বাজনার সঙ্গে ভাঙড়ার তাল বিশিষ্ট হিন্দি গানের সঙ্গেও নাচ হচ্ছে। তবে এরা অধিকাংশই দেশ থেকে আমেরিকায় পড়তে আসা ছেলে মেয়ে। তার সঙ্গে কিছু স্থানীয়ও যোগ দিচ্ছে। তালবিশিষ্ট যে সব গান ইদানীং আন্তর্জাতিক বিচারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, কিছু আধুনিকতা যুক্ত হয়ে, কথার বৈচিত্র্যে এবং শব্দযন্ত্রের উন্নত কলাকৌশলের ফলে হিন্দি গানও সেখানে স্থান পেয়েছে। নুরসৎ ফতে আলি খাঁর গান ও সুর আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের খুবই আকর্ষণ করেছে। তবে তাঁর গানের প্রতিভা ও খ্যাতির পরিধি আরও ব্যাপক। নুসরৎ ফতে আলি খাঁর মৃত্যুতে 'নিউইয়র্ক টাইমস্' এবং 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় যে প্রশস্তি লিখেছিল, তার পরে ভাঙড়ার প্রসঙ্গে আর সেই সুফি গায়ককে আনছি না।

আমেরিকার উপমহাদেশীয় লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাঙড়া ক্রমশ স্থান করে নিতে শুরু করেছে। পাঞ্জাবি পপ শিল্পী অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের গান 'মেক ওয়ে ফর দ্য ইন্ডিয়ান' মনে পড়ছে। নিউইয়র্ক এর মতো নগরভিত্তিক মিশ্র সমাজে এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতই স্বীকৃতি ও মর্যাদা পেয়ে এসেছে। এবার ছাত্র ছাত্রী মহলে ভাঙড়াও চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে। ম্যানহ্যাটনে যেমন 'চায়না ক্লাব' আছে, সেরকম আছে ভারতীয় যুবক-যুবতীদের জন্যে 'মেট্রোলেম' আর 'ম্যাডিসন' ক্লাব। ম্যাজিক মাইক প্রায়ই সেখানে যায়। ম্যানহ্যাটনে 'এস.ও.বি'স্ ক্লাবে প্রত্যেক মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে 'ভাঙড়া নাইট' হয়। প্রত্যেকটি বড় বড় পার্টির খবর ইনটারনেটে পাওয়া যায়। ওয়েব সাইটের নাম হচ্ছে—'ডেসি পার্টি জোন।' ডেসি হচ্ছে 'দেশি'। ইতালিয়ানরা যেমন জাতভাইকে 'পাইসান্' (ভাইজান?) বলে থাকে, তেমনি এ দেশে পাকিস্তানি, ভারতীয়রা নিজেদের বলে 'দেশি'।

ভাঙড়াকে বিদেশে এনেছে অবশ্য ইংল্যান্ডের পাঞ্জাবি সমাজ। কয়েকশো বছরের পুরনো এই ফসল উৎসবের নাচ তার যাবতীয় আবেদন নিয়ে দেশান্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

বছর দশ-বারো আগে বার্মিংহ্যামে পাঞ্জাবি রক শিল্পীরা ওয়েস্টার্ন পপ-এর স্টাইল মিশিয়ে ভাঙড়াকে নতুনভাবে পরিবেশন করেছেন।

এক্ষেত্রে সব চেয়ে নাম করেছেন 'অ্যাপাচি ইন্ডিয়ান' আর 'বালি সাগু'। গায়ক ও গীতিকার মালকিৎ সিংও এ দলে আছেন। 'হেই জামালো' এমন ঢেউ জাগাল যে কোনও পার্টিতে ভাঙড়া হবে মানেই ওই গান। মাথায় ফেট্টি জড়িয়ে, আকাশের দিকে দু'হাতের দু আঙুল উঁচিয়ে, এক্কা দোক্কা স্টাইলে ছন্দে ছন্দে এগিয়ে যাওয়া। কখনও আবার সামনাসামনি পায়ে পা জড়িয়ে চিৎপাত হবার মোক্ষম মুহূর্তে কায়দা করে দাঁড়িয়ে ওঠে ঢোলের বাজনা 'আঁহু আঁহু' রবকে ছাপিয়ে যাবে। আজকাল কিছু ভাঙড়ায় আর 'আহুঙ্কুর' শুনি না। গম আর বাজরা খেতের নাচ গ্রাম্যতা কাটিয়ে উঠেছে আর কি! বার্মিংহ্যামের পালিশ পড়েছে তো! শেফিল্ডে হলে হয়তো আরও কাঁচি কাটা হত। আসলে মুম্বইতেই ভোল পালটে দিচ্ছে। 'চপ্‌পা চপ্‌পা চরখা চলের' কায়দাই আলাদা!

ইংল্যান্ডের ভাঙড়া শিল্পীরা নিউ জার্সিতেও এসেছিলেন। নিউইয়র্কে যে ভাঙড়া নাইট হয়েছিল, সেখানে মিহির ম্যাজিক মাইক মারফাতিয়া বালি সাগুকে আনিয়েছিল। এডিসনে গুজরাতি সমাজের নবরাত্রি ফেসটিভ্যালে এসেছিলেন অ্যাপাচি। এখন কিন্তু বেশ নাম করেছেন দলের মেহেন্দি। দিল্লির ভূতপূর্ব ট্যাক্সিচালক।

কিন্তু এত রকম নাচ থাকতে, ভাঙড়ার কদর হচ্ছে কেন? হয়তো এ জন্যে যে লোকনৃত্য হিসাবে নিছক আনন্দের প্রকাশ ভঙ্গি বলে। শস্য উৎপাদনের সফলতার সবুজ ফসল ক্ষেতে কৃষকদের বলিষ্ঠতা ও প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতীক। ভাঙড়ায় জনজীবনের দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, বেদনার ছবি নেই। বছর চারেক আগে চারেক আগে আমেরিকায় 'পাবলিক ব্রডকাস্টিং চ্যানেলে' ডান্সিং নামে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে পাঞ্জাবি পুরুষদের ভাঙড়া নাচ ও তার বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করা হয়েছিল। এই ধরনের প্রচার ছাড়াও ভাঙড়ার তাল লোকেদের আকৃষ্ট করেছে। যে কোনও সমবেত নাচে যোগ দেওয়ার পক্ষে মোটামুটি সহজ নাচ। তালকানা না হলে আর হাঁটুতে বাত না থাকলে, দিব্যি হাত পা খেলিয়ে চালিয়ে যাওয়া যায়। বিদেশের ভাঙড়ায় ইচ্ছেমতো আধুনিক অঙ্গভঙ্গিও জুড়ে দেওয়া যায়। তবে নেচে মাতাল হলেও তালে ঠিক থাকতে হবে। বীজ বপন, লাঙল চালানো, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি যেমন নানা মুদ্রার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে, সেরকম পাঞ্জাবি কৃষকদের পৌরুষ এবং মোহনরূপে ভোলানোর বাসনাও ফুটে উঠবে। অর্থাৎ শস্য, হাস্য, লাস্য—ভাঙড়ার তিন উপাদান।

আমেরিকার ভাঙড়ায় শস্যের ভাগ সামান্য। হাস্য, লাস্য আর ডিসকোর ছায়া অবলম্বনে রক ভাঙড়া। এখানে একটা বিয়েতে দেখলাম পাঞ্জাবি বরপক্ষ তাদের বিরাট বরযাত্রীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এক পাঞ্জাবি ঢোলকিকে নিয়ে এসেছে। ঢোলকির নাম বুটা সিং। হিল্‌টন হোটেলের লবিতে সে যত ঢোলে চাঁটি দেয়, বরাত পার্টি তত উৎসাহে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ভাঙড়া নেচে যাচ্ছে। গানের কথাগুলো অবশ্যই শস্যক্ষেতের নয়। সবই বিয়ের গান। বুটা সিং পাগড়ি দুলিয়ে তারস্বরে গাইছে...'অব নাচে মুণ্ডে কা বাপ'...সঙ্গে সঙ্গে স্যুট আর পাগড়ি পরা শ্বশুরের নৃত্য। বুটা সিং যেই গাইল—'অব নাচে মুণ্ডে কা বুয়া'...অমনি ছেলের পিসি এক চক্কর ভাঙড়া সেরে নিল। এভাবেই এ দেশের ভারতীয়

পাকিস্তানি পারিবারিক উৎসবে ভাঙড়া জনপ্রিয় হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত আমেরিকান ছেলে মেয়েরাও এ নাচে যোগ দিচ্ছে।

পাকিস্তানে ম্যাডাম্ আজুরি নামে লোকনৃত্য বিশেষজ্ঞ এক মহিলা পঁয়ত্রিশ বছর আগে 'দ্য পাকিস্তানি কোয়ার্টালি' পত্রিকায় ভাঙড়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে—সাবেকি ভাঙড়া নাচে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সম্মেলনের ভাব প্রকাশ করা হয়। "বৈশাখী" নামে বার্ষিক ফসল উৎসব হয়, সেখানে পাঞ্জাবের নানা গ্রাম থেকে চাষী এবং অন্যান্য জীবিকার মানুষও সপরিবারে যোগ দেয়। অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে "বৈশাখী" উৎসবে ভাঙড়ার প্রচলন বহুদিনের। এখন পাকিস্তানেও ভাঙড়ার চর্চা সমানভাবেই আছে।

আমেরিকায় এই দুই সমাজ ছাড়াও দক্ষিণ এশীয় সমাজে ভাঙড়া সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উৎসব নৃত্যের ভূমিকাটি বজায় রেখেছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে ভাঙড়া যে 'এথনিক ড্যান্সের' জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তার কারণ এ নাচের বিট বা তাল। এবং বিনা মহড়াতেই দল বেঁধে নেমে পড়ার সুযোগ। অবশ্য সেইসব পরিবারের ছেলে মেয়েদের কথাই বলছি, যারা উৎসবগুলিতে যায়। উত্তর নিউ জার্সির টেনাফ্লাই শহরের একটি সতেরো বছরের ছেলে তাদের হাইস্কুলে একটি ডান্স ক্লাব পরিচালনা করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাচের সঙ্গে সে ভাঙড়াও যোগ করেছে। উদ্দেশ্য—সহপাঠী আমেরিকানদের ভারতের নাচ গানের সঙ্গে পরিচয় করাবে। ছেলেটির নাম কেদার সাংখোলেকার। সে আলাদা করে 'শক্তি ভাঙড়া ডান্স গ্রুপ'ও খুলেছে। কেদারের মা রচনা হচ্ছেন 'ক্ল্যাসিক্যাল ইন্ডিয়ান ডান্স' স্কুলের শিক্ষিকা। তিনিই ছেলেকে ভাঙড়ার তালিম দিচ্ছেন। তবে স্থান কাল পাত্রদের উপযোগী করে তাল আর শৌর্যবীর্যের ভঙ্গিমা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেদারের বিশ্বাস এ ধরনের সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে বর্ণবিভেদের সমস্যা এবং অপরিচয়ের ব্যবধান দূর করা সম্ভব। ভারতীয় ছেলেরা যে শক্তিশালী, তা বোঝানোর জন্যেই সে তার ভাঙড়া দলের নাম "শক্তি" রেখেছে। কেন না, "পাওয়ার"কে নাকি সকলেই ভয়ভক্তি করে। আগস্টের শেষ সপ্তাহে কেদার সাংখোলকার তার দলবল নিয়ে নিউ ইয়র্কে ভাঙড়া নেচে এসেছে। ম্যানহ্যাটনের 'ব্যাটারি ডান্স কোম্পানি' নামে আমেরিকান নাচের গ্রুপ যে নাচের উৎসবের আয়োজন করেছিল (ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে) সেখানে ক্ল্যাসিক্যাল ও মর্ডান ভারতীয় নাচের উৎসবে 'শক্তি ভাঙড়া দল'ও নেচেছে। দলের মেহেন্দির যে গান এখন বাজারে দারুণ চলছে, সেই 'বোলে তা রা রা রা'র সঙ্গে। ছ'বছর আগে কেদার প্রথম ভাঙড়া শুনেছিল। সেই থেকে এমন নাচের ঝোঁক চেপেছে যে হাইস্কুলের জিমনেশিয়ামে মাসে দু'দিন ধরে 'তারারারা' শেখাচ্ছে। মালটি-কালচারিজম-এর হাওয়া উঠেছে এ দেশে। এথনিক ডাইভারসিটির ওপর সকাল বিকেল বক্তৃতা চলছে। কেদারের বুদ্ধি ও শক্তির কদর না করে পারা যায় না।

এবার নিউ ইয়র্ক/নিউ জার্সির যেখানে যেখানে ভাঙড়া পার্টি হয়, তার খবর দিই। 'ডেসি পার্টি জোন' ইন্টারনেট থেকে জানা গেছে প্রত্যেক শুক্রবার ম্যানহ্যাটনের নামী রেস্তোরাঁ (ফিফ্থ অ্যাভিনিউ-এর কাছে) 'জুয়েল অফ্ ইন্ডিয়া'য় রাত দশটা থেকে পার্টি

হয়। ডিনার ও ভাঙড়া (রক-ভাঙড়া, হিন্দি গানের সঙ্গেও নাচ হয়) নাচার জন্য ২৫ ডলার। আগে চেক পাঠিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে কারা যাচ্ছে, তাদের নাম, ধাম, ফোন নম্বরও পাঠাতে হবে। হোটেল অতিথি তালিকা দেখে ব্যবস্থা করবে। হাঙ্গামা করা টাইপের লোকজনকে ঢুকতে দেবে না। কেন না ভারতীয়/পাকিস্তানি যুবতীদের নিরাপত্তার দায়িত্বের ব্যাপার আছে।

শুক্রবারেই পার্ক অ্যাভিনিউ-এর 'দ্য পার্ক অ্যাভিনিউ কান্ট্রি ক্লাবে' রাত দশটা থেকে হয় 'অ্যান্ ইটারন্যাল সামার ব্লিস' নামে আন্তর্জাতিক লোকনৃত্যের পার্টি। ভাঙড়া নিয়মিত হয়। ২১ বছরের ওপরে যাদের বয়স, তারা 'সুন্দর সাজপোশাক' পরে ঢুকতে পারবে। অর্থাৎ, জিন্স্, টি-শার্ট চলবে না। আগে থেকে নিজেরও সঙ্গীসাথীদের নাম, ধাম, ফোন নম্বর পাঠাতে হবে। এই ক্লাবে ডিনার নয়, শুধু অ্যাপেটাইজার দেবে।

আর কোথাও সাপ্তাহিক ভাঙড়া পার্টি হয় না। তবে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কয়েকটি হোটেলে ভাঙড়া পার্টি হয়েছে। ম্যানহ্যাটনের সিক্সথ অ্যাভিনিউ আর ব্রডওয়ের সংযোগস্থানে ক্লাব একস্-পো ভাড়া করে পার্টি হয়েছে। গ্রিনিচ ভিলেজের কাছে ওয়েবস্টার হল-এ ভাঙড়া উৎসবে টিকিট ছিল কুড়ি ডলার করে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দেখলাম 'পহলা নেশা' নাম দিয়ে পার্ক অ্যাভিনিউ কান্ট্রি ক্লাবের আসন্ন ভাঙড়া পার্টির বিজ্ঞাপন দিয়েছে। নিউ জার্সির উডব্রিজ শহরের শেরাটন হোটেলে আর ওই শহরেরই 'প্যাকিজ পাব্'-এ ভারতের পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে জব্বর ভাঙড়া হয়েছে।

গত বারো বছরে আমেরিকায় অভিবাসী ভারতীয় ও অন্যান্য উপমহাদেশীয় (দক্ষিণ এশিয়া) সমাজে আর্থিক প্রাচুর্যের সঙ্গে পার্টি দেওয়ার ঝোঁকও বেড়েছে। এগুলি সচরাচর কান্ট্রি ক্লাব, নাইটস অফ কলাম্বাস হল, রেস্তোরাঁ ও হোটেলে হয়ে থাকে। ভারতীয় ডিসক-জকিরা আমেরিকান গান বাজনার পাশাপাশি হিন্দি গান বাজিয়ে বাজিয়ে সে গানের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। নিউ ইয়র্ক ও শহরতলি অঞ্চলে প্রতি উইক্ এন্ডে অন্তত পঁচিশ/তিরিশটি প্রাইভেট পার্টি হয়। এর মধ্যে বিয়ে ইত্যাদি সব অনুষ্ঠানই থাকে। এই মিহির মারফাতিয়ার মতো আরও দশটি ডিস্ক-জকি কোম্পানি বেশ ভাল ব্যবসা করছে। এছাড়াও আরও পঞ্চাশজন মতো ডি জে আছে। যারা অনেক কম পারিশ্রমিকে সাদামাটা পার্টি উতরে দেয়। এদের মিউজিক সিসটেম, রেকর্ডের সংগ্রহ, আলোর বাহার ইত্যাদি একটু মাঝারি মানের। ছোটখাটো পার্টির পক্ষে ভালই। কিছু কিছু ভারতীয় ছেলে হাইস্কুলের ২-১ জন বন্ধু নিয়ে এরকম ডি. জে. হয়। দেড়শো/দুশো ডলার দিলেই পাওয়া যায়। কলেজে যাওয়ার আগে একটু বাড়তি রোজগার করে। বাঙালিদের মধ্যে অর্জুন রায় বলে একটি ছোট ছেলে নিউ জার্সির ছোটখাটো পার্টিতে ডি. জে হয়ে বেশ রোজগার করছে। সে এখন কলেজের ছাত্র। ছুটিতে অনুষ্ঠানের ডাক পেলে এখনও চলে আসে।

মিহির মারফাতিয়া এখন ক্যারিবিয়ান্স্ এ প্রতি মাসে প্রোগ্রাম পায়। তার কোম্পানিতে পঞ্চাশজন লোক নিয়েছে। তারা শুধু নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট অঞ্চলে নয়, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, ইলিনয়েও প্রতি বছর 'ম্যাজিক সাউন্ড এনটারটেনমেন্টের' ব্যানারে নানা ভারতীয় ও পাকিস্তানি উৎসব, নিউ ইয়ার্স পার্টিতে ডিসক-জকির কাজ করে। বিয়ে

উপলক্ষে আমেরিকান ব্যান্ড গ্রুপ (যদি বেশ নামকরা হয়) যেখানে চার থেকে পাঁচ হাজার ডলার নেয়, সেখানে রেকর্ডে দুই ভাষার ডিসকো মিউজিক বাজিয়ে এরা তার অর্ধেকেরও কম দক্ষিণা নেয়। তবে নাক উঁচু ভারতীয় ছেলে মেয়ে হলে বিয়েতে এদের ডাক পড়ে না। সেই আমেরিকান ব্যান্ডই আসে। লাইভ ব্যান্ড বলে খরচও বেশি পড়ে। সানাই, সেতার কিংবা এক আধটা ভাঙড়ার ক্যাসেট বাজাতে ইচ্ছে হলে, আমেরিকার ব্যান্ড-এর ডি জেকে দিয়ে সময়মতোই লাগিয়ে দেয়। বিয়ের রিসেপশনে ব্যান্ডের বাজনা, গিটার, স্যাকসোফোন চেলো আর 'সোলো ইস্ট'-এর ইংরেজি গানের মাঝে দিশি বাবা মায়ের উৎসাহে—বোলো তা রা রা রা, হ্যায়...বোলো তারারারা...।

২৫ অক্টোবর ১৯৯৭

গীত-গোবিন্দ

গোবিন্দ সেন আমাদের ক্লাবের পুরনো মেম্বার। ওঁর মতো এমন ক্লাব-গত প্রাণ মেম্বার আর পাওয়া যাবে না। অনেক তো দেখলাম। এত ডেডিকেশন, [illegible]র নেই। একবার ভোটে হেরে গিয়ে সন্ধে লাগতে বাড়ির সব আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। কারা যেন দল বেঁধে কলকল করতে করতে সহানুভূতি জানাতে গিয়েছিল। সাড়া পায়নি। পরে একদিন ফোঁশ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিল—সেদিন মনে হচ্ছিল যেন, ফ্যামিলিতে একটা ডেথ হয়ে গেছে...।'

ডক্টর যাদুগোপাল ওই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ঝড়েই 'বোধহয় ফ্যামিলিতে' শুনতে পাননি। ভেবেছিলেন ভোটে হেরে গিয়ে গোবিন্দ নিজেই মরে আছেন'। তাই হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন—'গোবিন্দা, সামনের বৎসর অবশ্যই পুনর্জন্ম হইবো।'

যাদুগোপালের ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যে হয়নি। পরের বছর গোবিন্দ সেন আবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। হেরেছিলেন বন্দনাদি। কিন্তু আমরা প্লাস্টিকের মালা বদল করিয়ে টরিয়ে ভাব সম্মিলন পর্ব সমাধা করেছিলাম। গোবিন্দ বন্দনার পরে অমৃতি, সিঙাড়া খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম।

গোবিন্দদার মধ্যে বরাবরই বেশ একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে। যে কোনও কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে। মজা দেখতে একদম ভালবাসেন না। কারুর কোনও নালিশ থাকলে গোবিন্দদা মন দিয়ে শুনবেন। ভায়া মিডিয়া না গিয়ে নিজেই সরাসরি তার প্রতিকার করতে চেষ্টা করবেন। এখন আমি একটু ক্ষমাশীল হয়ে গেছি। যখন তখন রেগে যাই না। কিন্তু এক সময় ক্লাবে সামান্য ঝামেলা দেখলেই ঘটনাটা গোবিন্দের গোচরে আনতাম। জানতাম, ঠিক কাজ হবে। ফাউন্ডার মেম্বাররা যাতে গতিচ্যুত না হয়, সে ব্যাপারে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমাদের ছাব্বিশ জনকে সদা গদিয়ান রাখতে গোবিন্দা এক হাতে গদা ঘোরাতেন। অন্য হাতে চক্র ছুঁড়তেন। গুরু গোবিন্দের শরণ নিয়ে আমা

বিনা পাগড়িতেই সর্দারি করতাম। প্রতিভার আকাল বুঝেও হাল ছাড়িনি। সকলেই ভীষণ অ্যাকটিভ। ছাব্বিশ জন করণ সিং। যে যেখানে ভিড়েছিলাম, আমেরিকানদের ভাষায় পার্মামেন্ট প্লেস। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিপুণ বিন্যাস! ক্লাবের ম্যাগাজিন বের হল তো, এক যুগ এডিটর থেকে গেলাম। গোবিন্দদা প্রকাশক। পাতায় পাতায়, সভ্যদের লেখা কাব্য কাহিনী। যাদুগোপালের 'অসভ্য' উপন্যাস! তাঁর 'দেহের আগুন' একটু নির্বাপিত করে ছাপানোর অপরাধে মিটিংয়ে কী হেনস্থা। যাদুগোপাল সহাস্যে জানতে চাইলেন, কেন আমি ওঁর লেখায় জঙঘায় জঙঘায় সঙঘাতের পরেই আধপাতা উড়িয়ে দিয়েছি? ক্লাবের মেম্বারদের এভাবে রস আস্বাদনে বঞ্চিত করার কারণ কী? শেষ পর্যন্ত গোবিন্দদা হাল ধরলেন। ক্রমশ ম্যাগাজিনে অন্যান্য দিক থেকেও লেখা আসছিল। গোবিন্দদার পিসিমা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসে বৃদ্ধা বয়সে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা প্রসব করতে লাগলেন। আমরা ভুড়ি ভুড়ি ছাপিয়ে যাচ্ছিলাম। কী সব অনবদ্য লাইন! কী উপমা জ্ঞান!

দাঁড়িয়ে থাকি
আমি হেথায় গোবিন্দেরই ব্যালকনি
হঠাৎ যেন মনে হয় বাঘা যতীন কলোনি।
এবার আমি নেমে এলাম গোবিন্দেরই কাননে।
কখন যেন হারিয়ে গেছি রাসমণি বাগানে।

কবিতা পড়ে গোবিন্দদার চোখে জল! কবি-পিসিমা উত্তরোত্তর প্রেরণা পাচ্ছিলেন। খসখস করে শুধু লিখে যাচ্ছেন। একদিন গোবিন্দদার সঙ্গে আমাদের পুজোর প্রোগ্রামের মিটিং-এ এসে, রিহার্সাল দেখতে লাগলেন। হাতে নোটবই। বাড়ি ফেরার সময় একটি নবজাতিকা উপহার দিয়ে গেলেন। নোটবই-এর ছেঁড়া পাতায়—

ওগো আলোলিকা চিরসম্পাদিকা
যেমন বানাও কমলাভোগ
তেমনি শেখাও চণ্ডালিকা
ধন্য! ধন্য! সব নাচের বালিকা।

ওই কা কা ধ্বনির মধ্যেই মোহমুদ্গর ছিল। আমি ঠিক নোটিশ পেয়ে গেলাম। চির সম্পাদিকা! সেরেছে! এবার নিজে থেকে ইস্তফা না দিলে একদিন মেরে তাড়াবে! পরের বছর ধানাই পানাই করে ছেড়ে দিলাম। তখন গোবিন্দদা সম্পাদক হয়ে গেলেন। কারণ হযবরল-র শুয়োরের মাপের মতো সব কিছু ওই ছাব্বিশের মধ্যে রাখতে চান।

এখন অবশ্য আর সে ব্যাপারে নেই। ম্যাগাজিন নানা হাত ঘুরে ঘুরে চলছে। ভালই চলছে। যাদুগোপাল লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। সায়েন্টিফিক প্রবন্ধ চাইলেও দেন না। জঙঘা নিয়ে সেই সঙঘাতের পর থেকেই খুব আঘাত পেয়ে থাকবেন। যাই হোক, আমাদের ম্যাগাজিনে গোবিন্দদা এখনও লিখে যাচ্ছেন। প্রত্যেকবার 'ক্লাবের ইতিহাস।' সেই প্রসঙ্গে ছাব্বিশ জনের 'দানের মর্যাদা'। গোবিন্দদার বউ-এর ভাষায়—কৃষ্টির নামে গুষ্টির পিণ্ডি! কেউ পড়ে না। তবু লেখা চাই। যত বাজে কাজ। বাড়িতে একটা কাজ করতে বলো। ওমনি রিস্ট-এ ব্যথা!

গোবিন্দদা সিরিয়াস মানুষ। সব কথা সোজাসুজি নেন। সে নিয়েও মজার মজার ঘটনা

ঘটেছে। বোধহয় '৮১ সালের কথা। পুজোতে 'ফাঁস' নাটক হবে। জোর রিহার্সাল চলছে। স্মাগলারের চরিত্রের নাম মিস্টার জুরাখ। নতুন এক ভদ্রলোক ওই পার্টটা করছেন। ক্লাবের মেম্বার নন। অল্প পার্ট বলে সব রবিবারে রিহার্সালেও আসেন না। ওঁর আসল নামটা আর খেয়াল থাকে না। রিহার্সালে জুরাখ জুরাখ জুরাখ বলেই চালিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। গোবিন্দদা নাটকে ছিলেন না। একদিন রিহার্সালে এসে জুরাখকে দেখলেন।

পরের উইক-এন্ডে কোন পার্টিতে গিয়ে আবার দেখা হয়েছে। গোবিন্দদা তাঁকে বললেন—'কী মিস্টার খাজুর। এবার আমাদের মেম্বার হয়ে যান।'

ভদ্রলোক ঠিক বুঝতে পারেননি। দু'চার কথার পরেই 'গোবিন্দদা তাঁর পদবি নিয়ে পড়লেন—'আপনারা নিশ্চয়ই ডোমিসাইল্ড? ওরিজিন্যালি ফ্রম খাজুরাহো রাইট?'

ভদ্রলোক অবাক—'আমরা? আমাদের বাড়ি তো মালদা।' গোবিন্দদা লজ্জা পেয়েছেন (খাজুরাহোর মর্মার্থ বুঝেই বোধহয়)।

—সরি, আপনার লাস্ট নেম থেকে ভেবেছিলাম।

—কেন বলুন তো? রায় শুনলে বাঙালি মনে হয় না?

—রায়? আপনার লাস্ট নেম খাজুর না? ফার্স্ট নেমটা বোধহয় খেয়াল করিনি...।

—খাজুর আবার কোত্থেকে পেলেন? আমার নাম শেখর রায়।

গোবিন্দদা খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। তারপর আমাদের ওপর কী রাগ!—তোমরা ওকে খাজুর ডাকো কেন? এরকম আজেবাজে নাম দিয়ো না। মানুষকে এভাবে ডিসরেসপেক্ট কোরো না।

আমরা যত বলছি খাজুর একবারও বলিনি, উনি তত রেগে যাচ্ছেন—তবে কি আমি ভুল শুনেছি? রিহার্সালে সবাই ওকে মিস্টার খাজুর বলে ডাকছিলে...। হঠাৎ পল্টু বলল—খাজুর না গোবিন্দদা। আমরা জুরাখ বলেছিলাম। উনি যে স্মাগলারের রোলটা করছেন, সেই নামে ডাকছিলাম।

গোবিন্দদা আরও রেগে গেলেন—নিজেরা সব ভাল ভাল পার্ট নিয়ে একজন নতুন লোককে স্মাগলারের পার্টে ঢুকিয়ে দিলে! আর সেই নামেই ডাকছ! দিস ইজ নট ফেয়ার!

উনি যে কান শুনতে ধান শুনে কেস্‌টা আরও ঝুলিয়েছেন, সে নিয়ে আর তর্ক করা গেল না।

গোবিন্দদার ফেয়ারনেস আর সিরিয়াসনেসের জন্যে এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। বছর কুড়ি আগের কথা। বহু পুরনো নাটক 'সেই তিমিরে'র রিহার্সাল চলছে। পরিচালক আমাদের ক্লাবের মেম্বার। প্রচুর কাস্টিং। রিহার্সালে বেশ ভিড় হচ্ছে। গোবিন্দদার মাথায় ঢুকল—একজন পরিচালকের পক্ষে এত লোকজন নিয়ে বই দাঁড় করানো শক্ত। ডবল করে দিলে সুবিধে হবে। ব্যস! না বলেকয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে মনোজ ভৌমিককে ডেকে পাঠালেন। মনোজ ভৌমিকের লেখা আপনারা হয়তো পড়ে থাকবেন। নাটক, লেখালেখি, পত্রিকা সম্পাদনা, ডকুমেন্টারি তৈরি—এইসব কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখেই মনোজ মারা গেছেন। যে সময়ের কথা বলছি, তখন নিউ ইয়র্কে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নামে ওঁর নাটকের গ্রুপ ছিল। গোবিন্দদা সেই ভেবেই পরিচালনার শক্তি বর্ধনের জন্যে তাঁকে খবর দিলেন। তারপর আমাদের পরিচালককে সে সুসংবাদ দিতেই, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বিদায় নিতে চাইলেন।

সেই নিয়ে মহা হইচই। নাটকের দল গোবিন্দদাকে চেপে ধরল। ক্লাবের মেম্বারকে ডিরেক্টর হতে বলে, তারপর এইসব পলিটিক্স চলবে না। গোবিন্দদার অধিকন্তু ন দোষায়ঃ থিওরি কেউ মানতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দদা বললেন—ঠিক আছে। ডিরেকশনের কথা আর বলব না। কিন্তু স্টেজ আর লাইটিং-এর জন্যেও কি মনোজের অ্যাডভাইস নেবে না? ওর এসব ব্যাপারে কত আইডিয়া আছে...

—জানি। কিন্তু মনোজ ভৌমিক আমাদের গাধা বলেছে। এই ইনসাল্টের পরে আমরা ওর অ্যাডভাইস চাই না।

—কী? গাধা বলেছে? কাকে বলেছে?

—আমাদের সবাইকে। আপনাকেও। পুরো ক্লাবটাকেই গাধাদের ক্লাব বলেছে মনোজ।

গোবিন্দদা হতভম্ব। আমরাও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। মনোজ গুণী মানুষ। হতে পারে নাটক নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন। তাই বলে নদীর এপারের নাটুকে দলকে 'গাধা' বলা—সত্যি বলতে কি বেশ রাগ হচ্ছিল। খবরটা যিনি এনেছেন, তাঁকে চেপে ধরা হল। তিনি তখন ধরি মাছ না ছুঁই পানি স্টাইলে বললেন—'হ্যাঁ, ঠিক ওভাবে না বললেও গাধা ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে মনোজ।

—কী বলেছে ঠিক করে বলুন তো!

ভদ্রলোক চেপে যেতে চাইছিলেন—'আরে দূর! যেতে দিন না। এইসব লুজ টক নিয়ে...'

গোবিন্দদা নাছোড়বান্দা—না, লুজ টক নয়। রীতিমতো অফেনসিভ কথা। কিন্তু মনোজ কি সত্যিই বলেছে? ভদ্রলোক চাপে পড়ে বললেন—'লাস্ট উইকে একটা জায়গায় বলেছে। নাটকের কথা হচ্ছিল। তাতে বলল—নিউ জার্সি থেকে ওদের নাটকে ডিরেকশন দিতে ডাকছে। দেখি! গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে যাওয়ার সময় কোথায়?

এনিয়ে কেউ আর জল ঘোলা করল না। গোবিন্দদা বললেন, তিনি আর মনোজকে এর মধ্যে জড়াবেন না। আমাদের পরিচালক ফিরে এলেন। 'সেই তিমিরে' নাটকও হয়ে গেল। মনোজ দেখতে এসেছিলেন। নিজে তখন গ্রুপ নিয়ে ব্যস্ত। কেন যে আর ওঁকে দ্বিতীয়বার ডাকা হয়নি, খেয়াল করেননি হয়তো। কিংবা কিছু শুনে থাকলেও সে প্রসঙ্গ তোলেননি।

এরপর মনোজ কিছুদিন নিউ জার্সিতে ছিলেন। তখন গোবিন্দদাদের অফিসেই চাকরি করছিলেন। দু'জনে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছিল। ক্লাব নিয়ে কথাবার্তা হতে হতে গোবিন্দদা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা, তুমি কি একবার আমাদের গোরু বলেছিলে?

—গোরু! আপনাদের গোরু বলেছিলাম! কী অদ্ভুত কথা! কার কাছে শুনলেন?'

—ওয়েল! দ্যাট আই ক্যান্ট টেল ইউ। কিন্তু সত্যি কি গোরু বলেছিলে?

মনোজ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—এ কী কথা গোবিন্দদা! হঠাৎ এরকম কথা আমি বলবই বা কেন? শুধু শুধু কে এসব বলছে, তা-ও-জানি না।

—তুমি তাহলে গোরুদের ক্লাব বলনি মনোজ?

—গোরুদের ক্লাব! কে এসব ড্যামেজিং কথাবার্তা বলছে বলুন না। আমার তো জানা উচিত?

—ছেড়ে দাও। আমিও ঠিক বিশ্বাস করিনি। এখন তো জেনেই গেলাম তুমি বলোনি।

গোবিন্দদা ক্লাবে ফিরে এসে আশ্বস্ত করলেন—নাঃ, মনোজ ভৌমিক আমাদের একবারও গোরু বলেনি। একটু ডাউট ছিল বলে 'ছাগল', 'ভেড়া' প্রত্যেকটাই ভেরিফাই করে নিলাম। একটাও বলেনি। ঝগড়া লাগানোর চেষ্টায় কেউ ওর নাম দিয়ে বাজে কথা রটিয়েছিল।

পরিচালক বললেন—গোরু, ভেড়া ভেরিফাই করে এলেন, আর গাধাটাই বললেন না? মনোজ ভৌমিক সবাইকে গাধা বলেছিল। এর মধ্যে ভুলে গেলেন?

গোবিন্দদা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন—'গাধা? আর ইউ সিওর?' পরিচালক বললেন—'ইয়েস! হান্ড্রেড পার্সেন্ট। হিজ কমেন্ট ওয়াজ, 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে যাচ্ছি।'

—'উঃ এত কনফিউশন ক্রিয়েট করো তোমরা। আগে জানতাম গোরু। আজ তোমরা ক্লেইম করছ গাধা! মানুষকে কতবার এসব কথা জিজ্ঞেস করা যায়? এনি ওয়ে, হি ইজ ভেরি আপসেট। তোমাদের সেটা বলতে বলেছে।'

গোবিন্দদার ইনভেস্টিগেশন আর গড়ায়নি। পরে মনোজের সঙ্গে এনিয়ে আমার কথা হয়েছিল। গাধা রহস্যের পিছনে কারুর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রয়োগ ছিল বুঝে মনোজ বলেছিলেন—তাহলে ইডিয়ম বাদ দেওয়াই নিরাপদ। আপনিও কিন্তু 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি' কথাটা প্রায়ই বলেন। ক্লাবের কথা উঠলেই বলেন। একদিন কিন্তু মোষেরা গুঁতিয়ে দেবে। কাদের আপনি মোষ টোষ বলেন জানতে চাইবে।'

মনোজ মারা গেছেন, সেই প্রায় দশ-বারো বছর হতে চলল। এসব ঘটনা তার অনেক আগের। এখন ভাবি, আমরা কত সেনসিটিভ ছিলাম। এক প্রবচন নিয়েই কত মানভঞ্জন। আজ মনোজ বেঁচে থাকলে দেখতেন নিউ ইয়র্ক/নিউ জার্সিতে গণ্ডারের চামড়া কত সস্তা হয়ে গেছে।

গোবিন্দ-গাথায় ফিরে যাই। দায়িত্বশীল মানুষ বলে গোবিন্দদাকে প্রায়ই এর তার কাজ ঘাড়ে নিতে হয়। গুটলি নামে এক মহিলা থাকেন টেকসাসে। তাঁর মা কলকাতা থেকে বেড়াতে আসছেন। নিউ ইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে নামবেন। তখন গোবিন্দদাকেই রিসিভ করতে হবে। একদিন বাড়িতে রেখে তারপর অস্টিনের ফ্লাইটে তুলে দেবেন। গুটলিরা সেখানে নামিয়ে নেবে। গোবিন্দদা কখনও গুটলির মাকে দেখেননি। এয়ার ইন্ডিয়ায় কাতারে কাতারে ভারতীয় নামবে। তার মধ্যে কে গুটলির মা চিনবেন কী করে? যা হোক, নামটা জেনে নিয়েছিলেন। তারপর সাদা কাগজে বড় বড় করে মীরা ঘোষ লিখে এয়ারপোর্টে গিয়ে উঁচু করে ধরে রাখলেন। ফ্লাইট এসে গেছে। এক এক বার করে অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জের বড় দরজা খুলে যাচ্ছে আর বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে একদল বেরিয়ে আসছে। গোবিন্দের জন্যে মীরার দেখা নেই। অনেকক্ষণ পরে উদভ্রান্তের মতো এক বৃদ্ধা বেরিয়ে আসছেন দেখে গোবিন্দদা তাঁর নাকের সামনে 'মীরা ঘোষ' নাচাতে লাগলেন। তিনি দেখেও দেখছেন না। গোবিন্দদা একরকম নিশ্চিত যে—ইনিই হবেন।

বুড়ো মানুষ, কলকাতা থেকে এত দূর আসতে গিয়ে একটু দিশেহারা ভাব হয়েছে। হয়রানির চোটে নিজের নাম ভুলে গেছেন। গোবিন্দদা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আর

ইউ বেঙ্গলি? মীরা ঘোষ? মহিলা ডানে বাঁয়ে মাথা নেড়ে স্কাই ক্যাপ ঠেলতে ঠেলতে চলে গেলেন। একটা মাদ্রাজি ফ্যামিলি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে নিয়ে গেল।

ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। এত লোক বেরিয়ে এল। অথচ গুটলির মার দেখা নেই! গোবিন্দদা ক্রমশ চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। বুড়ো মানুষ, ভুল করে লন্ডনে নেমে পড়েননি তো? নির্ঘাত ট্র্যানসিট লাউঞ্জে বসে বসে ফ্লাইট মিস করেছেন। কেন যে লোকে বুড়ো মাকে একা একা চলে আসতে বলে! গুটলির এই বে-আক্কেলে কাণ্ড কারখানায় বিরক্ত লাগছিল। হঠাৎ দেখলেন—আবার বাঙালি টাইপের দু-তিন জন মহিলা আসছেন। দুটো স্কাই ক্যাপে লটবহর চাপিয়ে তিনজন এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলেছেন। এবার সিওর শট। বাংলা কথাও কানে এল। গোবিন্দদা পোস্টার শুদ্ধই ছুটে গেলেন—'কলকাতা থেকে থেকে আসছেন? গুটলির মা? আপনি, না আপনি?' তিন বঙ্গবালা কেউই গুটলির নামে পুলকিত হলেন না। জীবনেও নাম শুনেছেন বলে মানেও হল না। একজন দূর থেকে কাদের দেখে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলেন। অন্যজন—'ও দিদি, আমার মেয়েকে তো দেখছি না। একটু দাঁড়িয়ে যাবেন কিন্তু...ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখতে পেয়েছি...।'

তিন নম্বর বললেন—'গুটলি না। আমার মেয়ের নাম সুচিত্রা। ওরা কি আপনাকে পাঠিয়েছে? কই, ফোনে তো কিছু বলেনি।'

—'মেয়ের নাম যখন মিলছে না, তখন আপনি নন।'

গোবিন্দদা আবার প্যাসেঞ্জার দেখতে লাগলেন। এরমধ্যে আরও লোক বেরিয়ে গেছে। তালে গোলে কাগজটা উঁচু করে দাঁড়াতে ভুলে গেছেন। খেয়াল হতে আবার মেলে ধরলেন। যাত্রীরা দেখেও দেখছেন না। দূরে দারুণ সুন্দরী এক অবাঙালি মহিলা ফোন করতে করতে এদিকে লক্ষ রাখছিলেন। কথা শেষ করে লটবহর নিয়ে গোবিন্দদার কাছাকাছি এসে হাত নেড়ে কী যেন বলতে চাইলেন। গোবিন্দদা বুঝে গেছেন। ফ্যাশানি রমণীকে নির্ঘাত কেউ নিতে আসেননি এখন একটু সাহায্য করতে হবে। রিফিউজ করা যায় না। কিন্তু গুটলির মার কী হবে? সে বুড়ি গেল কোথায়? মহা মুশকিল হল তো?

ততক্ষণে সুন্দরী মহিলা কাছে এসে গেছেন। নমস্কার করে বললেন—'আমি মীরা ঘোষ। গুটলির মা।'

গোবিন্দদা যেন মেলাতে পারছেন না। ক্যালকুলেশনটা অন্যরকম ছিল। অপ্রস্তুত ভাবটা ম্যানেজ করে নিয়ে বললেন, দেখুন তো! মিস করে গেছি। আই কুডনট সি ইউ...'

মহিলা বললেন—'আমি পোস্টারটা খেয়াল করিনি। মেয়েকে ফোন করলাম। ও বলল আপনি নিশ্চয়ই এসে গেছেন।'

তারপরেও কিন্তু গোবিন্দদার দায়িত্ব মেটেনি। একদিকে গুটলির মা, অন্যদিকে কে সেই সুচিত্রার মাকে নিয়ে আরও আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। কারণ রাস্তায় গাড়ির টায়ার ফ্ল্যাট হওয়াতে কানেটিকাটের সুচিত্রারা আরও দেরিতে এসে পৌঁছেছিল। সুচিত্রার মাকে তো আর একা ফেলে আসা যায় না! মেয়ের হাতে মাকে সম্প্রদান করে তবে গোবিন্দদা ছুটি পেয়েছিলেন।

ওঁর সিনসিয়ারিটির গল্প এক লেখায় শেষ করা যায় না। গত রবিবার ক্লাবের অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ছিল। দুশো বাইশ জন মেম্বারের মধ্যে মাত্র জনা কুড়ি এসে হাজির। দু

ট্রে ঘুগনি, এক বোঝা সিঙাড়া আর অমৃতি কিনে এনে সেক্রেটারি গজগজ করেছিলেন। এত খাবার খাবে কে? প্রেসিডেন্ট অভিমান করে জানলার দিকে চেয়ে আছেন। ক্লাবের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী তিনভাগের মধ্যে দু'ভাগ মেম্বার না এলে মিটিং-এ কোরাম হবে না। যাই হোক একটু একটু করে লোক আসতে লাগল। ইস্ট-ব্রানসউইক লাইব্রেরির একটা ঘর মিটিং-এর জন্যে বিনা ভাড়ায় পেয়েছি। সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রথম এক ঘণ্টা ওই যে ওই যে করে কেটে গেল। কাচের জানলার এ পাশ থেকে একটা করে মাথা দেখছি, আর রঙ মেলাচ্ছি। গোলাপি টাক হলে সাহেব। শনের নুড়ি হলে মেমসাহেব। তারা অন্য কাজে লাইব্রেরিতে ঢুকছে। আমাদের সভা আলো করতে আসছে না। কিন্তু খয়েরি ঝাঁকড়া কিংবা কালো ব্লানট কাট শট করে চলে গেলেই আমাদের হর্ষধ্বনি উঠছে 'ওই তো সুধীর নাগ আসছে। ওই তো গৌরী ঢুকে গেল।'

এভাবেই 'সদস্যদের যদা পশ্যন্তি, তদা হর্ষধ্বনি' তুমুল হয়ে উঠছিল। হাজার গণ্ডা অ্যাজেন্ডা আছে। বাক বিতণ্ডাও অনেক হবে। গোবিন্দদা তখনও লোক গুনে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ফোন করে করে আরও ক'জনকে জড় করলেন। শুধু একজন হলেই 'কোরাম' হয়ে যায়। অথচ বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আর কারুর দেখা নেই। হঠাৎ জানলার পাশ দিয়ে সাদা চুল যাচ্ছে দেখে গোবিন্দদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'হয়ে গেছে। টু থার্ড মেজরিটি হয়ে গেছে।'

'নীতা হাসল—'যাঃ, একটা আমেরিকান দৌড়ে গেল।' তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানলার বাইরে রেনকোট পরা সাহেবকে এক ঝলক দেখেও চিনতে পারেনি।

গোবিন্দদা টেবিল চাপড়ে বললেন—'বব এসে গেছে। নাউ ইউ ক্যান স্টার্ট।'

বব দরজা খুলে ঢুকল। চটাপট হাততালি। টু থার্ড মেম্বার হয়ে গেছে। গোবিন্দদাই ফোন করে ডক্টর দাশগুপ্তর জামাই বব স্মিথকে আনিয়েছেন। সে শ্বশুরের উৎসাহে মেম্বার হয়েছে। তার দৌলতেই আমাদের অনেক রসালাপের খবর পায়। বব চেয়ারে বসার পর গোবিন্দদা এক কপি কনস্টিটিউশন ধরিয়ে দিলেন। তর্কাতর্কির সময় কাজে লাগবে। বব চোখ টিপে হাসল। দীপঙ্করকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—ডু উই রিয়েলি নিড দিস কনস্টিপেশন? দীপঙ্কর খুক খুক করে হাসল।

ডক্টর দাশগুপ্তর অনেক সাজেশন বাদ গেছে বলে উনি ক্লাবের নব-সংবিধানের নাম দিয়েছেন 'কনস্টিপেশন'। কথায় কথায় বলেন, 'গোবিন্দের কনস্টিপেশন'। বব সব জানে!

তাও কি আর সব জানে? ইংরেজি শব্দ বলে রস পেয়েছে। বাংলার মজাগুলো কী আর বুঝবে? গতবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে গোবিন্দদার দীর্ঘ ভাষণ আর ভানুসিংহের পদাবলীতে এলোপাথাড়ি খঞ্জনি বাজানোর পরে প্রোগ্রামের নাম দেওয়া হল গোবিন্দজয়ন্তী। পিকনিকে সামান্য পোড়া মাংস খেয়ে যাদুগোপাল বললেন—গোবিন্দ- ভোগ।

গুরু গোবিন্দকে দিয়েই আমাদের কালচারাল ক্লাবের শুরু। গোরু, গাধা—সব অপবাদ খণ্ডনের জন্যে উনি সদা প্রস্তুত। শুধু যাদুগোপাল হাসেন—'গোবিন্দার বাঁশি কখন বাজে? কাগো চরাইবার সময়?'

১৯ এপ্রিল ১৯৯৭

ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা : নিউ জার্সি থেকে হলিউড

নিউ ইয়র্ক থেকে হাডসন নদীর এপারে নিউ জার্সিতে এসে পৌঁছনোর পরেই হোবোকেন শহর। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ছিল ইতালীয় নিজস্ব এলাকা। সত্তরের দশকে গুজরাতি নিবাস। হোবোকেন থেকে ট্রেন ধরে নিউ ইয়র্কে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না বলে এ শহর বহুকাল ধরে অভিবাসীদের প্রথম বাসস্থান ছিল। বাড়িভাড়া সস্তা। গাড়ি না থাকলেও চলে। দু পা দূরে নিউ ইয়র্কের ডাউন টাউন। বিদেশে প্রথম আস্তানা হিসেবে হোবোকেন মন্দ নয়। একেক দশকে একেকটি সম্প্রদায় দল বেঁধে হোবোকেনে থেকেছে। সচ্ছলতা এলে অন্য জায়গায় চলে গেছে। অবশ্য ইদানীং হোবোকেনের চেহারা, চরিত্র অন্যরকম হয়ে উঠেছে। পুরনো শহরের আমূল সংস্কার হওয়াতে বিষয় সম্পত্তির দাম বেড়ে যাচ্ছে। প্রফেশনাল ছেলে মেয়েরা অ্যাপার্টমেন্ট কিনছে। বড় বড় ক্লাব, শপিং মল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির দৌলতে হোবোকেন এখন উঠতি বড়লোকদের জায়গা হয়েছে। নিউ ইয়র্কের ওয়ালস্ট্রিটে চাকরি করা লোকেদের পক্ষে ওখান থেকে ট্রেনে যাতায়াত করার সুবিধে তো আগেও ছিল। এর ওপর পুরনো অঞ্চলকে নতুন করে সাজানোর ফলে হোবোকনের মান মর্যাদা বেড়ে গেছে।

অভিনেতা ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা ওই শহরে বড় হয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত ইতালিয়ান পরিবারের ছেলে। পুরো নাম ছিল ফ্র্যানসিস অ্যালবার্ট সিনাত্রা। সম্প্রতি ৮২ বছর বয়সে সিনাত্রা মারা গেছেন। তাঁর শিল্পীজীবন ও ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে লেখার শুরুতে পটভূমি হিসেবে হোবোকেনের কথা উল্লেখ করেছি। পঞ্চাশের দশকে হোবোকেনে বড় হওয়া ইতালিয়-আমেরিকান ছেলেমেয়েদের কাছে ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা ছিলেন যেন ঘরের লোক। হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতাকে চোখে না দেখলেও ইতালীয় পরিবারগুলিতে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছিল। ছেলে, মেয়ে, মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমা—সকলের কাছেই তিনি সমান প্রিয়। যে কোনও গল্প বা আড্ডায় ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার কথা উঠবেই। তাঁর সাফল্যের কাহিনী, গানের প্রতিভা নিয়ে কেবলই উচ্ছ্বাস আর আলোচনা। চারদিকে সারাক্ষণ ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার গান বাজছে। রেকর্ডে, রেডিওতে তো বটেই। এমনকি নিজেরা গান ধরলেও সিনাত্রার গান গাওয়াই ছিল রেওয়াজ। যদি টি ভি-তে একবার তাঁকে দেখাত, তাহলে সবাই কাজকর্ম ফেলে সেখানে জড় হত। এক কথায় ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা সে সময় হোবোকেনের মধ্যবিত্ত ইতালিয় আমেরিকান সমাজে প্রায় ভগবানের মতো ভক্তি ভালবাসা পেতেন। ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর বাবা, মা'র নাম থেকে শুরু করে পুরনো বাড়ির ঠিকানাও জানত। ঠিকানা ছিল ৪১৫ নম্বর মন্‌রো স্ট্রিটে। ওই বাড়িতেই সিনাত্রা বড় হয়েছিলেন। মা'র নাম ডলি আর বাবার নাম ছিল ফ্র্যাঙ্ক সিনিয়র। মার যেমন দাপট ছিল, বাবা তেমনই শান্তশিষ্ট মানুষ। হোবোকেনের অনেক ছেলেমেয়েরাই জানত সিনাত্রা ওই শহরে 'মেজর বো'স্ ওরিজিন্যাল অ্যামেচার আওয়ার' নামে গান বাজনার প্রতিযোগিতায় জিতেছিলেন। কিন্তু 'মেজর বো' যে কে ছিলেন, তা কেউ জানত না। এরা সবাই শুনেছিল ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা মাফিয়াদের সাহায্য নিয়ে হলিউডে গিয়ে পৌঁছেছেন। মাফিয়া বস স্যাম গিয়ানকানার সঙ্গে তাঁর গোপন বন্ধুত্বের

খবর মুখে মুখে ছড়াত। একটা গল্প প্রত্যেক বাড়িতে চালু ছিল। এক প্রযোজক নাকি ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রাকে তাঁর পছন্দমত ভূমিকা দিচ্ছিলেন না। মাফিয়ারা নাকি তাঁকে মেরে মাথার ঘিলু চটকে দেবে—এরকম হুমকি দিয়েছিল। প্রাণের ভয়ে তিনি প্রায় বিনা শর্তেই ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার সঙ্গে চুক্তি সই করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এইসব ঘটনার কোনও প্রমাণ টমান কেউ পায়নি। অথচ যে যখনই গল্পটা বলত, ভাব দেখাত ভীষণ বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছে। হাডসনের ধারে ওই ছোট্ট শহরে কত লোক যে বলত তারা সিনাত্রাকে চেনে, তার ঠিক নেই। অন্তত এক সময় চিনত—এরকম দাবি তো অনেক লোকই করত। কেউ বলত—'ব্লু-পয়েন্ট্ রেস্তোরাঁয় যেবার ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা হল, একটা মেয়েকে যা আওয়াজ দিল না! ইস্। বলা যাচ্ছে না।' তারপরেই চোখ মট্‌কে হেসে উঠত। কেউ বলত—'আমরা দু'ভাই মিলে তো পিৎজা খেতে 'লিওস-এ গিয়ে বসেছি। হঠাৎ ফ্র্যাঙ্ক ঢুকল। আমাকে ঠিক চিনতে পারল।'

এই গল্পগুলো বিশ্বাস করুক বা না করুক এদের পরের প্রজন্মের ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে যেত। একবার 'ব্লু-পয়েন্ট বার রেস্তোরাঁয়' ঘুরে আসত। একবার 'লিওস্ গ্র্যান্ডেভাস্' নামে পিৎজার দোকানে ঘুরে আসত। সবই সিনাত্রা সম্পর্কে মোহমুগ্ধতার ফল। তাঁর মাফিয়া গডফাদারের নাতির সঙ্গে স্কুলের ছেলেরা গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চেষ্টা করত। কমবয়সী ছেলেদের কাছে সিনাত্রা ছিলেন বহু দূরের মানুষ। কিন্তু হোবোকেনের মতো নগণ্য জায়গা থেকে ইতালিয় পরিবারের একটি ছেলে শেষ পর্যন্ত হলিউডে পৌঁছেছে, বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে—এই ঘটনা তাদের মনে উদ্দীপনা জাগাত। বন্দর শহরের শ্রমজীবী লোকেদের মানসিকতার পরিচয় ছিল এলিয়া কাজানের' '৫৪ সালের ছবি 'অন দ্য ওয়াটার ফ্রন্ট'-এ। ছবিতে হোবোকেনের জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছিল। হোবোকেনের ইতালিয় শ্রমিকরা বেশির ভাগ ডকে কাজ করতেন। জলের নীচে, ওপরে থেকে নানা কলকব্জা নিয়ে কাজ, নয়তো মাল তোলা আর খালাস করা। এঁরা জানতেন—কেউ কাউকে কিছু হাতে তুলে দেয় না। প্রতিটি জিনিস লড়ে আদায় করতে হয়। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা সম্পর্কেও তাঁরা এরকম ভাবতেন। তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করতে না পেরে, তাঁর লড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড ক্ষমতাকেই মনে মনে বাহবা দিতেন। তাঁদের একজন হয়েও সিনাত্রা যে আর তাঁদের সঙ্গে থাকলেন না, যা হতে চেয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত তাই হতে পারলেন—এই অধ্যবসায়কেই হোবোকেনের সমসাময়িক ইতালিয়-আমেরিকান মধ্যবিত্ত সমাজ মনে মনে স্বীকৃতি দিতেন। তাঁদের সীমাবদ্ধ জগতের বাইরে ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা ছিলেন যেন অন্য পৃথিবীর মানুষ। তবু শৈশবের জগত সিনাত্রার অভিনয় জীবনে কিছু প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। 'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি' ছবির মাজিও চরিত্রটির কথাই ধরা যাক। পোড়খাওয়া লোকের চরিত্র। হোবোকেনের ইতালিয়-আমেরিকার সমাজেরই যেন একটি লোক। ধরন ধারণ, কথা বলার ভঙ্গি, উচ্চারণ—সবই ওই অঞ্চলের লোকেদের মতো। শুধু গান গাওয়ার সময় ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা স্বতন্ত্র। সেখানে কোনও প্রভাব পড়েনি।

হোবোকেনের ইতালিয় ছেলেরা বহুবার আশা করেছে, একবার হয়তো সিনাত্রা তাঁর শৈশবের শহরে ফিরে আসবেন। কেন না, তাঁর মা ডলি সিনাত্রা অনেকদিন পর্যন্ত ওই শহরেই ছিলেন। সিনাত্রা 'ডেভিড ই রু জুনিয়র হাইস্কুলে' পড়েছিলেন। কয়েকজন

সহপাঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ রেখেছিলেন। 'জার্সি অব্জারভার' নামে খবরের কাগজে সিনাত্রা ছোটবেলায় ডেলিভারি বয়ের কাজ করতেন। হোবোকেনের বাড়িতে বাড়িতে খবরের কাগজ বিলি করতেন। হলিউডে যাওয়ার পরেও ওই পত্রিকা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এছাড়া আর একটি জায়গার সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। তা হল হোবোকেনের 'ইউনিয়ন ক্লাব'। সিনাত্রা এক সময় চল্লিশ ডলার সাপ্তাহিক মাইনেতে ওই ক্লাবে গান গাইতেন। বিখ্যাত শিল্পী হওয়ার পরেও হোবোকেনের পুরনো জগতের সঙ্গে তাঁর মানসিক বন্ধন ছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকেদের প্রত্যাশা সত্ত্বেও সিনাত্রা গত পঞ্চাশ বছরে একবারের জন্যেও হোবোকেনে আসেননি।

তবু তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে হোবোকেনে শোকদিবস পালন করা হয়েছে। ৮২ বছর আগে এই শহরেই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে লোকেরা স্মরণ করবে খুবই স্বাভাবিক। গাড়ির রেডিওতে দু'দিন ধরে শুধু সিনাত্রার গান বাজছিল। ট্রেনে হোবোকেন থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পথে যাত্রীরা নিজের ছোট্ট স্টিরিওতে সিনাত্রার ক্যাসেট শুনছিলেন। হোবোকেনের 'পিকোলো' রেস্তোরাঁয় রোজ সকাল এগারোটা থেকে লাইড স্পিকারে সিনাত্রার গান চলছিল। ওই রেস্তোরাঁর পেছন দিকে মিউজিক রুমের নাম 'সিনাত্রা ডেন'। দূর দূর থেকে লোকেরা এসে বসেছে। আশি বছরের বৃদ্ধ ইতালিয় দম্পতি কেঁদে কেঁদে গান শুনছেন। বলছেন—কাঁদব না? আমরা ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার সঙ্গে বড় হয়েছিলাম। তার গান আমাদের জীবন সুখে ভরিয়ে রেখেছিল।

'পিকোলো'র দেওয়াল জুড়ে সিনাত্রার নানা বয়সের ছবি। মালিক জোসেফ স্প্যাকা ভেন্টো জানেও না যে ওই রেস্তোরাঁয় কোনওদিনই সিনাত্রার পদধূলি পড়েনি। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার প্রথম জীবনের গানের দল 'দ্য হোবোকেন ফোর' ভেঙে যাওয়ার কুড়ি বছর পরে এই রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছিল। তখন অন্য মালিক ছিল। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা তখন নিউ ইয়র্কে গাইতে শুরু করেছেন। যাই হোক, এখনকার আবেগ, উচ্ছ্বাসের একটিই কারণ—'ফ্র্যাঙ্কি' আমাদের ছোট্ট শহরকে বিখ্যাত করেছিল।

হোবোকেন পর্ব শেষ হল। এবার পরের প্রসঙ্গে আসা যাক। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন? পরিচিতরা বলেন, খুবই বদমেজাজি ছিলেন। এমন রাগ ছিল যে, নিজের মতের বিরুদ্ধে গেলে কাউকে সহজে রেহাই দিতেন না। একবার অভিনেত্রী লানা টার্নার আর এভা গার্ডনারকে প্রচণ্ড গালাগালি দিয়ে নিজের বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন। তাতেও রাগ যায়নি। এভা গার্ডনারের জামাকাপড়, প্রসাধনের জিনিসপত্র, গানের রেকর্ড, বই—সব ড্রাইভ ওয়েতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সিনাত্রার পরিচিতের দল দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। মাফিয়া আর গুণ্ডা বদমাইশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুত্ব থাকলে সিনাত্রা তাঁকে অন্ধের মতো সমর্থন করতেন। কথায় কথায় বহুমূল্য উপহার দিতেন। তার শত্রু মনে করলে তীব্র বিদ্বেষ পুষে রাখতেন। এ হচ্ছে সিসিলিয়ানদের ধর্ম। এরা সামনাসামনি মোকাবিলা করার পক্ষপাতী। সিনাত্রাকে ঠিক বোঝা যেত না। যে কোনও মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করতেন। শিষ্টাচারের ধার ধারতেন না। মুখে কোনও খারাপ কথা আটকাত না। তবে এমনি এমনি নয়, কারও সঙ্গে বিরোধ লাগলে তবেই এই ধরনের ব্যবহার করতেন।

আবার এই লোক যখন গান শুরু করতেন, ব্যবহারের রুক্ষতা ঢাকা পড়ে যেত। শ্রোতারা তাঁর শিল্পী জীবনের বিশেষ অবদান অনুভব করে মুগ্ধ হতেন। যেখানে যতই অপ্রিয় আচরণ করে থাকুন, সাধারণ মানের ছবিতে অভিনয় করে থাকুন, ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার গান তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এ কথা সত্যি, যে তাঁর ভাবমূর্তির মধ্যে এক ক্রুদ্ধ ও কঠিন ব্যক্তিত্ব মিশে ছিল। অভিনয় ক্ষমতাও অসাধারণ পর্যায়ের ছিল না। হয়তো এ জন্যেই তাঁর গানের পৃথক মূল্যায়ন করা সহজ হয়নি। কিন্তু তাঁর গানে আকুল আকাঙ্ক্ষার যে প্রকাশ ছিল, নিঃসঙ্গতার যে বেদনা ছিল, এবং সময়ে সময়ে প্রাচুর্যময় উচ্ছ্বাস ছিল, তার প্রভাবেই শ্রোতারা শিল্পীর সঙ্গে একাত্মবোধ করতেন। তাঁরাও ভাবতেন—এসব আমারই অনুভূতি। 'দ্য ওয়ার্ল্ড অন আ স্ট্রিং', 'কাম ফ্লাই উইথ মি', 'ইয়াং অ্যাট হার্ট' গানগুলি এ জন্যেই এত জনপ্রিয় হয়েছিল। সিনাত্রা পপ কালচারের জগতে যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছিলেন, তার মূল কারণ শুধু তাঁর অসাধারণ কণ্ঠসঙ্গীত নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমসাময়িক আমেরিকান ভাবমূর্তির প্রতিফলন। একদিকে রুক্ষতা, অন্যদিকে কোমল ভাব, একদিকে অহঙ্কার, অন্যদিকে আঘাত গ্রহণ করার শক্তি—দুই বিপরীত ভাব তাঁর গানের কথায় ও সুরে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সাফল্য আর প্রাচুর্যের মুহূর্তে আমেরিকার মানুষ এমন একজন যুবক শিল্পীকে আবিষ্কার করল, যে শুধু দেশের প্রথম পপ সঙ্গীতের গায়ক নয়, সে যেন সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সুপ্ত অহংবোধকে জাগিয়ে তুলছে। সে যেন আধুনিক যুগের ফ্যাশন ও নতুনত্বের সূচনা করছে। এক সময় আমেরিকার পশ্চিম সীমান্তের 'কাও বয়' কিংবা বড় বড় শহরের গোয়েন্দারা যেমন মানুষের মনে এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করত, ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার গানও সেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অর্থাৎ, আলোড়ন সৃষ্টি করল। শ্রোতারা তাঁকে আদর্শ গায়ক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। ক্রমশ তাঁর উপার্জন সীমা ছাড়িয়ে গেল। প্রচুর অর্থ, প্রাসাদোপম বাড়ি, ব্যস্ত জীবনযাত্রা, একজন শিল্পীর যা যা কাম্য হতে পারে, সবই সিনাত্রার আয়ত্তে এল। রাগী মেজাজের যুবকটির প্রতি দেশের মানুষের প্রশস্তির অভাব ছিল না। কিন্তু সিনাত্রা কোনওদিনই সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে প্রথাগত আদর্শের অনুগামী ছিলেন না। একদিকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখছেন, অন্যদিকে মাফিয়া বস গিয়ানকানার পার্টিতে যাচ্ছেন। একের পর এক সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন। আবার ইচ্ছেমতো তাঁদের পরিত্যাগ করছেন। লানা টার্নার, এভা গার্ডনার, লবেন বেকল, মিয়া ফারো—প্রত্যেকের সঙ্গে একই ধরনের ব্যবহার করেছেন। এভা গার্ডনারকে বিয়ে করার জন্যে প্রথম স্ত্রীকে ছেলে মেয়ে সুদ্ধু ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর এভা গার্গনারের সঙ্গেও বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যে সিনাত্রা প্রথম থেকে কঠিনভাবে লেগে থেকেছেন। জীবনে কখনও নিয়ম করে গান শেখেননি। দম বাড়ানোর জন্যে একটি কলেজের মাঠে গিয়ে দৌড়তেন। তাতে নাকি ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়বে। এছাড়া শহরের সাঁতারের পুলে গিয়ে ডুব সাঁতার দিতেন। সেও নাকি গানের সময় দম বাড়ানোর প্রয়োজনে। তখন গানের কথাও মুখস্থ করতেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রায় আটবার জলের নীচে এদিক ওদিক করতেন। গাইতে গাইতে এমনভাবে নিঃশ্বাস ছাড়তেন যে প্রায় বোঝাই যেত না। এ প্রসঙ্গে পরে সিনাত্রা তাঁর মেয়ে ন্যানসিকে বলেছিলেন—ওই যে নিঃশ্বাস চেপে রেখে ডুব সাঁতার দিতে দিতে

গান গাইতাম তার জন্যেই সুরের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন গতি থাকত। সুর যেন ভেসে বেড়াত। ওই অভ্যেস আমার গানকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছিল।

ওই ছিল অনুশীলনের প্রথম পর্ব। গান গাওয়ার জন্যে সিনাত্রা প্রতিটি ভঙ্গি নিখুঁত করে তোলার চেষ্টা করতেন। হাতে মাইক্রোফোন ধরারও আলাদা কায়দা ছিল। বলতেন—জাপানের গেইশা মেয়েরা যেমন আলতো করে হাত পাখা ধরে, সেরকম সুন্দর ভঙ্গিতে মাইক্রোফোন ধরতে হয়। নিউ জার্সি, বিশেষ করে হোবোকেনের আঞ্চলিক ইংরেজির বদলে তিনি 'স্ট্রাংক অ্যান্ড হোয়াইটস্'-এর রাইটিং গাইড্ 'দ্য এলিমেন্টস অফ স্টাইল' পড়ে নিজেকে মার্জিত করেছিলেন। এ ছিল গানের জন্যে অনুশীলন। এরপর সিনাত্রা যখন অভিনয়ের জগতে এলেন, তখন আরও নানাভাবে নিজেকে তৈরি করে নিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—গায়ক মাত্রই অভিনেতা। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি নিজের অনুভূতি এবং অভিব্যক্তিকে নিজের মতো করে প্রকাশ করতেন। কোনওরকম ক্ল্যাসিকাল ট্রেনিং বা অভিনয়ের সুনির্দিষ্ট ধারাকে স্বীকার করতেন না। মর্লিন ব্র্যান্ডো ছিলেন সিনাত্রা অভিনীত ছবি 'গাইস্ অ্যান্ড ডলস্'-এর সহ অভিনেতা। ব্র্যান্ডোর অভিনয়ের শিক্ষা ছিল। কিন্তু সিনাত্রা আড়ালে বলতেন—মর্লিন ব্র্যান্ডো শুধু বিড়বিড় করে।

১৯৪২ সালের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। নিউ ইয়র্কের প্যারামাউন্ট থিয়েটারের একক অনুষ্ঠান তাঁকে সারা আমেরিকায় জনপ্রিয়তা এনে দিল। তখন তাঁর বয়স কুড়ির কোঠায়।

কিন্তু সৌভাগ্যের দিন চিরস্থায়ী হয় না। এত যে নাম যশ, এত জনপ্রিয়তা, সেও এক সময় নষ্ট হয়ে যেতে বসল। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার ব্যক্তিগত জীবন তীব্র সমালোচনায় আক্রান্ত হল। পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় তাঁর অখ্যাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল, যে পেশাদারি জীবন টিকিয়ে রাখাই শক্ত হল। জনসমক্ষে অশালীন ব্যবহার, ঝগড়া, বিবাদ ছাড়াও সিনাত্রার বিবাহ বহির্ভূত নারীসঙ্গ, যা কিনা স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং চরম লাম্পট্য বলে নিন্দিত হল—এই দুই কারণে তো বটেই, মাফিয়া দলের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধেও সিনাত্রাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল। ইতিমধ্যে শ্রোতাদের রুচিবোধের পরিবর্তন হয়েছে। সুইংগার শিল্পী ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার চাহিদা কমে আসছে। মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার কোম্পানি এই সময়েই তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দিল। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সিনাত্রার স্বরতন্ত্রীতে রক্তপাত হওয়ার ফলে গান গাওয়া বন্ধ থাকল। তাঁর রেকর্ডিং স্টুডিও বিক্রি হয়ে গেল। এজেন্টরা অন্য শিল্পীর কাছে চাকরি নিলেন। সমস্ত দিক থেকেই তখন তাঁর দুঃসময় চলেছে। সে সময় এডি ফিশার খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন। তাঁর অনুরাগী শ্রোতারা ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

সিনাত্রা মরিয়া হয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। কিন্তু গান দিয়ে নয়। এবার তাঁর হাতিয়ার হল চলচ্চিত্র। সেই বিখ্যাত ছবি—'ফ্রম্ হিয়ার টু ইটারনিটি'। এর আগে পর্যন্ত যে ছবিগুলিতে অভিনয় করেছিলেন, তার চরিত্রগুলি ছিল সঙ্গীতভিত্তিক। নিখাদ অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাননি। এই ছবি সিনাত্রাকে সেই সুযোগ দিল। ক্রুদ্ধ ইতালিয়ান সৈনিকের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা ১৯৫৩ সালে অস্কার পুরস্কার পেলেন। যদিও, কলাম্বিয়া পিক্চার্সের ওই ছবিতে অভিনয় করার জন্যে

তাঁকে প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হয়েছিল। 'অ্যানজেলো ডিমাজি'ও ভূমিকার জন্যে ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা দিনের পর দিন প্রযোজকদের কাছে আবেদন করেছিলেন। প্রায় জোর করেই সুযোগ নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টা সফল হল। 'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি' ছবি তাঁকে নতুন করে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিল। এবার 'ক্যাপিটল্ রেকর্ডস্ কোম্পানি' এবং সিনাত্রার নতুন সঙ্গীত ব্যবস্থাপক নেলসন রিড্ল্-এর সহযোগিতায় তিনি জীবনের সেরা গানগুলি রেকর্ড করতে থাকলেন। এই নব পর্যায়েই তিনি সুইংগার আর্টিস্ট হিসেবে যথার্থ স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। সাজসজ্জাও বদলে গেল। চল্লিশের দশকের সদ্য যুবক সুলভ বো-টাই, ঢোলা প্যান্ট, কোঁকড়ানো চুলের কায়দা বাতিল করে দিয়ে সিনাত্রা তাঁর নতুন ভাবমূর্তিতে দুরন্ত পৌরুষ ও পরিণত আবেদন আনতে চাইলেন। মাথায় তিনধার মোড়ানো ককড্ হ্যাট, কাঁধের ওপর পড়ে থাকা কোট আর না বাঁধা টাই—এই হল সিনাত্রার পরবর্তী সাজ। তাঁর সহশিল্পী পুরুষদের নাম দিলেন ক্যাট্স্। মেয়েদের নাম দিলেন ডল্স্। জীবনের নাম দিলেন 'গ্যাস্'। সেই নামকরণ আজও চলে আসছে।

সিনাত্রার সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে বিং ক্রসবি অথবা ন্যাট কিং কোলের কণ্ঠস্বর হয়তো আরো বেশি সুরেলা ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই সিনাত্রার মতো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। তার কারণ, অভিনেতা সিনাত্রার গানে বাণীর যথার্থ অভিব্যক্তি ছিল। প্রতিটি কথা মনকে স্পর্শ করত। বাণীর এই অনুভূতিগ্রাহ্যতা গানকে অন্যস্তরে নিয়ে যায়। এমন হয় যে, ওই গান অন্য কোনও শিল্পীর গলায় মানায় না। সিনাত্রার গান গেয়ে অন্য কোনও শিল্পী জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করেননি। 'আয় হ্যাভ্ গট্ ইউ আন্ডার মাই স্কিন্' ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার বদলে অন্য কেউ গাইলে শ্রোতারা সেই উপলব্ধির স্বাদ পেতেন না। এখানেই সিনাত্রার বৈশিষ্ট্য।

ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার সঙ্গীত জীবন শুরু হওয়ার অন্তত পঁচিশ বছর আগেই আমেরিকায় বেশ কিছু ভাল ভাল গান সৃষ্টি হয়েছিল। ভাল সুর, সুন্দর ভাষা ও গভীর ভাবনার পাশাপাশি কিছু কৌতুকভাবমূলক গানও রচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি গানের জন্যে যোগ্য শিল্পী ছিলেন না। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন। গানের জগতে তিনিই সেই স্বর্ণ যুগের সূচনা করলেন, যেখানে জনপ্রিয় সঙ্গীতের মান উন্নত হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে উন্নত মানের গানই জনপ্রিয়তা লাভ করবে। পরবর্তীকালে যেসব গীতিকার আর শিল্পীদের তিনি প্রভাবিত করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভিক্ দামোন্, স্টিলরেন্স, জুলিয়াস লারোসা এবং পরবর্তী সময়ে টোনি বেনেট। সিনাত্রাই ৩২টি গান নিয়ে তিন অঙ্কের নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। গীতিকারদের শিখিয়েছিলেন গান লেখার সময় কিভাবে পূর্ণ যতি, অর্ধ যতি, সেমি কোলন আর প্রশ্নবোধক চিহ্ন রাখতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথ প্রদর্শক। মাইক্রোফোন্ ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও সিনাত্রাই প্রথম রীতি পদ্ধতি বদলেছিলেন। সিনেমায় অভিনয়ের সময় মাইক্রোফোনও রেকর্ডিং পদ্ধতি যেমন শিল্পীর অভিনয়ের উৎকর্ষ বাড়াতে সাহায্য করে, সেভাবেই তিনি গানের ক্ষেত্রেও যন্ত্র শিল্পের ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নয়তো গানের মতো সূক্ষ্ম শিল্পকে যথাযথভাবে পরিবেশন করা যাবে না। ঘোষণার ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট বাচনভঙ্গি ও স্বরবর্ণের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে শিখিয়েছিলেন। ইংরেজি 'ভাওয়েল'গুলিকে সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতেন। তাঁর গলার স্বর খুব শ্রুতিমধুর

ছিল। প্রথম জীবনে প্রায় বাঁশির মতো কণ্ঠস্বর ছিল। পরে ক্রমশ ভারী হয়ে এসেছিল। গান গাইবার সময় কখনও কখনও কথা রচনা করতেন। পরিবেশ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক বোধ থেকে নতুন কথা সৃষ্টি করতেন। জ্যাজ্, ক্লাসিক্যাল আর রক্ সঙ্গীত—তিন ধারাই সিনাত্রার গানে স্থান পেয়েছে। প্রথম বয়সে বিরাট ব্যান্ড-এর দলের সঙ্গে গান শুরু করেছিলেন। তাঁর গানের মূল সূর ছিল—সুইং। পরবর্তীকালে নামী স্যাক্সোফোনিস্ট থেকে শুরু করে জ্যাজ্ সঙ্গীতের তাবড় তাবড় শিল্পীরা বলেছেন—ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রাকে তাঁরা জ্যাজ্ শিল্পী বলেই মর্যাদা দেন। বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পীরা বলেছেন তাঁরা ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার গানে বাণীর যথার্থ উচ্চারণ এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সূক্ষ্ম কায়দা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। সিনাত্রার গায়নশৈলীতে ইতালিয়ান অপেরা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ইতালিয়ান গানের অল্পবিস্তর প্রভাব ছিল। 'রক-এন-রোল' প্রিয় শ্রোতাদের কাছেও সিনাত্রা ছিলেন সেরা গায়ক। এক কথায় তিনি ছিলেন আমেরিকার পপ্ কাল্চারের প্রথম শিল্পী, যিনি টিন-এজারদের জীবনে গানের উন্মাদনা নতুন সুর ও কথার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ষাটের দশকে বিটল কালচার যেভাবে দেশের যুব সমাজকে প্রভাবিত করেছিল, সিনাত্রা তার কুড়ি বছর আগেই এ ধরনের সঙ্গীত ভিত্তিক জাতীয় উন্মাদনার সূচনা ঘটিয়েছিলেন। তিনি যখন নিউ ইয়র্কের টাইম্ স্কোয়ারে 'প্যারামাউন্ট' থিয়েটারে অনুষ্ঠান করতেন, ব্রডওয়ে পাড়ায় ভিড় ভেঙে পড়ত। নিউ ইয়ার্স ইভ-এর রাতের মতোই জন সমাগম আর উৎসবের মেজাজ সৃষ্টি হত। তার আগে পর্যন্ত কোনও গানের শিল্পীকে নিয়ে জনতার এরকম উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল—ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা ছিলেন অসামাজিক পপ শিল্পী। পঞ্চাশের দশকের আগে বা প্রথম দিকে যাঁরা গণসঙ্গীত গাইতেন, তাঁদের মধ্যে উষ্ণতার আবেদন ছিল। অন্তত শ্রোতারা সেরকমই আশা করতেন। পপ শিল্পী হবেন কাছের মানুষ। শ্রোতাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের ভাব থাকবে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর যখন যেমন মেজাজ থাকত, সে ভালোই হোক, আর খারাপই হোক, সেভাবেই নিজেকে উপস্থিত করতেন। মনোভাব গোপনের চেষ্টা করতেন না। এই বিদ্রোহী ভাব পরবর্তীকালে জেমস ডিন্, মার্লিন ব্র্যান্ডো আর এলভিস প্রেস্লির ব্যবহারেও ধরা পড়েছে। তা সত্ত্বেও এ যুগের পপ শিল্পীরা বিশ্বাস করেন—পপ সঙ্গীতকে ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রাই প্রথম নিজস্ব স্টাইল দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তার আগে পর্যন্ত গান গাওয়া হত, কিন্তু গায়নশৈলীর মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল না। বিং ক্রসবির মতো শিল্পীরও জনচিত্ত আকর্ষণ কোনও স্টাইল ছিল না। '৪২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমেরিকার সেরা গায়ক। দশ বছর খ্যাতির শীর্ষে থাকার পর তাঁর প্রতিযোগী হয়ে এলেন ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা। কয়েক বছরে মধ্যে গানের জগতে যোগ্য উত্তরাধিকার অর্জন করলেন। তিনি পপ সঙ্গীতের কৌলীন্যের সঙ্গে জ্যাজ্-এর ছন্দ মিলিয়ে আমেরিকায় জনপ্রিয় গানের সংজ্ঞা বদলে দিলেন। তাঁর কণ্ঠে গানের বাণী আরও গভীর, শুদ্ধ ও অর্থবহ হয়ে উঠল।

ক্রমশ সময়ের বিবর্তনে সেই প্রভাব সরে গেছে। চল্লিশ বছর আগে সকলেই ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার মতো করে গান গাইতে চাইত। এখন সেই যুগ নেই। গানের ধারা বদলে গেছে। সিনাত্রা এই সম্ভাবনার কথা জানতেন। বলেছিলেন—হয়তো আমার গানের মধ্যেই এই নিজস্ব স্টাইল থেকে যাবে।

৮২ বছর বয়সের বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এমন অনেক কথা লেখা যায়, যা তাঁর স্তুতির পর্যায়ে পড়বে না। অতএব প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করব না। ক্যালিফোর্নিয়ায় ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার বাড়ির গেটে লেখা ছিল—'কুকুরকে ভয় পেওনা। মালিক থেকে সাবধান।'

এই লেখা কারুর হাসির উদ্রেক করেনি। কারণ ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রাকে অধিকাংশ লোকই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ বলে জানতেন। তবু জনপ্রিয় শিল্পীর মৃত্যু বলে কথা। কেউ কেউ আবেগের সঙ্গে বলেছেন—'তিনি ছিলেন আমাদের যুগের মোৎসার্ট'। এক হিসেবে তুলনার তেমন বাড়াবাড়ি হয়নি। অস্ট্রিয়ান শিল্পী উলফ্‌গ্যাং অ্যামাডিয়াস্ মোৎসার্ট-এর অমার্জিত, পাঁগলাটে স্বভাবের কথা জেনেই তুলনা দিয়ে থাকবেন। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা বেঁচে থাকলে গর্ববোধ করতেন। অবশ্য অন্য কারণে।

২৭ জুন ১৯৯৮

মেয়ের বিয়ের বয়স

বিবাহ নামক সংস্কারটি মানুষের জীবনে অপরিহার্য কিনা—এ প্রসঙ্গে আমেরিকার মেয়েদের মধ্যে নানা প্রশ্ন জেগেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতার পূর্ণ সুযোগ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক দায় দায়িত্ব না থাকার ফলে এ দেশে অবিবাহিতা মেয়েরা অনেক সহজেই নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আদৌ বিয়ে করবেন কিনা, কোন বয়সে এবং কাকে বিয়ে করবেন—সবই তাঁদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।

১৯৯০ সালে একটি সমীক্ষা থেকে জানতে পারছি—আমেরিকায় কম বয়সে বিয়ে করার প্রবণতা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ১৯৭৫ থেকে '৯০ সালের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। '৭৫ সালে ২০-২৪ বছরের মেয়েদের মধ্যে ৬৩% ছিলেন বিবাহিতা। '৯০ সালে দেখা গেছে ওই বয়সী মেয়েদের মধ্যে মাত্র ৩৯% বিবাহিতা। ২৫ বছর থেকে ২৯ বছর বয়সের মেয়েরা '৭৫ সালে ৮৭% ভাগ ছিলেন বিবাহিতা। '৯০ সালে দেখা গেছে তার মধ্যে ৬৯% ভাগ বিয়ে করেছেন। যে সব মহিলার বয়স ছিল ৩০-৩৪ বছরের মধ্যে, তাঁরা '৭৫ সালে ৯৩% ভাগই ছিলেন বিবাহিতা। আর '৯০ সালের সমীক্ষায় জানা গেল ওই বয়সী মহিলাদের মধ্যে ৮২% বিবাহ করেছেন। এমনকি ৩৫-৩৯ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যেও এই তারতম্য ঘটেছে। '৭৫ সালে ওই বয়সী ৯৬% ভাগ মহিলাই ছিলেন বিবাহিতা। '৯০ সালে দেখা গেছে এঁদের মধ্যে ৮৯% ভাগ বিবাহ করেছেন।

যদিও ভবিষ্যতের কথা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, তবে এই প্রবণতা লক্ষ করলে মনে হয়—আমেরিকায় মেয়েদের কাছে বিয়ের প্রয়োজন ক্রমশ জরুরি বলে বিবেচিত হচ্ছে না। এখন শতকরা পাঁচ ভাগ মেয়ে কুমারী থাকেন। এরপর সম্ভবত ২০-৩০ বছর বয়সী

মেয়েদের মধ্যে ১০% মেয়ে কুমারী থাকবেন। কোনওদিনই বিয়ে করবেন না।

আমাদের এখানকার ভারতীয় সমাজে দ্বিতীয় প্রজন্মের মেয়েরাও বিয়ের বয়েসে পৌঁছে গেছে। প্রতি বছর এখানে বেশ বিয়ের মরসুম আসে। তবে বিয়ের বয়স, পছন্দ, অপছন্দ, মতামত, পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমেরিকান মেয়েদের প্রবণতা তাদের ওপরও কম বেশি ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। যোগাযোগ করে দেশ থেকে ভারতীয় পাত্র আনিয়ে, নিজেরা গিয়ে মেয়ে দেখিয়ে, নয় তো এখানে ভারতীয় ছাত্রকে ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা করে দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া—এক সময় মোটামুটি বেশ চলছিল। এখনও গুজরাতি সমাজে এ ভাবেই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। আমেরিকায় গুজরাতি সমাজে রক্ষণশীলতা কিছু বেশি হওয়ার কারণে দ্বিতীয় প্রজন্মের মেয়েরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ভারতীয়ভাবাপন্ন। আমেরিকার মূল স্রোতে তাদের ঠিক সে ভাবে মেলামেশা করতে দেওয়া হয় না, ফলে পারিবারিক প্রভাবে এরা গুজরাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিয়ে করে। 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রড্' নামে সাপ্তাহিক কাগজে পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপনে গুজরাতিদের ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্যে বিশেষ উদ্যম চোখে পড়ে। যেহেতু বাড়িতে এদের খাওয়া দাওয়া, জীবনযাত্রা, সাজগোজের ধরন, স্কুল কলেজের লেখাপড়ার বাইরের শুধুমাত্র নিজেদের সংস্থার অনুষ্ঠানেই যাতায়াত—এই প্রাদেশিকতার বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখার ফলে গুজরাতি মেয়েরা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়েতে বিশেষ আপত্তি করে না। সম্বন্ধ করে বিয়ে যেমন হয়, নিজেরাও গুজরাতি সমাজের মধ্যে বর পছন্দ করে নেয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে এরকম বিয়েই বেশি হচ্ছে।

কিন্তু ভারতের অভিবাসী সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র এখানে পাওয়া যাবে না। বাঙালি সমাজে দেখা যাচ্ছে, এ দেশে প্রতিপালিত মেয়েরা ক্রমশ নিজের নির্বাচনের ওপরেই গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশ থেকে পাত্র কী কারণে তাদের বিয়ে করতে আসছে, গ্রিনকার্ডই লক্ষ এবং বউ উপলক্ষ কিনা—এ প্রশ্ন নিয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করছে। অপরিচিত লোকের এই আগ্রহ নিয়ে তাদের রীতিমত দুশ্চিন্তা। এছাড়া আর একটি কথা। অনুষঙ্গ ব্যাপারটি নাকি প্রেম এবং দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়। এক ভৌগোলিক পটভূমিতে বড় হলে, শৈশব থেকে একই সংস্কৃতির প্রভাবে পুষ্ট হলে, সমাজ, পরিবেশ, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি ইত্যাদি মিলিয়ে কী নাকি এক অনবদ্য অনুষঙ্গ তৈরি হয়। যার অভাবে দুজনের মিল হওয়া অসম্ভব। এমনকি দুজনের নার্সারির ছড়াগান থেকে শিশুপাঠ্য বইটিও এক হলে সুবিধে হয়। খুব নাকি ভাবনার আদানপ্রদান হয় তাতে। একজন কলকাতায়, একজন কানপুরে বড় হলেও এক গান শোনা চাই রেডিওতে। এক কার্টুন দেখা চাই টিভিতে। এক বই পড়া চাই স্কুল কলেজ জীবনে। যদিও তখন কেউ কাউকে চিনত না, তবু বড় হয়ে যখন প্রেম অথবা বিয়ে হবে, তখন তো এই সবই 'সাধারণ লক্ষণ' হবে।

ভেবে দেখলে ভাবনাগুলো নস্যাৎ করা যায় না। আমার তেরো বছর বয়সে ছাদে বসে লুকিয়ে রমাপদ চৌধুরীর "প্রথম প্রহর" পড়ার উন্মাদনা অথবা 'হারানো সুর' ছবি দেখার পর যাবতীয় রোমান্টিক ভাবনার অভিজ্ঞতা যদি আমি পরবর্তী জীবনে কমন ফ্যাকটরের মতো কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে না পারতাম, হয়তো অভাববোধ থেকে যেত। কে জানে? অনুষঙ্গ তো একটা বয়সের পরে প্রায় স্মৃতিচারণের মতো হয়ে দাঁড়ায়। দু দেশের

দুই গাছ এক টবের কলমে বেঁধে দিলেই যে আনন্দে শাখা মেলে দেবে—এমন সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত বলা যায় না। এখানে আমাদের চেনাশোনা মেয়েগুলোর বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথা শুনে আমিও আর ভাবতে পারছি না—যে লোক "ভানু পেল লটারি" আর "টনসিল" সিনেমা দেখেনি, তার সঙ্গে সংসার করা কি কঠিন হত! "পথের পাঁচালী" দুজনেই ছোটবেলায় না দেখলে কি অসম্ভব দুঃখের ব্যাপার হত? আমার এ মন্তব্যে মেয়েরা ভারী আহত হয়। কারণ অনুষঙ্গ নিয়ে আমি রসিকতা করছি। বিবাহিত জীবনে তার ভূমিকাকে গভীরভাবে দেখছি না। শৈশবের সাধারণ লক্ষণকে মর্যাদা দেবার জন্যে এরা এখন ধুয়ো তুলেছে—আমেরিকায় বড় হওয়া ছেলে না হলে এদের সঙ্গে খাপ খাবে না। এখানে এই মেয়েরা বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অনেকেই প্রফেশনাল কেরিয়ার করছে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স, এম. বি. এ., ইকনমিক্স, আইন পড়ছে এমন ছাত্রী অনেক আছে। কেরিয়ার তৈরির জন্যে ২৭/২৮ বছর বয়সের আগে বিয়ের ইচ্ছে নেই এদের। বাঙালি ছেলেকেই বিয়ে করবে কিনা বলা শক্ত। বর পছন্দ হলেই হল। ভারতীয় অথবা আমেরিকান, দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেদের মধ্যে কাউকে খুঁজে নেবে। সর্বধর্ম সমন্বয়। সর্ব জাতি সমন্বয়। আমরা আন্তর্জাতিক। আমাদের মেয়েরা অধিকাংশই বিয়ের পরে পদবি বদল করবে না। নিজের পদবির সঙ্গে স্বামীর পদবি জুড়ে নেবে। দিনকাল ভাল নয়। ওদের মায়েদের মতো সানফোরাইজড্ মার্কা জীবন নয় যে আড়ং ধোলাই খেলেও ধোপে টিকে যাবে। এরা নতুন প্রজন্ম। বিয়ের জন্যে প্রতীক্ষার চেয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা আর প্রস্তুতিই প্রধান কথা। বেলা যায় বেলা যায় বলে হাঁক পাড়লেও ফল হবে না। পায়ের নীচে আর্থিক নিরাপত্তার জমি তৈরি করে তারপর অনুষঙ্গ-টঙ্গ মিলিয়ে কারও গলায় হার-মানা-হার পরাবে।

কিন্তু এত হিসেব নিকেশের পরেও কি ওরা বিবাহিত জীবন সম্পর্কে খুব নিশ্চিন্ত থাকবে? এ পৃথিবীতে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার দিন শেষ হয়েছে। অনায়াসে কোনও কিছু পাওয়া যাবে না এবং ধরে রাখাও যাবে না। সেই অর্থে শিক্ষার মূলধন, আর্থিক স্বনির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য, সহ্য এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার অভাব ঘটলে ওদের দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। কোন বয়স যে ঠিক বয়স সে নিয়েও তর্কের অবকাশ থাকছে। অন্তত পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে। সমস্যা ওদের, সমাধান ওদেরই করতে হবে। শুধু আবেগের বশে কম বয়সে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেয়ে ওরা দেখেশুনে ভালবাসা অর্জনে বিশ্বাসী। ওদের বিশ্বাসের ওপর বিশ্বাস রাখা ছাড়া আমাদের করণীয় কিছুই নেই। স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমিতে বসে আর কিছু করা চলে না। আমরা বর্জন শব্দটিকে ভয় পাই। গ্রহণ এবং অর্জনের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করি মাত্র। ভালবাসার ক্ষেত্রেও তাই।

১ *ফেব্রুয়ারি* ১৯৯২

ভালবাসার দিনক্ষণ

আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি, 'ভ্যালেনটাইনস ডে'। মার্কিন পাঁজি অনুযায়ী ভালবাসার অমৃতযোগ। কোন কালে সেন্ট ভ্যালেনটাইনের নামের সঙ্গে এই মধুক্ষণটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সঠিক জানা নেই। তবে 'ভ্যালেনটাইনস ডে'তে ভালবাসা জানানো যে কতখানি জরুরি, আমাদের বন্ধু এডওয়ার্ড রোলোফ সে ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল, যদিও অনেক দেরিতে।

এড-এর প্রথম বউ তাকে বড় অসময়ে ছেড়ে গিয়েছিল। ওদের তখন দুটো ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে। সে সময় এড চাকরি, পড়াশোনা আর সংসার চালানোর চাপে পড়ে সকাল বিকেল এমন ব্যস্ত যে বউকে সংসারের স্থায়ী সদস্য ভেবে নিয়ে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল। ভালবাসি ভালবাসি বলে জলে স্থলে ঘুরে ঘুরে নিয়মিত বাঁশি বাজানো দূরে থাক, ভ্যালেনটাইনস ডে-তে পর্যন্ত সকালে নকুড়মামা সেজে আকাশ দেখতে দেখতে নিজের অফিসে বেরিয়ে গেল। বিকেলে যখন বাড়ি এল, না কিনেছে গোলাপের তোড়া না কিনেছে হৃদয়ের ছাপ আঁকা হরতন মার্কা চকোলেটের বাক্স। কার্ড কেনার তো কোনও ব্যাপারই নেই। এরপর আর শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে? রেস্তোরাঁতে আগাম বুকিং করেনি বুঝে বউও আর বাচ্চাদের রেখে যাবার জন্যে বেবি সিটারের খোঁজ করেনি। এড শেষ মুহূর্তে দৌড়োদৌড়ি করে চকোলেটের বাক্স আর ওয়াইন কেনার চেষ্টা করেছিল। 'দরকার নেই' বলে কিছুই আনতে দেয়নি। পরের বছর 'মেকাপ' দেবে বলে ভেবে রেখেছিল এড। বউ তার আগেই অসম্ভব ভালবাসাপ্রবণ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্য বাড়িতে চলে গেল। এড-এর বিরুদ্ধে তার প্রধান অভিযোগ ছিল নিয়মিত ভালবাসে কিনা বোঝা যেত না। এড সেবারে হাতে কলমে শিক্ষা পেয়েছিল। কোন সাবজেক্টে উইক, সেটাও জেনেছিল। তারপর দ্বিতীয় বউ স্কুল টিচার আইলিনকে একেবারে ভালবেসে বেসে অস্থির। ওদের বিয়েতে গিয়েছিলাম। বর বউ দুজনের বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। চার্চে বিয়ে হল। তারপরে ওদের বেলুন ওড়ানো, 'জাস্ট ম্যারেড' লেখা ফেস্টুন লাগানো কালো ক্যাডিলাকের পেছন পেছন ধাওয়া করে রিসেপশনে গিয়েছিলাম এড-এর মায়ের বাড়িতে।

সেদিন অসম্ভব বৃষ্টি। বিকেলে পেছনের বাগানে শামিয়ানা খাটিয়ে পার্টি। বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে গোবর। ক্রমশ এমন ঝড়বৃষ্টি নামল যে আমরা হুড়মুড়িয়ে বর কনেকে ছেড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। লং ড্রেস প্রায় হাঁটুর কাছে তুলে, ব্যালেরিনা জুতো হাতে নিয়ে মহিলারা সব দৌড়ে আসছে। ছেলেরাও টাক্সেডো আর বো টাই সমেত লিভিং রুমে ভিড় করেছে। প্রায় গোটা বিয়েবাড়ি সেখানে। ওদিকে প্রচণ্ড ঝড় জলের মধ্যে ভেজা প্যান্ডেলে ঝমঝম বাজনার সঙ্গে আইলিনকে বগলদাবা করে পাক খেয়ে খেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে এড রোলোফ। বউকে ধরেছে যেন কচ্ছপের কামড়। জানলা দিয়ে দেখছি, দুজনের সাদা জুতো কাদায় মাখামাখি, কিন্তু নাচ থামানোর লক্ষণ নেই। এড সেদিন নির্ঘাত বাজ পড়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবে ভেবেছিল। এবার জীবনে আর কোনও উইক পয়েন্ট থাকতে দেবে না। পরে নিউমোনিয়া হয় হোক। নেহাত আইলিন টিচার বলেই বোধহয় কড়া ধমক দিয়ে ওকে ভেতরে এনেছিল। সেদিন থেকে এড-এর এক কথা—শুধু ভালবাসায় ভোলাব।

একথা ঠিক যে 'ভ্যালেনটাইনস' ডে-র সঙ্গে ভালবাসার বেশ একটা যোগ আছে। কিন্তু সত্যিকারের যোগসাজস আছে ব্যবসাদারদের সঙ্গে। পুরনো দিনে ছিল এই উপলক্ষে প্রিয়জনকে ফুল বা চকোলেট উপহার দেওয়ার প্রথা। 'প্রিয়জনের দিন' অর্থে স্ত্রী নয়তো ভাবী স্ত্রীর জন্যে চিহ্নিত ছিল এই বিশেষ তারিখ। উপহার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল শুধু পুরুষের। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল নারীর অধিকারের ব্যাপারটি ছাড়াও ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও ১৪ ফেব্রুয়ারিকে লাভজনকভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কার্ডের ব্যবসা, ফুলের ব্যবসা, চকোলেটের ব্যবসা, পোশাকের ব্যবসা, গহনার ব্যবসা, রেস্তোরাঁ, হোটেল সব জায়গাতে 'ভ্যালেনটাইনস ডে'র মওকায় লুটে নেওয়া দরকার। তখন ধুয়ো উঠল প্রিয়জনের সংজ্ঞাকে শুধু বউ আর প্রেমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। এক তো মার্কিনি পুরুষ অধিকাংশ সময়ে ঘোর স্ত্রৈণ, অন্তত বিয়ে টিকে থাকা পর্যন্ত। তার ওপর নতুন করে আবার 'প্রিয়জন' বলতে বউ নিয়ে মাতামাতি কেন? মা, বাবা কি ফেলনা? পুরুষ, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? আর বন্ধু প্রিয়জন নয়? চিঠিতে মাই ডিয়ার লেখার মানে কী? ছেলেমেয়েই বা অপ্রিয় হবে কোন দুঃখে? অন্তত শিশু বয়সে? তাছাড়া অফিসেও যদি কাউকে প্রিয় বলে মনে হয়, বছরে একদিন একটু ঝেড়ে কাশবে না? হলমার্ক কার্ড কোম্পানি মেয়েদের অধিকারবোধ নিয়েও খুবই সচেতন। একা একা কোনও ভালবাসা হয়? মেয়েদেরও অনেক কিছু বলার থাকে। সকলের সব কথা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে কার্ড কোম্পানি রমরমা ব্যবসা জুড়ে দিল। বাজার ছেয়ে গেল নতুন নতুন ভ্যালেনটাইনস কার্ডে। বর দিচ্ছে বউকে, বউ দিচ্ছে বরকে, মা দিচ্ছে মেয়েকে, মেয়ে দিচ্ছে তার বয়ফ্রেন্ডকে, বয়ফ্রেন্ড দিচ্ছে তার বন্ধুকে। গোলাপি রঙের ওপর সাদা লেস বসানো নানা ডিজাইনের কার্ড। কখনও টুকটুকে লাল পানপাতা আঁকা। ভেতরে ভালবাসার কবিতা। যেমন সম্পর্ক, তেমন বক্তব্য। মধুর রসের ছড়াছড়ি হলেও সখ্য আর বাৎসল্যেরও সুযোগ আছে কার্ড দেওয়া নেওয়ার জন্যে।

আমেরিকায় গত একুশ বছরে আমার ভূমিকা হয়ে রইল মূল গায়েনের পেছনের সারিতে বসা অখ্যাত দোহারকির মতো। মূল গায়েন যখন যেমন গেয়েছে, বুঝে, না বুঝে সুর মেলানোর চেষ্টা করেছি আরও অনেক এথনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এদেশের যত প্রথা, যত উপলক্ষ, তার প্রত্যেকটিতে শামিল না হলেও অধিকাংশ মেনে চলেছি যস্মিন দেশে যদাচার বোধে। এই প্রথানুগত্যের পেছনে কাজ করেছে ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রভাব, অন্তত আংশিকভাবে।

প্রথম দিকে 'ভ্যালেনটাইনস ডে' কবে আসত, যেত খেয়ালও থাকত না। মেয়ে যখন কিন্ডার গার্টেনে পড়ে সে-ই প্রথম বলেছিল এক বাক্স ভ্যালেনটাইন কার্ড কিনে দিতে হবে। সঙ্গে বড় এক বাক্স চকোলেট। ১৪ ফেব্রুয়ারি স্কুলে নিয়ে যাবে। টিচার নাকি বলে দিয়েছেন সবাইকে। ছোট্ট ছোট্ট লাল টুকটুকে পানপাতার মতো দেখতে বাক্স ভর্তি পঁচিশখানা কার্ড নিয়ে ফর্দ মিলিয়ে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লিখতে বসে গেল। ভেতরে ছাপিয়ে লেখা আছে 'টু মাই ভ্যালেনটাইন',... তার পাশে মেয়ে লিখছে ছোট্ট ছোট্ট নাম—জেনি, হলি, রায়ান, ব্রেট, কেন, সুজি...। মোট আঠারোজন ছিল ক্লাসে। বাকি থাকল সাতটা কার্ড। একটায় টিচারের নাম লিখল। বাকি রইল ছয়। ভালবাসার জন আর খুঁজে পায় না। জিজ্ঞেস করেছিলাম—আর তুই কাউকে ভালবাসিস না? একটুও না? ভেবে দ্যাখ না?

মেয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। ভালবাসা সহজ কাজ নয়। শেষে হিসেব মেলাবার চেষ্টায় বলেছিলাম—তুই আমাদের ভালবাসিস তো! দুটো কার্ড দিয়ে দে না। যেন মস্ত সমস্যা মিটল ভেবে সে আরও দুটো কার্ড সরিয়ে রাখল। তারপরেও বাক্স খালি হয়নি। উদ্বৃত্ত কার্ডের জন্যে উদ্বৃত্ত প্রিয়জন পাওয়া যায়নি।

ভ্যালেনটাইনস ডে'র আগে দোকানে দোকানে বিরাট সেল চলে। হিরে, মুক্তো, চুনি, পান্না আর ১৪ ক্যারেটের সোনার গয়না ভালই বিক্রি হয়। জামাকাপড়, কসমেটিক্সের দোকানেও মস্ত সেল দেয়। ফুলের দোকানে গোলাপের তোড়ার দাম আজ তুঙ্গে উঠেছে। পঁচিশটি আধফোটা গোলাপের তোড়ার দাম ডাকে পাঠালে ৬৫ ডলার। হাতে দিলে সামান্য কম। চকোলেটের চেহারা সব হরতনের মতো। বড় বড় চকোলেটের হৃদয় হাতে নিয়ে ভালবাসতে যাওয়া আর রেস্তোরাঁয় বসে ভ্যালেনটাইন নাইটের স্পেশ্যাল ডিনার খাওয়া। রেস্তোরাঁর বিজ্ঞাপন সপ্তাহ কয়েক আগে থেকে কাগজে কাগজে বেরতে থাকে। কেউ লিখছে—'রোমান্টিক মোমের আলোয় ডিনার! তোমার প্রিয়ার জন্যে বিনে পয়সায় পাবে ফুলের তোড়া।' (অবশ্যই ভাঙছে না যে সেটা গোলাপ তোড়া নয়)। আবার ইতালিয়ান রেস্তোরাঁ লিখছে—'তোমার ভ্যালেনটাইনের জন্যে ইতালির নেমন্তন্ন! চিকেন রোলানটিনি (শুধু দুজনের) লবস্টার ফ্র্যাডিয়াভোলো (শুধু দুজনের)।' একেবারে কপোত কপোতীর খাদ্য! ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ ডাকছে—'অনবদ্য বাজনার সঙ্গে অনবদ্য মদ্যপান, এসো তোমার প্রিয় বান্ধবীকে নিয়ে।' শুধু চীনেরা এসব ধানাই, পানাই করেনি। রোজকার বাঁধাধরা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ একটা, দুটো কালো হরতনের ছাপ বসিয়েছে। (ব্যঞ্জনায় বিশ্বাসী)। আবার খুদেখুদে টাইপ সেট জুড়ে দিয়ে লেখা, শুধু আজকের চীনে পদগুলোর নাম—'লাভার্স বোট' (চিংড়ি), 'লাভার্স নেস্ট' (ফ্রায়েড রাইস, অন্নের সঙ্গে আশ্রয়ের তুলনা দিয়েছে মনে হয়), 'টেস্ট অব লাভ' (হট অ্যান্ড সাওয়ার স্যুপ) উষ্ণ ভালবাসা? 'ড্র্যাগন অ্যান্ড ফিনিক্স' (নুডলস) ঝুটোপুটি নাকি? শেষকালে লিখেছে 'অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ' (চিকেন অ্যান্ড প্রন ডিশ) সর্বনাশ! বিজ্ঞাপনে চীনেরা একেবারে মোক্ষম পর্যায়ে চলে গেছে! আবার এক মাদ্রাজি রেস্তোরাঁ 'মহারানি'ও কম যায় না। ডাকে পাঠিয়েছে ডিসকাউন্ট কুপন। ভ্যালেনটাইন ডিনারে দোসা ইডলি খেতে গেলে আমাদের থালা পিছু দু'ডলার করে কম নেবে। আবার ফ্রি মেডু বড়া! দহিবড়াতেও ডিসকাউন্ট! সঙ্গে মনোরম পরিবেশ বোঝাতে কর্ণাটকি সঙ্গীতের কথাও লিখেছে (অবশ্যই ক্যাসেটে)।

তবে সকলের ওপর দিয়ে গেছে শেরাটন হোটেল। পাতা জুড়ে 'ভ্যালেনটাইন ডে'র বিজ্ঞাপন। জাম্বো সাইজের সব পানপাতা ভেসে ভেসে যাচ্ছে এ ধার থেকে ওধার। প্রথম পানপাতায় লেখা 'শেরাটনে রোমান্স'! দ্বিতীয় পানপাতার ভেতরে—'মোমের আলোয় মৃদু গুঞ্জন, দামি শ্যাম্পেন, তৃতীয় পানপাতায়—'হারানো দিনের গানের সঙ্গে নেচে যাও অবিরাম' আরও ক'টা পানপাতা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। একেবারে শেষের পানপাতায়—'ডিনারের শেষ রাতে থেকে যাও, লাগাতার শ্যাম্পেন...রাতের বিছানায় শুয়ে, দেখো জার্সির তারাভরা রাত আর পরদিন ভোরবেলা হাডসনের বুকে সূর্যোদয়...এবং ফ্রি কনটিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট।'

এই সব তো গেল হোটেল রেস্তোরাঁর কথা। এখন আসি পোশাকের কথায়।

'ভ্যালেনটাইন ডে'র উপহার হিসেবে পুরুষদের জন্যে বাজারে খুব চলছে নেকটাই আর হাফ প্যান্ট মার্কা ছোট্ট শর্টস। তার গায়ে ছোট ছোট হরতন নয়তো তীর ধনুক হাতে কিউপিডের ছবি। অন্তর্বাসে মদনের আবির্ভাব। আর মেয়েদের জন্যেও আছে হলিউডের 'ফ্রেডেরিক্স'-এর তৈরি লাল টুকটুকে সিল্কের দু'প্রস্থ অন্তর্বাস। হৃদয়ের ছাপ সেলাই করে বক্ষবাসে বসানো এবং শুধুই লেসের কারুকার্য। অথবা কৌপিনে অতনু! ভ্যালেনটাইনস ডে নিয়ে সব পুরুষের সমান উৎসাহ আমেরিকানদের মধ্যেও নেই। ভোলানাথ আর কোন সমাজে নেই? একদল যেমন আগে থেকে হিরে, মুক্তোর গয়না, হৃদয় আঁকা লাল বিকিনি কিনে রেস্তোরাঁ রিজার্ভ করে, ফুল হাতে রওনা দেয়, আর একদল তখন কার্ড, চকোলেট ভুলে মেরে অপ্রস্তুতের একশেষ। তবে তাদের বক্তব্য—ভালবাসার আবার দিনক্ষণ কি, অ্যাঁ? আরে, আমরাও কম রোমান্টিক নই। কিন্তু তৈরি করা দিনে ন্যাকামো পোষায় না। আমরা স্বাভাবিকতা ভালবাসি। জন্মদিন, ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার্স—এগুলো অন্য ব্যাপার। বছরকার দিন বলে কথা। তা নয়, হুট করে বানিয়ে বানিয়ে ক্যালেন্ডারে যত প্রেমের দিন, হাতাহাতির দিন, হাসির দিন, কান্নার দিন বসিয়ে দিলেই হল? এসব কার্ডওলা, ফুলওলা আর চকোলেটওলাদের চালাকি।

শোনা যাচ্ছে মেয়েরাও আর একঘেয়ে কার্ড পেলে খুশি হচ্ছে না। একজনের বউ টিপ্পনি কেটে বলেছে—'তুমি আর হলমার্ক কার্ড কোম্পানির ভাষায় ভালবাসা জানিও না। প্রত্যেক বছর একঘেয়ে ছড়া।' শুনে বর নাকি অনুপ্রাণিত হয়ে 'ভ্যালেনটাইনস ডে'র জন্যে নিজে হাতে কবিতা লিখতে বসেছিল। নীচে একটু নমুনা দিলাম।

"গোলাপ হল লাল, সঙ্গে কত কাঁটা
তোমার গালও লাল, কথায় কথায় ঝ্যাঁটা
গোলাপ ভালবাসি আমি কাঁটাও ভালবাসি
তোমায় ভালবাসি আমি ঝ্যাঁটাও ভালবাসি..."
(ইংরেজি কবিতায় ঝ্যাঁটার বদলে বাক্যবাণের কথা লেখা ছিল)

এই কবিতা পাওয়ার পরে, তার গোলাপবালার প্রতিক্রিয়ার খবর জানার সুযোগ হয়নি আমার।

এড রোলোফ বলেছিল—আমি অ্যালেনকে (প্রথম বউ) বারবার ভালবাসার কথা জানাতে পারতাম না। ভাবতাম ও বুঝে নেবে। অনবরত বলবার দরকার আছে ভাবিনি। এখনও ভাবি না। তবু আইলিনকে বলি। সকাল বিকেল 'আই লাভ ইউ' বলছি। নিজের কানেই অদ্ভুত লাগে। অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। হয়তো বহু ব্যবহারে কথাটার ভারও কমে যাচ্ছে...।

এদেশে আমেরিকান স্বামীদের মতো ভারতীয় স্বামীরা উঠতে বসতে 'আই লাভ ইউ' বলেন বলে জানা নেই। বললেও সাক্ষী রেখে তো বলেন না। কেউ এ প্রসঙ্গে বলেন—বিশেষ মুহূর্তের সংলাপ ভেবে কথাটাকে বাক্সবন্দি করে রাখা ভুল। তারপর সহজে আর বাইরে আনা হয় না। আসলে আমরা নাটকীয়তা হবে ভেবে ভুল করে আবেগের ওপর উচ্ছ্বাসের ছাপ মেরে দিই।

আবার কেউ সেই বিখ্যাত উদ্ধৃতির উদাহরণ দিয়ে বলেন—ভালবাসার সংজ্ঞা অনুযায়ী

দুজন মানুষ পরস্পরের সুখ দুঃখ আপনিই বুঝে যাবে। মুখের ভাষায় 'দুঃখিত হলাম' কিংবা 'ধন্যবাদ' বলারও প্রয়োজন হবে না। ভালবাসা যেখানে গভীর, মুখের ভাষায় তার স্বীকারোক্তি বাহুল্যমাত্র।

'ভ্যালেনটাইনস ডে' এইসব আপ্তবাক্য বুঝে ফেললে আর কোনও গোল থাকে না। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন তো সন্তই ছিলেন। সাধু সন্তদের নাম দিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছিল যে সময়ে, নির্ঘাৎ শুধু হৃদয়ের ব্যাপার স্যাপারই ছিল প্রধান। অর্থাৎ প্রিয়জনকে ভালবাসা জানাও। এখনও মূল ভাবনা হয়তো তাইই আছে, শুধু যুগের পরিবর্তন প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু আড়ম্বর এসেছে। আর নতুন চমক হিসেবে আজ সমকামীরাও পুরুষ পুরুষকে এবং মেয়েরা মেয়েদের প্রকাশ্যে ভালবাসা জানাচ্ছে। তবে তারা উপহারে আগ্রহী নয়, কেবল সান্নিধ্যে বিশ্বাসী। 'ভ্যালেনটাইনস ডে' কাছাকাছি থাকাটাই বড় কথা। কার্ডওয়ালারা একটু দমে গিয়েছিল। বিশেষ রকম সম্পর্কের জন্যে কার্ডে কবিতা না থাকলে সমকামী সমাজকে বধ করা যাচ্ছে না। বরং ফুলওলারা সুযোগ বুঝে ওই বাজারে ঢুকে পড়েছে। কার্ড কোম্পানি মার্কেটিং রিসার্চ সেরে ফেলে বাজারে নতুন কার্ড নামিয়ে দিল। সেই পানপাতা আর লাল, গোলাপির তীর ধনুকের ফাঁকে ফাঁকে মর্মগ্রাহী একটি দুটি কথা—'সামাজিক স্বীকৃতির বাইরে যে সম্পর্ক, সেই প্রেমের জন্যে...'

কার্ডগুলো সমকামীদের উদ্দেশ্যে তৈরি হল বটে, কিন্তু দেখা গেল, বাজারে তার অন্য ক্রেতাও কম নেই। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জন্যে এতদিন মনোমত কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। এ কার্ডে বেশ একটা পরকীয়া পরকীয়া ব্যাপার আছে তো! ভারী কাটতি হয়েছে ওগুলোর। ফল্গুধারার মতো গোপন ভালবাসা নিয়ে কার্ডের জন্যে আর হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে না। 'ভ্যালেনটাইনস ডে'তে ভালবাসার দিনক্ষণ দেখে যথাস্থানে পৌঁছে দিলেই হল। প্রেম নীরবে আসুক, নয়তো সরবেই আসুক, ঢালাও বন্দোবস্ত।

২১ *মার্চ* ১৯৯২

মার্কিন বিয়ের জাঁকজমক

গত কয়েক যুগ ধরে আমেরিকায় বিয়ের মতো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি নানাভাবে পরীক্ষিত হয়ে চলেছে। সত্তর দশকে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান হার লক্ষ করে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল, পরবর্তী দশকে হয়তো এ দেশের বহু মানুষের বিয়ে প্রসঙ্গে অনীহা দেখা দেবে। অথচ আশির দশকে দেখা গেল—বিয়ের বন্ধনকে এ যুগের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত গুরত্ব দিতে শুরু করেছে। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এরা কিছু হিসেবি। অভিভাবকদের মতে—বিচক্ষণ। বিয়ের বয়স বেড়েছে। 'হাই স্কুল ম্যারেজের' ক্ষণস্থায়ী ফল দেখেই সম্ভবত ঝোঁকের মাথায় সংসার গড়ার প্রবণতা দূর হয়ে যাচ্ছে। এরা স্কুল, কলেজের পর্ব শেষ করার পরেও দীর্ঘ সময় নিয়ে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করছে। ডেটিং-এর

সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার দিকটিকে খতিয়ে দেখছে।

বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ডিভোর্সি ছেলেমেয়েরাও যথেষ্ট সময় নিচ্ছে। তাদের সে সুযোগ আছে। এ দেশের প্রতিটি শহরে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া স্ত্রী পুরুষের মেলামেশার জন্যে ক্লাব আছে। এছাড়া চার্চে, অফিসে, বিভিন্ন 'হবি' ক্লাবে আলাপ পরিচয়ের পথ তো প্রশস্ত। আমেরিকায় ইদানীং বছরে যতগুলি বিয়ে হয়, তার এক তৃতীয়াংশ পাত্র বা পাত্রীই দ্বিতীয়বার বিয়ে করছেন। ফলে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলি কিছু সংক্ষেপ হচ্ছে। এককালে ডিভোর্সি পাত্র পাত্রীর পুনর্বিবাহের আসরে দু'পক্ষের সন্তানদের উপস্থিতি দৃষ্টিকটু ঠেকত। আর এখন তাদের নিয়ে আসাই রেওয়াজ হয়েছে। যাতে, প্রথম থেকে তারা নিজেদের 'অবাঞ্ছিত' মনে না করে। আগে দ্বিতীয় বিয়ে মানে একেবারে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হত। বউ-এর সাজগোজ, নেমন্তন্নের চিঠি ছাপা সচরাচর বাদ দেওয়া হত। এখন সেসব মানা হয় না। প্রথমবারই হোক, আর দ্বিতীয়বারই হোক, যার যেমন শখ, সাধ এবং আর্থিক ক্ষমতা, সেই অনুযায়ী সে অনুষ্ঠান করে।

আমেরিকানদের বিয়ের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয় প্রায় বছর খানেক আগে। আপনারা কি 'ফাদার অফ দ্য ব্রাইড' ছবিটির রি-মেক দেখেছেন? ওই হল একেবারে যথার্থ পরিস্থিতি। আমাদের দেশের বাবা, মা-র মতোই এদেশের কনের মা, বাবারও টেনশনে টেনশনে জর্জরিত অবস্থা! শুধু লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করতে করতে শয্যা নেওয়ার ব্যাপারটি নেই। পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক ডাকার প্রথা নেই। বিয়ে বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েদের সচরাচর নেমন্তন্ন হয় না। একেবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছেও আশা করা হয়, তারা বাচ্চাদের বেবি সিটারের কাছে রেখে আসবে। আগে আমেরিকান বিয়েতে গিয়ে একটিও শিশুর মুখ দেখতে পেতাম না। ইদানীং কিউবান বা ইতালিয়ান বাড়ির বিয়েতে গেলে বরং দেখি পাত্র বা পাত্রীর নিজের ভাইপো, ভাইঝি বা ভাগ্নে, ভাগ্নিরা একজোট হয়ে একটা টেবিলে বসতে পেয়েছে। তবে বেশিরভাগ বিয়েতেই ছোটদের দেখতে পাই না। আমেরিকান বিয়েতে আত্মীয়স্বজন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব আর অফিসের লোকজন মিলিয়ে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা সাধারণত দুশো-আড়াইশোর মধ্যে থাকে। নেমন্তন্ন করার সময় কার্ডের সঙ্গে আলাদা করে স্ট্যাম্প দেওয়া ছোট্ট খাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক কতজন আসবেন, সেটি অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের আগে জানাতে হবে। কন্যা কর্তা সেই বুঝে কেটারিং ব্যবস্থা আর টেবিলে টেবিলে নামের কার্ড রেখে বসার বন্দোবস্ত করেন। অতিথি পিছু প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর ডলার খরচ হয়।

এদেশের বিয়েতে এখনও মেয়ের বাবার ভূমিকাই প্রধান। কারণ বিয়ের দিনেই যা কিছু আচার অনুষ্ঠান এবং লোকসমাগম। বৌভাত জাতীয় কিছু নেই। বড় জোর বিয়ের আগের দিন পাত্রপক্ষ মেয়ের বাড়ির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নিয়ে বাইরে খেতে যান। তবে আমেরিকান পাত্রের বাবার দেওয়া রিসেপশনেও যে যাইনি এমন নয়। বিয়ের মতো জাঁকজমক তাঁরা করেন না।

মেয়ের বাবা সাধারণত যা যা করেন, সেগুলি হল ডাকে নেমন্তন্নপত্র পাঠানো, গির্জায় বিয়ের ব্যবস্থা করা (যা দুপুরেই হয়ে যায়), তারপর গির্জা থেকে অতিথিদের নিয়ে গাড়ির প্রসেশন করে বিকেলে কোনও বড় হোটেলে যাওয়া। সেখানে ককটেল লাউঞ্জে স্ন্যাক্স ও

ড্রিংকস দেওয়া হয়। তারপর গ্র্যান্ড বল রুমে নৃত্যগীত আর ফুল কোর্স ডিনারের আয়োজন। সব শেষে মস্ত ওয়েডিং কেক কাটা, শ্যাম্পেনের বন্যা...ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনতে এতটুকু হলেও প্রস্তুতির জন্যে অর্থও যেমন দরকার, সময়ও তেমন চাই। ফুলের অর্ডার, সাজ পোশাকের অর্ডার, দর্জির বাড়ি, গয়নার দোকানে যাওয়া তো আছেই। হিরে, মুক্তোর ছিমছাম গয়না টয়না এরাও দেয়। ছেলে শুধু একটি হিরের আংটি পায় ওয়েডিং রিং হিসেবে। এরপর আছে বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করে গির্জার সঙ্গে ব্যবস্থা করা। শহরের ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সঙ্গে তারিখ ঠিক করা। এদের তবু দুই প্রস্থ পর্ব। আর আমাদের যে ছেলেমেয়েরা আমেরিকান বিয়ে করছে, তাদের জন্যে তিন প্রস্থ! কারণ পুরুত ডেকে হিন্দু মতে বিয়েটি তো হতেই হবে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

গির্জার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর হোটেলের কনট্র্যাক্ট সই করা। কোথায় দামি কাচের বাসনে পরিবেশন করবে, কোথায় আসল রুপোর ছুরি কাঁটা দেবে, কোন হোটেলে কত লোক বসে খেতে পারবে, কাদের নাচের ফ্লোর বিশাল, কাদের মিউজিক ব্যান্ড নামকরা—সব দেখে শুনে তবে হোটেল বুক করতে হয়। বিয়েতে মেয়ে যা যা শখের জিনিস নেবে, তাও সময় মতো কিনে রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে রেওয়াজ বলে কিছু নেই। ছেলের বাড়ি থেকে কোনও কিছু চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং দু'পক্ষ মিলেই গিফট চেক উপহার দিয়ে নতুন সংসার সাজিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। অনেক মেয়ে সম্পূর্ণ নিজের উপার্জনের অর্থে বিয়ে করে। বাবা সাধ্যমত অনুষ্ঠানটির সামান্য খরচ দেন। না দিলেও কোনও লজ্জা বা সংকোচের কারণ নেই।

কনের সাজসজ্জার জন্যে বিউটি পার্লার আছে। সে সেখান থেকে চুল সেট করে মেক আপ নিয়ে, ওয়েডিং গাউন আর হিরে, মুক্তোর গয়না পরে ওয়েডিং পার্টির সঙ্গে গির্জায় পৌঁছবে। মায়েরও একই সঙ্গে চুল সেট করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মা আর শাশুড়ি বিশেষ স্টাইলে তৈরি লং ড্রেস, স্কার্ট ইত্যাদি গয়নার সঙ্গে মিলিয়ে পরবেন। বেচারি বাবার জন্যে শুধু ভাড়া করা টাকসাডো, অর্থাৎ বিয়ের দিনের জন্যে বিশেষ ডিজাইনের কালো স্যুট। বরও টাকসাডো পরে বিয়ে করতে আসে। তবে সেটি ভাড়ার পোশাক নয়। তার বিয়ে উপলক্ষে তৈরি হয়েছে। সঙ্গে বুকে কুঁচি বসানো সাদা সিল্কের রাফল শার্ট আর বো টাই। পরীর মতো ফুটফুটে দুটি ফ্লাওয়ার গার্ল কনের পেছন পেছন ফুল হাতে ঘুরে বেড়ায়। এরা নেহাতই বালিকা। আর থাকে ঝলমলে পোশাকের দুজন ব্রাইডস মেইড। দুজনের হুবহু এক সাজসজ্জা। পাত্রীর বোন নয়তো প্রিয় বান্ধবী এই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়।

বিয়ের খানিকক্ষণ আগে নিমন্ত্রিত অতিথিরা গির্জার বেঞ্চে এসে বসেন। অর্গানের বাজনার সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন। নির্ধারিত সময়ে অপেক্ষা শেষ হয়। বাইরের দরজায় ওয়েডিং ফ্যামিলি সারি দিয়ে দাঁড়ায়। একে একে বর, কনের সঙ্গে বাবা, মা, ভাই, বোন, জোড়ায় জোড়ায় ভেতরে আসেন। দুদিকে সারি দিয়ে বসা অতিথিদের মাঝখানের পথ দিয়ে, অর্গানের বাজনার সঙ্গে ধীর পায়ে কনে তার বাবার হাত ধরে অলটারের দিকে এগিয়ে যায়। স্বচ্ছ সাদা ওড়নায় মুখখানি ঢাকা। বর হেঁটে যায় তার মায়ের হাত ধরে। তার পেছনে দুজন দুজন করে ফ্লাওয়ার গার্ল, ব্রাইডস মেইড, আর নিকট আত্মীয়স্বজন।

এরপর বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ, শপথ বিনিময়, পরস্পরকে আংটি পরিয়ে দেওয়া আর

স্বামী, স্ত্রী হবার পর প্রথমবার প্রকাশ্যে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন। পাদ্রি সাহেব আশীর্বাদ করেন। অতিথিরা শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন, চুম্বন ইত্যাদিতে ব্যস্ত মা, মেয়ে দুজনেই। তারই মাঝে চোখ মোছার জন্যে বাবা রুমাল এগিয়ে দেন। যখনই যে বিয়েতে যাই, দেখি—মেয়ের বিয়ের সময়, বাবা, মা কেবলই রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন।

এসব মিটলে বর কনে গির্জার বাইরে চত্বরে গিয়ে দাঁড়াতেই তাদের ওপর মুঠো মুঠো 'পঞ্চশস্য' বর্ষণ। তার আগে অতিথিদের সকলের হাতে ছোট্ট জালের পুঁটলি ধরিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষ করে দেখেছি, গম, যব, কাগনি দানা ছাড়াও কী কী সব ভরা থাকে ওই ছোট্ট পুঁটলিতে। সেই দানাগুলো সদ্য বিবাহিত ছেলেমেয়ে দুটির গায়ে, মাথায় ছিটিয়ে তাদের সুখ, শান্তি কামনা করতে হয়।

এরপর হোটেলের রিসেপশন। পরদিন নবদম্পতির হানিমুন যাত্রা। এই হল ট্র্যাডিশন্যাল বিয়ের নমুনা। এছাড়া লোকাচারের পার্থক্য থাকে। ইহুদিদের বিয়েতে দেখেছি, 'ছাদনাতলা' করা হয়েছে—কনে জুতো পায়ে কাচের গেলাস ভেঙে দিয়ে হেঁটেছে। তাকে পুরুষ আত্মীয়রা মিলে চেয়ারে বসিয়ে বেশ কয়েক পাক ঘুরিয়ে আসরে বসিয়েছে। বর নতুন বউ-এর পায়ে ফিতে বেঁধে দিয়েছে। উপস্থিত অতিথিদের জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মাথায় ইহুদিদের মতো টুপি পরতে হয়েছে। র‍্যাবাই-এর সুর করে করে মন্ত্রপড়া, সে রীতিমত দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ অনুষ্ঠান। যদি 'ফিডলার অন দ্য রুফ' সিনেমাটি দেখে থাকেন, মনে করতে পারবেন।

ষাটের দশকে হিপিদের প্রভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানেও অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। পুরনো প্রথাকে অস্বীকার করার চেষ্টায় কিছু কিছু ছেলে মেয়ে আটপৌরে পোশাক পরে পার্কে গিয়ে বিয়ে সেরে ফেলত। তারপর গিটার বগলে সমবেত নৃত্য। খাওয়া দাওয়ার বালাই নেই। উপহারের খরচ নেই। বেশ কয়েক বছর এমন অনাড়ম্বর বিয়ের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু আবার বিয়ের আড়ম্বর ফিরে আসছে।

তবে কি আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে এখনও ঐতিহ্যের অনুসারী? যুগের পরিবর্তন কি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করছে না?

দেখা যাচ্ছে, এখন ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সংমিশ্রণে নতুন ভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগে যেসব নিয়ম একেবারে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হত, এখন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার মধ্যে থেকে যা কিছু গ্রহণযোগ্য, তাই-ই এরা বেছে নিচ্ছে। ভিক্টোরিয়ান আমলের মতো মেঝে অবধি লুটনো গাউন পরে এখনকার কমপিউটার যুগের কনে বিয়ে করছে বটে, কিন্তু বহুমূল্য সিল্কের পোশাকটির দাম নিজেই দিয়ে দিচ্ছে। বিয়ের খরচ নিয়ে কনে আগে থেকে ভাবী বরের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছে। কোথাও দুই পক্ষের অভিভাবক খরচ ভাগ করে নিচ্ছেন। তবে অধিকাংশ সময়ে দেখা যাচ্ছে বিশেষ জাঁকজমকের বিয়ে মানে, চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত ছেলেমেয়ে একটু বেশি বয়সে যৌথ খরচে সব কিছু করছে। ইতালিয়ান আর কিউবান পরিবারেও 'কন্যাদায়' এখন আর বাবার একার চিন্তা নয়। এ এমন দেশ, এখানে যারা বিয়ে করছে, তাদের ইচ্ছের ওপরে যা কিছু আয়োজন নির্ভর করছে।

বাবার আর্থিক সামর্থ্যের ওপর মেয়ের বিয়ে নির্ভর করে না। ছেলের বাড়ির প্রত্যাশার কোনও ব্যাপারই নেই। সামাজিক চাপও তো নেইই। সামাজিক জীবন এতই সীমাবদ্ধ যে, লোক লৌকিকতার দায়ও অনেক কম। এসব কারণে, বিয়েতে ট্র্যাডিশন বজায় রাখার ব্যাপারে ছেলে, মেয়ে যতটুকু চাইবে, সেইটুকুই যথেষ্ট। মেয়েরাই বেশি সোচ্চার। আর আমেরিকান মেয়ে তার বাপের বাড়ির স্বার্থ এত ভালরকম বোঝে যে, বিয়ে উপলক্ষেও তার বাবা, মাকে অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। খরচের ক্ষেত্রেও নয়।

বিয়ের সময় স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার শর্তটিও ইদানীং গুরুত্ব পাচ্ছে। বিয়ের শপথ নেওয়ার সময় পাত্রী মোটেই আর 'ওবে' কথাটি বলেন না। আদেশ পালন করার দিন গত হয়েছে। অতীতে পাদ্রি সাহেব বলতেন—কে এই মহিলাকে বিয়ের মাধ্যমে দান করছেন? এখন তাঁকে বলতে হয়—কে এদের দুজনকে আশীর্বাদ করছেন? সেই মেয়ের বাবার কথাই কিন্তু আসছে। অথচ মেয়ে এখন দান করার মতো অস্থাবর সম্পত্তি নয়। কী শপথ নেবে, তাও ছেলেমেয়ে নিজেরা লিখে ঠিক করে। মূল শর্ত বজায় রেখে সংস্কারের আধুনিকীকরণ। গির্জায় তাইই মেনে নেওয়া হয়। তবে ক্যাথলিক বিয়েতে প্রথা আনুগত্য কিছু বেশি থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বিয়ের সময় কনের ভূমিকাই প্রধান। আর বর হচ্ছে স্যাটেলাইট। আমেরিকাতেও বরের এরকম গৌণ দশা ছিল। কিন্তু আর তারা উপগ্রহ হয়ে থাকতে চাইছে না। সমানাধিকারই যদি হবে, তবে বিয়ের সময় পুরুষকেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে। অবশ্য এই প্রাধান্যের লোভে পড়ে তাদের পরিশ্রম বেড়ে গেছে। ভাবী শ্বশুর, নয়তো ভাবী বউ-এর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গির্জা ঠিক করা, হল জোগাড় করা, ফুলের অর্ডার দেওয়া, বাজনদারদের ইন্টারভিউ করা, হোটেলে হোটেলে ঘুরে খাবার পরীক্ষা করা। ফটোগ্রাফারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কার্ড বাছাই আর কথায় কথায় চেক আপ—বিয়ের আগে থেকে সম অধিকার অর্জনে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

বাঙালির 'আইবুড়ো ভাতে'র মতো আমেরিকান কনের জন্যে আছে ব্রাইডাল শাওয়ার। মহিলা আত্মীয়স্বজন আর বান্ধবীদের উদ্যোগে শুভকামনা বর্ষণের অনুষ্ঠান। কনেকে খাওয়ানো, উপহার দেওয়া, কেক কাটা, শ্যাম্পেন টোস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। একান্ত মহিলা সমাবেশ হলেও ভাবী বরকে নেমন্তন্ন করা হয়। ছেলের বাড়ির এরকম কোনও অনুষ্ঠান নেই। কিন্তু অন্য ব্যাপার আছে। বিয়ের ২-৪ দিন আগে বরের বন্ধুবান্ধবরা ব্যাচেলার্স পার্টি দেয়। কনে তো দূরের কথা, কোনও ভদ্রমহিলারই সেখানে নেমন্তন্ন হয় না। শুধু একজন কল গার্লকে ভাড়া করে আনা হয়। মোহিনীর সঙ্গে শেষ রজনী! অতীতে নাকি সেইরকম উদ্দেশ্য ছিল। এখন নিছক হই হুল্লোড়, নাচ, গান, আর আদি রসাত্মক রসিকতায় এসে ঠেকেছে। তবে 'ব্যাচেলার্স পার্টি'তে কলগার্ল ডাকা হবে কিনা—সেটা নির্ভর করে বর আর তার বন্ধুবান্ধবের রুচিবোধের ওপর। এখানে পরিবারের কোনও ভূমিকা নেই।

আমেরিকান বিয়ে নিয়ে লিখছি তো। বাঙালির দ্বিতীয় প্রজন্মের পরিণয় কাহিনী সবিস্তারে এবারে নয়। তবে যারা আমেরিকান বিয়ে করেছে, তাদের বিয়ে কেমন দেখেছি, জানানো হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ পর্যন্ত কম বিয়ে তো দেখলাম না। শ্রাবণী হোড় আর অ্যালেক্স কসনিকের বিয়ে হল ক'বছর আগে। মিতা চ্যাটার্জি বিয়ে করল জেফ

গার্ডনারকে। আশিস ভট্টাচার্যর সঙ্গে চার্চে ফ্র্যানের বিয়ে দেখলাম। অরূপ ঘোষের সঙ্গে ডেবির বিয়ে। আশিস সেনগুপ্ত আর তুলসী বউদির মেয়ে বান্টি বিয়ে করল ম্যানুয়েলকে। আর সদ্য সদ্য আমার এক দিদির মেয়ে জুঁই বাগচি বিয়ে করল জেমসকে। তার ডাক নাম জিম। ইতিমধ্যে চার-পাঁচ জন সাহেবকে গায়ে হলুদ দিয়েছি। ধান, দুর্বো দিয়ে আশীর্বাদ, মুখে লাড্ডু গুঁজে দেওয়া—দেশাচারে আমাদের ত্রুটি নেই।

একমাত্র সমস্যা হয়েছিল শ্রাবণীর বিয়ের সময়। তার মা আমাকে বলেছিলেন, গায়ে হলুদের সকালে 'শ্রী' গড়ে নিয়ে যেতে। অ্যালেক্সকেও একই সঙ্গে গায়ে হলুদ দেওয়া হবে। তার আগে মিতার বিয়ের সময় জেফকে মনের আনন্দে তেল হলুদ মাখানো হয়েছিল। সুতরাং অ্যালেক্সও মাখবে নির্ঘাৎ।

কিন্তু 'শ্রী' গড়ার ভার পেয়ে মুশকিলে পড়লাম। চারুকলা বিভাগে আমার প্রতিভা কখনও বিকশিত হয়নি। শানু লাহিড়ী ছিলেন আমাদের ড্রইং টিচার। অমন সদ্‌গুরু পেয়েও জীবনে কিছু হল না। সে যাক...। 'শ্রী' আমাকে গড়তেই হবে বুঝে গেলাম। কিন্তু দেশে থাকতেও তো কখনও মন দিয়ে দেখিনি, কী ভাবে কী করে? জানতাম, গিন্নি টাইপের একজন বানায়, আর যে জন্যে আবার শাড়িও পায়। হ্যাঁ, আরও জানি, ঘটিরা বলে 'ছিরি'। খুবই সীমিত জ্ঞান। কানাঘুষোয় শুনেছি শ্রাবণীর মা আমার জন্যে দেশ থেকেও শাড়িও আনিয়েছিল। তবে কি আমি গিন্নি? জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে...!

'শ্রী' প্রকল্পে হাত দেবার আগে বিস্তর ফোনাফুনি হল। বহুজনের বহু উপদেশ পাওয়া গেল। কত শত ফরমুলা! ধুর! কে আবার ব্লেনডারে চাল বাটতে বসবে? একি ইডলির প্রজেক্ট? তার চেয়ে ময়দার সঙ্গে রং গুলে বানানো যায় না? শুনলাম ময়দার শ্রী কেউ শোনেনি। হঠাৎ মাথায় খেলে গেল—রং বেরঙের প্লাস্টার অফ প্যারিস তো কিনে আনতে পারি। ময়দার মতো নরম, 'প্লে ডো' দিয়ে বাচ্চারা কত কিছু বানায়। আমার মেয়ে অনবরত কেঁচো আর পাখি বানাত। আর আমি শানুদির ছাত্রী হয়ে 'শ্রী' বানাতে পারব না?

ছোট ছোট কয়েক তাল রঙিন 'প্লে ডো' কিনে আনলাম। প্রথমেই স্টিলের থালার মাঝখানে একটা কটকটে গোলাপি রঙের গোল্লা বানিয়ে রাখলাম। তার গায়ে গায়ে কেঁচোর মতো সরু সরু হলুদ আর সবুজ রঙের নরম প্লাস্টার পাকিয়ে টিপে টিপে দিলাম। যেন গোলাপি পর্বতের গা থেকে নানা রঙের নদী নেমে আসছে। এবার পর্বতের গায়ে চিরুনি দিয়ে ইকড়ি মিকড়ি ডিজাইন। তার ওপর হলুদ, আর সবুজ গুল্লি পাকিয়ে ছাগলের নাদির স্টাইলে টিপের মতো বসাতে থাকলাম। থালা জুড়ে রঙের মেলা। পর্বতের চুড়োয় একটা টিয়া পাখি থাকবে আগেই কথা ছিল। বেশ মোটা মতো কটকটে সবুজ রঙের পাখি বানালাম। নাকের দু'পাশে গোলমরিচ টিপে দিলাম। একেবারে ঘোরাল চাউনি। তারপর লাল গোল্লা থেকে ঠোঁট তৈরি করে একটু বেঁকিয়ে পাখির নাকের কাছে ঠুসে দিলাম। ঠোঁটের ভারে টিয়া হয়ে গেল সবুজ কাঠঠোকরা। আবার লাল ঠোঁট ছিঁড়ে নিলাম। আবার পলতের মতো পাকিয়ে নতুন করে শুকসজ্জা—শুক বলে আমায় কৃষ্ণ মদন মোহন...।

শ্রাবণীর বরাত ভাল যে ওই অভিনব শিল্পকলা শেষ পর্যন্ত আমায় বহন করে নিয়ে যেতে হয়নি। আমাদের বন্ধু বৃতি কুণ্ডুর বোন মুনমুন আর তার বর সে সময় এখানে বেড়াতে এসেছিল। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই চারুশিল্পে বিশেষ দক্ষ। সেই বৃতিই আমায় তরালো।

তার বোন আর ভগ্নিপতি মিলে একেবারে দেশের নিয়মে চাল বাটা আর রং, তেল মিশিয়ে কী যে অসাধারণ এক শ্রী গড়ে দিল। বিয়ের আগের দিন পৌঁছেও দিয়ে গেল। আমার ডিউটি ছিল শুধু তেল দিয়ে দিয়ে 'শ্রী'কে অখণ্ড অবস্থায় রাখা। বিয়ের দিন আমি কিন্তু কাউকে মিথ্যে বলিনি। 'শ্রী' দেখে মুগ্ধ লোকজনকে আগ বাড়িয়ে বলেছি—ধ্রুবর বউ বৃতি, বৃতির বোন মুনমুন, মুনমুনের বরই তো নিজে হাতে...।

শুধু একটাই লজ্জার ব্যাপার থেকে গেছে। বিয়ে মিটে যাবার পর শ্রাবণীর মা আমাকে শ্রী গড়ার জন্যে শাড়ি দিলেন। মুনমুনরা দেশে চলে যাওয়াতে আর কখনও যোগাযোগও হল না। নয়তো শাড়িটা ওদেরই পাওয়ার কথা ছিল।

বাঙালি আর আমেরিকান পরিবারের মধ্যে যেসব বিয়ে হচ্ছে, সেখানে জাঁকজমক ক্রমশই বেশি হচ্ছে। একবার চার্চে বিয়ে, খাওয়া দাওয়া। আবার অন্য দিন পুরোহিত ডেকে হিন্দুমতে ঘণ্টা দেড়েকের বিয়ে, যাগযজ্ঞ, রিসেপশন, এলাহি খাওয়া দাওয়া, নাচ, গান, কেক কাটা। আগে ছোট হল ভাড়া করে, কেটারিং করে, ক্যাসেটে সানাই টানাই বাজিয়ে 'বিয়ে বাড়ি'র ঘটা হত। এখন ছেলে, মেয়েরা হিলটন, শেরাটনের ব্যাংকোয়েট হলে বিয়ে আর সেখানেই ভারতীয় রেস্তোরাঁর কেটারিং চাইছে। ডলারে কী না হয়? নিউ ইয়র্কে মুঘল পেন্টা হোটেলে এখন বিয়ে বাড়ির রমরমা 'ব্যবসা' করছে। হিলটন, শেরাটনের মতো বড় বড় হোটেলের সঙ্গে তাদের কন্ট্রাক্ট। হোটেলের মধ্যে বিয়ের আসর তারাই সাজাচ্ছে। যুঁই আর বান্টির বিয়েতেও দেখলাম, 'হায়াট' হোটেল আর 'র‍্যাডিসনে'র বিশাল লবির এক পাশে বিয়ের জন্যে আলাদা ঘর সাজানো হয়েছে। সে ঘরে অন্তত শ'তিনেক লোকের চেয়ারে বসে বিয়ে দেখার ব্যবস্থা। ফুল, পাতা আর সিল্ক জড়ানো স্তম্ভ, চাঁদোয়া এনে ছাদনা-তলা, বিয়ের মঞ্চ সাজিয়ে দিচ্ছে মুঘল গ্রুপের লোকজন। ভেলভেটের গদি বসানো নকল রুপোর জলচৌকি, সিংহাসন মার্কা উঁচু চেয়ার, সব বয়ে বয়ে আনছে। মালা বদলের এক জোড়া মস্ত ফুলের মালাও গেঁথে আনবে অর্ডার দিলে। বান্টি, ম্যানুয়েলের জন্যেও গেঁথে এনেছিল। মহারাষ্ট্রীয় পুরোহিত রামচন্দ্র পটবর্ধনই অধিকাংশ বিয়ে দেন। আমাদের বাঙালি বিয়ের সঙ্গে প্রায় কিছুই মিল খুঁজে পাই না। আমার ধারণা মারাঠি বিয়ের সঙ্গেও বিদেশের এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ পদ্ধতির বিশেষ মিল হবে না। সময়ের অভাব একটি প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত পটবর্ধন নিজেই সংক্ষিপ্ত ফরমূলা তৈরি করেছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাতে হাত মিলিয়ে দেন, না ঘট, গামছার আয়োজন, না নারায়ণ শিলার অবস্থান। সপ্তপদী হিসেবে ছেলে, মেয়েকে সাতবার ঘুরে আসতে বলেন। আমেরিকান জামাই আর বাঙালি মেয়ে হাত ধরাধরি করে সাত চক্কর দিয়ে আসে। মঞ্চের ওপরেই ঘোরে। এরপর যজ্ঞ, সিঁদুর দান আর গাঁটছড়া বাঁধা।

এ অঞ্চলে পটবর্ধন ছাড়াও অন্যান্য অবাঙালি পুরোহিত আর দু-একজন বাঙালি পুরোহিতও বিয়ে দেন। এঁদের বিয়ে আমাদের প্রথার সঙ্গে অনেক বেশি মেলে এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় নিয়ে হয়। আসলে যাঁরা যেভাবে বিয়ে দিতে চান, তাঁরা সেইভাবে পুরোহিত নির্বাচন করেন। পটবর্ধন আমেরিকান বর আর কুটুমবাড়ির বোঝার সুবিধের জন্যে ইংরেজিতে হিন্দু বিয়ের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। কুশণ্ডিকার কয়েকটি মন্ত্রের সার সংক্ষেপ অনুবাদ করে দেন। এই বৃদ্ধকে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সির ছেলেমেয়েরা গত কুড়ি

বাইশ বছর ধরে নানা বাড়ির পুজোয় দেখে এসেছে। আগে আগে সত্যনারায়ণ পুজো, সরস্বতী পুজো থেকে শুরু করে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক কাজ ইত্যাদিতে শুধু পটবর্ধনকেই দেখা যেত। এখন যেসব ছেলেমেয়েদের বিয়ে হচ্ছে, তারা অচেনা নতুন পুরোহিতের বদলে এতদিনের পরিচিত সৌম্যদর্শন, সদালাপি বৃদ্ধকেই পৌরোহিত্যের জন্যে নির্বাচন করতে চাইছে। তাঁর দেওয়া বিয়ে 'শর্টকাট' কিনা, এসব নিয়ে তাদের মা, মাসিরা মাথা ঘামালেও তারা গুরুত্ব দিচ্ছে না। মা মাসিরা এ জন্যে স্ত্রী আচারে মন দিয়েছেন। ভোরবেলা মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে দধিমঙ্গল, বেলা বাড়তে পেছনের বাগানে দলবল নিয়ে গায়ে হলুদ সারছেন। জামাইকেও কাছাকাছি কোনও বাড়িতে আনিয়ে হলুদ মাখিয়ে, মাথায় ঘট ভর্তি জল ঢালা হচ্ছে। বিকেলে জামাই বরণ, হেঁটে হেঁটে সাত পাক ঘোরানো, মালাবদল, শুভদৃষ্টির সময় যথাসম্ভব শাঁখ উলু বাজিয়ে শুভ কাজ সম্পন্ন করছেন। সাহেবের বাড়ি তত্ত্ব যাচ্ছে। শেরাটনের ব্রাইডাল স্যুইটে ফুলের তোড়া দিয়ে ফুলশয্যার খাট সাজানো হচ্ছে। একটি বিয়ে মানে অভিবাসী সমাজে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়া।

বিয়ের অনুষ্ঠানের পর ককটেল আওয়ার। এককালে সাহেবি স্ন্যাক্স পরিবেশন করা হত। এখন সিঙাড়া, কাবাবের গন্ধে হোটেলের লবি ভরপুর। 'মুঘল' আমেরিকাকেই মুঘলই-আজম বানিয়ে ছেড়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা পেয়ার কিয়া। আর আমাদের হাতে চিকেন টিকিয়া। শিক কাবাব, শাম্মি কাবাব, রেশমি কাবাব! ঘর মে অ্যান্টাসিড হ্যায় তো ডরনা কেয়া?

এরপর গ্র্যান্ড বলরুমে ফর্মাল ডিনার। নিজেদের নামের কার্ড দেখে দেখে বসা। এককালে ফ্যাকাশে সাহেবি ডিশ দিয়ে যেত। এখন 'মুঘল' তার দাওয়াতখানা খুলে দিয়েছে। অবশ্য সবই এক রাতের ব্যাপার। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ হোটেলে আর 'ভারতভূমির' চিহ্ন থাকবে না। তা না থাক, আমরাও তো 'একটি রাতের' অতিথি! মোগলাই খানা, ডিস্কো নাচ, ওয়ালজ, স্কোয়্যার ডান্স। আর সম্প্রতি যোগ হয়েছে ভাঙড়া। বর যদিও আমেরিকান, তবু তার আদি দেশ যেখানে ছিল, সেখানকার স্থানীয় বাজনার সঙ্গে নাচ হবেই। জার্মান, ব্রিটিশ, স্কটিশ, গ্রিক, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, ফ্রেঞ্চ, সুইস—যে জাতই হোক, তাদের নিজস্ব গান বাজনার সঙ্গে ভারতীয়রাও নাচে যোগ দেবে। ভোজন পর্বের আগে একপ্রস্থ নৃত্য গীত। পরে আর এক প্রস্থ। মেয়ের সঙ্গে বাবা নাচবেন। জামাই-এর সঙ্গে শাশুড়ি। পুত্রবধূর সঙ্গে শ্বশুর। একটি বিয়েতে গেলাম নিউ জার্সির 'আকবর' রেস্তোরাঁয়। বাঙালি ছেলে আর তার আমেরিকান নববধূর রিসেপশন। ছেলের বাবা, মা, সুদেব দাম আর ছন্দা দাম সেদিন পুরোপুরি ভারতীয় গান বাজনার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলাদেশের একটি দল গান গাইতে এসেছেন। মেম বৌ 'ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া'তে ডাক্তারি-ছাত্রী। বয়স বড় জোর পঁচিশ, ছাব্বিশ। ঝলমলে বেনারসির আঁচল কোমরে গুঁজে নিয়ে, খোঁপা দুলিয়ে দুলিয়ে তার সে কী নাচ! বাঙালি ছেলে পাঞ্জাবি, পায়জামা পরে যা হোক করে নাচার চেষ্টা করছে। আর তার বউ মাথা ঘুরিয়ে, কোমর দুলিয়ে নাচছে—'বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম, দেখা পাইলাম না'। মাসিরা কি আর চেয়ারে বসে থাকতে পারে? সারা ফ্লোর জুড়ে হই হই নাচ। যেমন বাংলাদেশের শিল্পীদের

জমাটি লোকসঙ্গীত, তেমনই পাগলপারা নাচ! ছন্দা দাম আসানসোলের মেয়ে। সেখানে ছাত্রী জীবনে স্কুল, কলেজে ভালই নাচতেন। ছেলে সুমনের রিসেপশনে তাঁকেও ফ্লোরে আসতে হল। মেম বউ যদি অজানা গানের সঙ্গে এমন সুন্দর নাচতে পারে তো শাশুড়ি, কেন, মাসি শাশুড়িদেরও নাচের উন্মাদনা এসে যায়। ওই পার্টিতেই 'সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী'র সঙ্গে সকলের দেখাদেখি হাত তুলে তুলে নতুন বউ-এর কী নাচ! আহা! ফুলশয্যার রাতেই গয়া কাশীর ডাক...।

জুঁই-এর বিয়ের রাতে হোটেলের বলরুমে দু'পক্ষের নাচের পাল্লাই ছিল সমান সমান। ইধারকা নাচ এক ঘণ্টা, তো উধার কা নাচ এক ঘণ্টা। বাঙালি ওয়েস্টার্ন ডান্সের শেষে বাও টাও সেরে টেবিলে বসতে না বসতে ভাঙড়ার হু হুঙ্কার। আবার ন্যাপকিন নাচিয়ে নাচিয়ে, এক্কা দোক্কার পোজে এগিয়ে চলো। জুঁই-এর শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও যথাসাধ্য পা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যোগ দিয়েছে। ভারতীয় লোকনৃত্যের প্রতি খুবই আকর্ষণ! হওয়াই স্বাভাবিক। বাঙালি যদি 'থরহরি কম্প' নৃত্যে এক ঘণ্টা ধরে শরীর ঝাঁকাতে পারে, 'ট্যাংগোর' বাজনায় শরীর ভেঙেচুরে পেছনে কেতরে পড়তে পারে, পরমুহূর্তে বন বন করে ঘুরতে পারে, 'আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি'র মতো পিঠ ধরে ধরে সারা হল তাল ঠুকে ঠুকে যেতে পারে, তবে আমেরিকানরা এক পা তুলে তুলে ভাঙড়া পারবে না?

সে রাতে ডিস্ক জকিরা সানাই থেকে 'খলনায়ক' কিছু বাকি রাখেনি। ঠিক কত রাতে খেয়াল নেই, দেখলাম এক দল মেয়ে নাচছে—চোলিকে নীচে (নাকি পিছে?) কেয়া হ্যায়...। এ গানের নিহিতার্থ নিয়ে নাকি বেজায় আন্দোলন হচ্ছিল। দেখুন, কত খবর রাখি? চোলি, চুন্নি কোনও সমাচারই অগোচরে থাকে না।

এবার বিবাহ সমাচার শেষ করি। বাঙালির সঙ্গে আমেরিকানের বিয়ে প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায়—ইদানীং জাঁকজমক অনেক বেড়ে গেছে। ভারতীয় পরিবারে পাত্র অথবা পাত্রী, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করছে। যাকে বিয়ে করছে, সেও মোটামুটি একই ধরনের আর্থ সামাজিক স্তর থেকে আসছে। শিক্ষা, দীক্ষা, চাকরির ক্ষেত্রেও তাই। ফলে বিয়ে যেভাবেই হোক, তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী হচ্ছে। মেয়ের বাবার ভূমিকা বলতে, বিয়ের খরচের সিংহভাগ তিনি বহন করছেন। মেয়েও অনেক সময় খরচ দিচ্ছে। তবে সবই নির্ভর করে পারিবারিক পরিস্থিতির ওপর। প্রফেশনাল মেয়েরা প্রায় অর্ধেক খরচ নিজেরা দেয়। চার্চ ওয়েডিং ইত্যাদির খরচ দেন আমেরিকান বৈবাহিক অথবা ছেলে নিজে। এভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। যৌতুক বলতে ফার্নিচার ইত্যাদি ছেলেমেয়েরা নিজেদের খরচে কেনে। বিয়ের সময় অধিকাংশ লোক তাদের গিফট চেক বা নগদ ডলার দেন। এখানে একটা হিসেবের ব্যাপারও কাজ করে। ধরুন দুজন অতিথির জন্যে বিয়েবাড়িতে খরচ হয়েছে দেড়শো ডলার। ডিনারে প্লেটের দাম, ককটেল, ফ্লাওয়ার থেকে ইত্যাদি মিলিয়ে। অতিথিরা সেই আন্দাজ করে নগদ ডলার বা গিফট চেক যৌতুক দেন। আমেরিকানদের মধ্যে এরকমই চলে। ইদানীং বাঙালিরাও আন্দাজে উপহার কেনার বদলে চেক দিচ্ছেন। নয়তো দল করে একটি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দিচ্ছেন। দোকানে জিনিস ফেরত দেওয়ারও কোনও ঝামেলা নেই। বিয়ের পর ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে করলে ডুপ্লিকেট উপহার দোকানে ফেরত দিয়ে অন্য জিনিস আনতে পারে। আর আছে ব্রাইডাল

রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা। বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কনে একটি ফর্দ রেখে দেয়। সেখানে তার পছন্দ বা প্রয়োজনের জিনিস তালিকাবদ্ধ করা থাকে। আমরা গিয়ে তার মধ্যে যার যেরকম বাজেট, সেই সেই উপহারটির দাম দিয়ে দিই। তখন আর সেটি তালিকায় থাকবে না। ফলে অন্য লোক আর একই উপহার কিনতে পারেন না। তবে বাঙালিরা ছোট খাটো গয়নাগাটিও দিতে শুরু করেছেন। শাড়ি দেওয়ার রেওয়াজ প্রায় নেইই। কারণ এদের শাড়ি পরার অভ্যাস অথবা সুযোগ কোনও কিছুই নেই। হ্যাঁ মেয়ের বিয়েতে গয়না দেওয়া এদেশেও আছে। সাহেব জামাই পায় সোনার আংটি, চেন, সোনার বোতাম। আমেরিকায় ভারতীয়দের সোনার গয়নার দোকানগুলো এখন বিয়ের মরশুমে জব্বর ব্যবসা করছে। আমেরিকানরা সাধারণত পুত্রবধূকে দেন মুক্তো, হিরে, নয়তো চোদ্দো ক্যারেটের শৌখিন গয়না।

হ্যাঁ, নমস্কারীও দিতে দেখেছি আমেরিকান বেয়ানকে। শ্রাবণীর মা অ্যালেক্সের মাকে 'সমুদ্র সবুজ' রঙের বেনারসি দিয়েছিলেন। সেই শাড়ি পরে প্রৌঢ়া মহিলা সারাক্ষণ মোমের পুতুলের মতো বসেছিলেন। অ্যালেক্স শৈশবে পিতৃহীন। মহিলার শেষ সন্তান। বিয়ে দেখার সময় মোমের পুতুলের গাল বেয়ে জলের ধারা নামছিল। এমন সব ধারাবাহিক ঘটনা মানুষকে স্বস্তি দেয়। ভাবে, বিদেশে ছেলে, মেয়ের জাত, ধর্ম গেল ভেবে লুকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার কোনও অর্থ হয় না। মানুষ তো সব দেশেই সমান। বিয়ের দিনে বিধবা মায়ের অশ্রুসজল মুখ—চির পরিচিত এই দৃশ্যের পরে দূরকে নিকট করা কি এতই কঠিন হবে?

২৭ নভেম্বর ১৯৯৩

সান্ত্বনা প্রার্থনীয়

আপনাদের জানাশোনার মধ্যে এমন কেউ আছেন, যাঁর জীবনে একবারও কোনও প্রতিকূল ঘটনা ঘটেনি, এবং সম্ভবত ঘটবে না? বড়রকম সমস্যা তো হয়ই না, এমনকি ছোটখাটো ঝঞ্ঝাট থেকেও তাঁরা মুক্ত থাকেন? আছেন কেউ? আমার জানাশোনার মধ্যে আছেন। এবার সেই স্থানীয় সুখময়দের সুসমাচার দিয়ে শুরু করি।

প্রতাপ আর রঞ্জনা সাহা হলেন সেই জুটি, যাঁদের দেখলেই মনে হয়—থাকে যদি কোথা অশোক নিলয়—তবে সে এঁদের বাসভবন। অগার ফিরদৌসে জমিন অস্ত...। হোল টাইম শুক্লপক্ষ। মহানিশা কথাটাই এরা জানেন না। বড়জোর আশাপূর্ণা দেবীর লেখায় দেখেছেন। অভিজ্ঞতায় নেই। কারণ, অশান্তি, টেনশন জাতীয় উপদ্রব সাহাভবন থেকে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

প্রতাপ সাহারা আমেরিকার বাইরে বিশেষ যান না। যে জন্যে যাত্রা বিভ্রাট, মাল ভর্তি স্যুটকেস লোপাট, ইন্ডিয়ায় গিয়ে সপরিবারে ম্যালেরিয়া নয়তো ডায়রিয়া হয়ে ধুঁকতে

ধুঁকতে ফেরা, "আর বোধহয় দেখা হবে না" বলে এয়ারপোর্টে বুড়ো বাবা, মার কান্নাকাটির পরে এখানে এসে টানা বিষাদপর্ব—এতরকম হার্দিক সমস্যা তাঁদের হয় না। অযথা ঝুঁকি না নেওয়ার ফলে বাড়তি অ্যাডভানটেজ আর কী! এঁদের মুখে বাবা, মা ভাই বোনদের কথাও শোনা যায় না। স্বামী, স্ত্রী দু'জনেরই ধরিত্রীর মতো স্থির এবং উত্তরে চাপা প্রকৃতির মানসিক গঠন।

কিন্তু স্থানীয় বাঙালি সমাজে উৎকণ্ঠার ভূমিকম্প লেগেই আছে। একজনের বিপদে দশজনের উত্তেজনা। প্রত্যেকে নিজস্ব ব্রহ্মাস্ত্র হাতে লড়াই করতে ছুটে যাচ্ছেন। একটা অসুখ, বিসুখ কি দুর্ঘটনার খবর পেলে হল। মহিলাদের এক হাতে রোগীর ঝোল, অন্য হাতে তারকেশ্বরের সুতোর বাবা, নয়তো পলিথিনের ছোট্ট ঠোঙায় সাঁইবাবার বিভূতি। সাঁই সাঁই করে গাড়ি চালিয়ে অকুস্থলে গিয়ে উপস্থিত। সারাবছর ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে 'ফাইটিং'-এ চলেছেন আমেরিকার 'পুতলি'। ইদানীং হার্ট বাইপাস সার্জারি তো জল ভাত হয়ে গেছে। তবু যদি একবার কোনও ভারত কুমারের অপারেশনের সময় হাসপাতালের লবিতে সমবেত বাঙালির রণসজ্জা দেখেন! বুকে টেনশন, মুখে—হবে জয় রে, ওহে বীর হে নির্ভয়...। হাসপাতালে নীরবতা রক্ষার জন্যে ঝাঁসি বাহিনীর গণসঙ্গীতের বদলে মনোসঙ্গীত। হাতে নির্মাল্যের কম্বিনেশন প্যাকেড। ও. টি তে চালান দিতে না পারলেও, পরে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে বীরের বালিশের নীচে টুক করে রেখে আসা যাবে।

শুধু সাহাদের কেউ 'আহা' বলার স্কোপ পায়নি। আজ পর্যন্ত তাঁদের কেউ জ্বরে ভুগতেই শোনেনি, তো ফ্যাকাশে রঙের চিকেন স্টু বানাবে কোন অকেশনে? কুড়ি বছর ধরে এমন জব্বর স্বাস্থ্য রক্ষা করলে লোকের সেবা নেওয়ার দরকার হয় না তো। অথচ এখানে অনেকেই এক আধবার হাসপাতালে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। পরস্পরের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র আর স্টুয়ের ঋণে আবদ্ধ হয়ে আছে। বেশির ভাগই এই ধাঁচের 'আহা! উহু!' প্রত্যাশী পরিবার। কিন্তু সাহারা অন্য টাইপ।

এঁরা সাজপোশাকে দারুণ শৌখিন। দেশে যান না বটে। কিন্তু চারগুণ খরচ করে বাজার আনিয়ে নেন। সেরা সাজসজ্জার গৌরবে রঞ্জনা নিজেকে বেশ স্বতন্ত্র মনে করেন। সাহারা অন্যের বিপদে আপদে জন-সংযোগের ভার নেন। লাগাতার টেলিফোনে কমিউনিকেশন। অকুস্থলে যান। খুব সহানুভূতিশীল। নিজেরা চিরসুখীজন হলেও অপরের ব্যথিত বেদন বোঝেন। মুখ চেনা লোকেরও আসলে ক্যানসার হয়েছে কিনা জানার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রোগীর বাড়ির লোক সদুত্তর না দিলে ভারতীয় ডাক্তার মহলে গিয়ে খোঁজ খবরের চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রফেশনাল এথিকসের কারণে ঠিক সহযোগিতা পান না। যাই হোক, প্রতাপ আর রঞ্জনার চিরসুখের মধ্যে উদ্বেগ বলতে ওই পরের জন্যে বেশি চিন্তা করা। সবাইকে সহানুভূতি জানানোর ব্যগ্রতা।

ক্রমশ পৃথিবী এতই ছোট হয়ে এসেছে যে দূরের খবর নানা সূত্রে এসে পৌঁছয়। কেউ কেউ শুনেছেন রঞ্জনার বাবা দুরারোগ্য রোগে অসুস্থ। প্রতাপ পাটনার ছেলে। সেখানে সম্প্রতি ওঁর মা মারা গেছেন। ওঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও কিছু জানাননি। অন্য সূত্রে খবর পেয়ে যাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁদের প্রতাপ বলেছেন—আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দ্যাট। ওঁরা সমবেদনা পছন্দ করেন না।

প্রতাপ কেন ছোট ভাই মারা যাওয়ার পর একবার দেশে মায়ের কাছে যাননি, মায়ের মৃত্যুর পর এদেশেও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম কিছু করেননি—এ নিয়ে তন্ময় ভটচাজের স্ত্রী একটু কথা তুলেছিলেন। সুবীর গুহর স্ত্রী নন্দা ধমকে দিয়েছে। একি পল্লীসমাজ নাকি? পার্টিতে পরচর্চা? তন্ময় ভটচাজ ছাড়বার পাত্র নন—আমি তো দু'বার ন্যাড়া হলাম। দেড় বছরের মধ্যে টু টাইমস। বাবা, মা বলে কথা! আর টেকো প্রতাপ ন্যাড়া হল না! কিছু ডিফারেন্স হত?

নন্দা বলেছিল—ইউ ডোন্ট নো, প্রতাপদা হয়তো কমিউনিস্ট ছিলেন। কমিউনিস্টরা ন্যাড়া হয় না।

নন্দা বোধহয় বলতে চেয়েছিল কমিউনিস্টরা শ্রাদ্ধ করে না। কিংবা সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্টরা শ্রাদ্ধ করে না। কিংবা সারা পৃথিবীতে তাদের মহা শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে বলে আর বাহুল্য করে না। যাই হোক, প্রতাপ সাহারা এ ধরনের রিচুয়াল না মানতেই পারেন।

হরিদাসের গুপ্তকথার মতো প্রতাপ সাহার গুপ্তকথা অপ্রকাশিত থাকার কথা। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের জন্যে তা ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে পড়ছে। ওঁদের ছেলে আর অনিমেষ দত্তর মেয়ে এক কলেজে ঢুকেছিল। প্রতাপের ছেলে বছর খানেক বাদে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিল। এখন মিউজিক ভিডিওর দোকানে চাকরি করে। অন্য শহরে থাকে। বাল্য সখী অনিমেষ-কন্যাকে সে মাঝে মাঝে ফোন করে। অনিমেষ পরিবার ছাড়াও অনেকেই জানেন প্রতাপ সাহার ছেলে এখন কোথায় আছে, কী করছে? কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু প্রতাপ, রঞ্জনা গত চার পাঁচ বছর ধরে রবিন ইজ্ ডুইং ফাইন গ্র্যাজুয়েট করছে, গ্র্যাজুয়েশন হয়ে গেছে, হি গট এ গুড জব...ইত্যাদি সুসংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন। অনিমেষের স্ত্রী দেবী কখনও রঞ্জনাকে বলে না যে—আমরা জানি রবিন কোনও কিছুই পাস করেনি। মানুষকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয়। তবু মাঝে মাঝে দেবী উত্তেজিত হয়ে পড়ে—ডুইং ফাইন কীরে? ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভাবছে না ওরা? রেকর্ডের দোকানে কেরিয়ার করবে?...বেশি বলতে গেলে দেবীর মেয়েটা রেগে যায়। বিদ্যাবৈরাগী সঙ্গীত রসিক রবিন তার ছোট্টবেলার বন্ধু। সে কেন হাইস্কুল পাস করে আর পড়েনি, সে নিয়ে বড়রা এত ডিসকাস করবে কেন?

সুখীরাম প্রতাপের মেয়ে আমেরিকায় পড়তে আসা এক বাঙালি ছাত্রর সঙ্গে বসবাস করছিল। সে প্রতাপের জ্যাঠতুত বোনের ছেলে। ভীষণ ব্রাইট বাঙালি পাত্র পাওয়া গেছে বলে ভাগ্নের সঙ্গে মহা ধুমধামে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে যে এদেশে বড় হয়েও শেষ পর্যন্ত আমেরিকান বিয়ে করেনি—রঞ্জনা এই আনন্দ সংবাদ অনেককেই জানিয়েছেন।

বরের ঘরের পিসি একজন ঠিক জুটে গেছে। মেয়েটি পাত্রের দিকের আত্মীয়। সে বিয়েবাড়িতেই শোকসভার মতো হাবভাব করছিল। কাদের কাছে যেন বলেছে—আমার দাদা, বউদিরা ভীষণ আপসেট! একটা মাত্র ছেলে কাজিনকে বিয়ে করে ফেলল...।

প্রতাপ মেয়ের বিয়ের দিন তসরের ধুতি, সাদা বেনারসির পাঞ্জাবি পরে একেবারে রাজ বেশে আমাদের অভ্যর্থনা করছিলেন। তাঁর ভাগ্নে কাম জামাইয়ের নাম সানি। বলছিলেন—সানির বাবা, মার আসার খুব ইচ্ছে ছিল। লাস্ট মোমেন্টে ভিসা দিল না। দে মাস্ট বি ভেরি আপসেট...।

প্রতাপ আজ তিনমাসের ওপর টেমপোরারি চাকরি করছেন। আগের ভাল কাজটি চলে গেছে। কিন্তু সে খবর ওঁর ছেলে মেয়েও জানে না। অন্তত উনি তাই বলেছেন। বাইরের লোকের পক্ষে তো জানার কথাই নয়। শুধু এক ভদ্রলোক কী দরকারে প্রতাপের আগের অফিসে ফোন করে জেনেছেন। প্রতাপকে পরে জিজ্ঞেস করাতে বলেছেন—ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলাম। টু মাচ প্রেসার! বাট্ ডোন্ট ডিসকাস উইথ এনি ওয়ান। সবাই জানে আমি বার্ন্স অ্যান্ড রোতেই আছি।

আমেরিকার লে-অফ কালচারে প্রফেশন্যাল লোকের চাকরি যাওয়া নতুন ব্যাপার নয়। সে জন্যে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। কারণ কোম্পানির ডাউন সাইজিং-এর সঙ্গে এম্প্লয়ির এফিসিয়েন্সির তেমন সম্পর্ক নেই। তাই প্রতাপ সাহা যে কেন এত লুকোছাপা করছেন, নিজের ছেলে মেয়েকে পর্যন্ত সত্যি কথা বলছেন না—এতে অন্য ভদ্রলোক অবাক হয়েছেন।

গোপনীয়তার কারণ হিসেবে প্রতাপের যুক্তি—রঞ্জনা ভীষণ প্রাইভেট পার্সন। আমাদের প্রবলেম নিয়ে অন্যরা কথা বলবে, শি হেটস দ্যাট। সো ফার আই ডোন্ট সি এনি প্রবলেম! লোকেরা শুধু শুধু বলবে আই লস্ট মাই জব, সিমপ্যাথি দেখাবে, সেটা একদম চাই না।

এঁরা সহানুভূতিকে ঘৃণা করেন। সমবেদনা সহ্য করতে পারেন না। এঁরা যে সব সময় খুব ভাল আছেন, সে কথা বোঝানোর জন্যে গোপনীয়তা রক্ষা করেন। এ জন্যে বিশেষ সৌভাগ্যবান মানুষদের শরীর খারাপ হয় না। গাড়ি খারাপ হয় না, দূর দেশে থাকা আত্মীয়স্বজনের দুরারোগ্য ব্যাধি হলে দুর্ভাবনা হয় না, মায়ের মৃত্যুতে শোক হয় না, সন্তানের জীবনে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে দুঃখ হয় না। এঁরা সব সময় নিজেদের সাফল্য আর সুখের ছবি তুলে ধরতে চান।

সুখুর গল্প শেষ হল। এবার দুখুর কথা। এ প্রসঙ্গে কিন্তু তাঁদের কথা বলছি না, যাঁরা অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে মোটামুটি সামান্য লক্ষণ নিয়ে চিহ্নিত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত শোকে, বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে, অ্যাভারেজ মানুষ যেমন আত্মীয়, বন্ধু প্রতিবেশীদের কাছে সমবেদনা, সাহায্য, সহমর্মিতা, বুদ্ধি, পরামর্শ আশা করেন, তেমন স্বাভাবিক প্রবণতা দুখীর বারমাস্যা নয়। আমেরিকায় যাঁরা ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে অচেনা লোকের দরবারে নিয়ে আসেন, তাঁদের কথাই এবার উল্লেখ করছি।

সাইকোথেরাপির যুগে পেশাদারি মনোবিদ্যা বিশেষজ্ঞর কাছে যাওয়া ক্রমশই চিকিৎসার অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। মানসিক ভার লাঘব করার জন্যে এই ব্যবস্থা। আমেরিকান সমাজে সাইকোথেরাপিকে দীর্ঘদিন ধরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ফলে যা দাঁড়াচ্ছে, অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা আঘাত থেকে কোনও কোনও মানুষ এতই বিচলিত, বিষণ্ণ হয়ে পড়েন, যে তাঁকে থেরাপিস্টের সাহায্য নিতে হয়। তিনি মনের ভার লাঘব করে স্বস্তি পান। এখন এই যে মনের কথা বলার একটি সরাসরি সূত্র পাওয়া গেছে, তার প্রভাব সমাজের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। অনেকেই মনে করছেন—সব কথা সবাইকে বলা যায়। তাঁদের কাছে একান্ত গোপন বলে কিছু থাকছে না। তাঁরা

টেলিভিশনের 'টক-শো'গুলিতে এসে মনের কথা উজাড় করে দিচ্ছেন। কেউ বলছেন—এ আমার স্বীকারোক্তি। কেউ বলছেন—এ আমার অভিযোগ। কেউ বলছেন—আমি আমার স্বামীর মুখোশ খুলে দিতে চাই। কেউ বলছেন আমার দুঃখ সকলকে ভাগ করে দিতে চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ আসলে চাইছেন টেলিভিশনের মাধ্যমে নিজেকে দেখাতে। নানারকম উদ্দেশ্য কাজ করছে। এদেশে দিনের মধ্যে এরকম বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়। রাত্রেও টক-শো থাকে। ওই চ্যানেলগুলি খুললেই দেখা যায়—একদল লোক চেয়ারে বসে মনের জট খুলছেন। কেউ দোষ স্খালন করার টিমে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা শুধু অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, গোপন প্রেম-ট্রেমের কথা কবুল করছেন। অন্য চ্যানেলে সেদিন হয়তো অনর্গল ধারাপাত চলেছে। প্রবঞ্চিতা মহিলারা কাঁদছেন। স্বামী বা সখার নামে নালিশ করছেন। আর এক চ্যানেলে লাগাতার আক্রমণ চলেছে। চাকরি এবং গৃহকর্ম বিমুখ অলস প্রকৃতির স্থূলাঙ্গিনী স্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বামীরা একজোট হয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছেন। টক্-শো পরিচালক বা পরিচালিকার কাজ হচ্ছে চোখা চোখা প্রশ্ন করে আগুনে ঘি দেওয়া। শুধু যে পারিবারিক সমস্যা তুলে ধরা হচ্ছে, তাও নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণেও যাঁরা বিক্ষুব্ধ। তাঁরাও জেহাদ ঘোষণা করতে টিভিতে আসছেন। বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছতে চান আর কি?

দর্শকরা উপভোগ করছেন। আবার নিজেরাই বলছেন—এ সব কথা কেউ বাইরে বলে? বিশেষ করে পারিবারিক কেচ্ছা নিয়ে এত ঢাক পেটানোর কী আছে?

লোকেরা টক-শো থেরাপিতে আসেন কেন? কেউ সমাজের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করতে আসেন। কেউ চান দর্শকরা সমবেত আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিন। স্টুডিওতে প্রচুর দর্শক উপস্থিত থাকেন এবং ক্ষণে ক্ষণে মতামত দেওয়ার সুযোগ পান। জনপ্রিয় "টক-শো"তে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্যে আগে স্টুডিও থেকে 'পাস' আনাতে হয়। যাই হোক, টক-শো থেরাপির মূল বিষয়ের মধ্যে তীব্র অভিযোগ, অনুযোগ ছাড়াও ব্যক্তিগত সমস্যা, মানসিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। পরিচালকরা বলেন—সমস্যার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁরা শোগুলি করেন।

এই যুক্তি কতদূর সমর্থন যোগ্য বলা কঠিন। "জেনি জোনস শো'তে পরিচালিকা একটি পনেরো বছরের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তার মায়ের বান্ধবী ৩৬ বছর বয়সী মহিলা স্যান্ড্রার সঙ্গে অ্যাফেয়ার চলার সময় ছেলেটির দৈহিক অভিজ্ঞতা কেমন হয়েছিল? পনেরো বছরের ছেলে কাঁধ নাচিয়ে উত্তর দিল—গ্রেট্।

কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে এই সব প্রশ্ন এবং উত্তর রাখা হয়? তবে 'শো'-কে জনপ্রিয় করার জন্যে সস্তা সস্তার হিসেবে এ ধরনের বিষয় অবশ্য সকলেই বেছে নেন না। টক-শো প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীরা কেউ কেউ বলেন—যে সব মানুষের মনের কথা শোনার কেউ নেই, দুঃখ বোঝার মতো কোনও সঙ্গী নেই, তাঁরাই বেশি সংখ্যায় এখানে উপস্থিত থাকেন। রোজ বিকেলে 'অপরা উইন্‌ফ্রে' শো হয়। পরিচালিকা মহিলাটিকে আপনারা অনেকেই "কালার পার্পল" ছবিতে প্রধান চরিত্রাভিনেত্রীর ভূমিকায় দেখেছিলেন। অপরা এদেশে ভীষণ জনপ্রিয়। তাঁর টক-শোর বিষয় নির্বাচনও সুচিন্তিত। একটি শো-তে বেকি আর গ্রেগ নামে এক দম্পতি এসেছিলেন। বেকি সন্তানসম্ভবা, অথচ বিবাহ বিচ্ছেদ চান।

কারণ গ্রেগ তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। বেকি নিশ্চয়ই এই আশা নিয়ে এসেছিলেন যে, তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্যে অপরা কিছু করবেন। শুধু তাই নয়, স্বামীর স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে হয়তো বেকি তাঁর হাতে থেকে মুক্তি পাবেন। গ্রেগ ভয় পেয়ে সরে যাবেন। জনতার আদালতে তাঁর অত্যাচারের কাহিনী রেকর্ড হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই গর্ভবতী দুঃখী মহিলাটি ভবিষ্যতে পুলিশ প্রোটেকশনও পাবেন। অর্থাৎ এঁরা আসেন নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জানাতে।

অন্যদিকে অনুতপ্ত স্বামীরা আসেন জনসমক্ষে নাটক করতে। প্রায় বছর খানেক আগে জেনি জোন্‌স শো-তে এরকমই এক স্বামী খুব আবেগকম্পিত হৃদয়ে বসেছিলেন। চৌত্রিশ বছর বয়স। নাম ড্যান ওয়েলবি। মিসৌরির সেন্ট্ লুই শহরে থাকেন। ভদ্রলোক ঘন ঘন প্রেমে পড়েন। বউ বিরক্ত হয়ে ডিভোর্স-এর হুমকি দেওয়াতে ভয় পেয়ে সস্ত্রীক টক-শোতে এসেছিলেন। সে কী অনুতাপ! ছল ছল চোখে বলছেন—সাক্ষী রেখে ক্ষমা চাইতে এসেছি। বউকে বোঝাতে চাই, ন্যাশনাল টেলিভিশনের মধ্যে দিয়ে বলতে চাই—আমার ঘাট হয়েছে। আর ছল চাতুরি করব না। বউকে দুঃখ দিয়েছি। এবার স্বভাব শোধরাতেই হবে...। ড্যানের বউ ডরিস প্রথমে ভেবেছিলেন বরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কাজটি উপযুক্তই হবে। নিজে তো বলে বলে হয়রান হয়েছেন। প্রেম রোগ সারার লক্ষণ নেই। থেরাপিস্ট দেখিয়ে একটু একটু উপকার হচ্ছিল। কিন্তু একেবারে সোজা টেলিভিশনে ভিড়িয়ে দিলে, ফষ্টিনষ্টির কথা প্রচার করে দিলে, দর্শকদের সামনে ড্যান আরও চোর হয়ে যাবে। কিছু কিছু মহিলা দর্শক থাকবেই। ধিক্কার, হুংকারে আসর কাঁপিয়ে দেবে। ড্যানের মুখে চুন-কালি দিয়ে তবে তারা বাড়ি যাবে। তা সেই আশায় বড় উৎসাহী হয়ে ডরিস ড্যানের কনফেশনের দিন টক শো-তে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সবই হল। ড্যান—আমি আর করব না প্রেম করব না। দু বেলা শটকে শটকে পড়ব না...আ...আ... বলে বউয়ের কোমর জড়িয়ে বাড়ি গেলেন। কিন্তু ডরিসের মনে একটা খিঁচ ধরে গেল। অপরিচিত, অগণিত দর্শকের চোখে নিজে যেন করুণার পাত্রী হয়ে গেলেন। যা ছিল তাঁদের দাম্পত্য সমস্যা, তাই নিয়ে একদল বাইরের লোক আলোচনা করল। ড্যানকে উপহাস করল। প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত ড্যান যখন বার বার করে তাঁর জীবনে অন্য মহিলাদের আকর্ষণের কারণ বলছিলেন, স্বীকারোক্তির সুযোগ পেয়ে সব ঘটনা খুলে বলছিলেন, সে সময় কোনও কথাই ডরিসের শুনতে ইচ্ছে করছিল না। মাঝখান থেকে তাঁর সম্মান রক্ষা হল না। বরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে এত বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা, এত বিদ্রূপ আর আক্রমণের আসরে গিয়ে বসলেন যে, শেষপর্যন্ত দুর্বল চরিত্র, মিথ্যেবাদী এবং একাধিক নারীর প্রতি আসক্ত এক পুরুষের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হলেন। স্বামীর থেরাপি করাতে গিয়ে নিজের লজ্জা, অপমান, মনোকষ্ট আরও বেশি হল।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা বলেন—এ ধরনের প্রকাশ্য আলোচনার পরে দাম্পত্য সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। এমনও দেখা যায় যে, হয়তো নিজেদের অশান্তি নিজেরাই ধীরে ধীরে দূর করতে চেষ্টা করছিলেন। বাইরের সাহায্যের দরকার হচ্ছিল না। কিন্তু টক-শোতে এসে মনের গোপন ক্ষতস্থানকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরে যন্ত্রণা আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এক দম্পতির শিশু সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁরা একটি টক-শোতে

এসেছিলেন, যেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল—সন্তান শোকের পর মনকে কীভাবে শান্ত রাখা যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেল ক্রমাগত স্বামী, স্ত্রী পরস্পরকে যেন দোষারোপ করছেন। যেন শিশুটির মৃত্যুর কারণ বা পরিস্থিতি বিচার করতে গিয়ে একে অন্যকে খুব সূক্ষ্মভাবে দায়ী করছেন। দর্শকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে, টক-শো পরিচালকের নির্দেশে মনের কথা খুলতে বলতে গিয়ে, এমন সব অনুযোগ, প্রচ্ছন্ন অভিমান প্রকাশ করছেন, যা হয়তো তাঁদের অবচেতনে ছিল। কিন্তু আঘাত দেবেন না ভেবে এতদিন। বলেননি। কিংবা আগে হয়তো চিন্তাও করেননি। লোকজনের সামনে প্রশ্নে প্রশ্নে আক্রান্ত হয়ে অবান্তর কথা বলে ফেলছেন। অনেকে বলেন, বেশিদিন তৃতীয় ব্যক্তি বাড়িতে থাকলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব ঝগড়া হয়। যেসব তুচ্ছ কথা দু'জনে অন্য সময় গ্রাহ্য করতেন না, লোকের সামনে তাই নিয়েই তর্কাতর্কি বেধে যায়। আবার উলটোটাও হয়। নিজেরা হয়তো বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার পরে মিটিয়ে নিতেন। কিন্তু বাড়িতে অন্যান্য লোক আছেন বলে চাপা রাগে গজগজ করছেন। সিন ক্রিয়েট করতে পারছেন না। মোট কথা, অশান্তির ইন্ধন জোগাতে না চাইলেও বাইরের লোকের উপস্থিতি সমস্যাকে কখনও কখনও জটিল করে তুলতে পারে।

টিভি টক-শোর প্রযোজক, পরিচালকরা প্রথম দিকে খুব সংবেদনশীল হওয়ার চেষ্টা করেন। যাঁদের দুঃখের কাহিনী প্রচার করবেন, তাঁদের সঙ্গে আগে বেশ কয়েকবার কথাবার্তা হয়। শো-এর জন্যে লোক বেছে নেওয়ার সময় এমনই প্রতিশ্রুতি দেন যেন, টক-শো হয়ে গেলে তাঁদের মন খুব হালকা হয়ে যাবে। একজনের সমস্যা হাজার জনকে নাড়া দেবে। এতে সমাজের উপকার হবে। মেকআপ রুমে পাশে পাশে থাকেন। শো শুরু হলে যখন দুঃখিত লোকজন আরও দুঃখিত বোধ করেন, কনফেস করতে আসা মানুষ আরও লজ্জিত হয়ে পড়েন, রেপিস্ট দর্শকদের কাছে ধিক্কৃত হন, ভীষণ নোংরা আর গায়ে দুর্গন্ধওলা স্বামী সমবেত মহিলাদের উপহাসের পাত্র হন, তখন প্রযোজক, পরিচালক নিরপেক্ষভাব দেখালেও কর্মাশিয়াল ব্রেকে দুঃখীদের পাশে চলে যান। তাঁদের ভেঙে পড়তে দেন না। কারণ পালিয়ে গেলে মুশকিল হবে। শো মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বুঝিয়ে সুজিয়ে ধরে রাখেন। এঁরা কিন্তু খুব সহজেই বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করেন। প্রতিদিন টক্ শো-তে এঁদের দেখতে দেখতে দর্শকদের ভাল লেগে যায়। তাই যদি কখনও ডাক আসে, স্বাভাবিক আকর্ষণেই এঁরা স্টুডিওতে পৌঁছে যান। ভাবেন এতদিন ধরে টক শো পরিচালকরা কত মানুষের সুখ, দুঃখ, সমস্যার কথা তুলে ধরছেন, জনান্তিকে নিশ্চয়ই কত সাহায্য করছেন। তাহলে আমাদেরও সাহায্য করবেন। বুঝতে পারেন না যে, আগে পরে কোনও ব্যাপারই নেই, থাকবে না। সাময়িক শোটিকে জনপ্রিয় করার জন্যে এঁদের ধরে আনছেন। গম কে সওদাগর। বিক্রিবাটা হয়ে গেলেই সম্পর্ক শেষ।

ওই যে ড্যান আর ডোরিস জেনি জোনস শো-তে গিয়েছিলেন, যাঁরা ন্যাশনাল টেলিভিশনে ড্যানের ফষ্টিনষ্টির কথা সাতকাহন বলে ফেলেছিলেন, তাঁদের পরে কী মন খারাপ। যতক্ষণ ক্যামেরা চলছিল, পরিচালিকার কত সমবেদনা, উপদেশ! ড্যানকে নীতিশিক্ষা দিচ্ছেন, ডোরিসকে ধৈর্য ধরতে বলছেন। আর যেই চটাপট হাততালির শেষে ক্যামেরা অফ হল, তখন আর পাত্তা নেই। স্বীকারোক্তির ফলে লজ্জিত ড্যান, প্রবঞ্চনার পাবলিসিটির পরে অপমানিত ডোরিস ভেবেছিলেন পরিচালিকা তাঁদের আরও কিছুক্ষণ

স্টুডিওতে থাকতে দেবেন। খানিক ধাতস্থ হয়ে তারা বাড়ি যাবেন। কিন্তু তাঁদের একেবারে পত্রপাঠ বিদায় করা হল। স্টুডিওর লোক ট্যাক্সি ডেকে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিল।

জেনি জোনস, ফিল ডনাহু, স্যালি জেমি র‍্যাফায়েল্, জেরি স্প্রিংগার প্রমুখ যতই না কেন থেরাপিস্টের মতো হাবভাব করুন, আসলে এঁরা প্রত্যেকেই জনপ্রিয় টিভি টক শোর পরিচালক। কে কত বেশি দর্শক টানতে পারছেন, সেটিই প্রধান উদ্দেশ্য। সকলের যে সাইকোলজিতে ডিগ্রি আছে, তাও নয়। জেরি স্প্রিংগার সত্তর দশকের শেষাশেষি সিনসিনাটি শহরের মেয়র ছিলেন। রাজনীতি ভাল বোঝেন। কিন্তু জনগণমনও নাকি ওই সুবাদেই ভালমত বুঝতে পারেন। তাই টক-শো হোস্ট হয়েছেন এখন। জেমি জোনস ভাল গাইতে জানেন। কিন্তু থেরাপি সংক্রান্ত কোনও লাইসেন্স নেই। অপরাধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনও পড়াশোনা নেই। অথচ 'রেপিস্ট'দের ডেকে এনে মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। অবশ্য ডিক ক্যাভেট, মার্ভ নিভিনদের মতো টক-শো হোস্টদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। যাঁরা উপযুক্ত যোগ্যতা নিয়ে ভাল ভাল বিষয়ের ওপর শো করেছেন। হেরালডো রেভেরা, অপরা আপাতত ভীষণ দর্শক টানছেন। হেরালডোর শো-তে চোর, ডাকাত, খুনে, ধর্ষণকারী, কল্‌গার্ল, ঠক, জোচ্চারও যেমন মনের কথা বলতে আসে, তেমন শিক্ষিত ভদ্র সমাজের মানুষও নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে উপস্থিত হন। সবই কিন্তু ব্যক্তিগত সমস্যা।

এ কথা ঠিক যে দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে টক-শোগুলি তৈরি হয়। মানুষ কখন কী ভাবে পরিবারের মধ্যে, অথবা সমাজের হাতে নিগৃহীত হন, পরিস্থিতির শিকার হন, কীভাবে তার সমাধান করার সম্ভব—এইসব নিয়েই পরিচালকরা বিষয় নির্বাচন করেন। আবার উদ্ভট বিষয়ও থাকে। একটা মানুষ কেন আর একজনের নকল করে, বিখ্যাত লোকের মতো চুলের ছাঁট দিয়ে সাজপোশাক পরে হুবহু অনুকরণ করে, তা নিয়েও শো হয়ে গেল। লুক অ্যালাইক শো। আধ ডজন লোক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের চেহারার সঙ্গে নিজের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে, বাদবাকিটা নকল করে স্টুডিওতে এসে হাজির। বাকি আধ ডজন এলভিস প্রেসলি সেজে মাথায় ডবল ডেকার চুল নিয়ে, সলমা চুমকির কোট পরে বসেছে। তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কত বিশ্লেষণ।

সুখীরাম আর দুখীরামের মধ্যে কাকে আপনার পছন্দ? প্রতাপ সাহার মতো ঝকঝকে মলাটের মধ্যে থাকবেন, নাকি ওই টক শো-র মানুষগুলোর মতো লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলবেন? নাকি 'সামান্য লক্ষণ' যুক্ত অ্যাভারেজ মানুষই আপনার পছন্দ? তবে অনেক সমবেদনা সঞ্চয় করে রাখুন। অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর—এইসব লোকের সংখ্যা তো কম নয়. উদাসীনতার পরিবর্তে সান্ত্বনা প্রার্থনীয়।

৭ *জানুয়ারি* ১৯৯৫

অভিবাসী সমাজে বিয়ে

নতুন বছরের শুভারম্ভ হোক শুভবিবাহ সংবাদ দিয়ে। সংবাদ বলতে একেবারে পাত্র-পাত্রী চাই থেকে শুরু করি। পাত্রের বয়স চুয়াল্লিশ। বিপত্নীক। দুটি ছেলেমেয়েসহ মিডল্-ইস্টে থাকেন। অনেক রোজগার। বিয়ের জন্যে দারুন সুন্দরী পাত্রী খুঁজছেন। সে মেয়েটি বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না হলে আপত্তি নেই। কিন্তু নিঃসন্তান হতে হবে। যোগাযোগ করুন—কঙ্কন একশো ছেষট্টি অ্যাট হট মেইল্ ডট কম।

রূপসীরা আরবে সংসার পাতার জন্যে খোঁজ নিতে পারেন। কিন্তু নো ছানা পোনা।

"গড ফিয়ারিং" এর বাংলা কী হবে? ধর্মভীরু? তো, সেরকমই বউ খুঁজছে ব্যাঙ্গালোরের এক কেরল খ্রিস্টান ছেলে। আমেরিকায় চলে আসার সুযোগ চাই আর সেইসঙ্গে যে কোনও ধর্মের গড-ফিয়ারিং বউ! যোগাযোগের ঠিকানা—ড্যানিয়েল কেসি অ্যাট রেডিফমেল ডট কম।

এবার পাত্রীরা কী চাইছে দেখা যাক। ইংল্যান্ড থেকে পাঁচ ফুট লম্বা বেয়াল্লিশ বছরের এক ভারতীয় মহিলা নিজের রূপগুণের বর্ণনায় লিখেছেন—আকর্ষণীয়া, কালো চোখ, কালো চুল, "নন্-স্লিম্" (দোহারা?), স্মার্ট। বেড়াতে ভালবাসি। বাইরে খেতে পছন্দ করি। নাচ, গান, সাঁতার জানি। আমার পছন্দের পুরুষকে হতে হবে প্রেমিক আর যত্নবান। প্রফেশন্যাল কোয়ালিফিকেশন অবশ্যই থাকতে হবে। দাঁড়ি গোঁফ কামানো ঝকঝকে মুখ চাই। আমার মতো নানা 'হবি' থাকা দরকার। রোম্যান্টিক আর সৎ পুরুষটির বয়স ৪৫ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হলেই চলবে। তারপরেই লেখা আছে "নো টাইম-ওয়েস্টার্স্"। মানে, আলাপ করে ফালতু সময় নষ্ট করা চলবে না। ধানাই, পানাই নয়। এমন রাজযোটক মিল হলে আমাদের গোবিন্দ-বউদির ভাষায় "দ্যান্ অ্যান্ড দেয়ার" বিয়ে সেরে ফেলতে হবে। পাত্রী লিখছেন এমন পুরুষের সন্ধান পেলে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, ইস্ট আফ্রিকা যে কোনও দেশে ঘর বাঁধতে রাজি আছেন।

বিজ্ঞাপনের নমুনা আর বাড়াচ্ছি না। ইদানীং পাত্র-পাত্রী কলামের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। পাঁচ বছর আগেও এ অবস্থা ছিল না। আমেরিকায় প্রকাশিত নানা স্টেটের ভারতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি-দুটি পৃষ্ঠায় ওই কলম থাকত। এখন সেই সব কাগজেও যেমন পাত্র-পাত্রী কলাম বড় হয়ে গেছে, তার সঙ্গে ঘটকালি ব্যবসায় জমিয়ে বসেছে ভারত ম্যাট্রিমনি ডটকম, ইন্ডিয়ান ম্যাট্রিমনিয়্যালস্ ডটকম, ইন্ডিয়ান ডেটিং ডট কম ইত্যাদি প্রজাপতি কোম্পানি। উদ্দেশ্য একটাই—সারা পৃথিবীর ভারতীয় পাত্র পাত্রীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করে দেওয়া। এদের ওয়েবসাইটে, খবরের কাগজে শুধু বিয়ে ও আনুষঙ্গিক তথ্য পাওয়া যাবে। আনুষঙ্গিক তথ্য প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে দেখা যাক কিভাবে এসব দেখাশোনা হচ্ছে।

গত মাসে নিউ ইয়র্কে "প্যার কা নশা" নামে একটা পার্টি হল। "দিওয়ান" রেস্তোরাঁয় পাঁচ কোর্স্ এর ডিনার আর ডিস্কো নাচের ব্যবস্থা করে ওই প্রজাপতি কোম্পানিরা ভারতীয় যুবক যুবতীদের আলাপ করিয়ে দিল। সত্তর-পঁচাত্তর জন ছেলেমেয়ে গিয়েছিল। এত

তাড়াতাড়ি অবশ্য রেজাল্ট জানা যাচ্ছে না। তবে শেষপর্যন্ত যদি তিনটে বিয়েও লেগে যায় মন্দ কি? পঁচাত্তর জন একশো ডলার করে দক্ষিণা দিয়ে পার্টিতে ঢুকেছিল। রেস্তোরাঁকে দিয়ে থুয়েও প্রজাপতি অফিসরা লাভ রেখেছে। ওই ধরনের বন্দোবস্তের নাম দেওয়া হয়েছে স্পিড ডেটিং। চোখে না দেখে কম্পিউটারে খট খটাশ্ করে ই-মেলের আলাপ প্রলাপ নয়। এ হচ্ছে সরাসরি চক্ষু বর্ণের বিবাদ ভঞ্জন। মেলামেশার স্পিড্ চালু করে দেওয়া হল। তারপর কে হুমড়ি খেল, কে ভেসে গেল সে তাদের ব্যাপার।

শাদি ডটকম আর দেশি ম্যাচ এ ভাবেই পাত্রপাত্রী খুঁজে আনছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বায়নের যুগে জাত-পাত ধর্ম নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক বিবাহের ক্ষেত্রে ও বাধা বন্ধ কাটিয়ে ওঠার জন্যে "সেমিনার" ইত্যাদির আয়োজন করছে। ভারত ম্যাট্রিমনি ডট কম-এর পত্রিকা "দেশি ম্যাচ"-এর চিফ্ অপারেটিং অফিসার হচ্ছে আমাদের পরিচিত এক মহিলা—সীমা সিং জোকারকর। বাঙালির দুর্গাপুজো মণ্ডপ থেকে শুরু করে, অবাঙালিদের দিওয়ালি ফেস্টিভ্যাল, রাস গরবা, পাঞ্জাবিদের 'ব্যায়সাখী মেলা', সর্বত্র সীমা আর তার অফিসের মেয়েরা বুথ্ নিয়ে বসে। অ্যাটল্যান্টিক সিটি আর নিউ ইয়র্কের ন্যাসো কোলিসিয়মে সারা বছর যে সব "বলিউড ধামাকা" চলে, এরা তার কিছুটা অংশ স্পনসর করে। আর হাজার হাজার দর্শককে "দেশি ম্যাচ" কাগজ বিলি করে। ২৮ পাতার সেই কাগজে বিয়ে সংক্রান্ত সব খবর পাওয়া যাবে। মুরুগাভেল জান্কীরামান হচ্ছেন এর প্রকাশক। নিউ ইয়র্কে-এ প্রধান অফিস। ক্যালিফোর্নিয়া আর কানাডাতেও অফিস আছে। এছাড়া আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, কালিকট, চণ্ডিগড়, চেন্নাই, কোচিন, কোইম্বাটুর, দিল্লি, গুরুভায়ুর, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, কলকাতা, লখনউ, মাদুরাই, মাইসোর, মুম্বাই, পণ্ডিচেরি, পুনে, তিরুবনন্তাপুরম, থান্জাভুর, ত্রিচি, বিশাখাপট্নম আর দুবাইতে আছে শাখা অফিস। মাসে দুবার প্রকাশিত "দেশি ম্যাচের" বার্ষিক চাঁদা হচ্ছে ১৮ ডলার। দু সপ্তাহ অন্তর ঢালাও পাত্র-পাত্রীর হদিশ পেতে গেলে এরকম পত্রিকার চাহিদা বাড়বেই। মাঝে মাঝেই আবার ছবি টবি দিয়ে "সফল কাহিনী" ছাপা হয়। অন্ লাইনের আলাপ, ই-মেইল, সামনা সামনি দেখাশোনা তারপর ঘোড়ায় চড়ে পাগড়ি মাথায় দুল্হা আসছে জয়মালা হাতে দাঁড়ানো দুলহনের দিকে। ব্যস! নেট রেজাল্ট ছবিসহ দেখানো হয়ে গেল!

তাহলে কি আমেরিকার ভারতীয় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রেম ট্রেম হচ্ছে না? সম্বন্ধ করে বিয়ের দিকেই তারা ঝুঁকছে? পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এদের মধ্যে ভারতীয় অভিবাসী সমাজের দ্বিতীয় প্রজন্মের পাত্রপাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বাঙালিদের সংখ্যা তো হিসেবেই আসে না। তামিল, তেলুগু, গুজরাটি, পাঞ্জাবি পাত্র-পাত্রী সেক্শনে একেক জাতের যদি পঁচিশ-ত্রিশটা করে সম্বন্ধের খবর থাকে, তো বাঙালিদের থাকে তিন-চারটি সম্বন্ধ। মারাঠিদেরও তাই। এর একটি কারণ বাঙালি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আমেরিকান বিয়ে করার হার প্রথম থেকেই অনেক বেশি। বাড়িতে ধর্মের প্রভাব কম। রক্ষণশীলতা ও গুজরাতি আর দক্ষিণ ভারতীয় অভিবাসীদের মতো নয়। ফলে বিয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ওই বাধাগুলি প্রবল হয় না। সম্প্রতি যেটি বেশি ঘটছে, তা হল দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি আর অবাঙালিদের মধ্যে প্রচুর বিয়ে হচ্ছে। কলেজ ক্যাম্পাসের প্রেম, চাকরি সূত্রে পরিচয়, বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে চেনাশোনা, নানা ভাবেই এদের

যোগাযোগ ঘটছে। বছর কয়েক ধরে পড়াশোনা আর কেরিয়ার তৈরির পরে এরা বিয়ে করছে। ঘটক কোম্পানির ফর্দে এদের খবর থাকে না।

এই যে নিজেদের ধর্ম বা জাতির বাইরে বিয়ে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা কি পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না? এ বিষয়ে ইদানীং নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। গত বছর নিউ জার্সিতে "ইন্টার ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজি"তে এ রাজ্যের চার-পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক ভারতীয় (আমেরিকায় জন্মেছে এবং বড় হয়েছে যারা) ছাত্র ছাত্রীরা এরকম একটি সেমিনার ও ওয়র্কশপে যোগ দিয়েছিল। বিষয় ছিল—"ইন্টাররেশিয়্যাল ডেটিং অ্যান্ড ম্যারেজ উইদিন অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্য সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি"। অন্য জাতিধর্মে বিয়ে করেছে, এরকম বেশ কয়েকটি দম্পতি, সমাজ বিজ্ঞানী, বিবাহ বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। দম্পতিরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। ছাত্র ছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেছেন কিভাবে তাঁরা পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত এবং ভাষাগত বাধা অতিক্রম করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার জন্যে কী পরিমাণ মানসিক চাপ ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন।

এঁদের সকলের অভিজ্ঞতা অবশ্য সমান নয়। দম্পতিদের মধ্যে ছিলেন মাধুরী তিওয়ারি রড্রিগেজ আর তাঁর পর্টুরিক্যান খ্রিশ্চান স্বামী এলভিন রড্রিগেজ। রবিন প্যাটেল আর তাঁর আফ্রিকান আমেরিকান স্বামী ড্যান ম্যাকনিল। হিন্দু মেয়ে সীমা আর তার মুসলমান স্বামী পরভেজ খান। নিশা শা (গুজরাতি) আর তার রাজপুত স্বামী তুযার তানওয়ার। এছাড়া তিনজোড়া প্রেমিক প্রেমিকাও ওই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। অনীশ নামে একটি গুজরাতি ছেলে ও তার হাইস্কুলের সময়কার প্রেমিকা একজন পাকিস্তানি মেয়ে। প্রিয়া নায়ার ও তার নরউইজিয়ান ক্রিশ্চান প্রেমিক। এবং নীল মেহতা ও তার আমেরিকান ইহুদি প্রেমিকা লরা।

মাধুরী আর এলভিনের আলাপ হয়েছিল ফিলাডেলফিয়া রেডক্রসের অফিসে ভলান্টারি কাজ করতে গিয়ে। মাধুরীর বাবা এ বিয়েতে আপত্তি করেননি। অথচ নিশা আর তুষারকে কিন্তু বিয়ের আগে বেশ ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। দুজনেই ভারতীয় হলে কী হবে, জৈন আর রাজপুত নাকি পাল্‌টি ঘর নয়। ওদের বাবা-মাদের রাজি করাতে বেশ সময় লেগেছিল। রবিন প্যাটেলের কালো আমেরিকান বরের তো রীতিমতো অগ্নিপরীক্ষা গেছে। ন বছর ধরে প্রেম। কিন্তু রবিনের মা, বাবা কালো জামাই বরণ করতে রাজি নন। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে শেষপর্যন্ত বিয়ে হয়েছে। এখন তাঁরা জামাইকে বেশ পছন্দ করেন। অনিশ তার হাইস্কুলের পাকিস্তানি বান্ধবীকে এখনও বিয়ে করতে পারেনি। দু বাড়িতেই ভীষণ আপত্তি। প্রিয়া নায়ার সেদিক থেকে ভাল আছে। নরউইজিয়ান প্রেমিককে বাড়ির লোকজন মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। ওরা বিয়ের কথা ভাবছে। গুজরাতি নীল আর ইহুদি লরার আলাপ হয়েছিল স্থানীয় ফার্স্ট-এইড স্কোয়াডে ভলান্টরি কাজ করতে গিয়ে। ওরাও শিগগিরই বিয়ে করবে।

আমরা ভারতীয়দের সঙ্গে ইহুদিদের বিয়ে প্রায় প্রতিবছরই দেখছি। একই মণ্ডপে একবার হিন্দুমতে পুরোহিত বিয়ে দিলেন। তখন বর বউ ভারতীয় সাজপোশাক পরল।

হিন্দু বিয়ের শেষে ঘণ্টাখানেক বিরতি দিয়ে তারপর জিউইশ বিয়ে হল। ওই বিরতির সময় মণ্ডপে ইহুদিদের ধর্মীয় প্রতীক "মেনোরা," হিব্রুভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থ, রামশিঙ্গার মতো একটি হর্ন্ ইত্যাদি টেবিলে রাখা হল। ওদের পুরোহিত (র‍্যাবাই) এসে গোছগাছ করে নিলেন। এমনিতে ইহুদিদের বিয়েতে গিয়ে দেখেছি ওদের অনুষ্ঠান কিছু কম নয়। তবে মিশ্রবিয়ের একবেলার মধ্যে হিন্দু বিয়েতে যত সময় লাগে, ইহুদি বিয়েতে তত নয়। মাঝে ওই যে বিরতি দেওয়া হল, আমন্ত্রিতরা তখন কক্‌টেল লাউঞ্জে গিয়ে ড্রিংক্‌স্ আর নানারকম স্ন্যাক্‌স্ খেলেন। এদিকে কনেকে তখন সাজবদল করানো হচ্ছে। লাল বেনারসি আর রাজ্যের গয়না গাঁটি ছেড়ে সাদা লেস্ আর নেট্ এর ওয়েডিং গাউন, নেটের ওড়না দিয়ে আমেরিকান কনে সেজে সে মণ্ডপে আসবে। সাহেব বর শেরওয়ানি কুর্ত্তা, নয়তো ধুতি, পাঞ্জাবি আর টোপর খুলে রেখে "টাকসিডো" (বিয়ের স্যুট) পরে নিয়েছে। তারপর লোকেরাও জলখাবার খেয়ে মণ্ডপে ফিরে এলেন। তাঁদের টুপি পরিয়ে দিয়ে ইহুদি বিয়ে শুরু হল। হ্যাঁ, ইহুদি বিয়েতে ধর্ম নির্বিশেষে সব পুরুষ অতিথিরই মাথার পেছনদিকে সিলকের ছোট্ট গোল টুপি পরতে হয়।

যাই হোক, বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করব না। কথা হচ্ছিল, মিশ্র বিবাহ সম্পর্কে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের মনোভাব নিয়ে। বিয়ের পরে তারা কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে? কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অনুরোধে তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন আমার স্বামী ভবানী। যেমন সায়ন্তনী দাশগুপ্তর সঙ্গে বরিস মিউলারের, দেবলীনা ধবল দেবের সঙ্গে রবার্ট অ্যারোস্ এর, কেকা চক্রবর্তীর সঙ্গে জেরি ফিলিগোইজ্ আর পারমিতা হোড়ের সঙ্গে রবার্ট হ্যারিংটনের হিন্দুমতে বিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক পাত্র পাত্রীই বিয়ের আগে একদিন পুরোহিতের সঙ্গে বসে হিন্দু বিয়ের লৌকিক রীতি আর বৈদিক প্রথা সম্পর্কে "স্টেপ বাই স্টেপ" প্রশ্ন টশ্ন করে সারকথা বুঝতে চেয়েছে। তারপর খুব মন দিয়ে সংস্কৃত মন্ত্র তন্ত্র বলে যথা নিয়মে বিয়ে করেছে। এদের মধ্যে সায়ন্তনী আর বরিসের কোনও ক্রিশ্চান বিয়ে হয়নি। বরিসের জার্মান পরিবারের তাতে কোনও আপত্তি ছিল না। পারমিতা আর রবার্টও চার্চে যায়নি। একই মণ্ডপে ওদের হিন্দু বিয়ে শেষ হবার মুহূর্তে যজ্ঞের আগুন থেকে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মযাজক ওঁদের ধর্মমতে বিয়ে দিলেন। আংটি বদল হল। কেকা চক্রবর্তীর প্রথমে হিন্দু বিয়ে হল। তারপর বিরতি দিয়ে সাজ পোশাক বদল করে ওখানেই ক্রিশ্চান বিয়ে হল। দেবলীনা আর রবার্টের সকালে ক্যাথলিক চার্চে বিয়ে হবার পরে সন্ধেবেলা শেরাটন হোটেলে হিন্দু বিয়ে হল। এরা বিবাহিত হলেও ধর্মান্তরিত নয়। সায়ন্তনী, দেবলীনা, পারমিতার বর আমাদের দুর্গাপুজোয় তিনদিন ধরে আনন্দ করে যায়। দেবলীনার বর রবার্ট প্রতি রবিবার বিকেলে নিজেদের চার্চে ইভনিং ম্যাস্-এ প্রার্থনা করতে যায়। এভাবেই পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে। আমাদের বাঙালি মহলে মিশ্রবিবাহ ক্রমশই সংস্কৃতির মধ্যে মিলেমিশে যাচ্ছে। যারা বিয়ে করেছে তারা অনেকে বলে—আমরা কেউ কারুর ধর্ম গ্রহণ করিনি। দুজনে দুজনের ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। দুর্গাপুজো, ক্রিসমাস, হনিকা (ইহুদিদের ধর্মোৎসব), দিওয়ালি, ইস্টার, প্যাস্‌ওভারে দুজনেই পারিবারিক উৎসবে যাই। আমাদের ছেলেমেয়েরা এ সবের মধ্যে বড় হচ্ছে। দুই সংস্কৃতির প্রভাব সমানভাবে বজায় রাখতে চেষ্টা করছি। আমরা নিজেরাও তো ইন্ডিয়ান-আমেরিকান।

লেখা শেষ করার আগে ঘটক কোম্পানির কথায় ফিরে আসি। তাদের বিজ্ঞাপনে একটি বিষয় লক্ষ্য করছি যে, ভারতীয় অভিবাসী সমাজ বিয়ের ক্ষেত্রে জাত, ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছে। শুধু ছেলেমেয়েরা নিজেরা যখন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, তখন বয়স, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি আর পারিবারিক পরিচয়ের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। চাহিদার ক্ষেত্রে আপস করা হচ্ছে ছেলে বা মেয়ে যদি বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। তারা আর জাত, ধর্ম নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী বিদেশে থাকে। নয়তো অস্থায়ীভাবে আমেরিকায় রয়েছে। আমেরিকায় পড়তে আসা কিংবা অস্থায়ী চাকরি নিয়ে "এইচ ওয়ান বি" ভিসায় থাকা ছেলেমেয়েরা অনেকেই পাকাপাকিভাবে এদেশে থেকে যেতে ইচ্ছুক। ছ বছরের ওয়ার্কিং ভিসার মেয়াদ ফুরোলে পাততাড়ি গুটোতে হবে। তাই সময় থাকতে যদি গ্রিনকার্ড হোল্ডার কিংবা আমেরিকান সিটিজেনকে বিয়ে করা যায়, তবে সহজে ইমিগ্রেশন পাওয়া যাবে। ইনফর্মেশন সিস্টেম সংক্রান্ত অস্থায়ী চাকুরেরা, উচ্চশিক্ষার শেষ পর্যায়ে আসা ছাত্রছাত্রীরা ঘটক কোম্পানির মারফৎ বিয়ের চেষ্টা করছেন। এছাড়া দেশে থাকা আত্মীয় স্বজনের জন্যেও এখানকার পাত্র-পাত্রীর খোঁজ চলছে। ইওরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা থেকে বিজ্ঞাপন আসছে।

তবে বিজ্ঞাপনের পাতা যে ক্রমশ বড় হচ্ছে, তার আরও একটি কারণ, অভিবাসী সমাজের দ্বিতীয় প্রজন্ম আমেরিকায় ছড়িয়ে থাকা বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে জীবনসঙ্গী খুঁজছে। এরকমভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কের বাঙালি মেয়ের সঙ্গে শিকাগোর মারাঠি ছেলের পরিচয় থেকে পরিণয় হয়েছে। বাঙালিদের মধ্যেও বিয়ে হচ্ছে। ই-মেল্ এখন মেলবন্ধনের মূলসূত্র। তারপরে গ্রন্থি বন্ধন।

হ্যাঁ, পাত্রের গুণাবলীর মধ্যে "ধূমপান করি না" কথাটা বারবার দেখছি। একটি বিজ্ঞাপনে ভাব আর ভাষার এমন বাহার যে অনুবাদ করে পাঠালে কোনও পাত্রী হয়তো অনুপ্রাণিত হবেন—"আমি মার্কিন নাগরিক। বয়স চুয়ান্নর একটু বেশি। দিনে দিনে যুবক হচ্ছি। উচ্চতা ১৫৫ সেন্টিমিটার। ওজন ১৫১ পাউন্ড। শাকাহারী। ধূমপান করিনা। মদ খাই না। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র। বাড়ির মালিক। আর্থিক সাচ্ছল্য আছে। আমার প্রিয় বউকে দুরারোগ্য অসুখে হারিয়েছি। আমি অ্যালফা-নিউমেরোলজিস্ট, ভাষাবিদ, প্রকৃতিবাদী এবং শব্দ বিজ্ঞানী। যে কোনও শব্দকে যে কোনও ভাষায় প্রতিধ্বনিত করতে পারি। তখন অতিসচেতন স্তরে পৌঁছে মহাবিশ্বের স্পন্দন অনুভব করি। এ হচ্ছে বিশ্বজনীনতা বোধ থেকে পাওয়া শিক্ষা। "ইউনিভার্শনের" সঙ্গে বাস করার অর্থ সৃষ্টি বা স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত হওয়া। এ হচ্ছে সব বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান এবং সব শিল্পের সেরা শিল্পকর্ম। চূড়ান্ত জ্ঞান, ভালবাসা আর আনন্দকে পাওয়া। পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান এর মধ্যেই নিহিত আছে। আমি এই পরম আশীর্বাদকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। যার বহুমুখী প্রতিভা আর সরল সৌন্দর্য আছে। সে হবে প্রাণিত করার মতো বিদগ্ধ, গভীর চিন্তাশীল এবং মনযোগী শ্রোতা। তার স্বাধীনচিত্ত, মুক্তমন কেবলই নতুন জ্ঞান আর উদ্‌ভাবনে আনন্দ পাবে। সে হবে অনন্যা। শুধু আমারই মনের মতো। সাহস আর অদম্য প্রাণশক্তি থাকবে। ঝম্‌ঝম বৃষ্টিতে, প্রবল তুষারপাতে, কুয়াশাঘেরা সন্ধ্যায়, বিবর্ণ চাঁদের আলোয় সে আমার সঙ্গে নাচবে, গাইবে। জাত, বর্ণের কোনও বাধা আমি মানি না..."

এই "সখার" হাত ধরে কেউ চলতে চান? তাহলে নাম ঠিকানা দিচ্ছি। ফোন-ফ্যাক্স্ 001-908-754-7559 সখার নাম হচ্ছে Vishwan, 4 Cola Surdo Court. Edison. New Jersey 08820. U. S. A. "দেশি ম্যাচ" পত্রিকার পাত্র-পাত্রী কলামে এই ব্রহ্মজ্ঞানীর খোঁজ পেলাম। শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা আর শুভ সংবাদসহ প্রজাপতি সংবাদ শেষ।

২০০৫

গ্রন্থিহীন বন্ধন

পারিবারিক ও সামাজিক প্রথামুক্ত জীবন যাপনে যে দেশের মানুষ ক্রমশই অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে, সে দেশ হল স্ক্যান্ডিনেভিয়া। বিশেষ করে আইনসম্মত অথবা আনুষ্ঠানিক বিয়ে, কোনওটিই তারা কর্তব্য বলে মনে করছে না। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, যেখানেই যাওয়া যাক, হিসেব নিলে দেখা যাবে বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ শিশু সন্তানদের নিয়ে একসঙ্গে আছেন। কিন্তু বিয়ে করেননি। নরওয়েতে এখন বছরে যত শিশু জন্মায়, তাদের ৫০ শতাংশই অবিবাহিতা মায়ের সন্তান। সুইডেন আর ডেনমার্কেও তাই। তবে অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, একটি-দুটি সন্তানের জন্মের পরে তাদের বাবা, মায়েরা কাগজে কলমে বিয়ে সেরে নিচ্ছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে।

আমেরিকায় গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে কুমারী মায়ের সংখ্যা আগের তুলনায় তিন-গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু এখনও এর কোনও সামাজিক সমর্থন নেই। "আন-ওয়েড মাদার" শব্দটির সঙ্গে লজ্জা ও করুণার দৃষ্টিভঙ্গি জড়িয়ে থাকে। গরিব ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যেই কুমারী মাতৃত্বের ঘটনা বেশি শোনা যায়। এছাড়া হলিউড আর ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল মহলে "লিভ-টুগেদারের" মতো অবৈধ সন্তানদেরও মোটামুটি স্বীকৃতি আছে। তবে অধিকাংশ সময়ে দেখা যায়, তাদের বাবা, মায়েরা পরে চার্চে গিয়ে বিয়ে সেরে নিচ্ছে। আর বাকি যে বৃহত্তর সমাজ, সেখানে এ ধরনের সম্ভাবনার শেষ কথা—হয় বিয়ে করে নেওয়া, নয়তো গর্ভপাত। অথবা পারিবারিক লজ্জা ঢাকতে গিয়ে সদ্যোজাত শিশুকে "অ্যাডপশন এজেন্সি"তে দিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ, বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের স্বীকৃতি দেওয়ার মতো মানসিকতা মূল সমাজে এখনও গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় ছবিটি অন্যরকম। নরওয়ের একটি মেয়ে মেরি অ্যান ক্রিস্টেনসেন্-এর কথাই ধরা যাক। তার পুরুষ বন্ধু টমি স্পিটারসেনের সঙ্গে কয়েক মাস মেলামেশার পর সে গর্ভবতী হল। এবার এক বাড়িতে থাকা দরকার ভেবে তারা একটি বাড়ি কিনল। আগামী মে মাসে মেরি অ্যানের বাচ্চা হবে। অভিভাবক হতে এদের আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয়। টমি নরওয়ের এয়ারফোর্সে চাকরি করে। মেরি অ্যান ফার্মাসিস্ট্। দুজনেরই ভাল রোজগার। বিয়ের সিদ্ধান্ত না নেওয়ার প্রধান কারণ—কয়েক মাসের আলাপে কেউ কাউকে ভালভাবে চেনার সুযোগ পায়নি।

এবার একসঙ্গে থেকে দেখবে যে মনের মিল হয় কিনা। হলে ভাল। না হলে সম্পর্ক থাকবে না। এই সাতাশ-আটাশ বছর বয়সে তারা কোনও আইনি বন্ধনে বাঁধা পড়তে রাজি নয়। সন্তান প্রতিপালনের জন্যেও এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা থাকা উচিৎ নয় বলেই তারা মনে করে। এদিকে অনাগত শিশুটির জন্যে "বেবি রুম" সাজিয়ে ফেলছে। নরওয়ের একটি অঞ্চলে বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে ৮২% এর প্রথম সন্তানটি জন্মেছিল তাদের বিয়ের আগে।

আটলান্টিকের এপারেই হোক, কি ওপারেই হোক, কুমারী মাতৃত্বের হার যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তার কারণগুলি মোটামুটি এক। জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি আবিষ্কার, (নিরাপত্তার আশ্বাসে মেয়েরা যৌন স্বাধীনতার সুযোগ নিয়েছে এবং কখনও দুর্ঘটনাবশত গর্ভবতী হচ্ছে), নারীবাদের প্রভাব, রুজি রোজগারের প্রয়োজনে বাইরের জগতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগবৃদ্ধি এবং ধর্মভয় বা ধর্মের ভূমিকার ক্রম অবলুপ্তি।

গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে পরিবারে ও সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা অনেকখানি বদলে গেছে। একসময় ছিল পুরুষই শুধু উপার্জন করতেন। এবং পরিবারে তাঁর ব্যাপক দায়দায়িত্বের সঙ্গে প্রাধান্যও ছিল। ক্রমশ মেয়েরাও সেই ভূমিকা অর্জন করেছেন। প্রয়োজনে একাই সন্তান প্রতিপালন করছেন। শুধু বিবাহ বিচ্ছিন্না মেয়েরা নন, পুরুষরাও একার সংসারে ছেলেমেয়ে মানুষ করছেন। আবার এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে স্বামী, স্ত্রীর আগের পক্ষের সন্তানদের সঙ্গে এ পক্ষের ছেলেমেয়েরা একই বাড়িতে বড় হচ্ছে। প্রথাগত কাঠামো বদল করে নিজেদের সুখ সুবিধে মতো সংসারের পুনর্গঠন হচ্ছে। এভাবে অবিবাহিত জীবনের সন্তানও স্বীকৃতি পাচ্ছে। যা ছিল কলংকের কথা, সেই কুমারী মাতৃত্বও আর্থ-সামাজিক স্তর অনুযায়ী নারীবাদের মুক্তচিন্তায় মেয়েদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফল বলে বিবেচিত হচ্ছে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোকেদের কাছে বিয়ের তাৎপর্য বা গুরুত্ব যে ক্রমশ কমে আসছে, তার প্রধান কারণ নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যাপক সরকারি উদ্যোগ। এছাড়া গির্জা আর রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নীতির সুস্পষ্ট বিভাজনের ফলে সমাজে ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বলে কিছু নেই। সমাজের রক্তচক্ষু না থাকলে, স্বাধিকার অর্জনে বাধা আসে না। নারী-পুরুষের স্বেচ্ছাচার নিন্দনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ফলে তারা কোনও সামাজিক বা পারিবারিক চাপের সম্মুখীন হয় না। সন্তান আসছে বলে অথবা সে জন্মে গেছে বলেই তার জন্মদাতা এবং দাত্রীকে বিয়ে করতে হবে—এমন কোনও দায়বদ্ধতা তারা অনুভব করে না। সুসম্পর্ক বজায় রেখে একসঙ্গে থাকাটাই বড় কথা বলে তারা মনে করে।

সুইডেনের পুরোহিতও আর বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সেখানকার লুথেরান স্টেট চার্চের এক ধর্মযাজক তার বান্ধবীর সঙ্গে দু বছর লিভ-টুগেদার করে এবার আনুষ্ঠানিক বিয়ের কথা ভাবছে। বান্ধবী নিজেও একটি সুইডিজ গির্জার ধর্মযাজক। কিন্তু চারমাস হল গর্ভবতী হওয়ায় কদিন আগে তারা কাগজে কলমে বিয়ে সেরে নিয়েছে। সামনের গ্রীষ্মকালে গির্জায় অনুষ্ঠান করে বিয়ে হবে। বাচ্চাটি জন্মানোর পরে বাবার পদবি নেবে, না মায়ের পদবি থাকবে, সে নিয়ে যাজক সহবাসীরা এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার এই নতুন সমাজধারা কি সমর্থনযোগ্য? বিবাহ বন্ধন

না থাকলে সংসারের ভিত কি সুদৃঢ় হয়? দেখা যাচ্ছে, সেই অর্থে ওই দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার গুণগতমান খুবই উঁচুতে। রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষা অনুযায়ী "কোয়ালিটি অফ্ লাইফ" এ প্রথম স্থান অধিকার করেছে নরওয়ে। দ্বিতীয় হচ্ছে সুইডেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে এদের জীবনযাত্রার মান সব থেকে ভাল। কিভাবে তা বিচার করা হয়? এক্ষেত্রে চারটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাথাপিছু উপার্জনের হার, শিক্ষা ব্যবস্থার মান ও গণশিক্ষার হার, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত এবং নাগরিকদের গড় আয়ু। জীবনযাত্রার গুণগতমান হিসেবে এগুলি নিরীক্ষণ করে রাষ্ট্রসংঘ একেকটি দেশকে নম্বর দেয়। আমেরিকার স্থান হচ্ছে অষ্টম।

স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে মেয়েদের একটিই সমস্যা। তারা প্রাইভেট কোম্পানিতে সহজে চাকরি পায় না। চাকরি যদি বা পায়, খুব কম সংখ্যক মেয়েই ম্যানেজমেন্ট পদে উঠতে পারে। এর কারণ—বিয়ের সিদ্ধান্ত নিক বা না নিক, মেয়েরা সন্তানের জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে চায় না। কর্মজীবনের প্রথমদিকে, তিরিশ বছরের মধ্যে মা হতে চায়। সন্তান হওয়ার পর দীর্ঘ ছুটি নেয়। সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। দু-তিন বছর পর্যন্ত চাকরিতে ফেরার চেষ্টা করে না। এই সব কারণে বেসরকারি কোম্পানিগুলিতে মেয়েদের চাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিয়ের প্রশ্নে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ব্যাপারটি ওদেশের বয়স্ক মানুষরা কিভাবে দেখছেন? ষাটের দশকে, এমনকি সত্তর দশক পর্যন্তও কিন্তু আবহাওয়া এরকম ছিল না। ওই যুগে মারগারেট নামে একটি মেয়ে আঠারো বছর বয়সে গর্ভবতী হওয়াতে বাবা, মায়ের চাপে পড়ে তার উনিশ বছরের পুরুষ বন্ধুকে বিয়ে করেছিল। তখন ওই বয়সে তার পড়াশোনাও বেশিদূর এগোয়নি। যাই হোক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে করেছিল। দুটি বাচ্চা হবার পর চার বছরের মাথায় বিয়ে ভেঙে গেল। পরে মেয়েটি নার্সিং পাশ করল। দ্বিতীয়বার বিয়ে করল। আবার বাচ্চা হল। তবে সে বিয়ে টিকল মোট ষোলো বছর। আপাতত ৫৭ বছরের এই মহিলা তাঁর তিন নম্বর প্রেমিকের সঙ্গে সাত বছর হল একসঙ্গে আছেন।

মার্গারেটের ছেলেমেয়েরা এ যুগের হাওয়ায় বিশ্বাসী। তাঁর পঁচিশ বছরের মেয়ে অ্যান-ম্যারেনের বক্তব্য—কোনও পুরুষ হয়তো বাবা হিসেবে চমৎকার, কিন্তু স্বামী হিসেবে তেমন নয়। এই কারণেই, ঘটনাচক্রে কেউ আমার সন্তানের বাবা হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে আমি যে তার সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে পারব, এমন কোনও দায়বদ্ধতা নেই। থাকা উচিৎ নয়। আমার কয়েকজন বান্ধবীর সন্তান আছে। তারা মনে করে সন্তান, তার নিজের। কিন্তু এজন্যে তার বাবাকেই জীবনসঙ্গী করতে হবে বলে মনে করে না।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় অনেক ছেলে মেয়েই মনে করে পুরনোদিনের মতো পারিবারিক ধাঁচ আর বজায় রাখা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে এক দলের ধারণা বিয়ের প্রথা বা ইনস্টিটিউশন ব্যাপারটিই অর্থহীন। অন্য দল ভাবে বিয়ে এক মহাদায়িত্বের বোঝা। এত রকম প্রতিশ্রুতি আর দায়বদ্ধতার মধ্যে যাবে কেন মানুষ? মোটকথা, দু দলেরই মনোভাব হচ্ছে—পরিবর্তনশীল সময়ে কোনও সম্পর্ককেই স্থায়ী বন্ধন বলে ভেবে নেওয়া ভুল।

সুইডেনের ধর্মযাজকরা প্রতিবছর অনেক শিশুকে ব্যাপ্টাইজ্ করেন যারা কুমারী মায়ের সন্তান। সেই সময় চার্চে শিশুটির মা, বাবাকে তাঁরা প্রশ্ন করেন, কেন তারা বিয়ে করছে না। উত্তরে শোনেন—বিয়ে হচ্ছে জীবনের এক মহাপদক্ষেপ। একেবারে নিশ্চিত

না হয়ে, সে পথে পা বাড়ানো যায় না। পুরোহিত তর্ক তোলেন—আর, এই যে ছেলেমেয়ে মানুষ করা? তাদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করা? এ ও জীবনের মহাপদক্ষেপ নয়?

না, জাবালির মা, বাবারা নাকি তা মনে করে না। কারণ, বাৎসল্য আর প্রতিপালন অনেক সহজ সরল কাজ। কিন্তু দাম্পত্য জীবন মানে জটিলতার পাকে পাকে জড়িয়ে যাওয়া। তাই সুখে থাকতে ভূতের খপ্পরে পড়তে চায় না। তাদের ধারণা আমেরিকান সমাজে সন্তানের আইনসঙ্গত পরিচয় নিয়ে বড় বেশি রক্ষণশীলতা বজায় রাখা হচ্ছে। সন্তান সম্ভাবনা হলেই বিয়ে করা উচিৎ, সন্তানদের ভাল পরিবেশে বড় করার জন্যে দাম্পত্য সম্পর্ক জোড়াতালি দিয়েও টিকিয়ে রাখা উচিৎ—এ সব নীতি উপদেশের ফল কিছু ভাল? তাহলে আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদের হার এত বেশি কেন? তার চেয়ে লিভ-টুগেদারই ভাল।

স্ক্যান্ডিনেভিয়া সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের নিয়মনীতিগুলো বিবাহিত-অবিবাহিত সব অভিভাবকের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। সুইডেনের "ডিভিশন অফ্ চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স" এর মুখপাত্র জানিয়েছেন—সরকার মনে করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় তার কোনও উপদেষ্টার ভূমিকা নেই। যেহেতু বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ও সহবাসের কারণে বহু অবিবাহিত পরিবারে শিশুর জন্ম হচ্ছে, তাই তাদের কথা ভেবে সরকার থেকে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। ফলে সকলেই সরকার থেকে সমান সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। প্রধান উদ্দেশ্য—ভেঙে যাওয়া পরিবার এবং একক দায়িত্বে সন্তান প্রতিপালনকারী মায়েদের অর্থ সাহায্য করা। পুরুষসঙ্গী বা স্বামী যদি খোরপোশ না দেয়, তখন সন্তান প্রতিপালনের জন্যে সরকারি সাহায্য বা মেইন্‌টেনেন্স্ অ্যালাওয়েন্স্ পাওয়া যাবে। বাড়ি ভাড়ার খরচ ও সরকার দেবে। সুইডেনে একক সংসার চালান যে সব মহিলারা, তাঁদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ওই হাউসিং অ্যালাওয়েন্স্ পান। সরকারের বক্তব্য হচ্ছে—কুমারী মাতৃত্ব, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ফলে অবৈধ সন্তানের জন্ম, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান হার, কোনও কিছুই আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু একার সংসারে সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে মা, বাবাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সরকার সেই ভার লাঘবের চেষ্টা করে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সরকারের এই উদারনীতি অবশ্যই সে দেশের ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে সন্তুষ্ট করছে না। বিবাহিত দম্পতির সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে দেখে খ্রিস্টান সংগঠনগুলি রীতিমতো উদ্বিগ্ন। তাঁরা বলছেন—যেখানে পারিবারিক বন্ধন নেই, কয়েক বছর অন্তর অন্তর লোকে ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে সঙ্গী বদল করছে, সেখানে সংসারের আদর্শ, মূল্যবোধ বলেও কি কিছু গড়ে উঠতে পারে? ছোটদের ওপর এর কী প্রতিক্রিয়া হবে? এ তো এক ছন্নছাড়া জীবনযাপন শেখানো হচ্ছে! নরওয়ের "ডিপার্টমেন্ট ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স" এর সঙ্গে যুক্ত ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক সদস্যের বক্তব্য—বিয়ের নামে লোকেদের এমন অনীহার কারণটাই আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের সমাজে প্রথাগত বিয়ের ব্যাপারটাই অচল হয়ে যাচ্ছে। লোকে শুধু লিভ-টুগেদার করছে। খুবই চিন্তার কথা।

হ্যাঁ, বিয়ের তাগিদ তাদের মধ্যেই আসছে, যারা বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কথা

চিন্তা করছে। ঠিক উত্তরাধিকার নয়, অংশীদার হওয়ার অধিকার চাইছে। ওদেশের আইন অনুযায়ী—বিবাহিত হলে স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর একজন অন্যজনের সম্পত্তির অধিকার পাবে। কিন্তু লিভ-টুগেদার করার সময় একজন মারা গেলে, সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকার পাবে তার সন্তানরা।

তো, এসব দেখেশুনে চার বছর আগে এস্‌পেন আর ট্রাইন্‌ নামে দুই সহবাসী বিয়ে সেরে ফেলেছে। তার আগে দশ বছর লিভ-টুগেদার করেছে। দুটি ছেলে মেয়েও হয়েছে। এরা একবার ভেবেছিল বিয়ে না করে, "পার্টনারশিপ কন্ট্র্যাক্ট" করবে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় অনেকেই যৌথ জীবনে এরকম কন্ট্র্যাক্ট করে। যদি সম্পর্ক ভেঙে যায়, তাহলে তাদের নিজের নিজের বিষয় বা অ্যাসেট্‌ আলাদা করে নেয়। তবে এখানে আইনের নানা প্যাঁচ আছে। দুজনের সম্পত্তির চুলচেরা হিসেব রাখতে হবে। এস্‌পেন আর ট্রাইন একটা মোটা বই কিনে ওই সব আইন, কানুন পড়তে গিয়েছিল। অধৈর্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তার চেয়ে বিয়েটাই বরং সোজা কাজ বুঝে রেজিস্ট্রারের অফিসে সই মেরে এসেছে। এস্‌পেন তার বউকে আংটি টাংটি দেয়নি। বউও দেয়নি। বর হচ্ছে নরওয়ে সরকারের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল। খুব হিসেবি মনে হয়। বউ স্কুলের দিদিমণি। বিয়ের পরে তাদের কোনও ভাবান্তর হয়নি। "ইনহেরিটেন্স ল্‌" এর কথা ভেবেই সম্পর্কে গিঁট দিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, বিয়ের পবিত্র বন্ধন টন্ধন নিয়ে এরা কোনও উচ্ছ্বাসবোধ করে না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় বিবাহবিচ্ছেদের হার এদের মনে বিয়ে সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি করেছে।

ওদেশে ধর্মের ভূমিকাও ক্রমশ গৌণ হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে, অবৈধ সন্তান বা অবৈধ সম্পর্ক বলে নিন্দনীয় শিশুটির মা আর বাবা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। দুজনের একই সুযোগ সুবিধে থাকবে। কিন্তু সাধারণত যা হয়, বাবা তার ভাগের ছুটিটা মাকে দিয়ে কদিন পরেই অফিসে রওনা দেয়। মা তারপর একটানা দু বছর ধরে বাচ্ছা মানুষ করে। যখন আবার কাজে ফিরে যায়, তেমন উন্নতি টুন্নতি হয় না। তার চেয়ে বড় সমস্যা হল স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বেসরকারি প্রতিষ্ঠাগুলো প্রথম থেকেই মেয়েদের চাকরি দিতে চায় না। কারণ, ধরেই নেয় যে ওই "ফ্যামিলি লিভের" নামে মেয়েরা এক একটি বাচ্চা হলে দু বছরের জন্যে বাড়িতে বসে থাকবে। অথচ ৮০% মাইনে দিতে হবে।

ফলে এখন দেখা যাচ্ছে ওদেশের মেয়েদের পেশাগত সাফল্য খুবই কম। স্কুলে পড়ানো, হাসপাতালের চাকরি আর নানা সরকারি দপ্তরে যুক্ত থাকা, এই হচ্ছে মেয়েদের চাকরির জগৎ। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বৈষম্য আছে।

তাহলে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মেয়েদের "কোয়ালিটি অফ্‌ লাইফ্‌" কী দাড়াল? কুমারী মাতৃত্ব, অস্থায়ী সংসার, পারিবারিক বন্ধনহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যত আর চাকরিক্ষেত্রে বৈষম্যের জন্যে অসফল কর্মজীবন।

২০০৫

গ্রহণের আগে সহন

আগে সন্ধি, পরে বিচ্ছেদ—জীবনে এমন নির্বন্ধ এড়ানোর চেষ্টায় আপনি সময় থাকতে নির্দোষ এক অভিসন্ধি করতে পারেন। বিয়ের আগে পরস্পরের অন্ধি; সন্ধি জেনে নেওয়া আর কী! ভাবছেন, তবে আর রহস্য, রোমাঞ্চের বাকি রইল কী?

কিন্তু দাম্পত্য জীবন কি গোয়েন্দা কাহিনী? এমনিতেই ঢের সাসপেন্স আছে। পরে দেখবেন। এখন যা বলছিলাম—যাঁর সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চলেছেন, তিনি দীর্ঘকাল আপনার সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পারবেন কিনা জানেন? দশশালা পরিকল্পনা চালু করার আগে একটু ভেবে দেখুন। শালা হয়তো জীবনে একাধিক পাবেন। দশের কম হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কণ্ঠমালা হতে বকুল যদি যায় গো ঝরে...তবে সে বড় দুঃখের গল্প হয়ে যায়। এ জীবনে কম তো দেখলাম'না!

দিনকাল বড় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। টলারেন্সের লেভেল প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। "যে সয়, সে রয়", "সহ্যই মেয়েদের প্রধান গুণ"—এইসব শুকনো কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না। উপদেশ যে দেয়, সে নিজেই বিশ্বাস করে কিনা সন্দেহ! কণ্বমুনির আশ্রমের লেকচার নয়, রবীন্দ্রনাথের স্ক্রিপচার থেকেই মেয়েদের নির্বাচিত কলাম—অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে...।

তবে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা মাত্রই সহন এবং দহন—এমন নিশ্চয়ই নয়। তবু, বিশেষ রূপে বহনের আগে দু পক্ষই অনুধাবন করে দেখুন—সঙ্গী নির্বাচনের জন্যে মানসিকতার আপাত মিলনই যথেষ্ট কি না। পরিবার, পরিবেশ, সংস্কার, শিক্ষা নিয়ে সম্পূর্ণ একজন মানুষ। জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিষয়গুলির সমান গুরুত্ব আছে। যেহেতু ওই উপাদানগুলিই তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করেছে।

যৌথ জীবন যাপনের সময় স্বভাবের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলি স্পষ্ট হতে থাকে। বৈসাদৃশ্যের সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক এবং সে ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের কারণেই বৈচিত্র্য, আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্ম নিতে পারে। এ সত্ত্বেও দুজনের মানসিক গঠনে কোথাও এক গভীর মিল থাকার কথা। নয়তো বোঝাপড়া গড়ে ওঠে না। দেখা যায়, স্বতন্ত্র চিন্তাধারাকে ছাপিয়ে গেছে দুজনের জীবনের মূল্যবোধের চেতনা। সেখানে তাঁরা অনুরূপ ভাবনার শরিক।

কিন্তু দুজন ভিন্ন রুচির মানুষের মধ্যে মানসিকতার পার্থক্য যদি থাকে লক্ষ যোজন, তবে সে দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছাকাছি পৌঁছনো সহজ নয়। হয়তো চেষ্টা চলে। তবু কমপ্রোমাইজ হয় না, অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না। কিছু সম্পর্ক জোড়াতালি দিয়ে টিকে থাকে। অধিকাংশই ভেঙে যায়। এ যুগে আর বহু আরম্ভে লঘু ক্রিয়া নয়, গৃহযুদ্ধের জের কোর্ট ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। আইন, আদালত, মিউচ্যুয়াল, অ্যালিমনি, এবং শিশুদের নিয়ে টানাটানি—যন্ত্রণার শেষ কোথায়? দহন আর কাকে বলে?

গ্রহণের আগে সহনের পরীক্ষা নিরীক্ষা কিছু কি তবে সেরে নেওয়া যায়? বসবাস ছাড়া কীভাবেই বা তা সম্ভব? আমেরিকায় এখন বিবাহ বিচ্ছেদের হার যে ভাবে বেড়ে চলেছে,

অভিজ্ঞ জনেরা উপদেশ দিচ্ছেন বিয়ের আগেই কবুল করে নাও—কী তুমি সহ্য করবে, আর কী কী করবে না। নিজের সদগুণ, বদগুণ সব মিলিয়ে ঝেড়ে কাশো। হোলি ম্যারেজের আগেই ভাল-মন্দ মিলায়ে সকলে এক কোপে 'বলি' হয়ে যাক। অন্তত গলদগুলো জানা যাক। তারপর অসীম ক্ষমার প্রশ্ন। সমঝোতা ইত্যাদি ইত্যাদি...।

বিয়ের আগে ম্যারেজ কাউন্সেলিং যে কতখানি জরুরি সে নিয়ে মাইকেল ডাগলাস নামে এক এমার্জেন্সি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ শুনুন। না, ইনি অভিনেতা মাইকেল ডাগলাস নন, যদিও ক্যালিফোর্নিয়ারই বাসিন্দা। ইনি ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া এমার্জেন্সি সার্ভিসেস-এর ডেপুটি চিফ। বহু অঘটন সামাল দিয়েছেন। লস এঞ্জেলেসের ভূমিকম্প থেকে ওকলাহোমার বিস্ফোরণ পর্যন্ত যেখানেই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে, মাইকেল ডাগলাস পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। আতঙ্কগ্রস্ত, শোকগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করেছেন।

কিন্তু আর নয়। '৯৬ সাল থেকে মাইকেল অন্য কাজ শুরু করেছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে এমার্জেন্সি সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে প্রি-ম্যারেজ কাউন্সেলিং-এর কাজ করছেন। উদ্দেশ্য—বিবাহ বিচ্ছেদ রোধ করা। ক্যালিফোর্নিয়াই তাঁর মূল কেন্দ্র। মোট পঁচাত্তরটি চার্চের গ্রুপ নিয়ে বিভিন্ন শহরে কাউন্সেলিং-এর শাখা খোলা হচ্ছে। ওই রাজ্যের মডেসটো শহরে দশ বছর আগেই "কমিউনিটি ম্যারেজ পলিসি" নামে এরকমই একটি নীতি নির্ধারক কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। বিভিন্ন চার্চের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ওই কেন্দ্রের নীতি হচ্ছে—যখনই কোনও এনগেজড ছেলে মেয়ে, বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্যে চার্চের কাছে আসবে, তখন তাদের কয়েকটি শর্ত দেওয়া হবে। যেমন—আরও চার মাস অপেক্ষা করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বভাব, আচরণ, বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে জানাতে হবে (মনোবিজ্ঞানীর কাছে পরীক্ষা করিয়ে), কয়েকবার দুজনকে কাউনসেলিং অর্থাৎ খোলাখুলি আলোচনায় বসতে হবে এবং বিবাহ পরবর্তী জীবনের সম্ভাব্য সমস্যা, সংঘাত নিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। চার্চ থেকে ওই নির্দেশগুলি জেনে নিয়ে তবেই ছেলে মেয়েরা বিয়ের জন্যে চার্চের সাহায্য পাবে!

মাইকেল ডাগলাস ওই প্রোগ্রামকেই ব্যাপকভাবে চালু করতে চাইছেন। কাউন্সেলর অর্থাৎ উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর মতে মনোবিজ্ঞানীদের মতোই অভিজ্ঞ হতে পারেন দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছেন—এমন বিবাহিত দম্পতি। তাঁদের সাহায্য পেলে কম বয়সী এনগেজড ছেলে মেয়েরা অনেক সমস্যারই সমাধান খুঁজে নিতে চেষ্টা করবে।

মডেসটো শহরে গত দশ বছরে বিবাহ বিচ্ছেদের হার শতকরা সাত ভাগ কমে গেছে। অবশ্য ঠিক শহর নয়, ক্যালিফোর্নিয়ার ওই স্ট্যানিস্লস কাউন্টিতেই এই হার লক্ষ করা হয়েছে।' ৮৫ সাল থেকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা চল্লিশ ভাগ (৪২০,০০০ জন)। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের হার ১,৭৩২ থেকে ১,৬০৬-এ নেমে এসেছে।

গ্রেটার মডেস্টো মিনিস্টেরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপাত্র জানিয়েছেন—এ অঞ্চলে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা তুলনামূলকভাবে কমই ঘটছে। অবশ্য এর জন্যে যে শুধু চার্চের কমিউনিটি ম্যারেজ পলিসি-ই কাজ করছে, তাও নয়। অন্যান্য কারণ হচ্ছে—এখানে বেশ কিছু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিবাসী পরিবার এবং ল্যাটিন আমেরিকান পরিবার

আছেন, যাঁদের পারিবারিক জীবনের বন্ধন অনেক দৃঢ়। তাছাড়া রক্ষণশীল খ্রিস্টান চার্চের প্রভাব তো আছেই।

শুধু প্রথম বারের বিয়ে নয়, কারও কারও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়েও কাউন্সেলিং-এর মাহাত্ম্যে হয় কেঁচে যাচ্ছে, নয় বেঁচে যাচ্ছে। ল্যারি নামে একজন বিয়ে পাগলা লোক যখন তিন নম্বর বিয়ে করতে যাচ্ছে, চার্চের প্যাসটর তাকে থামিয়েছেন। কাউন্সেলিং করতে পাঠিয়েছেন। চার মাস বাদে ল্যারি বুঝেছে—ঝোঁকের মাথায় আবার বেলতলায় যাচ্ছিল। বিয়ের জন্যে মনে মনে যত রকম আবেগের খেলা চলে, সে সব তার কিছুই হচ্ছিল না। তবু বিয়ে বিয়ে করে নেচেছিল। যাই হোক, প্যাসটরের সাহায্যে নিবৃত্তি ঘটিয়ে ল্যারি এখন ভাবছে আদৌ তার ম্যারি করা দরকার কি না?

গত বছর রেচেল আর ম্যাটের বিয়ে হয়েছে। রেচেলের বয়স তখন মাত্র একুশ। বিয়ের আগেই দুজনের ঝগড়া লেগেছিল। প্রমাদ গুণে তারা সময় থাকতে কাউন্সেলিং করতে গেল। দুজনেরই পার্সোনালিটি টেস্ট হল। রেচেল তো ডাহা ফেল। কারণ তার অসম্ভব রাগ, উত্তেজনা, এবং ধৈর্যের নিতান্ত অভাব! ওদিকে প্রেমিক ম্যাট হচ্ছে নির্বিকার, উদাসীন টাইপের লোক। কাউন্সেলর বললেন—দুজনকেই স্বভাব শোধরাতে হবে। নয়তো বিয়ে করলে অশান্তি লেগে থাকবে। রেচেলও তা বুঝেছিল। প্রেম পর্বেই কত ধুন্ধুমার হয়েছে! একবার রেচেলের মেজাজকে আমল না দিয়ে ম্যাট বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বসেছিল। রেচেল তখন রেগেমেগে দেওয়ালে স্প্যাগেটি সসের বয়াম আছড়ে ভেঙেছিল। দেওয়ালে রক্তের লিখন! তারপর পরিষ্কার করতে প্রাণ গেছে। বিয়ের পরে ক্রমাগত খণ্ড প্রলয় হোক—ওরা কেউই চায়নি। তাই সময় থাকতে স্বভাব পরীক্ষা করাতে গিয়েছিল।

বিয়ের এক বছর হয়েছে। রেচেল কিছু আছড়ে ভাঙেনি। চণ্ডাল রাগ বর্জন করে শিখেছে কী ভাবে বিনা তর্জন, গর্জনেও ম্যাটকে নাড়া দেওয়া যায়। দরকার মতো 'সাইজ' করা যায়। কাউন্সেলিং হচ্ছে পরস্পরকে একটুখানি সাইজ করার একসারসাইজ।

যদিও আমেরিকার শতকরা ৭৫ ভাগ বিয়েই হয় কোনও না কোনও ধর্মমত অনুসারে এবং তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রাক-বিবাহ উপদেশাবলী গোছের একটি অধ্যায় থাকে, কিন্তু সেই অর্থে কাউন্সেলিং বলে কিছু হয় না। কারণ, যখনই বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আসে, আমেরিকার অধিকাংশ চার্চ কেবল শুভকর্মটি সমাধা করে দেয়। অনুষ্ঠান আর আশীর্বচন—এর বেশি মাথা ঘামায় না।

মাইকেল ম্যাকম্যানাস নামে এক বিবাহ বিশেষজ্ঞ ম্যারেজ সেভার্স নামে বই লিখেছেন। তিনি বলছেন—বিয়ের আগে কাউন্সেলিংকে আইনবদ্ধ করে দেওয়া উচিত। গাড়ি চালানোর জন্যে যেমন লাইসেন্স পরীক্ষায় পাস করতে হয়, সেরকম বিয়ে করার আগেও কাউন্সেলিং কোর্স নিয়ে পরীক্ষায় পাস করতে হবে। গাড়ি চালানো যত সহজ, নর নারীকে চালানো মোটেই তত সহজ নয়। সুতরাং পরীক্ষা বেশ কঠিন হওয়া দরকার। মেরিল্যান্ড আর কলোরাডো রাজ্য তো রীতিমতো বিবেচনা করছে যে ওই আইন জারি করবে কি না। মিশিগানেও জোর তর্কাতর্কি চলছে। সারা আমেরিকায় আপাতত প্রায় চল্লিশটি শহরে স্থানীয়ভাবে এ ধরনের কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিচ্ছেদের খরচ কিছু কম?

ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ম্যারিট্যাল অ্যান্ট ফ্যামিলি স্টাডিজ বিভাগের হিসেব অনুযায়ী—যদি একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকাকে সমঝোতার কোর্স শেখাতে এক ডলার ও খরচ হয়, তবে পরবর্তী জীবনে হয়তো তাদের হাজার হাজার ডলার বেঁচে যেতে পারে। কনফ্লিক্ট রেসলিউশন স্কিলস শেখাতে যত খরচই হোক, সে তো ডিভোর্সের গুণাগারের তুলনায় যৎসামান্য। একটি ডিভোর্স মানে ধনক্ষয়, মানক্ষয়, মনোকষ্ট, কাজকর্মের ক্ষতি—জীবনের অন্তত সিকিভাগ অপচয়। সুতরাং "প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর" মনে করলে বিয়ের আগে কাউন্সেলিং-এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

কোনও কোনও চার্চ আবার বেশি কড়াকড়ি শুরু করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার "অরেঞ্জবার্গ ব্যাপটিস্ট চার্চ" নিয়ম করে দিয়েছে—এনগেজড হবার পরে মোট দশ দিন দু ঘণ্টা করে সমঝোতার ক্লাস করতে হবে। অন্তত ছ মাস অপেক্ষার পরে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলে, তবেই ওই চার্চ বিয়ের ব্যবস্থা করবে। ব্যাপটিস্ট চার্চের প্যাসটর চান, প্রেমিক প্রেমিকারা অবশ্যই "টেমপারামেন্ট অ্যানালিসিস" করাবে। ওই বিশ্লেষণে ধরা পড়বে তাদের দুজনের ব্যক্তিত্ব কেমন, মেজাজ কেমন, প্রচণ্ড রাগ আছে কি না, আদ্যন্ত নার্ভাস কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই অ্যানালিসিসের জন্যে ব্যাপটিস্ট চার্চ চল্লিশ ডলার করে খরচ নিচ্ছে। কিন্তু ফলাফল জানার পরে নিখরচায় কাউন্সেলিং করাচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অর্ধেকেরও কম দল ওই "কমিউনিটি ম্যারেজ পলিসি"র সমর্থনে সই দিয়েছে। কারণ, তাদের নিজেদেরও কিছু কর্মসূচী আছে। "কংগ্রেজেশন বেথ শলোম" নামে রক্ষণশীল ইহুদি উপাসনালয় মনে করে খ্রিস্টানরা বড় বাড়াবাড়ি করছে। ইহুদিদের নিজেদের কাউন্সেলিং সেন্টার আছে। সেখানে এত কড়াকড়ি নেই। বোঝাপড়ার কোর্সের বোঝা বেশ হালকা ধরনের। বোধহয় ওই "অঙ্গার শত ধৌতেন..." বিশ্বাস করে। স্বভাব শোধরানোর আশা বিশেষ রাখে না। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চগুলিও ওই পলিসিতে নাম লেখায়নি। তবে তাদের নিজস্ব কাউন্সেলিং সেশন আছে। সেখানে প্রাক-বিবাহ উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি দেওয়া হয়।

কিন্তু যারা ওই মাইকেল ডাগলাসের দলে যোগ দিয়েছে তারা একবাক্যে সমর্থন করছে—কাউন্সেলিং করা খুবই দরকার। এখানে কোনও পুঁথিগত উপদেশ দেওয়া হয় না, ব্যবহারিক জীবনের বোধ ও অনুভূতি থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিবাহিত লোকেদের অভিজ্ঞতাও খুব মূল্যবান। গ্রেস লুথেরান চার্চের রেভারেন্ড জন ব্রুগার কাউন্সেলিং করে সম্ভাব্য বিয়েগুলির মধ্যে ১৫% ভাঙিয়ে দিয়েছেন। মানে, তাঁর কথা শুনে কিছু নেড়া বেলতলায় যেতে ভরসা পায়নি। রেভারেন্ড সন্তুষ্ট। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ওই ১৫% বিয়ে ধোপে টিকবে না। তাই সময় থাকতে ঠেকিয়ে দিয়েছেন।

ডিক নেলসন নামে একজন স্বীকারও করেছে—কাউন্সেলিং তাঁর জীবনে কত উপকার করেছে। কিন্তু তার প্রথম বিয়ের সময় এমন সাহায্য পায়নি। এপিসকোপাল চার্চে এক পাদরি দশ মিনিটে বিয়ে সেরে দিয়েছিলেন। তারপর ফুড়ুৎ করে হানিমুন। শেষে লাগাতার হানাহানি। সমস্যা ছিল "মানি প্রবলেম"। বউ-এর "বাজে খরচ" নিয়ে ঝগড়া লাগত। বউ একদিকে ঝগড়া করত, কান্নাকাটি করত। আর ডিক ক্রমাগত তার সঙ্গে ঠাণ্ডা ব্যবহার চালিয়ে যেত। অপেক্ষা আর উপেক্ষার সমান সমান লড়াই চলেছিল সতেরো বছর। শেষে

ডিভোর্স হয়ে গেল। ডিকের ধারণা, সে সময় কেউ তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কমিউনিকেশনের কথা বোঝাতে পারেনি।

কিন্তু দ্বিতীয়বার ডিক নেলসন চল্লিশ ঘণ্টার প্রাক-বিবাহ কাউন্সেলিং করে তবে বিয়ে করেছে। রীতিমত হোম ওয়ার্ক করে আনতে হত। সে এবং তার দ্বিতীয় বউ দুজনকেই চার্চের প্যাস্টরের কাছে কনফ্লিক্ট রেসলিউশন স্কিলগুলি শিখতে হয়েছে। তিনি জোর করে ডিককে দিয়ে "সাংসারিক ও বাইরের খরচ" সম্পর্কে হিসেব নিকেশ করিয়েছেন। বাজেট নিয়ে যাতে আবার ঝগড়া না লাগে, তাই এই কোর্স দেওয়া হল। নেলসন দ্বিতীয় বিয়ের পরে বুঝেছে ওই খরচ নিয়েই সে আগের বউকে কী অপমান করে গেছে। সব টাকা পয়সা নিজের দখলে রেখে কীভাবে বউকে দাবিয়ে রেখেছিল, এখন বুঝতে পারছে। কারণ এ বউ সে বউ নয়। এখন দুজনে মিলে বাজেট করে। দুজনে মিলে খরচ করে। দুজনে মিলে হিসেব রাখে। যে যার নিজের দায়িত্বে বাড়তি খরচ করে। মোট কথা ডিক নেলসনের এ বিয়ের হিসেব মিলেছে।

সংসারে টাকা পয়সার ভূমিকা মোটেই গৌণ নয়। কীভাবে তা খরচ করা হবে, সে নিয়ে মতান্তর হতেই পারে। এক ফুলের দোকানের মালিকের নাম অ্যালিসন। ফুলের মতোই সুন্দরী এবং সুবাসী ওই মহিলা কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারে মোটেই উদাসী নন। তাঁর যে প্রেমিক, বেজায় রসিক। ঠাট্টা করে বলেছিল—"বিয়ের পরে তোমার অ্যাকাউন্টগুলো আমার নামে করে দেবে তো?" শুনে তো মহিলা তখন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেলেন। লোকটা বলে কী? আমার "ফুলের অ্যাকাউন্ট" ছিঁড়ে নিতে চাইছে? ব্যস! এনগেজমেন্ট ভেঙে যায় আর কী? রসিক প্রেমিক অসময়ের রসিকতার ফল টের পেয়েছে। শেষে সেই কাউন্সেলিং। ফুলওয়ালি বলেন "বিয়ের পরে আমি জয়েন্ট অ্যাকাউন্টও করব না।" তখন কাউন্সেলার বোঝালেন—প্রেমিকের মশকরার উত্তরে এমন অবিশ্বাস শোভা পায় না। জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকলে জয়েন্ট সংসার করারও দরকার নেই। প্রেমিকও অভিমান করে বলছে—"তোমার ফুল, ফল, কিচ্ছু চাই না ব্যস! আংটিও ফেরত চাই না...।"

তখন গোলাপ সুন্দরী নরম হলেন। বিয়ে হল। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টও হল। কাউন্সেলিং থেকেই ওই ফয়সলা।

বিয়েতে বাগড়া দেওয়ার কাজেও "কাউন্সেলিং পলিসি" যে সমান পারদর্শী, সে তো আগেই বলেছি। এক দমকল কর্মীরই কত আক্কেল হল! সে খুব প্রেম করেছিল। বিয়ের অগ্নিপরীক্ষায় ঝাঁপ দেবার আগে কী মনে করে কাউন্সেলিং-এ ভর্তি হল। কিন্তু দশ খানা সেশন শেষ হল না। সাতের মাথাতেই সপ্তপদীর প্ল্যান গুবলেট। কারণ হোম ওয়ার্কে সে সমানে ফেল মারছে। একটা রচনা লিখতে দিয়েছে, যার বিষয় হচ্ছে—বিবাহের উপকারিতা সম্পর্কে যাহা জানো লিখ। (অন্তত দশটি পয়েন্ট লিখ)।

ওই রচনাই শোচনীয় হল। বিয়ের উপকারিতার কথা ভাবতে ভাবতে দমকলের দম বেরিয়ে গেল। কোনও লাগসই পয়েন্টই খুঁজে পেল না। উলটে বিবাহের অপকারিতার পয়েন্ট মনে আসছে! সে বোধহয় বুঝে ফেলেছিল প্রেম যদি নাটক হয়, বিয়ে তবে ফাটক। আটক থেকে সেলাম ঠোকা অসম্ভব যার আগুনে ঝাঁপানো স্বভাব, তাকে বন্দী করিবে কোন

দোষে?

দমকল বিয়ে করবে না জেনে তার প্রেমিকা প্রথমটায় ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। এনগেজমেন্ট কেঁচে গেলে দুঃখ হবেই। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী দমকল তাকে বুঝিয়েছিল—"ভাঙা বিয়ের চেয়ে ভাঙা এনগেজমেন্ট অনেক ভাল। সময় থাকতে রামধাক্কা সামলে দিলাম।"

আমাদের শহরে হিরের দোকানে ঝলমলে আলোর নীচে এনগেজমেন্ট রিং সাজিয়ে রাখে। সে সব আংটির কী বাহার! সেই পনেরো শতক থেকে হিরের আংটি পরিয়ে বাগদানের প্রচলন হয়েছিল। আজও সেই ধারা বজায় আছে। গোলাকার আংটির তাৎপর্য হল—ভালবাসার সতত এবং চিরন্তন অবস্থান। হিরের অর্থ বিজয় এবং চিরন্তন প্রেম। গ্রিক শব্দ অ্যাডামাস থেকে ডায়মন্ড। অ্যাডামাসের অর্থ "অজেয়"। হিরে এমনি এক রত্ন যা পুরুষের ভালবাসা, বিশ্বাস, বিবাহিত জীবনে সম অনুরাগ ও অপরিবর্তিত রূপকে প্রতিভাত করে। অতীতে বাগদানের সময় পুরুষ একটি খোলা তলোয়ারের ওপর হিরের আংটি রেখে বিবাহের প্রস্তাব দিত। ভালবাসার পাত্রীর জন্যে সে জীবন দিতেও প্রস্তুত।

এ যুগে সে প্রথা নেই। কোষ বিমুক্ত কৃপাণের ওপরে নয়, প্রেমিকার বাঁ হাতের অনামিকায় সযত্নে হিরের আংটি স্থান পায়। কেন জানেন? বাঁ হাতের অনামিকার একটি ধমনী কোন পথে যেন হৃদয়ের কাছে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু এত যে আড়ম্বর, তবু মানুষ হিরে ফেলে শূন্য আঁচলে গিঁট বাঁধে। শুধু আংটি কেন সার হবে? হিরের ক্ল্যারিটি, মহার্ঘ আবেদন, সারা জীবনের গ্যারান্টির কাগজ, সে তো থাকবেই। বস্তু অপরিবর্তিত থাকে।

সুতরাং হিরের আংটি নয়, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে সেই জীবনের কথা ভাবুন, যেখানে গ্রহণ, বহন, সহন, দহন—ভালবাসার দায় অনেক। না হয় নিভৃতে রচনা লিখুন—বিবাহের উপকারিতা কী কী? যদি পাঁচটা পয়েন্টও হৃদয় দিয়ে লিখতে পারেন, সাহস করে আংটি পরিয়ে দেন। বাকি পয়েন্ট ক্রমশ ক্রমশ বিয়ের পরে আবিষ্কার করবেন। বিয়ে আসলে গোয়েন্দা কাহিনীই। "স্বপন কুমার" সিরিজ। স্বপ্ন দিয়ে শুরু তো? তারপরেও বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস!

৬ এপ্রিল ১৯৯৬

পুরুষ-পীড়ন

রাজশেখর বসুকে আজ আমেরিকায় পাওয়া গেলে এদেশের নিগৃহীত মানব সমাজ নির্ঘাৎ তাঁকে মানব সমিতির সভাপতি করে ছাড়ত। আহা! কী সব মর্মস্পর্শী লাইন! মানব সমিতির বার্ষিক সমাবেশে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার জন্যেই যেন লেখা—

"ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে
গিন্নী ঘা দেন কর্তাকে
ধরে তাড়া করে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্ তা গিননী করতা গাধারে
ঘাড়ে ধরে ঘন ঘন ঘা কত ধুম ধুম দিতে থাকে
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্টে পাল্টে ফেলে...
... ...
ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা..."

"ভৃশণ্ডীর মাঠ"-এর নাদু মল্লিকের মতো শত শত নদের চাঁদ মল্লিক ইদানীং বউ-এর হাতের চড় চাপড় খেয়ে খেয়ে দরদী 'ভ্রাতৃ সংঘ' খুলে বসেছেন। চড়, কিল, লাথি ছাড়াও হঠাৎ হঠাৎ মাথার পেছনে ঠকাস করে সসপ্যানের বাড়ি তো বাঁধা। আচমকা টেলিফোন রিসিভারের গোঁত্তাও নাকি মারাত্মক! এরপর মসীধারা থেকে অসিধারা। কলমের নিব ফোটানো থেকে রান্নাঘরের ছুরি খোঁচা—কোনও কিছুর খামতি নেই।

গত দশ বারো বছরের মধ্যে পুরুষের হাতে নারীর নির্যাতন নিয়ে লিখেছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু নারীর হাতে পুরুষের পীড়ন নিয়ে মাত্র একবার লিখেই স্বজাতিচ্যুত হতে বসেছিলাম। ঠিক ঠাক চাঁদা দেওয়া সত্ত্বেও "ভগিনী সংঘের" সদস্যপদ থেকে আমার নামের পাশে ট্যাঁড়া পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। তখন লেখাটাকে 'রম্য রচনা' বলে চালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে উলটো বিপত্তি। ডঃ যাদুগোপাল প্রকাশ্যে র্ভৎসনা করে বলেছিলেন—"আমাগো ট্রেজিডি লইয়া মশকরা করা খুবই অমানবিক হইসে।" এবার তাই আট ঘাট বেঁধে নেমেছি। শ্যাম কূল দুই রেখে লিখব।

পুরুষের হাতে নারীর দৈহিক নির্যাতনের প্রতিবাদে আমেরিকায় গত পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন সংস্থা খুবই সোচ্চার হয়েছে। নারী মুক্তি আন্দোলনের পুরোধাদের উদ্যোগ বাদ দিয়েও বলা যায়—এই ভয়ঙ্কর পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় সরকারি মহল এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান একত্রে কাজ করে চলেছে। কিন্তু এখন পুরুষ সমাজেও এমন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যে তাঁরা দাবি করছেন, তাঁদের নিগ্রহের বিরুদ্ধেও একইভাবে প্রতিক্রিয়া হোক। পারিবারিক বিরোধে পরাজিত এই সব আহত স্বামীদের বক্তব্য—গৃহ বিবাদ মানেই স্ত্রীদের ওপর হাতের সুখ করা নয়। বরং স্বামীরাই স্ত্রীর কাছে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ভোগ করছেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মেয়েরা যে দুর্বল এবং তাদের পক্ষে স্বামীকে ধরাশায়ী করা সহজ নয়—এসব নাকি সবৈব মিথ্যা প্রচার। প্রহৃত স্বামীদের জন্যেও সরকারি আশ্রয় বা শেলটারের ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ

প্রোটেকশন দিতে হবে, স্ত্রীকে মানসিক চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ও থেরাপিস্টের কাছে পাঠাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা।

এ বছরের শেষাশেষি "ডোমেস্টিক রাইটস কোয়ালিশন" নামে মানব সমিতি আহত স্বামীদের জন্যে শেলটার তৈরির কাজকর্ম শুরু করবেন। কারণ এই দল বিশ্বাস করেন—হে পুরুষ, তুমি যদি ক্রমাগত থাপ্পড় খেতে থাকো, লাগাতার ঘুসি খেয়ে খেয়ে তোমার মুখে কালশিটে পড়ে যায়, উঠতে বসতে বউয়ের লাথি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়, তবে জেনো তোমার সঙ্গে ঘোরতর বেআইনি ব্যবহার করা হচ্ছে। সহ্য করার কোনও দরকার নেই। নারী পুরুষের সমান অধিকার চাই। তোমাদের 'মারকুট্টে' বলে অকারণ বদনাম বহুকাল হয়েছে। তোমরা বউ ঠেঙিয়ে জেল খাটতে গেছ। আর নয়। এবার বউদের জেলে পাঠাতে হবে। মানে মারদাঙ্গাপ্রিয় বউদের জন্যেই লৌহকপাট।

বিভিন্ন "পুরুষ সমিতি"র খাতাপত্র থেকে জানা গেছে—মার খাওয়া স্বামী বা প্রেমিকের সংখ্যা নেহাত অল্প নয়। অত্যাচারিতা স্ত্রীর মতো গলাধাক্কা খাওয়া স্বামীরও অনেক করুণ ইতিহাস ওইসব খাতাপত্রে রেকর্ড করা আছে।

কিন্তু এঁদের এককথায় আহত বা প্রহৃত বলা যাবে কি? একজন মেয়ের তুলনায় তার স্বামীর দৈহিক শক্তি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। সুতরাং একেবারে সমান ভাবে নির্যাতিত হওয়া সম্ভব কিনা, প্রশ্ন সেইখানেই। ছোরা, ছুরি বা রিভলভারের কথা বাদ দিলে, শুধু হাতাহাতি কিংবা কোস্তাকুস্তি চালিয়ে মেয়েরা কতক্ষণ জিততে পারে? একজন নিষ্ঠুর স্বামী অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্ত্রীকে যেরকম বীভৎসভাবে মারতে পারেন, কোনও সবলা স্ত্রীর পক্ষেও ঠিক সেই অনুপাতে স্বামীকে উরুভঙ্গ অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো কি সহজ কথা? তবে স্বামী অধিক শোকে পাথর হলে অবশ্য সেটা সম্ভব হতে পারে। এবং তাই ঘটে। কোনও কোনও স্বামী বলেছেন—তাঁদের স্ত্রী সময় সময় এমন উন্মাদের মতো হিংস্র হয়ে ওঠেন যে পশুদের যেমন খুরে আঁচড়, কামড় দেওয়ার প্রবৃত্তি হয় না, এঁরাও স্ত্রীকে ওইভাবে পালটা আক্রমণ করতে পারেন না। ফলে তাৎক্ষণিক উন্মত্ততার শিকার হতে বাধ্য হন। তারপর আদালতের শরণ নিয়ে বিদায় করে দেন।

অত্যাচারিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে বলে নারী নির্যাতনের ইস্যুর অনেক বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কারণ নির্যাতন থেকে হত্যার ঘটনাও ঘটে। কিন্তু আক্রমণ ব্যাপারটিই ভীতিপ্রদ। সে নারীর ক্ষেত্রেই হোক, কি পুরুষের ক্ষেত্রেই হোক। পুরুষের বিরুদ্ধে অত্যাচার করলেও তাকে আইনের চোখে অপরাধী বলে গণ্য করা উচিত। কে মার খাচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। কেউ কারও ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, সে দেহেরই হোক, কি মনেরই হোক—তার জন্যে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা দরকার। পুরুষ সমাজের এরকম দাবি নিয়ে নারী মুক্তিকামী দলের বিশেষ আপত্তি দেখা দিয়েছে। তাঁদের উদ্বেগের কারণ হল—সম অধিকারের যুক্তি দেখিয়ে কিছু নারী বিদ্বেষী দল এভাবে বিরুদ্ধ প্রচারে নেমেছেন। অসহায় মেয়েদের একটি মানবিক সমস্যাকে নিয়ে এই মানব দল রেষারেষি লাগিয়েছেন। ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকার মধ্য পশ্চিম অংশের "ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ ইন্টারভেনশন প্রজেক্ট" থেকে প্রতিবাদিনীরা জানিয়েছেন—সাম্প্রতিক ধুয়ো উঠেছে পুরুষও নাকি প্রহারে জর্জরিত

হচ্ছেন! এর ফলে একটি স্বীকৃত সত্যকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। মেয়েরা যে পুরুষের সঙ্গে কত ভয়ে ভয়ে বাস করে আর পুরুষদের যে মেয়েদের সম্পর্কে আতঙ্কিত হবার কোনও ব্যাপারই নেই—এই সত্যকে গোপন করা হচ্ছে। দাম্পত্য অশান্তি থাকতে পারে। তাই বলে পুরুষ নির্যাতনকে মোটেই সামাজিক সমস্যা বলা উচিত না।

আহত পুরুষরা এর ফলে আরও দুঃখ পাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য—যে পুরুষ বউ-এর হাতে মার খায়, তার যন্ত্রণার সঙ্গে লজ্জাও কিছু কম নাকি? আইন তাঁদের দিকে নয়। ফলে বউ আঁচড়ে কামড়ে দিলে বা ছুরি হাতে তেড়ে এলে যখন তাঁরা আত্মরক্ষার জন্যে বাধা দেন বা তাকেও কষে দু'ঘা লাগিয়ে দেন, তখনই তিনি মস্ত অপরাধী হয়ে যান। বউ পেটানোর অভিযোগে জড়িয়ে পড়েন। আইন করে স্বামী পেটানো বন্ধ করা উচিত নয়? মেয়েরা সহানুভূতি পেয়ে পেয়ে উগ্রচণ্ডী হয়ে উঠছে। অথচ তাদের শাস্তি দেবার বদলে স্বামীকে বলা হচ্ছে আসামী। কখনও কখনও সমাজের চোখে হাসির পাত্র। কারণ বউকে শায়েস্তা করতে পারেনি। আর শায়েস্তা করতে গেলেই হাতে দড়ি! কী বিচিত্র এই দেশ!

স্বামী স্ত্রীর মারামারির ওপরে সমীক্ষা নিয়ে জানা গেছে—পুরুষদের অভিমান, অনুযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। মোট ৬০০০ নারী পুরুষকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—একসঙ্গে থাকার সময় ঝগড়াঝাঁটি হলে, কে কী ভাবে সমঝোতা করেছেন। অহিংস না সহিংস, কোন্ পথে মীমাংসা করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই অবশ্য বিবাহিত স্বামী স্ত্রী নন। তবে অধিকাংশ বিবাহিত। বাকিরা হলেন 'লিভ টুগেদার'-এ বিশ্বাসী।

সমীক্ষার ফলাফল হল—মেয়েরা পুরুষের তুলনায় মার খেয়েছেন বেশি। চড়, চাপড়, লাথি, কামড়, ঘুসি, কোনও কিছুর দ্বারা আঘাত পাওয়া এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বামীরা ছুরি বা রিভলভার দেখিয়ে জোর হুমকি দেওয়াতে আতঙ্কিত হয়েছেন এঁরা। কিন্তু পুরুষরাও সে তুলনায় কম বার আক্রান্ত হননি। ওই একই পন্থায় তাঁদেরও আঘাত সহ্য করতে হয়েছে বেশ অনেককেই। সংখ্যায় তাঁরা কিছু কম নন। শুধু দুটি কায়দা মেয়েরা রপ্ত করতে পারেননি। লাগাতার ঠেঙিয়ে যাওয়া আর গলা টিপে ধরাতে পুরুষ এখনও একেশ্বর। মানে মারকুট্টে পুরুষদের কথা বলছি। সেদিক থেকে মেয়েরা দু'চার ঘা দিয়েই রণে ভঙ্গ দেন। স্বামীর গলা টেপবার জন্যে উচ্চতার সমস্যাও অবহেলা করা যায় না। প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকলেও টুল, চেয়ার বয়ে আনতে আনতে তেজ মরে যায় হয়তো। তবে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে ওই ছ'হাজার নারী পুরুষের মধ্যে যাঁরা সহিংস ভাবে মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা দু'পক্ষই সমান সমান গেছেন। অর্থাৎ মারামারির প্রবণতা দু'পক্ষেরই সমান ছিল। পন্থাও কিছু আলাদা ছিল না। শুধু দৈহিক দুর্বলতার কারণে মেয়েদের দল মার খেয়েছেন বেশি। নয়তো মার দিতে তাঁরাও সমান আগ্রহী।

সমীক্ষার ফলাফলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে ঘুরে মারতে গেলেও তো মেয়েদের লড়তেই হচ্ছে। অতএব পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন আর নেই—এই যুক্তিতেই মেয়েদের মধ্যে লড়াকু মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে। বরকে জব্দ করতে হলে হাত পা চালাতে দ্বিধা করতে নেই। তবে নির্যাতনের সময় মেয়েরা যেভাবে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, সে তুলনায় পুরুষের বিপদ অনেক কম। এজন্যে দু'পক্ষকেই সমান বিপজ্জনক বলা যায় না। হয়তো সমান ভাবে আগ্রাসী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েদেরই

হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে যেতে হয়। বীভৎস মার খাওয়ার পরিণামে অতিরিক্ত রক্তপাত বা হাত, পা ভাঙার জের সামলাতে শয্যা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ডাক্তারদের মতে—কোনও কোনও পুরুষ এমন নির্মমভাবে মেয়েদের মারে যে সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছাড়াও ইন্টারন্যাল ইনজুরি এবং রক্তক্ষরণ হতে পারে। তুলনায় মেয়েরা এত বীভৎসভাবে পুরুষের শরীরের সর্বত্র আঘাত করতে পারে না।

সমীক্ষা প্রসঙ্গে কিছু প্রতিবাদ করেছেন, যাঁরা, তাঁদের ধারণা—এটি অসম্পূর্ণ। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষরাই উদ্যোগ নিয়ে এটি পরিচালনা করেছেন। উদ্দেশ্য—মেয়েরা যে পুরুষ নির্যাতনে দক্ষ হয়ে উঠছে, সেটি তথ্য সহযোগে প্রমাণ করা। নিউ হ্যামশায়ারের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত "ফ্যামিলি রিসার্চ ল্যাবরেটরি" থেকে সমীক্ষা নেবার ভার যার ওপর ছিল, সেই অধ্যাপক একদেশদর্শিতার নজির রেখেছেন। অথচ একসময় ইনি মেয়েদের অত্যাচারের ইতিহাস নিয়ে কত গবেষণা করে বই লিখেছিলেন। কিন্তু এখন আর নিরপেক্ষ থাকছেন না। মেয়েদের প্রসঙ্গে সমাজকে বিভ্রান্ত করতে পারে তাঁর সাম্প্রতিক সমীক্ষার ফলাফল। ওই ছ'হাজার জনের মধ্যে অনেক মেয়ে ও পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মারপিট করেছে, ঠিক কথা। কিন্তু কী প্রমাণ আছে যে তাদের আগে উত্তেজিত করা হয়নি? কী কী দুঃখ এবং পীড়ন থেকে তারা প্রতিকারের জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছে, সেটি তো বেমালুম গোপন রাখা হয়েছে! আতঙ্ক থেকেও মানুষ মরিয়া হয়ে উঠতে পারে। রিপোর্ট মোটেই সম্পূর্ণভাবে লেখা হয়নি। কিন্তু দাম্পত্য অশান্তিতে উত্যক্ত স্বামীদের কাছে সমীক্ষাটি বেশ উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ বলে মনে হয়েছে। এ কথা ঠিক যে পুরুষের গায়ের জোর বেশি। সংসারে আধিপত্য করার প্রবণতাও হয়তো এককালে খুবই ছিল, কিন্তু সেজন্যে মেয়েদেরই শুধু নির্যাতিত বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। এতদিন ধরে সমাজে এই প্রচার চলে আসছে বটে। অথচ অত্যাচারিত পুরুষই শুধু জানেন যে কী দিনগত পাপক্ষয় চলে তাঁদের। এ প্রসঙ্গে এক ভদ্রলোকের এমন অভিজ্ঞতা আছে, যে মেয়েদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে তিনি এখন নিঃসন্দেহ। স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়াঝাঁটি হলে স্ত্রী তাঁকে দমাদম মার লাগাতেন। গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। পরশুরামের ভাষায়—

"গিন্নি ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়।
ধাক্কা ধুক্কি দিতে, ত্রুটি ধনি করে না।
নগণ্য নির্ধন করতা গা ধা
(ধা-এর ওপর শম্)
ধিন তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা—
ধা ধসকালে সব মাটি...।"

এ কথা বলা বাহুল্য, মার্কিন নাদু মল্লিকের পিঠে ধা মোটেই ধসকাত না। রীতিমত শমে পড়ত। তার ওপর গিন্নি কয়েকবার তাঁর গায়ে গরম কফিও ছুড়ে দিয়েছেন। তাঁদের ঝগড়া একদিন এমন চরমে উঠল যে গিন্নি তাঁকে পুলিশ ডেকে বাড়ি থেকে তাড়াবেন বলে শাসাতে লাগলেন। তিনি তখন নিজেই পুলিশকে ফোন করবেন বলাতে গিন্নি তো আরও খেপে উঠলেন। পুলিশ আসার আগেই রাস্তায় দৌড়ে গিয়ে—"মেরে ফেলল! মেরে ফেলল! বাঁচাও! বাঁচাও!" করে লোক জড় করলেন। শেষমেশ পুলিস এসে নাদুকে অ্যারেস্ট করে

জেলে পুরল আর গিন্নি সর্বহারার মতো চলে গেলেন নারী আশ্রমে। দুজনারই মেয়াদ ছিল অবশ্য সাময়িক। তারপর নাদু আর ভাব করতে যাননি। গিন্নিকে ত্যাগ করে বেঁচেছেন। এখন একটি লক্ষ্মীমন্ত নতুন বউ-ও পেয়ে গেছেন। তবে নাদু মল্লিকের দৃঢ় বিশ্বাস—আমেরিকায় আইনের সুবিধে নিয়ে মেয়েরা পুরুষের ওপর ভীষণ অত্যাচার করে যাচ্ছে। মানসিক কষ্ট দেওয়াও কম অন্যায় নয়।

নিগৃহীতা নারীদের জন্যে দরদী যেসব সংস্থা আছে, সেখানকার প্রশাসিকারাও মোটামুটি স্বীকার করছেন যে ক্রমশ ক্রমশ আগ্রাসী মনোভাবসম্পন্ন মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। "ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ ইনটারভেনশন"-এর একজন প্রশাসিকা বলেছেন—"আমাদের সেন্টারে মোট ১৩টি থেরাপি গ্রুপ আছে। বিভিন্ন সমস্যা থেকে মেয়েদের যে উদ্বেগ এবং বিষাদ সৃষ্টি হয়, তার চিকিৎসার জন্যে মোট ১৩টি দলে এদের ভাগ করে দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে, আগ্রাসী মনোভাবের মেয়েদের বিভাগে ক্রমশ রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এরা প্রত্যেকেই কম বেশি অর্থে দৈহিক আঘাত করে থাকে। স্বামী অথবা পুরুষ সঙ্গীর ওপর আক্রমণ করতে ওঠে, সামান্য ঝগড়া থেকেই। সেই হিসেবে, মেয়েদের মধ্যে আগ্রাসনের প্রবণতা বাড়ছে। তবে যতই যাই হোক, যদি এক হাজার মেয়ে স্বামীর হাতে বীভৎস মার খায়, তো মাত্র একজন স্বামীর ওই অভিজ্ঞতা হয়। গত দশ বছর ধরে গৃহবিবাদ ও হিংস্রতা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এই-ই দেখেছি। প্রতি বছরে অন্তত একশো জন মেয়েকে মার খাবার পর হাসপাতালে ছুটতে দেখেছি। সে তুলনায় ক'জন পুরুষ ভয়ঙ্কর ভাবে আহত হয়েছে?"

দৈহিক অত্যাচার ছাড়াও পুরুষের নানা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। হয়তো কোনও শারীরিক ত্রুটি আছে। স্ত্রী তাই নিয়েই নিষ্ঠুর মজা করেন। অসুস্থতা থাকলে যা যা কাজ তাঁর পক্ষে করা কষ্টকর, ঠিক সেই কাজগুলো জবরদস্তি করাতে বাধ্য করেন। প্রয়োজনের সময় কানে শোনার যন্ত্র, পায়ের ক্রাচ, নয়তো প্রায় অন্ধ মানুষের চোখের চশমা কেড়ে নিয়ে দীর্ঘসময় স্বামীকে অসহায় অবস্থায় জব্দ করেন, এমন স্ত্রীও নাকি আছেন। শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও অক্ষম স্বামীকে এঁরা অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যন্ত্রণা দেন।

দেখা যাচ্ছে, নির্যাতনের মাত্রা ছাড়াতে দু'দলেই কিছু নিষ্ঠুর আছেন। তবে এঁদের মধ্যে পরিস্থিতিগত প্রভেদ অনেকখানি। স্ত্রী যদি যন্ত্রণা দেন, স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। ব্যাপারটাকে চির বিদায়ের পর্যায়ে ফেলা যায়। কারণ, সচরাচর স্ত্রীরা আর তাঁকে নয়নজলে ফেরানোর চেষ্টা করেন না। হিংসা থেকে প্রতিহিংসা বা অনুতাপ কোনও কিছুই প্রবল না হলে, মিটমাট হবার সম্ভাবনাও যেমন থাকে না, তেমনই স্বামী অথবা সঙ্গীকে আজীবন ধাওয়া করে অশান্তি করে অশান্তি করার ইচ্ছেও যাবে না।

এইখানেই নিষ্ঠুর পুরুষের সঙ্গে তাঁর তফাৎ ধরা পড়ে। পুরুষ সহজে আধিপত্য ছাড়তে চান না। সাংসারিক অশান্তি থেকে স্ত্রী বা বান্ধবী যদি মনে করেন বেরিয়ে গিয়ে নিস্তার পাওয়া দরকার, সে চেষ্টা সহজ হয় না। যেখানে যাবেন, সেখানেই স্বামী গিয়ে হাজির হন। হয় ভয় দেখিয়ে, নয় অনুনয় বিনয় করে ফিরে আসতে বাধ্য করেন। তারপর আবার মারমূর্তি ধরেন। তারপরেও ছেড়ে যেতে হলে স্ত্রীকে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। কোর্ট থেকে প্রোটেকটিভ অর্ডার এনে স্বামীকে শত হস্ত দূরে রাখতে হয়। বেশিরভাগ সময়

শেলটারে গিয়ে আত্মগোপন করতে হয়। নয়তো পথে ঘাটে খুন হয়ে যাবেন এই আশঙ্কায় বহু দূরের কোনও স্টেটে পালিয়ে যেতে হয়। দৈহিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাঁরা সংসার ছাড়তে বাধ্য হন যখন, ধরে নিতে হয়, অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। সেই অবস্থায়ও স্বামীরা তাঁদের নিষ্কৃতি দিতে চান না। কোনওভাবে ফিরিয়ে এনে আবার যন্ত্রণা দিতে থাকেন।

আমেরিকায় 'ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ইউনিফর্ম ক্রাইম রিপোর্টস'-এর তথ্য অনুযায়ী এদেশে যত মহিলা খুন হন, তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের মৃত্যু হয় স্বামী নয়তো ঘনিষ্ঠ পুরুষসঙ্গীর হাতে। সে তুলনায় স্ত্রী নয়তো সঙ্গিনীর হাতে খুন হন অনেক কম সংখ্যক মানুষ। নিহত পুরুষদের মধ্যে মাত্র ৫% পুরুষের মেয়েদের হাতে মৃত্যু হয়। সময়ে সময়ে এই ধরনের পরিসংখ্যান পরিবর্তিত হয়। তবে একথাও জানানো হয়েছে যে বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা খুন করেন বাধ্য হয়ে। আত্মরক্ষার জন্যে ছুরি বা রিভলভার ব্যবহার করতে গিয়ে সঙ্গীকে হত্যা করেন।

এদেশে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া মানেই অবশ্য মারপিট নয়। হয় বহু আরম্ভে লঘু ক্রিয়াতেই শেষ হয়। নয়তো ঠাণ্ডা লড়াই চলতে চলতে ছাড়াছাড়ি। "হানি" "হানি" শেষ হয়ে হানাহানিতে পৌঁছাবার মুখে চিরবিদায়। আর এখনও পর্যন্ত গৃহবিবাদের ফলে নিগৃহীত মানুষ হিসেবে আমরা মেয়েদেরই চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। সিনেমায়, টিভিতে এর ওপর ভিত্তি করে খবর প্রচারিত হয়। কাহিনী চিত্রর তৈরি হয়। "দ্য বার্নিং বেড" অথবা "স্লিপিং উইথ দ্য এনিমি" ছবির বিষয়বস্তু এইরকম। ফলে নির্যাতিত নারীর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রহৃত স্বামীদের দুঃখের কথা বিশেষ প্রকাশিত হয় না। সহজে বিশ্বাস করাও যায় না।

একদিন টিভি-র একটি "টক শো"-তে পুরুষ নির্যাতন নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেখানে এক মহিলা বলেছিলেন রাগ হলেই নাকি হাতুড়ি নিয়ে স্বামীকে তাড়া করতেন। প্রাণের দায়ে স্বামী পালিয়ে গেছেন। দর্শকদের মধ্যে অট্টহাসির রোল উঠল। যেন খুবই মজার ব্যাপার। অথচ যদি উলটো ঘটনা ঘটত, তবে নির্ঘাৎ স্বামীর হাজতবাস বাঁধা ছিল। বউ-এর হাতে মার খাওয়া ভারী হাস্যকর ব্যাপার। বউকে মার দেওয়া পাশবিক আচরণের প্রকাশ। আর আত্মরক্ষার জন্যে বউকে ঘা কতক দেওয়াও অন্যায়। মেয়েদের গায়ে কখনও হাত তুলতে আছে? ফলে পুরুষের মার খাওয়া নিয়ে কোনও আন্দোলন হয় না। কোনও সমাজকল্যাণ কর্মীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন না। প্রপীড়িত মানব দলের জন্যে কোনও শেলটার তৈরি হয় না। মনোবিদ্যা বিশারদরা থেরাপি বা কাউনসেলিং করতে আসেন না। বরং স্বামীরা উপহাসের পাত্র হন। তাঁর পৌরুষ এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে রঙ্গ রসিকতা চলে। কানেকটিকাট স্টেটে এক ভদ্রলোক প্রায় প্রায়ই স্ত্রীর কাছে গলা ধাক্কা খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশে ফোন করলেন। পুলিশের প্রচণ্ড সন্দেহ যে কোনও লোক অকারণ বাজে বকছে। কিছুতেই ভদ্রলোক কেস ফাইল করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত অনেক চাপ দিয়ে পুলিশকে বাড়িতে ডাকলেন। স্ত্রী নিজে স্বীকারও করলেন যে সদ্য সদ্য স্বামীকে উত্তম মধ্যম দিয়েছেন। পুলিশ কেস তো লিখলই না। উলটে স্বামীকে উপদেশ দিয়ে গেল ফ্যামিলি কাউনসেলিং করাতে।

ভদ্রলোক ফ্যামিলি কাউনসেলিং-এর জন্যে একটি প্রাইভেট এজেন্সিতে গিয়ে জানলেন তারা নির্যাতিতা মেয়েদের জন্যে শেলটারও খুলেছে। নির্যাতিত পুরুষদের জন্যে কোনও শেলটার থাকলে, সেখানে তিনি আশ্রয় নিতে চাইলেন। এজেন্সি তো অবাক। পুরুষ থাকবে সুরক্ষিত নিরাপদ আশ্রয়ে? কার ভয়ে? এদিকে বউ-এর তাড়নায় ভদ্রলোক বাড়িতে ঢুকতেই পারছেন না। ঢুকলেই গলাধাক্কা।

মর্মাহত ভদ্রলোককে তখন নিজভূমে পরবাস। এদিকে পুরুষ হয়ে জন্মানোর অপরাধে কোনও দরদী গোষ্ঠী তাঁর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে না। তিনি সরাসরি নালিশ জানালেন কানেকটিকাট স্টেটের হিউম্যান রাইটস কমিশনারের কাছে। এটি' ৮৫ সালের ঘটনা। তখন সরকারি উদ্যোগে আইন করে স্থির করা হল, যেসব এজেন্সি সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে কাউন্সেলিং সেন্টার এবং মেয়েদের শেলটার চালাচ্ছে, তারা নারী পুরুষ উভয় সমাজকে সমান সাহায্য দেবে। প্রয়োজন হলে অত্যাচারিত এবং গৃহহীন পুরুষকেও শেলটার দেবে। তারপর থেকে কিছু শেলটারের ব্যবস্থা হলেও সংখ্যা এখনও নগণ্যই বলা যায়।

এখন ওই ভদ্রলোক নিজেই লাঞ্ছিত মানব সমাজের জন্যে কাউন্সেলিং করছেন। দল গড়েছেন। তাঁর নিজের আর্থিক পুঁজি নিঃশেষ। তা সত্ত্বেও চেষ্টা চরিত্র করে সংগঠন চালাচ্ছেন। নিজের দুঃখ দুর্দশা যা গেছে তার আর কোনও প্রতিকার হয়নি। এখন নিঃসঙ্গ জীবনে একটিই কাজ বেছে নিয়েছেন। সেটি হল আমেরিকার মার খাওয়া নাদু মল্লিকদের সান্ত্বনা দেওয়া এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করতে সাহায্য করা। তিনি যুবকদের কখনও নারী বিদ্বেষ পোষণ করতে বলেন না। তাঁর ধারণা এখনও পৃথিবীতে ভাল মেয়েই বেশি। ভাগ্য মন্দ হলে হান্টারওয়ালিদের খপ্পরে পড়ে মানুষ। তিনি যে শেলটারের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে কাউন্সেলর আরও আছেন কয়েকজন। পারিবারিক অশান্তিতে উত্যক্ত হয়ে চলে আসা মানুষের সংখ্যা কিছু নগণ্য নয়।

বাঙালি বউ-এর হাতে মারধোর খেয়ে বিবাগী হয়ে দেশে ফিরে গেছে এমন একটি বাঙালি ছেলের কথা মনে পড়ছে। ছাত্র-ভিসায় নিউ ইয়র্কে এসেছিল। চাকরি করার উপায় নেই। টাকা পয়সার টানাটানি। বউ আশপাশের ইমিগ্রান্ট বাঙালিদের সচ্ছল জীবনযাত্রা দেখে ক্ষুব্ধ হয়। গ্রিন কার্ড না পেলে কিছু সুরাহা সহজে হবেও না। বর পি. এইচ. ডি. করার চাপে বেশি সময় পায় না। নানা কারণে নিত্য অশান্তি। তার মধ্যে বউ-এর মন উড়ু উড়ু। এক বিবাহিত বাঙালির সঙ্গে মন মোজি হয়ে গেল। ছাত্র বর প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। তেজস্বিনী বউ তখন বেপরোয়া। একে সময় দিতে পারিস না, তায় গ্রিনকার্ড জোগাড় করতে না পেরে টুংটাং করে সংসার চালাচ্ছিস, ভাড়া গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে যখন তখন আমাকে দিয়ে তুই গাড়ি ঠেলাস। একটা "ব্রড ওয়ে শো" দেখাসনি। নায়াগ্রা নিয়ে গেলি না দু'বছরের মধ্যে। তোর আবার সন্দেহ করার চেষ্টা? আরও দুটো মুখচোরা বাঙালি ছাত্রের সামনে রোগা পটকা বরকে টেনে এক থাপ্পড় দিয়েছিল বউ। তার আগে দুদিন নাকি মারাত্মক আঁচড়েও দিয়েছিল। পটকার গাল, গলা নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। মুখচোরা বাকি দুই ছাত্র জেরা করে জেনেছিল। সেদিন প্রকাশ্যে মার খেয়ে পটকার অসম্ভব অভিমান হল। স্থানীয় দরদী ছাত্র সমাজের উপদেশে বউকে তালাক দিতে যা যা করণীয়

লুকিয়ে লুকিয়ে সব সেরে ফেলল। ডক্টরেট শেষ করে ডিভোর্সের স্যুট ফাইল করে দিল। নিষ্ঠুর বউ তাকে ক্রমাগত মানসিক যাতনা আর মধ্যে মধ্যে দৈহিক বেদনা দিয়ে থাকে—এই অভিযোগে বেকসুর ডিভোর্সও পেয়ে গেল। পটকা এখন কলকাতায় পড়ায়। বউ অন্য কোনও স্টেটে এক সাহেবের সঙ্গে আছে শুনতে পাই।

১১ *জুলাই* ১৯৯২

উপহারের হাতবদল অথবা মানুষ বদল

এদেশে খালি হাতে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার একদম রেওয়াজ নেই। আমেরিকান সমাজে ঘন ঘন নেমন্তন্ন আদান প্রদানের নিয়ম নেই বটে, কিন্তু কালে ভদ্রে সপ্তাহ শেষে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ডাক পড়লে উপহার কিছু নিতেই হয়। তবে সেটি সাধারণত শ্যাম্পেনের বোতল, ভাল জাতের ওয়াইনের বোতল, বাড়িতে তৈরি করা অথবা কেনা কেক, পেস্ট্রির বাক্স, নয়তো চকোলেটের টিন, ফুলের তোড়া ধরনের উপহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর যদি তারা কোনও বিশেষ উপলক্ষের জন্যে নেমন্তন্ন পায়, তখন সেই অনুযায়ী জিনিস দেয়। বাচ্চা হবার খবর পেলে ছোটদের জিনিস, মায়ের বেবি শাওয়ারে (মার্কিনি 'সাধ' গোছের ব্যাপার) মার অথবা ভাবী শিশুর জন্যে উপহার দেয়। জন্মদিন বা অন্যান্য অনুষ্ঠানেও গুরুত্ব বুঝে উপহার। বিয়েতে বড় মাপের গিফট চেক নয়তো, সম্পর্ক বুঝে দামি উপহার। ক্রিসমাসেও উপহারের ছড়াছড়ি। অনেকে আবার বেশ হিসেব টিসেবও কষেন।

আমাদের বাঙালি মহলে উপহার দেওয়া নেওয়া যেন নিয়মের মতো হয়ে গেছে। কোনও অনুষ্ঠান থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু বিনা অনুষ্ঠানেও এই যে প্রতি শুক্র, শনি, রবিবার এর ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া দাওয়া চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে, উপহার কেনার খরচও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। ওয়াইনের বোতল বোধহয় বয়সের হিসেবে এখন এক একখানা মান্ধাতার আমলের হবে। কারণ সচরাচর পুরুষরা হার্ড লিকার পান করেন।

নানা কারণে 'ওয়াইন'-এর বোতল হাতে নিয়ে নেমন্তন্ন যাওয়া হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধে। দামের বকমফের আছে। ইউরোপের আমদানি জিনিস হলে দশ ডলারের মধ্যে। আর এখানে আপস্টেট নিউ ইয়র্ক নয়তো ক্যালিফোর্নিয়ার জাতীয় উৎপাদন হলে তিন-চার ডলারে কিনতে পাওয়া যাবে। দু-এক ডলার বেশি দিলে বাক্সবন্দি বোতলের গায়ে গিফট র‍্যাপ জড়িয়ে মাথার ওপর রিবনের ঝুঁটি বসিয়ে দিয়ে দাও। মনে মনে জানা আছে, ওটি এখন দীর্ঘকাল হাত ফেরতা হয়ে সারা বাঙালি সমাজে ঘুরবে। শ্যামবাজার থেকে লেকের পাড়ে ছেড়ে দেওয়া বজ্জাত বেড়ালের মতো আবার পথ চিনে চিনে নিজের বাড়িতে ফিরে আসাও বিচিত্র নয়!

তবে বাঙালির নজর আছে। নেহাত এলেবেলে আড্ডা, কিংবা খুব চেনা বন্ধুর বাড়িতে হলে ওয়াইনের বোতল বগলে যেতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু সাপ্তাহিক নেমন্তন্ন তো আর এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ফলে ক্যালেন্ডারে 'ডেট' দেওয়া বা পাওয়াই বেশ শক্ত ব্যাপার। অন্তত তিন মাসের নোটিশ না দিলে কোনও জনপ্রিয় বাঙালিকে আপনি নিজের বাড়িতে শনিবারে আনতেই পারবেন না। তাঁর বাড়িতে গায়ে পড়ে যাওয়ার আশা তো ছেড়েই দিন। অতএব মার্কিনি পঞ্জিকা আমাদের সামাজিক জীবনের দিনক্ষণ ঠিক করে দেয়। বিয়ে, জন্মদিনের পার্টি, বিয়ের তারিখ, নতুন বাড়ি কেনার পর 'হাউস ওয়ার্মিং' বা বাড়ি গরম করার বিরাট ভোজের দিন টিন তো অন্তত পক্ষে ছ'মাসের নোটিশে ঠিক করতে হবে। আর এমনি নেমন্তন্নগুলোও ইদানীং প্রায় ওই পর্যায়ে ঠেকেছে। উপহার দেওয়ার ব্যাপারটিও সেইভাবেই চলছে। একই শহরে থেকে এক বাঙালি আর এক বাঙালির বাড়ি ঠিক এক বছর পরে ডিনার খেতে যাচ্ছে। কারণ বাকি বছরটা দেড়শো মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন খেতে খেতে হয়েছে। নিজের শহরের এক এবং একমাত্র বাঙালি ভাইটিকে 'ডেট' দিতেই পারেনি। তা যখন সেই বার্ষিক নেমন্তন্নে যাচ্ছে, হাত খালি করে যাবে কেন? জিনিসের তো অভাব নেই। নজরের ব্যাপারটিও আছে। জলেই জল বাঁধে। অতএব পারফিউমের সেট, অন্যান্য কসমেটিক্সের বাক্স, স্ফটিক বা কাট গ্লাসের পাত্র, চীনে ফুলদানি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়ের ম্যাচিং সেট, কর্নিং ওয়্যারের রান্নার বাসন, ছবির অ্যালবাম, হ্যান্ডব্যাগ, শার্ট, সোয়েটার, বাচ্চাদের জামাকাপড়, খেলনা, টব ভর্তি আসল ফুলের গাছ, সিল্কের ফুলের গাছ, নকল সেটিং-এর গয়না ইত্যাদি ইত্যাদি। ইদানীং আবার নতুন কায়দা হয়েছে দেশ থেকে শাড়ি কিনে এনে জমিয়ে রাখা এবং 'বন্ধুত্ব' বুঝে সুতি, সিল্ক দেওয়া দেওয়ি। কারণ ডলারের দাম যে হারে বাড়ছে, এখানে কুড়ি ডলারে একটি ভাল 'টি পট' কিনে দেবার বদলে দেশের একটি মোটামুটি ভাল শাড়ি দেওয়া যায়। যদি বাড়িতে বাড়তি থাকে। কিন্তু সম্প্রতি আরও অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন আমাদের 'সুশান্তদা'। সুশান্ত রায় নিজে অসম্ভব বই পড়েন এবং অপরকেও ঘন ঘন পড়াতে চান। প্রত্যেক বছর বই ব্যবসায়ী বিমল ধর দেশ থেকে আসেন বাংলা বইয়ের একজিবিশন করতে। সুশান্তদার সঙ্গে বিমল ধরের বিশেষ বন্ধুত্ব। সুশান্তদা নিজের বইয়ের বাজার তো যা করেন, সে তাঁর নিজের শখ মেটাতে। কিন্তু ইদানীং সাপ্তাহিক নেমন্তন্নে যাচ্ছেন বাংলা বই, বাংলা গানের ক্যাসেট সঙ্গে নিয়ে। এমন উপহার চট করে পাওয়া যাবে না। যারা পাচ্ছে, তারা খুবই খুশি হচ্ছে। সুশান্তদার বক্তব্য, কত আর সাংসারিক জিনিসে বাড়ি ভরাবে? বইয়ে রীতিমত শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে আমার আর তোমার বউদির নামে সই করে দিচ্ছি। ও গিফট আর কাউকে চালান করতে পারবে না।

সাংসারিক জিনিস বলতে মনে পড়ল—একটি ছোট্ট ছেলে খেলনার দোকানে গিয়ে কী একটা খেলনা কেনার বায়না ধরেছিল। তার মা বোঝাল—দাঁড়াও না, দু'দিন বাদেই তো ক্রিসমাস। পার্টিতে কত গিফট পাবে। হয়তো এই খেলনাটাই কেউ দেবে তোমাকে। ছেলে মুখ ভার করে বলল—না, ক্রিসমাসে তো সবাই তোমাকে শুধু কেটলি দেবে। পরে দেখা গেল সে মিথ্যে দুঃখ করেনি। শুধু উপহার পেয়ে পেয়ে তার মার রান্নাঘরে নানা ধাতুর, নানা রঙের নানা মাপের কেটলিই জড় হয়েছে অন্তত ডজন খানেক।

এখন কথা হচ্ছে, এক তো সাপ্তাহিক নেমন্তন্নে উপহার কেনা একটা বড় খরচে দাঁড়িয়ে গেছে। তার ওপর লোকেদের নিজেদের বাড়িতেই এক ডজন নতুন কেটলি জমেছে। তা কোনও মা যদি সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করে হারাধনের দশটি কেটলিকে একে একে অন্যত্র পাচার করেন, দোষ দেওয়া যায়? হ্যাঁ, খেয়াল রাখতে হবে কে কে কেটলি হাতে এসেছিল এবং কোন কোন কেটলি? র‍্যাপে নাম লেখা থাকে। মনে রাখার চেয়ে লিখে রাখা নিরাপদ। তারপর নিউ জার্সির কেটলি লং আইল্যান্ডে, ফিলাডেলফিয়ার জাপানি ফুলদানি নিউ ইয়র্কে চালান করা যায় অনায়াসে। কিন্তু এসব আমদানি রপ্তানির জন্যে একটু মনোযোগী হতে হবে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর কায়দাটা জানা চাই। না হলে মস্ত কেলেঙ্কারি। চোখের সামনে দেখেছি সে ঘটনা। রুবি মল্লিকের বাড়ি গিয়েছিলাম তাদের হাউস ওয়ার্মিং পার্টিতে। থরে থরে উপহার নিয়ে ঢুকছিল লোকজন। 'ফায়ার প্লেসের' সামনে সব সাজিয়ে রাখা হচ্ছিল। রাতে খাওয়া দাওয়া, গান বাজনার পর্ব মিটলে উপহারগুলো খোলার জন্যে সবাই রুবিকে ধরে পড়ল। সকলেরই আগ্রহ জিনিসগুলো বসে বসে দেখবে। রুবি মোড়ক খুলছে আর লজ্জা পাচ্ছে। তার মতে এসব ফর্মালিটির কোনও দরকার ছিল না। হঠাৎ একটা মোড়ক খুলতে বেশ সুন্দর একটা স্টিলের ওপর রুপোর জল করা জলের জগের ছবি আঁকা বাক্স বেরল। মোড়কের গায়ে কার্ড দিয়ে লেখা ছিল—রুবিকে শুভেচ্ছার সঙ্গে চিত্রা। চিত্রাকে রুবি ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু চিত্রার যেন একটু নার্ভাস ভাব। কারণ বাক্স খুলে ফেলে রুপোলি জগ টেনে বের করতে গিয়ে দেখা গেল আর একখানা পুচকে হাতে লেখা চিরকুট তার মধ্যে। রুবি ভুরু কুঁচকে পড়ে ফেলল—'চিত্রা বউদিকে স্বপ্না।' ভাবতে পারেন, আমাদের সেই আড্ডায় প্রায় পাশাপাশি চিত্রা আর স্বপ্না বসে আছে। স্বপ্না চিত্রাকে 'চিত্রাবৌদি' বলেই ডাকে। সে কী অপ্রস্তুত অবস্থা! স্বপ্না গম্ভীর হয়ে গেল। চিত্রা বাথরুমে হাঁটা দিয়েছে ততক্ষণে।

পরে চিত্রা সাফাই গেয়েছিল নাকি—রোজ রোজ কত গিফট কিনব? আরও একটা রুপোর জাগ নতুন আছে। তাও আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। লং উইক এন্ড বলে স্বপ্নারা লেক জর্জ বেড়াতে যাবে বলেছিল। একবারও ভাঙেনি রুবির পার্টিতে আসছে। আর লোকেদেরও বুঝি না। খালি 'গিফট খোলো' 'গিফট খোলো' করে পাগল করবে? আর স্বপ্নাটাই বা কী? যখন দিয়েছিলি, তখন তো বাইরে একবার নাম লিখে দিয়েছিল। আবার জাগের মধ্যে ডবল করে আমার তার তোর নাম লিখতে গেলি কেন? আমি কি উপুড় করে ঝাঁকিয়ে দেখেছি আগে?

আমাদের সমাজে 'লৌকিকতা' বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে নিজেরা অনুযোগ করি। আবার বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কেউ রাজি হয় না। খালি হাতে লোকের বাড়ি যেতে শুরু করা উচিত বলে লেকচার দিয়েও কর্মক্ষেত্রে সহজে কেউ রেওয়াজ ভাঙতে রাজি নয়। একে তো অযথা অর্থ ব্যয় এমনকি অপব্যয়ের পর্যায়েই ফেলা যায় এগুলোকে। কোনও বিশেষ উৎসব হয় আলাদা কথা। কিন্তু সামারে অমুকের সাঁতার পুলে সাঁতার কাটার নেমন্তন্ন পেলেই তখুনি উপহার কিনতে যেতে হবে কিংবা প্রতি সাপ্তাহিক নেমন্তন্নে ইধার কা মাল উধার করতে হবে—এরকম রেওয়াজ কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না। মাঝখান থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের প্রত্যাশা বেড়ে উঠতে পারে। তারা ধরে নিতেই পারে, কেউ কখনও

এমনি খেতে আসবে না। কয়েকটি পরিবার মিলে ইদানীং উপহার প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তাঁদের কিন্তু গছানো খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। নিজেরাও নেমন্তন্ন, আড্ডায় গিয়ে প্রথমেই বলে দিচ্ছেন—আমরা কিছু আনিনি কিন্তু এভাবে ব্যাপারটা চালু থাকলে হয়তো হাওয়া বদল হতেও পারে ক্রমশ।

আসলে দূর বিদেশে আত্মীয় পরিজনহীন মানুষগুলো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে দিয়েই বিস্তারিত পরিবারের স্বাদ পায় তো। ঠিক লৌকিকতার খাতিরে নয়, আত্মজনকে কিছু দেবার আনন্দেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। পুজোর সময় মনে হয় পাতানো বোনকেই একটা শাড়ি দিই। ভাইফোঁটা এলে কেউ ভাবে কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে 'দাদা' বলে ডেকে কোনও এক অনাত্মীয়ের কাছেই বিপদে আপদে যত সাহায্য পেয়েছে। তাঁকে একখানা শার্ট দিই না কিনে? একটি ছাত্রকে দেখেছি কত হিসেব করে চাকরি আর পড়াশোনা করছে। তার মধ্যে বউটির বাচ্চা হয়ে গেল। চাকরি করার মতো ওয়ার্কিং ভিসা নেই বউটির। এমন প্রাচুর্যের দেশেও ছাত্রটি বাচ্চার জন্যে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই কিনে উঠতে পারছে না। তাই বলে বাচ্চাটার পাতানো মাসি, পিসিরা মুখ ফিরিয়ে থাকবে? তারাই আনন্দ করতে শপিং মলে ছোটে। চাঁদা করে কিনে ফেলে পেরাম্বুলেটার, হাই চেয়ার, নয়তো শীতের জামাকাপড়—যা কিছু একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্নপ্রাশনের হুজুগ তোলে মাসি, পিসি, জ্যাঠা কাকার দল। এই 'পাতানো' সম্পর্কের জের চলে বহুকাল। দশ বছর পরে সেই ছাত্রই হয়েছে প্রতিষ্ঠিত বাঙালি। খবর পেল এককালের পাতানো 'বড়দা' ক্যানসার হয়ে হাসপাতালে গেছেন। তখন তার প্রতিদানের সময়। হয়তো আর্থিক সাহায্য জরুরি নয়। তবু কিছু তো করা যেতে পারে। হাসপাতাল ফেরৎ বড়দা বাড়ি এলেন সাময়িক একটু সুস্থ অবস্থায়। ছেলেটি 'ক্রিসমাস' উপলক্ষে ধরিয়ে দিয়ে গেল জনে জনে উপহার। 'বড়দা'র কলেজে পড়া ছেলের হাতে মোটা অংকের গিফট চেক দিতে গেলে এরকম একটা উপলক্ষ তো চাই।

আরও আছে নানা সেন্টিমেন্ট। কারও বাবা মা দেশ থেকে বেড়াতে এলেন তো চারমাস বাদে তাঁদের দেশে ফেরার সময় সুটকেসে জিনিস ধরছে না। এখানে ছেলে অথবা মেয়ে তো যা দেবার দিয়েছে, তার সঙ্গে আবার 'মাসিমা' মেসোমশাই' বানিয়ে বসেছিল যারা, তারাও ওঁরা চলে যাচ্ছেন শুনে ওই বয়স মানুষদের ব্যবহারযোগ্য কিছু কিছু উপহার দিতে এল। কারও নিজের মা বেঁচে আছেন দেশে, হয়তো বাবা নেই। কারও দুজনেই আছেন। কারও কেউই বেঁচে নেই। যখন তাঁদের দেবার ইচ্ছে ছিল, তখন কত কারণেই কত কিছু পারা যায়নি। আজ সাধ্য আছে, অথচ সেই নেবার মানুষগুলো চলে গেছেন। অতএব? ওই সাদা চুলের, মোটা লেন্সের চশমা পরা বৃদ্ধাটিকে দেখেই মনে পড়ে অন্য একজনকে। হয়তো তাঁর স্মৃতিতেই কিনে বসে পার্কার কলম। 'মেসোমশাই'কে নিতে হয় বড় সঙ্কোচের সঙ্গে। কেউ টুকটুকে লাল পাড় নয়তো মেরুন কলকা পাড়ের সাদা 'চায়না সিল্কের' শাড়ি কিনে এনে দেয় চারমাসের চেনা প্রৌঢ়া 'মাসিমা'কে। নিজের মায়ের জন্যে কেনার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, তিনি দেশে 'থান'-এর বদলে সরু পাড়ের কাপড় পরেন বহুকাল।

২৩ নভেম্বর ১৯৯১

ইধার কা মাল উধার

গত মাসের শেষে রজত মজুমদাররা দেশে গেল। ওদের হাতে দু একটা ওষুধপত্র পাঠাব ভেবে ঠিক রওনা হবার আগের দিন গিয়েছিলাম। স্বামী স্ত্রী দুটি ছোট্ট মেয়ে নিয়ে চলেছে। মাস খানেকের মাত্র ছুটি। কিন্তু লটবহর দেখে আমার চক্ষুস্থির। টিকিট পিছু দুটো করে বড় বড় সুটকেস নেওয়া যায়। সেই হিসেবে ওরা তিন দু'গুণে ছ'খানা পেল্লায় সুটকেস গুছিয়ে ফেলেছে। শুধু, তাদের ওপরে চড়ে বসে ডালা বন্ধ করা বাকি। উপরন্তু আরও চারখানা ঢাউস সুটকেস পথের মাঝখানে সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, একযাত্রায় অর্ধেক আমেরিকা তুলে নিয়ে চলেছে। মাত্র এক মাসের জন্যে এত জিনিস? আর ওই দাঁড়ানো চারখানা সিন্দুকের জন্যে তো একসেস লাগেজ হিসেবে একগাদা ডলার মালভাড়া দিতে হবে। তাছাড়া, নিউ ইয়র্ক আর বম্বের এয়ারপোর্টে মাল টানাটানির ধকলও কম নাকি? "এয়ার ইন্ডিয়া"র লাউঞ্জে তো এমন কড়াকড়ি করেছে যে—যাত্রী ছাড়া একটি বাড়তি লোককে ঢুকতে দেবে না। সিকিউরিটি চেকিং-এর কাউন্টারে একা হাতে প্রতিটি বাক্স খুলে আর বন্ধ করে খানা তল্লাশির সুযোগ দিতে হবে। আবার হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চেক ইন কাউন্টারে মাল নিয়ে যাওয়া। বম্বেতেও একই অবস্থা। রজতদের এত মাল টানবে কে? রজত নিজে রোগা পটকা, তার বউ ছন্দাও কিছু হামিদা বানু নয়। গত বছরে পেটে একটা অপারেশন হয়েছে। দুই মেয়ে সামলাতেই তার প্রাণ যায়।

মালের বহর দেখে ছন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম—এতগুলো সুটকেস নিচ্ছ? আবার চারটে এক্সট্রা লাগেজ?

ছন্দা সামান্য উত্তেজিত—আমাকে বলবেন না। ওকে জিজ্ঞেস করুন।

রজত কাঁধ নাচিয়ে দু'হাত তুলে বলল—আর জিজ্ঞেস করার কী আছে? তুমি প্রথম থেকে রাজি হলে কেন?

ছন্দা আরও রেগে বলল—কী করে জানব এত ঝামেলায় পড়তে হবে? কেউ সঙ্গে ট্রাভল করতে চাইলে, না বলা যায়?

ওদের শুভযাত্রার আগের দিন উপস্থিত হয়ে এত তর্কাতর্কি লাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বসে থেকে ওদের সময় নষ্ট করাও উচিত হবে না। কিন্তু বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপাতে এসেছি। ওষুধের ঠোঙাটা না দিয়ে চলে যাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে রজত আর আমাকে চা ধরিয়ে দিয়ে ছন্দা নিজের চা করে আনতে গেল।

তারপর রজত আর ছন্দার কাছ থেকেই সুটকেস বৃত্তান্ত শুনলাম। ওরা দেশে যাচ্ছে শুনে জয়ন্ত বাগচি সঙ্গে বউ বাচ্চা গছিয়ে দিচ্ছে। জয়ন্ত দেশে গিয়ে দু'একবার প্রবল পেট খারাপে ভুগেছিল। শীতকালে যদি বা সহ্য হয়, গরমকালে কলকাতা অসহ্য। এদিকে বড় ছেলেটার বয়স ন'বছর। গরমে লম্বা ছুটির সময় ছাড়া, স্কুল কামাই করে শীতকালে দেশে যাওয়া যাবে না। এইসব অসুবিধের জন্যে জয়ন্তর আপাতত দেশে যাওয়ার কোনও বাসনা নেই। কিন্তু সুমিত্রা যাবেই। ছোট ছেলেটার বয়স আড়াই বছর। দুই ছেলে আর সুমিত্রার জন্যে একই দিনে জয়ন্ত 'এয়ার ইন্ডিয়া'র টিকিট কিনে ফেলল, যাতে রজত মজুমদার অ্যান্ড

পার্টির সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারে। রজতরা দল বাড়াতে তেমন আপত্তি করেনি। সারা পথ নিজেদের মেয়ে দুটোর সঙ্গে জয়ন্তর ছেলে দুটোও বেশ খেলতে খেলতে যাবে—এরকমই ভেবে থাকবে হয়তো। কিন্তু রওনা হবার দুদিন আগে জয়ন্ত যখন একেবারে চারখানা সুটকেস নিয়ে ট্রিপ মারতে এল, তখন মজুমদার ফ্যামিলি বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ল। কারণ জয়ন্ত বুঝিয়ে গেল, যেহেতু রজতের বন্ধু সুপ্রিয় তার মস্ত স্টেশন ওয়াগন চালিয়ে মজুমদার পার্টিকে কেনেডি এয়ারপোর্টে নিয়ে যাচ্ছে, সেহেতু 'অনেক জায়গা আছে' বুঝে সেও সুমিত্রাদের চারখানা সুটকেশ আগেই জমা দিয়ে গেল। তারপর নিজের বউ বাচ্চাদের প্লেনে তুলে দেবার সময় বাকি চারখানা সঙ্গে নিয়ে যাবে। মোট আটটা বড় সুটকেস তো সুমিত্রার সঙ্গে যাচ্ছেই, আবার যখন ছন্দা বলে ফেলেছে যে ওরা নিজেরা আটটার বদলে মাত্র ছ'টা সুটকেশ নিচ্ছে, তখন জয়ন্ত আরও উৎসাহিত হয়ে বলে গেছে—ওঃ! তাহলে তো আরও দুটো লাগেজ তোমাদের টিকিটে চলে যাবে। একটা টাইপরাইটার যদি দিই সঙ্গে? আর একটা আমেরিকান ট্যুরিস্টারের ব্রিফ কেস?

মোটকথা বাকি চারটে বিশাল সুটকেশ, খান চারেক হ্যান্ড ব্যাগ, সুমিত্রা এবং দুই ছেলে, বাক্সবন্দি ভারী টাইপরাইটার আর ব্রিফকেস গাড়িতে তুলে এয়ারপোর্টে যাবে জয়ন্ত। এবং এয়ার ইন্ডিয়ার লাউঞ্জে তাকে ঢুকতে দেবে না। রজত মজুমদার তখন 'তুমি যতো ভার দিয়েছো সে ভার' গাইতে গাইতে টেনে হিঁচড়ে দুই পরিবারের মাল নিয়ে ভেতরে ঢুকবে। ছন্দা আর সুমিত্রা সাহায্য করতে গিয়ে কোমরের ফিক ব্যথায় চমকে উঠবে। চারটে বাচ্চা ফাঁক তালে এসকেলেটর বেয়ে লাগাতার নামা ওঠার চেষ্টা করবে। দূরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কাচের আড়াল থেকে জয়ন্তর হাতছানি—বাই বাই। রাইট টু মি। টেক কেয়ার।

তারপর কলকাতা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত রজতের কুলি সর্দারের ভূমিকা। কনভেয়ার বেলটের সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে মজুমদার ও বাগচি পার্টির ছয় প্লাস আট, মোট চোদ্দোটা সুটকেশ নামানো এবং মুহুর্মুহু কেতরে পড়া। তখনও টাইপরাইটার আর ব্রিফকেস ঘুরতে ঘুরতে আসছে...।

কল্পনায় এইসব অসহ্য দৃশ্য দেখে ছন্দা রেগে আগুন। এই অবস্থায় ওদের বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপাব কিনা ভেবে ওষুধের ঠোঙাটা নিয়ে লজ্জা পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেটা ওরা এককথায় হাত ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল।

আমেরিকার বাঙালিরা মাল টানাটানিতে সিদ্ধহস্ত। দেশে যাওয়া আসা করা মানে সুটকেস বোঝাই জিনিস নেওয়া। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাইরেও আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিতের জন্যে উপহার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে ফলে সুটকেস ভারী হতে বাধ্য। তার ওপর আছে দয়াধর্ম। এদেশের জামাকাপড়, টুপি, সোয়েটার, মাফলার, বিছানা চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদির অখণ্ড পরমায়ু। একবার কিনলে সহজে চেকনাই হারায় না। তাই বলে এক যুগ ধরে একই জিনিস ব্যবহার করা যায়? ছেলেমেয়েরা তো বছর বছর নতুন পোশাক বদলাবে। মায়েদের শাড়িগুলো নিত্য ব্যবহারের অভাবে হ্যাঙারবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। বাবাদের শার্ট, প্যান্ট, সোয়েটার, কোট ও ফ্যাশন বদলের মহিমায় ক্রমশ তামাদি হতে থাকে। সুতরাং জমে যাওয়া শাড়ি, সালোয়ার, কুর্তা, স্কার্ট, ব্লাউজ, জামা, শার্ট, কোট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি ইত্যাদি ঠেসে ঠুসে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে, দেশে যাদের প্রয়োজন, তাদের

দেওয়া যায়। সেদিক থেকে ইধার কা মাল উধার করার যুক্তি আছে। ভাল ভাল জিনিসগুলো কাজে লেগে যায়।

এরপর আছে উপরোধে ঢেঁকি গেলার পর্ব। দেশে যাবার মুখে চিঠিপত্রে অনুরোধ আসে। কেউ চেয়ে পাঠান ক্যামেরা, কেউ পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার, ভি সি আর। আনুষঙ্গিক হিসেবে ভারী ভারী সোয়েটার, জিনস, জ্যাকেট এমনকি মেয়ের বিয়েতে দেবার জন্য কমসেটিক্স-এর সেট থেকে পোর্সিলিনের ডিনার সেট পর্যন্ত। গায়ে হলুদের জন্যে স্যামসনাইটের সুটকেস আনলে আরও ভাল হয়। নিদেনপক্ষে জামাই-এর জন্যে একটা ব্রিফকেস। স্যুট লেংথ তো অবশ্যই। ফলে যাত্রীর বোঝা বেড়ে যায়। অবশ্য অনুরোধ এলেই যে রাখতে হবে, এমন কথা নয়। সেটা নির্ভর করে, কে কাকে লিখলেন, তার ওপর। তবু, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু বোঝা বইতে হয়। দেশ থেকে ফেরার সময়ও অন্যান্য বোঝা বাড়ে। সামারে দেশে গিয়ে তিন মাস থেকেছেন কি মরেছেন! সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় ফেরার মুখে নিউজার্সির ডজন খানেক প্রবাসী কন্যা এবং তস্য পরিবারের জন্যে করুণ মুখের বাবা মায়েদের কাছ থেকে মস্ত পোঁটলা আপনাকে নিতেই হবে। সামনে দুর্গাপুজো। 'যাও হে গিরিরাজ, আনো গৃহে গৌরী' বলে চোখের জল ফেলে তো লাভ নেই। গৌরীর সে বছর ইন্ডিয়া যাওয়ার সুবিধে নেই। অতএব তার জন্যে বমকাই, ব্যোম ভোলানাথের ধুতি, কার্তিক, গণেশের পাঞ্জাবি, নয়তো লক্ষ্মী, সরস্বতীর চুড়িদার কুর্তা আপনি ছাড়া কে বয়ে আনবে? আবার শীতকালে গেলে অন্তত পুজোর তত্ত্বর হাত থেকে রেহাই পাবেন ভাবছেন তো? সে গুড়ে বালি। এক তো পাটালি গুড়ের সিজনে গুরু গুড়-ভারেই ভারাক্রান্ত হবেন। পাঁচজন গৌরীর জন্যে পাঁচটি জাম্বো পাটালি এবং এক বোঝা নতুন গুড়ের সন্দেশ। আর সরস্বতী পুজোয় গৌরীরা নতুন শাড়ি নিশ্চয়ই পরবেন? তাঁদের কন্যা, চলমান ছোট্ট সরস্বতীরা ও ছাপকা ছাপকা হলুদ সিলকের শাড়ি পরবে। সুটকেসে না ভারতে পারলে বরানগর থেকে বালিগঞ্জ উজিয়ে আসা বৃদ্ধ গিরিরাজের চোখে প্রচ্ছন্ন বিষাদ লক্ষ করবেন। তারপর আমেরিকায় ফিরে এসে পাঁচজন গৌরীর সঙ্গে মান-অভিমান, সুতরাং এ রিস্ক নেওয়া চলে না।

এই যে সব বোঝার কথা লিখলাম, এগুলোর সঙ্গে আমাদের হার্দ্যিক সম্পর্কই বলা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছেতেই বহন করি। সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে। কিন্তু এর বাইরে অন্য একটি বোঝার কথা লিখব বলেই এতক্ষণ ধরে শিবের তথা গৌরীর গীত গাইলাম। সে হল ব্যবসার বোঝা। কড়ায় গণ্ডায় লাভজনক শর্তে ইধার কা মাল উধার হয়ে যায়। গুজরাতি, পাঞ্জাবিদের 'একচেটে ব্যবসা' বলে আর আঙুল দেখিয়ে লাভ নেই। গত কুড়ি বছর ধরে কিছু বাঙালি দু'দেশের কাসটমসের চোখে ধুলো দিয়ে ফলাও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন সুটকেস বোঝাই করে সিন্থেটিক শাড়ি, অঢেল কসমেটিক্স, সানগ্লাস, ফোল্ডিং ছাতা, পার্কার পেন, শার্ট, জিনস, স্যুট লেংথ, সোয়েটার, লেদার জ্যাকেট, ঘড়ি, ক্যামেরা, ক্যাসেট প্লেয়ার, ক্যালকুলেটর, ক্যাসিও সিনথেসাইজার থেকে শুরু করে সিগারেট, হার্ড লিকারের বোতল পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তারপর ঠিক ঠিক জায়গায় খবর দিলেই ফরেন গুডসের লোভে ক্রেতা এসে যাচ্ছে। হাতে হাতে নগদ বিদায়। বারো ডলারের চায়না সিল্কের শাড়ি বিক্রি হয়ে গেল ডবল দামে। এখানে ডিসকাউন্ট স্টোর থেকে

স্পেশাল সেলে কেনা পারফিউম বিক্রি হয়ে গেল তিনগুণ দামে। ব্যবহার করা সানগ্লাস নিয়েও নাকি কাড়াকাড়ি। ভাগ্যি এদের 'জয় বাংলার' ভিকটিম নেই।

এমনি করে দেশে পৌঁছনোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সুটকেসগুলো পর্যন্ত ভাল দামে বেচে দেওয়া গেল। এ জন্যে এরা এখান থেকে কাপড়ের ঢাকা পরিয়ে নিয়ে যায়। সুটকেসগুলোর গায়ে কালি ঝুলি লেগে গেলে খদ্দেরদের বধ করা যাবে না। দেশে যাবার সময় বেশি ডলার ভাঙানোরও দরকার হয় না, যদি চুটিয়ে ব্যবসা ফাঁদা যায়। আবার ব্যবসার মূলধন হিসেবে কিছু ডলার ভাঙাতেও হয়। তাই থেকে কেনা হল সস্তার সুটকেস আর রাশিকৃত দেশজ জিনিস। দামি দামি শাড়ি, ভারতীয় পোশাক, চামড়ার হাত ব্যাগ, শৌখিন চটি, নকল গহনা, রুপোর জিনিস, পেতল আর চন্দন কাঠের জিনিস। ভাল চায়ের প্যাকেট, র'সিলকের তৈরি নানারকম উপহার, নানা রাজ্যের হাতের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সেগুলো আমেরিকায় নিয়ে এসে বিক্রি করে দেওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। এরা যখন আমেরিকার সওদা নিয়ে দেশে যায়, তখন আত্মীয়, বন্ধুদের জন্যে উপহার দেওয়ার জায়গা থাকে না। তখন প্রত্যেকের জন্যেই 'ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল" গোছের ব্যবস্থা। একটি পঞ্চাশ সেন্টে কেনা সাবান বা চার ডলারে কেনা লিপস্টিক যদি দ্বিগুণ নামে বিক্রি করা যায়, তবে ভাই বোনেরা শুধু শুধু "ক্যামে সাবান" মেখে পয়সার শ্রাদ্ধ করবে কেন? দেশে থাকে, সিনথল মাখবে, সোজা কথা। একজন অভিনেত্রী খবর পাঠিয়েছেন সব কটা পারফিউম তাঁর দরকার। তাঁকে বিক্রি না করে পাড়ার বউদিকে "ইটারনিটি"-র কোলন দেওয়ার কোনও মানে হয়? দুনিয়ার লোক সিগারেট আশা করে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জ্যাক ড্যানিয়েলের বোতল খুলে নেশা জমাতে চাইছে। সব আশা আর নেশার ওপর জল ঢেলে দাও। লন্ডনের ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কিনে, প্লাস্টিকের থলেতে ভরে বয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কি এইসব আশাবাদী আর নেশাবাদীদের সাপ্লাই দিতে? একটু নেশা হলেই তো দেশে ফিরে আয়, দেশে ফিরে আয়—করে কান্নাকাটি। নাঃ ওসব চোখের জলের লাগল জোয়ারে সাপ্লাই দিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওই ছোট্ট দোকানটায় রেখে এলেই হবে। হাতে হাতে এসে যাবে নগদ নারায়ণ।

আবার আমেরিকায় ফিরে এসে রাতারাতি দেশের টাকায় কেনা শাড়িগুলো গায়ে ডলারের টিকিট সেঁটে দেওয়া হল। ঝুটো গয়নার গায়ে নতুন দামের টিকিট সাঁটার জায়গা নেই। তখন নোট বইতে, হিসেব রাখা হল। এরপর যে বাড়িতে পার্টি হচ্ছে, যদি ভাগ্যক্রমে সেখানে নেমন্তন্ন জুটে যায় তো সুটকেস ভর্তি বালুচরি নিয়ে উপস্থিত। ক্লাবের জলসায় সুটকেস খুলে টেবিলে বসে যাওয়াও কোনও সমস্যা নয়। বাঁশবনে ডোম রমণীরা কানা হয়ে যাবে অবধারিত। প্রচণ্ড দাম নিচ্ছে কি না ভেবে দেখার অবকাশ নেই। একটু ভাবিত হলেই সবচেয়ে সেরা শাড়িখানা বিক্রি হয়ে যাবে। এদেশে শাড়ির ব্যবসায় জাঁকিয়ে বসেছে কিছু বাংলাদেশি বাঙালিরাও। আড়াইশো তিনশো ডলারে বিক্রি করছে একটি ঢাকাই মসলিন শাড়ি। এখন এক ডলারের দাম ভারতের টাকার ২৮ অথবা ২৯ টাকা। বাংলাদেশের টাকায় কত দাম হলে একটি ঢাকাই জামদানির দাম তিনশো ডলার হতে পারে ভেবে দেখুন। পশ্চিমবাংলার শাড়ির ক্ষেত্রেও দামের বহর কিছু কম দেখি না। একটি কাঁথা স্টিচের শাড়ি বা বালুচরি অন্তত পক্ষে দেড়গুণ দামে বিক্রি হয়ে যায়। দক্ষিণ-দেশীয় সিল্ক বা

ওড়িশার সিল্কও বাঙালির 'কারবারে' চড়া দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকায় বাঙালির ব্যবসার দৌড় নিশ্চয়ই এ পর্যন্ত নয়। যাঁরা সরাসরি কোনও ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন, তাঁদের প্রসঙ্গেও এ লেখা নয়। কখনও তাঁদের বিষয়ে লিখব। এ লেখাতে শুধু সেই বাঙালির কথা লিখেছি, যারা কোনওরকম সীমা শুল্ক না দিয়েই বছরের পর বছর দেশে, বিদেশে বাণিজ্য করে যাচ্ছে। ক্রেতার অভাব কোনও দেশেই নেই। অন্য দেশের জিনিসের জন্যে আগ্রহ তো আছেই। ফলে জয়ন্ত বাগচির আটখানা সুটকেসের তাবৎ মাল, নতুন টাইপরাইটার আর ব্রিফকেস রজতের ঘাড়ে চেপে কলকাতায় গেলেও আখেরে লাভবান হবে জয়ন্ত আর সুমিত্রা। সব বেচে দিয়ে সুমিত্রা ফিরে আসবে শাড়ি আর ভারতীয় পোশাকের পাহাড় নিয়ে। সামনে দুর্গাপুজো। গৌরীরা এখন থেকেই ডলার হাতে অপেক্ষা করছে।

ইধার কা মাল উধার করা নিয়ে নানা আলোচনা শুনি। আমাদের পক্ষে প্রতি টিকিট পিছু প্লেনে দুটি মস্ত সুটকেস নিয়ে যাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। নিউ ইয়র্ক থেকে কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, কোথাও বাড়তি মালভাড়াও দিতে হয় না। ওজনের ক্ষেত্রেও চুয়াল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কেজি পর্যন্ত নিতে পারি একজন। শুধু বম্বে বা দিল্লিতে দু'দিনের বেশি ব্রেক জার্নি করলে তখন কলকাতার যাত্রীকে কুড়ি কেজির ওপরে বাকি ওজনের জন্যে মালভাড়া দিতে হয়। সেও দুটি সুটকেসের বাড়তি ওজনের জন্যে পাঁচশো-ছশো টাকার বেশি হয় না সাধারণত। মোট কথা আমরা যখন সপরিবারে যাতায়াত করি এবং এক দু'বছর অন্তত দেশে যাই, তখন সুটকেসগুলোতে জায়গার অভাব হয় না। অথচ এখানকার সংসারের উদ্বৃত্ত জিনিস স্থানীয় গ্যারাজ সেলে বিক্রি করে দিয়ে নয়তো স্যালভেশন আর্মিতে দান করে দিয়ে বাড়ি সাফ করে ফেলি। সব জিনিস দেশের মানুষের ব্যবহারে লাগে না এ কথা সত্যি। কিন্তু প্রতি পরিবার যদি অন্তত একটি সুটকেসেও উদবৃত্ত পোশাক পরিচ্ছদ, গরম জামাকাপড়, প্যাকেটের গুঁড়ো দুধ, ওষুধের কোম্পানি থেকে ভিটামিনের বড়ি, ব্যবহার করা বিছানার চাদর ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যায়, জিনিসগুলো কোনও না কোনও দুঃস্থ পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করতে পারে। আসলে সেভাবে কিছু পরিকল্পনাও তো করা হয় না। কেউ বলেন—আমাদের এত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, তাদের জন্যে জিনিস নেব না? ওতেই তো সুটকেস ভর্তি হয়ে যায়। কেউ বলেন—এখানকার জিনিস ছাড়া কোনও কিছু ব্যবহার করতে পারি না। পার্সোনাল গুডস নিতেই সুটকেস ভরে যায়। টিন এজাররা যখন যায় তাদের সঙ্গেই বরং দেখি বিলাসিতার জিনিস কম যাচ্ছে ইদানীং। কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের চিন্তাধারায় হঠাৎ বাহুল্যতা বর্জনের ছোঁয়া লাগে। 'যস্মিন দেশে যদাচার' বোধে ওরাই বোঝা নেয় অনেক কম। সামান্য কয়েক প্রস্থ পোশাক নিয়ে ছুটি কাটাতে চলে যায়। অথচ আমরা বোঝা নামাতে পারছি না। ফর্দ মিলিয়ে ধনী আত্মীয় বন্ধুদের জন্যে প্রতিবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই ধরনের উপহার কিনে নিয়ে যাচ্ছি। ব্লেন্ডার, টেপ রেকর্ডার, ঘড়ি, কলম, সিনথেটিক সিল্ক আর শিফন জর্জেটের সঙ্গে যাবতীয় শৌখিন জিনিস সুটকেসে উঠছে। তাদের প্রয়োজন নেই। তবু নিয়ে যাচ্ছি। কারণ দেওয়া এবং পাওয়া দুই-ই আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। নিজেদের ব্যবহারের জন্যে যত জিনিস সঙ্গে নিচ্ছি, তার অর্ধেকও ব্যবহার করছি না। বহুমূল্য কতগুলো শাড়ি, তার সঙ্গে

মানানসই ব্যাগ আর জুতো অকারণ বাক্সবন্দি হয়ে সাত সমুদ্র তেরোনদী পার হচ্ছে আবার স্বস্থানে ফিরে আসছে। দেশের ওষুধপত্রে ভরসা হারিয়েছি। সম্ভাব্য সবরকম রোগের দুশ্চিন্তার সঙ্গে হাজার রকম ওষুধ নিয়ে চলেছেন কেউ। আবার সে সব বগলদাবা করে ফিরে আনছেন। এলোপাথাড়ি ওষুধ বিলোতে চাইলেও আন্দাজে নাম না জানা ওষুধ খাবে কেন দেশের লোক? গায়ে পড়ে বাড়ির বুড়ি-রাঁধুনিকে হাড়ের জোর বাড়ানোর জন্যে দেওয়া হল খুব দামি ওষুধ ক্যালট্রেট। তাতে নাকি প্রচুর ক্যালশিয়াম। সে এমন বেঢপ সাইজের পেট মোটা ট্যাবলেট যে হাড়ের জোর বাড়াতে গিয়ে বুড়ি শেষে গলায় আটকে মরে আর কি? বুক চেপে ধরে কাকুতি মিনতি—না দাদাবাবু, ও বড়ি গিলবোনি আর।

এইসব রাজ্যের অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে আমাদের পারাপার চলছে। ফেরার সময় সঙ্গে আনছি অতিরিক্ত দেশের বাজার। যার অর্ধেকও পরে আর ব্যবহার করা হয়ে উঠছে না। সুটকেস খালি যাবে, এই দুশ্চিন্তায় দু'পর্বেই কী অপব্যয়! যারা এই মওকায় আমদানি রপ্তানির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে ইধার কা মাল উধার করার উদ্দেশ্য তো রীতিমত স্পষ্ট। বাড়তি রোজগারের জন্যেই এতরকমের মাল টানাটানি। কিন্তু আমাদের যাত্রাই বা এমন উদ্দেশ্যবিহীন হবে কেন? বছরে দশ হাজার বাঙালি যদি আমেরিকা থেকে কলকাতা বেড়াতে যায়, তবে সেই কুড়ি হাজার সুটকেসে দেশের দুঃস্থ মানুষদের জন্যে অন্তত কিছু জামাকাপড় ভরে নেবার জায়গা দেওয়া যায় না? সবই তো ব্যবহার করা পুরনো জিনিস। স্যালভেশন আর্মিতে দান করার বদলে শুধু একটু সঙ্গে গুছিয়ে নেওয়া। তবু ইধার কা মাল উধার করার একটা মানে হয়। পারাপারের সামান্য উদ্দেশ্য থাকে।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

প্রবাসে সফল বাঙালি

বেশ কয়েক বছর ধরে আমেরিকার নানা ভারতীয় সম্মেলনে গিয়ে লক্ষ করেছি— আমাদের অভিবাসী সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে সব কথিকা পাঠ, আলোচনাচক্র ইত্যাদি হয়ে চলেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রসঙ্গ। নারীসমাজও যথাযথ ভাবে আলোচিত বলা যায়। সে তুলনায় পারিবারিক এবং বৃহত্তর সাংসারিক পটভূমিতে অভিবাসী পুরুষের জীবন নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা শোনার সুযোগ হয়নি। উত্তরসুরি প্রসঙ্গে পুরুষ অবশ্য এসেছেন। সে শুধু অভিভাবক অর্থাৎ একটি মাত্র ডায়মেনশনের মধ্যে দিয়ে। সেই পরিচয় ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে, সমাজে, সংসারে তাঁর কিছু বৃহত্তর ভূমিকা থেকে যায়। আলোচনার বিষয়বস্তু হবার মতো উপাদান অভিবাসী পুরুষের জীবনে নেই, অথবা সেই অর্থে বড়মাপের সমস্যা, সুখ, দুঃখ বিশেষ কিছুই নেই, অতএব আলোচনা, পর্যালোচনার মধ্যে এনে খতিয়ে দেখার প্রশ্ন ওঠে না—এমন অসম্পূর্ণ চিন্তা তো সম্ভব নয়। যাই-ই হয়ে থাক আমাদের অনবধানের কারণ, এ বিষয়ে পুরুষের নিজেরও কিছু

দায়িত্ব থাকার কথা। সম্ভবত আবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা থেকে হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্ক এবং মননের চর্চাতে তাঁরা স্বস্তিবোধ করে থাকেন। অভিবাসী জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য, নৈরাশ্য, জাতীয় তাবৎ অনুভবকে প্রকাশ্য আলোচনার বিষয়বস্তু না করে তাঁরা সভা সমিতিতে আসেন অন্যান্য বক্তব্য নিয়ে। বাঙালির ঐতিহ্য, কিংবা কলকাতা তিনশো বছর, নয়তো আমেরিকায় অবসরপ্রাপ্ত জীবনে সোশ্যাল সিকিউরিটির সুবিধা ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে আনেন। অতএব এবং তথ্য সমৃদ্ধ এই সব লেখা তাঁদের অধ্যবসায়ের পরিচয় বহন করে আনে। কেবল আনে না তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের খবর।

অথচ সাহিত্যের চেয়ে জীবন বড়—এমন কথা লিখেছিলেন সমরেশ বসু। প্রবাসীর চিঠির জন্যে অভিবাসী বাঙালি পুরুষ প্রসঙ্গে কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেইসব ব্যক্তিগত ভাবনার ওপর ভিত্তি করে এবারের লেখা। তবে এ লেখায় শুধু সন্তান হিসেবে তাঁদের ভূমিকার কথাই উল্লেখ করেছি।

একজন বলেছিলেন—আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালি ছেলেরা দেশের আত্মীয়স্বজনের কাছে সোনার ডিম পাড়া হাঁস। মন্তব্যটি শ্রুতিমধুর নয়। তবু আংশিকভাবে সত্য। সত্তর দশকের শুরুতে অভিবাসন নিয়ে আসা বহু বাঙালি ছেলে তাঁদের দেশের আত্মীয়স্বজনের কাছে আর্থিক প্রয়োজনে মুশকিল আসানের ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন। এঁদের উপার্জনের অর্থে দেশের পরিবারগুলি মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত হয়েছেন। যাঁরা উচ্চবিত্ত ছিলেন, তাঁরাও অধিকন্তু ন দোষায় বিবেচনায় জীবনযাত্রার মান আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

সেই রসদের জোগান দেওয়া কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না। এদেশেও ডলার উপার্জনের পথ তেমন প্রশস্ত নয়। বিশেষ করে বিদেশে আসার পর প্রথম পর্যায়ে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকার কারণে এবং এ দেশের চাকরির জগতে অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন অনেক ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকেই বাধ্য হয়ে দোকানে বাজারে, ব্যাঙ্কে, সাধারণ চাকরি নিতে হয়েছিল। সিকিউরিটি গার্ডের কাজ, পোস্ট অফিসের পিওনের কাজ কোনও কিছুই বাদ যায়নি। নিজেদের শিক্ষা আর পেশাগত যোগ্যতার সঙ্গে সে সব চাকরির আদৌ কোনও সম্পর্ক ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের পড়াশোনা চালানোর খরচ, দেশে বাবা মায়ের সংসারের দায়িত্ব, নিজের সংসার—সবদিক সামাল দিতে গিয়ে অনেকে দিনে, রাতে দুটি করে চাকরি করেছেন বহু বছর। বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে স্ত্রীদের পক্ষেও তাদের রেখে কাজ করতে যাওয়ার অসুবিধে ছিল। কখনও দুজনে সময় ভাগাভাগি করে ছেলেমেয়ে দেখতেন। স্বামীর দিনের বেলা চাকরি তো স্ত্রীর সন্ধেবেলায় কোনও দোকানে, নয়তো হাসপাতালে বা সিনিয়র সিটিজেন হোমে কাজ করতে যাওয়া। আমেরিকায় খাবার দাবারই যা সস্তা। বাদবাকি সবই তো খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। এদেশে থাকতে গেলে মোটামুটি একটু ভদ্রগোছের জীবনযাত্রাও চাই। কতদিন আর আজেবাজে পাড়ায় ভাঙাচোরা অ্যাপার্টমেন্টের দেড়-দু'খানা ঘরে, নয়তো খরচ বাঁচাতে মাটির তলায় বেসমেন্টের অ্যাপার্টমেন্টে মাথা গুঁজে থাকা যায়? ব্যবহৃত আসবাবপত্রের দোকান থেকে খাটবিছানা কিনে এনে শোওয়া, জং ধরা জগদ্দল মার্কা পুরনো গাড়ি চড়া আর দেশে বেড়াতে যাবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে খরচের কথা ভেবে বছরটাকে পিছিয়ে দেওয়া। এইসব

দিন যখন গেছে, তখনও তাঁরা দেশের আত্মীয়দের কাছে প্রকৃত অবস্থা জানাননি। চাকরির নিরাপত্তা নেই, পৃষ্ঠবল নেই, সঞ্চিত অর্থবল নেই, তবু প্রকৃত সমস্যা জানাতে দ্বিধা ছিল। লজ্জার প্রশ্ন ছিল হয়তো। তারই সঙ্গে ছিল দূরে থাকা নির্ভরশীল মানুষগুলিকে অকারণ দুশ্চিন্তার ভারে ভারাক্রান্ত না করার চেষ্টা।

তবে এ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যাঁরা সৌভাগ্যবান, তাঁরা গোড়াতেই ভাল সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। এই সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামিল হননি। আর যাঁদের বড় অসময় গেছে, তাঁরাও কয়েক বছরের লড়াই-এর পরে সুদিনের সুখ দেখেছেন।

এখন এদেশে এবং স্বদেশে এঁদের পরিচয় সফল মানুষ হিসেবে। এখানে যেমন যেমন সচ্ছলতা এসেছে, ওখানেও তেমন তেমন প্রভাব পড়েছে। দেশে স্বল্পবিত্ত বাবা যা পেরে ওঠেননি, ছেলে তাঁর মায়ের আশা পূর্ণ করতে তাই-ই করেছেন। কেউ বাড়ি করে দিয়েছেন। কেউ ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। আমেরিকা থেকে সোনার কয়েন কিনে নিয়ে গিয়ে মায়ের গলার চওড়া হার থেকে শুরু করে রেফ্রিজারেটর রান্নার গ্যাস, ইনভার্টার, রঙিন টিভি, ভি. সি. আর., পুরনো গাড়ি—যে যেমন পেরেছেন রাতারাতি দেশের বাড়িঘরের ভোল পালটে দিয়েছেন। এমন অনেক মানুষ এদেশে আছেন, যাঁদের সম্বল বলতে ছিল শুধু মেধা আর উদ্যম। ধারের টাকায় প্লেনের টিকিট কেটে আর প্রথম পর্বে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে সামান্য ডলার কিনে এঁরা বিদেশে এসেছিলেন।

তারপর ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। বাবা মাকে আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছেন। নকশাল আন্দোলনের পর হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাইকে খুঁজে পেতে এনে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রিনকার্ড পাইয়ে দিয়েছেন। আবার লেখাপড়া শেষ করিয়ে চাকরিতে ঢুকিয়েছেন। গ্রিনকার্ডের দৌলতে বোনেদের ভাল বিয়ে দিয়েছেন। তাদের বরেদের কাছে আমেরিকা আসা ছিল বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত অভিযান। এছাড়াও এঁরা দীর্ঘকাল ধরে নানা ভাবে বৃহত্তর পরিবার প্রতিপালন করে চলেছেন। কেউ কর্তব্যবোধে, কেউ চাহিদার জোগান দিতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এঁদের কাছে প্রত্যাশাও যেন অতিরিক্ত হয়ে উঠেছে। তা পূরণ না করলে ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে। কোনও কোনও গৌরী সেন ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। বাবা, মা ভাইবোনের প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম মানুষটির জীবনে তথাকথিত সফলতায় খাদ মিশে গেছে।

নিউ ইয়র্কের অমিয় সেনের মা দেশে ক্যানসারে মারা গেলেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। অমিয় দেশে শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে শুনলেন মাকে কী সেবাই করেছেন তাঁর বোনেরা এবং ভাইদের স্ত্রীরা। সন্তানের উপযুক্ত কাজ বলতে যা বোঝায়, সে তাঁরাই করেছেন। রাতে অমিয় স্ত্রীর কাছে ফিসফিস করে অনুযোগ করলেন,—'তুমি যদি ওই সময় মাসখানেকের জন্যও চলে আসতে, তবে মা একটু সেবা পেয়ে যেতেন।' স্ত্রী বললেন—'বাচ্চাদের ফেলে কী করে আসতাম? ওদের স্কুল ছিল না? সেবাই না হয় করতে পারিনি। এতদিনের অসুখের সমস্ত খরচ কে চালাল? কম টাকা পাঠাইনি আমরা। ওরা তো শেষে দু বেলা নার্সও রেখেছিল।' স্বামীকে নিরুত্তর দেখে আবার বোঝালেন—'সামর্থ দিয়ে না করলেও অর্থ দিয়ে তো করেছি।'

অর্থ বড় না সেবা বড়—এই দ্বন্দ্বে রাত ভর জেগে থাকলেন অমিয়।

একবছর পরে অমিয় জানতে পারলেন—মা তাঁর উইলে অমিয়কে বাড়ির অংশ দেননি। তাঁর অনেক আছে এবং দেশে ফিরবেন না—এই যুক্তিতেই বঞ্চিত করেছেন। অমিয়র স্ত্রী বা মেয়েদের গয়নাগাটি দেবার তো প্রশ্নই নেই। প্রথমটা খুব অভিমান হয়েছিল। সম্পত্তির ভাগ পাওয়াটা বড় কথা নয়। সত্যি কি আর তাঁর মেয়েরা দমদমের ওই বাড়িতে গিয়ে থাকবে কোনওদিন? কিন্তু বাড়ির বড়ছেলের নিজের থাকবার অধিকারটুকুও মা কেড়ে নিলেন? ওই বাড়ি তিনতলা করার সময় অমিয় বাবাকে কম ডলার পাঠিয়েছিলেন? বাড়ি মেরামত করতেও সমানে টাকা দিয়েছেন। কেউ তাঁর কথা ভাবলেন না। যে সংসারের জন্যে সারাজীবন চিন্তা করলেন, সেখানেই এই প্রতিদান? এখন দেশে গিয়ে জোর করে ঘর দখল করে থাকারও প্রবৃত্তি হয় না। সেখানে তাঁর দাবি করার মতো কোনও কিছুই নেই। ওই সংসার তাঁকে উদ্বৃত্ত মনে করে বসতবাড়িতে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছে—এই দুঃখই বড় হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে।

আরও কত ঘটনা আছে। সফল মানুষ হয়ে ওঠার যাবতীয় সম্ভাবনা সত্ত্বেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বেঁচে আছেন হার্লেমের নিশীথ মুখার্জি। খড়গপুর আই. আই. টি.-র ভাল ছাত্র ছিলেন। মানসিক চিকিৎসকের বিচারে উন্মাদের পর্যায়ে না পড়লেও নিশীথের আশু চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। দরিদ্র কালোদের পাড়ায় একটি অ্যাপার্টমেন্টে সব সময় দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকেন। সহজে টেলিফোন ধরেন না। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ওঁকে ঘরের বাইরে এনে কিছু বোঝানো যায় না। চাকরি জীবনে হতাশ হয়ে, নানা ব্যর্থতায় এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নৈরাশ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে এঁকে চিকিৎসা করানো বা দেশে ফেরত পাঠানো, কোনও কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী একেবারে নিকট আত্মীয় ছাড়া কেউ এই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী নন। কালো প্রতিবেশীদের মতে যেহেতু নিশীথ বিপজ্জনক মানুষ নন, তাঁকে জোর করে কোথাও পাঠানো যাবে না। শুনেছি তাঁর মা এসেও নিরুপায় হয়ে ফিরে গেছেন। এই সব পেয়েছির দেশে বিষাদগ্রস্ত বাঙালির আত্মহত্যার ঘটনাও বিরল নয়।

এদেশে আছেন এক সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালি। চাকরি বাকরি ভালই করেন। সে অর্থে সফল মানুষ নিশ্চয়ই। কিন্তু পূর্ণ সাফল্যে বাদ সাধছেন তাঁর বিধবা মা। নিঃসঙ্গ এই মানুষটি আর একা একা দেশে থাকতে চাইছেন না। অসহায় পেয়ে বাড়িওলা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। উঠে যাবার তাগাদা দিচ্ছেন। প্রায়ই জল কল বন্ধ অবস্থা। কিন্তু ছেলে মাকে নিয়ে আসার ব্যাপারে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত। সবচেয়ে অস্বস্তিতে পড়েন তাঁরা, যাঁরা দেশে গিয়ে ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হন। নিজস্ব আশ্রয় নেই, অন্য কোনও ছেলে মেয়ে নেই, নিঃসম্বল সেই মা বারবার তাঁদের বলেন—'খোকা কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না? বাবা মারা যাবার খবর পেয়েও তো খোকা এল না...আমার যে খোকা ছাড়া কেউ নেই।'

যাঁরা এসব কথা শুনে এখানে ফিরে আসেন, তাঁরা কেউ কেউ খোকাকে প্রশ্ন করেন। খোকা চিন্তিত মুখে বলেন—'মার কি আমেরিকায় ভাল লাগবে? সোশ্যাল আইসোলেশনটাই বিরাট প্রবলেম!'

এমন আছেন আরও এক আধজন। কর্ম জীবনে, দাম্পত্য জীবনে এমনকি সামাজিক জীবনেও তাঁদের সাফল্যের প্রতিমূর্তি বলে চিহ্নিত করা যায়। অথচ দেশের আত্মীয়স্বজনের

সঙ্গে বিশেষ সংযোগ নেই। অতীতকে এক রকম মুছে ফেলেছেন। হারিয়ে যাওয়া ছেলের খোঁজ খবর চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন হেমন্তকুমার মিত্র মজুমদার নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী তখন রোগশয্যায়। আমি ছেলের ছবি দেখে চিনতে পারিনি। শুনেছি বাড়ির ওপর রাগ করে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করছেন। জানি না, সেই বৃদ্ধ আজও ছেলের সন্ধান পেয়েছেন কিনা। কলকাতার মার্কিন কনসুলেটে ছেলের ছবি হাতে করে এসেছিলেন আরও একজন, যদি সেখানে কোনও খবর পাওয়া যায়, এই আশায়।

তবে আমাদের অভিবাসী বাঙালি সমাজে অধিকাংশ মানুষই প্রয়োজনবোধে দুই দেশের দুটি সংসারের ভারসাম্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। চাকরিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, অর্থের প্রাচুর্য আছে, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কাছে ভালবাসা, শ্রদ্ধা পেয়েছেন বলে মনে করা সত্ত্বেও এঁরা দেশের ফেলে আসা সংসারটির কথা বিস্মৃত হতে পারছেন না। দুই দেশের জীবনযাত্রার মানের এমন পার্থক্য যে সাধ্যমত সাহায্য করার পরেও নিজেদের প্রাচুর্য মাঝে মাঝে অতিরিক্ত মনে হয়। এর ওপর আছে দীর্ঘ অদর্শনের দুঃখ। কোথাও তাঁর থাকার প্রয়োজন ছিল, কোথাও তাঁর আরও কিছু দায় এবং দায়িত্বেরও প্রতিশ্রুতি রাখার কথা ছিল এবং একদিন ফিরে যাবারও কথা ছিল। এই সব অলিখিত শর্তের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে এঁরা নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে জীবনের সফলতার মাপজোক করে চলেছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই ছাইচাপা অহংকার, প্রচ্ছন্ন আত্মশ্লাঘা মাথা লুকিয়ে ফেলেছে। অনেক করলাম, অনেক দিলাম—এই ভাবনাটাই ক্রমশ লজ্জা দিতে শুরু করেছে। কে করে না? কে দেয় না? নেহাত অমানুষ না হলে কে তার আপনজনকে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে ফেলে রাখে? দেশে থেকে দু'বেলা লড়াই করে বড় সংসার চালাচ্ছে যারা, তাদের কৃতিত্ব বেশি? না আমার? আমি তো সব ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থেকে দূরে এসে গা বাঁচিয়ে বসে শুধু অর্থ দিয়েছি। তারা অর্থ, সামর্থ্য, পুঁজি, সময়, সবকিছু নিঃশেষ করে সংসারের নিত্য চাহিদার যোগান দিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, আমি ডলারের হিসেবে বাড়িতে লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছি। কিন্তু সে ওই টাকার হিসেবে তিল তিল করে বোনের বিয়ের দেনা শোধ করেছে। বাবা মায়ের কঠিন রোগের চিকিৎসা করেছে। কলকাতায় বাড়ি করার স্বপ্ন দেখতে নেই জেনে শহরতলিতে ঘুরে ঘুরে জমি দেখেছে। এর ওপর আছে তার নিজস্ব পরিবারের ভবিষ্যৎ। আমি বিদেশে আত্মীয় এবং শৈশবের বন্ধুবান্ধব বর্জিত হয়ে শুধু আমার ছোট্ট পরিবারের গণ্ডির মধ্যে বসে আছি। সে আছে সকলের সঙ্গে। আত্মীয়, পরিজন, প্রকৃত বন্ধু এবং শাখাপ্রশাখা নিয়ে তার বেঁচে থাকা। আমি দেশে গেলে আমার পিসিমা জলখাবারের প্লেটে ছুরি, কাঁটা না দিতে পেরে অপ্রস্তুত হয়ে যান। দামি উপহার কোলে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন। অথচ সে খোঁজখবর না করলে অভিমান করেন। তার ওপর প্রত্যেকের কী অবাধ অধিকার! আমার কেন সেই জোর নেই? কে বেশি ভাগ্যবান? সে, না আমি? সে প্রিয়জনের রোগশয্যার পাশে থাকবে, হয়তো মৃত্যুর সময় শিয়রে দাঁড়াবে। শেষকৃত্যের সব দায় একাই বহন করবে। আমি ট্রাঙ্ককলে খবর পাব। যখন গিয়ে পৌঁছব, সে বলবে—'তোমাকে বড় দেখতে চেয়েছিলেন...'।

২৩ জানুয়ারি ১৯৯৩

এ বি সি ডি

"ফর ভাইফোঁটা, আই হ্যাড টু সিট হাঁটু গেড়ে।"..."আরে বাবা, হোয়াটস দ্য প্রবলেম? আই নো হাউ টু সিট বাবু হয়ে।"

দিল্লি, বম্বে, কলকাতার বিশেষ অঞ্চলের বাঙালি টিন এজারদের বাক্য রচনা সম্পর্কে এই সব গল্প শুনি। বাংলা গল্পের বই, বাংলা গানের বিষয়ে তাদের আগ্রহ কমে আসছে। আর এও জানি, তারা আমেরিকার বাঙালি ছেলেমেয়েদের নাম দিয়েছে—এ বি সি ডি। 'আমেরিকান বর্ন কনফিউডজ্ দেশি'। ভাষাগত কনফিউশনকে ধরেনি বোধহয়!

দেশে, বিদেশে বাঙালির ভাষা বিপ্লবের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে কত পরিচিত শব্দ, বাগবৈশিষ্ট্য। প্রবচন আর সম্পর্কজনিত সম্বোধন। যা কিনা একান্তভাবে বাঙালিরই ছিল। বাঙালি টিন এজারদের খিচুড়ি ভাষা নিয়ে সমালোচনার আগে নিজেদের অবস্থাটা কেমন দেখা যাক। ভুনি খিচুড়িতে আমরাও বেশ নাম কিনেছি।

মিশ্র ভাষায় আমরা ভারী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। চাকরি, বাকরি, রাজনীতি, আমেরিকা, ভারত, সোমালিয়া, তসলিমা নাসরিন, ভূমিকম্প, অসুখ, বিসুখ, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি যে আলোচনাতেই যাই, ইংরেজি শব্দ বাদ দিতে পারি না। টেনশনকে "উদ্বেগ" আর সিজনকে "ঋতু" বললে কবিদের ভাষা বলে মনে হয়। লাইফ স্টাইলকে "জীবনযাত্রা" বললে তো হয়ে গেল রচনা লেখার হেডিং। দেখুন, "শিরোনাম"-ও শিরে এল না। এই তো অবস্থা। আপনি কি কানে পুঁজ জমলে লোকসমাজে বাংলায় স্বীকার করবেন? ঝন্‌ঝনানির মধ্যেই ফিশ্‌ফিশ্ করে বলবেন—"ইনফেকশন"। ওই একটি ইংরেজি শব্দ বহু অবাঞ্ছিত চর্মরোগকেও স্টাইলের সঙ্গে বলিয়ে দিচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই সংক্রামক আর কি!" "অন্তরে অন্তরে রক্ত ঝরে"—জীবনে একবারও বলেছেন? "ইন্টারন্যাল ব্লিডিং" আর "হেমারেজ" থাকতে কে বাজে বকে? রোগীর বাড়ির লোকই আশ্চর্য হয়ে তাকাবে। আকছার শুনি—"হাইপার অ্যাসিডিটি।" এরপর হয়তো শুনব "সুপার অ্যাসিডিটি"। কী ছিমছাম বর্ণনা। তা না, দেখা হলেই বুকের ভেতর জ্বলে যায়। গলার মধ্যে পুঁটলি পাকায়, টক জল, চোঁয়া ঢেকুর, চোরা অম্বল—অম্লজানবাষ্পের সুদীর্ঘ ইতিহাস।

এসব কারণেই ইংরেজি আমাদের স্বস্তি দেয়। দৈহিক বর্ণনা দেওয়ার সময়ও তাই। লিখতে বসে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়ে যাই। "এইডস" প্রসঙ্গে সমকামী পুরুষ সমাজের যৌন অভ্যাস নিয়ে "পরিবর্তনে" একবার লিখেছিলাম। বাংলা প্রতিশব্দ কলমের ডগায় আনতে রীতিমত ভাবতে হচ্ছিল।

যাই হোক, দেশে, বিদেশে বাংলার বদলে ইংরেজির ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বাক্য গঠনের মধ্যে সেই আরোপ লক্ষ করা যায়। আমার অনেক বন্ধু বলেন—ছেলেমেয়ে কলেজ থেকে আসবে বলে লুক ফরোয়ার্ড করছি। বলেন না—অপেক্ষায় আছি। কারও বৃদ্ধা মাকে দেখে বলেন—শি ইজ সো সুইট! বলেন না—ভদ্রমহিলাকে এত ভাল লাগল। সব মাসিমারাই এখন মিষ্টি মামি। আপনি বলেন না যে—ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না? এখানে শুনি কিছুই ফোরসি করা যায় না।

তবে এখনও আমেরিকার অধিকাংশ বাঙালি ছুটির দিনের আড্ডায় বাংলাতেই গল্প-গুজব চালিয়ে যান। নিজেদের সমাবেশে অকারণ ইংরেজি বলার প্রবণতা তেমন নেই। সারা সপ্তাহের কাজের ভাষাকে এঁরা আর ছুটির দিনের আসরে টেনে আনতে চান না। অথচ দেশে গেলে অনেক পার্টিতেই দেখেছি বাঙালিরা নিজেদের মধ্যে সর্বক্ষণ ইংরেজি বলে যাচ্ছেন। তাঁদের বাংলা বলা নিয়ে সমস্যাটা কোথায়, জানতে হলে আবার বোধহয় সেই ঔপনিবেশিক শাসনের অজীর্ণের প্রতিক্রিয়ার কথাই বিবেচনা করতে হয়।

এখানে এক মহিলার বেশ গর্ব যে, তিনি কলকাতার কনভেন্টে পড়েছিলেন বলে বাংলা শেখার দরকার হয়নি। বয়স মধ্য চল্লিশ। যে সময় দক্ষিণ কলকাতার বাঙালি পাড়ায় বড় হয়েছিলেন, সে সময় ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়া বহু মেয়ে তাঁর তুলনায় ঢের ভাল বাংলা জানত। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে ইনি নিজেকে বেশ স্বতন্ত্র মনে করেন। সম্প্রতি এক হাস্যকর ঘটনা ঘটে গেল। এক ভদ্রলোক দিল্লিতে গিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে এলেন। ফিরে আসার পর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে বললেন—আমেরিকায় বড় হওয়া মেয়ে যে আদৌ 'কুমারী' হতে পারে, এই অশ্রুতপূর্ব তথ্য আবিষ্কারের পরে তাঁর জামাই নাকি অভিভূত! ভদ্রলোকের শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের প্রবণতা কিছু প্রবল থাকার কারণে তিনি নিজের কন্যা সম্পর্কেই বন্ধু মহলে "অক্ষত যোনি" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। স্নেহ অতি বিষম বস্তু হলে যা হয়। এই নিয়ে বিস্তর কানাকানি চলল। ঘটনাচক্রে সেই বাংলায় দুর্বল মহিলারও কানে গেল। এমন কঠিন কথা তিনি জন্মে শোনেননি। মানে বোঝার জন্যে অনুবাদিকার সাহায্য নিলেন। এত কাল এত ভাল ভাল বাংলা শব্দ তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেও মর্মস্পর্শ করেনি। যে জন্যে পুনর্ব্যবহারের প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু এই কঠিন শব্দ তাঁকে বড় নাড়া দিয়ে গেল। বেশ কিছুদিন পরে একটি পার্টিতে মহিলাদের কাছে কবুল করলেন—আমি এখন অনেক বাংলা জানি। ক্যান ইউ বিলিভ, অসীম বাসু নিজের মেয়েকে বলেছে "একান্নবর্তী"। জাস্ট্ থিংক অফ ইট! নিজের মেয়ের ভার্জিনিটি নিয়ে ডিসকাস করছে! উইথ আদার পিপল...।

সবাই অবাক। "একান্নবর্তী"-র সঙ্গে ভার্জিনিটির কী সম্পর্ক? অসীম বাসু আর কত বাজে বকবে? আমেরিকায় আবার কোন বাঙালির একান্নবর্তী সংসার? একটা, দুটো বাচ্চা, একা একা মানুষ হয়। জয়েন্ট ফ্যামিলির কী জানে ওরা? দেশেই এখন ও সব সিসটেম চলে গেছে...।

বঙ্গ বিশারদ একটু দমে গেলেন। রস পরিবেশনে ত্রুটি হল নাকি? আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না যে? উলটে সবাই জয়েন্ট ফ্যামিলি নিয়ে লেকচার দিচ্ছে। শেষে জেরার ফলে জানা গেল—কিছুদিন আগে "একান্নবর্তী" শব্দটা তিনি অন্য কোনও সূত্রে শিখেছেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের দুর্মর আগ্রহে প্রয়োগে গোলমাল হয়ে গেছে। আমরা তাঁকে বলে দিয়েছি—ওঁর দুটো "সংগ্রহ"-ই এ যুগে বিশেষ কাজে লাগবে না। যখন তখন স্মরণ করার দরকার নেই।

আমাদের সময়, প্রবাসী বাঙালিদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বাংলা পড়তে, লিখতে না পারার প্রভূত উদাহরণ ছিল না। অন্তত মেয়েদের শিখতে হত। হয়তো বিয়ের কারণে মেয়েদের অন্য রাজ্যে থাকার সম্ভাবনার কথাও ভাবা হত। আমার বড় জ্যাঠামশাই কর্মসূত্রে

বরাবর দিল্লিতে থেকেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা সেখানেই বড় হয়েছে। জ্যাঠতুত বোনেরা ভালই বাংলা লিখতে, পড়তে পারত। লেডি আরউইন স্কুলে পড়ত। শুধু ভাইদের মধ্যে একজন পড়েছিল দিল্লির মডার্ন স্কুলে। বাংলা ভাল লিখতে জানত না। যে জন্যে আমাদের সেই "ছোড়দাকে" কম উত্যক্ত করা হত না। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে ছোড়দা কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিল। দিল্লিতে তার বাবাকে ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখত। কিন্তু মার বোধহয় 'আদেশ' ছিল—তাকে বাংলাতেই লিখতে হবে। ছোড়দার সেই অধ্যবসায় ভুলিনি। বানান জিজ্ঞেস করে করে মাকে চিঠি লেখা। "শ্রীচরণেষু"-তেই প্রথম ধাক্কা! কিন্তু চালিয়ে তো যেত। এখন শুনি ছেলেমেয়েদের অপ্রয়োজনীয় জিনিস শেখার সময় নেই। এতই তাদের অন্যান্য চাপ। ছোড়দা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত, হস্টেলে থেকে ক্রিকেট, হকি, সব টিমে খেলত। জিমখানার পাণ্ডা ছিল বলা যায়। হিন্দি সিনেমার পোকা। মনে আছে "প্রফেসর" দেখে "কল্পনা"-র জন্যে পাগল! তা যত হুজুগই তার থাক, শনি-রবিবার বাড়ি এলে মার জন্যে বাংলা চিঠির মুসাবিদা নিয়ে বসত।

এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের বাড়িতে গৃহদেবতার কাছে আম উৎসর্গ না হলে আম খাওয়া শুরু করা যেত না। সেই পুজো হয়ে যাবার পর, ঠাকুরমার নির্দেশে আমরা বিদেশে থাকা বাবা, জ্যাঠা, কাকাদের সুসংবাদটি লিখে দিতাম। তারপর তাঁরা আম খেতেন। একবার 'আম উৎসর্গের' দিন কলেজ থেকে ছোড়দা এল। প্রচুর আম টাম খেয়ে আমাদের দেখাদেখি দিল্লিতে চিঠি লিখতে বসল। ভীষণ তাড়া। ঝটপট কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লিখে চিঠিটা আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বলে গেল—আমের পাশে গ্যাপ রেখেছি। ওই কথাটা লিখে দিবি।

দেখলাম লিখেছে—আম...হয়েছে। কী যে দুর্বুদ্ধি মাথায় এল! চিঠিটা ওইভাবেই ডাকে দিয়ে দিলাম। কিছুদিন পরে জেঠিমার রাগান্বিত পত্রাঘাত—শংকর যে কী লিখেছে...আম উৎসর্গ হয়েছে কিনা জানাস।

সব শুনে ছোড়দার কী রাগ। আমাকে শাসাতে লাগল—তোর জন্যে মা, বাবার আম খেতে দেরি হয়ে গেল।

পারিবারিক ঘটনার কথা এ জন্যে লিখলাম যে, সে সময়ে মায়েদের চাপে পড়েও ছেলেমেয়েদের বাংলা লিখতে হত। এখনকার মায়েরা ভাল ইংরেজি লেখেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাংলায় চিঠি লেখার লোক নেই। তারাই বা কাকে লিখবে?

আমেরিকাতে বাংলা বলা নিয়ে আরও বেশি সমস্যা। এ প্রসঙ্গে আগেও লিখেছি। বাড়িতে বাংলা কথাবার্তা বলার জন্যে বিশেষ চেষ্টা না করলে, ছেলেমেয়েদের পক্ষে ওই অভ্যাস হওয়া অসম্ভব। শিশুকাল থেকে বেবি সিটার আর ডে কেয়ার সেন্টার, তারপর দিনের মধ্যে ছ'-সাত ঘণ্টা করে স্কুল ও অন্যান্য জিনিস শেখা—ছুটির দিনেও নানা প্রোগ্রাম। বাংলা শেখানো নিয়ে বাবা, মার-ও নানা যুক্তি তর্ক শুনেছি। প্রথমত ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠে না। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে যখন সকলে একত্র হল, সে সময় ওই দু-তিন ঘণ্টার জন্যে ভাষা আন্দোলনে নামার ইচ্ছে হয় না। তার চেয়ে রবিবারের বাংলা স্কুলে দেওয়া ভাল। দলে পড়ে তবু কিছু শিখবে। একদল বলেন—বাংলা বলা, না বলায় কিছু এসে যায় না। ওরা জন্মসূত্রে আমেরিকান। ওদের 'আমেরিকান' হতে দেওয়াই ভবিষ্যতের পক্ষে

নিরাপদ। আরও একদল আছেন। তাঁদের বক্তব্য—ছোটদের পক্ষে একাধিক ভাষা শেখা অনেক সহজ। একেবারে শিশুকাল থেকে বাড়িতে বাংলায় কথাবার্তা বলার অভ্যাস করিয়ে দিলে, কলেজে গিয়েও তারা বাংলা ভোলে না। এশিয়ান কমিউনিটিতে অন্যান্য এথনিক সম্প্রদায় যদি দ্বিতীয় প্রজন্মকে নিজেদের ভাষা শেখাতে পারে, বাঙালির অসুবিধে কোথায়? স্কুলে বাঙালি ছেলেমেয়েরাই স্প্যানিশ কোর্স নিচ্ছে, ফ্রেঞ্চ কোর্স নিচ্ছে। সে সব শিখছে কীভাবে? প্রয়োজনে লাগবে এই বিবেচনায়? বাংলা ভাষাকে শুধু অপ্রয়োজনীয় ভাবা হচ্ছে কেন? গুজরাতিরা বোর্ড অফ এডুকেশনে আবেদন করে গুজরাতি অধ্যুষিত শহরের আমেরিকান পাবলিক স্কুলে গুজরাতি ভাষা শেখানোর টিচার আনিয়েছেন। বাংলাদেশিরা বাংলা শেখানোর জন্যে কিছু কিছু স্কুলে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দাবি করাতে, ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার ওপর নির্ভর করে, বোর্ড অফ এডুকেশন তার ব্যবস্থা করেছে। আমরা সেই অর্থে দাবিহীন। আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখার পেছনে পারিবারিক তাগিদই একমাত্র কার্যকর হয়ে থাকে। ইদানীং স্থানীয় বাংলা সানডে স্কুলগুলি এ কাজে বিশেষ সাহায্য করছে। নিয়মিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে যাওয়া, সেখানে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাময়িক বাস করা ইত্যাদি থেকেও বাংলা শেখার সুযোগ আসে। এই ধরনের পরিবারের ছেলেমেয়েদের আপনি অ্যাকসেন্ট বর্জিত বাংলায় কথা বলতে শুনবেন। যদিও এরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। নিউ ইয়র্ক শহরে ও কাছাকাছি অঞ্চলে প্রতিপালিত বাঙালি ছেলেমেয়েদের পারিবারিক চেষ্টা আর "বাংলা পাঠশালার" প্রভাবে ভাষা জ্ঞান রীতিমত উদাহরণযোগ্য। নানা "বঙ্গ সম্মেলনে" ছোটদের "রামের সুমতি", "ক্ষুদিরাম", "বিন্দুর ছেলে" ইত্যাদি নাটক দেখেছি। নিউ ইয়র্কের বাঙালি ছেলেমেয়েদের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে সমালোচনা করা সমীচীন হবে না। এই সব পরিবারে বাঙালিয়ানার চর্চাও সম্ভবত কিছু অধিক। আমেরিকার প্রত্যন্ত রাজ্যগুলিতে, যেখানে মুষ্টিমেয় বাঙালির বাস, সেখানেও বাবা, মা-র সাহায্য ছাড়া ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা শেখার অন্য কোনও সুযোগ নেই। আমি এ কথাই বলতে চাইছি যে—ভাষা শেখার জন্যে দেশ, কাল, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রর শিক্ষা ব্যবস্থা—কোনও কিছুই অন্তরায় হতে পারে না, যদি আপনার নিজের ইচ্ছে আর সময় থাকে। আর প্রবাদবাক্য অনুযায়ী ইচ্ছে থাকিলে উপায় আবিষ্কৃত হইবেই। আর যদি মনে করেন, বাবার চেয়ে 'ড্যাড' বেশি শ্রুতিমধুর, তো সেই ইচ্ছেই পূর্ণ করবেন। একটাই মুশকিল। ভবিষ্যতে অভিযুক্ত হলেও হতে পারেন। ভেবে দেখুন, আমরা ছোটবেলা থেকে যা যা পেয়েছি, তার বদলে, যা যা পাইনি, সেগুলো দিব্যি মনে রাখি না? সারা বিশ্ব ঘুরে এসেও ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মাকে বলি—তোমরা তো আমাকে বাদ দিয়ে দু'বার পুরী গিয়েছিলে! আমেরিকায় উত্তমকুমার সঙ্গে কত দেখাশোনা হয়েছিল! তবু জেঠিমা, কাকিমাদের শোনাতে ছাড়ি না—তোমাদের জন্যে তো আমার অগ্নিপরীক্ষা, সবার উপরে (নাকি ওপরে?), চাওয়া পাওয়া—কিচ্ছু দেখা হয়নি। আমি যে তাঁদের নাইট শো-এর সঙ্গী হতে পারিনি, এ দুঃখ কি "ভিডিও" দেখলেই ভুলে যাব? ঠিক এইভাবেই, আমেরিকার একটি বাঙালি মেয়ে কলেজে গিয়ে বুঝেছিল—এশিয়ান গ্রুপে বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে নিজের ভাষায় কথা বলতে জানে। ভারতীয়, পাকিস্তানি, চীনে, জাপানি, কোরিয়ান, থাই ছেলেমেয়েরা—নিজেদের এথনিক কালচার এবং ভাষা

বিষয়ে নেহাত অজ্ঞ নয়। মেয়েটি পরে বাবা, মাকে বলেছিল—এই 'প্রিভিলেজ' থেকে তাকে বঞ্চিত করার কারণে সে রীতিমত অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত বোধ করে। আরও পরে তাকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছিল তার জুইশ বর। বলেছিল— ড্যাড বলো কেন? তোমাদের ল্যাংগোয়েজে নিশ্চয়ই অন্য কিছু বলে? বাপ বাপ করে "বাবা" ডাকছে এখন মেয়ে, জামাই দু'জনেই। এ সবই আমার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া পুরনো ঘটনা।

বাংলা বলা নিয়ে অনেক হল। এবার আসি আত্মীয়স্বজনের পরিচয় দেবার ধরন প্রসঙ্গে যে পরিবর্তন লক্ষ করছি, সেই কথায়। আমেরিকানদের মতো বাঙালিরও কি আর এক্সটেনডেন্ট ফ্যামিলি বলে কিছু নেই? সদ্য যারা এখানে বিয়ে হয়ে আসছে, কিংবা পড়তে আসছে, বয়স ধরুন ২৩-২৪ থেকে ২৮-র কোঠায়, সেই সময় মেয়েরা বলে—আমি বেশি আত্মীয় টাত্মীয়দের চিনি না। শোভনা গুহ? আই ডোন্ট নো, আমার বাবার কাজিন হবে বোধহয়...ক্যানাডায়, হ্যাঁ বাপির একজন বোন থাকে।... সামারে বোধহয় উদয়নের বাবা, মা আসছে। ঠিক জানি না। উদয়নের দাদার বউ এখন এক্সপেক্ট করছে...।

সম্পর্কগুলোর অন্য পরিচয় দেওয়া যায় না? আত্মীয়স্বজনকে না চেনা এত কৃতিত্বের কাজ নাকি? সম্পর্কের সূত্র মনে রাখা নিছক গ্রাম্যতা? গেঁয়ো লোকেরা জ্ঞাতি গুষ্ঠির নামধাম মনে রাখে? বাবার কাজিন প্রসঙ্গে "বোধহয় আমার কোনও পিসির কথা বলছেন—" বলা যায় না? উদয়নের বাবা, মা হচ্ছেন মেয়েটির নিজের শ্বশুর, শাশুড়ি। তাঁদের সে পরিচয়ও অস্বীকৃত। যেন পাড়ার লোকের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। উদয়নের দাদার বউ হচ্ছে মেয়েটির বড় জা। জা, ননদ, ভাসুর শ্বশুর, পিসি, মাসি—এ ভাবে বললে নিজেদের 'আধুনিক' বলে বোঝানো যায় না বোধহয়! কে জানে? আমরাও যেমন বোনপো, বোনঝি, টোনঝি বলিনি কোনওদিন। বোনের ছেলে, দিদির মেয়ে, এরকম বলেছি। হয়তো সেইভাবেই ভাষান্তর হয়ে চলেছে।

তবে মাঝে মধ্যে চমকে কি আর যাই না? অন্যান্য বসু নামে অত্যন্ত মেধাবী একটি ছাত্র বেশ কয়েক বছর আগে এ দেশের বিখ্যাত আইভি লিগ কলেজ 'ডার্টমাউথ্'-এ পড়তে এসেছিল। কলকাতায় আর বম্বের স্কুলে পড়েছে। যতদূর মনে পড়ছে লা মার্টিনিয়ার কিংবা ডন্ বসকোর ছাত্র ছিল। এদেশে স্কলারশিপ নিয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স করছে তখন। ক্রিসমাসের ছুটিতে কলেজ ডর্ম থেকে এখানে এক বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। কী-ই বা তার বয়স তখন। বছর উনিশ হবে বোধহয়। কলকাতার সূত্র ধরে কার সঙ্গে যেন অনন্যর পারিবারিক চেনাশোনা বেরিয়ে গেল। যে মহিলা ওর বাড়ির লোকের নামধাম বলছিলেন, তাঁকে চমৎকৃত করে দিয়ে অনন্য উত্তর দিয়েছিল—আমি আপনার সেই লর্ড মামার দৌহিত্র।

দেশান্তরী বাঙালিরা সমস্বরে বলে উঠেছিল—'দৌহিত্র' কথাটা শেষ কবে শুনেছি বলো তো? লর্ড মামার দৌহিত্রর দৌলতে বিদেশে সম্ভবত সেই প্রথমবার। ভাষান্তরের একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করব।

এদেশে মাঝেমধ্যে শ্রাদ্ধ বাড়িতে যেতে হয়। সেখানে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দেওয়ার পর বাকি নিমন্ত্রিতদের খেতে দেওয়া হয়। এরকমই একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছি। ব্রাহ্মণ ভোজন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। রান্নাঘরে মেয়েরা লুচি করছেন। দেখি

কয়েকটা বাচ্চা মেয়ে ঘুর ঘুর করছে। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। লুচি টুচি দেখে খিদে পাওয়াই স্বাভাবিক। ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমরা এখন খাবে? তাহলে পেপার প্লেট নিয়ে টেবিলে বসে যাও।

তারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিল। একটা আট-নয় বছরের মেয়ে বলল—আর উই সাপোসড টু ইট ফার্স্ট?

—সিওর। গো, গেট সাম প্লেটস...।

আমাকে ভয়ঙ্কর চমকে দিয়ে, তার চেয়ে একটু বড় একটা মেয়ে বলল—"নো, মাই মাম সেড্—কায়োট্স উইল ইট লেইটার। দ্যাটস্ দ্য রিচুয়্যাল্ অব দ্য ডে। আই ডোন্ট মাইন্ড...।

জাতপাতের জ্ঞান যদি একদিনের জন্যেও দেওয়া হয়ে থাকে, তবু "কায়োটের" স্যাক্রিফাইসটা চিন্তা করুন তো! এক ফোঁটা মেয়ে, বলে কিনা—"আই ডোন্ট মাইন্ড"। আমেরিকান বর্ন কনফিউজড্ দেশি তো! মায়ের কথায় লুচির লোভ সংবরণ করে, কুসংস্কার মেনে নিয়ে, যথাসময়ে খেতে বসবে ভাবছে। এগুলো ভীষণ বিভ্রান্তির লক্ষণ নয়? বি জে পি আবার এ বি সি ডি-দের না দলে টানতে চেষ্টা করে। 'কায়োট্স' যা একখানা ঐতিহ্যের বাণী শুনিয়েছে আমায়!

১ *জানুয়ারি ১৯৯৪*

সাতজন মুশকিল আসান

প্রত্যেক ছুটির দিন মালটিপারপাস ডে। অবসর নয়, বিশ্রাম, নয়, শনি আর রবি হচ্ছে—বহুমুখী পরিকল্পনার নির্বাহ দিবস ও রজনীদ্বয়। শুক্রবার সন্ধে নামতেই সামাজিকতার ওভারটাইম শুরু। বয়স তো আর কমছে না। বরং দমই কমে আসার কথা। তবু রুটিন বদলের লক্ষণ নেই। হঠাৎ কারও শরীর খারাপ শুনলে সামান্য টনক নড়ে। মনে মনে বলি—আর কতকাল হুজুগে মাতবে হে? এবার একটু স্লো-ডাউন করো। কিন্তু পরের উইক এন্ডে আবার সেই পথের দাবি। হুজুগ, বিনোদন, আত্মীয়তার যোগসূত্র রক্ষা আর সামাজিক কর্তব্য সাধনের উৎসাহে ছুটির দিনে অর্ধেক সময় পথে পথে কেটে যায়। এভাবেই একদিন ওভারটাইম সারতে গিয়ে সাতজন মুশকিল আসানের দেখা পেয়ে গেলাম।

এটি রবিবারের ঘটনা। সামাজিকতার আহ্বানে সকাল থেকে বাড়িতে সাজ সাজ রব তুলে দিয়েছি। ইন্ডিয়ান টি ভি প্রোগ্রামে সুরাটের প্লেগ, হাতে দড়ি পরা ইয়াকুব, অনুপ জলোটার "তনমে রাম, মন মে রাম, রোম রোম মে রাম রে"...কোনও মতে দেখে নিয়েই ধাঁই করে সদর দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বিচিত্র লটবহর কর্মযোগের সবে শুরু। গাড়িতে বসে সারাদিনের রুটিনখানা একবার ঝালিয়ে নিলাম। প্রথমে চলে যাব

পঁয়তাল্লিশ মাইল দক্ষিণে নিউ ব্রানসুউইক শহরে রবার্ট উড জনসন হসপিটালে।

পরিচিত এক মহিলার হার্টে বাই-পাস-সার্জারি হয়েছে। তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। ইচ্ছে ছিল ফুলের বাস্কেট আর গেট ওয়েল কার্ড নিয়ে যাব। যেমন এদেশের দস্তুর আর কি! সেই মতো ছোট্ট ঝুড়ি ভর্তি ফুল টুল কিনেও এনেছি। কিন্তু বেরনোর আগে ফোনে খবর পেলাম—ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ফুলওলা পার্টিদের ফুল হাতে ঢুকতে দেননি। পেশেন্টের নাকি অ্যালার্জি হতে পারে। তাও ভাবলাম, ঝুড়িটা গাড়িতে নিয়ে যাই। অন্য কোথাও কাউকে গছিয়ে দেব। ফুল নেব না, অশ্রু নেব...এ সব নজরুলগীতিকা মাত্র! গুচ্ছের ডাঁটি, পাতাসুদ্ধু কার্নেশন আর গোলাপের ঝুড়ি গাড়িতে উঠে বসল। রোগীর জন্যে বিস্কুটের টিন আর গোলাপি গেট-ওয়েল কার্ড।

হাসপাতালের পার্কিং গ্যারাজে গাড়ি রেখে এলিভেটরে চেপে করোনারি কেয়ার ইউনিটে গেলাম। ছ দিন হল হার্ট সার্জারি হয়েছে। এরই মধ্যে নল টল সব খুলে দিয়েছে। রোগিনীর চেয়ে তাঁর স্বামীর চেহারাই বেশি কাহিল দেখলাম। টেনশনে মুখ, চোখ বসে গেছে ভদ্রলোকের। মহিলা বেশ কথাবার্তা বলছেন। কাশি এলে বুকের যন্ত্রণার ধকল সামলাতে লাল টুকটুকে এক বালিশ দিয়েছে। মস্ত এক হরতনের মতো দেখতে। হার্টের ওপর হার্টের চাপ। সঙ্গে সেলাই করা ডট পেন দুলছে। যারা ওঁকে দেখতে আসছে। বালিশের ওপর নাম আর শুভেচ্ছা বাণী লিখে দিচ্ছে। চলে আমার মুখে শুনি ওঁদের ছেলে সঞ্জয় নিউ ইয়র্ক থেকে মাকে দেখতে এসেছে। সন্ধের বাস ধরে আবার কলেজ ডর্মে ফিরবে। তার মোটে আঠারো বছর বয়স। একা একা বাস আর সাব-ওয়ে নিয়ে কত রাতে ক্যামপাসে পৌঁছবে ভেবে অসুস্থ মা একটু চিন্তিত।

খেয়াল হল, আমরাও তো আজ নিউ ইয়র্কে যাব। বাড়ি ফেরার আগে ওই কলেজ পাড়াটাই আমাদেরও লাস্ট স্টপেজ। ওঁদের বললাম—যদি সঞ্জয় আমাদের গাড়িতে ফিরতে চায়, কোনও অসুবিধে নেই।

দ্বিতীয় স্টপেজ—তন্ময় মিত্রের বাড়িতে পৌঁছতে দুপুর দুটো বেজে গেল। এখানে যা মাল নামালাম। যাকে বলে বিবিধার্থ সংগ্রহ। বিরাট বিরাট শপিং ব্যাগ নিয়ে ঢুকছি দেখে তন্ময়ের বউ নন্দিতাও হাত লাগাল। দুটো বড় ঠোঙা থেকে মাংসের ঝোলের গন্ধ বেরোচ্ছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি আর ডাল, ঝোলের গন্ধওলা ঠোঙা থেকে প্লাস্টিকের বাসন উঁকি মারছে দেখে নন্দিতা বলল—'এত রান্না কার জন্যে এনেছ? তোমরাই তো বললে আজ রিহার্সালের পরে ডিনার অবধি থাকবে না...।

ইশ! নন্দিতা ভাবছে আমাদের থিয়েটার পার্টির জন্যে মাংস-টাংস রেঁধে এনেছি। ভুল ভেঙে দেওয়ার জন্যে বললাম—আমাদের জন্যে নয়, মেয়েটার জন্যে একটু রান্না নিয়ে যাচ্ছি। কনটেইনারগুলো এখন তোমার ফ্রিজে রাখব বলে গাড়ি থেকে নিয়ে এলাম।

নন্দিতা কৌটোগুলো ফ্রিজে ঢোকাল। বলল, ওর নিজের তৈরি কাটলেট আর কেকও সঙ্গে দিয়ে দেবে। তার মানে ঠোঙা আরও বাড়বে। এদিকে বাদ বাকি যে সব মাল নামিয়েছি, তার বিলি ব্যবস্থা করা দরকার। রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। জনতার দাবিতে শিগগিরই আবার অ্যান্টনি কবিয়াল হবে। অ্যান্টনি যিনি সাজছেন, তিনি এখন জিনস আর পোলো ডিজাইনার শার্ট পরে নাটকীয় গলায় বলছেন—হামি বংগালি হইটে চাই। হারমোনিয়ামে

প্যাঁ প্যাঁ করে আবহসঙ্গীত বাজছে। আমি ঠোঙা উদ্ধারে বসেছি। পুজোর মুখে দুটো শাড়িতে ফলস লাগাতে দিতে হবে। তিনটে ব্লাউজ তৈরি করতে দিতে হবে। আমাদের নাট্যসঙ্গীত পরিচালিকা দারুণ সেলাই করে। সে আনমনে 'আমি যামিনী তুমি শশী হে' বাজাচ্ছিল। আমি শাড়ি, আর ব্লাউজ পিস হারমোনিয়ামের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বললাম—ঘি ঘি ফলস দিও দুটো শাড়িতেই।... কবে দেবে? না না, অত কিছু তাড়া নেই...। অ্যান্টনি আহত হয়ে পার্ট বন্ধ করে তাকিয়ে আছেন। ওঁর মুড নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি কি শুধু রিহার্সাল দিতে এসেছি নাকি? মালটিপারপাস ডে-তে বাকি প্রোজেক্টগুলো দেখতে হবে না?

এদিকে, ভীষণ দরকারি একটা হলদে ঠোঙা হারিয়ে গেছে। ঠিক ঠোঙা নয়, মস্ত পেট মোটা হলদে খাম। তার মধ্যে দুর্গাপুজোর ব্রোশিওরের জন্যে এক হাজার ডলারের 'অ্যাড'-এর চেক ছিল। এবারের প্রেসিডেন্ট আমার বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী। তাকে তো আর শূন্য হাতে ফেরাতে পারি না। সে এখন এখানেই হানা দেবে কথা আছে। নন্দিতা তার জন্যে কাটলেট গরম করছে। অথচ আমাদের কত খেটে তুলো আনা তিনটে অ্যাড-এর চেক সুদ্ধু খাম উধাও!

হঠাৎ সৌদামিনীর বাড়িউলি মাসি অ্যান্টনিকে বলল—আচ্ছা আপনি যে একটা হলদে খাম তখন ব্রিফ কেসে পুরলেন, ওটা নয়তো?

—ওটা ওথেলো।

ও হ্যাঁ, স্থানীয় এই নটসূর্য আবার পুজোতে শ্রুতি নাটকও করছেন। অ্যান্টনি কবিয়ালের রিহার্সালের ফাঁকে "ওথেলোর" খুনোখুনির দৃশ্য করার বাসনায় স্ক্রিপ্ট সুদ্ধু হলদে খাম বয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ হুজুগে তাল দিচ্ছে না বলে জুৎ করে বসতে পারছেন না। কিন্তু খামটা সব সময় সঙ্গে আনছেন। "বাড়িউলি মাসি"-র নজর তো! খাম চালাচালি দেখতে পেয়েছে।

অ্যান্টনি আবার ব্রিফ কেস খোলার আগে গৃহকর্তা তন্ময় ঘোষণা করলেন—এই তো তোমার ওথেলো। ডাইনিং রুমের টেবিলে পেলাম। অ্যান্টনি আশ্চর্য! ব্যাপারটা কী হল?

ব্যাপারটা সেই ভ্রান্তিবিলাস। আমরা এসে প্রথমে ডাইনিং রুম দিয়েই কিচেনে ঢুকে গিয়েছিলাম। নন্দিতাকে রান্না ধরিয়ে দেওয়ার আগে হলদে খামটা ডাইনিং রুমে টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম। সেখানে এখন ওথেলো ডেসডিমোনা, ইয়াগো পৌঁছে গেছে, আসলে অ্যান্টনি সাহেবও ওখানেই ওথেলোদের রেখেছিলেন। রিহার্সালে শ্রুতি নাটকের কথা তুলতেই সবাই "মার মার" করাতে খামটা তুলে রাখতে এসে আমাদের খামটাই ব্রিফ কেসে পুরেছেন। উলটো করে শুইয়ে রাখলে দুটোর চেহারা প্রায় এক। যাক, শেষ পর্যন্ত ঠোঙা উদ্ধার হল। পুজোর প্রেসিডেন্ট বমাল সমেত ধন্যবাদ দিয়ে কাটলেট খেয়ে চলে গেল।

আবার রিহার্সাল বসল। কিন্তু আমার মাথায় তখন মটকা, গামছা ঘুরছে। পুজো কমিটি দেশ থেকে কার্তিক, গণেশের জন্যে মটকা ধুতি আর মহা স্নানের লাল গামছা আনিয়ে দিতে বলেছিল। ধ্রুব কুণ্ডু এনেও দিয়েছেন। কিন্তু থাকেন বেশ দূরে। তাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একটা গাঁইয়া মতো লাল পাড় শাড়ি আমার কোনওদিন পরা হয় না। কলা বউকে দিয়ে দেব বলে সেখানাও ওই ঠোঙায় ভরে এনেছি। পুজো কমিটির কনভেনর এ বাড়িতে এসে এখনই নিয়ে যাবে। নন্দিতার কাটলেটের খদ্দের আমি সমানে বাড়িয়ে

দিচ্ছি। সকাল থেকে ওর ধারণাও ছিল না। রব দ্বারা আহুত লোকজন এভাবে একের পর এক ঠোঙা নিতে আসবে।

আমার বিলি ব্যবস্থা বেশ এগিয়ে গেছে। এবার রিহার্সাল দেওয়ার মতো সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করতেই হয়। সঞ্জয় এসে গেলে রণে ভঙ্গ দেব। কিন্তু ছেলেটা আর এল না। তার বাবা ফোন করে জানালেন, সে এত তাড়াতাড়ি ডর্মে ফিরতে চাইছে না।

আমরা আর দেরি করব না। নিউ জার্সির এই দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ ইয়র্ক পৌঁছতে দেড় ঘণ্টা। নন্দিতার ফ্রিজ থেকে রান্নাগুলো নিয়ে রওনা দিলাম।

নিউ জার্সি টার্ন পাইক ধরে যাচ্ছি। এই রাস্তার অন্য নাম রুট নাইন্টি ফাইভ। ওদিকে, উত্তরে বস্টন পর্যন্ত এ দিকে দক্ষিণে নেমে ফ্লোরিডা পর্যন্ত গেছে। নিউ জার্সি টার্ন পাইক নাম শুধু এই স্টেটে। উত্তরে গিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজের কাছে শেষ হবে। তখন আবার "নাইনটি ফাইভ নর্থ" নাম হয়ে কানেকটিকাট পেরিয়ে বস্টনের রুট। আমরা জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ ধরে হাডসন নদী পার হব। তারপরেই নিউ ইয়র্ক শহর।

ট্র্যাফিক জ্যাম যা দেখছি, পৌঁছতে দেরি না হয়। সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছনোর কথা। তারপর আবার নিউ জার্সি ফেরা। এদিকে, যত দেরি হবে, ওদিকে তত রাত হবে। ক্রমশ অধৈর্য লাগছে। চারটে লেনে ক্রমাগত গাড়ি আর ট্রাকের ভিড়। দূর থেকে দেখছি সামনে মাইলের পর মাইল গাড়ির পেছনের লাল আলো যেন থেমে আছে। কনস্ট্রাকশন চলছে বোধহয়।

ট্র্যাফিক যেই বেশ চালু হল, হঠাৎ আমাদের গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশে বিশাল লম্বা ট্রাকের গর্জন। দোতলা সমান উঁচু সিট থেকে ড্রাইভার চেঁচাচ্ছে—ইট গট টু মুভ ইওর কার। সে নিজের ট্রাক থামাল। গাড়ি না সরালে যে কী বিপদ হতে পারে, সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু পুলিশ যতক্ষণ না আসছে, এ জগদ্দল কোথায় সরাব?

ট্রাক ওলার পেছন পেছন তার সঙ্গীও নেমে পড়েছে। দুই দীর্ঘদেহী কালো মানুষ হাত তুলে দুরন্ত ট্র্যাফিক থামিয়ে দিল। গাড়ি সুদ্ধ আমাদের আরও দুটো লেন পার হয়ে একেবারে পাঁচিল ঘেরা শোলডার লেনে নিয়ে গিয়ে ফেলল। গাড়ির হুড খুলতে বলল।

গাড়ির বনেটের আড়ালে মাথা ঢুকিয়েছে ট্রাকওলা। আবার চিৎকার—অলটারনেটর গেছে। টোইং ট্রাক ডাকতে হবে। তার সঙ্গী জানলায় মাথা গলিয়ে বলল—তোমরা ট্রিপল-এর মেম্বার? ওদের কল করতে হবে। কার ফোন আছে?

—না, কার ফোন নেই।

—এনি ওয়ে, আমরা টার্ন পাইকে পুলিশ দেখলে জানিয়ে যাচ্ছি।

ট্রাক চালিয়ে চলে যাওয়ার আগে আমাদের ধন্যবাদ শুনতেও পেল না।

অচল গাড়ির জানলার ধারে বসে আমার মনে হল আজ দু'জন মুশকিল আসান এসেছিল।

এই ধারণা আরও দৃঢ় হল পুলিশের অদর্শনে। এতক্ষণ ধরে গাড়ির হুড খুলে বসে আছি। অথচ হাইওয়ে পেট্রল কারের দেখা নেই।

—বার বার বলেছিলাম, এ গাড়িটা নিয়ে নিউ ইয়র্কে যাব না। পুরনো গাড়ি, কখন কী ট্রাবল দেবে...।

—আপ-টাউনে কেউ নতুন গাড়ি নিয়ে যায় না। ব্রড ওয়ে-তে পার্কিং না পেলে, সেই তো যেখানে, সেখানে রাখা...।

—পুলিশের কাণ্ডটা দেখেছ? প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল...

এক ঘণ্টা? ঘড়ি দেখে চমকে উঠলাম। পৌনে আটটা বাজে। মেয়েকে বলেছিলাম সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছব। না খেয়ে দেয়ে বসে আছে। মেয়েটা আজ চিন্তায় পড়ে যাবে। জানে, দুপুরে নন্দিতার বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। দেরি দেখে হয়তো ওদের ফোন করবে। কত আগে বেরিয়ে পড়েছি শুনলে আরও চিন্তা করবে।

আশ্চর্য। পুলিশের টিকি নেই? আজ কি হাইওয়েতে বসে রাত কাটাব নাকি? এমন অভিজ্ঞতা জীবনে হয়নি। তাও, যদি ধারে কাছে একটা ফোন থাকত। একবার করে রাস্তায় নেমে দাঁড়াচ্ছি, একবার করে গাড়িতে ফিরে আসছি। মেয়েটার জন্যে টেনশন হচ্ছে।

হঠাৎ সবুজ একটা ভ্যান থেকে কারা চিৎকার করছে। ভ্যানটা শোলডারে গিয়ে থামল। ঝপাঝপ তিনটে ছেলে নেমে পড়ল। আলো আঁধারির মাঝে তিনটি ঝুঁটি। ঝুঁটিতে পাগড়ি নেই। টাইট করে রুমাল বাঁধা। তিন সর্দার ভ্যানে করে যেতে যেতে দেশোয়ালিদের দুর্গতি দেখে নেমে পড়েছে। বয়স তাদের বেশি নয়। আমাদের গাড়ির কলকব্জা নেড়েচেড়ে দেখল। অলটারনেটর খারাপ হয়েছে শুনে বড় সর্দার দু পকেটে হাত পুরে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল। মেজ সর্দার জিজ্ঞেস করল—কোনও হেলপ আসছে? টোইং কোম্পানি খবর পেয়েছে?

—পুলিশই এল না এখনও। কল করবে কে?

ছোট সর্দার বলল—আমাদের ভ্যানে ফোন আছে। কল করে দাও।

হাতে স্বর্গ পেয়ে প্রথমেই নিউ ইয়র্কে ফোন।

তবু ফোনটা করা গেল। দূরে লাল আলোর মুকুট পরা উঁচু উঁচু দুটো গাড়ি আসছে দেখে সর্দারদের ভ্যান থেকে পুলিশে আর ফোন করা হল না। ভাবলাম, এতক্ষণে সাহায্য আসছে। তিন সর্দারও তাই দেখে ভ্যানে চড়ে চলে গেল। এ পর্যন্ত মোট পাঁচজন মুশকিল আসানের দেখা পেয়েছি। এখন শুধু পুলিশের গাড়িতে ওঠা বাকি।

কিন্তু কোথায় পুলিশ? মুকুট পরা গাড়িগুলো প্রাইভেট ভ্যান। যেন ঠাকুর ভাসান দিতে চলেছে। চোখের নিমেষে আলোর চেকনাই মিলিয়ে গেল।

একটু পরে টোইং ট্রাক আর পুলিশের গাড়ি এল। কিন্তু ট্রাক নিয়ে ড্রাইভার শোলডারে রাখছে দেখে, পুলিশ পরম নিশ্চিন্তে কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। যেন বুঝেই নিল, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে। শীতকাল নয়, অ্যাকসিডেন্ট নয়, গাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা নেই, বুড়ো-বুড়ি বসে নেই, শক্ত-সমর্থ দুজন মানুষ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে—এদের আবার এমার্জেন্সি কিসের? টোইং ট্রাকের সঙ্গে অচল গাড়িটা জুতে দিয়ে ওই ট্রাকে চড়েই বাড়ি চলে যাবে। পুলিশ আমাদের অসহায় না ভেবে আরও এমার্জেন্সি কেসের খোঁজে রওনা দিল। বেঁচে গিয়ে কী মুশকিলেই পড়লাম।

টোইং ট্রাকের ড্রাইভারের সঙ্গে এক মহিলা হন হন করে আসছে। ট্রিপল 'এ' কোম্পানির নামধাম লেখা ট্রাক নয় দেখে সন্দেহ হল এ নিশ্চয়ই নিউ জার্সি টার্ন পাইকের নিজস্ব ট্রাক। পুলিশের ডাক পেয়ে এসেছে। কিন্তু চালকের সঙ্গিনী বলল—আমাদের কেউ

খবর টবর দেয়নি। এমনি যাচ্ছিলাম। শোলডারে গাড়ি পড়ে আছে দেখে থেমেছি। গাড়ি "টো" করতে হবে না-কি?

এরা আবার কারা? ভ্যানের সঙ্গে বিরাট প্ল্যাটফর্ম লাগিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে? মহিলার ইংরেজি যদি বা বোঝা যাচ্ছে, চালক তো মুখই খুলছে না। মহিলা বলছে, গাড়ি সুদ্ধু আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। ওদের নাকি নু-আর্কে মোটর গ্যারাজ আছে। ইচ্ছে করলে আগে সেখানেই যেতে পারি। গাড়ি রেখে ওদের ভ্যানে বাড়ি পৌঁছে দেবে। পরে গাড়ি সারিয়ে যা বিল হয়, তাই মিটিয়ে দিলেই হবে।

এ অবস্থায় কী করা উচিত? স্প্যানিশদের খপ্পরে পড়ে আন্দাজে কোথায় যাব? ওদের মোটর গ্যারাজের কার্ড ধরিয়ে দিতে অন্ধকারে কিছুই পড়া গেল না। মহিলা সমানে বলে যাচ্ছে—আমার বর মস্ত মেকানিক। ইংরেজি বলতে পারে না তো কী হয়েছে? আমি ওর অফিস চালাই...। তার বাক্যস্রোত থামিয়ে আমরা বললাম—নু-আর্কে যাব না। আমাদের নিজেদের শহরের গ্যাসস্টেশনে গাড়ি সুদ্ধু নিয়ে চলো। তারপর যা হয় করব। বউটা তাতেই রাজি। বরকে স্প্যানিশে কী সব বোঝাল। মধ্য বয়সিনী সুন্দরীর যুবক স্বামী। সেও ভারী রূপবান। তবে একটু ভীতু ভীতু ভাব। বউকে গুজ গুজ করে কী সব বলতে বউ আমাদের কাছে ঝেড়ে কাশল। ওদের এই টোইং ভ্যান নিউ জার্সি টার্ন পাইকে অপারেট করার লাইসেন্স নেই। গ্যারাজের প্রয়োজনে কিনেছে। কিন্তু এই হাইওয়েতে কোনও গাড়ি পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেলে পুলিশ ধরবে।

বউটা ভারী বুদ্ধি ধরে। হেসে হেসে বলল, তোমাদের একটু চেপে গেলেই হবে। পুলিশ ধরলে আমরা বলব বন্ধুদের হেলপ করছি। হাইওয়েতে প্রবলেম হয়নি। এমনি তোমাদের বাড়ি থেকেই গাড়িটা সারাতে নিয়ে যাচ্ছি...।

হঠাৎ খুব বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। এবার আইন অমান্য আন্দোলনে নামব। ঢের অপেক্ষা করেছি। আর নয়। পুলিশ ধরতে আসুক, উলটে তাদের ব্যাজ নম্বর টুকে নিয়ে "হ্যারাসমেন্টে"-র মামলা ঠুকে দেব। আমরা চারজন বিদেশি মানুষ একটা ভাঙা গাড়ি পেছনে বেঁধে হাসি, গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম, অমনি পুলিশ আমাদের হ্যারাস করতে এল...এই সেনসিটিভ ইস্যু নিয়ে ডিসক্রিমিনেশন চার্জ এনে উকিল লাগাব। ওয়াশিংটনে আমাদের লবি আছে না? ভীষণ সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।

কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। বরটা নার্ভাস হলেও গায়ে খুব জোর। তার মেক্যানিক্যাল ব্রেইনও প্রশংসাযোগ্য। ইংরেজির অভাবে কথায় বড় নয় বটে, কিন্তু কাজে ভারী দড়। একা একা কী সব বোতাম টিপে টিপে ওদের ভ্যানের পেছনের বিরাট প্ল্যাটফর্ম মাটিতে নামিয়ে ফেলল। তারপর 'গোঁ' শব্দের আর একটা বোতাম টিপে যেই না ওই প্ল্যাটফর্মের ওপরে আমাদের নাকে দড়ি বাঁধা স্টেশন ওয়াগনখানা তুলতে গেছে, আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম। লোকটা ভয় পেয়ে বউটার কাছে পালাচ্ছে। ভাবছে বহু-আকাঙ্ক্ষিত পুলিশরা আসছে। ও সব কিচ্ছু নয়। আমাদের ঠোঙাগুলো নামাতে হবে না? অতগুলো খাবারের কৌটো, ওথেলো আর অ্যান্টনি কবিয়ালের স্ক্রিপ্ট, ফুলের ঝুড়ি, ছাতা, একটা বিরাট থলেতে মেয়ের সংসারের জন্যে টয়লেট টিস্যু, স্প্যাগেটি সস্, লেটুস, টমেটো, শশা, প্লাস্টিকের চাদরে মোড়া কম্বল—সব আর একটু হলে মোটর গ্যারেজে পৌঁছে যাচ্ছিল।

বউটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বরকে থামাল। অনর্গল স্প্যানিশে বক বক করছে। ছুটে ছুটে গিয়ে সব ঠোঙা বের করে এনে ওদের ভ্যানের সামনের সিটের কাছে জড় করছে দেখে আমরাও হাত লাগালাম। মাংসের গন্ধে ভ্যান-এর ভেতরটা যেন পাঞ্জাবি হোটেল। নির্ঘাৎ ঝোল টোল উলটেছে। দূর! আর ওসব দেখেই বা কী করব? এখন গাড়িটার গতি করে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি। ভাগ্যিস সঞ্জয় সঙ্গে আসতে রাজি হয়নি। তার যে কী গতি করতাম?

বউটা আমাকে ডাকাডাকি করে ভ্যানের সামনের সিটে বসল। পেছনের গোঁ গোঁ শব্দ। মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম প্ল্যাটফর্ম উঠে আসছে। তার ওপর নেভি ব্লু স্টেশন ওয়াগন বসে আছে। বরটা ফিরে এসে স্টিয়ারিং ধরে বসল। তার পাশে লেপটে তার বউ। বউ-এর গা ঘেঁষে আমি আর এ পাশের জানলা ঘেঁষে আমার স্বামী। চার বন্ধু চলেছি। গল্প গুজব না করলেই নয়। নাম-টাম জানার জন্যে বউটার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম। সে ব্রাজিলিয়ন। দশ বছর হল আমেরিকায় আছে। বড় বড় তিনটে ছেলেমেয়ে। ছেলে 'রিও'-তে থাকে। মেয়েরা মার সঙ্গে নতুন বাবার সংসারে। বাবার নাম রুবেন কারলিনো। আর্জেন্টিনা থেকে দু' বছর হল এসেছে। এসেই বিয়ে টিয়ে করে সিমেক করনোরেশন নাম দিয়ে গাড়ি সারানোর ব্যবসা আরম্ভ করেছে। ওদের যে কী কী সার্ভিস আছে, বউটা গড় গড় করে বলে যাচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে বরটা স্প্যানিশে নতুন নতুন পয়েন্ট মনে করিয়ে দিচ্ছিল। দুজনের মধ্যে স্প্যানিশে কথাবার্তা চলে। বউ পর্তুগিজ, স্প্যানিশ ইংরেজি—তিনটে ভাষা জানে বলে বরের ব্যবসার 'অফিস-ওয়ার্ক' সব কিছু নিজে দেখে। নু-আর্কের আয়রন বাউন্ড সেকশনে যত ব্রাজিলিয়ন আছে, সবাই ওদের খদ্দের। সদ্য সদ্য ওয়ার্ল্ড কাপের মরসুম গেছে। ব্রাজিলের গরিমার কথা তুলতে বউ একেবারে আত্মহারা। বরটা যেন ছায়ায় পড়ে যাচ্ছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে হাইওয়ে টোল বুথের কাছে পৌঁছনোর আগে স্প্যানিশে বলল আমরা নিউ জার্সি টার্ন পাইকে ঢোকার মুখে যে মাইলেজের টিকিট নিয়েছিলাম, সেটা যেন আর এই বুথে না দেখাই। সত্যি তো! তা হলেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে যে নিজেরা গাড়ি চালিয়ে টার্ন পাইকে ঢুকে এনট্রি টিকিট নিয়েছিলাম। তার মানে গাড়ি তার পরে খারাপ হয়েছে। আর লাইসেন্স ছাড়াই এই ফ্ল্যাট-বেড টোইং ট্রাক সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নাঃ আর্জেন্টিয়ান বরের বিচক্ষণতা লক্ষ করার মতো। সে টুক করে শুধু নিজের এন্টি কার্ডখানা টোল বুথে ধরিয়ে দিল। আমরা টেন্‌সড। ধরা পড়লে এখানেই পড়ব। বরটা পাঁচ ডলার দিয়ে চেঞ্জ নিল। বউটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গাড়ি টোল বুথের সবুজ আলোর সঙ্কেত পেয়ে হু হু করে বেরিয়ে এল।

ব্যস্! আর কোনও চিন্তা নেই। পুলিশ আর আমাদের ছুঁতে পারবে না। টার্ন পাইকের পর্ব শেষ। এখন রুট এইটটি ধরে আমাদের শহরের দিকে যাচ্ছি। এই রাস্তায় কারলিনো রীতিমতো লাইসেন্স দেখিয়ে গাড়ি 'টো' করতে পারে। সুতরাং কিছু নাহি ভয়। বউটা ততক্ষণে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। মার সঙ্গে মেয়ের আজ দেখা হল না, মেয়ে তার মার হাতের রান্না খেতে পেল না বলে, কী সহানুভূতি। যাক গে, বাড়িতে নিয়ে গেলে অন্য ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে নেবে বলে সান্ত্বনা দিল। অন্য ছেলেমেয়ে নেই শুনে আরও সহানুভূতি দেখাল। আর এরই মাঝে মাঝে বরটা অনবরত ভুল লেনে চলে যাচ্ছে দেখে

আমরা হাত দিয়ে লেফ্‌ট, রাইট করে যাচ্ছিলাম।

শহরের মধ্যে স্টপ সাইন দেখে বউটা গল্প থামিয়ে ঝট করে স্টিয়ারিং চেপে ধরল। বরের কী অভিমান! আমি স্টপ সাইন চিনি না? আসলে হাইওয়ের সাইন বুঝতে বরের এখনও মাঝে মাঝে অসুবিধে হয় বলে বউটা সমানে খবরদারি করে তো। এবার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। আমরা হেসে ফেলাতে ওরাও হাসছে।

বন্ধ গ্যাস স্টেশনের পার্কিং স্পেসে রাত দশটা নাগাদ গাড়িটা রেখে আসা হল। পরের দিন ফোন করে দিলেই হবে। বাড়ি আসার পথে নিজেদের মধ্যে বাংলায় বলাবলি করলাম—এরা এখন কত ডলার চাইবে কে জানে? ওদের ইচ্ছে ছিল নু-আর্কের গ্যারেজে গাড়িটা সারাবে। সে তো হল না। এখন টোইং-এর জন্যে যা খুশি চাইতে পারে। আগে দরদস্তুর করা হয়নি। এখন যা বলবে, না দিয়ে উপায় নেই...।

বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার পর দেড়শো ডলার চেয়েছিল। কিছু বেশি নয়। "ট্রিপল্ এ" কোম্পানি আর ইন্সিওরেন্স থেকে ফেরত পেয়ে যাব। দূরত্ব আর সময়ের হিসেব যোগ করলে অন্য কোনও প্রাইভেট টোইং কোম্পানি অন্তত শ' খানেক ডলার বেশি চাইত। আজ এরা অনেকরকম চাপ দিতে পারত। ওদের গ্যারাজে গাড়ি সারাব না শুনে একটু হতাশ হয়েছিল। তবু আর একবারও বলেনি। গাড়িতে তোলার পর জোর দবরদস্তি করলে কী বিপদেই পড়তাম। তার বদলে যা বলেছি, তাই করেছে। জিনিসপত্র বয়ে বয়ে এ গাড়ি, ও গাড়ি করেছে। ট্রিপল-এর লোক এ সব বাড়তি কাজে হাতও দিত না।

কারলিনোর বউ রসিদ লিখে দিল। চেক নিয়ে ব্যাগ ভরল। অ্যামাউন্ট দেখল না। ফোন নম্বর চাইল না। আইডেনটিফিকেশনের জন্যে ড্রাইভার্স লাইসেন্স লিখে নিল না। এক এক করে সব জিনিস ড্রাইভওয়েতে নামিয়ে রাখল। কারলিনো নেমে এসে হ্যান্ড-শেক করল। তারপর শান্ত প্রিয়দর্শন সেই আর্জেন্টিনার যুবক আর তার উচ্ছ্বসিত ব্রাজিলিয়ন বউ আবার ভ্যানে উঠে বসল।

ঠোঙাগুলো নিয়ে বাড়ি ঢুকছি, দেখি অন্ধকারে ফুলের ঝুড়িটা পড়ে আছে। সকালের সেই ডাঁটি পাতাসুদ্ধু কার্নেশন আর গোলাপ। সারা পথ ঘুরে ফিরে এসেছে। আজ একজন মুশকিল আসানের দেখা পেলাম, মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। অথচ ফুল-টুল কাউকে দেওয়া হল না। হাইওয়ের শোলডারে ডেকে ঝুঁটিওলা সর্দারজিদের গুলদস্তা দিচ্ছি, নয়তো সেই বিশাল ট্রাকের বিশাল মাপের ড্রাইভারদের ফুল শোঁকাচ্ছি—এইসব অতি-নাটকীয় দৃশ্যের কথা চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সব ঝামেলা মিটে যাওয়ার পরে, স্বস্তি আর কৃতজ্ঞতা থেকে একটি আন্তরিক মুহূর্ত রচনা করা যেত না? ব্রাজিলিয়ন বউটার হাতে ফুলের ঝুড়িটা ধরিয়ে দিইনি বলে আক্ষেপ থেকে গেল।

১২ নভেম্বর ১৯৯৪

জন্মবৃত্তান্ত

ডাঃ সেনগুপ্তর বাড়ির বার-বি-কিউ পার্টিতে দেবীকে যখন প্রথম দেখি তখন তার বয়স বছর দুয়েকের বেশি নয়। ওর বাবা-মা সদ্য নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে নিউ জার্সিতে এসেছে। ডাঃ সেনগুপ্তর সঙ্গে সুপার মার্কেটে আলাপ হতেই নেমন্তন্ন করে দিয়েছেন। এই সুযোগে আরও কিছু বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে ওদের।

আমাদের মাধবীর আশ্চর্য ক্ষমতা। সে নিমেষের মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলে কোনও বাচ্চাকে তার বাবার মতো দেখতে, না মায়ের মতো। শুনেছি এখানে হাসপাতালে কারও সদ্যোজাত বাচ্চা দেখতে গিয়েও সে নার্সারি রুমের কাচের দেওয়াল ভেদ করে পাঠিয়ে দেয় তার দৃষ্টির সার্চলাইট।

দেবীকে দেখেও তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল একইরকম। অভিনিবেশ সহকারে তার বাবা দেবপ্রিয় আর মা জয়িতাকে লক্ষ করার পর প্রথম মন্তব্য হল—ওকে কার মতো দেখতে বলুন তো? আপনাদের কারুর সঙ্গেই কোনও মিল নেই। তাই না? বলে আমাদের সমর্থন আদায় করে তাকাতে লাগল। আমরা লক্ষ করলাম দেবীকে নিয়ে উঠে যেতে যেতে জয়িতা বলে গেল—জানি না। ঠিক বুঝতে পারি না কার মতো হয়েছে?

তারপর বছর চারেক কেটে গেছে। এখন আমরা অনেকেই জানি কেন দেবীকে তার বাবা-মার মতো দেখতে হয়নি। শুধু দেবী নিজে জানে না সে খবর। একদিন তার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে জেনেও জয়িতা সেই অনাগত সময়ের কথা ভুলে থাকতে চায়।

আমেরিকাতে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কুমারী মাতৃত্ব যতখানি লজ্জা ও কলংকের বিষয় বলে চিহ্নিত হত, ইদানীং সে তুলনায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন এসেছে। এখন প্রতি চারটি শিশু পিছু একটি শিশু জন্মায় কুমারী মায়ের গর্ভে। এক সময় যাদের বিয়ের আগে মা হওয়ার জন্যে অপমান ও লজ্জার মধ্যে থাকতে হত, এখন তাদের মতো মেয়েরা নিজেদের সিঙ্গল মাদার বলে অসংকোচে পরিচয় দিচ্ছে। তবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোর পক্ষে তিরিশ বছর সময়ও বোধহয় যথেষ্ট নয়। কারণ এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবৈধ বিচারে জন্মানো শিশু 'অ্যাডপশন এজেন্সি'তে চলে যায় এবং অন্য কোনও পরিবারের দত্তক হিসেবে স্থান পায়। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিচয়েই হয় তার নিজের পরিচয়।

তবু কিন্তু জন্মবৃত্তান্ত গোপন থাকে না। হয় ছোট থেকেই, নয়তো একটু বড় হবার পরে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সে পালিত সন্তান। তার অনুভবের জগতে আঘাত, বিস্ময় যাই আসুক, কোনও গোপনতার মধ্যে দিয়ে তাকে লালন পালন করার পক্ষপাতী নয় এরা। ক্রমশ এদেশে পালিত সন্তানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে শিশুর ভবিষ্যৎ কৌতূহল নিরসনের জন্যে বিভিন্ন অ্যাডপশন এজেন্সিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা প্রতিটি শিশুর জন্মের যাবতীয় তথ্য রেকর্ডে রাখে।

নিউ জার্সিতে এবং আমেরিকার আরও ৪৬টি স্টেটে এখনও এই নিয়ম যে পালিত সন্তান, তার প্রকৃত বাবা মা এবং যারা এখন তার অভিভাবক অর্থাৎ দত্তক নিয়ে তাকে বড়

করেছেন এই তিন পক্ষ সম্পূর্ণ একমত না হলে সেই ছেলে বা মেয়েটির জন্মের সার্টিফিকেট সিল করা অবস্থাতেই অ্যাডপশন এজেন্সির হেফাজতে থাকবে। শুধু সন্তানের কৌতূহলে নয়, অভিভাবকের দায়িত্বের জন্যে নয়, অথবা অতীতের ভুলভ্রান্তির কথা ভেবে আবেগবশত কোনও কুমারী মায়ের অনুরোধে নয়, জন্মবৃত্তান্ত অথবা বার্থ সার্টিফিকেট তখনই দেখতে দেওয়া হবে যখন তিন পক্ষই মনে করবে এ সত্য প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন আছে। আইন অনুযায়ী আসল সার্টিফিকেট সিল করা অবস্থায় থাকে। সেটি দেখার অধিকার দত্তক নেওয়ার সময় অভিভাবকদেরও দেওয়া হয় না। নতুন একটি সার্টিফিকেট তাঁরা পান। তাতে শিশুর নাম এবং নতুন বাবা মায়ের সন্তান হিসেবে পরিচয়পত্র থাকে। তবে মোটামুটিভাবে কিছু প্রশ্নের উত্তর তাঁরা পান। শিশুর জন্ম কোন দেশে হয়েছে, আর ভাই বোন আছে কি না, ভাষা এবং ধর্ম ইত্যাদি জেনে নেওয়াও সম্ভব হয়। কিন্তু তার বাবা মার নাম ঠিকানা কখনই জানানো হয় না। অনেক সময় এজেন্সির কাছে সে সব থাকেও না। পথে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর জন্মের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাবে? কত সময় তো চার্চের সামনে, অনাথ আশ্রমের দরজায়, হাসপাতালের ওয়েটিং রুমেই পাওয়া যায় এদের। মায়ের দিয়ে যাওয়া গুটি কতক জামা আর দুধের বোতল মাত্র সম্বল করে অসহায়ের মতো পড়ে থাকে পথের এক পাশে। পরে এদের পরিচয় হয় অন্য নামে, অন্য জীবনে। যে সুপার মার্কেটের দরজার কাছে ছোট্ট বাক্সে শুয়েছিল, সেই বাজারের নামেই নামকরণ হয়ে গেল—অ্যালেকজান্ডার। অনাথ আশ্রমে সিস্টাররা আদর করে ডাকলেন—অ্যালেক্স। সেই থেকে নাম হয়ে গেল অ্যালেক্স। পদবি নেই। তারপর অ্যাডপশন এজেন্সির মাধ্যমে পৌঁছে গেল যে পরিবারে তাদের পদবি পেয়ে সম্পূর্ণ পরিচয় হল অ্যালেক্স নিউবার্গার।

কিন্তু এই পরিচয়ে সব সময় সম্পূর্ণ মনে হয় না নিজেকে। যে মুহূর্তে জানতে পারে, এতদিন যাঁকে মা বলে ডেকেছে তিনি তার জন্মদাত্রী নন, যাঁকে বাবা বলে জেনেছে তাঁর বংশের কেউই সে নয়, বড় যন্ত্রণার মধ্যে সে অতীতকে ফিরে দেখতে চায়। মনের মধ্যে তখন অজস্র প্রশ্নের তোলপাড়। কোথায় আমার সেই মা যে জন্মমুহূর্তে আমাকে ত্যাগ করেছিল? কী ছিল সেই অনিবার্য কারণ যা তাকে নিজের সন্তানকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল? একবার তাকে দেখতে পাওয়া যায় না? প্রশ্ন করা যায় না, আমাকে তার মনে পড়ে কি না?

হ্যাঁ, এইভাবেই টানাপোড়েনে ক্ষত বিক্ষত হয় কেউ কেউ। আমেরিকার জীবনধারায় মানসিকভাবে পরিণত হয়ে ওঠে যে বয়সে, সেই বয়সই তাকে এমন সব প্রশ্নের সামনে এনে দেয়, জানবার মৌলিক অধিকার থেকে সে উত্তরের দায়ভার চাপিয়ে দেয় যতটুকু না তার অভিভাবকদের ওপর, তার চেয়েও বেশি অ্যাডপশন এজেন্সিগুলির ওপর। আশা করে তাদের জমা খাতায় আছে তার জন্মরহস্যের প্রকৃত উত্তর হয়তো আছে হারিয়ে যাওয়া সেই মায়ের। নাম ঠিকানা অথবা কোনও দরিদ্র বাবার পরিচয়। হয়তো কোনও অগৌরব ছিল না তার জন্মের ইতিহাস। বৈধ পরিচয় নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল। কত কারণেই তো মানুষ সন্তান পালনে অক্ষম হতে পারে। দারিদ্র্য, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কত কীই কারণ থাকতে পারে তবু জানা দরকার কী সেই কারণ। এই বিষণ্ণ ভাবনায় সাময়িকভাবে গৌণ হয়ে যেতে থাকে তার স্বচ্ছন্দ বর্তমান জীবন। আশ্রয়চ্যুত না হয়েও নিজেকে ছিন্নমূল ভেবে বড় দুঃখী

মনে হয়। অভিভাবকদের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে ওঠে। কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। নিজেদের চেষ্টা তো থাকেই, উপরন্তু সাইকোলজিস্ট, সমাজ বিজ্ঞানীদের নির্দেশ মেনে পালিত সন্তানের মনোকষ্ট দূর করার চেষ্টা করেন। অ্যাডপশন এজেন্সিগুলির কাছে যদি প্রথম থেকেই দু'পক্ষের নাম ঠিকানা জমা দেওয়া থাকে, তবে অত্যন্ত প্রয়োজনবোধে খবর সংগ্রহ করা সহজ হয়। নিউ জার্সিতে আছে 'অ্যাডপটিভ পেরেন্টস ফর ওপেন রেকর্ডস' নামে একটি সংস্থা। তাঁরা দাবি করছেন—প্রত্যেক মানুষের নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানার অধিকার আছে। যে বয়সে তার জানার আগ্রহ হবে; তথ্যের অভাবে তাকে প্রকৃত সত্য না জানতে দেওয়া সামাজিক অপরাধ।

গত কয়েক বছরে শুধু ওই সংস্থাটিই নয়, আরও বেশ কয়েকটি সংস্থা এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অ্যাডপশন লিবারেশন মুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাডপশন কংগ্রেস, দ্য কনসার্নড ইউনাইটেড বার্থ পেরেন্টস, ওরিজিনস ইত্যাদি সংঘবদ্ধ দল মিলে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বিশেষভাবে চাপ সৃষ্টি করছে যাতে আইন করে এই খোলাখুলি ব্যবস্থা চালু করা যায়। গত বছর মে মাসে এরা মিছিলে যোগ দিয়ে 'ওপেন মাই রেকর্ডস' দিবস পালন করেছিলেন। পালিত ছেলে-মেয়েরা রেকর্ড ব্যুরোর কাছে আবেদন জানিয়েছে, তাদের জন্মের কাগজপত্র সিল করা খাম থেকে খুলে দেখতে দেওয়া হোক। কে কোথায় সেই সব কাগজপত্র পেতে পারে এবং ইচ্ছে হলে খুলে দেখতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, এই জানাজানির ফলে কার কী লাভ হবে? শুধু উত্তর পেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? এখানে একটি কলেজ ছাত্রী বলেছে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা। ২১ বছরের মেয়েটির নাম সুজ্যান। হঠাৎ কলেজে এক মহিলা এসে অন্যদের কাছে নাম ধাম জিজ্ঞেস করে তাকে খুঁজে পেলেন। দেখা হওয়ার পর অনেকক্ষণ কোনও কথা নেই। অপলকে তাকিয়ে দেখছেন। সুজ্যানের অস্বস্তি হচ্ছে। ক্লাসে যাবার তাড়াও আছে। হঠাৎ মহিলা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কি পয়লা অক্টোবরে জন্মদিন? ২১ বছরে পড়েছ? সুজ্যান আশ্চর্য হয়ে বলল—আপনি কি করে জানলেন? মহিলা থেমে থেমে বলেছিলেন, আমি জানি। ২১ বছর আগে আমিই তোমায় জন্ম দিয়েছিলাম।

একুশ বছর আগে এক অসহায় কুমারী লোকলজ্জার ভয়ে সদ্যোজাত মেয়েটিকে দান করে দিয়েছিল। তারপর বছরের পর বছর খুঁজেছেন। বহু দিনের চেষ্টার পর মেয়ের দেখাও মিলেছে। তারপর আট বছর কেটে গেছে। সুজ্যানের জীবনে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হয়েছে আশ্চর্যরকম। একদিকে আনন্দ পেয়েছে। নিজের মাকে দেখতে পাওয়া, মায়ের বিবাহিত জীবনের ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে ভাই বোনের ছায়া খুঁজে পাওয়া, এই সবই তার জীবনে অতিরিক্ত প্রাপ্তির মতো হয়েছে। অন্যদিকে দুঃখ পেয়েছে মায়ের স্বামীর শীতল ব্যবহারে, যেন তার উপস্থিতি মায়ের লজ্জাজনক অতীতকে টেনে এনেছে। সবচেয়ে মায়া হয়েছে অভিভাবকদের অভিমান দেখে। তাঁরা কেবলই ভাবছে সুজ্যান তাঁদের ছেড়ে চলে যেতে পারে। অথচ সুজ্যানের জীবনে বাবা মা বলতে এখনও তাঁরাই আছেন। নিজের মায়ের প্রতি ওর মমত্ববোধ থাকলেও যে মা মানুষ করেছেন তাঁর প্রতি টান এবং ভালবাসা যে কত গভীর সুজ্যানের মতো করে কেই বা অনুভব করতে পারবে?

পালিত সন্তানের সঙ্গে তাঁর জন্মদাতা বাবা মায়ের দেখা হওয়া ক্রমশই সম্ভবপর হচ্ছে। নিউ ইয়র্কের অ্যাডপটি লিবারেশন মুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৭১ সালে। তারপর থেকে এই কুড়ি বছরে প্রায় ৩০,০০০ মানুষ নিজেদের মধ্যে দেখা করার সুযোগ পেয়েছে।

নিউ জার্সির স্টেট ডিভিশন অফ ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসেজের অ্যাডপশন শাখার খবরে জানা গেছে প্রতি মাসে প্রায় সত্তর আশিটি টেলিফোন আসে এ ব্যাপারে। কারণ এখানে রেজিস্ট্রি করা থাকে যে সব কাগজপত্র তার মধ্যে থেকেই প্রয়োজনীয় খবর উদ্ধার করে এঁরা সরবরাহ করতে পারেন। তবে তার আগে তিন পক্ষকে আগ্রহী হতে হবে নয়তো সম্মতি জানাতে হবে। তারপর দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। তবে দেখা হওয়ার আগে বাধা আসে অনেক। প্রথমত অ্যাডপশন এজেন্সিগুলির গাফিলতি, অনিচ্ছা, কর্মীদের অসহযোগিতার ফলে সিল করা কাগজপত্র উদ্ধার করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কখনও আত্মীয় স্বজন বাধা দেবার চেষ্টা করেন। কখনও নিজের মা আত্মপরিচয় দিতে চান না। তাঁর বর্তমান জীবনে অতীতের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে ভয় পান। বেশিরভাগ সময় বাধা আসে পালক বাবা মায়ের কাছ থেকে। তাঁরা উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে ভাবেন, এই জানাজানির ফলে তাঁদের প্রত্যেকেরই মানসিক কষ্ট বাড়বে। এতদিন যাকে সন্তানের মতো করে মানুষ করেছেন, সে আর শুধুমাত্র তাঁদের নিজস্ব স্নেহের জন হয়ে থাকবে না। তার মনে দ্বিধা আসবে। কে তার বেশি আপন হয়ে উঠবে, এই ভাবনায় অসহায় হয়ে পড়েন তাঁরা। ফলে সকলের সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ছেলে বা মেয়েটিকেই মানসিক চাপ সহ্য করতে হয় খুব বেশি রকম। তবু এমনই কৌতূহল যে হাল ছাড়তে পারে না। হয়তো শেষ পর্যন্ত চেষ্টা সফল হয়। কিন্তু তারপরের দিনগুলো অভিজ্ঞতা একেক জনের ক্ষেত্রে হয়ে উঠে একেকরকম। দেখা হবার আগে অদম্য আগ্রহ, দেখা হবার পর মনে হয় শুধু কি এই টুকুর জন্যেই এত বছরের অপেক্ষা ছিল। যে সম্পর্ক হতে পারত দুর্ভাগ্য আর পরিস্থিতির চাপে তা কবেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আজ এত বছর বাদে আর কী প্রত্যাশা থাকে মানুষের? দেখা হলে যোগাযোগ রাখলেই হারানোর দুঃখ দূর হয় না। তবে সান্ত্বনা থাকে যে জীবনের মস্ত একটি অভাববোধ যেন আংশিকভাবে দূর হয়েছে। বড় গোপন অথচ গভীর ক্ষতর ওপর সামান্য প্রলেপ পড়েছে।

এই দেখা হওয়া, যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রে তিন পক্ষের মধ্যে বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছে এমন উদাহরণই বেশি। সুজ্যানের বিয়ের সময় তার বাবা মা কিছুতেই তার আসল মাকে আমন্ত্রণ জানাননি। মেয়ে পালিত হলেও তার বিয়েতে হঠাৎ এক অল্পশিক্ষিত, সামান্য চাকুরে মহিলা এসে আসল মায়ের পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন—এ বিষয়ে তাঁদের ঘোর অমত ছিল। সুজ্যান মনে কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করে অশান্তি সৃষ্টি করেনি। তবে তার বিয়ের পর যখন প্রথম সন্তানটি জন্মাল তখন নাতি দেখতে সেই মা আবার এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ফ্লোরিডা থেকে। আপাতত নাতিকে নিয়ে দুই ঠাকুমার একটু মিটমাট হয়েছে।

অনেক সময় ছেলে-মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করে। মাকে খুঁজে পাওয়ার পর বাড়িতে যখন মনোকষ্ট, অশান্তি শুরু হয় তখন অভিভাবকদের দুঃখ দিতেও ইচ্ছা হয় না।

অথচ মার জন্যেও মায়া হয়। ফলে গোপনে গোপনে দীর্ঘকাল যোগাযোগ রেখে যায়। বহু ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে, দেখা হয়ে বিষণ্ণতা আরও গভীর হয়েছে। পালিত সন্তান যত স্নেহ ভালবাসার মধ্যেই মানুষ হোক, মনে মনে একটি ক্ষোভ তাদের থাকেই। তারা ভাবে কখনও কেউ তাদের ছেড়ে গিয়েছিল। তারা অবহেলার শিশু ছাড়া কিছু নয়। এই দুঃখ ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হতে পারে যদি দেখে পরবর্তী জীবনে সেই মা নতুন ছেলে মেয়ে নিয়ে আবার সংসার করছে। এমন কোনও কারণ খুঁজে পায় না, যার জন্যে মা তাকে নিষ্ঠুরের মতো ত্যাগ করে গিয়েছিল। ক্রমাগত মান, অভিমান, দোষারোপ করে করে সে অস্থির করে দেয় মাকে। মায়ের পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে যেন প্রতিশোধ নেবার জন্যেই। এমন ক্ষেত্রে সাহায্য করেন নানা অ্যাডপশন কাউনসেলিং সেন্টারের কর্মীরা। সাইকোথেরাপি বা গ্রুপ থেরাপির সাহায্য পাওয়া যায় সেখানে মেরি কোহেল নামে এক মহিলা বলেছিলেন, ষোলো বছর ধরে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ছেলের খোঁজ পেয়েছিলাম। তাকে যাঁরা মানুষ করেছেন তাঁদেরও সম্মতি নিয়েছিলাম অ্যাডপশন এজেন্সির মারফত। কিন্তু দুঃখ কি জান? ছেলে আমাকে দেখতে চাইল না। জানিয়ে দিল আমাকে দেখার জন্যে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, আগ্রহ নেই। জানি না অভিমান আর বিদ্বেষ থেকে বলেছিল কিনা। তার পর আরও অনেকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

জয়িতা দেবপ্রিয়কে কেউ কেউ উপদেশ দিয়েছেন সময় থাকতে দেবীকে সব কথা বলে দেওয়া ভাল। নয়তো কখন কার কাছে কী শুনবে, তখন প্রতিক্রিয়া হবে অন্যরকম। ওরা নিজেরাও জানে একদিন সেই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। আঠারো বছরের দেবী যত কিছু প্রশ্ন করবে তার অনেক উত্তরই তাদের জানা থাকবে না। সেই অজ্ঞতার দায় তাদের নয়। হয়তো পশ্চিমবাংলার অনাথ আশ্রমের খাতায় দেবীর জন্মের ইতিহাসও এত খুঁটিয়ে লেখা থাকবে না। তখন কি দেবী সিলড রেকর্ডের জন্য অস্থির হয়ে উঠবে? সাত সমুদ্র পাড়ি দেবে হারানো মায়ের সন্ধানে? কী অনায়াস স্বার্থপরতায় জয়িতা ভেবে নেয়—দারিদ্র্য, অপুষ্টি, আর অতিরিক্ত সন্তানের জন্ম দিতে দিতে সেই মার জীবনীশক্তি আর কি অবশিষ্ট থাকবে?

১৮মে ১৯৯১

নিঃসন্তান জীবন

শান্তনু আর শুক্তির বিয়ে হয়েছে বহুকাল। আমেরিকাতেই এসেছে পনেরো বছর হতে চলল। ওদের ছেলে মেয়ে না থাকার একটিই যুক্তি—বাবা মা হওয়ার কোনও শখ নেই আমাদের। শান্তনুর ধারণা তার একটি চিরযুবক ভাব আছে। ছাত্র জীবনের দিনগুলোর মতোই হই হুল্লোড় করা, চুটিয়ে মদ্যপান, হেলথ ক্লাবে গিয়ে শরীর স্বাস্থ্য সুঠাম রাখা, পাশ্চাত্য নাচ শেখা, ইচ্ছে মতো নিউ ইয়র্কের 'রাতের অ্যাডভেঞ্চারে' উত্তেজনা ও আনন্দ পাওয়া কৌতূহলবশত পেনসিলভানিয়ার 'ন্যুডিস্ট কলোনিতে' গিয়ে দিগম্বর সমাজের রহস্যটি জেনে আসা—এরকম দায়বিহীন মুক্ত জীবন ওর ভাল লাগে। বউয়ের সঙ্গে রীতিমত বোঝাপড়া আছে বলে দাবি করে। বন্ধনহীন গ্রন্থি জাতীয় ব্যাপার স্যাপার বলে শোনা যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে শান্তনুর ঘোর দ্বিধা। সন্তানের কাছে নাকি তার বিরাট দায়বদ্ধতা এসে যাবে। আদর্শ পিতা হতে গেলে সে এখন যা যা করছে, তার কোনওটাই চালিয়ে যাওয়া যাবে না। সে মিথ্যাচার পছন্দ করে না। ম্যাসাজ পার্লার থেকে ভোরবেলা বাড়ি ফিরে ছেলে মেয়েকে উলটোপালটা কারণ দেখানো তার পক্ষে খুবই গ্লানির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর স্নেহশীল পিতা হতে গিয়ে ও সব জীবনকে বাদ দিয়ে দেবে, এমন শপথও নেওয়া কঠিন। তাই সব দিক ভেবে শান্তনু সিদ্ধান্ত নিয়েছে—বাবা হবার পথ মাড়াবে না। শুক্তি খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে। চাকরি নিয়ে অনেকটা সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখে। ছেলে মেয়ে না চাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য—ছেলে মেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে শান্তনুর ওপর ভরসা করা অসম্ভব। আমারও কেরিয়ার আছে। শেষে সব ঝামেলা আমার ওপর এসে যাবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি। আমার কোনও অভাব বোধও নেই।

দীপঙ্কর, মীনারও সিদ্ধান্ত ছিল এইরকম। তবে যুক্তি ছিল অন্য। দীপঙ্কর শৈশবে পিতৃহীন। মাও মারা গেছেন অল্প বয়সে। দুই দাদা অসময়ে মারা গেছেন ভরা সংসার রেখে। দীপঙ্করই একমাত্র পুরুষ অভিভাবক সে সময়। আমেরিকাতে আসার পর আর্থিক দায়দায়িত্ব সবই নিয়েছেন ভাইপো ভাইঝিদের মানুষ করার জন্যে। মীনাকে বিয়ে করে আনার আগে স্পষ্ট বলে নিয়েছিলেন, ওঁদের কোনও সন্তান না হওয়াই ভাল। দীপঙ্করের দৃঢ় বিশ্বাস ওঁদের বংশে আয়ু অত্যন্ত কম। অসময়ের মৃত্যু বার বার পরিবারকে অসহায় অবস্থায় রেখে গেছে। আর নতুন করে নিজেদের জীবনে সে ঝুঁকি নিতে চান না। নিজেরও অল্প বয়স থেকে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়েছে। মীনা ওঁর কথা মেনে নিয়েছিলেন। মনে মনে মা হবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দীপঙ্করের মন প্রস্তুত নয় জেনে বিশেষ চাপ দেননি। দু'বছর আগে ম্যাসিভ্ হার্ট অ্যাটাক হল দীপঙ্করের। হাসপাতালে নিতে নিতেই সব শেষ। বয়স হয়েছিল ছেচল্লিশ বছর। মীনা এখন একেবারে একা। বন্ধুরা দুঃখ করে বলেন—ওর যদি একটা ছেলে মেয়ে থাকত। জীবনে আর কোনও অবলম্বন থাকল না। মীনা শান্তভাবে বলেন—দীপঙ্করের ভয়টাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত। তবু শেষ সময়ে অনেক শান্তি নিয়ে গেছে, সে কোনও সন্তানকে অসহায় অবস্থায় রেখে গেল না। ছোটবেলায় বাবা না থাকার কষ্ট যে কী, নিজে তো জানত।

মানুষের জীবনে বিয়ে মানেই সন্তান—এমন অবধারিত ঘটনা নিয়ে ক্রমশ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটছে। অবশ্য খুবই ধীরে এবং বলাবাহুল্য নানা যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে। মানুষের জীবনে সন্তানের প্রয়োজন এবং ভূমিকা নিয়ে চিরকালের ধারণা অনুযায়ীই আমরা চলছি। তাই যখনই কোনও নিঃসন্তান দম্পতি দেখি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধরে নিই যে, কোনও শারীরিক সমস্যাহেতু এঁদের সন্তান হয়নি। স্ত্রীকে বন্ধ্যা ধরে নেওয়াটাই ছিল এক সময়ের রেওয়াজ। ক্রমশ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারটিও চিকিৎসকদের কল্যাণে সাধারণ মানুষের মনে স্বীকৃত হয়েছে। তারপরও মানসিকতার প্রসার লক্ষ করা গেছে। নিঃসন্তান দম্পতি বিশেষত স্ত্রীকে তাঁর নিঃসন্তান জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন, সহানুভূতি এবং তাঁর শূন্যতা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানো ইত্যাদি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্যার সমাধান তৃতীয় ব্যক্তির এক্তিয়ারে নেই, সেই সমস্যা নিয়ে বার বার তাঁদের অভাববোধকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াও নিষ্ঠুরতার নামান্তর বলে মনে হয়েছে অনেকের কাছে। মনে মনে যাই থাক, প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার রেওয়াজ কমে আসছে, অন্তত এই অভিবাসী সমাজে। তবে এ সবই সমবেদনা অথবা ভদ্রতাবোধ প্রসূত ব্যবহার। কারণ ধরেই নেওয়া হয়ে থাকে যে সন্তানহীনতা বিশেষ দুঃখের। তারই প্রতিকারের জন্যে এতরকম চিকিৎসা, অপারেশন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক সমস্যার সমাধান নেই জেনে শিশু দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা। পালিত সন্তানকে ঘিরে সংসারে নতুন আনন্দের উৎসব। সেই চিরকালীন ধারণাটি বার বার প্রতিষ্ঠিত হয়—সন্তানই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধন। সন্তানের অভাবে দাম্পত্য জীবনে পূর্ণতা আসা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে প্রচলিত ভাবনাটি বেশ স্পষ্ট। কিন্তু ইদানীং অন্য যে ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তা হল ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানবিহীন জীবনে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের বেঁচে থাকার মূলমন্ত্রটি তবে কি? এত আকর্ষণই বা কোথায়?

তাঁরা কি উত্তর দেন শোনার আগেই অনেকের অনুমান নির্ভর মন্তব্য শোনা যায়—'ইচ্ছে করে ছেলে মেয়ে চায় না, এ একেবারে অসম্ভব কথা। নিশ্চয়ই কোনও শারীরিক সমস্যা আছে। লোকের কাছে স্বীকার করতে চায় না।' আবার কেউ বলেন—'শিশু ভালবাসে না মানেই অস্বাভাবিক মানসিকতার লোক। স্বার্থপর। নিষ্ঠুর তো বটেই। পুরুষের ক্ষেত্রে অনীহার ব্যাপারটি যদি বা মেনেও নেওয়া যায় মেয়েদের ক্ষেত্রে মা না হতে চাওয়ার ইচ্ছেকে অসম্ভব অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। সন্তান ধারণ এবং পালন করা ছাড়া তার জীবনে আর কী ভূমিকা থাকা সম্ভব—এ নিয়েই গবেষণা চলতে থাকে। এইসব চিন্তাভাবনা অবশ্যই আবেগ নির্ভর। যুক্তি নির্ভরও বটে।

কিন্তু সন্তান যাঁরা চান না তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে কি সত্যিই কোনও অপূর্ণতা থাকে? পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি স্টাডিজ-এর অধ্যাপক ডঃ জে বেলস্কাই বলেছেন—সন্তানবিহীন দম্পতি এবং সন্তান আছে এমন কিছু দম্পতি নিয়ে গবেষণা করে জানা গেছে ওই দলের মধ্যে সন্তানহীন দম্পতিদের বিবাহিত জীবন অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ। কারণ এঁরা সন্তানের সেতুবন্ধন ছাড়াই পরস্পরকে আশ্রয় করে রয়েছেন। অন্য ক্ষেত্রে সন্তান থাকার কারণে বহু দম্পতি হাজার তিক্ততা সত্ত্বেও পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারছে না। শুধু মাত্র সন্তানের জন্যে নিজেদের দৈনন্দিন অশান্তি

সহ্য করে যাচ্ছেন। সুতরাং সন্তান থাকা সত্ত্বেও এঁদের জীবনে শান্তি নেই। সন্তান যাঁরা চান না তাঁরা বলেছেন—বিবাহিত জীবনে এখন যা আকর্ষণ আছে, তাকেই স্থায়ী করার চেষ্টা করছি। সন্তান এনে তার দ্বারা বাড়তি কিছু সুখ পাওয়া সম্ভব হবে কিনা জানি না। সেই অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না। বর্তমানের জীবন যাত্রাই আমাদের বেশি পছন্দ। সন্তান থাকলে এই জীবন অব্যাহত থাকবে না।

এঁদের মধ্যে আছেন ৩৭ বছর বয়স্কা মেলিসা কোহেন সিলভারম্যান। নিজে পাবলিক রিলেশন অফিসার। স্বামী ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এঁরা দু'জনেই বাইরের জগতে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। স্বার্থপর এবং স্নেহহীন মানুষ নিঃসন্তান থাকা পছন্দ করে—এই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে মেলিসার বক্তব্য—স্নেহমাখা অনুভূতি কি শুধুমাত্র নিজের সন্তানের জন্যে সীমাবদ্ধ থাকে? আমার নিজের কাজের জগতে আমি সেই অনুভূতি খুঁজে পাই। আমার নিজের হাতে গড়া এই পাবলিক রিলেশন কোম্পানি। তাকে যত্ন করে বড় করাই আমার কাছে সন্তান পালনের মতো দায়িত্ব। এছাড়া আমরা স্বামী স্ত্রী মিলে যে সব ত্রাণ তহবিলে ডলার দিই, চ্যারিটি উৎসবের জন্যে চাঁদা তুলি, তার প্রত্যেকটিই শিশুকল্যাণের জন্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পাঠানো হয়। —এসব যুক্তি অবশ্য মেলিসার শাশুড়ির মন ভেজাতে পারেনি। তিনি দেখা হলেই হা-হুতাশ করেন এবং ছেলে ও বউকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। মেলিসার কোলে একটি ফুটফুটে শিশু কেমন মানাবে—এরকম স্বপ্নটপ্ন দেখানোর চেষ্টা করলেও মেলিসার সোজা উত্তর—উনি ফুটফুটে নাতি নাতনি পেলে খুশি হবেন বলে আমি মোটেই জীবনযাত্রা বদলাব না।

টমাস হোগানের বয়স সাঁইত্রিশ বছর। একটি কমপিউটার কোম্পানির বড় ম্যানেজার। এঁরা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ঠিক করে রেখেছেন, ছেলে মেয়ে হবে না কোনওদিন। হোগানের খুব রাগ হয়, যখন আত্মীয়স্বজন গায়ে পড়ে জ্ঞান দিতে আসে। তাঁর মতে ছেলে মেয়ে হচ্ছে না কেন জিজ্ঞেস করা প্রথমত অসভ্যতা, ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো। দ্বিতীয়ত ছেলে মেয়ে হওয়াটা নিয়মই বা হবে কেন? তার চেয়ে বরং যাদের পটাপট ছেলে মেয়ে হচ্ছে তাদেরই জেরা করা উচিত—কেন তোমরা না ভেবে চিন্তে জনসংখ্যা বাড়াচ্ছ? বাবা অথবা মা হবার মতো কী যোগ্যতা তোমার আছে যে তোমাদের ভরসায় আরও লোকজন টেনে আনছ?

হোগানের মতো মারমুখি না হলেও নিঃসন্তান দম্পতিদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু আছেন, যাঁরা যুক্তি দিয়ে নিজেদের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারেন। এমন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, যাঁদের জীবিকার জন্যেই দিনের প্রধান সময় কাটে শিশু অথবা কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে। এঁদের বক্তব্য—ব্যক্তিগত জীবনে দায় দায়িত্ব বাড়ানোর চেয়ে কর্মজীবনে অধিক সংখ্যক শিশুর সংশ্রবই আমাদের পছন্দ। সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন বহু কর্মী, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে ছেলে মেয়ে চান না, অথচ কাজ করেন নির্যাতিত শিশুদের জন্যে। এঁদের মনোভাব স্বার্থজড়িত ছোট দায়িত্ব নিয়ে বড় দায়িত্বে ফাঁকি দিতে চাই না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিশুদের প্রতি অনীহা থেকে এঁরা নিঃসন্তান থাকার সিদ্ধান্ত নেননি। অনেকে বলেছেন—কোনও সৃষ্টিশীল জীবিকা থাকলে সন্তানের অভিভাবক হওয়ার মতো টানাপোড়েন আর নেই। অভিনেত্রী ক্যাথরিন হেপবার্নের সন্তানহীনতার এই

ছিল যুক্তি। চিত্রকর, সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রী, কোনও সময় সাপেক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হিসেবে কেউ কেউ মনে করেন—সন্তান পালনের ভার থাকলে তাঁদের সাধনার বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিল্পীর একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোনও একটিকে বেছে নেওয়া উচিত।

সামাজিক জীবনে, কর্মজীবনে বিশেষ প্রাধান্য এবং সাফল্য পাওয়ার ফলে মেয়েদের অনেক সময় মা হবার ইচ্ছে গৌণ হতে থাকে। বাইরের জগৎ থেকে সাময়িক ছুটি নিয়ে ঘরবন্দি হবার চিন্তাও তার আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনও দেখা যায় শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা, অবাঞ্ছিত কিছু ঘটনা থেকে পাপবোধ, বাবা মার মধ্যে অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদির জন্যেও নিজের জীবনে সন্তানের উপস্থিতি বেশ কঠিন সমস্যার মতো মনে হয়। এরা সেই সমস্যা এড়ানোর জন্যে নিঃসন্তান থাকা নিরাপদ মনে করে। বংশগত রোগ, পারিবারিক ধারায় কোনও অস্বাভাবিকতা, ডায়বিটিস, হাঁপানি, হৃদরোগ, চর্মরোগ ইত্যাদির জন্যেও অনেক দম্পতি সন্তান চান না। মানসিক বৈকল্য যদি পরিবারে থাকে, স্কিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি, ভবিষ্যৎ সন্তানের মধ্যে সেই রোগ সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা আছে জেনে এঁরা অনাবশ্যক ঝুঁকি নিতে চান না।

আমেরিকায় সেনসাস ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী প্রতি ৫ জন মহিলা পিছু একজন নিঃসন্তান। প্রায় ৮ বছর ধরে এই রকমই হিসাব চলে আসছে। তবে এর মধ্যে অনেক মহিলা আছেন, যাঁরা গণনার সময়ে নিঃসন্তান থাকলেও ভবিষ্যতে মত পরিবর্তন করতে পারেন বলে জানিয়েছেন।

এদেশে যে কোনও ঘটনায় মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। দম্পতি নিঃসন্তান থাকবেন কিনা, সে সিদ্ধান্তও তাঁরা নিতে পারেন মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করে। এই বিশেষজ্ঞদের উপদেশ হচ্ছে—কখনও পারিবারিক চাপে পড়ে সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত নয়। আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশী তোমাদের সন্তানের দায়িত্ব নেবে না। তোমাদের বিয়ের পর যদি কোনও ভুল বোঝাবুঝি চলতে থাকে, সন্তান এলেই তার সমাধান হবে এটি অত্যন্ত ভুল ধারণা। জটিলতা আরও বাড়বে। সন্তানকে তার জন্যেই চাওয়া উচিত, কোনও সমস্যা মেটাতে নয়। কর্মজীবনে যদি কোনও টেনশন থাকে, সে ক্ষেত্রেও সন্তান এলে মস্ত সুরাহা হবে আশা করো না। মানসিক পরিবর্তন আসবে হয়তো, কিন্তু টেনশন ম্যাজিকের মতো অদৃশ্য হবে না। বরং নতুন দায়িত্ব আসায় দুর্ভাবনা আরও বাড়তে পারে। প্রতিটি সমস্যার চেহারা আলাদা, সমাধানের প্রক্রিয়া আলাদা, একটির সমাধানে অন্যটির প্রয়োগ চলে না। বিশেষত সন্তানকে সে অর্থে ব্যবহার করা যায় না। এটিও স্বাভাবিক যে মানুষের সিদ্ধান্ত বরাবর এক থাকে না। নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা। এটি সম্ভব যে বিয়ের পর প্রথম বেশ কয়েক বছর নানা ব্যস্ততা, উন্নতির চেষ্টা, অনেক উপার্জন ও খরচের ইচ্ছা, ব্যক্তিগত আরাম ও সুখের জন্যে সন্তান সম্ভাবনার কথা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শখ, সাধ মিটে গেলে দায় দায়িত্বের ইচ্ছে হয়, সন্তানের জন্যে আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। সুতরাং মত পরিবর্তনের ব্যাপারটিও স্বাভাবিক এবং আন্তরিক বলে বুঝতে হবে। দু'জনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সব সময় খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার। একজন

যেন অন্যজনের আরোপিত ইচ্ছে নিয়ে জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে অবহেলা না করে। চিকিৎসকের মতে স্ত্রী ও পুরুষের ইচ্ছাকৃতভাবে প্রজনন ক্ষমতা বিলোপ করা অনুচিত। কারণ একটি সন্তান না থাকা সত্ত্বেও টিউব্যাল লাইগেশন করিয়ে পরবর্তী জীবনে অনুতাপ ও হতাশায় মানসিকভাবে অসুস্থ হয়েছেন—এমন মহিলার উদাহরণ আছে। সুতরাং দৈহিক পরিস্থিতি যেন সন্তান জন্মদানের উপযোগী থাকে। ২৫ বছর বয়সে যে ভাবনাকে 'অসম্ভব' মনে হচ্ছে, ৩৫ বছর বয়সে পৌঁছে সেই ভাবনার জন্যেই হয়তো মন অস্থির হয়ে উঠতে পারে। যদি মত বদলাতে ইচ্ছে হয়, অভিজ্ঞ অভিভাবকদের পরামর্শও কাজে লাগে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, অভিভাবকরা আশ্চর্য হন না। যে কোনও বয়সেই সন্তান পালন সম্ভব—এই অভয় বাণীটি নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেন। সুখে, দুঃখে, আনন্দ বেদনায় মিশে থাকা এ অভিজ্ঞতার যে কোনও পরিপূরক নেই—অভিভাবকদের মতো করে সেই বার্তা জানতে পারেন?

সন্তান ধারণ অবশ্যই উপরোধে ঢেঁকি গেলার বস্তু নয়। নিউ ইয়র্কে আছেন মধুছন্দাদি। দেশে গেলে হোটেলে ওঠেন। নিজে কোনওকালে বাচ্চাকাচ্চা বরদাস্ত করতে পারেন না। ঝাড়া হাত-পা মানুষ। কিন্তু দেশে গেলে শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি, বোনের বাড়ি যেখানেই উঠুন, ছোটদের চ্যাঁ ভ্যাঁ লেগে থাকে। বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়, ঘুমের দফারফা। তারপর নানা উপদ্রব, রুজ লিপস্টিক ঘাঁটা, ঘড়ির স্প্রিং নষ্ট করা—এসব তো আছেই তার চেয়ে হোটেলে উঠে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঝাঁকি দর্শন দিয়ে আসা ঢের ভাল। এক সময় ভাল নাচতেন। শারীরিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে মা হওয়ার ইচ্ছে হয়নি বলে শোনা যায়। মধুছন্দাদির বর অভিরূপদা শান্তশিষ্ট মানুষ। কথাবার্তা কমই বলেন। শুধু ছোট ছেলে মেয়ে দেখলে চোখ দুটি কৌতুকে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

শান্তনুর দিদি পরী থাকে এখানে। মাঝে মাঝে বিকট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—উঃ শানুটার শ্রাদ্ধ হবে না। ওর ভাগ্যই এরকম। জন্মাল যখন, আমার দাদু মারা গেলেন। মুখে ভাত হল না। বিয়ে করল বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে। কী ছাতার রেজিস্ট্রি বিয়ে করে এল! আবার দ্যাখো, একটা ছেলে মেয়ে হল না। তাহলে? তুই মরলে তোর তো শ্রাদ্ধও হবে না!

শান্তনু ওরফে শানু হো হো করে হেসে ওঠে। পরকালে নিজের সুরাহা হবে বলে এখন থেকে জ্যাক ড্যানিয়েল আর শিভ্যাজ রিগ্যাল-এর বোতল ছেড়ে ফিডিং বোতলের সন্ধানে ছুটবে নাকি? পিতা শব্দটা বড্ড পবিত্র পবিত্র শোনায়। যাকে তাকে মানায় কখনও?

১৫ জুন ১৯৯১

সিঙ্গলস এক্সপো

সিংহী খোঁজে সিংহকে, নিজের বয়স চল্লিশ/সুঠাম গড়ন সিংহীদেবী, দেখায় যেন বাইশ।/শাবক, টাবক একটিও নেই, স্তাবকই দরকার/শক্তিশালী সিংহ এলে, সিংহী খুলবে দ্বার।/সিংহী জানে মরণ কামড়, ভ্যাম্পায়ারের ধাঁচ/এই নম্বরে ডায়াল করুন, ষোলো, তেরো, পাঁচ।

মাঝে মাঝে অনুবাদের প্রেরণায় সাংঘাতিক সব কবিতা লিখে ফেলি। খবরের কাগজের ব্যক্তিগত কলমে 'সঙ্গী চাই' বিভাগে যা সব রগরগে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, তার একটু নমুনা দেখাতে গেলে কবিতাতেই বেশ খোলতাই হয়। নিছক গদ্যে লেখা বটতলামার্কা সেইসব আবেদনকে একটু 'শোধন' করে নিয়ে ছড়া স্টাইলে ছড়িয়ে দিই। আর একটা শুনবেন? যাট বছরের নবীনকুমার, গোঁপ, দাড়ি নির্মূল/বউ মরেছে গত বছর বিরহে ব্যাকুল!/ ব্যবসা থেকে ডলার কড়ি জমছে লাগাতার/স্বর্ণকেশী সুন্দরী কেউ আসবে নাকি আর?/আমার হাইট প্রায় ছয় ফিট, সেটা কিছুই নয়/ওজন শুধু একটু বেশি, তাতেই কী বা ভয়?/বিশ্বাসী এক সঙ্গিনী চাই, শুধু 'আমার নারী'/বিয়ের কোনও ব্যাপারই নেই, টাইমে ছাড়াছাড়ি।

পদাবলী আর লম্বা করব না। এবারের লেখার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওই বিজ্ঞাপনগুলোর কিছু পরোক্ষ সম্পর্ক আছে বলে দুটো একটা উদাহরণ দিলাম। আবার ছড়া লেখার ইচ্ছে হলে হয়তো একটা পরে লিখতেও পারি। সে যাক, এবার আসল প্রসঙ্গে আসি।

আমেরিকায় প্রতি বছর কোনও না কোনও দলের বিশেষ উৎসবের সময় আসে। যেমন এই তিরানব্বই সালকে নিজেদের বছর বলে বেছে নিয়েছে চিরকুমার/কুমারীরা। কৌমার্যের সঙ্গে এদের অবস্থাকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হল না। বরং বলা উচিত অবিবাহিত সম্প্রদায়, যাদের এদেশে 'সিঙ্গল' বলে। মান্ধাতার আমলের ধারণা নিয়ে মাঝে মাঝে এরকম গোলমাল করে ফেলি। যাই হোক, অবিবাহিত সমাজ এ বছরে মহা ধুমধাম করে একা থাকার মহোৎসব পালন করতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় শ'পাঁচেক লোক মিলে দশ ডলার করে টিকিট কেটে 'সিঙ্গলস এক্সপো'তে প্রভূত আনন্দ করে এল। স্যান রাফায়েল শহরে আমেরিকান সিঙ্গলস নামে একটি ক্লাব আছে। তারাই ছিল উদ্যোক্তা। সারা বছর ধরে নাকি এরকম অনেক অনুষ্ঠান চলবে। এ দলের মূলমন্ত্র, ভেবে দ্যাখ মন কেউ কারও নয়। ওই এক্সপো বা মেলাতে দোকানিরাও বেশ গুছিয়ে বসেছিল। জাহাজে প্রমোদ ভ্রমণ, লিমোজিন বা ভাড়াগাড়ির এজেন্সি, একা-দের জন্য হেলথ স্পা—এই সবই তাদের ব্যবসা। মনে করুন—কয়েকজন একা একা মানুষ ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে বেড়াতে যেতে চায়। এই জাহাজ কোম্পানিগুলোর কাজ হল টিকিটে বিশেষ ছাড় দিয়ে সব 'একলা চলো'দের ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারপর মাঝসমুদ্রে গিয়ে একারা যদি একা থাকতে না চায়, সে বন্দোবস্তও মজুত থাকবে। না, কোনও ভাড়াটে ব্যাপার নয়। স্বাভাবিক আকর্ষণেই একাদের মধ্যে ভাব হয়ে যেতে কতক্ষণ? জাহাজ কোম্পানি সেই সব সম্ভাবনার কথা বুঝেই মিলিয়ে মিশিয়ে সিঙ্গলসদের টিকিট বিক্রি করে।

এদেশের অবিবাহিত সমাজ আবার নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। চিরকুমার বা কুমারী থাকা আপাত উদ্দেশ্য হলেও মানসিকতার প্রভেদ অনুযায়ী এরা নানা দলের সদস্য হতে পারে। একটা দলের নাম ভেজিমেটস। এরা সবাই শাকাহারী। সিংহীর ছদ্মনামে আমাদের স্থানীয় কাগজে যে মহিলা সিংহের মতো সঙ্গীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, মনে হয় এ দলের নয়! চিরকুমার সভার মধ্যে আছে স্টার গেজার্স দল। তারা আবার জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করে। রাশিচক্র নিয়ে, ভূত, ভবিষ্যৎ বাণী নিয়ে বেজায় আগ্রহ তাদের। নিয়ম করে ফরচুন টেলারের কাছে যায়। আবার একদলের নাম হল 'আনঅ্যাটাচড স্মোকার্স অফ আমেরিকা।' এই বন্ধনমুক্ত দলের প্রধান কাজ ধূম্রপান। যেসব নিঃসঙ্গ মানুষ আপনমনে সিগারেট খায়, তাদের জন্যে এই ক্লাব। রিচার্ড গস নামে এক চিরকুমার ভদ্রলোক হলেন 'আমেরিকান সিঙ্গলস' ক্লাবের চেয়ারম্যান। তিনি মাঝে মাঝেই একাদের ক্লাস নেন। পাঠক্রমের বিষয় হল—কীভাবে একা একা সুখে থাকা যায়?

কিন্তু মুশকিল হল এই সুখের পন্থাকে খুব বিশ্বাসযোগ্য করে প্রচার করা সহজ হচ্ছে না। কারণ যতই সিঙ্গল সমাজ বলতে চেষ্টা করুক যে, দিল্লির লাড্ডু খেয়ে কাজ নেই, তারা কিন্তু ঘুরে ফিরে সেইসব সেমিনার আর সিমপোজিয়ামেই গিয়ে বসে, যেখানে সিঙ্গলদের মেলামেশার মূল লক্ষ্য জীবনসঙ্গী নির্বাচন—এরকম আলোচনাও হয়ে থাকে। ওই যে ক্যালিফোর্নিয়ায় মহোৎসব হল, সেখানে একটি ভিডিও ডেটিং সার্ভিস বেশ অনেক ডলার ঢেলেছিল। তাদের নাকি বিয়ে দেবার ফলাও ব্যবসা। নাম দিয়েছে 'গ্রেট এক্সপেকটেশন'। ভিডিও চালিয়ে পাত্র পাত্রী দেখায়। টিভিতে হুক আপ সিস্টেমে ক্যালিফোর্নিয়ার সিংহের সঙ্গে টেকসাসের তন্বী সিংহীর আলাপ করায়। এভাবে দিনে নাকি তারা কমপক্ষে তিনটে বিয়ে ঠিক করে ফেলছে ইদানীং। আর কিছু কিছু মহিলা তো স্পষ্টই বলেছেন যে তাঁরা ওই মহোৎসবে গিয়েছিলেন শুধু বর খুঁজবার জন্যেই। এতরকম কুমার কোথায় পাওয়া সম্ভব?

'আমেরিকা সিঙ্গলস' দলের সদস্যরা অবশ্য বেশিরভাগই মনে করে—আমেরিকার ইতিহাস অনুযায়ী এখন হল একক জীবনযাপনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময়। গত একশো বছরের মধ্যে এত বেশি সংখ্যক অবিবাহিত নারী পুরুষ দেখা যায়নি। কুমার, কুমারী, ডিভোর্সি, বিধবা ও বিপত্নীক মিলিয়ে দেশের শতকরা চল্লিশ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এখন একা থাকে। ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে যাঁরা একা থাকতে বাধ্য হন, তাঁদের সম্পর্কে আমেরিকার মূল সমাজের তেমন কোনও বক্তব্য নেই। কিন্তু যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধনমুক্ত হয়ে থাকতে ভালবাসেন, তাঁদের সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ মানুষের এক ধরনের কৌতূহল নাকি কোনওমতে নিবারণ করা যাচ্ছে না। অন্তত সিঙ্গলরা সেরকম বলছেন। পারিবারিক মূল্যবোধ, নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ থেকে 'একা'রা বিচ্যুত হয়ে নেহাত স্বার্থপরের মতো বাঁচতে চায়—এ ধরনের মন্তব্য সিঙ্গলদের একদম পছন্দ নয়। মোট কথা কেউ বিয়ে না করলেই তাকে 'অস্বাভাবিক' বলার চেষ্টা মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। তাঁদের মতে—অধিকাংশ বিয়েই তো ধোপে টেকে না। নয়তো দুটো বোকা লোক একসঙ্গে জুটে গিয়ে আরও বোকার মতো বেঁচে থাকে। মনের মিল নেই, বুদ্ধির চর্চা নেই, শুধু গদগদ হয়ে বসে থাকা! বোকাদের সঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকা ঢের ভাল।

একারা গবেষণা করে জেনে ফেলেছে যে অবিবাহিতা মহিলারা দীর্ঘজীবী হন। বিবাহিতাদের চেয়ে তাঁদের স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে। বুদ্ধিমতী মেয়েরা জন্মে বিয়ে করে না নাকি! কিন্তু পুরুষের বেলায় ঘটনাটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিসটিক্স' বলছে—বিয়ে করলে পুরুষের পরমায়ু বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য আগে ভাঙলেও, পুরুষের স্বাস্থ্য দিব্যি মজবুত থাকে। 'একা' সমাজের সব মেয়েই তাই বলে অবিবাহিতা থাকতে রাজি নয়। হয়তো সাময়িক একা থাকায় বেশ মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। একটি মেয়ে হিপনোথেরাপি করে। সম্মোহন বিদ্যা আর রূপচর্চার কোর্স দিয়ে রোজগার করে। দু'বার বিয়ে ভেঙে যাবার পর এখন সিঙ্গলস ক্লাবে যাতায়াত করছে বটে, কিন্তু মনে দিব্যি বিয়ের বাসনা আছে। সে বিশ্বাস করে—আছে সে কোথায়, আজো তারে হয় নাই চেনা...।

একাকিত্ব শেষ হোক বলে যাঁরা সিঙ্গলস জমায়েতে আসেন, তাঁদের সাহায্য করার জন্যে মহিলারাই বেশি তৎপর হয়ে ওঠেন। 'অন লাইন ইন্ট্রোডাকশনস' নামে প্রজাপতি অফিসের মালিকও একজন মহিলা। তিনি ডেটিং সার্ভিসের ব্যবস্থা করে একাদের সঙ্গী জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। ছবি, আর কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে ফর্দ বানিয়ে তারপর বিলি ব্যবস্থা।

একাদের মনোমত সঙ্গী জুটিয়ে দেওয়া বেশ কঠিন। নেহাত কম বয়সে তবু একরকম। তখন দু' চোখ স্বপ্নের কাজলে মাখামাখি। জ্ঞানে, অজ্ঞানে আপন মনের মাধুরী টাধুরি মিশিয়ে একাকার কাণ্ড! কিন্তু তারপর মন অত সহজে ভোলে না। চাওয়ার ফিরিস্তি কত? সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের খুঁতখুঁতুনি আর যায় না। এক ভদ্রলোক তো তিতিবিরক্ত হয়ে নিজেই ঘটকালি ব্যবসা আরম্ভ করলেন। সঙ্গিনী পাবার জন্যে আগে আগে যতবার 'ডেটিং সার্ভিসের' সাহায্য চেয়েছেন, তারা যা খুশি তাই গছানোর চেষ্টা করেছে। কোনওবার 'ফুলমালা' বা 'আদরিণী' এসে উপস্থিত। কোনওবার মেঘে মেঘে বেশ বেলা হয়ে যাওয়া মধ্যযৌবনা। শেষমেশ ভদ্রলোক নিজেই কম্পিউটারে সঙ্গী নির্বাচনের ব্যবসা খুলেছেন। মাসে পঞ্চাশ ডলার করে দক্ষিণা ছ'মাসের মধ্যে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা। রাত দুটো পর্যন্ত তিনি ওই অফিস খোলা রাখেন। কারণ, ডেট করার পর আলোচনা অথবা নালিশ করার জন্যে যাতে ক্লায়েন্টরা দৌড়ে আসতে পারে, সেই বিবেচনায়। নালিশ করার প্রবণতা নাকি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ডেট ফেরত নিশুতি রাতে তাঁর অফিসে হানা দিয়ে বহু মহিলা শাসিয়েছে—'পয়সা নিয়ে বুড়ো গছানো? চালাকি? সিনেমা দেখতে বসে ঢুলছিল...'। অভিযোগ করতে পুরুষও কিছু কম যায় না। তারা কেবলই তন্বী খুঁজবে। শিক্ষিতা, সংস্কৃতিসম্পন্না, সঙ্গীত বোদ্ধা, স্কিইং-এ পারদর্শিনী, এতরকম বায়নাক্কা সব কেবল মুখে। যখন খুঁজে পেতে এমন সব গুণাগুণ সম্পন্না মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হল, তখন বার দুই ডেট করার পরেই নালিশ—'আসলে এত যে মুটকি বুঝতে পারিনি। রোগা মতো গুণী পেলে বেশ হত...'। বেশিবয়স্ক লোকেদের খুব একটা আবদার থাকে না। মোটামুটি সঙ্গী একটি পেলেই হল। বিয়ে হওয়াটা বড় কথা নয়। এক সঙ্গে সময় কাটানো নিয়ে কথা। কিন্তু একক যুবক সম্প্রদায় পাকা জহুরি। এক মহিলা 'ইয়াংগার মেন অ্যান্ড ওল্ডার উইমেন' নামে ডেটিং এজেন্সি খুলে মোট সাতশো আটশো জনের কাছে সাড়া

পেয়েছেন। এখানে ২১ বছরের কমবয়সী পুরুষ আর ৩৫ বছরের কমবয়সী মহিলাদের সদস্য করা হয় না। কোম্পানির ব্রোশিওরে নানা বিখ্যাত লোকেদের বাণী ছাপানো হয়েছে। কবে নাকি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন—কেন বয়সে বড় মহিলাকে বিয়ে করা উচিত।...ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি বলতে কি আমেরিকানদের মধ্যেও এরকম ধারণা প্রচলিত আছে যে বউ একটু বড় হলে মন্দ হয় না। বান্ধবীর বয়স বেশি হলে তো আরও আকর্ষণীয়া হয়। সে জানে কত বেশি। বোঝে কত বেশি। পৃথিবীকে দেখেছে বেশিদিন। আবেগ, অনুভূতি যতই গভীর হোক, সংযত হতে জানে। অকারণ জেদাজেদি, বায়না, আবদার কিচ্ছুটি নেই। পরিণত বলতে যা বোঝায়। কৃতজ্ঞতাবোধও তার এত যে সময়ে কেটে পড়তে চাইলেও সে 'স্মৃতিটুকু থাক' বলে ব্যাগ দুলিয়ে ফিরে যাবে।

আমেরিকান মেয়েরাও কিছু সহজলভ্য নয়। সিঙ্গল থাকব সেও ভাল, তবু ভূষিমালের দিকে নজর দেব না। জীবনযাত্রার মান এমন বাড়িয়ে ফেলেছে যে, ওইভাবে বরাবর থাকতে পারবে কিনা না জেনে, হুট করে সঙ্গী জোটাবে না। বর না হলেই বা? সঙ্গীরও তো একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকা চাই? তুমি গুণে গুণে ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে স্যাঙ্গুভ্যালির কেবিনে (আছে এখনও?) বসে মাটন কবিরাজি চালাবে নাকি? ওসব কোন কালের গল্প কথা হয়ে গেছে?

তা আমেরিকান মেয়েদের যখন এত পায়াভারী, সাধারণ মানুষগুলো যায় কোথায়? একা একা উইক এন্ডে ঘুরঘুর করার চেয়ে অন্য ধরনের কোনও 'ডেটিং সার্ভিসে' নাম লেখানো যায়। মুশকিল আসান সর্বত্রই আছে। দেশোয়ালিরা যদি মামুলি লোক বলে পাত্তা না দেয়, বিশ্বসংসারে কি লক্ষ্মীমেয়ের অভাব আছে? বুদ্ধি খাটিয়ে 'প্যাসিফিক রোমান্স ইনকরপোরেটেড' খুলে বসেছেন এক ভদ্রলোক। নিজের বউটি ফিলিপিনো। ডেটিং অফিসের দেওয়ালে কর্তা গিন্নির যুগল মিলনের ছবি। আমেরিকান বর আর ফিলিপিনো বউ পরস্পরের দিকে মোহিত হয়ে চেয়ে হাসছে। একটা মোটা বই কিনতে পাওয়া যাবে। দাম চল্লিশ ডলার। তার মধ্যে পাতায় পাতায় শুধু আধবোজা চোখে চেয়ে থাকা ফিলিপিনো রমণীদের স্বল্প বাস পরা ফুল সাইজ ছবি। প্রত্যেকের পাশে নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর। পছন্দ হলে বিদেশিনী সিন্ধুপার হয়ে চলে আসবে। বিয়ের আশাতেই অবশ্য। আর সে বিয়ে যে কত সুখের হবে তার গ্যারান্টি দিচ্ছেন ডেটিং এজেন্সির মালিক। নিজের উৎফুল্ল বউ-এর মুখপানে চেয়ে চেয়ে বলছেন—ফিলিপিনের মেয়েদের কালচারই অন্যরকম। কী শিক্ষা! আগে স্বামী, পরিবার, তারপর সে নিজে। হুঁঃ আমেরিকান মেয়েদের কাছে বলতে যাও না একবার।

তবে এদের এজেন্সিতে তেমন ব্যবসা হচ্ছে না। জোগাড় যন্ত্র করে কে আর অন্য কালচারের মেয়ের আশায় বসে থাকতে চায়? ঘুরে ফিরে সেই বিড়ালাক্ষীর সন্ধানেই এজেন্সি থেকে সিঙ্গল ক্লাবে নয়তো চার্চে ফিরে আসে। কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে?

'পসিটিভ কানেকশনস' নামে যে এজেন্সি আছে, তার কায়দা কানুন অন্যরকম। তিন মাসের জন্যে হাজার ডলার দিয়ে সদস্য হতে হবে। প্রতি ডিনারের জন্যে ষাট ডলার দিতে

হবে। সেখানেই দেখাশোনা, চেনা, জানার সুযোগ। যে মহিলার এজেন্সি, তিনি ভীষণ করিৎকর্মা। এজেন্সির ডিনারে এক মনমোহন কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে নিজেই প্রেমে মশগুল। অন্য পাত্রী না খুঁজে নিজেই ভিড়ে গেছেন। এদিকে আগের প্রেমিককে নিয়ে মহা সমস্যা। তার আগেও একজনের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। এই দুজন উত্তীয়র প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এজেন্সি থেকেই দুজন সঙ্গিনী এনে দিয়েছেন। কারও কাছে পয়সা কড়ি নেননি। হ্যাঁ, অনেককাল আগে ডিভোর্স করাতে তার আধবুড়ো এক বরও ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খবর পেয়ে তাকেও গোলগাল একটি মহিলার সঙ্গে ভাব করিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যেও পয়সাকড়ি চাননি। ব্যবসা করছেন বলে তো আর মায়া মমতা বিসর্জন দেননি!

একা থাকার জন্যে যাঁরা বিয়ে থা করেন না বা আত্মীয়, স্বজনের সঙ্গেও বাস করেন না, তাঁদের নিঃসঙ্গতা বোধ সাধারণের তুলনায় কম বলে ধরে নেওয়া যায়। বিশেষত আমেরিকায়। কারণ এদেশে পারিবারিক দায়দায়িত্বের চাপে পুরুষ চিরকুমার থাকেন না। স্ত্রীর মৃত্যু হলে বা ডিভোর্স হয়ে গেলেও একা থাকার জন্যে কোনও পরিস্থিতিমূলক চাপ সৃষ্টির ব্যাপার নেই। এঁরা সকলেই যে নারীর সম্পর্কে অনাগ্রহী এমনও নয়। সম্ভবত কমিটমেন্ট বা দাম্পত্য দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করতে চান না। নিজের ইচ্ছেমত জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চান। মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের মানসিকতা কাজ করে। সাময়িকভাবে সঙ্গী পাওয়ার সমস্যা নেই, সামাজিক জীবনে নিঃসঙ্গতা দূর করার বিভিন্ন উপাদান আছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কারণে ভরণপোষণের জন্যেও স্বামীর প্রয়োজন বিশেষ জরুরি নয়। আর শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এত অবাধ যে, তার জন্যেও বিবাহ বাহুল্য মাত্র। সুতরাং যাঁরা একা একা থাকতে চান, পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালনের বাইরে, সেই মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দ স্বাধীন জীবন তাঁদের অন্য কোনও রসের সন্ধান দেয়।

এদেশে একা থাকা মানুষদের সংখ্যা ক্রমশ ভারী হচ্ছে জেনে, একথা মেনে নিতেই হয় যে তাদের সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তিনিষ্ঠ সারবত্তা কিছু আছে। কী সেই যুক্তি? শুধু বোকা লোকরাই বিয়ে করে? দুই বোকা মিলে গিয়ে ঘোর বোকার সংখ্যা বাড়ায়? মেয়েরা বিয়ে করলে অসময়ে মরে যায়? বিয়ে মানেই দুঃখ, কষ্ট, স্বাস্থ্যহীনতা? আমি কি তবে কৃতকর্মের জন্যে এতকাল পরে অনুশোচনা করব? কিন্তু কী প্রমাণ আছে যে আমাদের চেয়েও বোকার কম্বিনেশন অবিবাহিত সমাজে নেই? কে গেছে তাদের প্রত্যেকের বুদ্ধ্যঙ্ক মাপতে? আই কিউ-এর বাংলা কী হয় জানে তারা প্রত্যেকে? বিবাহিত মানুষের 'ক্রিয়েটিভিটি' যে কী জিনিস সঞ্জয় গান্ধী জানত। ••• সেই মহৎ অবদানের প্রতিযোগিতা বোকাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? আরও কতরকম সৃষ্টিমূলক প্রজেক্টে বোকারা ভিড়ে যায়। বিয়ের পরেও হা হুতাশের গান গায়। প্রেমের কবিতা লেখে। থান ইট সাইজের উপন্যাস বোকারা কম লিখেছে? লেখার রসদ পাচ্ছে কোথায়? এক থেকে খান খান হয়ে শতধা বিভক্ত হবার অভিজ্ঞতা নিয়েই লিখছে তো।

হঠাৎ মনে পড়ল শিব্রাম ছিলেন নমস্য ব্যক্তি। সেই অসাধারণ একা মানুষের অসামান্য ক্রিয়েটিভিটির কথা স্মরণ করে রণে ভঙ্গ দিলাম। বোকাদের দলে ওঁর সমতুল্য কাউকে পাচ্ছি না।

এবার ফাইনাল ছড়াটা লিখে ফেলি। কাগজে দেখা 'সঙ্গী চাই' বিজ্ঞাপনের ভাবানুবাদ।

একা এবং বোকার যৌথ প্রযোজনা।

'আমি ডাক্তার বলে সময় পাই না খুঁজতে নতুন সঙ্গী।
আগের স্বামীকে খেদিয়ে দিয়েছি, মনোভাব তার জঙ্গি।
এখন আমার বয়স চলছে তিরিশের কাছাকাছি।
ছোট ছেলে নিয়ে মস্ত বাড়িতে বড্ড একলা আছি।
যে কোনও পুরুষ, জু হতে পারো, হতে পারো ক্রিশ্চান।
একটি শর্ত, আমার
বাড়িতে চলবে না ধূমপান। লেখাপড়া জানা ভদ্র মানুষ, বেঁটে যদি নাহি হও
মোটা না হলে তো আরও ভাল হয়, গলফ খেলতে যাও?
কনসার্ট শোনো? থিয়েটার দ্যাখো? বই পড়ো নিয়মিত?
ব্যাঙ্কেতে কিছু সঞ্চয় আছে আপনার অর্জিত?
আমার সঙ্গে মেশার জন্যে এই গুণগুলো চাই
তোমার কণ্ঠস্বরের আশায়, (আমি) কান পেতে রই।'
ভ্রমর যেথা...নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে!

৬ মার্চ ১৯৯৩

বাড়ি থেকে পালিয়ে

পোস্ট অফিসের দেওয়ালের পোস্টারে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছবি। সুপার মার্কেটের দুধের বাক্সের গায়ে কয়েকটি মুখ। পাশে নাম, বয়স আর নিরুদ্দেশের তারিখ। কতদিন ধরে এইসব হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়ের ছবি দেখছি। নেহাত শিশুদের বাদ দিলে এদের মধ্যে পলাতকের সংখ্যাও অনেক। আমেরিকায় এমন বহু ছেলেমেয়ে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে। নিজের বাড়ি থেকে, নয়তো ফস্টার হোম থেকে পালিয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এ দেশের বড়সড় খবরের কাগজে হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলম থাকে না। শহরতলির স্থানীয় কাগজে বরং বেড়াল কুকুর হারানোর পর উতলা মালিকের আকুল আবেদন টাবেদন বেরয়। রূপসী কালো মার্জারির জন্যে একশো ডলার পুরস্কার কিংবা "সদানন্দ ও ক্রীড়াশীল" জার্মান শেপার্ডের জন্যে শ'পাঁচেক ডলার বখশিস দেবার প্রতিশ্রুতি মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে। কিন্তু ছেলে, মেয়ে হারিয়ে গেলে "বুলা ফিরে এসো, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়" ধরনের চিঠি কখনও ছাপা হতে দেখিনি। তারাপদদের কি অত চিঠিপত্র পড়ার সময় থাকে? কে জানে? এ দেশে আর সে আপিলের ভরসায় না থেকে তদন্তের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হয়। "ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়েটেড চিলড্রেন" সংক্ষেপে এন. সি. এম. ই. সি-র ভার্জিনিয়ার অফিসে হট লাইনে ফোন করে দেবার পর সেখান থেকেই অনুসন্ধান পর্ব আরম্ভ হয়।

ওই প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৯৮৪ সালে। মূল দপ্তর—ওয়াশিংটনের কাছে ভার্জিনিয়ার আর্লিংটন শহরে। বেসরকারি ও অ-লাভজনক সংস্থাটি গত তেরো বছর ধরে নিরুদ্দিষ্ট ছেলেমেয়েদের জন্যে অনুসন্ধান ও উদ্ধারের কাজ করছে। এদের কর্মসূচীর মধ্যে আছে নিরুদ্দিষ্টদের তালিকা প্রস্তুত করে নাগরিক ও পুলিস বিভাগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, বিভিন্ন প্রযুক্তিগত মাধ্যমের সাহায্যে সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, সারা দেশে নিরুদ্দিষ্ট ছেলেমেয়েদের ছবি ও বিবরণ সহ পোস্টার পাঠানো, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের যে দীর্ঘ তালিকা আছে এবং অনুসন্ধানের জন্যে যে অ-লাভজনক সংস্থাগুলি কাজ করছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সংযোগ স্থাপন, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে রাষ্ট্রের যে বিধিবদ্ধ আইন আছে, তার প্রয়োগ ইত্যাদির ব্যাপারেও এই সংস্থা উদ্যোগ নেয়। চব্বিশ ঘণ্টা টেলিফোনের হট লাইন নম্বরে যে কোনও লোক যে কোনও প্রাসঙ্গিক খবর দিয়ে অনুসন্ধানের কাজে সাহায্য করতে পারেন। শুধু আমেরিকা নয়, কানাডা ও মেক্সিকোতেও এদের কেন্দ্র আছে। ফ্যাক্স নম্বর, কমপিউটারের ওয়েবসাইট নম্বরের মাধ্যমে সংস্থা চব্বিশ ঘণ্টাই নিরুদ্দেশ খবরাখবর আদান-প্রদান করছে।' ৯০ সালের এপ্রিল মাসে এন. সি. এম. ই. সি-র সঙ্গে "অ্যাডামস ওয়ালশ সেন্টারস" নামে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত হয়েছে। ফলে ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, নিউ ইয়র্ক ও সাউথ ক্যারোলিনাতে চারটি নতুন শাখা অফিস খোলা হয়েছে। আমেরিকার নিরুদ্দিষ্ট ছেলেমেয়েদের বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে "ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়েটেড চিলড্রেন" নানাভাবে কাজ করছে। জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে ছেলেমেয়ে চুরি, তাদের ওপর যৌন আক্রমণ, ড্রাগ ও অন্যান্য নেশা ধরানো, অপরাধমূলক কাজকর্মে নিয়োজিত করা ইত্যাদি কাজ বন্ধ করা যায়। এই প্রতিষ্ঠান ওয়াশিংটনের কংগ্রেসের আদেশবিধি অনুযায়ী 'ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসেস অফিস অফ জুভেনাইল জাস্টিস অ্যান্ড ডেলিনকোয়েন্সি প্রিভেনশন' দপ্তরের সঙ্গে কাজ করে। পুলিস, সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, নির্বাচিত সদস্য, বিচারক, আইনজীবী, শিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, থেরাপিস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষ একই উদ্দেশ্যে এই সংস্থাকে সাহায্য করে। শুধু পলাতক ছেলেমেয়েরাই তো নয়, অপহৃত এবং বিতাড়িত ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান জাতীয়ভাবে উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের প্রতিটি শিশুর নিশ্চিত আশ্রয়, নিরাপদ ও সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকারকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার জন্যেই এরা সর্বস্তরে কাজ করছে।' ৮৪ সাল থেকে এ বছরের মার্চ মাসের মধ্যে ৫৬ হাজারেরও বেশি হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিয়েছে। উদ্ধারের কাজে পুলিস বিভাগকে সাহায্য করেছে। ৩৫ হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়েকে খুঁজে পেয়েছে। এই সংখ্যা অবশ্য শুধু পলাতকের নয়। অপহৃত এবং বিতাড়িত ছেলেমেয়েদের সংখ্যাই বেশি। "অ্যাডামস ওয়ালশ চাইল্ড রিসোর্স সেন্টার"ও যৌথভাবে সাহায্য করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেছিল ফ্লোরিডার এক দম্পতি জন ও রিভি ওয়াল্‌শ। তাঁদের ছ'বছরের ছেলে অ্যাডামকে ষোলো বছর আগে অপহরণ করার

পর হত্যা করা হয়েছিল। সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ওয়ালশ্ দম্পতি এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের কয়েকটি তালিকাভুক্ত করা হয়। ঘটনার সূত্র অনুমান করে এদের সাতটি তালিকার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অপহরণের চেষ্টা অসফল হলেও 'অ্যাটেম্পটেড অ্যাবডাকশন' বলে নথিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। কারণ যেহেতু ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছরে প্রায় একশো পনেরো হাজার অসফল অপহরণের ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় হচ্ছে—অনাত্মীয় বা অপরিচিত লোকের দ্বারা অপহরণ এবং পুলিসের কাছে খবর আসা। বছরে চার হাজার, ছ'শটি ঘটনা ঘটে। তৃতীয়—অপরিচিত লোকের দ্বারা অপহরণের পরে দীর্ঘকাল শিশুটি নিখোঁজ থাকে। তারপর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরকম ঘটনা ঘটে বছরে প্রায় তিনশোটি। চতুর্থ—বাবা, মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে একজন অন্যজনের হেফাজত থেকে জোর করে সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে যায়। কখনও বাবা অথবা মায়ের অবর্তমানে দুই পরিবারের আত্মীয়রাও এরকম জোর জবরদস্তি করেন। বহু ক্ষেত্রে শিশু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত বদল হতে বাধ্য হয়। বছরে এরকম ঘটনা ঘটে ৩৫৪,০০০। পঞ্চম—বাড়ি বা ফস্টার হোম (সামরিক আশ্রয়) থেকে পালিয়ে যায় ৪৫০,৭০০ জন ছেলেমেয়ে। ষষ্ঠ—বাড়ি বা আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয় ১২৭,১০০ জন। সপ্তম—আহত, অবহেলিত, অসুস্থ অবস্থায় নিখোঁজ ভবঘুরে ছেলেমেয়ে। এদের সংখ্যা ৪৩৮ হাজার ২০০।

এই হিসেব হচ্ছে ছ'বছর আগের বার্ষিক তথ্য। ইতিমধ্যে ওই সাতটি তালিকায় আরও কিছু যোগ, বিয়োগ হয়েছে। যে যে সূত্রে খবরগুলি পাওয়া যায়, তা হল পারিবারিক নিরীক্ষণ (সার্ভে), বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের সামাজিক অবস্থান, পলাতক ছেলেমেয়েদের ফিরে আসার পরে দেওয়া বিবৃতি, তাদের পর্যবেক্ষণ, পুলিস রেকর্ড পরীক্ষা, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের তথ্যের পুনঃবিশ্লেষণ এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজে জড়িত প্রফেশনাল লোকেদের গবেষণামূলক বিবৃতি।

এবারের লেখায় ওই সাতটি তালিকার খুঁটিনাটি আলোচনায় না গিয়ে পলাতকদের বিষয়েই সংগৃহীত খবর জানাচ্ছি। তার আগে ভেবে দেখা যেতে পারে—কেন এরা ঘর ছাড়ে? সুখের আশ্রয় ছেড়ে অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ডাকে সাড়া দেয় কিসের আকর্ষণে? কী আছে সেই জীবনে, যার জন্যে বাবা, মা, ভাই, বোন তুচ্ছ হয়ে যায়?

অনেক কারণেই এরা ঘর ছাড়ে। এক দলের থাকে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। কৈশোরে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের দুর্বার আকর্ষণ। অন্য দলের থাকে বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ, আতঙ্ক অথবা অভিমান বাবা, মায়ের মধ্যে তীব্র অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ, সৎ বাবা নয়তো সৎ মায়ের সঙ্গে থাকার বাধ্যবাধকতা। অতিরিক্ত দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অত্যাচার, স্কুলের নানা সমস্যা, নিজের উদ্বেগের কথা কাউকে বলতে না পারার কষ্ট—এসব কারণে তাদের ধারণা হয় বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেই বোধহয় সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। বারো বছর থেকে সতেরো বছর বয়সের মধ্যে একবার না একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, এরকম ছেলেমেয়েদের সংখ্যা প্রায় ১২%। বাবা, মা দুজনেই বর্তমান, এরকম বাড়ি থেকে সবচেয়ে বেশি নিরুদ্দেশের খবর পাওয়া যায়। পলাতকদের মধ্যে শতকরা ৪৬ ভাগ ছেলেমেয়ে

এরকম পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে। নিরুদ্দিষ্ট দেড়শোজন ছেলেমেয়েকে ফিরিয়ে আনার পর এই খবর জানা গেছে। এদের মধ্যে ৩১% হচ্ছে এমন পরিবারের সন্তান, যেখানে হয় শুধু মা নয়তো বাবা আছেন। বাকি ২৩% নিরুদ্দেশ হয়েছে সৎ বাবা, নয়তো সৎ মার সংসার থেকে। নির্যাতনই হচ্ছে প্রধান কারণ। বাবার অত্যধিক মদ্যপান, দারিদ্র্য ইত্যাদি সমস্যা ছাড়াও নীতিবোধহীন পরিবারে সন্তান নানাভাবে পীড়িত হয়। লিভ টুগেদার করছে, এমন স্ত্রী, পুরুষ বহুক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। স্বার্থপর, অধৈর্য, দায়িত্বহীন, নিষ্ঠুর মানুষের কাছে স্নেহ ভালবাসা, মমত্ববোধের পরিবর্তে শিশু কঠোর শাসন ছাড়া কিছু পায় না। বয়ঃসন্ধিক্ষণে তার প্রতিবাদ করতে চায়। ফলে অত্যাচার বেড়ে চলে। প্রচণ্ড মারধর নানাভাবে বঞ্চিত করা, শাস্তি দেওয়া, শীতের রাতে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, বাড়িতে অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ করতে বাধ্য করা। এর ওপর আছে যৌন অত্যাচারের আতঙ্ক। সৎ বাবা, নয়তো সৎ দাদা, কখনও কোনও নিকট আত্মীয় কমবয়সী মেয়েদের ওপর লুকিয়ে সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। পারিবারিক অশান্তির ভয়ে মেয়েটি কাউকে বলতে পারে না। ক্রমশ নিজের ওপর ঘৃণা জন্মায়। মানসিক দুশ্চিন্তায় পড়াশোনার ক্ষতি হতে থাকে। স্কুলেও পিছিয়ে পড়ার ফলে ভীষণ উদ্বেগ শুরু হয়। ভীষণ চাপ সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ভাবে অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচবে।

বাবা, মায়ের কাছে স্নেহ যত্নে প্রতিপালিত সন্তানও কখনও মুক্তি খোঁজে। তাঁদের অতিরিক্ত প্রত্যাশা, সন্তানকে ঘিরে ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকার জন্যেও কিছু কিছু ছেলেমেয়ের মনে বিক্ষোভ জন্মায়। ক্রমাগত প্রত্যেক বিষয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে এবং আশানুরূপ ফল না পেলে বাবা, মায়েরও হতাশা আসে। বাড়িতে অশান্তি হয়। অক্ষমতার দুঃখ থেকে অপরাধবোধ, সব শেষে পলায়নী মনোবৃত্তি—পরিত্রাণের পথ খোঁজে।

নিরুদ্দেশের সঙ্গে কুসঙ্গেরও সম্পর্ক আছে। অল্প বয়সে খারাপ সঙ্গে পড়ে কিছু ছেলেমেয়ে ড্রাগ, অ্যালকোহলে আসক্ত হয়। চুরির প্রবণতা দেখা দেয়। পড়াশোনা বন্ধ করে স্কুল পালাতে শুরু করে। অথচ দেখা গেছে, এদের কোনও পারিবারিক অশান্তি নেই। নিজের দুর্বলতায় নিজের ক্ষতি করে বসেছে। কেউ বা বেপরোয়া মেলামেশার ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। বাবা, মাকে আঘাত দেবার ভয়ে এরা নিজেদের উদ্বেগের কথা বলতে পারে না। বিষণ্ণতা, আত্মহত্যার ইচ্ছা—সব মিলিয়ে একদিন মরীয়া হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালায়। বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো মানসিক বল না থাকার ফলে আবেগতাড়িত হয়ে পথে নামে।

এ দেশে বিষাদগ্রস্ত ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম নয়। আর্থিক সাচ্ছল্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েও এরা মনে করে বাড়িতে সেরকম আন্তরিকতা, ভালবাসা নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা-মা, নিজেদের কর্মজগৎ নিয়ে ব্যস্ত। অন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা কম। পাড়ায় অথবা স্কুলে এরা সহজে জনপ্রিয় হতে পারে না। সমস্যা তার নিজের মনমরা স্বভাবের জন্যেই। কোথাও বন্ধুবান্ধব পায় না। ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ, অভিমান দানা বাঁধতে থাকে। এ ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছুটা অকারণ বিষণ্ণতা থাকে। সময়মত গুরুত্ব দিলে এবং

চিকিৎসা করালে এদের জীবন স্ফূর্তি এবং প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। নয়তো দীর্ঘ বিষণ্ণতায় কেউ কেউ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

সংসারে দারিদ্র্য ও আর্থিক নিরাপত্তার অভাব থেকেও ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করে। ভাবে নিজে চেষ্টা করে দেখবে, যাতে অন্য কোনও উপায়ে সেই সুখ খুঁজে পাওয়া যায়। অথবা অনেক উপার্জন করে তারপর বাড়ি ফিরবে।

কিন্তু বাইরের জগৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মোহভঙ্গ ঘটায়। কারণ চোদ্দো বছরের এই কিশোর কিশোরীরা যতদিন হাতে ডলার থাকে, ততদিন উন্মাদনার ঘোরে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। তারপর সুসময় শেষ হয়। কারণ—রুজি রোজগারের সহজ রাস্তা বন্ধ। ১৬ বছরের কম বয়স হলে কেউ চাকরি দেবে না। স্কুলের পাঠ সম্পূর্ণ না করার ফলে ভবিষ্যতেও কোনও ভদ্রগোছের চাকরি জুটবে না। এর মধ্যে যদি নেশা করার অভ্যেস হয়ে থাকে, তবে আরও বিপদ। কুসঙ্গে পড়ে সমাজবিরোধী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। মেয়েদের অনেক বিপদ। সহানুভূতি দেখিয়ে, আশ্রয় দেবার লোভ দেখিয়ে দালালরা তাদের পৌঁছে দেবে আমেরিকান 'মাসি'র ঘরে। এদের জন্যেই নিউ ইয়র্কের লাল আলো এলাকায় খদ্দের ধরতে দাঁড়াতে হয় সুদূর মফস্বল শহরের অ্যানামেরী অথবা ক্যাথিকে। এইডস-এর ভয় সত্ত্বেও রবারের সুরক্ষা তথা প্রতিরক্ষার ওপর নির্ভর করে এরা পেশায় টিকে থাকে। ক্রমে ক্রমে ঘর পালানো ছেলেমেয়েদের মধ্যে চুরি, জোচ্চুরি, খুন, খারাপির নেশা ধরাতে চায় অপরাধ জগতের রাঘব বোয়ালরা। কতজন ফাঁদে পড়ে যায়। মার্কামারা হয়ে যাবার পর হাজার ইচ্ছে সত্ত্বেও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ খুঁজে পায় না।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যেই আমেরিকার বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ চেষ্টা শুরু করেছে। ঘর পালানো ছেলেমেয়েদের হীনম্মন্যতা ক্ষোভ, বিষণ্ণতা ও অপরাধ প্রবণতার মূল কারণগুলি খোঁজার জন্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এ জন্যে বাবা, মাকেও সচেষ্ট হতে হবে। সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে ছেলেমেয়ের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা দরকার। জানতে হবে কোথায় কেন সংঘর্ষ বাধছে। দুপক্ষকেই সমঝোতায় আসার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্যে স্কুলে আছেন কাউনসেলর। প্রত্যেক স্কুলে বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা যুক্ত থাকেন। প্রয়োজনে তাঁরা সাহায্য করেন। যদি অতিরিক্ত বিষাদ বা আত্মহত্যার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তখন মানসিক রোগের চিকিৎসা করাতে হবে। পারিবারিক পরিবেশ কোথায় তাকে অশান্তি দিচ্ছে, তার কারণ খুঁজে দেখা দরকার। ছেলেমেয়ের যদি ড্রাগ অথবা অ্যালকোহলে আসক্তি হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের সাহায্য নেওয়া দরকার। অপরাধ প্রবণতার জন্যেও উপযুক্ত কাউনসেলিং, চিকিৎসা, সাময়িকভাবে ডিটেনশন সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বদা বাবা-মাকে দায়ী করার বদলে বেয়াড়া ছেলেমেয়েদের উগ্র স্বভাব সংশোধনের জন্যে বিভিন্ন "জুভেনাইল হোম"-এর সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। অর্থাৎ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

নিউ ইয়র্ক, হিউস্টন, ফ্লোরিডা, লস এঞ্জেলেস, সাউথ ক্যারোলিনা, মিশিগান, নিউ জার্সি, ওহায়ো, অ্যালাবামা ইত্যাদি নানা জায়গায় ২১ বছরের নীচে নিরুদ্দিষ্ট

ছেলেমেয়েদের জন্যে সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। সরকারিভাবে দেখতে গেলে আমেরিকার প্রত্যেক রাজ্যেই এ ধরনের সাময়িক আশ্রম আছে। এখান থেকে যোগাযোগ করে তাদের নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যদি বাড়ির পরিস্থিতি একান্তই প্রতিকূল হয়, তবে তাদের জন্যে ফস্টার হোম বা অ্যাডপশন হোমের ব্যবস্থা করা হয়। বহু নিঃসন্তান দম্পতি, এমন কি ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও, অনেকে এরকম ঘরছাড়া কিশোর কিশোরীকে কয়েক বছর অথবা প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ের জন্যে আশ্রয় দিতে রাজি থাকেন। সরকার এ জন্যে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দেয়। আশ্রিত ছেলে অথবা মেয়েটির খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড়, চিকিৎসা, পড়াশোনার খরচ—সব কিছুই ১৮ বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়। প্রয়োজনে ২১ বছর পর্যন্তও দেওয়া হয়ে থাকে।

বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অনুতপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যা হোক করে খাওয়া, পরা যদি বা চলে, লেখাপড়া না শিখলে যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার—এই সার সত্য বুঝেই বোধহয়। সাময়িক আবেগ ও উত্তেজনার বশে বেরিয়ে পড়ে তারপর সাত ঘাট ঘুরে ডেনিস নামে একটি ছেলে বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির। এদিকে পকেট শূন্য। শেষ পর্যন্ত সে ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং চিলড্রেনের অফিসে ফোন করল। সে তখন উত্তর-পূর্ব উপকূল রাজ্য কানেটিকাটে। ফিরতে চায় ফ্লোরিডায়। "পলাতক" থেকে "আগন্তুক" হতে ইচ্ছুক। প্রথমে কানেটিকাটের পুলিসকে সব জানাতে হল। তারা একটি ইয়ুথ শেলটারে থাকতে দিল। পরদিন "ট্রেইলওয়ে অপারেশন হোম" ফ্রি প্রোগ্রামের বাসে চড়ে ডেনিস মায়ামিতে তার বাড়িতে পৌঁছে গেল। এভাবেই বাড়ি ফিরেছে ১৭ বছরের মেয়ে নিকোল। ১৫ বছরের মেয়ে ন্যানেট ক্রুপা। গত কয়েক বছরে সারা আমেরিকায় এই বাস সার্ভিসের দৌলতে হাজার হাজার নিরুদ্দিষ্ট ছেলেমেয়ে ঘরে ফিরেছে। এই ব্যবস্থার মূলে আছেন নিউ জার্সিরই একজন পুলিস অফিসার, ক্যাপ্টেন রিচার্ড ভুরহিস। এখন অবশ্য অবসর নিয়েছেন। ক্যাপ্টেন ভুরহিস তাঁর চাকরি জীবনে বহু বছর ধরে পথে পথে এমন কপর্দকহীন, দিশেহারা ছেলেমেয়েকে ঘুরতে দেখেছেন। দেখেছেন অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়া কিশোর, দেহ ব্যবসার শিকার নিরুপায় কিশোরীদের। প্রতি বছর প্রায় দু'হাজার কিশোর কিশোরীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, যাদের কেউ শনাক্ত করার নেই। ক্যাপ্টেন ভুরহিস এ নিয়ে প্রায়ই চিন্তা-ভাবনা করতেন। শেষ পর্যন্ত "দি ট্রেইলওয়ে করপোরেশন" নামে প্রাইভেট বাস কোম্পানির কাছে আবেদন জানালেন, যদি তারা হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের বিনা ভাড়ায় বাড়ি পৌঁছে দেয়। এত বড় দেশে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া তো সহজ কথা নয়। তিন মাস বাদে ওই কোম্পানি সারা আমেরিকায় এই সার্ভিস চালু করল। এও প্রায় বারো, চোদ্দো বছর আগের কথা। সঙ্গে স্পনসর করেছিলেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ চিফ অফ পোলিসও। দু'হাজার বাস সারা দেশে বারো হাজার শহরে যায়। যদি কোনও ছেলেমেয়ে এই বাসে চড়ে বাড়ি ফিরতে চায়, তবে প্রথমে তাকে স্থানীয় পুলিসের কাছে যেতে হবে। থানায় নিরুদ্দিষ্টের তালিকা থাকে। সেই অনুযায়ী পুলিস তাকে ট্রেইলওয়ের বাসে বসিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে দেবেন। তার আগে ছেলে অথবা মেয়েটির বাবা-মাকে ফোন করে বাস পৌঁছনোর সময় ইত্যাদি জানিয়ে দেবেন। তাঁরা তাঁদের শহরের পুলিস অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। বাস পৌঁছলে হারাধনকে সঙ্গে করে বাড়ি

ফিরবেন। তারপর অবশ্য কাউনসেলরের কাছে সমঝোতার জন্যেও যেতে হবে। আগে যেখানে গড়ে প্রতিদিন ৯টি পলাতক বাড়ি ফিরত এখন সে জায়গায় ২১ জন করে ফিরছে। বহু শিশু আছে, যারা বন্ধুর প্ররোচনায় পথে বেরিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। অথবা কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে এক সময় অন্য রাজ্যের পথে ছেড়ে দিয়েছিল। অত ছোট বয়সে সে বাড়ি ফিরতেই পারেনি। "ন্যাশনাল রানঅ্যাওয়ে সুইচবোর্ড", "রান অ্যাওয়ে হটলাইন' ইত্যাদি সংস্থাগুলি আছে বাবা-মাকে সাহায্য করার জন্যে। এইসব দপ্তর তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। এছাড়া এফ. বি. আই. "ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফর্মেশন সেন্টার কমপিউটরে" নিরুদ্দিষ্টের বিবরণ সহ তথ্য পাঠিয়ে দেয়। '৮২ সালে অনুমোদিত "দ্য মিসিং চিলড্রেন অ্যাক্ট" এই নিয়ম জারি করেছে।

জীবনে যে অবস্থাই আসুক, বাড়ি থেকে কম বয়সে পালিয়ে গিয়ে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, সে প্রসঙ্গে "পলাতক"রা বলেছে—পথে বেরিয়ে ঘর না থাকার কষ্ট, অভাবে পড়ে দু-পাঁচ ডলারের জন্য কী না করতে হয়েছে! বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে বিপথে যেতে বসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত হয়তো বড় অপরাধী হয়ে উঠতাম। বাড়িতে থাকতে বুঝতে পারিনি বাইরে কত বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। তারপর ঠেকে শিখলাম। ঝোঁকের মাথায় পালিয়ে না গিয়ে বাড়িতে, স্কুলে, নিজের সমস্যার জন্যে সাহায্য চাওয়া দরকার। হয়তো প্রতিবাদ করব। প্রতিকার চাইব। মানিয়ে নেব। নিজের ভুল বুঝতে চেষ্টা করব। কিন্তু পালিয়ে যাব না, আশ্রয় হারাব না।

৫ জুলাই ১৯৯৭

সন্তান প্রতিপালন

প্রতি বছর এদেশে এক লক্ষ শিশু বাবা-মায়ের সংসার ভেঙে যাওয়ার ফলে পারিবারিক জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়। দশ বছর আগে যারা জন্মেছে তাদের সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত অন্তত কিছু সময় কাটবে হয় মা, নয়তো বাবার আলাদা সংসারে। প্রায় ৭০% ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা আছে। এদের মধ্যে অনেকেই আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে বড় হবে। আর কালো সমাজের মধ্যে ৯৪% ছেলেমেয়ে এই পরিস্থিতির শিকার হতে পারে।

নিউ জার্সির প্যাসেইক শহরে একটি জীর্ণ বাড়ির মাটির নীচের বেসমেন্টের ঘরে মাস দু-তিন লুকিয়েছিল বিয়াঙ্কা। সঙ্গে ছিল তার চারটি ছোট ছেলেমেয়ে। প্রথমে থাকত ওই বাড়িরই দোতলার অ্যাপার্টমেন্টে। ভাড়া দিতে না পারায় মালিক আদালতের নোটিস দেখিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। তখন ওই অজ্ঞাতবাস পর্ব। সেখানে সেন্ট্রাল হিটিং কাজ করে না, বাথরুম নেই, রান্নার ব্যবস্থা নেই। কোনওমতে চারটি শিশুকে নিয়ে দিনগত পাপক্ষয় চলছিল তার। একটা ছোট রুম হিটার আর পুরনো লেপ-কম্বল সম্বল করে দুঃসহ

শীতের সঙ্গে মোকাবিলা আর প্লাগ পয়েন্টের সুবিধে পেয়ে কোনওমতে হটপ্লেটে রান্না। বাথরুম ব্যবহারের জন্যে প্রতিবেশীদের দয়াভিক্ষা। এইভাবে চলছিল তার সংসার। শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গেল। ক্রিসমাসের সময় মালিক মিস্ত্রি পাঠিয়েছিলেন বেসমেন্টে। কিছু সংস্কারের কাজকর্ম চলছিল। মিস্ত্রিরাই আবিষ্কার করেছিল লেপ কম্বলে চাপা দেওয়া শিশুগুলিকে। বিয়াঙ্কার পক্ষে আর সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত "প্যাটারসন কোয়ালিশন ফর হাউজিং অ্যাড্‌ভোকেসি"র সাহায্যে অন্য একটি বাড়িতে জায়গা পেল।

আর এক গরিব মা শেরিলের অবস্থাও এরকম। তার বর ছেড়ে চলে যাবার পর তিনটি ছোট মেয়ে নিয়ে খুবই কষ্ট চলছে। দিনে দুটো চাকরি করতে হয়। সপ্তাহে সাতদিন সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খাবারের দোকানে চাকরি। অস্থায়ী কাজ, তাও পার্ট টাইম। ফলে স্বাস্থ্যবিমার সুবিধে নেই। মেয়ের অসুখ করল। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার সাধ্য নেই। পঞ্চাশ ডলার ভিজিট দিয়ে চিকিৎসা করাবে কোথা থেকে? ওই পঞ্চাশ ডলার খরচ করতে হয় সংসারের কাঁচা বাজার কেনার জন্যে। বিনা চিকিৎসায় ব্রংকাইটিসে অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে শেষপর্যন্ত গেল হাসপাতালে। অবস্থা ততদিনে বেশ জটিল হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে কয়েকদিন এমন টানাপোড়েন গেল যে সময়মত চাকরিতে হাজিরা দেওয়া গেল না। ফলে একটি চাকরি তখনই চলে গেল। দারিদ্র্যের চরম পর্যায়ে আমেরিকার ওয়েল ফেয়ার ভাতার মাসিক সাহায্য পেয়ে তবে রক্ষা পেল পরিবারটি।

এই সব মায়েরা হচ্ছে আমেরিকার লক্ষ লক্ষ গরিব পরিবারের এক এক জন। এদেশের গরিব নাগরিক বলতে যাদের বোঝায় শিশুরা হচ্ছে তার বৃহত্তম অংশ। আমেরিকার গত বছরের হিসেব অনুযায়ী মোট ১২.৬ লক্ষ শিশুর মধ্যে প্রতি পাঁচজন পিছু একজন দারিদ্র্যসীমার মধ্যে চিহ্নিত হয়। ওয়াশিংটনে "হাউজ সিলেক্ট কমিটি অন চিলড্রেন, ইয়ুথ অ্যান্ড ফ্যামিলিস"-এর তথ্য থেকে জানা গেছে পাঁচ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত প্রতি চারজন শিশু পিছু একজন দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হচ্ছে। কালো সমাজে মোট শিশুর সংখ্যার অর্ধেক (পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত) এই পর্যায়ে পড়ে। নিউ জার্সিতেই ১.৮৩ লক্ষ শিশুর মধ্যে ১৫% দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। আশির দশকে ধনী সমাজের মধ্যে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি হয়েছে ১৯% মতো। আর দরিদ্র সমাজের আয় সে তুলনায় আরও হ্রাস পেয়েছে। আশির দশকের শুরুতে যে সব পরিবার আর্থিক কারণে এবং সন্তান প্রতিপালনের জন্যে সরকারি সাহায্য পেত, তাদের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই ছাঁটকাট করে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া চাকরিতে ঘণ্টাপিছু সর্বনিম্ন আয় বলতে একটি বিশেষ অঙ্ককে দীর্ঘকাল একই রাখা হয়েছিল। ফলে অভাব বৃদ্ধির কারণ হয়েছিল একাধিক।

সাদা গরিব পরিবারগুলির মধ্যে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে সব সময় বিবাহ বিচ্ছেদকেও দায়ী করা যায় না। দেখা গেছে, বাবা মা দুজনেই উপার্জন করে সংসার চালিয়েও হালে পানি পাচ্ছেন না। কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস করছে একা মায়ের সংসারে। হয়তো কুমারী মায়ের সন্তান। তার তো দুর্ভাগ্যের সূচনা হচ্ছে জন্মমুহূর্ত থেকে। অথবা জন্মানোর পরই বাবা, মা আলাদা হয়ে গেল। মায়ের সংগ্রাম থেকে শিশুর অযত্ন, দুঃখ, দুর্দশা সবই সম্ভব। ১৯৬০ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত কুমারী মায়ের সন্তানের জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৩০০%। ১৯৮৫ সালের হিসেবে ২২% শিশু জন্ম হয়েছিল

এই পরিস্থিতিতে। আর কালো পরিবারে তখনই ছিল ৬০% শিশু যারা অবিবাহিতা মায়ের গর্ভে জন্মে বড় হয়ে উঠছে। সুতরাং এদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করা কঠিন নয়। আমেরিকার দারিদ্র্য এবং সন্তান প্রতিপালন প্রসঙ্গে মায়েদের ভূমিকা লক্ষ করবার মতো। ১৯৬০ সালে একা মায়ের উপার্জনে সংসার চলত যে হারে, এখন তার ১৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে আছে ১৩% সাদা মায়ের পরিবার, ৪৪% কালো মায়ের পরিবার এবং ২৩% হিসপ্যানিক মায়ের পরিবার। আমেরিকার মোট দরিদ্র সমাজের অর্ধেকের কিছু বেশি হচ্ছেন এই গরিব মায়েদের দলে।

আমেরিকান সমাজের এই দুঃখজনক পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমশই সমাজতত্ত্ববিদ এবং অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এঁদের বক্তব্য—সমাজে মেয়েদের নীতিশিক্ষা দেবার অধিকার আমাদের নেই বটে। মাতৃত্বের ক্ষেত্রে বিবাহ অবশ্য কর্তব্য—এমন উপদেশ আমরা অযাচিতভাবে দিতে পারি না। কিন্তু ক্রমবর্ধমান দরিদ্র শিশুর হার লক্ষ করে আমরা আশঙ্কিত হয়ে উঠছি। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বিবাহিত বাবা মা, এবং সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুর তুলনায়, অবিবাহিত মায়ের সংসারে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে আলাদা সংসারে প্রতিপালিত শিশুর দারিদ্র্যের সম্ভাবনা ছ'গুণ বেশি থাকবে। অতএব অনিবার্য পরিস্থিতি হিসাবে না বিচার করে এ দারিদ্র্যকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে চেষ্টার সময় এসেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গেও একই বক্তব্য আমাদের।

মাথা-গোঁজার সংস্থান নিয়েও সমস্যার শেষ নেই। একার চাকরিতে মা অথবা বাবার পক্ষে সাধ্যমত বাসস্থান খুঁজে নেওয়া সহজ হয় না। আর চাকরি না থাকলে সরকারি ভাতার ওপর নির্ভর করে বাসস্থান খুঁজে নেওয়া তো আরও কঠিন। প্যাটারসনের একটি কারখানায় কাজ করেন ডোরিস মাইকেলসন। সেখানে ল্যাম্প শেড তৈরি হয়। ঘণ্টা পিছু ৬ ডলার তাঁর আয়। দুটি ছোট মেয়েকে ডে কেয়ার সেন্টারে রাখতে হয় সারাদিন। মাসে এ জন্যে খরচ পড়ে ২৪০ ডলার। তারপর আছে মাসে ৬৫০ ডলার করে বাড়ি ভাড়া। নানা বাড়তি খরচের ফলে ঠিকমত বাড়িভাড়া দিতে পারছিলেন না। বাড়িওলা উচ্ছেদ করে দেওয়ার পর সরকারি আশ্রয়ে থাকতে হয়েছিল চার মাস পর্যন্ত। অথচ ডোরিস তেরো বছর চাকরি করছেন ওই কারখানায়। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর আজও ঘোচেনি। তাঁর উপার্জনের $^{২}/_{৩}$ ভাগ চলে যেত বাড়িভাড়া বাবদ। এদেশেও গরিব মানুষদের সেই একই সমস্যা—সীমিত আয়ের মধ্যে বাড়িভাড়া দেওয়া আর ছেলেমেয়ে মানুষ করা সমস্যা।

১৯৮৯ সালে আমেরিকার ২৭টি বড় শহরকে কেন্দ্র করে একটি সার্ভে নেওয়া হয়েছিল। দেখা গেছে এই সার্ভের তথ্য অনুযায়ী সারা আমেরিকায় মোট ৩৬% পরিবার গৃহহীন অবস্থায় পৌঁছেছে। প্রধান কারণ—সাধ্যমত বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকার জায়গা পাচ্ছেন না। প্রতি চারজন গৃহহীন মানুষ পিছু আছে একজন শিশু।

সুজেট কোমাচো নামে এক মহিলার এখন সমস্যার শেষ নেই। বয়স মাত্র তেইশ বছর। একটি বাচ্চার বয়স একবছর, অন্যটির পাঁচ। চাকরি নেই, থাকার জায়গা নেই, সরকারি সাহায্যও আটকে আছে লালফিতের ফাঁসে। কিছুদিন আগে তাঁর স্বামী তাঁকে দুই বাচ্চাসুদ্ধু ফ্লোরিডায় নিয়ে গিয়ে সংসার পেতেই হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে নিউ জার্সি এলেন মায়ের কাছে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য। ফ্লোরিডাতে সব আবেদনপত্র জমা দিয়েও

এসেছিলেন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অভিসে। স্টেট বদল হওয়াতে সরকারি সাহায্য আসতে সময় লাগছে। এদিকে মা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন বেশিদিন ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর কাছে থাকা চলবে না, যদি টাকাপয়সা না দিতে পারে। মার সঙ্গে মান অভিমান করে বেরিয়ে এসে একরাত হোটেলে কাটালেন। সস্তার হোটেল। রাতভর ড্রাগ ব্যবসায়ী আর দেহ ব্যবসায়িনীদের আনাগোনা এবং হল্লা। মাঝে মাঝে ঘরের দরজায় টোকা পড়ছে। ভয়ে সারারাত জেগে কাটানোর পর আবার বাচ্চাদের নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। এখন যতদিন না সরকারি সাহায্য নিয়মিত আসছে এবং একটি চাকরি করতে পারছেন, সাময়িকভাবে "হোমলেস শেলটার"-এ থাকা ছাড়া উপায় নেই। এখানে নিরাপত্তা সস্তার হোটেলের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু দারিদ্রদশা তো সহজে ঘুচবে না।

আমেরিকায় চিকিৎসা ব্যবসাটি এমনই লাভজনক শর্তে চলে আসছে যে গরিব মানুষের রোগ বড় বালাই গোছের অবস্থা। যে সব গরিব পরিবার চাকরি না করে ওয়েল ফেয়ারের ভাতার ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের মধ্যে আছে বিনা পয়সায় সরকারি চিকিৎসার ব্যবস্থা। 'মেডিকেইড' নামে সরকারি স্বাস্থ্যবিমা তাঁদের চিকিৎসার খরচ দেয়। কিন্তু যদি এঁরা চাকরি করেন, তখন কিন্তু আবার এই নিখরচায় চিকিৎসার সুবিধে অথবা সাপ্তাহিক খাবার কেনার জন্য ফুড স্ট্যাম্প কিছুই এঁরা পাবেন না। এ এক অদ্ভুত নিয়ম। অর্থাৎ কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে যাঁরা চাকরি না করে ওয়েলফেয়ারে থাকছেন, তাঁদের যে সুবিধে, এঁদের মতো সামান্য চাকুরিজীবীদের তা নেই। আমেরিকার গরিব পরিবারগুলের মধ্যে অন্তত ১/৩ ভাগ কোনও চিকিৎসাবিমা ছাড়াই বেঁচে আছেন। একেবারে মরিয়া না হলে হাসপাতালে যান না। তারপর অবশ্য সরকারই হাল ধরে। কিন্তু বারোমাস কষ্ট তো থাকেই, বিশেষ করে শিশুগুলির ক্ষেত্রে।

আমেরিকান স্ত্রীরোগ এবং ধাত্রীবিদ্যা বিশারদদের কাছে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যান এদেশের উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা। বছরে দু-বার না হলে একবার তো বটেই। আর গর্ভবতী অবস্থায় একটানা প্রতি মাসের পরীক্ষার ব্যাপার তো থাকেই। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে গরিব মেয়েদের সে সুবিধেও নেই। সামান্য চাকরি, চিকিৎসাগত সুযোগ সুবিধেও এত অল্প যে এমন অনেক মেয়ে আছেন যাঁরা গর্ভবতী অবস্থার মাত্র দুবার চিকিৎসকের কাছে গেছেন। একবার সূচনা পর্বে, একবার গর্ভযন্ত্রণা শুরু হবার পরে। মাঝে কোনও পরীক্ষা না হওয়ায় শিশুর জন্মের সময় এবং পরে নানা জটিলতা দেখা দিচ্ছে। অথচ এদের চিকিৎসা এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, মাতৃজঠরে থাকাকালীন শিশুর বহু রোগ তার জন্মের আগে ধরা পড়ছে এবং চিকিৎসার ফলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। শিশু চিকিৎসকরা বলছেন—জাতীয় স্বাস্থ্যবিমা বা ওই ধরনের কোনও সমাধান না করলে গরিব মা অন্তঃসত্বা অবস্থায় যেমন বিনা-চিকিৎসায় থাকছেন, শিশুর জন্মও সেকারণে সমস্যাজড়িত হয়ে উঠছে। প্রতি চারজন পিছু একজন আমেরিকান গর্ভবতী মেয়ে এক্ষেত্রে অবহেলিত থাকেন। আর্থিক সমস্যাই প্রধান। পৃথিবীর বড় বড় শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় আমেরিকায় নবজাত শিশুর মৃত্যুর হার বিশেষ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। সমাজতত্ত্ববিদরা বলছেন, এই পরিস্থিতি শুধু উদ্বেগজনক নয়, লজ্জাজনক এবং এর জন্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

আমেরিকায় কুমারী মায়ের সংখ্যা বেশি বলেই যে শিশুরা দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হচ্ছে, এ কথা বলা আর সমস্যার সমাধান কঠিন বলে চিন্তিত হওয়া—এ পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে একই কথা শুনে আসছি আমরা। কিন্তু সুইডেনে ৪৯% শিশু জন্মায় কুমারী মায়ের গর্ভে। সেখানে বিবাহ বন্ধন ছাড়াই বাস করেন বহু স্ত্রী-পুরুষ। তবে তাঁদের জীবনযাত্রার জন্যে শিশুদের মূল্য দিতে হয় না। সরকার নানা সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে সাহায্য দিয়ে থাকে। জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা প্রকল্প, সন্তান জন্মের পরে মা অথবা বাবার ছুটি নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সুযোগ সুবিধে দেওয়া এবং পরে অভিভাবকরা চাকরিতে যোগ দিলে শিশুদের জন্যে কম খরচে 'ডে-কেয়ার'-এর ব্যবস্থা—সরকারি উদ্যোগ ও অর্থ সরবরাহ থাকে নানাভাবে।

অবশ্য আমেরিকাতে ক্রমশ গরিব মায়েদের সমস্যা নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। শিক্ষা যদি দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই-এর জন্যে একটি মহৎ অস্ত্র বলে বিবেচিত হয়, তবে শিক্ষাক্ষেত্রেই জোর দেওয়া বিশেষভাবে জরুরি। সুজেট কোমাচো এখন আশ্রয় পেয়েছেন প্যাটারসন শহরে 'কোয়ালিশন ফর হাউজিং অ্যাডভোকেসি'র সাহায্যে। নিউ জার্সি রাজ্যে 'রিচ' নামে একটি সরকারি সংস্থা আছে। তার সাহায্য নিয়েছেন। এখানে ওয়েলফেয়ারের সাহায্য যে সব মায়েরা নিয়ে থাকেন, তাঁদের জন্যে নানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া শেষ হলে প্রাথমিক চাকরির ব্যবস্থাও এখান থেকে করা হয়। আর প্রশিক্ষণ চলাকালীন মা যতক্ষণ কেন্দ্রে থাকেন, শিশু সন্তানদের বিনা খরচে সরকারি 'ডে-কেয়ার সেন্টার'-এ রাখা হয়। সুজেট সেক্রেটারিয়াল কোর্সে ভর্তি হয়েছেন আপাতত। ওয়ার্ড প্রসেসিং কোর্স শেষ হলে ওঁর অ্যাকাউন্টিং পড়ার ইচ্ছে আছে। কারণ শুধু হাইস্কুল পাসের ডিপ্লোমা সম্বল করে বাকি জীবন আর ভাল মাইনের চাকরি করা সম্ভব নয়। অভাব দূর করতে হলে শিক্ষাই এখন একমাত্র লক্ষ্য ওঁর কাছে। শিশু সন্তানদের জন্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভাবলে ভয় হয় ওঁর।

শিক্ষার প্রয়োজন শিশুদের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি। অথচ গরিব শিশুরা অভাবের দরুন যে সব পাড়ায় থাকে, সেখানকার স্কুলগুলিতে মাইনের প্রশ্ন না থাকলেও, বিপদের প্রশ্ন থাকে। ড্রাগ অ্যাডিক্ট থেকে শুরু করে দুষ্ট শ্রেণীর লোকজন পাড়ার বাসিন্দা। তাদের ছেলেমেয়েরা যায় একই স্কুলে। পারিবারিক প্রভাবে তারাও প্রভাবিত হয়। এছাড়া দরিদ্র-পরিবারের শিশুরা পরিবেশগত কারণে, পুষ্টির অভাবে, চিকিৎসার অভাবে বহুক্ষেত্রেই পড়াশোনায় মনোযোগী হয় না। বিয়াঙ্কার দুই ছেলে যখন বেসমেন্টে লুকিয়ে থাকত, তখনই স্কুলে যাওয়ার অভ্যেস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একজনের বয়স এগারো, একজনের আট। তারা এর মধ্যেই পুলিশের খাতায় নাম উঠিয়ে বসে আছে। অপরাধ—একটি ডেলিভারি ট্রাকের দরজা ভেঙে খাবার দাবার চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল।

শেরিলের মেয়েরা চারমাস ছিল মায়ের বন্ধু আর আত্মীয়দের বাড়িতে। পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছে। এখনও স্কুলে ভাল করতে পারছে না বিশেষ। অল্প বয়সে নানা অশান্তির মধ্যে থেকে ওদের মানসিক বিকাশও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে না। একটি মেয়ে খুবই উগ্র স্বভাবের হয়েছে। তাকে স্কুলে মনোবিদ্যা বিশারদ এবং মানসিক চিকিৎসক নিয়মিত দেখছেন।

আমেরিকায় প্রাচুর্য আর অপচয়ের পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয়ের এই দিকটি ক্রমশ

প্রকট হয়ে উঠছে। তবে সরকারি সচেতনতার জন্যে চাপসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের বেসরকারি উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানগুলি নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। খাওয়া পরার সংস্থান থাকলেও এদেশে দরিদ্র নাগরিকের বিশেষত শিশুর প্রাথমিক অধিকার যে যে ক্ষেত্রে, সেই বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতার আভাস লক্ষ করা যাচ্ছে।

৫ অক্টোবর ১৯৯১

কর্মহীন মানুষ

শীতের শুরুতেই কার্নিভ্যাল বসেছে। ফাঁকা মাঠে রাতারাতি রং বেরঙের বিশাল তাঁবু আর সামিয়ানা খাটিয়ে জমজমাট মেলা শুরু হয়েছে। কটকটে সবুজ আর গাঢ় গোলাপি রঙের আলোর বাহার। জগঝম্প বাজনার সঙ্গে নানা রকমের "রাইডে" চড়ার আকর্ষণ। মস্ত উঁচু নাগরদোলায় উঠে আকাশ পাতাল ছুটে বেড়াচ্ছে একদল টিন এজার। হুল্লোড়ে কানপাতা দায়। মেরি গো রাউন্ডের হাতি, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বোঁ বোঁ করে পাক খাচ্ছে আরও কমবয়সীগুলো। দোকানি ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে বিক্রি করছে ধোঁওয়া ওঠা নিমকির মতো গরম প্রেটজেল আর গোলাপি তুলোর মতো বুড়ির চুলের মার্কিন সংস্করণ কটন ক্যান্ডি।

সেই কার্নিভ্যালে দেখা হল কিরণ দেশাইয়ের সঙ্গে। নিজের দুই ছেলেকে মেরি গো রাউন্ডে বসাচ্ছিল। ওর পাশে দাঁড়িয়েছিল ওদের পাশের অ্যাপার্টমেন্টের মনি বোসের ছেলে মেয়ে। আমি কাছাকাছি পৌঁছনো মাত্র মেরি গো রাউন্ড ঘুরতে শুরু করল। পক্ষীরাজে ভেসে যাচ্ছে কিরণের দুই ছেলে। হাঁ করে চেয়ে দেখছে নীচে দাঁড়ানো বাচ্চা দুটো। ওরা চড়ল না কেন? ভয় পায় নাকি এইসবে উঠতে? কারণ, কিরণকে যতদূর জানি, ওদের জন্যে টিকিট কেটে দেবে না এমন মেয়ে নয়। কত সময় ওদের বাড়িতে খেলা করতে আসে ওরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকে শুনি। চারটে বাচ্চায় খুব ভাব হয়ে গেছে, কিরণই বলে মাঝে মাঝে। সামান্য ডলার খরচ করে ওদের মেরি গো রাউন্ডে চড়াবে না। এ হতেই পারে না। হয়তো শরীর ভাল নেই ওদের। চারদিকের যা ফ্লু চলেছে। সেই জন্যেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করেছে বোধহয়।

কিন্তু ওদের দুঃখ দুঃখ মুখ দেখে জিজ্ঞেসই করলাম, রাইডে উঠলে না? ভয় করে নাকি?

ছেলেটা মাথা নাড়ল। মেয়েটাও দেখাদেখি মাথা নেড়ে 'না' বলল। আমি হাসছিলাম—পরের বারে উঠবে? ওই তো ভিকিদের রাইড থেমে আসছে। যাও, চলে যাও। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে আট-ন বছরের ছেলেটা বলে উঠল, "আমার ভয় করে না। কিন্তু বাবা বারণ করেছে। বাবার তো চাকরি নেই।"

কোনও শিশুর মুখে এমন কথা শুনিনি। মনি বোসের চাকরি নেই জানতাম না। হতে

পারে পরিবারটি আর্থিক চাপের মধ্যে আছে। তবু কার্নিভ্যালে এসে বাচ্চাদুটো দু-চার ডলারের জন্যে রাইডে উঠতে পারবে না, এমন অবস্থা হবার কথা নয়। বছর দেড়েক হল দেশ থেকে এসেছেন ভাইয়ের ভরসায়। তারপর থেকে টানাপোড়েন চলছে। হয়তো বহু দিনই চাকরি নেই।

কিরণ ওদের কটন ক্যান্ডির পয়সা দিয়ে পাশের স্টলে পাঠাল। তারপর বলল—এত খারাপ লাগে বাচ্চাদুটোর জন্যে। রোজ খেলতে আসে। আজ সব কটাকে কার্নিভ্যাল রাইডে চড়তে বারণ করেছে। আমাদের মেডিকেল ইনসিওরেন্স নেই এখন। অ্যাক্সিডেন্ট হলে বাবা হাসপাতালে খরচ দিতে পারবে না। বোনটা চড়ার জন্য বায়না করছিল। তাকে ও ভুলিয়ে ভালিয়ে শান্ত করল, এমন বুঝদার ছেলে।

'রিসেশন' শব্দটা মাথার মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে ক্রমশ। আমেরিকায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর্থিক নিরাপত্তা বলে আর যেন কোনও নিশ্চয়তা নেই। চাকরির বাজার এমন যে নতুনদের পক্ষে কোথাও ঢুকতে পারাই কঠিন। পুরনোরাও জোর গলায় বলতে পারেন না, কবে কখন মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। তবে তাঁরা সঞ্চয় করেছে অনেক। সেই সঞ্চয়ের জোরেই জীবনযাত্রার মান বদলানোর প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু মনি বোসেরা সঙ্গে মাত্র দেড়বছরের পুঁজি নিয়ে এ বাজারে টিকে থাকবে প্রায় দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতাই বলা চলে।

নিউ ইয়র্কে "স্টেট আনএমপ্লয়মেন্ট অফিস"-এর তথ্য অনুযায়ী নিউ ইয়র্ক রাজ্যের শহরতলি অঞ্চলে বেকার সমস্যা রীতিমত উদ্বেগজনক। একটি "জব রিসার্চ সেমিনারে" চাকরির ব্যাপারে এসেছেন একই সঙ্গে বেকার আইনজীবী, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, তিনজন শিক্ষক, চারজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একটি কোম্পানির বরখাস্ত হওয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট। এরকম সেমিনার প্রতি সপ্তাহে হচ্ছে এবং প্রত্যেকবার শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

আমেরিকায় আবহাওয়া নিয়ে আলোচনার বদলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনাই এখন সার্বজনীন প্রসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কে শহরতলি অঞ্চলে বেকার সমস্যার হার '৯০ সালে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, আগের অবস্থার তুলনায়। লং আইল্যান্ড অঞ্চলে '৮৬ সালে মোট ৬০০০ জন লোক ফেডারেল কোর্টে নিজেদের দেউলিয়া হিসেবে প্রমাণ করেছিল। '৯০ সালে ১১৬০০ জন নিজেদের দেউলিয়া প্রমাণ করেছে। এখন '৯১ সালের শেষে ব্যাংকের হিসাবে কপর্দকহীন বলে নিজেদের নাম লিখিয়েছে মোট ১৫,০০০ জন লোক।

ধারে কেনা বিষয়সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সময়মত ব্যাংকে দেনা শোধ করতে না পারার কারণে। সত্তরের দশকে একটি দৈনিক কাগজে বাড়ি জমি বিক্রির বিজ্ঞাপনে হয়তো সপ্তাহে একটি বাড়ির বিজ্ঞাপন থাকত, যেটি ব্যাংক ক্রোক করে নিয়ে বিক্রি করছে। এখন সময়মত দেনা শোধ করতে না পারার ফলে প্রতি সপ্তাহে চার/পাঁচটি ক্রোক করা বাড়ি বিক্রির জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বাড়ির মালিকদের আর্থিক অবস্থা যখন ভাল ছিল, তখন শখ করে বাড়ি কিনেছিলেন। হয়তো ট্যাক্সির ব্যবসা ছিল। মোটা রকম উপার্জন হত। তারপর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ লাগল। সন্ত্রাসবাদের ভয়ে আমেরিকানদের বিদেশযাত্রার শখ উবে গেল। কে আর কত ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবে? ট্যাক্সির বাজার মন্দা হয়ে গেল। দেশের মধ্যেও অর্থনৈতিক কারণে ব্যয়সাপেক্ষ ভ্রমণের প্রবণতা কমে যাবার দরুণ

প্লেনযাত্রীরা সংখ্যা কমতে লাগল। যেটুকু প্রয়োজন, সে নিজের নিজের গাড়ি নিয়েই সেরে নেওয়া যায়। নানা কারণে ট্যাক্সিওলার বাজার নষ্ট হতে লাগল। বড় বড় কোম্পানি রিসেশনের ফলে খরচ কমাতে চাইছে। বিজনেস ট্রিপ, উঁচু তলার কর্মিদের ক্লোজার ট্রিপ, ট্রেনিং প্রোগ্রাম, সেমিনার ও কনফারেন্সে দূরে দূরে পাঠানো ইত্যাদি কমিয়ে দিতে থাকলে ট্রাভেল সংক্রান্ত বাজেট অনেক কমে আসে। তখন লিমোজিন সার্ভিস বা ট্যাক্সির প্রয়োজনও কমে যায়। এইভাবে নানা দিক থেকে মার খেতে খেতে ট্যাক্সির মালিক ধার করে কেনা বাড়িটির ইনস্টলমেন্টের মাসিক দেড় হাজার ডলার নিয়ম করে ব্যাংকে শোধ দিতে পারছিলেন না। বাড়ি ক্রোক হয়ে গেল। ব্যাংক সেই ফোর ক্লোজারের বাড়ি ফেরত নিয়ে আবার দালাল মারফত বিক্রি করে দিল।

বাড়ি বিক্রির বাজারও এখন খুব মন্দা চলেছে। মিলিটারি কন্ট্রাক্ট, জমি বাড়ি বিক্রির ব্যবসা, বাড়িঘর তৈরির ব্যবসা, ব্যাংকের ব্যবসা, ইনসিওরেন্সের ব্যবসা, পাইকারি ব্যবসা—সর্বত্র কঠিন অবস্থা। একমাত্র ওষুধ কোম্পানি আর ডাক্তারদের ব্যবসা মার খায়নি। কারণ শরীর তো রিসেশনের সঙ্গে সমঝোতা করবে না। উপরন্তু দীর্ঘদিন বেকারত্বের কারণে টেনশনজাত অসুস্থতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মচ্যুতদের মধ্যে আছেন কমপিউটার বিশেষজ্ঞ থেকে ইঞ্জিনিয়ার, অফিস সেক্রেটারি, ব্যাংকের অফিসার, অধ্যাপক, শিক্ষক ইত্যাদি সর্বস্তরের শিক্ষিত মানুষ। প্রতি পরিবারেই স্বামী অথবা স্ত্রী কোনও একজন এ ধরনের পেশায় নিযুক্ত থেকে উপার্জন বন্ধ হয়ে গেলে জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকায় এ বছর বেকারত্বের হার প্রায় শতকরা ৭ ভাগ। নিউ ইয়র্ক শহরে এই হার পৌঁছেছে ৮%-এর কাছাকাছি। নিউ জার্সিতে ৬½%-এর কাছাকাছি। আমেরিকায় বেকারত্বের হার কয়েক মাস আগে যখন ৬.৮% ছিল তখন থেকেই কর্মক্ষম এবং চাকুরিজীবী ১২৫ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ লোক বেকার হয়েছেন। অর্থাৎ চাকরির জন্যে অন্ততপক্ষে দীর্ঘদিন চেষ্টা করার পর নিষ্ফল হয়েছেন। এই সংখ্যার বাইরে আছেন আরও ছয় লক্ষ নাগরিক, যাঁরা পুরো সময়ের জন্যে চাকরি পাননি বলে বাধ্য হয়ে পার্ট টাইম কাজ করেন। লেবার ডিপার্টমেন্টের হিসেব অনুযায়ী এঁরা বেকার নন। কিন্তু কিছু কিছু লেবার বিশেষজ্ঞ বলেন এঁদের যা আর্থিক অবস্থা, এঁদেরও আংশিকভাবে কর্মহীনই ধরে নেওয়া উচিত। এবং বেকারভাতার সুযোগ দেওয়া উচিত।

এর বাইরে আছেন আরও একদল। ওঁরা দীর্ঘদিন কাজ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সীমিত সময়ের বেকারভাতা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি সাহায্য পান না বলে ওঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের বেকারের তালিকা থেকেও বাদ চলে গেছেন। এই বিক্ষুব্ধ, হতোদ্যম মানুষগুলির মধ্যে আছেন বরখাস্ত হয়ে যাওয়া উচ্চপদস্থ কর্মী, কলেজ পাশ করা শিক্ষিত যুবক, যুবতী এবং নৈরাশ্যবাদী, অলস যুব সম্প্রদায়। কেউ কেউ চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে দীর্ঘদিন বেকার হয়ে আছেন। কেউ কেউ কাজ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। চাকরির কোনও সুযোগই আসেনি কলেজ পাশ করার পরে। বছরের পর বছর উপার্জন নেই, এরকম মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৯৮১,০০০-য়ে। গত বছরে প্রায় ১২% নাগরিক এই পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন। এঁরা কোনওরকম ভবিষ্যত সম্ভাবনা না দেখে চাকরির চেষ্টাই ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে লেবার ডিপার্টমেন্ট এই

তৃতীয় দলটিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখেছিল প্রায় ৫০০,০০০ আমেরিকান আছেন, যাঁরা আর চাকরি খোঁজেন না। চাকরি খোঁজার প্রমাণ দেখাতে পারেন না বলে বেকারভাতাও পান না। সুতরাং এঁদের সংখ্যা যোগ করলে এখন আমেরিকায় বেকারত্বের হার বেড়ে গিয়ে শতকরা ৮%-এর বেশি হবে। এই তৃতীয় দলের মধ্যে আছে গৃহহীন বা হোমলেস মানুষ। সরকারি মতে 'বেকার' বলতে তাঁদের বোঝায় যাঁদের একটি ঠিকানা আছে। কিন্তু এই তৃতীয় দলের মধ্যে বেশিরভাগই ঠিকানাবিহীন। কোনও স্থায়ী বাসস্থান নেই। এঁদের সংখ্যা যোগ করলে আমেরিকার বেকারত্বের হার বেড়ে যাবে অথচ কাগজ কলমে এঁদের ধরা হচ্ছে না কেন? কোনও কোনও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের মতে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য গোপনের চেষ্টা। লেবার ডিপার্টমেন্টকে এজন্যে চাপ দেওয়ার কথা বলছেন এঁরা। দেশের বেকার সমস্যাকে লঘুভাবে দেখানোর অর্থ প্রশাসনের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখা।

তবে অন্যান্য অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরাও এ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন মত পোষণ করছেন। তাঁরা বলছেন—এই তৃতীয় দলকে দুভাগে ভাগ করা দরকার। এক, যাঁরা চাকরি করতে ইচ্ছুক এবং দুই—যারা বেকার থাকতেই পছন্দ করে। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার লেবার ডিপার্টমেন্ট এই ব্যাপারে তৃতীয় দলের নতুন করে মূল্যায়ন করবে। ইচ্ছুক এবং কর্মহীন যাঁরা, তাঁদের পুরো এক বছরের চাকরি খোঁজার চেষ্টা প্রমাণিত হলে শুধু তাঁদেরই বেকার বলে চিহ্নিত করা হবে এবং প্রমাণ করা যাবে বাকিরা শ্রমবিমুখ ভবঘুরে মান।

গত এক বছরের মধ্যে এদেশে যেভাবে ছাঁটাই হয়েছে তার একটি হিসেব দেওয়া যাক। ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে ৮০৪,০০০ লোকের চাকরি গেছে। এর মধ্যে ১০% লোক কোনও দিনই ওই ধরনের চাকরি ফিরে পাবে না। কনস্ট্রাকশন ব্যবসাতে ছাঁটাই করা হয়েছে ৪৯৫,০০০ জন কর্মীকে। ৭০% ভাগ লোকই আর ওই ধরনের কাজ পাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার ছাঁটাই করেছে ৩৮৭,০০০ জন কর্মীকে। ১০০% ছাঁটাই কর্মী কোনওদিন আর ওই চাকরি ফিরে পাবে না। রিটেল কোম্পানিগুলি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে মোট ৩৫৬,০০০ জন কর্মীকে। ৮০% লোকেরই ওই ধরনের কাজে আবার যোগ দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাঁটাই করেছে মোট ৪৬,০০০ জন কর্মীকে। এদের মধ্যে ৫০% লোক আর পুরনো কাজে ফেরত আসবে না। ফিন্যান্স কোম্পানিগুলি ছাঁটাই করেছে ২৩,০০০ জন কর্মীকে। শতকরা একজনই কোনওদিন হারানো চাকরি ফিরে পাবে না।

আমেরিকায় এবারের "রিসেশন" জনসাধারণের ওপর সামগ্রিকভাবেই নৈরাশ্যের ছায়া ফেলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এদেশে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একাধিকবার দুর্বল হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০-এর জুলাই থেকে ক্রমশ যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যান্য বারের রিসেশনের পরে ঠিক এরকম সমস্যা দেখা দেয়নি।

রাষ্ট্রপতি বুশের প্রশাসনে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিপন্ন—এই প্রচারে ডেমোক্রেটিক দল বিশেষ সোচ্চার হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে বুশ যে পরিমাণ বেশি সময় দিয়েছেন, দেশের মূল সমস্যা সে তুলনায় একেবারেই প্রাধান্য পায়নি। জনসাধারণের মধ্যে সমীক্ষা নিয়ে জানা গেছে বুশের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি অধিক আনুগত্যের কারণেও

দেশের আর্থিক পরিস্থিতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বুশ নিজেও এই সমালোচনার সরাসরি মোকাবিলা করে উঠতে পারছেন না। তবে "এশিয়া ভ্রমণ" বাতিল করেছেন সদ্য সদ্য। এন এ টি ও-র দুদিনের অধিবেশনে সম্প্রতি ইতালির রোমে ঘুরে আসার পর থেকে ডেমোক্র্যাটরা তাঁকে বিশেষভাবে আক্রমণ করেছেন। সারা আমেরিকায় রোম নামে মোট এগারোটি ছোট শহর আছে। বুশ নাকি তার কোনও একটিতেও কস্মিনকালেও পদার্পণ করেননি। কারণ সেখানে রিসেশনের প্রভাবে মানুষের চাকরি নেই। মিসিসিপি রাজ্যের রোম শহরে ১১% লোক ছাঁটাই হয়ে বেকার অবস্থায় আছে। ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসন্যাল ক্যাম্পেন কমিটির বক্তব্য—বুশ নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পৃথিবী ঘুরে না বেড়িয়ে, যদি স্থানীয় "রোমে" গিয়ে বেকারদের কাজ খুঁজে দেন, তো সেটাই হবে রাষ্ট্রপতির উপযুক্ত ভাবমূর্তি।

ওয়াশিংটনের প্রশাসনিক মহল মার্কিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে ক্রমশ আশান্বিত হয়ে উঠছেন। "ব্যুরো অফ লেবার" এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছরের তৃতীয় কোয়ার্টারে জাতীয় উৎপাদনের হার বেড়েছে শতকরা ২.৪ ভাগ। চতুর্থ কোয়ার্টারে শতকরা ২.৯ ভাগ দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কৃষিমূলক ব্যবসা বাদ দিয়ে বাদবাকি কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীর ঘণ্টাপিছু উৎপাদনের হার যোগ করে এই সমীক্ষায় পৌঁছনো হয়েছে। "ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্‌টিকস" এমনও ভবিষ্য-দ্বাণী করেছে যে নব্বই-এর দশকে আমেরিকার আরও ১৮ লক্ষ নতুন চাকরি বাজারে আসবে।

এ পর্যন্ত 'রিসেশনের' প্রভাব মুক্তির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছু বোঝা না গেলেও এ বছরের শেষাশেষি অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে বলা যায়। 'রিসেশন' কাগজে কলমে শেষ হয়ে যাবার পরেও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক পরিবর্তনের ফলে বহু বেকার মানুষই আর হারানো চাকরিটি ফিরে পাবেন না। নতুন চাকরির নিশ্চয়তাও কিছু নেই। জীবনধারণ এবং সংসার প্রতিপালনের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে। আবেদনপত্র নিয়ে দিনের পর দিন অফিসে অফিসে ধরনা দেওয়া আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা। হতাশা, অর্থাভাব, পারিবারিক অশান্তি—একটি চাকরির অভাবে শত সমস্যা।

এদেশে কর্মহীন মানুষরা নিজেদের জন্যেই সহমর্মী দল গড়ে তোলেন। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট একটি/দুটি দিনে এঁরা মিলিত হয়ে পরস্পরকে মনোবল দেওয়ার চেষ্টা করেন। চাকরির খবরাখবর আদান প্রদান করেন। নানা রাজ্যে এরকম সাপোর্ট গ্রুপ বা সহমর্মী দলের মিটিং হয়। কখনও কর্মহীন কমপিউটার বিশেষজ্ঞরা দল গড়ে তোলেন। কখনও বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের সাপ্তাহিক মিটিং হয়। কাউন্সেলর, মনস্তত্ত্ববিদরা আসেন বক্তৃতা দিতে। ব্যক্তিগত অশান্তি, নৈরাশ্যের সময় এঁদের পরামর্শ পাওয়া যায়। মিটিং করার জন্যে অনেক রেস্তোরাঁ বিনা ভাড়ায় একটি ঘর ছেড়ে দেয়। কখনও কফি পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। এই সহমর্মী দলের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়া হয়। কর্মখালি বিজ্ঞাপন কেটে আনা, চিঠি লেখা, টাইপ করা, টেলিফোনে চাকরির খবর আনা, প্রয়োজন হলে গাড়ি দিয়ে সাহায্য করা, কোথায় কীভাবে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। সমবায় কিচেন, সমবায় বাসস্থান ইত্যাদিও প্রয়োজন বোধে গড়ে তোলা হয় সাময়িকভাবে। আমেরিকান সমাজে কর্মহীন মানুষকে পরিস্থিতির শিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ কারণে

গোপনীয়তা বা লজ্জার প্রশ্ন তেমন থাকে না। এঁরা প্রকাশ্যেই জানান যে এঁদের চাকরি নেই এবং অসংকোচে অন্যদের কাছে চাকরির ব্যাপারে সাহায্য চান। কিন্তু ভারতীয় সমাজে বিশেষত শিক্ষিত বাঙালি সমাজে এখনও এই ব্যাপারটি সংকোচবশত গোপন রাখার প্রবণতা আছে। বিদেশে আসার সময় যে প্রত্যাশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, বসবাস করাকালীন অনেকের জীবনেই আশানুরূপ প্রাপ্তি ঘটে না। বিশেষ করে চাকরির অনিশ্চয়তা, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত স্বীকৃতির অভাব, অন্যান্য সফল অভিবাসী বাঙালিদের তুলনায় নিজের ব্যর্থতা এঁদের ক্রমশ ক্রমশ বিষাদ এবং হীনমন্যতা বোধের মধ্যে নিয়ে যায়। কিন্তু গ্রুপ কাউনসেলিং বা 'সাপোর্ট গ্রুপের' মতো ঠিক কিছু তো গড়ে তোলেন না এঁরা। কারণ নিজের অবস্থা জানাতে সংকোচ বোধ করেন। ফলে স্ত্রী ছাড়া আর কোনও সহমর্মী নেই যিনি কোনওভাবে মানসিক বল দিতে পারেন। নিজের চাকরি না থাকা মানে স্ত্রীর চাকরি সম্বল করে সংসার চালানো। মেডিকেল ইনসিওরেন্সের জন্যেও স্ত্রীর চাকরিটাই ভরসা তখন। আর ছোটখাটো চাকরি হলে স্ত্রীও সেরকম মেডিকেল বেনিফিট পান না, যাতে পুরো পরিবারটির চিকিৎসা চালাতে পারেন। তবে সত্তরের দশকে আসা বাঙালি সমাজের ক্ষেত্রে আদৌ এই অবস্থাটি প্রযোজ্য নয়। তাঁরা যথাসময়ে এসেছেন এবং গুছিয়ে নিয়েছেন এবং এখনও আমেরিকার কর্মজীবী ও বুদ্ধিজীবী সমাজের 'সর্বোচ্চ উপার্জনের' ক্ষেত্রে প্রফেশন্যাল ভারতীয়রা আছেন। এঁদের দ্বিতীয় প্রজন্মই এখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মার্কিন ডিগ্রি আর মার্কিন নাগরিকত্বের দৌলতে এশিয়ান সমাজের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা চাকরির বাজারে খোদ আমেরিকান সাদা সমাজকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। রিসেশন এঁদের কাছে রাষ্ট্রীয় সমস্যার অতিরিক্ত কিছু নয়। চাকরি হারালে পুরনো চেনাশোনার সাহায্যে একটি চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে 'লাইন' বদলাচ্ছেন। সঞ্চয়ও কম নেই। এক/দু বছর চাকরি না থাকলেও ইনভেস্টমেন্ট, স্টক মার্কেট, বিষয় সম্পত্তির আয় থেকে অনেক কিছুই বজায় রাখতে পারছেন। বড় কোম্পানি থেকে ছাঁটাই হবার সময় নয়তো বাধ্যতামূলক অবসর নিয়ে মোটারকম ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। তাই দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট কিনে ভাড়াটে বসিয়ে দিলেন। মাস ছয়েকের মধ্যে নতুন চাকরিও পেয়ে গেলেন। অনেক পরিশ্রম করে বিদেশি ডিগ্রির লেজুড়গুলো কি আর অকারণে জুড়েছিলেন? দেশ বিদেশের উচ্চশিক্ষা যথার্থই ভাতে বাড়ছে।

কিন্তু মনি বোস তো সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি। অভাগার মতো এলেন একেবারে সাগর শুকিয়ে যাবার মুখে। মার্কিনি ডিগ্রি নেবার পয়সা, সময় সুযোগ অনেকটাই তো হল না এখনও। চাকরির অভাবে সংসার চালানোই এক কঠিন সমস্যা। তার ওপর চিকিৎসার কী ভীষণ খরচ এদেশে। চাকরি না থাকলে মেডিকেল ইন্সিওরেন্সও নেই। আলাদা করে চারজনের প্রাইভেট বিমা কেনার সাধ্য নেই। অতএব অসুখ বিসুখ ঠেকিয়ে রাখা দরকার। অবশ্য নিজেকে 'গরিব' প্রমাণ করলে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে সরকার। কিন্তু নিজেকে অক্ষম প্রমাণ করা নিজের কাছেই কি সহজ? আমেরিকায় চলে আশার উদ্দেশ্যই যেখানে ছিল বড়লোক হওয়া, সেখানে নিজেকে গরিব প্রতিপন্ন করে দাতব্য চিকিৎসার ভরসায় থাকা—নেহাত নিরুপায় না হলে কে করে এসব? একটা চাকরি না হলে কোনও অসুখের ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। বাচ্চাদুটো নাগর দোলায় উঠবে না। মেরি গো রাউন্ডের

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়তে চাইবে না—কথা দিয়েছে। বেকার মানুষের ছেলেমেয়েদের অত মজা করতে নেই।

১৮ জানুয়ারি ১৯৯২

গর্ভপাত : পক্ষ-বিপক্ষ

ইম্যাকুলেট হার্ট অফ্ মেরি নামে যে চার্চের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করি, সেখানে কোনও কবরখানা নেই। ক্যাথলিক স্কুল আর চার্চকে ঘিরে মাঠের মতো অনেকখানি জমি। কখনও দেখি—সেখানে স্কুলের খেলাধুলো চলছে। কখনও চার্চের নিজস্ব মেম্বারদের মুক্তমেলা ধরনের উৎসব হচ্ছে।

একদিন চোখে পড়ল সারামাঠ জুড়ে ছোট ছোট ক্রুশ পোঁতা হয়েছে। ক্রুশের নীচের দিকে শিশুর কবরের মতো ছোট মাটির বেদি। হঠাৎ দূর থেকে দেখলে কবরখানা বলে ভুল হতে পারে। এই যে রাতারাতি চার্চের মাঠে নকল বেদি বানিয়ে, ক্রুশ বসিয়ে পথের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা, এর কারণ আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র গর্ভপাত আইনসম্মত করার বিরুদ্ধে নিরুচ্চার প্রতিবাদ। অর্থাৎ ওই চার্চের সদস্যরা প্রতীকের সাহায্যে ভ্রূণ হত্যার ইঙ্গিত দিয়ে তাঁদের মতামত জানাচ্ছেন।

সপ্তাহখানেক ধরে ওই দৃশ্য দেখতে দেখতে যখন মনের মধ্যে হয়তো কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটছে, সে সময় অন্য দৃশ্য রচনা করলেন প্রতিবাদী পক্ষ। কাছাকাছি এক সরকারি জমিতে তারা এসে শ'খানেক লোহার হ্যাঙার ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেন। গাছের ডালে ঝুলন্ত পোস্টারে আতঙ্কগ্রস্ত যুবতীর মুখ। ওই প্রতীক থেকে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে আইন করে গর্ভপাত বন্ধ করা হলে মেয়েদের অন্য কারণে জীবন সংশয় হবে। তারা পুরনো দিনের মতো লুকিয়ে গর্ভপাত করাতে যাবে কোনও হাতুড়ে ডাক্তার বা আনাড়ি দাই-এর কাছে। এক সময় ভ্রূণহত্যা যাদের গোপন পেশা ছিল, তারা লোহার হ্যাঙার দিয়ে জরায়ু থেকে ভ্রূণ উৎপাটন করে আনত। সেই বীভৎস পদ্ধতির কথা স্মরণ করানোর জন্যে হ্যাঙার টাঙিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ আইনসম্মত গর্ভপাতের সমর্থনে এই দল প্রতীকের সাহায্যে মতামত জানালেন।

আবার কয়েকদিনের মধ্যে নীরব উতোর চাপান শেষ করে দু'দলই মাঠ ফাঁকা করে দিলেন। আমেরিকার শহরে শহরে এমন উদাহরণ আরও পাওয়া যাবে। এছাড়া গর্ভপাত আইনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সোচ্চার প্রতিবাদ এবং মিছিল তো আছেই। ওয়াশিংটনে ক্যাপিটলে বিল্ডিংয়ের সামনে এমন জমায়েত সমানেই হয়ে আসছে। প্রো চয়েস দলের দাবি হচ্ছে—গর্ভপাত নারীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিষয়। তাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না। আর রাইট টু লাইফ বা 'প্রো লাইফ' দলের দাবি হল ভ্রূণ হত্যা আইন করে বন্ধ করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার সহজ বিকল্প হিসেবে এই নিষ্ঠুরতাকে আইনের

সাহায্যে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না...ইত্যাদি...ইত্যাদি। নানা স্লোগানে দু দল মুখর।

আমেরিকায় পঞ্চাশের দশকে গর্ভপাত নিষিদ্ধ থাকার ফলে সরকারি অনুমোদন বা সরকারি খরচে হাসপাতালে যাবার উপায় ছিল না। প্রাইভেট ক্লিনিকেরও এত সুব্যবস্থা ছিল না। নারীর জীবনে সেই উভয় সঙ্কটের মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। তারপর ক্রমশ প্রাইভেট ক্লিনিকের সুবিধে হওয়াতে গর্ভপাতের ব্যবস্থা সমাজে অনুমোদিত না হলেও দুরূহ ছিল না। ১৯৭৩ সালে এদেশে 'রো ভার্সেস ওয়েড' আইনের সাহায্যে গর্ভপাতকে আইনসম্মত করা হল। পরিস্থিতিগত কারণে গর্ভপাত করানো মার্কিন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে পড়ল। গত উনিশ-কুড়ি বছরে এই আইন বলবৎ রয়েছে কয়েকটি শর্তের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত কোনও মহিলা যখন এই উদ্দেশ্যে ডাক্তারের কাছে বা ক্লিনিকে যাবেন, পরীক্ষার পর তাঁকে আরও চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে মনস্থির করার জন্যে। সেই সময় পার হবার পর তিনি গর্ভপাত চান কি না স্থির করবেন। দ্বিতীয়ত গর্ভপাতের ক্লিনিকের এই দায়িত্ব থাকবে—সেখানে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে বোঝাতে হবে। গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রকৃত অবস্থার কথা বলে তাঁকে ওই সিদ্ধান্ত থেকে নিরস্ত করার জন্যে উপদেশ দেবেন চিকিৎসক এবং ক্লিনিক কর্মীরা। তৃতীয়ত টিন এজার মেয়ে যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ওই উদ্দেশে ক্লিনিকে আসে, তবে তাকে বাবা নয়তো মা, কোনও একজন অভিভাবকের অনুমোদন আছে একথা প্রমাণ করতে হবে। সে অভিভাবকহীন হলে কোর্টের জজের অনুমতি নিতে হবে। গর্ভপাতের আগে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও বিবাহিতা নারী এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। এছাড়াও আর যে যে কারণে সন্তান সম্ভাবনা হলে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হবে, সেগুলি হল ধর্ষিতা নারীর ক্ষেত্রে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে দৈহিক সংসর্গের ফলে এবং বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে মাতৃত্বের সম্ভাবনা থেকে যদি অসুস্থতার জন্যে প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা থাকে।

দেখা যাচ্ছে, এই আইনও আমেরিকার প্রত্যেকটি স্টেটে সমানভাবে কার্যকরী নয়। যেমন অভিভাবকের অনুমতির ব্যাপারটি সর্বত্র প্রযোজ্য হয়নি। ম্যাসাচুসেটস, রোড আইল্যান্ড, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ওহায়ো, ইন্ডিয়ানা, মিশিগান, অ্যালাবামা, জর্জিয়া, সাউথ ক্যারোলাইনা, লুইসিয়ানা, আরফানসো, মিসৌরি, মিনেসোটা, নেব্রাস্কা, নর্থ ড্যাকোটা, ওয়াইওমিং আর ইউটা রাজ্যে এই অনুমোদন আবশ্যিক। অর্থাৎ বাবা, মায়ের সম্মতি এবং উপস্থিতি ছাড়া টিন এজারের গর্ভপাত করানো হবে না। আবার ওয়াশিংটন স্টেট, ওরিগন, ক্যানসাস, ওক্‌লাহোমা, টেকসাস্, আয়ওয়া, উইসকনসিন, ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, ফ্লোরিডা, নিউ ইয়র্ক, ভারমন্ট, নিউ হ্যামশায়ার, মেইন, কানেকটিকাট, নিউ জার্সি ও হাওয়াই-তে এই অনুমোদন থাকলেও ক্ষেত্র-বিশেষে অভিভাবকের বদলে কোনও বিচারকতে জানাতে হবে। অভিভাবকরা থাকা সত্ত্বেও এরকম নিয়ম আছে যে শুধু বিচারকের অনুমতি নিয়েও মেয়েটি গর্ভপাত করাতে পারবে। এখানে আইনের চাপ অপেক্ষাকৃত শিথিল। আবার ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যালাস্কা, নেভাদা, আইডাহো, মনট্যানা, কলোরাডো, অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো, সাউথ ড্যাকোটা, ইলিনয়, কেনটকি, টেনেসি, মিসিসিপি, পেনসিলভানিয়া, মেরিল্যান্ডে অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এছাড়া ওই যে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চিন্তা করার সময় দেওয়ার কথা, সে শর্তও প্রত্যেক রাজ্যেই

আবশ্যিক করা হয়নি।

সারা আমেরিকার হিসেব অনুযায়ী এখন এদেশে বছরে ১.৬ লক্ষ গর্ভপাত করানো হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই হার যথেষ্টই বেশি। প্রতি এক হাজার গর্ভ সঞ্চার পিছু ২৯টি গর্ভপাত।

১৯৭৩ সালের 'রো ভার্সেস্ ওয়েড্ ডকট্রিন' আমেরিকা মেয়েদের বিশেষত দরিদ্র পরিবারের কুমারী মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিল। কুমারী মাতৃত্ব, গোপনে গর্ভপাতের ঝুঁকি অথবা সদ্যোজাত সন্তানকে দান করে দেওয়ার দুঃখ, বারবার সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের সমস্যা, বিধবা অবস্থায় নয়তো বিবাহ বিচ্ছেদের পরে সন্তান সম্ভাবনা, আর্থিক অনটন—এ সব ছিল নিম্ন মধ্য পরিবারের বড় সমস্যার কারণ। সেই হিসেবে গর্ভপাত সংক্রান্ত নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে তারা রেহাই পেতে চেষ্টা করল। উচ্চবিত্ত সমাজেও প্রতিক্রিয়ার বিশেষ পার্থক্য হল না। কারণ অবাঞ্ছিত সন্তান কোনও সমাজেই স্বীকৃতি পায় না। কুমারী মাতৃত্বও সমর্থন যোগ্য নয়, অন্তত পরিবার ও সমাজের বিচারে। ধনী পরিবারের হাইস্কুলে পড়া মেয়ে বা কলেজে পড়া ছেলেমেয়ে যদি এরকম অবস্থায় পড়ে, তখনও অভিভাবকদের একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েন। ছেলে অসময়ে ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে বলে অসন্তুষ্ট হন। বিয়ে হলে একরকম। না হলে অন্য পন্থার কথা ভাবতে হয়। সুতরাং গর্ভপাত আইন সম্মত হলে তাঁদের কিছু দুর্ভাবনা ঘোচে। এছাড়া ধর্ষণ, অসহায় অবস্থার সুযোগে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, অসুস্থ মহিলার সন্তান ধারণের ফলে জীবনের আশঙ্কা ইত্যাদির কারণে গর্ভপাতের ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা হল। অথবা অন্তঃসত্ত্বা হবার পরে দাম্পত্য অশান্তি যদি তুঙ্গে ওঠে, স্ত্রী নির্যাতিত হতে থাকেন এবং বিয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়, সেখানেও তিনি গর্ভপাত আইনের সাহায্য নিতে পারেন। অর্থাৎ মেয়েদের একান্ত ব্যক্তিগত সঙ্কটে গর্ভপাত আইনের আশ্রয় নিয়ে সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

কিন্তু দেখা গেল রো ভার্সেস ওয়েডকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও বিতর্ক ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল। রক্ষণশীল সমাজে এই ইস্যু নিয়ে নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, নীতি বিগর্হিত পাপ আচরণের সমর্থন ইত্যাদি তীব্র অভিযোগের ঝড় উঠল। ক্রমশ প্রো চয়েস আর রাইট টু লাইফ দলের মধ্যে প্রবল বিরুদ্ধতা সৃষ্টি হল। গত বারো বছরে রাজনৈতিক মহল এ নিয়ে বিব্রত।

গর্ভপাত ইস্যু নিয়ে প্রতিক্রিয়া এমন পর্যায়ে পৌঁছল মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ভোটপ্রার্থীরাও এই নিয়ে প্রচারে নামলেন। গর্ভপাত আইন হয়ে দাঁড়াল ক্যাম্পেনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। গত বারো বছরে যা লক্ষ করা গেল—পরপর দুই রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতিই অর্থাৎ রেগন ও বুশ গর্ভপাত প্রসঙ্গে রীতিমতো রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেন। এঁরা নানাভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মাধ্যমে ১৯৭৩-এর 'রো ভার্সেস ওয়েড' অর্থাৎ গর্ভপাতে নারীর সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা করলেন যদিও বলা হল সুপ্রিম কোর্টকে সংশোধন ও পরিবর্তনের ভার দেওয়া হয়েছে। রেগনের মেয়াদ শেষ হবার পরে বুশ একইভাবে সুপ্রিম কোর্টের নতুন সিদ্ধান্তের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। প্রধান উদ্দেশ্য হল ১৯৭৩-এর আইনের রদবদল।

মোট ন'জন বিচারক নিযুক্ত হলেন। মাত্র একজন মহিলা ও বাকি আটজন পুরুষ। বুশের বিশেষ ভরসা ছিল তাঁর এবং রেগনের আমলে নিয়োগ করা তিন রক্ষণশীল বিচারকের ওপর। তাঁরা হলেন মহিলা বিচারক স্যান্ড্রা ডে ওকনর, অ্যানথনি এম কেনেডি আর ডেভিড এইচ স্যুটার। বাকিদের মধ্যে ছিলেন আরও ক'জন রক্ষণশীল বিচারক। প্রধান বিচারপতি উইলিয়ম রেন্‌কুইস্ট, বায়রন হোয়াইট। অ্যান্টনি স্ক্যালিয়া আর সেই বহুবিতর্কিত কালো বিচারক ক্লারেন্স থমাস। এঁরাও রদবদলের জন্যে উদ্যোগ নিতে পারেন বলে সম্ভাবনা ছিল। মাত্র দুই উদার ভাবাপন্ন বিচারক ছিলেন ৮৩ বছরের বৃদ্ধ হ্যারি ব্ল্যাকমান আর জন স্টিভেন্স।

এঁরা ন'জন ভোট দিলেন। ফলাফল হল—১৯৭৩-এর আইনের স্বপক্ষে গেলেন পাঁচজন। আর বিপক্ষে চারজন। ওকনর, কেনেডি, স্যুটার তিনজনেই বুশকে নিরাশ করলেন। তাঁরা সমর্থন জানালেন বৃদ্ধ ব্ল্যাকমান আর স্টিভেন্সের মতো ওই উদার নীতির স্বপক্ষেই। আর বিপক্ষে ভোট দিলেন বাকি চারজন। রো ভার্সেস ওয়েড সামান্য সংশোধিত হয়ে এই দাঁড়াল—(১) গর্ভপাতের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও মহিলা যদি চিকিৎসকের কাছে বা ক্লিনিকে যান তাঁকে তারপরেও ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষার পরে তিনি গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

(২) গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেবার পরেও তাঁকে চিকিৎসক ও ক্লিনিক কর্মীদের কাছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুনতে হবে। সে সময় তাঁর গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স, অবস্থান এবং তাকে বিনষ্ট করা উচিত কি না—এসবই চিকিৎসকদের মারফৎ তাঁকে জানতে হবে। অর্থাৎ তাঁরা তাকে গর্ভপাতের অনুকূলে তো কিছু বলবেনই না। উপরন্তু এর প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কি না, সে বিষয়ে উপদেশ দেবেন।

(৩) টিন এজার মেয়েদের ক্ষেত্রে অন্তত একজন অভিভাবকের সম্মতি থাকতেই হবে। অথবা কোনও একজন বিচারকের অনুমোদন আনতে হবে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এই নিয়ম বজায় থাকবে।

(৪) তবে বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতির কোনও প্রয়োজন নেই। গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারিণী তিনি নিজেই। এই ক্ষেত্রে সংশোধিত আইনে মেয়েরা আরও কিছু সাংবিধানিক অধিকার পেয়ে গেলেন।

এছাড়া অন্যান্য যা যা শর্ত ১৯৭৩-এর মতোই রাখা হল। গত ২৯ জুন সুপ্রিম কোর্টে ভোটের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে ভোটের ফলাফল যাই হোক, যে কোনও মুহূর্তে পাশার দান উলটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ মাত্র এক ভোটের জন্যে রো ভার্সেস ওয়েড-কে টিকিয়ে রাখা গেল। এ প্রসঙ্গে বৃদ্ধ বিচারক ব্ল্যাকমান বলেছেন—আমার তিরাশি বছর বয়স হয়েছে। আমি এই আদালতে চিরকাল থাকব না...। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য, এর পরে যাঁরা বিচারপতি হয়ে আসবেন, তাঁদের নিয়োগের ব্যাপারেও নতুন রাষ্ট্রপতি ও প্রশাসনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। সুতরাং ভবিষ্যতে এই ইস্যু নিয়ে যে আবার কী পরিস্থিতি হবে, অনুমান কঠিন নয়।

আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পটভূমিতে বিল ক্লিনটন ও রস পেরো এই দুই প্রার্থীই এখন গর্ভপাত প্রসঙ্গে উদারনীতি এবং নারীর ব্যক্তিগত অধিকারের সপক্ষে মতামত

দিচ্ছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে শুধুমাত্র গর্ভপাত ইস্যুকে প্রাধান্য দেবে—এমন নয়। অন্তত এ মুহূর্তে বহু অন্যান্য সমস্যা নিয়েই তাদের বিচার বিবেচনা চলছে। তবে গত তিন বছরের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে মোট ২/৩ ভাগ ভোটার 'গর্ভপাতের আইন' বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দেবে না। তবে জর্জ বুশের পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকছে। তিনি এ পর্যন্ত আমেরিকার কোর্টে দেড়শো জন বিচারককে নিয়োগ করেছেন। তাঁর এবং রেগনের নির্বাচিত বিচারকের সংখ্যা এখন এত বেশি যে মোট বিচারকদের মধ্যে ৬০% ই হচ্ছেন এঁদের অনুমোদিত। নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল যাই-ই হোক না কেন কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগে এখন দীর্ঘকাল এঁরাই প্রভাব বিস্তার করবেন। তবে 'প্রো চয়েস' দল বুশের ফিরে আসা একেবারেই পছন্দ করছেন না। কারণ আবার জমানা ফেরত পেলে বুশ নির্ঘাৎ আরও বহু রক্ষণশীল বিচারকদের ধরে আনার চেষ্টা করবেন এবং গর্ভপাত অধিকারকে পাকা আইনের আওতায় ফেলতে দেবেন না। এ সবই অবশ্য এই দলের অনুমান সাপেক্ষ প্রচার।

প্রো চয়েস দল সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। একদল কোর্টের বোতামে ছোট্ট হ্যাঙার লাগিয়ে তাতে রক্তের বদলে লাল রং মাখিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ কিনা আবার সেই পঞ্চাশের দশক ফিরে আসছে। আমেরিকার মেয়েদের দুঃখের দিন সমাগত। কারণ সুপ্রিম কোর্ট যা এতদিন মেয়েদের সাংবিধানিক অধিকারের বিষয় ছিল, তাকে বিশেষ সুবিধে বলে চিহ্নিত করতে চাইছে। এই যে রাজ্যে রাজ্যে এত রকম সরকারি বিধিনিষেধ আরোপ করার সুযোগ দেওয়া হল, তার ফলে হাজার রকম সমস্যা সৃষ্টি হবে। গরিব মেয়েদের বিশেষত টিন এজারদের আরও বিপদগ্রস্ত করা হল। পেনসিলভানিয়া রাজ্যে মোট ৬৭টি কাউন্টি আছে। তার মধ্যে মাত্র আটটি কাউন্টিতে অ্যাবরশন ক্লিনিক আছে। এতদিন সেখানে ওই চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করা আর চিকিৎসকের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শোনার শর্ত মানতে হত না। এখন নতুন রায় বলবৎ হবার পরে কোনও মহিলাকে গর্ভপাত করার জন্যে মোট দু'বার অত দূরে যাতায়াত করতে হবে এবং কাজের জায়গা থেকে ছুটি নিতে হবে। গর্ভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ এবং সময় দুই-ই নষ্ট। টিন এজারদের সমস্যাও কম হল না। যে সব স্টেটে তাদের গর্ভপাত করাতে হলে অভিভাবকদের সঙ্গে আনতে হবে তাদের কাছে ব্যাপারটি বেশ দুশ্চিন্তার হবে বলে গর্ভপাত সমর্থনকারীরা মনে করছেন। প্রথম বাড়িতে জানানো সহজ কাজ নয়। তারপর বাবা, মার প্রতিক্রিয়া অশান্তি ইত্যাদির ভয়। আবার তাঁদের কাছে গোপন করলেও নিস্তার নেই। যেতে হবে কোনও জজ সাহেবের কাছে। তিনি মত না দিলে গর্ভপাত করানো যাবে না। গর্ভপাত ক্লিনিকের চিকিৎসকরা বলছেন—এতরকম বাধা ও আশঙ্কা দেখে ছেলেমানুষ মেয়েরা হয়তো গোপনে কোনও বিপজ্জনক উপায়ে গর্ভমোচনের চেষ্টা করবে। তাতে জীবন সংশয় হতে পারে। অথবা চিরকালের মতো তার সন্তান ধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গর্ভপাতের জন্যে খরচ হয়তো তিনশো ডলার মতো। চিকিৎসকরা পার্ট টাইম হিসেবে ক্লিনিকে এসে কাজ করেন। এখানকার নিয়ম মানতে হলে তাঁদের প্রত্যেককে আরও বেশি সময় দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে একদিন মেয়েটির পরীক্ষা করবেন। আবার ২৪ ঘণ্টা পরে উপদেশ দেবেন, তাও আবার নিজের ব্যবসার ক্ষতি করে। এত সব খরচ ক্লিনিক জোগাবে কার কাছ থেকে? ওই গরিব মেয়েটি কাছ থেকে

অবশ্যই। তার ওপর তার থাকা, খাওয়া সমস্যা তো থাকছেই। সেখানেও চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষার জন্যেই বাড়তি গুণাগার দিতে হবে। এই সব নিয়েই এখন 'প্রো চয়েস' এবং 'প্ল্যানড পেরেন্টহুড' জাতীয় সংস্থারা সোচ্চার হয়েছেন। তবে মোটামুটিভাবে পাশার দান যে একটুর জন্যে উলটে যায়নি, এতে তাঁরা সাময়িকভাবে সামান্য নিশ্চিন্ত হয়েছেন। বিলটি ফ্রিডম অফ চয়েস অ্যাক্ট না হওয়া পর্যন্ত জোরদার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এঁরা।

অন্যদিকে 'রাইট টু লাইফ' দলও উত্তেজিত। এঁরা বলছেন—সুপ্রিম কোর্টের রায় শেষ পর্যন্ত ভ্রূণ হত্যাকারীদের স্বপক্ষে গেল। অসহায় অজাতক শিশুর জীবন ধারণের অধিকার নিয়ে বিচারকরা আদৌ চিন্তা করলেন না। এমনকি রেগন, বুশের নিয়োজিত তিন বিচারকও বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। নানা শর্ত আরোপ করা সত্ত্বেও গর্ভপাতের নিরঙ্কুশ অধিকারকে কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ করা হল না। এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি ক্রমশ এদেশের মেয়েদের ভবিষ্যতে আরও উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবন যাপনে সাহায্য করবে। স্বজন, পরিবার, সমাজ কোনও কিছুই তাদের স্বেচ্ছাচারে বাধা দেবার সুযোগ পাবে না।

একদিকে ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর উইমেনের সভানেত্রী প্যাট্রিশিয়া আয়ারল্যান্ড বলছেন—আদালতে রো ভার্সেস ওয়েডকে বাঁচিয়ে রাখার দুর্বল চেষ্টা সত্ত্বেও তার মৃত্যু হল। নারীর সাংবিধানিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ এড়ানো গেল না।

ওদিকে ওয়াশিংটনে রাইট টু লাইফ মিছিলে যোগ দিয়েছে ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে। বুকের সামনে পোস্টারে ভ্রূণের ছবি আঁকা। ন'বছরের মেয়ে পোস্টার দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আজ আমার জন্মদিন। আমাকে জীবন দেবার জন্যে মাকে ধন্যবাদ। সে নাকি জ্ঞান হওয়া ইস্তক মায়ের সঙ্গে মিছিলে মিছিলে জীবনের জয়গান গেয়ে বেড়াচ্ছে।

ক্রুশধারী আর হ্যাঙারধারীরা ওয়াশিংটনের সুপ্রিম কোর্টের চত্বরে সেদিন লাগাতার স্লোগান চালিয়ে গিয়েছিলেন। ক্রুশধারীরা চাইছিলেন না, '৭৩ সালের গর্ভপাত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বজায় থাকুক। তাঁরা চিৎকার করে বলছিলেন—এক, দুই, তিন, চার, রো ওয়েড পগার পার। ওদিকে গর্ভপাত সমর্থকদের দল আরও ভারী। তাঁরাও সমস্বরে ধ্বনি দিচ্ছিলেন—জীবনদাতা?/মিথ্যে কথা!/মায়ের মৃত্যু/তুচ্ছ হল!/শিশুর জন্যে/মাথা ব্যথা!

তবে কি বুশ সাহেব প্রমাদ গুনছেন? কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের সৎ সাহস হারাচ্ছেন না। ভোটরঙ্গের সময়েও স্পষ্টই বলেছেন—আমার কাছে পারিবারিক মূল্যবোধ অনেক বড়। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত সেক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতিকে প্রাধান্য দেওয়াতে আমি স্বস্তি পেয়েছি। গর্ভপাত সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত সকলেই জানে। এখনও তার পরিবর্তন হয়নি। তিনটি পরিস্থিতি ছাড়া বাদ বাকি সবক্ষেত্রে আমি গর্ভপাতের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ, আত্মীয়র দ্বারা গর্ভসঞ্চার ও মায়ের জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা ছাড়া অন্য কোনও কারণে গর্ভপাতকে সমর্থন করি না।

গর্ভপাত অধিকারকে কেন্দ্র করে পরস্পর বিরোধী দলগুলি আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্যন্ত সক্রিয় আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সুপ্রিম কোর্টের সামনে, গর্ভপাত ক্লিনিকের সামনে মিছিল, স্লোগান আরও জোরদার হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে নিয়মনীতিগুলিকে ব্যবহার করা হবে, তার মধ্যেই প্রতিফলিত হবে কোথায় কী ঘটছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ই শেষ কথা নয়। এই ইস্যু এমনই স্পর্শকাতর যে কোর্টের সিদ্ধান্ত থেকে সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব নয়। মেয়েদের নিজস্ব অধিকারের প্রশ্ন যেমন একদিকে, অন্যদিকে আছে ভ্রূণহত্যার ক্ষেত্রে মানবিক বিচারের প্রশ্ন। কোনও দলই চূড়ান্তভাবে অপর দলের বক্তব্য ও অনুভূতিকে নস্যাৎ করে দিতে পারেন না। প্রথমত অবাধ যৌন স্বাধীনতার সুযোগ থেকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিণতি এদেশে গর্ভপাত সমস্যাকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। আইনের সাহায্যে এ ধরনের সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। সমাজে সর্বস্তরে এর প্রভাব পড়ছে। কুমারী মাতৃত্ব থেকে দারিদ্র্য, উচ্চশিক্ষার অভাবে জীবিকার সমস্যা, অভাবি এবং একা মায়ের সংসারে পালিত সন্তান নানা স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক সমস্যা থেকে বহু সমস্যার জন্ম। হয়তো পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলির মতো আমেরিকাতেও গর্ভপাত ইস্যুকে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ওপর ন্যস্ত করার চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। জনসাধারণ তো ঠিক সেই অর্থে চরমপন্থী হল না কোনও দেশেই, যে অর্থে কোনও বিশেষ দলকে চিহ্নিত করা যায়। সাধারণ মানুষ এদেশেও গর্ভপাত প্রসঙ্গে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে মতামত দিয়ে থাকেন। একই সঙ্গে কেউ নারীর ব্যক্তিগত অধিকারকে যেমন স্বীকৃতি দেন। অবস্থা বিশেষে গর্ভপাতকে সমর্থন করেন, তেমনই ভ্রূণ হত্যা সম্পর্কেও তাঁদের রক্ষণশীল মনোভাব থাকা সম্ভব। সুতরাং কয়েকজন বিচারকের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে জনসাধারণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভর করলে হয়তো গর্ভপাত আইন প্রসঙ্গে আরও ব্যাপক বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

মাতৃজঠরে ভ্রূণের হৃদস্পন্দন থেকে জীবনের সূচনা বলে যদি ধরা হয়, তবে সেই জীবনের জন্যে যাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা অবশ্য এখন ক্রমশ সংখ্যালঘু হয়ে উঠছেন। নানা কারণে 'প্রো চয়েস' দলের সংখ্যা ভারী হয়েছে। বেঁচে থাকার অধিকার কার বেশি। একটি মেয়ের না আর অজাতক ভ্রূণের? খেয়াল করবেন, আমি এখানে মা বা সন্তান শব্দটি ব্যবহার করছি না। কারণ মেয়েটি মা হতে চাইছে না। নারী তার আপন ভাগ্যকে জয় করার কিছু অধিকার অর্জন করেছে বলে আমার ধারণা। অন্তত এই শতকে আমেরিকায় বসে খুব বেশি নালিশ করা যাবে না। অতএব নারীর দেহগত অধিকারে কোর্ট কাছারির হস্তক্ষেপ সমর্থন করা যায় না। তার গর্ভের ভ্রূণকে সে জন্ম দিতে চায় কি না সে সিদ্ধান্ত তার নিজেরই হোক। কিন্তু এরচেয়েও বড় সিদ্ধান্তের দায় তার আছে। অন্তঃসত্ত্বা না হওয়া। নীতিশিক্ষার পাঠ নয়, আধুনিক পৃথিবীর জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সুবিধের কথা বলছি। 'প্রো চয়েস' দল বলেন—আমার শরীর নিয়ে যা কিছু সিদ্ধান্ত, সে একান্তই আমার হবে। তাহলে সেই শরীর ভারমুক্ত রাখার গুরুভার বা দায়িত্বও সে নিজেই সক্ষম। ভেবে দেখতে গেলে মেয়েদের শরীরের নানা অংশের বর্ণনাও কিন্তু আবেগের বশে দেওয়া চলে না আর। মাতৃজঠর বলে জবরদস্তি চিহ্নিত হবার দরকার নেই। নারীত্বের সঙ্গে মাতৃত্বের প্রচ্ছন্ন শর্ত আরোপ করার কী আছে? শুধু জঠর না মাতৃজঠর, সে নারী বুঝবে।

এইসব নিয়ে মাঝে তর্কে নেমে পড়ি। গর্ভপাত ইস্যু নিয়েও তর্কাতর্কি হয় এধারওধার। প্রো চয়েস-রা ধিক্কার দিয়ে বলেন—মুক্তমনের অধিকারী নই আমি। ওদিকে আমার গোঁড়া ক্যাথলিক বান্ধবী ফ্র্যান সেলস মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে বলে—তোমার অ্যাবরশন রাইটকে

সাপোর্ট করার মধ্যে কোনও মহত্ব নেই, মানবিকতাও নেই।

আমি তো সেই জনসাধারণেরই একজন। কোনও দলেই পুরোপুরি নাম লেখাতে পারি না। ক্রুশ আর হ্যাঙার একই সঙ্গে খুব সঙ্গোপনে যন্ত্রণা দিতে থাকে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

বাড়ি ভাড়ার ঝোঁক

কোনও আমেরিকান এক বাড়িতে সারা জীবন কাটাতে চায় না। এক শহরে দীর্ঘদিন থাকে কিনা সন্দেহ। চতুরাশ্রমের পর্বে পর্বে চতুর্দিকে অভিযান। গত অর্ধশতকের ইতিহাস এই গতিবাদের প্রবণতাকে প্রমাণ করছে। একটি মানুষ অন্তত বার দশেক ঠিকানা বদল করতে পারেন। এখানে কিন্তু শৈশবের কথা বাদ দিচ্ছি। কারণ শুধু আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর বহু দেশে, এবং আমাদের দেশেও ইদানীংকালে কতজন আর তাঁর শৈশবের 'ক্রীড়াভূমি'তে থেকে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারছেন? চাকরি সূত্রে পরবাসী, বিবাহ ঘনীভূত করতে প্রাইভেসি, পৈতৃক ভিটে প্রোমোটারের হাতে গেলে ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানবাসী। নয়তো 'নব গৃহ নির্মাণ'—কোথায় আর আপনি এক জায়গায় টিকে আছেন? অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এ যুগে আর একটি মাত্র বাড়িতে চিরকাল থেকে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, মূলের মতোই মূল থেকে উৎপাটিত হয়ে যত্র তত্র ছড়িয়ে পড়ছেন।

আমেরিকায় এই সেদিন পর্যন্ত মূল উৎপাটনের ঘটনাগুলো আরও কম বয়সে ঘটে যাচ্ছিল। স্কুল জীবন শেষ হয় ১৮ বছর বয়সের মধ্যে। সেই যা একটানা বাবা মার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা। তারপর হয় কলেজ, নয় চাকরি। নয়তো চাকরি করতে করতে কলেজ। চার বছরের কলেজ পর্বের মধ্যে শুধু ছুটি কাটাতে বাড়ি ফেরা। আর চাকরি শুরু হলে নিজের ছোট্ট একটি আস্তানা। কারণ 'বড় হলে' স্বনির্ভর হতে হয়। এই হল প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু সম্প্রতি বড় হওয়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আর বেকার সমস্যা। এ অবস্থায় আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে স্বনির্ভর হতে গেলে অনেক ছেলেমেয়ের পক্ষেই খরচ চালানো মুশকিল হয়ে পড়ছে। যে জন্যে বহু বাড়িতে দেখা যাচ্ছে অবিবাহিত চাকুরে ছেলে মেয়েরা আবার তাদের বাবা, মার সঙ্গেই থাকছে। প্রধান সুবিধে—হাতে বেশ পয়সাকড়ি জমে যাচ্ছে। বিয়ে করার আগে পর্যন্ত যতখানি সঞ্চয় করা যায়। দ্বিতীয়ত হঠাৎ করে চাকরি বাকরি চলে গেলেও থাকা, খাওয়ার চিন্তা নেই। তবে এও অস্থায়ী বন্দোবস্ত। চাকরি বদল করলে অন্য শহরে কিংবা অন্য স্টেটেই চলে যেতে হতে পারে। আর বিয়ে করলে তো পত্রপাঠ নবনীড়।

যাই হোক, এই দ্বিতীয় পর্যায় থেকেও কিন্তু একটানা এক বাড়িতে থাকার সম্ভাবনা নেই। প্রথমে ছোট অ্যাপার্টমেন্ট। তারপর বড় অ্যাপার্টমেন্ট, তারপর টাউন হাউস কিনে ফেলা, তারপর জমি জায়গা সুদ্ধু বাড়ি কেনা, তারপর বদলি হয়ে যাওয়া, বাড়ি ঘর বিক্রি,

নতুন জায়গায় আবার নতুন সংসার। সেখানেও প্রথমটা কোম্পানির খরচে ভাড়া বাড়িতে থাকতে থাকতে নিজেদের ঘরদোর কেনার ব্যবস্থা করা, দুম করে চাকরি চলে যাওয়া, আবার কাজ খোঁজা, আমেরিকার এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে ভেসে যাওয়া, নতুন ঠিকানা, যৌবনকাল শেষ, প্রৌঢ়ত্বে নতুন পরিকল্পনা, বাড়ি ঘর বেচে দিয়ে কনডোমিনিয়াম কিনে ফ্লোরিডা নয়তো ছেলে মেয়ের কাছাকাছি কোনও একটি স্টেটে এসে বসা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এক জীবনে বহুবার বাসস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকছে।

এদেশে এখনও পর্যন্ত একটি ব্যাপার প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে—ভাড়া বাড়ির বদলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের বাড়ি কিনে ফেলা। কোনও মতে ডাউন্ পেমেন্ট অর্থাৎ প্রথমবারের কিস্তির মোটা অঙ্কটি ব্যাংকে ধরে দিতে পারলে, বাদ বাকি ধার দেনার ব্যবস্থা তাদের হাতে। এবং পঁচিশ বছর থেকে তিরিশ বছর ধরেও মাসে মাসে ধার শোধ দেওয়া যায়। ফলে প্রথম বাড়িটি কিনতে একটু চাপ সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু বাড়ি ছোট হলে মর্টগেজ পেমেন্টও সাধ্যের মধ্যে থাকে। কিন্তু পরের বারে সুবিধে অনেক। এতে ৮০/৮৫ সাল পর্যন্ত বাড়ির দাম যে ভাবে বেড়েছিল, তাতে একটি পুরনো ছোট্ট বাড়ি বিক্রি করেই প্রায় দ্বিগুণ লাভ হয়ে যেত। তখন সেই লাভের অংশ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে ধরে দিলে নতুন বড় বাড়ি কেনা সহজেই সম্ভব হত। ঊনআশি সালে একজন পঁচাশি হাজার ডলার দিয়ে একটি বাড়ি কিনেছিলেন। পুরনো বাড়ি। সাতাশি সালে সেই বাড়ি বিক্রি করলেন দুশো, আশি হাজার ডলারে। নিউ জার্সি ছেড়ে নতুন চাকরি নিয়ে মেরিল্যান্ডে গিয়ে প্রাসাদোপম বাড়ি কিনলেন তিনশো হাজার ডলারে। তার মানে, আট বছরে কী পরিমাণ লাভ করেছেন! অন্য স্টেটে গিয়ে আগের বাড়ি বিক্রির লাভ থেকেই খরচ তুলতে পারলেন।

ঠিক তার এক বছরের মধ্যে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অবনতি ঘটতে লাগল। আমেরিকার অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল যে বাজারে নতুন বাড়ির ক্রেতাই পাওয়া যায় না। চাকরি বাকরির বাজার খারাপ। ব্যবসাপত্র ঢিমে তালে চলছে। কত বাড়ি দেনার দায়ে ক্রোক হয়ে যাচ্ছে। মালিক মাসে মাসে মর্টগেজ শোধ করতে না পারার ফলে তার বাড়ি ব্যাংকের ফোর ক্লোজারে চলে যাচ্ছে এবং আবার বিক্রির বাজারে আসছে। অতিরিক্ত শখশৌখিনতার জন্যে মানুষ অযথা ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ফলে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হয়ে পড়ে থাকছে। ক্রমশ বিলভার দাম কমাতে বাধ্য হচ্ছে। পুরনো বাড়ির মালিকরা বাড়ি বিক্রি করে যে দ্বিগুণ লাভ করবে, সে সুযোগই নেই। সে সময় একটা কথাই ছিল—বায়ার্স মার্কেট। অর্থাৎ ক্রেতাদের সুবর্ণ সুযোগ। সম্ভাব্য ক্রেতার তুলনায় বাজারে নতুন, পুরনো মিলিয়ে অজস্র বাড়ি। দরাদরি করে দাম কমিয়ে তবে লোকে বাড়ি কেনে।

'৯১-এর গোড়ায় বাড়ির দাম সামান্য বাড়তে শুরু করলেও মোটামুটিভাবে অবস্থার বিশেষ তারতম্য হল না। সে সময় একজন তাঁর বাড়ি বিক্রি করলেন দুশো হাজার ডলারে। আটাত্তর সালে সেটি কিনেছিলেন নব্বই হাজার ডলার দিয়ে। তেরো বছরে দাম বেড়েছে একশো দশ হাজার ডলার। এমন অবস্থায় আর একটু উন্নতি হয়েছে।

এদেশে একটি বাড়ি কেনার জন্যে মধ্যবয়সে সঞ্চিত অর্থ উজাড় করে দেবার প্রয়োজন হয় না। ব্যাংক আর মর্টগেজ কোম্পানিগুলির দৌলতে চাকরি জীবনের শুরু থেকেই চেষ্টা চরিত্র করে আগাম ঋণ নিয়ে বাড়ি কেনার সুবিধে পাওয়া যায়। সেই হিসেবে এদেশের

মানুষ খুব বেশি সময় ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন না।

কিন্তু সম্প্রতি বাড়ির মালিক আবার বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকছেন। নয়তো আদৌ বাড়ি কেনার পরিকল্পনাই করছেন না—এমন লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

ইদানীং আমেরিকার অনেক বয়স্ক মানুষ ভাড়া বাড়িতে ফিরে যাওয়াই সুবিধে মনে করছেন। অথচ দশ বছর আগে পর্যন্ত এদেশে অ্যাপার্টমেন্ট-এর বাসিন্দা বলতে প্রধানত অল্পবয়সী ছেলে মেয়ে আর অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছরের স্ত্রী, পুরুষদের বোঝাত। সাধারণত ওই বয়সের পরে মোটামুটিভাবে অধিকাংশ মানুষ নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন অন্য একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। নব্বই-এর দশকে নাকি আমেরিকায় বয়স্ক ভাড়াটে লোকের সংখ্যা (যাদের বয়স ৩৫ বছর থেকে ৬৪ বছর) শতকরা ২৮ ভাগ বেড়ে যাবে। আমেরিকার সেন্সাস ব্যুরো আর ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স থেকে এ হিসেব পাওয়া গেছে। এরা জানাচ্ছে—৪৫ বছর থেকে ৫৪ বছর যাঁদের বয়স, তাঁদের মধ্যে নাকি শতকরা ৫৩ ভাগ লোকই অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকবেন। এদিকে ৩৪ বছর বয়সের নীচে যাঁদের বয়স, সেই ভাড়াটেদের সংখ্যা কমে যাবে শতকরা ৯.৪ ভাগ। দু' হাজার সালের মধ্যে মোটমুটি এরকম অবস্থা দাঁড়াবে।

আমেরিকার রিয়েল এস্টেট অবস্থার এই পরিবর্তনের মূলে আছে নানা কারণ। বাড়ির দাম যাই-ই দাঁড়াক, রিসেশনের প্রভাবে সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা কমে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উপার্জন মিলিয়ে একটি নির্দিষ্ট আয়ের অঙ্ক না দেখাতে পারলে, ব্যাংক থেকে ধার পাওয়া যাবে না। ডাউন পেমেন্টের জন্যে সঞ্চয় করতে হবে—একটি দু'শো হাজারের বাড়ির জন্যে অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ হাজার ডলার। তারপর মাসে মাসে বাকি দেনা শোধ করার দায়িত্ব। দেখা যাচ্ছে, সে অবস্থায় পৌঁছতে এ যুগের ক্রেতাদের সময় আরও বেশি লেগে যাচ্ছে। নব্বই সাল পর্যন্ত আমেরিকায় প্রথমবার বাড়ি কিনতেন যাঁরা, তাঁদের বয়সের গড় হিসেবে ছিল ২৯ বছর। দশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের ক্রেতাদের বয়সের গড় হিসেব হয়ে দাঁড়াবে ৩১ বছর। অর্থাৎ ক্রমশ ক্রমশ অ্যাপার্টমেন্টে থাকার সময় দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, বাড়ি কেনার জন্যে তৈরি হতে সময় বেশি লাগছে।

এরপর আছে সামাজিক কারণ। বিবাহ-বন্ধনহীন সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে দু'জন মানুষ যখন একসঙ্গে বসবাস করছেন, অস্থায়ী ঠিকানাই যুক্তিযুক্ত বলে ভাবছেন। দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকবেন এমন কোনও কথা নেই। বাড়ি কিনতে গেলে দু'জনকেই আর্থিক দায়িত্ব নিতে হয়। যেখানে সম্পর্কের স্থায়িত্ব নিয়েই তাঁদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই, সেখানে টাকা-পয়সার ঝামেলায় যাবেন কেন? এ জন্যে এঁরা ভাড়া বাড়িতে থাকাই পছন্দ করেন। আর আছেন ডিভোর্সি অথবা বিধবা কি বিপত্নীক মানুষ। ডিভোর্সের পরে বহু বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। দু'জনে টাকা-পয়সা ভাগ করে নিয়ে যখন আলাদা সংসার শুরু করেন, তখন অ্যাপার্টমেন্টই সুবিধেজনক বলে মনে হয়।

অবিবাহিত বয়স্ক লোকেরাও বাড়ি ঘর করার ঝামেলায় যেতে চান না। পুরুষ, মহিলা, যাঁরা কোনওরকমে সাংসারিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চান না, লিভ টুগেদার করারও বাসনা নেই, তাঁরা আপন মনে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে ভালবাসেন।

ছেলে মেয়ে নিয়ে কুমারী মা, সমকামী দম্পতি (?)-রাও অ্যাপার্টমেন্টে থাকা পছন্দ করেন। যেখানে কেউ কারুর খোঁজ রাখে না, সেখানে তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়ে অন্য লোকের কৌতূহলের প্রশ্ন নেই। ঝুটঝামেলা এড়াতে যাঁরা প্রচলিত অর্থে সামাজিক নন, তাঁরা অ্যাপার্টমেন্ট পাড়ার ফুল প্রুফ প্রাইভেসিই পছন্দ করছেন। তাঁদের সমাজে শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, ফ্যাশন ডিজাইনার ইত্যাদি লোকের সংখ্যা তো কম নয়। তাঁরা আমেরিকার মফস্বলে থাকতে চান না। শহরতলিও পছন্দ নয়। এদেশের শহর মার্কা গ্রাম, নয়তো গ্রাম মার্কা শহরে তাঁরা কস্মিন কালেও বাড়িওলা হতে আসবেন না। থাকবেন নিউ ইয়র্ক, স্যানফ্র্যানসিসকোর মতো বিদগ্ধ নগরের অ্যাপার্টমেন্টে। এঁরা হলেন যথার্থ নাগরিক। কবি অ্যালেন গিনসবার্গ আমাদের খুব কাছের শহর 'প্যাটারসনে'র ছেলে। ওখানেই ওঁর বাবা মাস্টারি করেছেন। গিনসবার্গ প্যাটারসনের স্কুলে পড়েছেন। কিন্তু শৈশবের ক্রীড়াভূমি ছেড়ে কবেই নিউ ইয়র্কে চলে গেছেন। গ্রিনিচ ভিলেজ, সোহো পাড়ায় ওঁদের মানায়। বছরে একবার প্যাটারসনের কবিতা উৎসবে এসে বাণী টানি দিয়ে যান। আবেগ কম্পিত স্বরে ছেলেবেলার কথা বলেন। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে মননশীল লোকজন কেউ কেউ ভাড়া বাড়িতে থাকা পছন্দ করেন। বিষয় সম্পত্তির মতো তুচ্ছ পার্থিব ব্যাপারে সময় আর অর্থ ব্যয় করেন না। এঁরা বিদগ্ধ ভাড়াটে।

বাড়িঘর ভোগ করার জন্যে আধ ডজন ছেলে মেয়ে থাকাও দরকার। ত্রিশ বছর আগে আমেরিকাতে যে কোনও পরিবারে অন্তত পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে জন্মাত। তারা বড় হয়ে চাকরি সূত্রে এবং বিয়ে থা করে দূরে চলে গেলেও, এমন দূরে যেত না যে, প্রায় প্রায়ই মা-বাবার কাছে চলে আসতে পারবে না। চেষ্টা করত পৈতৃক বাড়ি থেকে বেশি দূরে না যেতে। ফলে বারো মাস বাড়িটি ব্যবহার হত। আর এখন এক তো ছেলেমেয়ের সংখ্যা কমে গেছে। তারাও বড় হয়ে এত দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে যে বছরে ঘন ঘন দেখা হচ্ছে না। সমাজে নিঃসন্তান দম্পতির সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বয়স্ক স্বামী-স্ত্রী আর বড় বাড়িতে সারা জীবন কাটাতে চাইছেন না। বাড়ি পরিষ্কার রাখা, বাগানের পরিচর্যা, শীতকালে বরফ পরিষ্কার করা—ক্রমশ ক্রমশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বাড়ি সারানো, রং করা, যে কোনও যন্ত্রপাতি বদলানো—খরচ বাঁচাতে গেলে পরিশ্রম বাড়ে। পরিশ্রম বাঁচাতে গেলে খরচ বেড়ে যায়। এই কারণে এঁরা বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে আবার প্রথম যৌবনের মতো অ্যাপার্টমেন্টের দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইছেন। এদেশের মফস্বলের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার পরিবর্তে কোনও বড় শহরের বৈচিত্র্য উপভোগ করতে চাইছেন। বড় শহরে সবচেয়ে সুবিধে—প্রত্যেক কাজে গাড়ি চালানোর দরকার হয় না। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কাছাকাছি হাঁটা পথে সুপার বাজার, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল, শপিং মল, ডাক্তারের অফিস, পোস্ট অফিস। হেঁটে গিয়ে অর্ধেক কাজ সেরে ফেলা যায়। কালচারাল সেন্টারগুলোতে নানা অনুষ্ঠান দেখার সুবিধে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি বিস্তৃত হয়।

বয়স্ক ভাড়াটেদের ফিরে পাওয়ার জন্যে অ্যাপার্টমেন্টওলারা বড়ই আগ্রহী। যেহেতু এঁরা বেশি বয়সে এধার ওধার চাকরি খুঁজতে চলে যাবেন না বা অ্যাডভেঞ্চার করতে অন্য স্টেটে গিয়ে হাজির হবেন না, সেহেতু এঁদের বেশ অনেকদিন ধরে ভাড়াটে হিসেবে পাওয়া যাবে। আমেরিকাতে সাধারণত একটি অ্যাপার্টমেন্টে কোনও ভাড়াটের থাকার সময়ের গড়

হিসেব হল ১.৫ বছর। আশা করা যাচ্ছে বয়স্করা এসে থাকতে আরম্ভ করলে স্থায়িত্বের গড় হিসেব হবে ২.৫ বছর। শুনতে হয়তো বিশেষ তফাৎ মনে হচ্ছে না। কিন্তু যার সম্পত্তি, তিনি ভালই লাভবান হবেন। কারণ একবার করে ভাড়াটে চলে যাওয়া মানে নতুন করে বিজ্ঞাপনের খরচ, অ্যাপার্টমেন্ট রং করে ধুয়ে, মুছে ঝকঝকে করার খরচ, পুরনো ভাড়াটে চলে যাওয়ার সময় এবং নতুন ভাড়াটে আসার সময় অ্যাপার্টমেন্ট ইনসপেকশনের খরচ, ভাড়া দেবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট ইত্যাদি সবই হচ্ছে বাড়িওলার বাড়তি খরচ। সেদিক থেকে এক ভাড়াটে বেশিদিন টিকে থাকলেই সুবিধে। তিন বছর অন্তর চুনকাম করিয়ে দিলেই যথেষ্ট। বয়স্ক ভাড়াটেরা ছ' মাস অন্তর বাড়ি বদল করতে যাবেন না। লিজ ভাঙলেই গুণাগার দিতে হবে বলে ভয় পাবেন। তাছাড়া ফ্ল্যাট বদলানো মানে অনেক বাড়তি খরচ আর ঝঞ্ঝাট, যেগুলো বেশি বয়সে তাঁদের পোষাবে না। সুতরাং এঁদের জন্যে অ্যাপার্টমেন্টওলারা উৎসাহিত হবেন, তাতে আর সন্দেহ কি?

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের মালিকদের আরও আশা—ক্রমশ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে বেকার অথবা সাধারণ চাকরি করা ছেলেমেয়েরা ভালরকম রোজগার করতে শুরু করবে। রোজগার পাতি ভাল হলেই আলাদা সংসার করবে। এছাড়া ইমিগ্রেশনও এই ব্যবসা বাঁচিয়ে রেখেছে। সারা বছর নানা দেশ থেকে পিল পিল করে লোক আসছে। ছাত্ররা পড়তে আসছে। আমেরিকার মাটিতে পা রাখার পর অ্যাপার্টমেন্টে না ঢুকে যাবে কোথায়? কে তাদের খাতির করে থাকতে দেবে? এতরকম ভাড়াটের আশায় বাড়িওলাদের আরও অ্যাপার্টমেন্ট তৈরির প্রজেক্ট চলছে।

তবে এদের মতে ভাড়াটেদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায় হলেন একটু বয়স্করা। তাঁদের রুচি মাফিক ফ্ল্যাট হচ্ছে। কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়সী ভাড়াটেদের তুলনায় আরও বয়স্কদের রোজগার শতকরা চল্লিশ ভাগ বেশি। এঁদের বয়স ৩৫ বছর এবং তার ওপরে। এবার যে ধরনের কমপ্লেক্স্ তৈরি হচ্ছে, সেখানে ছেলে ছোকরাদের চেয়ে এঁদের পছন্দের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কমবয়সীরা "হেলথ স্পা"-তে গিয়ে কৌপিন সম্বল করে উষ্ণ প্রস্রবণে কেলি করতে ভালবাসে। অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের চাকচিক্য, গুলবাগিচা আর লবির জাঁকজমক নিয়ে মাথা ঘামায়। বয়স্কদের 'বক্রেশ্বরে' গিয়ে সমবেত অবগাহনের কোনও তাগিদ নেই। তাঁরা বিলডিং-এর বাইরের স্টাইল নিয়েও মাথা ঘামান না। হ্যাঁ, পাড়াটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন আর একটু গাছপালা দিয়ে ঘেরা হলেই হল। আসল দরকার হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরের সুবিধাগুলো। ঘরগুলো যেন বড় বড় হয়। ছোট একখানা গুদাম ঘর পেলে আরও ভাল। যত রাজ্যের জিনিস বয়ে এনেছেন, সেগুলো ঠেসে ঠুসে তুলে রাখার জন্যে ক্লসেট, লফ্ট্, ক্যাবিনেট যত বেশি পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা হল ভীষণ নিরাপত্তা চাই, একা একা হাওদা বাড়িতে পড়ে থাকবেন না বলেই তো জন-অরণ্যে এসেছেন। কিন্তু তাই বলে চোর, ডাকাত ঢুকে পড়লে মুশকিল। এঁরা সিকিওরিটি ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হয়ে কোথাও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেবেন না। দুটো-একটা গাড়ি রাখার জন্যে নিজস্ব গ্যারাজ চাই। গেটওলা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স চাই। গেটে পাহারা, মেন ডোরে পাহারা, এলিভেটরের সামনে দারোয়ান, ইনটারকম সিসটেমে ক্ষণিকের অতিথিকে ধরে ধরে মৌখিক পরীক্ষা—এমন পাকা বন্দোবস্ত রাখা চাই। তবেই

বয়স্করা ভাড়া নিতে অনুপ্রাণিত হবেন। কমবয়সীদের বোধহয় প্রাণের মায়া একটু কম। গাড়ি টাড়িও তেমন দামি নয় যে গ্যারাজ ছাড়া বাড়ি ভাড়া নেবে না।

আগেকার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে কাপড় কাচার জন্যে বাইরে যেতে হত। কারণ প্রত্যেক অ্যাপার্টমেন্টে শুধু ফ্রিজ, কুকিং রেঞ্জ আর এয়ারকন্ডিশনার ছাড়া আর কোনও মেশিন দিত না। এখনও অধিকাংশই তাই। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের বেসমেন্টে বিশাল লন্ড্রি রুম। অনেকগুলো ওয়াশিং মেশিন আর ড্রায়ার সব সময় চলছে। ভাড়াটেদের জামাকাপড়ের বস্তা নিয়ে নীচে গিয়ে কাপড় কাচতে হবে। পয়সা দিলে মেশিন চলবে। দু'জনের সাপ্তাহিক খরচ এ জন্যে তিন ডলার মতো।

এখন বয়স্করা চাইছেন প্রত্যেকের নিজেদের ফ্ল্যাটের মধ্যে ওয়াশিং মেশিন আর ড্রায়ার বসিয়ে দেওয়া হোক। তাঁরা অকারণ ওপরনিচ করতে চান না। লিফটে চড়ে কাপড় কাচতে যেতে তাঁদের ভীষণ আপত্তি। আর ড্রাইক্লিনিং কোম্পানির লোক যেন নিয়মিত ঘরের দোরে এসে কাপড় ধুতে নিয়ে যায় এবং ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এঁদের যাবতীয় বায়না মেনে নিয়ে এখনকার অ্যাপার্টমেন্ট মালিকরা একেবারে নতুন ধাঁচে বাড়ি বানিয়ে ফেলছেন। তবে রাতারাতি পুরনো বাড়িগুলোকে এরকম করে নেওয়া তো সম্ভব নয়। তাই, সেখানে বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যভাবে ব্যবস্থা করছেন। যে বাড়িতে দুটো সুইমিং পুল ছিল আর ছুটির দিনে ব্যান্ডপার্টি এনে, ভেন্ডারদের খাবারের স্টল দিতে ডেকে এনে, বিরাট করে পুলপার্টি দেওয়া হত, সেখানে একটি পুল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে তৈরি করা হয়েছে হলঘর। সেমিনার রুমে ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি এসে বক্তৃতা দিচ্ছে, নানা চার্চ গ্রুপ এসে গান গাইছে, পিয়ানোর কনসার্ট—রোজ রোজ প্রোগ্রাম। গত দু' বছরে যে সব আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন অ্যাপার্টমেন্ট হাউস তৈরি হয়েছে, তার এক তৃতীয়াংশ ভাড়াটেই হচ্ছেন সচ্ছল, বয়স্ক মানুষ। এঁদের পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভর করে বাড়িঘর সাজানো হচ্ছে। টোকার মুখে মার্বেলের চত্বর। মেহগনি কাঠের দরজার গায়ে প্রত্যেকের নাম লেখা চকচকে পেতলের নেমপ্লেট। মস্ত রেফ্রিজারেটর, সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনিং, অতিরিক্ত স্টোরেজ স্পেস, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ার—ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। এঁদের কাজকর্মের সুবিধের জন্যে বিল্ডিং-এর নীচে বিজনেস্ সেন্টার খোলা হয়েছে। সেখানে ফ্যাক্স্ মেশিন, কপি মেশিন, কমপিউটার এমনকি খরচ করলে একজন সেক্রেটারিও সাহায্য করবে। এ ধরনের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে একটি টু বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া মাসে ২০০০ ডলার। দু'টি শোবার ঘর ছাড়াও হলের মতো প্রশস্ত বসবার ও খাবার জায়গা। দু'টি বাথরুম। রান্নাঘর ও ছোট্ট ব্যালকনি। তবে এই ফ্ল্যাট নিউ ইয়র্ক শহরে হলে আরও পাঁচশো-সাতশো ডলার বেশি হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে মাসে মাসে এত ডলার ভাড়া দিয়ে এঁরা অ্যাপার্টমেন্টে থাকছেন কেন? নিজের বাড়ি থাকলে বছরের শেষে ট্যাক্স থেকে কিছু সাশ্রয় হত। ভাড়াটে হিসেবে তো সে সুযোগও থাকছে না। এঁদের বক্তব্য—বাড়ি কিনেও আপাতত বিশেষ লাভবান হওয়া যাচ্ছে না। এঁদের বাবা-মায়েরা যে দামে বাড়ি কিনতেন, অবসর নেবার সময় তিন গুণ দামে বিক্রি করতেন। দীর্ঘদিন এক বাড়িতে থাকতে পারতেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। রোজগারের ধান্দায় কবে কোথায় চলে যেতে হয়, কোনও স্থিরতা নেই। ঘন ঘন বাড়ি বিক্রি করতে চাওয়া মানে আরও আর্থিক ক্ষতি। আড়াইশো হাজার ডলার দিয়ে একটি

বাড়ি কিনতে গেলে উকিলকে ক্লোজিং কস্ট দিয়ে আর আনুষঙ্গিক খরচ মিলিয়ে প্রায় চার হাজার ডলার খরচ হয়ে যায়। আবার দু-চার বছরের মধ্যে সে বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হলে নিজের পকেট থেকে চলে যাবে আরও ১৫ হাজার ডলার। কারণ বাড়ি বিক্রির এজেন্ট কমিশন নেবে মোট বিক্রির দামের শতকরা ছ' ভাগ। তাহলে ওই পনেরো হাজার আর উকিলের ক্লোজিং কস্টের চার হাজার যোগ করলে এখানেই উনিশ হাজার বেরিয়ে গেল। যদি ইতিমধ্যে বাড়িটার দাম কুড়ি হাজার ডলারও বেড়ে থাকে, তবেই বা কি লাভ থাকছে? সুতরাং যাঁদের একটানা কোনও জায়গায় থাকার সম্ভাবনা না থাকে, তাঁদের পক্ষে দু, তিন বছরের জন্যে অ্যাপার্টমেন্টই ভাল।

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ইনভেস্ট করে এক সময় ভারতীয়রা বেশ লাভ করছিলেন। ভার্জিনিয়া থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে গুজরাতিদের মোটেলের ব্যবসা বহুদিন ধরেই চলে আসছে। টেকসাস স্টেটে কিছু বাঙালি অনেক বিষয়-সম্পত্তি বাড়িয়েছিলেন। ওই অঞ্চলে বাড়ির দাম সস্তা। ডাউন পেমেন্টের মতো ডলার জমলেই ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তিনটে, চারটে করে বাড়ি কিনেছেন। তারপর ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়ার পেমেন্ট থেকেই ধার শোধ হচ্ছিল। কিন্তু অয়েল ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে এবারের রিসেশনেরও আগে ('৮৩/'৮৪ সালে রেগনের আমলে) ওদিকের চাকরি বাকরির অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে উঠল। একসঙ্গে দু'টি তিনটি বাড়ির মর্টগেজ দেওয়া সোজা নয়। না বাড়িওলার চাকরি থাকছে, না ভাড়াটের। কাজের সন্ধানে টেকসাস ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে। বাড়ি বিক্রি হয় না। ভাড়া হয় না। সুযোগ বুঝে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলো ভাড়া কমিয়ে দিচ্ছে। নতুন ভাড়াটেকে প্রথম দু' মাস ফ্রি থাকার সুযোগ দিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বাঙালির সম্পত্তি প্রায় বোঝা হয়ে দাঁড়াল। ব্যাংকের ফোর ক্লোজারে বাড়ি চলে যাওয়ার পর অনেকেরই বহু পরিশ্রমের উপার্জন নষ্ট হয়ে গেল। অথচ সময় বুঝে, জায়গা বুঝে, বাড়ি কেনা, বেচা আর অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবসা করে নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়াতে বহু ভারতীয় প্রচুর লাভ করেছেন।

এদেশের বাঙালিরা অবসর নেবার মুখে নতুন করে আবার অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা হবেন কিনা বলা শক্ত। বড় বড় বাড়ি কেনার ঝোঁক এখনও থিতিয়ে যায়নি। পেল্লায় বাড়ি কেনার জন্যে অফিস থেকে ৭০-৮০ মাইল দূরে ভুট্টা খেতের মধ্যে গিয়েও প্রাসাদ বানাতে রাজি। তাঁরা একখানি ছোট খেত পছন্দ করেন। নাগরিক হবার জন্যে বড় শহরে ঘর ভাড়া করতে যাবেন না। নিউ ইয়র্কের কার্নেগি হলে গিয়ে জুবিন মেহতা কি রবিশংকরের প্রোগ্রাম শোনার বদলে নিঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিদের কাকলি শুনে রিল্যাক্স করবেন।

তবে সম্প্রতি বাঙালি বাড়িওলাদের তিন ধরনের পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। একদল বলছেন—বড় বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে একই শহরে বা কাছাকাছি এলাকায় ছোট টাউন হাউস বা কনডোমিনিয়াম কিনবেন। অনেকে কিনেছেনও। সেখানে এজেন্সির হাতে মেইনটেনেন্সের ভার।

আর একদল অপেক্ষা করছেন ছেলে মেয়েরা শেষ পর্যন্ত কোন স্টেটে গিয়ে স্থিতু হয় দেখার জন্যে। তখন তাদের কাছাকাছি কোথাও অ্যাপার্টমেন্ট কিনে থাকবেন।

আর একদল কলকাতায় কিংবা শান্তিনিকেতনে ঘরদোর তুলছেন। ভাবছেন অবসর

জীবন সেখানে কাটাবেন। কিন্তু বেশির ভাগ প্রৌঢ় বাঙালি দম্পতি (যাঁদের বয়স ষাটের ওপর পৌঁছেছে) এখনও পুরনো বাড়িতেই আছেন। কে যে শেষ পর্যন্ত কোথায় থাকবেন, সে এক রহস্য। চেনা জায়গা ছেড়ে যাওয়া সহজ নয়। ছেলেমেয়েরাও খুব জোর দিয়ে বলছে না যে—বাড়িটি বিক্রি করে দাও। কারণ এই চলমান সমাজে তারা নিজেরাই কে কোথায় ঘুরে বেড়াবে তার স্থিরতা নেই। এ অবস্থায় বাবা-মা তাঁদের নিজেদের চেনা জানা এলাকাতেই থাকুন, অন্তত যতদিন না অথর্ব হয়ে পড়েন। তারপর নাকি তারাই দেখভাল করবে আর তখন বুড়ো বুড়িকে ঘরদোর বেচতেই হবে। এতরকম চিন্তাভাবনার পরেও কিন্তু বাঙালি এখনও নিশ্চিত নয়, যে শেষ জীবনে সে পৃথিবীর কোন গোলার্ধে থাকবে। সেটা ঠিক করতে পারলেই যে কোনও হেমিসফেয়ারে যে কোনও বাড়িতে লটবহর নিয়ে ঢুকে পড়বে। গোলার্ধ নিয়ে গোলমাল মিটে গেলেই মাল নিয়ে রেডি। একটা চালচুলো ঠিক জুটে যাবে।

২৬ জুন ১৯৯৩

উকিলের খাতির

আমেরিকায় ডাক্তারদের মতো উকিলরাও বড় বড় স্পেশ্যালিস্ট। আইনের বটগাছের মগডালে বসে থাকেন জজসাহেব। আর শাখায় শাখায় বিশেষজ্ঞ উকিলের দল। যেমন মামলা, তেমন উকিল। কেউ 'করপোরেট ল' পড়ে মহাপণ্ডিত। বড় বড় কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় তাঁর পেশাদারি জীবন উৎসর্গীকৃত। কেউ দুর্ঘটনা বিশারদ। জনগণের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করাই তাঁর সদাব্রত। কেউ বিবাহ সংক্রান্ত তাবৎ আইন-কানুন গুলে খেয়েছেন। বিয়ে ভাঙার স্পেশ্যালিস্ট। তাঁকে দিয়ে কিন্তু বাড়ি ভাঙার মামলা হবে না। ভাঙনের স্পেশ্যালিস্টদের মধ্যেও প্রশাখা আছে।

অজ্ঞ লোকের পক্ষে আইনজ্ঞ হওয়া অসম্ভব। কতবার কত পরীক্ষার বৈতরণী সাঁতরে পার হওয়া। ভাল ল'কলেজে ভর্তি হতে পারা, পাশ করে বেরোনো, ল ফার্মে চাকরি পাওয়া এবং 'বার' পরীক্ষায় উৎরে যাওয়া—যাকে বলে কয়েক বছর ধরে 'চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা'। কোর্টে যুদ্ধ করার সময় প্যাটন ট্যাঙ্কের মতোই কামান দাগতে হয় তো। একদিকে দল, তো অন্য দিকে মাদল।

বাড়ির ডাক্তারের মতোই এদেশের ঘরে ঘরে ফ্যামিলি ল'ইয়ারের খাতির। একটু জমি বাড়ি করতে গেলেও উকিল দরকার। তার সঙ্গে উইল করার ব্যাপারটিও এসে যায়। এদেশের মানুষ উইল করার জন্যে বার্ধক্যের অপেক্ষায় থাকে না। স্থাবর, অস্থাবর যেটুকুই থাক, কম বয়সেই উকিল ডেকে উইল করে রাখে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক যোগ, বিয়োগও সঙ্গে চলতে থাকে। এ সব কারণেই পারিবারিক উকিল দরকার। অন্যান্য সমস্যা হলেও তিনিই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাহায্য করেন।

আমাদের পারিবারিক উকিলের নাম জর্জ ফস্টার। দাড়িওলা, জবরদস্ত ইহুদি উকিল। গত সতেরো বছরে বৈষয়িক কারণে কালেভদ্রে তাঁর কাছে গিয়েছি। প্রথমবার তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলাম ওই উইলের জন্যেই। '৭৫ সালের জুলাই মাসে ইউরোপ বেড়াতে গিয়েছিলাম। মেয়ে তখন খুব ছোট। তাকে এক আত্মীয়র বাড়িতে রেখে বেড়াতে যাচ্ছি শুনে পরিচিত আমেরিকানরা বলল—'তোমাদের উইল আছে তো?' আমরা উইল টুইল করার কথা চিন্তাও করিনি। বুড়ো-বুড়িদের কাজ আগে থাকতে করব কেন? কিন্তু সাহেবরা খুব ভয় দেখাল। অ্যাটলান্টিক পার হয়ে যাওয়া। ইংলিশ চ্যানেল, নর্থ সি, আরও কত পারাপার বাকি আছে। প্লেন ভেঙে খসে পড়তে পারি। আরতি সাহা তো নই, যে দুরন্ত ইংলিশ চ্যানেলে ভরাডুবি হলে সাঁতরে বেঁচে যাব। ক্ষণস্থায়ী জীবন! ইওরোপ যাত্রাই যে অগস্ত্য যাত্রা হবে না, কে বলতে পারে? আর সত্যি যদি তা হয়, মেয়েটা রাতারাতি অনাথ হয়ে যাবে। তখন আমেরিকার সরকারমশাই তার সব দায়িত্ব নিয়ে নেবে। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তার যাবতীয় দেখ্ভালের বন্দোবস্ত থাকবে মার্কিন সরকারের হাতে। আমাদের রেখে যাওয়া সামান্য যা খুদ কুঁড়ো, সেও কেউ ছুঁতে পারবে না। মহা মুশকিল। আমরা না থাকলে মেয়েটা সরাসরি মার্কিনি হেফাজতে চলে যাবে? দেশে তার ঠাকুমা, দিদিমা, দাদু, জ্যাঠা, মামা, খুড়ো সব বিদ্যমান থাকতে রাতারাতি অনাথিনী বালিকা? হ্যাঁ, একমাত্র উপায় হচ্ছে উইল করে যাওয়া। আমরা যা লিখে যাব, সরকারকে তাই শুনতে হবে। তো সেই কারণেই সতেরো বছর আগে আমরা জর্জ ফস্টারের খোঁজ পেয়েছিলাম।

উকিলের উপার্জনের কথা যদি বলেন, সেও ডাক্তারদের ছাপিয়ে যেতে পারে। নির্ভর করছে কোন উকিলের পশার কেমন, তার ওপর। আমাদের চেনা একটি পাঞ্জাবি মেয়ে বিনীতার বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। ওয়াশিংটনের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য আইন পাশ করেছে। নিউ ইয়র্কের একটি লিগ্যাল ফার্মে চাকরি করছে। মাইনে বছরে আশি হাজার ডলার। বহু ইঞ্জিনিয়ার ওই মাইনে পেতে চাকরি জীবনের অর্ধেক পেরিয়ে যাবে। এরপর বিনীতার বার একজ্যাম পাস করার কথা। তারপর উপার্জনের পথ ক্রমশ প্রশস্ত হবার সম্ভাবনা। একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবীর ঘণ্টাপিছু পারিশ্রমিক অন্ততপক্ষে একশো ডলার। তবে যে কোনও পেশায় সকলের উপার্জন তো সমান নয়। পরিশ্রম করার ক্ষমতার ওপরেই অধিকাংশ ব্যবসা দাঁড়িয়ে যায়।

আমেরিকায় উকিলদের এমন পশার সত্ত্বেও সম্প্রতি কিছু দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। বিয়ে ভাঙার উকিলরা ভারী দুঃখ পেয়েছেন। তাঁদের ভাঙনের ব্যবসা মন্দাক্রান্ত। নারীরা নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলে যা হয়, তাই ঘটেছে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের চিফ জাজ জুডিথ কে নতুন আইন জারি করেছেন যে—ডিভোর্স ল-ইয়াররা কোনওভাবে তাঁদের মক্কেলদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে পারবেন না। জুডিথ কে এ বছরের শুরুতে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল হবার জন্যেও বিবেচিত হয়েছিলেন। সেই হিসেবে তাঁর একটি জাতীয় পরিচিতি আছে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের প্রধান বিচারক থাকাকালীন তিনি এই নতুন নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করেছিলেন। ১ নভেম্বর থেকে এটি কার্যকর হবে। ডিভোর্স ল-ইয়ারদের জানানো হয়েছে যে তাঁদের এখন থেকে নতুন বিষয় অনুযায়ী চলতে হবে।

প্রথমত বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার দরুন উকিল ঠিক কী পরিমাণ পারিশ্রমিক নেবেন, তা প্রথমেই লিখে জানাতে হবে। আনুষঙ্গিক যত কিছু খরচ করবেন, রসিদ সমেত তার প্রতিটি কপি ক্লায়েন্টকে দিতে হবে। প্রতি দু'মাস অন্তর কোন খাতে কী খরচ করেছেন, রসিদসহ তার লিখিত হিসেবে জমা দিতে হবে। কোনও কারণেই 'রিটেনার্স ফি' অর্থাৎ আগাম জমা নেওয়া অর্থ, ফেরত দেওয়া হবে না বলে লিখিয়ে নেওয়া চলবে না। মামলার নিষ্পত্তি যাই-ই হোক, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া যায়নি বলে ক্লায়েন্টের সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। বাকি পারিশ্রমিক আদায়ের জন্য তাকে বসতবাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য করা চলবে না। ক্লায়েন্টের বাড়ির মর্টগেজের ওপর লিয়েন রাখা যেতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রেও আগে ডিভোর্সি দুই পক্ষ আর জর্জের কাছ থেকে লিখিত সম্মতি নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া মহিলাদের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উকিল যদি তাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িত হন, তবে তার জন্যেও অভিযুক্ত হবেন। উকিলের আইন ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। 'বার' অ্যাসোসিয়েশন থেকে নাম কাটা যাবে। দেনা পাওনা নিয়ে উকিল আর মক্কেলের মধ্যে যে মতান্তর হবে, তার সমাধান করবে আরবিট্রেশন গ্রুপ।

এ বছরের শুরু থেকেই একটি স্টাডি কমিটি এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে কাজ করেছে। স্টাডি কমিটি থেকে প্রস্তাবিত নিয়মকানুন গুলি বিবেচনা করা ছাড়াও জাজ জুডিথ কে আরও একটি কমিটি তৈরি করেছিলেন। তাদের কাজ ছিল—পরিবর্তিত নিয়মনীতিগুলি অন্যান্য মামলার উকিলদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায় কিনা, পরীক্ষা করে দেখা। আমেরিকার অনেকগুলি স্টেটেই ডিভোর্স মামলায় কীভাবে ক্লায়েন্টকে কোর্ট থেকে আইনের সাহায্যে আরও কিছু সুযোগ সুবিধে দেওয়া যায়—তার যথাসাধ্য চেষ্টা চলছে। তবে নিউ ইয়র্ক স্টেটে সদ্য সদ্য যা হল, এমন সংশোধিত নিয়মকানুন অন্য কোনও স্টেটেই জারি করা হয়নি। জুডিথ কে-র বক্তব্য—প্রত্যেক স্টেটের ডিভোর্স মামলার নিয়মগুলি পর্যালোচনা করে 'স্টাডি কমিটি' বেছে বেছে এমন কিছু নীতি নিয়েছেন, যেখানে উকিলের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ খুবই কম। উকিলরা হচ্ছেন আদালতের উচ্চপদস্থ কর্মী। সুতরাং তাঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার দায়িত্ব আছে। নিজেরা সচেতন না হলে, জজসাহেব আর কোর্টের অ্যাডমিনসট্রেটিভ বোর্ডকে কড়া হতে হবে। বোর্ডে আছেন নিউ ইয়র্ক স্টেটের চারটি অ্যাপেলেট্ ডিভিসনের প্রিসাইডিং জজের দল। সারা স্টেটে যত উকিল আছেন, তাঁদের স্বভাব চরিত্র নিয়ে দু'কথা বলার এক্তিয়ার এঁদের দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে কে কী করছেন, কোর্ট সেখানে খবরদারি না করলেও, পেশাগত ক্ষেত্রে উকিলের অসৎ আচরণ অথবা পেশার সুযোগ নিয়ে নীতি বহির্ভূত কাজকর্ম করছেন কিনা—বোর্ড তার বিচার করবে। দরকার পড়লে উকিলদের কড়কে দেবে। জুডিথ কে নিজে তো প্রধান বিচারক, ক্ষমতার শীর্ষে বসে আছেন। সঙ্গে নিয়েছেন অ্যাডমিনসট্রেটিভ বোর্ডের একদল জজসাহেব। উকিলদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার জন্যেই এত চেষ্টা। কারণ, আমেরিকার সাধারণ মানুষ সুযোগ পেলেই উকিলকে গালাগালি দেয়। জজের নিন্দে করে। 'মামলার ফল' নিয়ে সর্বদাই যেন দুঃখিত। এমনটা হবে কেন? বিশেষ করে, বিয়ে ভাঙার উকিলদের এত বদনাম রটছে যখন, গলদ কিছু আছেই। তাঁদের ক্লায়েন্টরা যখন সংসার ভেঙে যাচ্ছে বলে নানা অশান্তিতে থাকেন, তাঁরা তখন নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত। পরের বউ

টানতে অস্থির! এসব বন্ধ করতেই মহিলা জজ এত কড়াকড়ি করে দিলেন। ঘর ভাঙার ওকালতি করতে গিয়ে মাথায় কাঁঠাল ভাঙা চলবে না। উকিলের বক্তৃতা থেকে গদগদ প্রণয় উচ্ছ্বাস—কভি নহি! ধরা পড়লে সোজা বটতলা পার করে দেওয়া হবে।

'অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য বার অফ দ্য সিটি অফ নিউইয়র্কে'র সাংবাদিক সম্মেলনে বসে জুডিথ কে যখন এই কথা জানালেন, বহু উকিল সেখানে বসেছিলেন। অনেকেই জোর হাততলি দিয়েছেন। তবে ভাল মন্দ সমালোচনাও হয়েছে। কেউ বলেছেন—বিয়ে ভাঙার মামলায় বাদী, বিবাদীর অধিকার, সুযোগ, সুবিধে, অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হল ঠিকই। এর প্রয়োজনও ছিল। তবে নতুন নিয়ম কেন শুধুমাত্র 'ম্যাট্রিমনিয়াল ল ইয়ার'দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে? এতে করে লোকের মনে ধারণা হতে পারে এঁরা বিশ্বাসযোগ্য উকিল নন। ডিভোর্স ল'ইয়ার মানেই অর্থলোভী, সুযোগ সন্ধানী লোক। অথচ সকলেই তো তা নন। বহু সৎ উকিল আছেন। আবার ওকালতির অন্যান্য শাখাতেও অর্থলোভী উকিল থাকতে পারেন।

কথাটি খুবই যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে ভাঙার উকিলকে যদি রসিদ সহ খরচের হিসেব দেখাতে হয়, তবে ইনকাম ট্যাক্সের উকিলকেও রসিদ দেখাতে হবে। তাছাড়া 'ম্যাট্রিমনিয়াল লইয়ার' মানেই তো অসাধু লোক নয়। নিউ ইয়র্ক স্টেটে মোট তিন থেকে চার হাজার জন বিয়ে ভাঙার উকিল আছেন। বছরে প্রায় ৬৫ হাজার ডিভোর্সের মামলা নথিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। তাহলে কতজন আর 'দুশ্চরিত্র' হবার সুযোগ পাচ্ছেন? চার হাজার উকিলের পক্ষে ৬৫ হাজারের ঘাড় ভাঙাও অসম্ভব। সুতরাং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যে বাদবাকি উকিলদের সন্দেহজনক ব্যক্তির তালিকায় ফেলে দেওয়া হল কিনা? এ জন্যেই তাঁরা ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু একেবারে অকারণ একটি বিশেষ দলকে চিহ্নিত করা হয়নি। ডিভোর্স ক্লায়েন্টদের সঙ্গে উকিল এমনকি জজেদের ব্যবহার প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ শোনা গেছে। সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে—অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের চাহিদা মেটানো। আমেরিকায় সবচেয়ে পসার হচ্ছে 'আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ম্যাট্রিমনিয়াল লইয়ার্স'দের। ঘণ্টায় একশো ডলার তো বটেই। এছাড়া নানা ধরনের চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে থাকে। 'রিটেনার ফি' বাবদ অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে বসে থাকা। আনুষঙ্গিক খরচের বহর দেখিয়ে মিথ্যে মিথ্যে বিল করা। মামলা যে কোন অবস্থায় পৌঁছেছে, সে সম্বন্ধে সহজে কোনও খবর না দেওয়া, ফি দেওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে, বাড়ি বিক্রির জন্যে চাপ দেওয়া—এ সবই ঘটে। ক্লায়েন্টের সঙ্গে মামলা চলাকালীন ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নেওয়ার অভিযোগও শোনা যায়। দীর্ঘদিন ধরে মামলা ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা তো থাকেই। দুটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে—ম্যাট্রিমনিয়াল ল'ইয়ারদের বিরুদ্ধে ক্লায়েন্টদের অভিযোগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। নিউ ইয়র্ক শহরের 'কনজিউমারস্ অ্যাপেয়ার্স কমিশনার' স্বতন্ত্রভাবে খোঁজ খবর নিয়ে জানিয়েছেন—বিয়ে ভাঙার উকিলরা মহিলাদের সঙ্গে ভীষণ অসদ্ব্যবহার করেন। প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের স্বার্থরক্ষার চেয়ে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অল্প শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে নানাভাবে কার্যসিদ্ধি করেন। নিউ ইয়র্ক স্টেটের অন্য এক জজ লিও মিলোনাসকে ওই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে একটি কমিশন গঠন করতে নির্দেশ দেওয়া হলে তিনি সেই কমিশনে জুডিথকেও

নিয়েছিলেন। এ সব মার্চ মাসের আগের ঘটনা। সে সময় ওই কমিশনে সরাসরি যুক্ত থেকে মহিলা বুঝেছিলেন—সাধারণ লোকজন কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। ক্রমাগত চিঠি আসত। প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে টেলিফোন। ডিভোর্সের মামলায় জড়িয়ে কত মহিলা এবং পুরুষমানুষও যে কীভাবে উকিলের হাতে নাজেহাল হচ্ছেন, তার খবর পেতেন। এই জন্যেই বিয়ে ভাঙার উকিলদের শায়েস্তা করতে তিনি আইন কানুন বদলে ছেড়েছেন।

এখন থেকে কোনও অজানা খরচের রহস্য বজায় রাখা চলবে না। 'রিটেইনার মানি' কী কারণে উকিল জমা রাখতে চাইছেন, কবে ফেরত দেবেন—সব খোলসা করে লিখতে হবে। হাতিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। কারণ 'নন রিফান্ডেবল' বলে কিছু থাকছে না। মামলা চলাকালীন কিংবা শেষের দিকে যদি ক্লায়েন্ট আর উকিলের মধ্যে ফি দেওয়া নিয়ে ঝগড়া লেগে যায়, তবে বাধ্য হয়ে ক্লায়েন্টকে কোর্টে যেতেও হবে না। এতদিন তা-ই যেতে হত আর ক্লায়েন্টের ওপর তখন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। একগাদা বাড়তি খরচ। এখন সেরকম অবস্থা হলে তিনি আরবিট্রেশন প্যানেলের সাহায্য চাইবেন। স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে এই প্যানেল তৈরি করা হয় বটে। কিন্তু আইনজীবী যত জনই থাকুন, তার চেয়েও বেশি সংখ্যক অন্যান্য পেশার মানুষ থাকেন। অর্থাৎ একটি নিরপেক্ষ দলকে সিদ্ধান্ত নিতে ডাকা হয়।

এরপর আরও ব্যাপার আছে। এখন থেকেই বিয়ে ভাঙার উকিলদের ট্রেনিং দেওয়া শুরু হচ্ছে। একেবারে কালিদাসের ট্রেনিং! প্রত্যেক ম্যাট্রিমনিয়াল ল ইয়ার হাতে মামলা নেওয়ার সময় ক্লায়েন্টকে জানাতে বাধ্য হবেন যে—কী ভাবে উলটে ক্লায়েন্ট তাঁর নামে কোর্টে নালিশ করবে। অর্থাৎ যদি কোনও কারণে ক্লায়েন্টের মনে হয় যে উকিল তার স্বার্থ দেখছে না বা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে, তখন সে কীভাবে লিখিত অভিযোগ পাঠাবে, সেও উকিলকেই আগে ভাগে শিখিয়ে দিতে হবে। একেবারে কবচ কুণ্ডল দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। সেই চিঠি যাবে কোর্টের 'গ্রিভান্স কমিটি'র দপ্তরে। সেই কমিটি চালায় স্টেটের অ্যাপেলেট কোর্টস। তখন শুরু হবে জোর তদন্ত। যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে শাস্তির ব্যবস্থাও হবে। জরিমানা দিলেই যথেষ্ট, নাকি বটতলা ছেড়ে যেতে হবে—সে সব নির্ভর করবে ইউ এস লেজিসলেচার কী বিধান দেয়, তার ওপর।

জজেরাও কিছু শিক্ষা পেয়েছেন। প্রধান বিচারক সোজাসুজি বলে দিয়েছেন—বিয়ে ভাঙার মামলা দিয়ে জজসাহেবের গা এলানো ভাব একদম চলবে না। এ বিষয়ে ঝটপট এগোতে হবে। যেদিনই তাঁকে একটি মামলার বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হবে, ঠিক তার একমাসের ভেতরে তাঁকে প্রাথমিক আলোচনার দিন স্থির করতে হবে। সেখানে বাদী, বিবাদীও থাকতে পারবে। আর এই যে এক বছর ধরে ট্রায়ালের আগের কাজকর্ম ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলতে থাকে, সে সব বন্ধ করতে হবে। ঠিক ছ'মাসের মধ্যে সব অনুসন্ধান শেষ করে ট্রায়াল ডাকতে হবে। এই সেপ্টেম্বর মাস থেকেই জজদেরও ট্রেনিং নিতে হবে। কীভাবে 'ম্যাট্রিমনিয়াল' মামলার সংশোধিত নিয়ম কানুনগুলিকে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্যে জুডিশিয়াল ট্রেনিং।

কয়েকজন মহিলার জন্যেই এত কাজ হল। বছর দুই আগে এঁরা নিজেদের ডিভোর্স

নিয়ে এমন উত্যক্ত হয়েছেন যে দল বেঁধে নিউ ইয়র্ক সিটির 'কনজিউমারস অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট'-এ উকিলদের নামে নালিশ করে এসেছেন। নালিশে কী না হয়? বিভিন্ন মহিলা সংস্থার প্রতিনিধিরা বলা বাহুল্য সন্তুষ্ট হয়েছেন। তবে তাঁরা চাইছেন জজ সাহেবদেরও একটু সমঝে দেওয়া হোক। কারণ বরাবরই দেখা গেছে, কিছু কিছু জজ বেশ নারীবিদ্বেষী টাইপের হন। বিচারের সময় সেই বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। উকিলরা স্বভাব বদলালে কী হবে। জজকেও উদার হতে হবে। নারীর অধিকারকে দাবিয়ে রাখা চলবে না। 'ম্যাট্রিমনিয়াল' মামলায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাস্টডি ফাইটের সময় জজই তো চূড়ান্ত রায় দেন। তা জজদের জন্যে কেন নতুন কিছু নিয়ম তৈরি করা হল না? সমদৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কি নিরপেক্ষ বিচার হয়? জুডিথ কে আশ্বাস দিয়েছেন—জজদেরও ট্রেনিং সেশন শুরু হয়েছে। জেনডার ইস্যু নিয়ে তাঁরা যেন খুব সচেতন থাকেন, নারীর সাংবিধানিক অধিকার টধিকারের কথা মনে রাখেন, তার ওপর জোর দেওয়া হবে।

নিউ ইয়র্কে তো এত কিছু হল। অন্যান্য স্টেটের কী নিয়ম? নিউজার্সিতে আরবিট্রেশনের গুরুত্ব খুবই বেশি। উকিলের সঙ্গে মক্কেলের দেনা-পাওনা নিয়ে ঝগড়া লাগলে মক্কেলকে আর কোর্টে গিয়ে ফয়সালা করতে হয় না। আরবিট্রেশন কমিটির কাছে গেলেই কাজ হয়। সে কমিটিতে উকিলের চেয়েও বেশি সংখ্যক অন্য পেশার লোক থাকেন। মোটামুটি নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাউথ ক্যারোলাইনা আর ইলিনয় স্টেটে উকিলরা কোনও কারণেই মক্কেলের ফাইল আটকে রাখতে পারেন না। নেহাৎ চোর, জোচ্চোর মক্কেল হলে আলাদা কথা। হয়তো উলটে উকিলকেই শাসাচ্ছে। কিন্তু বাদ বাকিদের ক্ষেত্রে সময় মতো কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতেই হবে। এমনকি মামলা চলার সময় কিংবা নিষ্পত্তির পরে যদি মক্কেল ফি দিতে অসমর্থ হয়, তখনও ফাইল ধরে রাখা চলবে না। নিউ ইয়র্কে উকিলের রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে যাবার একমাসের মধ্যে মক্কেলকে ফাইল ফেরত দিতে হবে। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে কড়া হুকুম জারি করা আছে—উকিলে মক্কেলে ঢলাঢলি করলেই হাতে দড়ি।

প্রধান বিচারক জুডিথ কে-র নতুন নিয়ম জারি করা নিয়ে বিয়ে ভাঙার উকিলরা অনেকেই ভেঙে পড়েছেন। কেউ বলছেন—আমাদের আলাদা করে দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমরা সকলেই তো খারাপ লোক নই। মক্কেলের বাড়ি ঘরদোর বিক্রি করতে বলি কেন? মামলা যে হাতে নেব, কিসের আশায়? দেখছি ডিভোর্স করতে চাইছে, অথচ মহিলার হাতে পয়সা কড়ি কিছুই নেই। তাকে তো মুক্ত করা দরকার? কেস চালানোর খরচ নেই? তখন বাধ্য হয়ে তাদের বাড়িটির ওপর লিয়েন রাখতে হয়। যাতে খরচ ফেরত পেয়ে যাই। এখন যা কড়া নিয়ম করা হল, তাতে ঝগড়াটে দুই বর-বউয়ের অনুমতি নিতে হবে, জজসাহেবের সম্মতি আদায় করতে হবে। তবে নাকি মর্টগেজের ওপর লিয়েন রাখা যেতে পারে। বাড়ি তো বিক্রি নাকি করাতেই পারব না। তাহলে আমাদের ফি-টা দেবে কে? বিয়ে ভাঙতে গিয়ে খালি জনসেবা করে যাব? আমাদের আর্থিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে দেবে?

আরবিট্রেশন প্যানেল নিয়েও এঁরা আপত্তি করছেন। ওই প্যানেলে তো উকিলের চেয়ে বেশি অন্য পেশার লোক থাকবে। তবে আর কে উকিলের স্বার্থরক্ষা করবে? নিরপেক্ষ

বিচার মোটেই হবে না। দয়ালু ভাব দেখিয়ে সমানে নালিশ করা পার্টিকে সাহায্য করা হবে। আর উকিলকে বলা হবে—সস্তায় মামলা করে দাও। উকিলের বাড়া ভাতে ছাই দিতে এইসব আরবিট্রেশন প্যানেলের ব্যবস্থা হয়েছে।

উকিল আর মক্কেলে একটু মাখামাখি হলেই বা অত দাবড়ানি দেওয়ার কী আছে? প্রাপ্ত-বয়স্ক দু'জন মানুষ যদি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ই, তাতে কোর্টের কি? জজের কি? আমেরিকায় আদালত কি উকিলের প্রেম ভালবাসাও কন্ট্রোল করবে? কেন?

মহিলা উকিলরাও নানা সমালোচনা করছেন। 'আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশনস ফ্যামিলি ল সেকশন'এর সদ্য নির্বাচিত চেয়ারপার্সন লিন গোল্ড-বাইকেন বলেছেন—একটি বিশেষ পেশাকে কীভাবে হেয় করা হল। উকিলের আইনগত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মক্কেলকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়াতে এবারে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। উকিল ফাইল ধরে রাখতে পারবে না, ফি পাওয়ার নিশ্চয়তার জন্যে মক্কেলের বিষয় সম্পত্তির ওপরে ভরসা করতে পারবে না, তবে কী ভাবে মামলা লড়বে? এমন অনেক ডিভোর্স ল ইয়ার আছেন, যাঁরা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে প্রথমে কোনও ফি পান না। মামলা চালাতে হয় নিজের খরচে। কথা থাকে, নিষ্পত্তি হবার পরে ক্লায়েন্ট টাকা পয়সা মিটিয়ে দেবেন। কতবার এমন হয় যে, সে পাওনা আর মেটানোই হয় না। পেনসিলভানিয়ার যে ল'ফার্মে লিন দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, সেখানে প্রতি বছর অন্তত ২০% পারিশ্রমিক বাকি থেকে যায়। কখনওই উদ্ধার করা যায় না। এবার থেকে যা হবে, যে সব মহিলার অর্থের সংস্থান নেই, কোনও উকিল তাঁদের মামলা নিতে চাইবেন না। আবার সেই বড়লোক ক্লায়েন্টদেরই শুধু মামলায় লড়া এবং জেতার পথ প্রশস্ত থাকবে। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় স্বামী বড় উকিল লাগিয়ে, কাচ্ছা-বাচ্চা সমেত যাবতীয় সুবিধে আদায় করে নেবেন।

উকিল ছাড়া কি মামলা লড়া যায় না? অবশ্যই যায়। তবে এবারের চিঠিতে সে প্রসঙ্গ আনছি না। পরে কখনও লিখব। এবার উকিলের অবদানের উদাহরণ দিয়েই লেখা শেষ করছি। আমরা যখন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে প্রথম বাড়ি কিনে গৃহপ্রবেশের তোড়জোড় করছিলাম, সেই সময়কার ঘটনা। বাড়িটা ছিল এক ইটালিয়ান মহিলার। কন্ট্র্যাক্ট সই করে আগাম পাওনা মিটিয়েছি। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দেবার নোটিশ দিয়েছি। তারা নতুন ভাড়াটে ঠিক করে বসে আছে। হঠাৎ মহিলা বেঁকে বসলেন। তাঁর নাকি মন প্রস্তুত নয়। ঠিক কোন মাসে যে বাড়ি ছাড়বেন ভাবতেই পারছেন না। আমরা সেবারে রিয়েল এস্টেট এজেন্টের মাধ্যমে বাড়ি কিনিনি। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সরাসরি মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করেছিলাম। ফলে মহা মুশকিলে পড়লাম। একমাসের মধ্যে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিতে হবে। বাড়ির জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া হয়ে গেছে। ডাউন পেমেন্টের জন্যে যা নিজস্ব সঞ্চয়, সে সব তুলে আনার ব্যবস্থা হয়েছে, আর মহিলা বলেন কি না বাড়ি এখন ছাড়বেন না! আমরা আবার জর্জ ফস্টারকে ধরলাম। এমনিতেও তাঁর মাধ্যমেই সব কথাবার্তা এগোচ্ছিল। উকিল ছাড়া তো এসব কাজ হয় না। তিনি সব শুনে বললেন—মুভার ডেকে প্যাকিং আর বাড়ি বদলের দিন ঠিক করা হয়েছে। এর নড়চড় হবে না। তোমরা ওই তারিখেই বাড়িতেই ঢুকবে। তারপর তিনি মহিলাকে মস্ত চিঠি দিয়েছিলেন। বক্তব্য ছিল—'যতদিন তুমি মনস্থির করতে না পারো আমার ক্লায়েন্টরা

মোটেলে থাকবে। স্টোরেজ ভাড়া করে ফার্নিচার আর জিনিসপত্র রাখবে। মোটেলে রান্নার অসুবিধা হয় বলে রেস্টোরেন্টে খাবে। সব খরচ তোমার। কারণ তুমি ওই তারিখে বাড়ি দেবে বলে কন্ট্র্যাক্ট সই করেছিলে। তোমাকে ওদের জন্যে একবার ট্রাক ভাড়া আর মুভিং এর খরচও দিতে হবে। কারণ ওরা প্রথম বার দিচ্ছে। ওদের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যা বাড়তি খরচ, সেও তোমার জন্যে। তুমি তাও দিতে বাধ্য। আর যদি একান্তই বাড়ি বিক্রি করতে না চাও, তবে তোমার ল ইয়ারের মারফত আমাকে জানাবে। তারপর চুক্তিভঙ্গ করে আমার ক্লায়েন্টদের ভীষণ সমস্যায় ফেলেছ—এই অভিযোগে আমরা মামলাও করতে পারি। ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছেড়েও দিতে পারি...।'

আমরা কারও ভিটেমাটি উচ্ছেদ করতে চাইনি। কিন্তু উকিল বললেন—এসব ক্ষেত্রে অ্যাকশন নিতেই হয়। তা রি-অ্যাকশনও হল প্রায় রাতারাতি। মহিলা সামান্য গাঁই গুঁই করেই মনস্থির করে ফেললেন। শুধু নতুন আবদার—'গ্যারাজ খালি করতে দেরি হবে।' জর্জ ফস্টারের নতুন চিঠি গেল—'আমার ক্লায়েন্ট গাড়ি রাখার অসুবিধের জন্যে বাড়ির দাম একটু কমিয়ে দিতে চাইছে...'। ব্যস্। মহিলা গ্যারাজের ভূষিমালও চটপট সরিয়ে ফেললেন। আমরা কন্ট্র্যাক্ট অনুযায়ী ঠিক দিনেই বাড়ি পেয়ে গেলাম। মহিলা আমাদের উকিলের ব্যবহারে বিরক্ত হলেও তাঁর কর্মক্ষমতার প্রশংসা করেছিলেন। বাড়ির ক্লোজিং-এর দিন বলেছিলেন—'খুব উকিল ধরেছিলে তোমরা। আমারটা একেবারে অপদার্থ। সময় বুঝে নিজের মেয়ের বিয়ে নিয়ে মেতেছে। যেটাকে কাজ চালাতে দিয়েছে, সেটা আরও অপদার্থ...।

আমাদের মতো অজ্ঞ মানুষদের জন্যেই তো আইনজ্ঞরা আছেন। বিয়ে ভাঙার উকিলরা দক্ষযজ্ঞের বিনাশ করেন, শেষে শান্তির জল দেন, তাঁদের প্রণামী নিয়ে এত কার্পণ্য কি সমর্থন করা যায়?

২ অক্টোবর ১৯৯৩

মহিলা উকিল বনাম পুরুষ মক্কেল

কোর্ট কাছারির কথা একটু বেশি লিখছি কি? ইদানীং এই এক লাইনে বসে যাওয়া রোগ হয়েছে। যখন যে লাইনে লেখার 'জ্বালানি সংগ্রহে যাই, এত কিছু মালমশলা হাতে এসে যায় যে তখন ভাবি, জুরির কথা লিখব আর শুঁড়ির সাক্ষী মাতালের ঘটনাটা চেপে যাব? হাড় বোকা মক্কেল আর ধুরন্ধর উকিলের কথা যদি লিখি, তবে রূপসী উকিলের জন্যে আকুল সেই বেঁটে মক্কেলের খবরটা দেব না? হঠাৎ হঠাৎ কাউন্টি কোর্টে খুচরো কাজ পেয়ে যাই। কতরকম কেস শুনি। ক্যাফেটেরিয়াতেও মামলার গল্প। সেই সব স্টক ক্লিয়ারেন্সের উদ্দেশ্যেই এই সব লেখা। 'কত অজানারে' কে সেলাম ঠুকে শত অজানারে...

তো, সেই রূপসী ফেডারেল প্রসিকিউটারের কথায় আসি। তার নাম লোর্না শফিল্ড।

নিউ ইয়র্কের নামকরা 'লা ফার্ম ডেবিভয়েস আন্ড প্লিমটন'-এর পার্টনার। মামলার কাজের ব্যাপারে এক বেঁটে মক্কেলের সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক নিউ ইয়র্ক শহরের বাইরে থাকেন। ডিনারের শেষে মফস্বলে ফিরবেন বলে ট্যাক্সি ডাকলেন। লোর্না গুডবাই করার আগেই মক্কেলের খপ্পরে। ভদ্রলোক তাঁকে জোর করে ট্যাক্সির মধ্যে টেনে আনতে আনতেই চুম্বন করলেন। হোটেলের ঘরে নাকি তাঁর রিজার্ভেশন আছে। সেখানে তাঁর গার্লফ্রেন্ডের ছবি আছে। সে ছবি লোর্নাকে দেখাতে চান। মক্কেলের আক্কেল দেখে উকিল প্রথমে হতভম্ব হলেও পরমুহূর্তে ঝটকা মেরে নেমে পড়েছেন। ট্যাক্সির দরজা দিয়ে ধাঁই করে তাঁর পা চেপে দিয়েছেন। দরজার বাড়ি খেয়ে মক্কেল বাড়ি পালিয়েছেন।

পরদিন অফিসে গিয়ে লোর্না তাঁদের ফার্মের লিটিগেশন ডিপার্টমেন্টে ঘটনাটা জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হল। টেলিফোনে ওই অসভ্য লোকটিকে জানিয়ে দেওয়া হল যে তাঁর কেস এঁরা নেবেন না। লোর্না শফিল্ড ইচ্ছে করলে সেক্সচুয়্যাল হ্যারাসমেন্টের মামলা করতে পারতেন। সম্ভবত নিজের পসারের কথা চিন্তা করে আর ঝামেলা বাড়াতে চাননি।

আমেরিকায় মহিলা আইনজীবীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন—তাঁদের পুরুষদের সমকক্ষ বলে ধরা হয় না। ছুতোনাতা পেলেই ওপরতলা থেকে শুরু করে সহকর্মী, বিরোধী পক্ষের উকিল এমনকি নিজের মক্কেল পর্যন্ত তাঁদের মহিলা বলে স্বতন্ত্রভাবে দেখেন। যথাযোগ্য মর্যাদা দেন না। অবশ্য যাঁদের এ অভিজ্ঞতা হয়নি, তাঁরা ঠিক সমর্থন করেন না। তবে মহিলা উকিলদের ওপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা, নয়তো তাঁদের সঙ্গে অকারণে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি যে হয় না, তা নয়।

বড় বড় ল ফার্মগুলিতে যে সব মহিলা আইনজীবী পার্টনার নয়তো কর্মী হিসেবে থাকেন, তাঁদের যদি ওই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, তাহলে সব সময় যে সেই মক্কেলকে বিদায় করে দেওয়া হবে, তা কিন্তু নয়। প্রথমত এই পেশায় উন্নতি করতে গেলে, ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের কাজটিকে গুরুত্ব দিতে হয়। সেই হিসেবে ল ফার্মের কোন আইনজীবী কতজন মক্কেলের সঙ্গে কাজ করছেন, কতগুলি মামলার দায়িত্ব নিয়েছেন, তার ওপরেই তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নির্ভর করছে। এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্মী-সহকর্মী, বিরোধীপক্ষের উকিল—এতগুলি লোকের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্ব আছে। সব মিলিয়ে মহিলা আইনজীবীকে ব্যবসায়িক কারণেই সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখার কথা মনে রাখতে হয়। পুরুষ আইনজীবীর ক্ষেত্রেও তাই। তবে যেহেতু লিঙ্গভেদের কারণে তাঁদের সঙ্গে তারতম্যমূলক আচরণ করার সম্ভাবনা কম থাকে, অথবা কোনওভাবে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টাও চলে না, সেহেতু পুরুষ আইনজীবীদের ঠিক ওই জাতীয় সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় না। দ্বিতীয়ত—বড় বড় ল ফার্ম সাধারণত নামী দামি মক্কেলদের ছাড়তে রাজি হয় না। দীর্ঘদিনের ক্লায়েন্টকে হারাতে চায় না। ফলে যদি তাঁদের কেউ মহিলা উকিলের সঙ্গে আপত্তিজনক ব্যবহারও করেন, অনেক সময় ঘটনাটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলে। ল ফার্মের অন্যান্য মালিক মনে করেন, একজন উকিলের নালিশ শুনেই এতদিনের মক্কেলদের হাতছাড়া করা যায় না। আর এখনও পর্যন্ত আইন ব্যবসায়ে সেই একই ধারা বজায় রয়েছে। মামলার আগে মক্কেলই উকিল বেছে নেবেন। এক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ পার্টনাররা কোনও পরিবর্তন আনতে চান না।

অর্থাৎ যিনি উকিলের মোটা পারিশ্রমিক দেবেন, তাঁর হাতেই বেশি ক্ষমতা। মক্কেল যেমন উকিল চাইবেন, তেমন ভাবেই বেছে নিতে পারবেন। নেহাত কোনও অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা না হলে, ফার্ম নিয়োজিত আইনজীবী, সে তিনি নারী বা পুরুষ যেই হোন, কখনই কোনও মক্কেলকে বাতিল করে দিতে পারেন না। সুতরাং বড় ল ফার্মে দীর্ঘদিনের ক্লায়েন্টরা প্রভাব বিস্তারের যথেষ্টই সুবিধে পান। একজন উকিল তাঁর বিরুদ্ধে কতদূর কী করতে পারবেন?

এমনিতে যে কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো বড় ল ফার্মগুলিতেও কর্মীদের সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্টের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়মনীতি বজায় রাখা হয়। পার্টনার, মেম্বার, কর্মী প্রত্যেকেই সেই বিধি নিষেধের আওতায় পড়েন। অর্থাৎ কোম্পানির সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত কেউই মহিলাদের সঙ্গে আপত্তিজনক ব্যবহার করতে পারবেন না। গত বছর এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। শিকাগোর 'বেকার অ্যান্ড মেকেঞ্জি' ল ফার্মের এক পার্টনারের বিরুদ্ধে তাঁর সেক্রেটারি মামলা করেছিলেন। সেক্সচুয়্যাল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ প্রমাণ করে ওই ফার্ম আর পার্টনারের কাছ থেকে ৭.২ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলেন। কিন্তু সচরাচর ক্লায়েন্টদের বিরুদ্ধে ওই ধরনের মামলা করতে কোনও ল ফার্মই রাজি হতে চায় না।

মহিলা উকিলদের এই সমস্যা এখনও প্রতিবাদযোগ্য ইস্যু বলে গুরুত্ব পায়নি। একে নারী নির্যাতনের আওতায় ফেলা যাচ্ছে না। কারণ, মহিলা আইনজীবীকে সেই অর্থে নির্যাতন সম্ভব নয় বলেই লোকের ধারণা। অতএব কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ, যৌনতার অভিযোগ ইত্যাদি আনতে হয়। সমস্যা হল—প্রতিবাদ এবং প্রতিকার দাবি করার পরে সেই মহিলার পেশাগত দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা? হয়তো এই রূপসী উকিলকে নিত্য নতুন মক্কেলের সঙ্গে বিজনেস ডিনারে পাঠিয়ে ল ফার্ম আবার ঝুট ঝামেলায় পড়তে চাইবে না। তাঁর কাজের জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। ব্যবসার সুযোগ অন্যদের হাতে চলে যাবে। যে জীবিকা মূলত জন-সংযোগের ভিত্তিতে সফল হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে মক্কেল বাছাই করে মামলা হাতে নেওয়ার কথা চিন্তা করা যায় না।

ল ফার্মগুলিতে ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে—ওই ধরনের অভিযোগের নজির বিশেষ না থাকলেও অন্যান্য অভিযোগের জন্যে মামলা হয়েছে। সানফ্রান্সিসকোর ফেডারেল কোর্টে একজন পুরুষ অ্যাটর্নি মামলা ঠুকে দিয়েছেন। তিনি যে ল ফার্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই কোম্পানি এবং এক ক্লায়েন্টের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মোটারকম খেসারত দাবি করেছেন। ওই ল ফার্ম নাকি এক ক্লায়েন্টের পরামর্শে তাঁকে ব্যবসা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাঁর বয়স হয়ে গেছে, এই কারণ দেখিয়ে ক্লায়েন্ট কোম্পানি বুঝিয়েছেন যে—ওই বুড়ো উকিল দিয়ে চলবে না। নিজের মামলার জন্যে তাঁর একজোড়া যুবক উকিল চাই। আর ল ফার্মও সেই উপদেশ শুনেছে। বয়স্ক অ্যাটর্নিকে রিটায়ার করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। ডিসক্রিমিনেশন চার্জ এনেছেন। নিজে যে এখনও কত পরিশ্রম করে মামলা লড়তে পারেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন। জজসাহেব তাঁর পক্ষে রায় দিয়ে বলেছেন—ওই মক্কেলের ইচ্ছে মতো কেস ভণ্ডুল করে দেওয়ার কোনও এক্তিয়ারই নেই। মক্কেলের অগ্রাধিকারের অর্থ এই নয় যে তিনি একাই মামলার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন। এভাবে বয়সের অজুহাত দিয়ে মাননীয় উকিলকে অপমান করা রীতিমত

নীতিবহির্ভূত কাজ হয়েছে।

মহিলা উকিলদের সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগকে গ্রাহ্য না করলে ল ফার্মগুলি ভবিষ্যতে আইনের প্যাঁচে পড়বে বলে জানা গেছে। কারণ ওই অবমাননা ঘটছে কর্মসূত্রে। ফার্মের পার্টনার বা কর্মীকে ক্লায়েন্ট যদি ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা বলেন, সাড়া না পেলে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন, কেস তুলে নিতে চান, তবে ওই মহিলা আইনজীবী সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানিকে জানাবেন। যদি কোম্পানি এর প্রতিকার করে তো ভাল। নয়তো মহিলা ওই ক্লায়েন্টকে তো বটেই, নিজের ফার্মের নামেও আদালতে নালিশ ঠুকে দেবেন। কারণ ল ফার্ম সব অভিযোগ শোনা সত্ত্বেও ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। খদ্দের হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে 'অন্যায় যে সহে', তাকেও শাস্তি পেতে হবে। অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণিত হলে ফার্ম উকিলাদেবীকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে। জেনেশুনে ন্যাকা সাজার গুনেগার। হ্যাঁ, এরকমই হুঁমকি দিয়েছেন একটি ল ফার্মের লেবার ল-পার্টনার বারবারা লিন্ডম্যান। তাঁর যুক্তি হচ্ছে—কোম্পানির কাজে অফিসের বাইরে গেলে সেখানে যদি কাউকে অপ্রীতিকর শিকার হতে হয়, তবে তার প্রতিকার কোম্পানিকেই করতে হবে। বেঁটে মক্কেলের সঙ্গে ওই রূপসী উকিল তো আর সাধ করে ডিনার খেতে যায়নি। কেনই বা যাবে? যেতে হয়েছিল শুধু কাজের কথাবার্তা শেষ করে আসার জন্যে। তো, তার যদি এই ফলাফল হয়, তবে কোম্পানিকেই মক্কেল তাড়াতে হবে। অথচ, কার্যক্ষেত্রে তা হচ্ছে কোথায়? যখনই কোনও মহিলা উকিলের এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, তখনই তাঁকে ওই কেস থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। অন্য উকিল মামলা নিয়ে নেন। সেই মক্কেলের কাজ তো ঠিকই উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে মহিলা উকিলকে সরে যেতে হল। তাঁর অভিযোগের জন্যে তিনিই যেন দোষী হয়ে গেলেন। আরও সমস্যা হয়, যখন ওই মহিলা নিজে ওই ল ফার্মের অংশীদার থাকেন। নিজেদের ফার্মের বিরুদ্ধে, বন্ধু স্থানীয় পার্টনারদের বিরুদ্ধে মামলা করার অর্থ নিজেকে পুরোপুরি সরে আসতে হবে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, মামলার টানাপোড়েন তো আছেই তার ওপর আবার নতুন করে নিজের ব্যবসা শুরু করতে হবে, পসার জমাতে হবে। কাজগুলি আদৌ সহজ নয়। এইসব কারণেই অনেক সময় ল পার্টনাররা মামলা করতে চান না। একজন কর্মচারীর পক্ষে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেওয়া যতখানি সহজ, একজন মালিকের পক্ষে অন্য অংশীদারের নামে মামলা করা তেমন সহজ নয়। অনেক কারণেই তাঁকে পিছিয়ে আসতে হয়। মহিলা উকিলরা অংশীদার হলে এই সমস্যাও থাকে। সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগে মক্কেলকে দায়ী করলেও সরাসরি নিজের পার্টনারদের অভিযুক্ত করতে চান না।

উকিলের সঙ্গে মক্কেলের এমনই এক কাজের সম্পর্ক যে দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজকর্ম করতে হয়। আলাপ আলোচনার জন্যে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ ছাড়াও টেলিফোনে, চিঠিপত্রের নিয়মিত যোগাযোগ থাকে। মামলার স্বার্থে এক সঙ্গে বাইরে যেতে হয়। বিজনেস লাঞ্চ, বিজনেস ডিনার—উকিল মক্কেলে মোলাকাত নেহাত কম হয় না। আর সেই ফাঁকেই এক আধজন মক্কেল অকস্মাৎ কুপোকাত! ব্যস! সেই থেকে যত গণ্ডগোল।

এদেশে হামলে পড়া মক্কেলদের সংখ্যা কিছু কম নয়। সম্প্রতি ৫৫৩ জন মহিলা অ্যাটর্নির ওপর সমীক্ষা নিয়ে জানা গেছে—শতকরা ৬১.৫ জন বলেছেন গত পাঁচ বছরে

তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে মক্কেলদের কাছে অসম্মানিত হয়েছেন। প্রেম নিবেদন ছাড়াও মক্কেলরা তাঁদের বাজে উকিল বলে হেনস্থা করেছে। মেয়ে বলেই তাঁদের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছে।

সব ল ফার্মই তো আর ওই নিউ ইয়র্কের ডিবিভয়েস অ্যান্ড প্লিমটন্-এর মতো মক্কেল তাড়াতে রাজি হয় না। কয়েক বছর আগে ক্যান্ডিস কলিনস নামে এক মহিলা লস্ এঞ্জেলেসে একটি ছোট ল ফার্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক মক্কেল এলেন কোনও খেলনা কোম্পানির নামে মামলা ঠুকতে। প্লাস্টিকের ছোট্ট বালতি নিয়ে মাথায় টুপির মতো করে বসাতে গিয়ে তাঁর ছোট্ট ছেলের গলায় বালতি আটকে গিয়েছিল। কোনওমতে হ্যান্ডেল ভেঙে ছেলে উদ্ধার হয়েছে বটে কিন্তু ভদ্রলোক খেলনা কোম্পানিকে উচিত শিক্ষা দিতে চান। মোটা খেসারত চান। ক্যান্ডিস কলিনস চাইল্ড সেফটি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার, কনজিউমার প্রোটেকশন ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। বিপজ্জনক খেলনার বালতি নিয়ে কেস সাজাবেন বলে প্রস্তুত হলেন। এদিকে মক্কেলের বালতির দিকে আর মনই নেই। দেখা হলে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন। সপ্তাহখানেক ধরে শুভদৃষ্টি সেরে, তারপর বললেন—মনে হচ্ছে, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি...।

ক্যান্ডিস আমল না দিতে ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায়নি। বালতি মামলা শেষ হতেও পারেনি। খেলনা কোম্পানি থেকে ভদ্রলোকের কোর্টের বাইরে কিছু পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়াতে বালতির মক্কেল মামলা তুলে নিয়েছিলেন। ক্যান্ডিস এ সব কথা নিয়ে ফার্মে আর আলোচনা করেননি। তখন সবেমাত্র ওকালতি শুরু করেছিলেন, বয়সও কম ছিল। নতুন এসেই নিজেকে নালিশকুটি হিসেবে চিহ্নিত করতে চাননি। কিন্তু পরে অন্য এক মক্কেল তাঁকে এত অপমান করেছিলেন যে, ক্যান্ডিসকে অভিযোগ আনতে হয়েছিল। সে ভদ্রলোকের ছিল চাইল্ড কাস্টডির মামলা। বিবাহ বিচ্ছেদের পর বাচ্চাদের নিয়ে দড়িযুদ্ধ চলছিল। তাদের মাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে ভদ্রলোক ক্যান্ডিসকে কাস্টডি ফাইটে লাগিয়ে দিলেন। ক্যান্ডিস তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে দিব্যি লড়ছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের কোনও আস্থা নেই। সমানেই ক্যান্ডিসকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। ক্যান্ডিস কেন উকিল হিসেবে আরও মারমুখী হয়ে মামলা লড়ছেন না, কেন আগ্রাসী মায়ের কাছ থেকে বাচ্চাদের জন্যে আরও বেশি বেশি ভিজিটেশন আওয়ার আদায় করে দিচ্ছেন না, সেই নিয়ে ধুমোধুমি ঝগড়া! অসহ্য বিরক্ত হয়ে ক্যান্ডিস ওই ল ফার্মের পার্টনার-ইন-চার্জকে নালিশ করলেন। দিনের পর দিন মক্কেলের দাবড়ানি তিনি হজম করবেন কেন? পার্টনার-ইন-চার্জ সব শুনে বললেন—আমরা ভদ্রলোককে জানিয়ে দেব, যেন তিনি মামলা চালানোর জন্যে অন্য ল ফার্মের সাহায্য নেন। আমাদের কোম্পানি থেকে তাঁকে আর উকিল দেওয়া হবে না।

এত কথা বললেন বটে, কিন্তু আসলে কিছুই করলেন না। শুধু ক্যান্ডিস কলিন্সকে নির্দেশ দেওয়া হল, তিনি যেন ওই মক্কেলের সঙ্গে কাজ না করেন। অন্য এক পুরুষ উকিল কেসটি পেয়ে গেলেন। ক্যান্ডিসের ধারণা তিনি পার্টনার হলে এর বিহিত করতে পারতেন। এখন তিনি আর ওই ফার্মের সঙ্গে যুক্ত নন। আলাদা অফিস খুলেছেন। মক্কেলরা অভব্য আচরণ করলে পত্রপাঠ বিদায় করে দেবেন। ব্যবসার খাতিরেও ওই ধরনের আপস করবেন না।

ল ফার্মের পার্টনাররা বলেন—সব ক্ষেত্রে মক্কেলের উদ্দেশ্যও সঠিক বোঝা যায় না। সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্টের চার্জ আনতে গেলে উপযুক্ত প্রমাণ দরকার হয়। মক্কেলের ব্যবহার বিচার করে সেই প্রমাণ সংগ্রহ করা ছাড়াও অন্যান্য দায়িত্ব এসে পড়ে। চরিত্র নিয়ে টানাটানি চলছে দেখলে মক্কেলও পালটা মামলা বাধিয়ে দেবে। উকিলে মক্কেলে মামলায় মামলায় ল ফার্মের কাজকর্ম লাঠে ওঠার জোগাড় হবে। আইনজ্ঞরা বলেন—মক্কেলের দুর্ব্যবহার নিয়ে প্রতিবাদ জানানো উচিত। তবে যেহেতু মক্কেল বিনা উকিল বাঁচে না, সেহেতু তাঁদের স্বার্থরক্ষার দিকটি আমাদেরই দেখা কর্তব্য। অতএব...

সাধারণ যে সব মক্কেল মামলা লড়ার জন্যে মেয়ে উকিলের বদলে পুরুষ উকিল চান, তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কাজে ল ফার্মের পুরুষ পার্টনাররাই সাহায্য করতে পারেন। এবং অনেকেই তাই করেন। তবে ব্যবসার খাতিরে সব সময় তো আর মক্কেলদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায় না। একটি প্রতিষ্ঠিত ল ফার্মে অন্তত আশিজন উকিল যুক্ত থাকেন। কোন মামলা কে পাবেন, নির্ভর করে উকিলের বিশেষ লাইন আর মক্কেলের চাহিদার ওপরে। সে ক্ষেত্রে যে মক্কেলরা মেয়ে উকিলের সাহায্য নেবেন না বলে জানিয়ে দেন, তাঁদের মামলায় তখন বাধ্য হয়েই পুরুষ উকিল নিয়োগ করতে হয়। আমেরিকায় অধিকাংশ ল ফার্মের মালিক যেহেতু পুরুষ আইনজীবী, মহিলাদের তাঁদের বিচার বিবেচনার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। এই ব্যবসায়ে মহিলা উকিলরা এখনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। বয়স, অভিজ্ঞতা দুয়ের কারণেই মেয়েদের প্রভাব, প্রতিপত্তি বিস্তারের সুযোগ কম। ন্যাশন্যাল ল জার্নাল পত্রিকা থেকে '৯২ সালে এদেশের সর্ব বৃহৎ ২৫০টি ল ফার্মের ওপর একটি সমীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। দেখা গেছে শতকরা সাঁইত্রিশ ভাগ মহিলা উকিল কাজ করেন অ্যাসোসিয়েটস হিসেবে। মাত্র ১১% হচ্ছেন ল ফার্মের পার্টনার। '৮৯ সালে নেওয়া অনুরূপ সমীক্ষার তুলনায় '৯২ সালে সামান্যই উন্নতি লক্ষ করা গেছে। পুরুষ অধ্যুষিত আইন ব্যবসার প্রধান ক্ষেত্র হল করপোরেট ল ডিপার্টমেন্ট। বিভিন্ন ক্লায়েন্ট কেম্পানির সঙ্গে প্রধানত তাদেরই যোগাযোগ। সেই হিসেবে তাঁরাই মহিলা উকিলদের সেক্সচ্যুয়াল হ্যারাসমেন্টের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। ল ফার্মের কর্মী থেকে শুরু করে মহিলা উকিলদের সঙ্গে মক্কেলরা যাতে ভদ্র ব্যবহার করেন, মেলামেশার সুযোগে আপত্তিজনক আচরণ না করেন—এ বিষয়ে কঠোর নিয়মনীতি বজায় রাখার স্বপক্ষে মহিলা উকিলদের অ্যাসোসিয়েশন সোচ্চার হয়েছে। তবে তাঁরা এ কথাও স্বীকার করেছেন যে—মক্কেলদের স্বভাব চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে তাঁদের ওকালতির ব্যবসা লাটে ওঠার সম্ভাবনাও প্রবল। অতএব খুব বুদ্ধি খাটিয়ে উপায় আবিষ্কার করতে হবে। মক্কেলকে নরমে গরমে টিকিয়ে রাখা আর কি? মোট কথা প্রতিবাদ জানাতে হবে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে স্কুল অফ ল-র প্রফেসর বারবারা এস ব্রায়ান্ট বলেছেন—মক্কেলকে না চটিয়েও পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যেতে পারে। যদি ঠিকমত তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া যায়, দেখা যাবে তাঁরা মহিলা উকিলদের অন্য চোখে দেখছেন। উপেক্ষা অথবা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে ভীষণ শ্রদ্ধা ভক্তি করছেন। বেয়াক্কেলে মক্কেলদের এ ভাবেই আক্কেল দিতে হবে।

১১ মার্চ ১৯৯৫

উপার্জনের তাগিদ

প্রয়োজন দিয়ে শুরু হয়ে প্রলোভন দিয়ে শেষ। বহু আমেরিকান পরিবারে এজন্যেই উপার্জনের আগ্রহ পরিণত বয়স পর্যন্ত বজায় থাকে। প্রথম বয়সে অর্থের প্রয়োজনে আর পরবর্তী জীবনে বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দুটি দুটি করে চাকরি করেন। নয়তো দুজনে মিলিয়ে তিনটি চাকরি। ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার আকর্ষণ থেকে এই ধরনের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। স্যালি নামে এক মহিলার বাহান্ন বছর বয়স। সপ্তাহে তিনদিন আর শনি, রবিবার মিলিয়ে মোট পাঁচ দিন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ফুলটাইম চাকরি করেন। এছাড়া সপ্তাহে কুড়ি নয়তো পনেরো ঘণ্টা কাজ করেন একটি কমপিউটার ফার্মে। কয়েক বছর আগে তাঁকে দুই ছেলে মেয়ের কলেজের খরচ চালানোর জন্যে দ্বিতীয় কাজটি নিতে হয়েছিল। বড় মেয়েকে ডাক্তারি পড়িয়েছেন। ছেলে পি. এইচ. ডি. করছে। স্যালি এখন অনায়াসে দ্বিতীয় কাজটি ছেড়ে দিতে পারেন, স্বামীর ভালই রোজগার। কিন্তু স্যালি এত দিনের অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। নিজেদের বাড়ি, তিনখানা গাড়ি, দু-তিনটে কুকুর, বেড়াল। সপ্তাহে সপ্তাহে ক্লিনিং লেডি এসে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যান। স্যালিদের প্রতি বছর দেশ বিদেশ বেড়ানোর শখ। ফলে বাড়তি রোজগারের চাহিদা থেকেই যাচ্ছে। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও অতিরিক্ত পরিশ্রম গায়ে লাগছে না। স্যালির যুক্তি হচ্ছে—এতদিন ছেলে-মেয়ের জন্যে খরচ করেছি। এখন নিজেদের শখ, শৌখিনতার জন্যে খরচ করছি। বাড়তি ডলার সব সময় কাজে লেগে যায়।

অর্থাৎ, দুটি চাকরির ধকল, যেমনই হোক, উদ্বৃত্ত অর্থের আকর্ষণ এড়ানো যাচ্ছে না। স্যালির মতো পরিশ্রমী মহিলা অনেক আছেন। আমেরিকায় চাকরির জন্যে নির্ধারিত সময় ও কাজের চাপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনায় বেশি বলেই ধরা হয়। যেমন জার্মানির সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে—একই ধরনের চাকরি করতে গিয়ে দুই দেশের মানুষ সমান পরিশ্রম করছেন না। আমেরিকান মহিলা ক্যাথির কথা ধরা যাক। তিনি নিউ জার্সির বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর "জে.সি. পেনিতে" কাজ করেন। সিনিয়র মার্চেনডাইজিং ম্যানেজার। ওদিকে, এক জার্মান যুবক অ্যানড্রিয়াস ম্যুলার বার্লিনে "কার্লস্টাড" নামে বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে একই ধরনের কাজ করেন। অটো, মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ডিভিশনের সুপার ভাইজার। কিন্তু দুজনের কাজের সময়ের মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। অথচ মাইনের মধ্যে বিশেষ তফাত নেই। ম্যুলার সপ্তাহে মোট ৩৭ ঘণ্টা চাকরি করেন। বছরে দেড়মাস ছুটি পান। দোকান মাত্র একদিন সন্ধে বেলা খোলা থাকে। বাকি দিন বিকেলের পর বন্ধ হয়ে যায়। শনিবার দুপুর দুটোয় বন্ধ হয়। রবিবারও বন্ধ থাকে। জার্মানির নতুন নিয়ম অনুযায়ী ওই যে সপ্তাহে মাত্র একদিন সন্ধেবেলায় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলা থাকে, তাতেও ম্যুলারের ভীষণ আপত্তি। তাঁর প্রশ্ন—কে রাত সাড়ে আটটার সময় সাইকেল কিনতে আসবে? আমেরিকার লোকেরা কী বলে ভর সন্ধে বেলায় বাজার করতে বেরয় জানি না। রাত নটা পর্যন্ত শপিং মলে ঘুরে বেড়ায়...।

আমেরিকায় ক্যাথির চাকরি হচ্ছে সপ্তাহে অন্ততপক্ষে ৪৪ ঘণ্টা। তারমধ্যে সন্ধের

শিফট আছে। শনি রবিবারও কাজে যাওয়া আছে। প্রত্যেক ছুটির দিনে না হলেও বেশ ঘন ঘন কাজে যেতে হয়। প্রায়ই বাড়িতে কাজের ফাইলপত্র নিয়ে আসেন। জমে থাকা পেপার ওয়ার্ক শেষ করতে হয়। মাথার মধ্যে সব সময় এক চিন্তা, বেশি ছুটি নিলে অফিসে তাঁর প্রভাব, প্রতিপত্তি কমে যাবে। এজন্যে কখনও টানা এক সপ্তাহের বেশি ছুটি নেন না। মহিলা নিজেও কিন্তু জন্মসূত্রে জার্মান। এখন জার্মানি বেড়াতে গেলে তাঁর সব কিছুই অন্যরকম লাগে। তিনি লক্ষ করেছেন—জার্মানদের কাছে বিশ্রাম আগে, চাকরি পরে। অথচ আমেরিকায় একেবারে বিপরীত অবস্থা।

ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেসে আমেরিকান কর্মীদের প্রতি সপ্তাহের কাজের গড় সময় হচ্ছে ৩৭.৭ ঘণ্টা। ইদানীং আরও বেড়ে যাচ্ছে। দশ বছর চাকরি করলে তবে সেই কোম্পানি বছরে একমাস ছুটি বরাদ্দ করবে। তাও অনেক অফিসে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত দেয়। পনেরো বছর চাকরি করলে পাঁচ সপ্তাহ ছুটি। জার্মানিতে কর্মীদের সাপ্তাহিক কাজের গড় সময় ৩০ ঘণ্টা। ইদানীং চাকরির সময়ের হার কমিয়ে আনা হয়েছে। প্রত্যেক জার্মানকর্মী আইন অনুযায়ী বছরে পাঁচ সপ্তাহ ছুটি নিশ্চয়ই পাবেন। চাকরি অনুযায়ী অনেকে তার চেয়েও বেশিদিন ছুটি পান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুই দেশের কাজের চাপ একরকম নয়। এ তো গেল ওয়ার্ক লোডের প্রভেদের কথা। এরপর আছে ওয়ার্ক এথিক অর্থাৎ কর্মজগতের নীতিগত প্রভেদের প্রসঙ্গ। অথবা কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা। চাকরির জন্যে কে কতখানি সময় ব্যয় করতে চান? জার্মানরা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কিছুতেই কাজ করতে চান না। ওই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কর্মীরা প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সময় কাজ করেন বটে, তবে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে। আমেরিকায় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ফুলটাইম কাজ করেও কর্মচারীরা অনেকেই অন্য কোথাও পার্টটাইম চাকরি করেন। সপ্তাহে মোট ষাট ঘণ্টা পর্যন্ত কাজের মধ্যে থাকেন।

তবে আমেরিকায় বিভাগীয় দোকানগুলিতে এই যে সময় ও শ্রম সাপেক্ষ চাকরি, ধোপে টিকে থাকার ব্যাপারে কিন্তু কর্মীদের সমান আগ্রহ বজায় থাকে না। জার্মানির দোকানে কর্মচারীরা সহজে চাকরি ছাড়েন না। বছরের পর বছর একই দল বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ীভাবে থাকেন। বারবার ট্রেনিং দিয়ে নতুন নতুন লোক নিতে হয় না। তুলনায় "জে. সি. পেনির" মতো বড় দোকানেও প্রতি বছর শতকরা চল্লিশভাগ কর্মী চাকরি বদল করে অন্যত্র চলে যান। আবার নতুন করে ট্রেনিং দিয়ে লোক নিতে হয়। ফলে কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। আমেরিকায় বিভাগীয় দোকানে অবশ্য ট্রেনিং-এর ব্যাপারটি যৎ সামান্যই বলা যায়। সপ্তাহ খানেক কাজ শেখানোর পর শিক্ষা-নবিশির পর্ব শেষ। তখন চাকরি শুরু হয়ে যায়। যাঁরা এই সব চাকরি করতে আসেন, তাঁদের কাছে রোজগার করাই প্রধান ব্যাপার। অনেক কিছু শেখার আছে বলে দোকানে কাজ করতে আসেন না। কিন্তু জার্মানির বিভাগীয় দোকানে অ্যাপ্রেনটিসশিপের সময় প্রায় দু'বছর পর্যন্ত ট্রেনিং দেওয়া হয়। এমন ভাবে তৈরি করা হয়, যার ফলে যে কোনও কর্মচারী প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে সমান জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। মোটর সাইকেল বিভাগে যাঁর থাকার কথা, প্রয়োজন হলে তাঁকেই কসমেটিকস বিভাগের দেখাশোনা করতে হবে।

ছুটির বিষয়ে জার্মানদের মতামত হচ্ছে—যতক্ষণ চাকরি করছি, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট

করব না। অফিস চলাকালীন ভীষণ পরিশ্রম করে কাজ তুলে দেব। কিন্তু যে মুহূর্তে ছুটির ঘণ্টা বাজবে, অফিসে বসে সময় নষ্ট করব না। সোজা রাস্তায় নেমে পড়ব। ম্যুলার নামে ওই সুপারভাইজারের খুব বাগানের শখ। বাড়িতে স্ত্রী আর ছোট ছেলে আছে। ম্যুলার এমনিতে রোজ কুড়ি মিনিট আগে অফিসে আসেন। তাঁর স্টাফরা এসে পৌঁছনোর আগে তাঁকে আসতে হয়। কিন্তু ওভার টাইমের ব্যাপারে মোটেই রাজি হন না। সপ্তাহে ৩৭ ঘণ্টার বেশি কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, যতই না ওভারটাইমে বাড়তি রোজগারের সুযোগ থাক। ওই যে ৩৭ ঘণ্টার চুক্তি সই করেছিলেন, তার বেশি কাজ করবেন না। কারণ অবসর সময়ের কোনও বিকল্প নেই। অর্থ দিয়ে তা পূরণ করা যায় না।

জার্মানিতে চাকরির সময়কে সীমাবদ্ধ এবং সংক্ষিপ্ত রাখার ক্ষেত্রে ইউনিয়নগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মানির শক্তিশালী লেবার ইউনিয়ন এনিয়ে চাপ সৃষ্টি করে। পাঁচ বছর আগে যখন জার্মানিতে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধেয় দোকানপত্র খুলে রাখার নিয়ম চালু করা হয়েছিল, বহু জায়গায় দোকানের কর্মীরা ধর্মঘট করেছিলেন। ম্যুলার দেখেছেন ওই বৃহস্পতিবারের বাড়তি দু'ঘণ্টার জন্য স্টাফদের কাজে লাগানো বেশ শক্ত ব্যাপার। অথচ লেট শিফটে কাজ করতে রাজি হলে সেই কর্মীকে সারা সপ্তাহের ঘণ্টার হিসেবে এক ঘণ্টার ছাড় দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও কেউ রাজি হতে চান না। তাঁদের জবাব হচ্ছে—সপ্তাহে একদিন হলেই বা কী হয়েছে? রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজ করলে বাড়িতে বউ ভীষণ রাগারাগি করে।

আমেরিকানদের দুটো চাকরি করার ক্ষমতা দেখে ম্যুলার অবাক। অন্য জার্মানরাও অবাক। তাঁরা বলেন—এক চাকরির ধকল সহ্য করে বাড়ি ফিরতে সন্ধে সাতটা বেজে যায়। আবার কখন অন্য কাজ করতে যাব? আমাদের দেশে চাকরি থেকে ছুটি দেওয়া হয় সাময়িক বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। ওই সময় অন্য একটা চাকরিতে ঢুকে যাওয়া বেআইনি। ছুটি আমরা পাই বিশ্রাম নিয়ে দেহ-মনকে চাঙ্গা করে নেওয়ার জন্যে। সে সময় অন্য জায়গায় কাজ করা মানে নিজেকে আরও ক্লান্ত করা। আমেরিকার মতো জার্মানিতেও যদি লোকেদের বাড়তি উপার্জনের আগ্রহ থাকত, তবে অবশ্যই ভেবে দেখতে হত, সত্যিই এত পরিশ্রম করার কোনও অর্থ আছে কি না?

আমেরিকার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চাকরিতে ক্যাথিকে কত ঘণ্টার পরিশ্রম করতে হয়? মার্চেনডাইজিং ম্যানেজার হিসেবে রোজ সকাল ৮টার মধ্যে জে.সি. পেনিতে পৌঁছতে হয়। দোকান দশটার আগে খোলে না। কিন্তু তাঁকে হাতে সময় নিয়ে যেতে হয় প্রধানত দুটি কারণে। প্রত্যেক ফ্লোরে যত জিনিস সাজানো থাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো লক্ষ করেন। যেখানে যা নেই, তা সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। কর্মচারীদের ডিউটির রুটিন দেখে রাখেন। সকাল ন'টা নাগাদ অধিকাংশ সেলস কর্মীরা এসে পৌঁছন। তাঁরা রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক তাকে আর শোকেসে নতুন নতুন স্টক এনে রাখেন। ক্যাশ বিভাগ থেকে নোট ও কয়েন সুদ্ধু ট্রে নিয়ে আসেন। অথচ বার্লিনের কার্লস্টাডের মতো বড় দোকানেও সেলস কর্মীরা এক ঘণ্টা আগে আসেন না। ঠিক দোকান খোলার দু/চার মিনিট আগে আসা নিয়ম।

জে. সি. পেনির সেলস কর্মীরা নন-ইউনিয়ন স্টাফ। কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁদের

ধারণাও অন্যরকম। মনে করেন, বাড়তি সময় দোকানে থাকা হচ্ছে চাকরিরই অঙ্গ। জার্মানদের সুখ সুবিধের খবর জেনে তাঁরাও অবাক। জার্মানিতে দোকানের সেলসকর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা ছাড়াও, বছরে বোনাস দেওয়া হয় পুরো এক মাসের মাইনে। মেটার্নিটি লিভও তাঁরা বেশিদিন পান। বাবার জন্যে পেটারনিটি লিভের বন্দোবস্ত আছে। সদ্যোজাত শিশুর মা, বাবা, যিনিই দীর্ঘদিনের জন্যে ছুটি নিন না কেন, তিন বছর পর্যন্ত তাঁর চাকরি বজায় থাকবে। আমেরিকান সেলস পার্সনরা ভাবতেই পারেন না, চাকরি শুরু করতে না করতে বছরে পাঁচ সপ্তাহ ছুটি পাওয়া যায়। কয়েক বছরের মধ্যে ছ'সপ্তাহ টানা ছুটি নেওয়া যায়। রবিবারে দোকানে যাওয়ার দরকার হয় না। শনিবার রাত ৯টা পর্যন্ত দোকানে থাকতে হয় না—এ তো রীতিমতো সুখের চাকরি। অবশ্য প্রত্যেক ছুটির দিনেই যে আমেরিকার দোকানে প্রত্যেক সেলস পার্সনকে উপস্থিত থাকতে হবে, তা নয়। যার যেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডিউটি পড়ে। ধরুন এক মহিলার শিফট অনুযায়ী তিনি এই সপ্তাহে দিনের বেলা তো বটেই, বৃহস্পতি আর শুক্রবারে রাত ৯টা পর্যন্ত দোকানে কাজ করবেন। অন্য সময় তিনি একটি বিউটি পার্লারে কাজ করেন। সারা সপ্তাহে ষাট ঘণ্টা পরিশ্রম করে সপ্তাহ শেষে চারশো ডলার মতো আয় করেন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সেলস পার্সনরা এবং ওই জাতীয় অন্যান্য কর্মীরা বেশির ভাগই দুটি করে চাকরি করেন। এঁদের ট্রেনিং বলতে ওই প্রথম কয়েকদিনের শিক্ষানবিশি। কী করে ক্যাশ রেজিস্ট্রার এ কাজ করতে হয়, তাইই শেখানো হয়। আসলে এঁরা যেহেতু সাময়িক উপার্জনের তাগিদে কয়েক মাসের মধ্যে চাকরি নেন, আবার ছেড়ে দেন, আবার অন্য ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢোকেন, সে জন্যে এঁদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে কোম্পানিগুলি সময় অথবা অর্থ, কিছুই নষ্ট করতে চায় না। ভারতীয় মহিলারা, যাঁদের কোনও প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন নেই, তাঁদের অধিকাংশই এদেশে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করতে যান। কয়েক মাস রোজগার করলেন। ইন্ডিয়া যাওয়ার ইচ্ছে হলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। কারণ ফিরে এসে আবার ওইরকম একটি কাজ পেয়ে যাওয়া খুবই সহজ। বাড়ির কাছাকাছি শপিং সেন্টার বা মল থাকলে যাতায়াতে সময় নষ্ট হয় না। সামারের সময় বাচ্চাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায়। তখন মায়েরাও চাকরি ছেড়ে বসে থাকেন। ওইসব দোকানে নতুন চাকরি নিয়ে ঢোকে হাই স্কুল আর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। কারণ সামারেই তাদের চাকরি করার সুযোগ। এইভাবে সব সময়ই দেখা যায় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কর্মী বদল হয়ে যাচ্ছে। নানা কারণে কোম্পানি এঁদের প্রশিক্ষণের জন্যে বেশি সময় এবং অর্থ ব্যয় করে না। পাঁচ বছর আগের তুলনায় এখন এঁদের কাজের পরিশ্রমও বেড়েছে। রিসেশনের বাজারে বিক্রি কমে গিয়েছিল। দোকানে লোক ছাঁটাই হয়েছিল। এখন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির ফলে ব্যবসার অবস্থাও ভাল হয়েছে। দোকানে বিক্রির হার বেড়েছে। কিন্তু নতুন লোক নেওয়া হয়নি। আগে যেখানে ৪০ জন সেলসপার্সন বিভিন্ন বিভাগে কাজ করতেন, এখন সেখানে ২৫/২৬ জনই সব কিছু দেখছেন। কাজের চাপ যথেষ্ট বেশি হয়েছে।

জার্মানির কার্লস্টাড ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ পর্ব বেশ সময় সাপেক্ষ। অ্যাপ্রেনটিস থাকার সময় তাঁরা তিন বছর ধরে বিশেষ ট্রেনিং নেন। সপ্তাহে তিনদিন দোকানে চাকরি করেন আর বাকি দু'দিন কোর্স নেওয়ার জন্যে কোম্পানির খরচে

স্কুলে যান। সেখানে বুক কিপিং থেকে প্রোডাক্ট ইনফরমেশন—নানা বিষয়ে কোর্স দেওয়া হয়। ম্যুলারও তিন বছর ট্রেনিং নিয়েছিলেন। মোট তেরো বছর ওই দোকানে কাজ করছেন। মোটর সাইকেল সংক্রান্ত সব খবর তাঁর নখদর্পণে। বাইসাইকেল বিভাগে আছেন একজন সাইকেল রেসে পারদর্শী সেলসম্যান। গত সতেরো বছর ধরে বাইসাইকেল ও তার যন্ত্রপাতি বিক্রি করে আসছেন। ম্যুলারের কাছে যে ষোলোজন কর্মচারী ওই বিভাগে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে কারুর চাকরি দশ বছর হয়ে গেছে। কারও পাঁচ বছর। মোট কথা, জার্মানির ওই দোকানে কর্মচারিদের চাকরি বেশ পুরনো হয়ে গেছে। অবশ্য কাজের স্থায়িত্ব থেকে এক ধরনের অনড় অবস্থাও সৃষ্টি হয়। ম্যুলার ইচ্ছে করলে প্রমোশন নিতে পারেন। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট লেভেলে পৌঁছনোর সুযোগও এসেছিল। কিন্তু তিনি ভেবে চিন্তে দেখেছেন, তাহলে আর বার্লিনের এই দোকানে কাজ করা যাবে না। হয় বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। নয়তো এত বেশি ঘুরে বেড়াতে হবে যে, পরিবারের সঙ্গে থাকার সময় কমে যাবে। তার চেয়ে যা করছেন, তাইই ভাল। ভাগ্যে থাকলে আর নিজের যোগ্যতার জোরে একদিন ওই দোকানেই হয়তো ডিপার্টমেন্টাল হেড হয়ে বসতে পারেন। এরকমই তাঁর আশা। না হলেও ক্ষতি নেই। মাত্র ২৯ বছর বয়সে মাসে মাসে ডলারের হিসেবে ২,৩৬৫-র মতো মাইনে পাচ্ছেন। সেলস বোনাস পাচ্ছেন। মাইনে সমেত লম্বা ছুটি পাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় কথা চাকরির পরেও অনেকটা সময় বাড়িতে কাটানো যাচ্ছে। এরপরেও সন্তুষ্ট না হলে আর কী চায় মানুষ?

জার্মান সুপারভাইজার ম্যুলার চাকরিসর্বস্ব জীবন অপছন্দ করলেও আমেরিকান মার্চেনডাইজিং ম্যানেজার ক্যাথি কিন্তু কাজের নেশায় মেতে আছেন। জে. সি. পেনি স্টোরে পাঁচটায় তাঁর ছুটি হয়। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খেয়ালই থাকে না। তারপরেও কতক্ষণ বসে বসে বাথরুমের কার্পেটের নতুন ডিজাইন বই দেখেন। সামনের বছর কী ধরনের বাথরুম ম্যাট্ অর্ডার দেবেন, তার জন্যে আরও ক্যাটালগ নামিয়ে আনেন। বাথরুমের আরও কত কী অর্ডার দেওয়ার আছে। এত বড় দোকানের অর্ডার যাবে। ক্যাথি কতক্ষণ আর দোকানে বসে বই দেখবেন? তারচেয়ে অর্ডারের ফাইলপত্র নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাক। বাড়ি ফিরে ডিনার সেরেই ফাইল নিয়ে বসেন। ঘণ্টা দুই অফিসের কাজ করেন। তারপর একটু টি ভি দেখা আর ঘুমিয়ে পড়া। হয়তো সেটি শুক্রবারের রাত। ক্যাথির বিশেষ সামাজিকতার বালাই নেই। শনি/রবি পুরো শিফট দোকানেই কাটান। বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার সঙ্গে থাকেন তাঁর দু/তিনটি বড় বড় ছেলে মেয়ে। তারা নিজের নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। ক্যাথি ব্যস্ত তাঁর কর্মজীবনে। বন্ধু বান্ধব, পার্টি, বেড়ানো, নানা রকম অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া—কিছুই আর তাঁকে আকর্ষণ করে না। শুধু মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজন আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেন। বছরে এক বার বড় মেয়ে, জামাই আর নাতি-নাতনিদের কাছে বেড়াতে যান। তা-ও মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে। গরমের ছুটিতে তারা এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যায়। ক্যাথির গত বছর অপারেশন হওয়াতে তিন সপ্তাহ ছুটি নিতে হয়েছিল। অফিস থেকে ফাইল আনিয়ে, অ্যাসিস্ট্যান্ট আনিয়ে, বিছানায় বসে বসে কাজকর্ম করেছেন। টেলিফোনে মাল অর্ডার দিয়েছেন। বাড়িতেই বায়ার্স অ্যান্ড পারচেজার্স মিটিং হয়েছে। ক্যাথি শুয়ে থাকার মানুষ নন। নিজের কাজ তার এত ভাল লাগে যে অন্য কোনও চাকরির কথা

ভাবতেই পারেন না। এখন মাইনে পান বছরে ৩২ হাজার ডলার। এর ওপর বোনাস আছে। গত বছরের সেলস ফিগার বিট করার জন্যে খুবই ব্যস্ত। ভবিষ্যতে অ্যাসিসট্যান্ট স্টোর ম্যানেজার হবেন বলে আশা করছেন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করার কারণই তো হচ্ছে বিক্রির দিকে লক্ষ্য রাখা। কখনও ফ্লোরে, ফ্লোরে স্টক দেখে বেড়াচ্ছেন। কখনও ক্রেতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের বেড়াচ্ছেন। কখনও ক্রেতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের মতামত জানতে চাইছেন। ক্যাথির ধারণা এসব কাজে আন্তরিকতা না থাকলে উন্নতি করা যায় না। দোকানকে ভালবাসতে হবে।

কাজ পাগল আমেরিকান অবশ্য সবাই নয়। তবে উপার্জনের তাগিদ থেকে ফুলটাইম চাকরির পরেও ছোটখাটো পার্টটাইম কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের পাশাপাশি অধিকতর সাচ্ছল্যের আকাঙ্ক্ষাও সমানভাবে কাজ করে। জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ আরাম এবং বিলাস ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে প্রথম জীবন থেকেই এঁরা তৎপর। কোনও রকম অসুবিধে, প্রাচুর্যের অভাবকে মেনে নেওয়া এঁদের পক্ষে কঠিন। ভারতীয় সমাজেও এই মানসিকতা প্রভাব বিস্তার করেছে। খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার জন্যে স্বামী, স্ত্রী উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন। এক মাসের শিশু সন্তানকে ডে কেয়ার সেন্টারে রেখে বেশ ঝটপট বিষয় সম্পত্তি বাড়িয়ে ফেলছেন। অ্যাপার্টমেন্টে সারাদিন মার কোলে বসে থাকার বদলে যথাকালে নিজেদের বড় বাড়ি হলে, শুধু রাতটুকু ঘুমোনোর জন্যেই সেই শিশু বাড়ি ফিরছে। কর্মব্যস্ত সমাজ। তবে প্রত্যেক দেশেই তো বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকেন। আমেরিকায় জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে যে পরিমাণ সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়, তার জন্যেই এঁরা প্রথম থেকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন। সেই চাপ কমে গেলে বিশ্রাম নেওয়ার সময় আসে। তবে কতখানি অবসর তাঁরা চাইছেন, তার ওপর নির্ভর করে তাঁদের প্রৌঢ় অবস্থার দিনযাপন। যেহেতু অনেক রকম শখ সাধ তাঁদের মজ্জাগত, প্রাণ প্রাচুর্য এবং ভোগ করার ইচ্ছেও প্রবল, সেহেতু বয়স বাড়লেও উপার্জনের তাগিদ নষ্ট হয় না। অন্তত পার্ট টাইম কাজ করছেন না, এমন প্রৌঢ় দম্পতির সংখ্যা বিরল। ৬৫ বছরের ওপর বয়স হলে তখন রণে ভঙ্গ দেওয়ার সময় আসে। সোশ্যাল সিকিউরিটির ভাতা নিয়ে ভলানটারি কাজকর্ম শুরু হয়।

ডবল চাকরির উদাহরণ আমেরিকার অবিবাহিত সমাজে, বিশেষ করে যুবক যুবতীদের মধ্যে আরও বেশি। তবে প্রফেশনাল লেভেলে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে কম। অনেকে সময় কাটানোর জন্যেই দুটি চাকরি নেন। উইক এন্ড ছাড়া সামাজিকতার সুযোগ নেই। শীতের মরশুমে প্রায় তিন চার মাস আমেরিকার শহরতলি অঞ্চলে সন্ধেবেলায় বিশেষ কিছু করার থাকে না। সম্ভবত নিঃসঙ্গতা বোধ থেকে অবিবাহিত লোকজন, কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা সন্ধেবেলা পার্ট টাইম চাকরি নেয়। সেখানেই তাদের চেনাশোনা গড়ে ওঠে। আড্ডা না হোক, কাজের ফাঁকে গল্প গুজব হয়।

আমেরিকানদের উপার্জনের তাগিদ, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, আর্থিক মোহ, যাই থাক, জার্মানদের তাতে কোনও আগ্রহ নেই। অফিস ছুটির পর লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে সুখী গৃহকোণে পৌঁছনোই প্রধান আকর্ষণ। তার জন্যে সপ্তাহে তিরিশ ঘণ্টার চাকরিই যথেষ্ট। জার্মান কর্মচারী ম্যুলারের কাছে পরিশ্রমের চেয়ে বিশ্রামের দাম বেশি। বদলির

ভয়ে প্রমোশন নিতে চান না। ব্যক্তিগত অবকাশের একটি মুহূর্তও অফিসের কাজে নষ্ট করতে রাজি নন। বৃহস্পতিবারের বারবেলার পরে সন্ধেবেলায় মোটর সাইকেল বিক্রি করতে হয় নেহাতই বাধ্য হয়ে। আর আমেরিকার ক্যাথি পেশার মধ্যে নেশার উত্তেজনা খুঁজে পেয়েছেন। সোমবার প্রাতঃকালে উঠে মনে মনে বলেন—"ওঃ, আবার একটা সপ্তাহ হাতে পেলাম..."। জার্মানি পড়েছে ছুটির ফাঁদে। আমেরিকা কর্মজালে।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

কর্মক্ষেত্রে কালো মেয়েদের প্রতিষ্ঠা

এলেন স্কট নামে সাতাশ বছরের একটি মেয়ে রকওয়েল ইন্টারন্যাশনাল ইনকরপোরেটেড-এ বড় চাকরি করেন। ইনি কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের শিক্ষিত মেয়ে। আমেরিকার কর্মক্ষেত্রে এই সমাজের প্রফেশনাল মহিলারা ক্রমশই উন্নতি করছেন। গত দশ বছরের মধ্যে এঁদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। '৮২ সালের তুলনায়' ৯২ সালে কালো প্রফেশনাল মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা একশো পঁচিশভাগ। আমেরিকার আটত্রিশ হাজার কোম্পানিকে ইউ এস ইকুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কমিশনের কাছে যে রিপোর্ট পাঠাতে হয়, তার থেকেই জানা গেছে—এখন প্রফেশনাল কালো মহিলার সংখ্যা দু'লক্ষেরও বেশি। যে কোম্পানিতে অন্তত একশোজন চাকুরে আছেন, তাঁদেরই ওই রিপোর্ট পাঠাতে হয়।

অবশ্য এ দেশের শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রফেশনাল পুরুষ ও মহিলাদের তুলনায় ওই দুশো হাজারকে সামান্যই বলা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে—কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ প্রফেশনালদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা প্রফেশনালদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। চোদ্দো বছর আগে প্রতিটি কালো প্রফেশনাল পুরুষ পিছু মহিলা ছিল ১.২ জন। আর এখনকার হিসেব অনুযায়ী ১.৮ জন। শ্বেতাঙ্গ মহিলারাও ক্রমশ চাকরি ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছেন। তবু প্রফেশনাল পুরুষদের ছাপিয়ে যেতে পারেননি। চোদ্দো বছর আগে প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ পিছু প্রফেশনাল মহিলা ছিল ০.৬২ জন। এখন ০.৯৬ জন। সুতরাং সব মিলিয়ে কালো মহিলারাই এগিয়ে আছেন। শুধু প্রফেশনাল চাকরিতেই নয়, মিলিটারি বিভাগে, ফিন্যান্স, ইনসিওরেন্স ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়, রিটেইল ব্যবসায়, ট্রান্সপোর্টেশন ও কমিউনিকেশন ব্যবসায়, মাইনিং-এর কাজে, হোলসেল ব্যবসায়, এগ্রিকালচার, ফরেস্ট বিভাগ, মাছের ব্যবসা, ম্যানুফ্যাকচারিং ও কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে, সর্বত্রই কালো পুরুষদের তুলনায় কালো মহিলারা দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছেন। এই জাতীয় চাকরিতে আছেন আট লক্ষ পনেরো হাজার কালো মহিলা। কালো পুরুষ আছেন পাঁচ লক্ষ চৌষট্টি হাজার। এই হিসেবের মধ্যে কিন্তু করণিকের চাকরিকে ধরা হয়নি। হোয়াইট কলার জব অর্থাৎ শিক্ষানির্ভর বৃত্তির মধ্যে ক্ল্যারিকাল কাজকেও ধরা হয়। সেক্ষেত্রেও কালো পুরুষদের

তুলনায় কালো মহিলা ক্লার্কের সংখ্যা এখন পাঁচ গুণ বেশি হয়েছে। একমাত্র কায়িক শ্রমসাপেক্ষ কাজে অর্থাৎ ব্লু কলার জব-এ কালো পুরুষরা এগিয়ে আছেন। অপারেটর, শ্রমিক, ক্র্যাফটসম্যান, যন্ত্রপাতি সারানোর কাজ ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে।

আমেরিকার চাকরি ক্ষেত্রে কালো মেয়েরা যে ক্রমশ উন্নতি করে চলেছেন, এ ব্যাপারটি কালো সমাজে কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এ দেশে বর্ণবৈষম্যের সমস্যা, অফিসে উন্নতি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অদৃশ্য অবরোধের অভিজ্ঞতা—এইসব প্রতিকূলতা বিবেচনা করলে কালো মেয়েদের প্রতিষ্ঠা নিয়ে ওই সমাজের আগ্রহ থাকার কথা। কিন্তু সাদা, কালো দুই সমাজেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই এ সম্পর্কে সংশয় পোষণ করছেন। এঁদের মধ্যে বড় বড় কোম্পানির পদস্থ কর্মীরা আছেন। সরকারি অফিসাররা আছেন। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক, মনস্তত্ত্ববিদরা আছেন। এঁরা মনে করছেন—এই ধারা থেকে আমেরিকার করপোরেট কালচারের মধ্যে একটি নতুন বিভেদের সৃষ্টি হতে চলেছে। সাদা, কালোর দ্বন্দ্ব, কর্মক্ষেত্রে নারী, পুরুষের সম অধিকারের ইস্যু ইত্যাদি নিয়ে এমনিতেই বিভেদ এবং বিভেদের অবসান ঘটানোর চেষ্টায় জটিলতা বাড়ছে। ফলাফল যাই-ই হোক, টেনশন থাকছে।

কালো পুরুষরা খুশি হচ্ছেন না কেন? বর্ণবৈষম্যের কারণে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার বিবেচিত না হওয়ার জন্য এত বছর লড়াই করে এসেছেন। অথচ তাঁদের সমাজেরই মেয়েদের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় সম্পূর্ণ সমর্থন নেই কেন?

কালো মানুষেরা চিন্তিত অনেক কারণেই। এঁদের কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ কেমন হবে? পারিবারিক জীবনের চেহারাটি কেমন দাঁড়াবে? লড়াই কি আরও কঠিন হবে? মেয়েদের উপার্জনে সংসার চলবে। ছেলেরা না কর্মক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে, না সমাজে অথবা সংসারে তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি বজায় থাকবে। পারিবারিক দায়িত্ব বহনের অক্ষমতা থেকে সংসারে তার কোনও মর্যাদা থাকবে না। বাড়িতে বোন অথবা স্ত্রীর তুলনায় কালো ছেলেটির উপার্জন কম হলে পরিবারের কেউ তার ওপর নির্ভর করবে না। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের রোজগার বেশি হলে সামাজিক সমস্যাও জটিল হবে। সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী এখনও প্রেম, পরিচয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরুষের আর্থিক অবস্থা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। ডেট করা, বিয়ের আগে ইচ্ছে হলে কিছুদিন একত্রে বসবাস এবং বিয়ের পরে সংসার চালানো—সব কিছুতেই পুরুষের উপার্জনের প্রধান ভূমিকা আছে। আমেরিকার কালো সমাজের প্রফেশনাল মেয়েদের উপযুক্ত বর পাওয়া যাবে কোথা থেকে? ম্যানেজার মেয়ে কি অপারেটর পুরুষকে পছন্দ করবেন? যোগ্য পাত্রের অভাবে প্রতিষ্ঠিত মেয়ের বিয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে। কালো সমাজে এ ঘটনা নতুন নয়। ওয়াশিংটনে কালো ছাত্রছাত্রী অধ্যুষিত বিশ্ববিদ্যালয় হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক বলেছেন—আমাদের সমাজে মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ছেলেদের সামান্য প্রত্যাশা থেকে রীতিমতো সমস্যা দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত মেয়েদের জন্যে উপযুক্ত ছেলের খুবই অভাব। ফলে কালো সমাজে বিয়ে, বংশধারা বজায় রাখা, যৌন স্বাস্থ্য, প্রবৃত্তিগত প্রবণতা ইত্যাদি নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। সুশিক্ষিত, উপার্জনশীল পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে, এর সমাধান সম্ভব নয়।

কালো সমাজে মেয়েরা কেন পুরুষদের চেয়ে বেশি উন্নতি করছেন? কী কী কারণে পুরুষরা পিছিয়ে পড়ছেন? মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে—প্রথমত কালো পুরুষদের প্রফেশনাল চাকরিতে ঢোকার মতো বিদ্যাবুদ্ধির অভাব ঘটছে। দ্বিতীয়ত সুযোগ পেলেও কর্মক্ষেত্রে তাঁরা কালো মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা টানতে পারছেন না। বড় বড় কোম্পানিতে কালো উচ্চপদস্থ কর্মী হিসেবে মেয়েদেরই বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। যে কোনও কারণেই হোক, কালো প্রফেশনাল মেয়ে কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের বিচারে অধিকতর যোগ্য বলে প্রমোশন পেয়ে যান। ইউ এস ইকুয়্যাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কমিশনের কাছে রিপোর্ট চলে যায়—আমরা কালো মহিলাকে উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ কোনও ডিসক্রিমিনেশন নেই।

কালো পুরুষদের বয়ঃসন্ধিক্ষণের নানা সমস্যাও এ জন্যে দায়ী। ড্রাগ, অপরাধপ্রবণতা, অসমাপ্ত শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থার প্রতি রুষ্ট মনোভাব থেকে বহু কিশোর বিপথে চলে যায়। অবাঞ্ছিত নাগরিক হিসাবে নিজেদের মনের ক্ষোভকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ জানায়। এরা বিপজ্জনক জীবনযাপন করে। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব অনুযায়ী—আমেরিকায় অল্পবয়সী কালো ছেলেদের অসময়ে মৃত্যুর প্রথম কারণই হচ্ছে খুন হওয়া। কালো যুবকদের মধ্যে কলেজের ছাত্র যত না আছে, তার দ্বিগুণ সংখ্যক আছে জেলের কয়েদি হিসেবে। সাদা লোকেদের তুলনায় কালোদের বেকারত্বের হারও দ্বিগুণ। আবার তার মধ্যে কর্মহীন পুরুষের সংখ্যাই বেশি। কালো মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক কালো পুরুষ বেকারভাতা নিয়ে নিশ্চষ্ট হয়ে বসে থাকেন। প্রফেশনাল চাকরিতে (আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানিতে) কালো পুরুষদের সংখ্যা কম থাকার আর একটি কারণ আছে। আর্থ-সামাজিক কারণে কালো পরিবারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেদের ইউ এস মিলিটারিতে যোগ দেওয়ার তাগিদ থাকে। বিনা খরচে উচ্চশিক্ষা লাভ ও উপার্জনের পথ প্রশস্ত হওয়ার ফলে বহু কালো পরিবারের ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। পেন্টাগনের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে—ইউ এস মিলিটারি ফোর্সে কালো পুরুষের সংখ্যা দু'লক্ষ সত্তর হাজারেরও বেশি এখন।

যে সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইকুয়্যাল অপরচুনিটির কাছে রিপোর্ট করে, তারা এখন অনেক বেশি সংখ্যক কালো মেয়েকে চাকরি দিচ্ছে। তুলনায় কালো পুরুষদের সুযোগ কমে গেছে। দু'বছর আগে এই কোম্পানিগুলি থেকে মোট ২.৭৭ মিলিয়ন কালো মহিলাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। কালো পুরুষরা চাকরি পেয়েছেন মোট ২.৪৪ মিলিয়ন। মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতাই এর প্রধান কারণ। কলেজের ডিগ্রি অনুযায়ী যোগ্যতার পরিমাপ হয়। আমেরিকায় কর্মরত কালো চাকুরিজীবীদের মধ্যে শতকরা ১৪.২% মেয়েদের গ্র্যাজুয়েট নয়তো মাস্টার্স ডিগ্রি আছে। কালো পুরুষদের মধ্যে শতকরা ১১.৯ ভাগের ওই ডিগ্রি আছে। এর মধ্যে প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদেরও ধরা হচ্ছে।

ক্রমশ কালো মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের হার বেড়ে যাচ্ছে। তুলনায় কালো পুরুষদের শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। অযোগ্যতা থেকেই বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার দরুন এমন এক পর্যায়ে এঁরা থেকে যাচ্ছেন যেখান থেকে কর্মজগতে সুযোগ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকছে না। উচ্চশিক্ষার অভাবে ভাল চাকরি নাগালের বাইরেই

থেকে যাচ্ছে।

অবশ্য সারা আমেরিকার কালো সমাজের চাকরির বাজার আর উপার্জনের হার লক্ষ করলে স্পষ্টই বোঝা যাবে—শ্বেতাঙ্গ সমাজের সঙ্গেও যেমন তাঁদের অনেক পার্থক্য, এশিয়ান-আমেরিকানদের সঙ্গেও সেই রকমই প্রভেদ। অধিকাংশ কালো মহিলা সামান্য মাইনের সামান্য চাকরিতে আজীবন টিকে আছেন। ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।পুরুষদেরও একই অবস্থা। সন্তান প্রতিপালনের জন্যে কালো মহিলারা যে কোনও ধরনের কাজ দীর্ঘদিন ধরে করে চলেন। স্বামীরা মর্জিমাফিক কাজ ছাড়লেও মেয়েদের সংসারের মুখ চেয়ে চাকরি ছাড়ার উপায় নেই। কাজের মান যেমনই হোক না কেন। মাইনেরও তফাত আছে। একই চাকরি করে কালো মেয়েরা কালো পুরুষদের মাইনের চেয়ে শতকরা ১৪ ভাগ কম পান।

প্রফেশনাল চাকরির একেবারে শীর্ষস্থানে না হলেও, বেশ দায়িত্বপূর্ণ পদে যাঁরা থাকেন, সেখানে কালো মহিলাদের চেয়ে কালো পুরুষদের সংখ্যা এখনও বেশি। যেহেতু পুরুষ প্রফেশনালরা অনেক আগে থেকে কাজ শুরু করেছেন, সেহেতু তাঁদের প্রমোশন ইত্যাদিও আগে হয়েছে।

কিন্তু ক্রমশ এই পার্থক্য কমে আসছে। সাম্প্রতিক ছাঁটাইয়ের কারণে বড় বড় কোম্পানিতে ম্যানেজারদের ওপরেই কোপ পড়েছে সবচেয়ে বেশি। সাদা ম্যানেজারদের মতো বহু কালো পুরুষ ম্যানেজারেরও চাকরি গেছে। এছাড়াও অন্য কারণ হল কালো মহিলাদের ম্যানেজমেন্টের চাকরিতে স্থান করে নেওয়ার যোগ্যতা। গত দশ বছরে ম্যানেজমেন্টের চাকরিতে কালো পুরুষের যোগ দেওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২২ ভাগ। আর কালো মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৪ ভাগ। হোয়াইট কলার চাকরির প্রতিটি বিভাগে কালো পুরুষদের চেয়ে বেশি সংখ্যক কালো মহিলা কাজ করছেন।

কালো মেয়েদের প্লাস পয়েন্টই তাঁদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। প্রথমত লেখাপড়ায় ভাল করছেন। শতকরা ২৬.২ ভাগ কালো ছেলে কলেজে ভর্তি হয়। মেয়েরা শতকরা ৩২.৩ ভাগ কলেজে পড়ে। ব্যাচেলার্স ডিগ্রি পাস করেন। শতকরা ৯.৭ ভাগ মেয়ে। কালো ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৮.১ ভাগ কলেজের ডিগ্রি অর্জন করেন। মাস্টার্স বা প্রফেশনাল ডিগ্রি করেন শতকরা ৪.৫ ভাগ কালো মেয়ে। তুলনায় কালো পুরুষরা ৩.৯% উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এ তো গেল শুধু ডিগ্রি, ডিপ্লোমার কথা। এরপর আছে চাকরিগত যোগ্যতার প্রশ্ন। ডিগ্রির হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত কালো মহিলারা কাজের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার পরিচয় দেন। ভীষণ পরিশ্রমী। কালো পুরুষদের চেয়ে তাঁদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও বেশি। সূক্ষ্ম বোধশক্তি, দায়িত্ব সচেতনতা, অনলস উদ্যমী মনোভাব ছাড়াও পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার ধৈর্য এঁদের অনেক কারণেই করপোরেট পরিবেশের উপযোগী করে তুলেছে। কালো পুরুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী নন। তাঁরা অবশ্য বলছেন—শ্বেতাঙ্গ কর্মীরা কালো মেয়েদের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করেন বলেই নাকি তাঁদের এত উন্নতি হচ্ছে। এখানে অবশ্য যৌন আকর্ষণের কোনও ব্যাপার নেই। শান্ত, ধীর, স্থির সহকর্মীর কাছাকাছি থাকার যে স্বাচ্ছন্দ্য, তাই উপভোগ করেন। সিরিয়াস প্রকৃতির মহিলাদের সঙ্গে কাজ করার যে নিশ্চিন্ততা, তাই বোধ করেন। কালো পুরুষদের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, স্পষ্ট কথা বলার অভ্যাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে সরাসরি

পদমর্যাদার দাবি করা ইত্যাদি শ্বেতাঙ্গ ওপরওয়ালাদের পছন্দ হয় না। তাঁরা বলেন, কালোদের মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব, সন্দেহপরায়ণতা, জেদ, একগুঁয়েমি, অতিরিক্ত তর্ক করার প্রবণতা এত বেশি যে প্রায়ই সংঘাত উপস্থিত হয়। তুলনায় কালো মহিলাদের সঙ্গে কাজ করা অনেক সহজ।

এ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস অ্যান্ড স্পেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ম্যানেজার কালো মহিলা অ্যামান্ডা হ্যারিস বলেছেন—কালো মেয়েরা ছোটবেলা থেকে নানাভাবে শিক্ষিত হয়। বহুমুখী বৈশিষ্ট্য তাদের স্বভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে মায়েদেরই বেশি অবদান থাকে। যে কোনও অবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার মতো পরিবর্তনশীল এক মন—কালো মেয়েদের জীবনে বহু পরিস্থিতির মোকাবিলায় সাহায্য করে। চাকরি ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতার দাম আছে।

জেনারেল মোটরস করপোরেশনের প্যাটেন্ট অ্যান্ড লাইসেন্সিং-এর ভাইস প্রেসিডেন্টও একজন কালো মহিলা। বয়সে যুবতীই বলা যায়। নাম ওয়ান্ডা ডনসন-লো। কোম্পানির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্বেতাঙ্গ সমাজের মানুষ। তাঁর উৎসাহ আর সহযোগিতা ওয়ান্ডাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য—আমার ওপর ওয়ান্ডার আস্থা ছিল। কখনও কোনও বিশেষ কর্মসূচির অনুমোদন চেয়ে আন্দোলন করেনি। কখনও আমার সাহায্য করার ইচ্ছাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সন্দেহ করেনি। আমার কথার ওপর নির্ভর করে কাজ করে গেছে। কিন্তু আমি অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কালো পুরুষ কর্মী হলে শুরুতেই চ্যালেঞ্জের মনোভাব নিয়ে আসত।

কিন্তু সত্যিই কি এমন অসহিষ্ণুতা কালো পুরুষের মজ্জাগত থাকে? চাকরি ক্ষেত্রে এ জন্যেই কি তাঁদের ক্ষতি হচ্ছে? কালো পুরুষরা সাদা মানুষের চোখে আগ্রাসী, একগুঁয়ে প্রকৃতির। অথচ কালোদের বক্তব্য—আপাত রুক্ষতাই আমাদের বর্ম। কর্মক্ষেত্রে আমাদের অযোগ্য প্রতিপন্ন করা বা ব্যবহার থেকে ভুল বোঝার ঘটনা তো নতুন নয়। অনেক দুঃখকষ্ট, অপমানের পরে আমরা বুঝেছি নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকারও বিশেষ মূল্য আছে। ওই অনমনীয় আচরণ দিয়ে আমরা নিজেদের প্রতি রক্ষার জন্যে একটি দুর্গ তৈরি করি। দূরত্বের এই আবরণ তখনই সরিয়ে নেওয়া সম্ভব, যখন সহকর্মী আর ওপরওয়ালাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠছে। তার আগে নয়। বড় বড় কোম্পানিগুলির উচিত—কালো কর্মীদের যাঁরা সুযোগ ও সাহায্য দিয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে দেবেন, সেই ধরনের ক্ষমতাশীল, উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ কর্মীদের ওপর নির্ভর করা। সাধারণত প্রতি দশজন সাদা মানুষের মধ্যেই একজন থাকেন, যিনি কালোদের সম্পর্কে সংবেদনশীল এবং সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে চান। কর্মক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের বোঝাপড়ার সমস্যা প্রসঙ্গে একজন কালো প্রজেক্ট ম্যানেজারের ধারণা—প্রথমত আমাদের বুঝতেই সময় লেগে যায় যে, মানসিকতার ব্যাপারটি এত গুরুত্বপূর্ণ। এই নয় যে, কালোদের হুবহু সাদাদের মতো আচরণ করতে হবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে নিয়মকানুন, ধারা বজায় আছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই হবে। আমরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে পাই। দীর্ঘসূত্রী মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করি। চেষ্টা করি অফিসে সেরা ইঞ্জিনিয়ার হব। নিজের কাজ নিয়ে, নিজেকে অপরিহার্য করে তোলার ইচ্ছে থেকে

এমনভাবে সিদ্ধান্ত নিই, মতামত দিই, কাজের ধারা বেছে নিই যে, শেষ পর্যন্ত আখেরে কোনও লাভ হয় না। মানসিকতার প্রভেদ থেকেই অফিসে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।

আবার অন্যরকম ধারণার কথাও শোনা গেছে। অধিকাংশ কালো মহিলা ও পুরুষের মত হচ্ছে—কর্মক্ষেত্রে কালো পুরুষের দৃঢ়চেতা মনোভাব ও অটল ব্যক্তিত্বই শেষ পর্যন্ত তার উন্নতির কারণ হয়। যে মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গ সহকর্মী এবং মালিকরা বুঝতে পারেন যে তুমি ঠিক কী ধরনের মানুষ এবং তোমার কর্মজীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী, তখন থেকেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতে থাকে। সম্পর্কের গোড়ার দিকের অমসৃণ দিকগুলি মেজে ঘষে সমান করে নেওয়ার চেষ্টা দু'পক্ষেরই থাকা দরকার। এ হচ্ছে পুরুষে পুরুষে সমঝোতার ব্যাপার। ফলাফল কালো পুরুষদের ক্ষেত্রে ভালই হয়। তবে মহিলাদের পরিস্থিতি অন্যরকম। সাদা পুরুষের ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপারে যে উৎসাহ লক্ষ করা যায়, তার মূলে আছে আরও একটি কারণ। তাঁরা ভাবেন—কেউ তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। কালো মেয়ে তাঁর সাদা সহকর্মীকে অতিক্রম করে গিয়ে ওপরের চেয়ারটি দখল করার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু কালো পুরুষকে বিশ্বাস নেই। প্রতিযোগী মনোভাব থেকে কখন কীভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, বলা তো যায় না।

কালো পুরুষরা এইরকম ভাবেন তবে একথা মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে—কালো মহিলাদের চাকরি দেওয়া আর প্রমোশনের ক্ষেত্রে আমেরিকার বড় বড় কোম্পানিগুলির এক ঢিলে দুই পাখি মারার ব্যাপারও থাকে। কালো এবং মহিলা দুজনকেই এক দানে সুযোগ দিয়ে ইকুয়্যাল অপরচুনিটির উদারতা দেখানো হল। নীতিগত তাগিদে আইনের দিক বাঁচিয়ে, হয়তো একটি কমবয়সী, অনভিজ্ঞ কালো মেয়েকেই উঁচু পদে বসিয়ে দেওয়া হল। সেখানে তার বয়স বা অনভিজ্ঞতা কোনও বাধা নয়। মূল উদ্দেশ হচ্ছে—কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় এবং নারী জাতিকে সম-অধিকারের ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া। কিন্তু প্রফেশনাল কালো মহিলারা মনে করেন এই 'দাক্ষিণ্যের' ফল ভাল হয় না। তাঁরা যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন—এ কথা প্রমাণ করতে খুবই লড়াই করতে হয়।

তবে কি এমন সময় আসছে, যখন আমেরিকার কালো মহিলারা বড় বড় কোম্পানিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হবেন? অনেকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবেন? এ দেশে 'গ্লাস সিলিং' কথাটি খুবই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মাথার ওপরের কাচের ছাদ ভেদ করে ওপরতলার সব কিছুই দেখা যায়, কিন্তু পৌঁছনো যায় না। ভারতীয় প্রফেশনালরাও অধিকাংশই স্বীকার করেন, চাকরিক্ষেত্রে একেবারে ওপরের দিকে তাঁদের জন্যেও এই গ্লাস সিলিং-এর বন্দোবস্ত অথবা বাধা। যা প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের পক্ষে অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব। কালো প্রফেশনাল মহিলারাও ওই কাচের ছাদের নীচে অপেক্ষা করে থাকবেন। তবে তাঁরা যে এই পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন, সুশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—এও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমেরিকার কর্মজগৎ নিয়ন্ত্রণের অধিকার যে শ্বেতাঙ্গ সমাজের হাতে, তাঁদের তুলনায় অবশ্য এমন অগ্রগতির কথা বলার মতো কিছু নয়। ইকুয়াল অপরচুনিটির কাছে রিপোর্ট দেয় যে সমস্ত কোম্পানি, তাদের হিসেব অনুযায়ী প্রফেশনাল কালো চাকুরের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৫.৯%। তার মধ্যে উচ্চপদে আছেন মাত্র ৫%। কালো মহিলারা সাধারণত সেই পদগুলি পান, যা মহিলাদের জন্যে নির্ধারিত বলে বিবেচ্য। অর্থাৎ

সংযুক্ত থাকার দায়িত্ব। হয়তো সাদা মহিলারা ওই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বা উন্নতি করে অন্য বিভাগে চলে গেছেন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের মূল কর্মভার যে সব কর্তাব্যক্তির হাতে, সেখানে কালো মহিলাদের স্থান নেই। মাইনেও কম পান। একই কাজে কালো পুরুষ আর সাদা মহিলারা যা মাইনে পান, কালো মহিলার ক্ষেত্রে তার ৮৬% দেওয়া হয়। সাদা পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় তো আরও তফাত হয়ে যায়। তিনি যা মাইনে পান, তার ৬০% দেওয়া হয় কালো প্রফেশনাল মহিলাকে। এর ফলে সাংসারিক খরচ চালানোর ক্ষেত্রেও সাদা মহিলার চেয়ে কালো মহিলাকে অধিকতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ যাঁরা একা উপার্জন করেন, সেইসব পরিবারে সাদা মহিলার চেয়ে কালো মহিলার ওপরেই বেশি রকম আর্থিক চাপ আসে। অথচ তাঁর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। সচ্ছল পরিবারের সাদা মেয়েটি যে কোনও প্রয়োজনে তার বাবা, মার কাছ থেকেও মোটা রকম অর্থ সাহায্য পায়। কালো প্রফেশনাল মেয়েটির বাবা, মা বা ভাই, বোনের সেই আর্থিক সঙ্গতি নেই। উপরন্তু তাঁরাই হয়তো মেয়েটির ওপর নির্ভর করেন। এইসব কারণে প্রফেশনাল হওয়া সত্ত্বেও দুই সমাজের দুই মহিলার মধ্যে আর্থিক অবস্থার মিল নেই।

অতীতে কালো সমাজে বহু সময়েই দেখা যেত, স্ত্রীরা স্বামীদের চেয়ে বেশি উপার্জন করতেন। তখন দৈহিক পরিশ্রমই ছিল অতিরিক্ত উপার্জনের একমাত্র পথ। কিন্তু এখন সময় অন্য রকম। কালো প্রফেশনাল মহিলা স্বামী হিসেবে কাকে বেছে নেবেন? সুশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত কালো পুরুষের সংখ্যা এতই নগণ্য যে পছন্দমত বর পাওয়া সহজ নয়। কেবল যৌথ উপার্জনের কথা ভেবে নিজের চেয়ে কম পড়াশোনা জানা, সামান্য চাকুরে কোনও একজনকে বেছে নিতে হলে অনেক কিছুই চিন্তা করতে হয়। মানসিকতার মিল হবে কিনা, সেই প্রধান চিন্তা। একজন কালো ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর দুই মেয়েকে প্রফেশনাল শিক্ষায় শিক্ষিত করে এখন কালো জামাই জোড়া খুঁজে খুঁজে হয়রান। কালো জামাই ছাড়া আর কিছু পছন্দ নয়। কিন্তু প্রফেশনাল পাত্র কালো মতো একজোড়া পাওয়া বেশ শক্ত হচ্ছে। বাধ্য হয়ে মেয়েদের বলে দিয়েছেন—ভালবাসাই আসল। যদি কোনও কালোরঙের দমকল কর্মীর মধ্যেই তুমি ভালবাসার আগুন দেখতে পাও, তবে সেখানেই ঝাঁপ দাও। ইঞ্জিনিয়ার মেয়ের সঙ্গে দমকল কর্মীর আর সাইকোলজিতে মাস্টার্স করা মেয়ের সঙ্গে মেইলম্যানের মনের মিলই হচ্ছে আসল মেলবন্ধন। কিন্তু মেয়েরা নির্বিকার। কালো ছেলে নিশ্চয় পছন্দ তাদের, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় তাদের উপযুক্ত হওয়া চাই। নয়তো বিয়ে করার প্রশ্ন ওঠে না।

আবার এমনও দেখা যায়, অনেক কালো পুরুষই প্রফেশনাল কালো মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী নন। এখানে হীনম্মন্যতার মতো এবং ঈর্ষার মতো কিছু অনুভূতি কাজ করে। কালো মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, বড় চাকরি, জীবনযাত্রার উন্নত মান এঁদের ঠিক স্বস্তি দেয় না। বিদ্রূপ করে বলেন—মহিলার নিজের অ্যাপার্টমেন্ট আছে। নতুন গাড়ি চড়েন! জামাকাপড়ের কী বাহার! কোম্পানি থেকে কত বেনিফিট! ও সব বড় বড় ব্যাপার...

অর্থাৎ মন থেকে ঠিক বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। মেয়েমানুষের এত বাড়বাড়ন্ত সহ্য হয় না। বিয়ে করলে হুকুম তামিল করতে করতে প্রাণ যাবে।

প্রফেশনাল কালো মেয়েদের জীবনসঙ্গী খুঁজে নেওয়া সহজ হচ্ছে না। বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা বোধ করছেন। এক সময় এঁদের মায়েরা ঘরে, বাইরে

সংগ্রাম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বলতেন—যে মেয়েদের জীবনে কিছু হয় না, তারাই বিয়ে করে মরে।

আর এ যুগে বিদুষী, সুপ্রষ্ঠিত কন্যা বলছেন—যে জীবনে অনেক কিছুই হয়, অথচ সুখ, দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মতো মানুষ আসে না, এই সাফল্য, যত কিছু অর্জনের অভিজ্ঞতা, ভালবাসার মানুষ আর সন্তানের অভাবে সবই যেন অর্থহীন মনে হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

মাতৃভক্ত মার্কিন যুবক

মাতা কয় প্রকার? হিসেব করে দেখছি আমেরিকানদের চেয়ে বাঙালিদের কয়েকজন মা বেশি হয়ে গেছে। মেরিমাতাকে যদি জগন্মাতা বলে ধরি, তাও ওদের মায়ের সংখ্যা কম পড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি মহিলা গুরুজনকে আন্ট নয়তো নাম ধরে ডাকলে আর মায়ের শর্টেজ হবে না? তা সত্ত্বেও কিন্তু গর্ভধারিণী, ধর্মমাতা, বিমাতা, দেশজননী ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে দুই দেশেই মায়ের ভ্যারাইটি আছে বেশ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকে এবারের লেখায় কোন মাকে স্মরণ করি? আর কাকে? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সেই একজনকেই তো ধরাছোঁয়া যায়। নিজেদের তাবৎ সমস্যার ভারে উদব্যস্ত করা যায়। আজীবন শুধু উৎকণ্ঠার অনুপান পান করিয়ে নিদানকালে 'আহা! বটবৃক্ষ ছিলেন! সংসারের মেরুদণ্ড ছিলেন...।' পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণের স্টাইলে, 'ধৈর্যশ্রী', 'সেবাভূষণ', 'সহ্যবিভূষণ' নয়তো 'ঝাঁসির রানি' টাইটেল দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় অদৃশ্য নেমপ্লেট।

এদেশে আমেরিকান যুবকরা কী বলেন? দেখছি ইদানীং মাতৃভক্ত মার্কিন যুবকের সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেছে। তাঁরা যেন দলে দলে মায়েদের শরণ নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। রবার্ট নামে চব্বিশ বছরের একটি ছেলে বছর তিনেক আগে কলেজ গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। তারপর থেকে সেই যে হস্টেল পর্ব সমাধা করে বাড়িতে এসেছে, আর মাতৃমন্দির ত্যাগের লক্ষণ নেই। মা ক্যারল ওলিস ভেবেই পাচ্ছেন না অত বড় দামড়া ছেলে কেন আলাদা থাকছে না। রবার্টের ওপরে আরও ছয় ভাইবোন আছে। তারা কিন্তু কেউ এত দিন ধরে মায়ের সঙ্গে থাকেনি। কলেজ থেকে পাস করে বাড়িতে ফিরেছিল ঠিকই। কিন্তু চাকরি বাকরি পেয়ে মাস কয়েকের মধ্যে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেছে। চারজন বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

শুধু বিয়ে করেনি। প্রত্যেকে আলাদা, আলাদা থাকে। মা ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কি বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে মুভ করতে চাও? ছেলের উত্তর—আমার সব বন্ধুরা বাবা-মার সঙ্গে থাকে।

সারা আমেরিকায় এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ এমন নয় যে এরা আর্থিক কারণে বাবা-মার ওপর নির্ভরশীল। প্রফেশনাল ডিগ্রি আছে, ভাল চাকরি করছে,

পছন্দমত বান্ধবী আছে, তবু আলাদা থাকার ইচ্ছে নেই।

সেই স্কুলে পড়ার বয়সের মতো মায়ের রেফ্রিজারেটর খুলে ইচ্ছেমতো খাবার বের করে খাচ্ছে। আজ এই পদ চাই। কাল ওই কেক খাওয়ার শখ। আবার সেই খোকা খোকা ভাব। অবশ্য ডিসিপ্লিনের ব্যাপারেও উদাসীন নয়। পার্টিতে গিয়ে মাঝ রাত পর্যন্ত হল্লা করার আগে পরস্পরকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—মাকে ফোন করে দাও। বলো ফিরতে রাত হবে। শুয়ে পড়েন যেন।

আমেরিকান যুবকদের এমন 'মায়ের খোকা' সুলভ হাবভাব দেখে তাদের বান্ধবীরা, এমনকি বোনেরাও চোখ কপালে তুলছে। কারণ তারা এখন অনেক বেশি স্বনির্ভর। কুড়ি, বাইশ বছর আগে বরং ব্যাপারটি সমান সমান ছিল। যে সব ছেলেরা আর মেয়েরা কুড়ির কোঠায় পৌঁছে অন্তত কয়েক বছরও বাড়িতে থাকত, তাদের সংখ্যার হার ছিল সমান। অর্থাৎ শতকরা চল্লিশভাগ যুবক এবং শতকরা চল্লিশভাগ যুবতী বাবা-মায়ের সংসারে থাকত। আর এখন কুড়ির ওপরে যাদের বয়স, সেইসব ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ নিজেদের বাড়িতে থাকতে চলে আসে। কলেজের ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত হস্টেলে থাকার পর আবার বাবা-মা'র সংসারে ফিরে আসে। সে তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ ওই বয়সী মেয়ে বাড়িতে থাকে। পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এই তারতম্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

কুড়ির ওপরে পৌঁছনো এই যুবকদের অনেকের মধ্যেই প্রেম ভালবাসার বিষয়টি গৌণ হয়ে থাকছে। কয়েক বছর আগেও এই বয়সী ছেলেদের মধ্যে বান্ধবী খুঁজে নেওয়া আর নিয়মিত মেলামেশার ব্যাপারটি একান্ত স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ক্রমশ তাদের জীবনযাত্রার ধরন বদলে যাচ্ছে। এরা কেউ কেউ বেশ হিসেব করে চলছে। শন ম্যাকডারমট-এর বয়স চব্বিশ বছর। নিজেদের বাড়িতে থাকে। সন্ধেবেলায় বারে, রেস্তোরাঁয় গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় তার যথেষ্ট উৎসাহ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পছন্দমত বান্ধবী নির্বাচন, তাকে বাড়িতে আসতে বলা কিংবা কোনও সম্পর্ক গড়ে তোলায় তার আগ্রহ নেই। প্রেম ট্রেম নিয়ে সে ভাবেই না। স্কট টেনেরির বয়স সাতাশ বছর। সেও কলেজের পড়া শেষ করে কয়েক বছর আগে বাড়িতে ফিরে এসেছে। নিজের পুরনো ঘরখানা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। ইচ্ছে করলে বাড়িতে বন্ধু বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করে আনতে পারে। কিন্তু স্কটের সেরকম ইচ্ছেই হয় না। কারণ বাড়িতে সে মায়ের সঙ্গে খোকা হয়ে থাকতে চায়। মায়ের সংসারে বান্ধবী নিয়ে এসে সময় কাটানো নাকি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার হয় না। সে সব একার অ্যাপার্টমেন্টে মানায়।

কিন্তু কেন এরা বাড়িতে থাকাই সুবিধেজনক মনে করছে? মার্কিন সমাজে প্রতিপালিত হয়ে, বয়সোচিত উদ্দামতা বিসর্জন দিয়ে খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন? এর প্রধান কারণ—কাজের ভয়। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে থাকা মানে প্রতিটি কাজ নিজে হাতে করতে হবে। ব্যাচেলরের বোঝা বইবে কে? মাসে মাসে বাড়ি ভাড়া দিয়ে ডলারের শ্রাদ্ধ! তার বদলে—মা আছেন আর আমি আছি, ভাবনা কি আছে আমার? মায়ের হাতে খাই, পরি, মা নিয়েছেন আমার ভার।

মা রেঁধে বেড়ে খাওয়াচ্ছেন, বাসন ধুয়ে দিচ্ছেন, জামা কাপড় কেচে দিচ্ছেন, ঘরদোর

গুছিয়ে রাখছেন, টেলিফোনের মেসেজ লিখে রাখছেন, অসুখে সেবা করছেন। বাবাও তো আর এতবড় ছেলেকে শাসন করতে পারেন না। সেদিক থেকে মহা সুবিধে হয়েছে। রাতে বাড়ি না ফিরলে 'যুবক'কে কেউ জ্ঞান দিতে আসে না। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে সব পরিবারে এমন অপার স্বাধীনতা নেই। বহু মার্কিন পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা বাড়িতে থাকলে এবং সে চাকরি করলেও এমন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পায় না। মাঝে মাঝেই তাকে বাবার নীতিগর্ভ বক্তৃতা আর মায়ের হককথা, অনুযোগ, অভিযোগ, শুনতে হয়। আশানুরূপ পরিণতি হচ্ছে না মনে করলে কন্যার প্রেম এবং প্রেমহীনতা দুই নিয়েই তাঁদের টেনশন। সাধে কি আর শতকরা ৩৫ ভাগের বেশি যুবতী পড়াশোনার শেষে বাড়িতে ফিরছে না? আমেরিকার মতো দেশ স্বাধীনতার ভগ্নাংশ নিয়ে কে বাঁচিতে চায়?

অথচ যুবকদের কাছে ঝামেলা বর্জিত জীবনই বেশি পছন্দের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। না হয়, একটু ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হচ্ছে, না হয় বন্ধু, বান্ধবীদের ডেকে এনে রাতভোর হই হুল্লোড় করা যাচ্ছে না, কিংবা রাতে বিশেষ বান্ধবীকে ঘরে আনা সম্ভব হচ্ছে না, তো কী এমন ক্ষতি হচ্ছে? এর নাম সামান্য ক্ষতি। তারচেয়ে বাবার বাড়ি ভারী মজা, বাড়ি ভাড়া নাই। যত খুশি চান করি, জলের ট্যাক্স নাই। কর্তব্যবোধে খাই। খরচ বাবদ মাসে মাসে সামান্য কিছু ধরে দিলেই যথেষ্ট। বাড়তি খরচ বলতে মায়ের জন্মদিনে এক গুচ্ছ লাল গোলাপ এনে বড়সড় একখানি চুম্বন! ব্যস! বুড়ি গলে জল! বুড়োকেই তখন বুড়ি আর 'খোকা' সহ ডিনার খেতে বাইরে যেতে হবে। খোকারা আশ্রয়চ্যুত হতে চায় না। মার আদর যত্ন কোথায় পাবে? রোজ রোজ ডিনারে ঘরে তৈরি স্যুপ্ থেকে স্যুফলে আর কে সাজিয়ে দেবে?

যা মনে হয়, আমেরিকান যুবকদের সাম্প্রতিক মাতৃভক্তির পেছনে আছে একজাতীয় নির্ভরশীলতা এবং অন্যত্র অবহেলিত হওয়ার চাপা ক্ষোভ। আসলে তো পুরুষমাত্রই চায় সেবা আর লাগাতার মায়া, মমতার সাপ্লাই। এদেশেও এ জন্যে এককালে তারা ছোট ছোট বউ নিয়ে আসত। নিজেরা হাইস্কুল পাস করে যেমনই চাকরি বাকরি পাক, বউ একটি পেয়ে যেত। সেই ছোট বউদের বেশি বিদ্যে, বুদ্ধি বিকাশের সময় হত না। তারা চাকরি করতে যেত না। সপ্তাহ শেষে ডলার রোজগার করে কনফিডেন্স লেভেল বাড়িয়ে ফেলত না। যেন শত শত সূর্যমুখী ফুল! শুধু স্বামী সূর্যের মুখপানে চেয়ে থাকা আর নিরন্তর আদর, যত্ন করে যাওয়া অর্থাৎ সংসার সর্বস্ব সেই বউদের দেহ, মন, প্রাণ পার্মানেন্টলি অধিকার করে স্বামীরা বড় সন্তুষ্ট থাকত।

কিন্তু সেদিন আর নেই। সূর্যমুখী কালচারের চাকা পাংচার হয়ে অচল অবস্থা! হাইস্কুল পাস করা মেয়েরা আঠারো বছর বয়সে বিয়ের কথা চিন্তাও করে না। হাইস্কুলে সুইট হার্ট যদি কেউ হয়ে থাকে, থাক। ধোপে টিকলে তখন দেখা যাবে। মেয়েরা লেখাপড়া শেষ করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, পৃথিবীর নানা দেশ দেখতে বেরবে, 'পিস কোরে' কাজ নিয়ে বাংলাদেশের কলেরা ক্যাম্পে সেবা করবে, নয়তো আফ্রিকার সোয়েজিল্যান্ডে গিয়ে ইস্কুলের টিচার হবে, কিংবা আত্ম অন্বেষণের জন্যে স্রেফ বোহেমিয়ান জীবনযাপন করেই ক'বছর পার করে দেবে, তবে না সংসার ধর্মের কথা বিবেচনা করবে?

ফলে যুবক যুবতীদের বিয়ের বয়স পিছিয়ে গেছে। বউনির্ভরশীল যুবকরা পড়েছে মহা

মুশকিলে। লিভ-টুগেদার করতে গেলেও অর্ধেক খাটুনি থেকে যাচ্ছে। ডিউটিতে ফাঁকি দিলে সঙ্গিনী আশ্চর্য চোখে চেয়ে থাকবে। তাকে দিয়ে পটিয়ে পাটিয়ে নিজের গন্ধওলা মোজা কাচানো অসম্ভব। এক বাঙালি মহিলা বলেছিলেন, দেশে থাকতে নাকি স্বামীর রুমাল আর আন্ডারওয়ার কাচার পবিত্র অধিকার নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে তাঁর রোজ হাতাহাতি হত। হাতাহাতি মানে ওই আর কি? খোকার ছাড়া গেঞ্জিখানা নিয়ে দু'পক্ষের টানাটানি। কে বা আগে সার্ফের জলে ডোবাবেন। যাইহোক, যে কথা বলছিলাম—লিভ টুগেদারের অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে, শুধু বিছানায় নয়, সর্বত্রই সহ অবস্থান। খোকা বান্ধবীর হাতে ভাল মন্দ খেতে চাইলে কাঁদতে কাঁদতে পেঁয়াজ কেটে দেওয়া থেকে ডিনারের শেষে অন্তত তিনখানা ইলেকট্রিক গ্যাজেট্ তাকে মেজে, ঘষে পরিষ্কার করে আবার যথাস্থানে তুলে রাখতে হবে। বিয়ের আগেই এত কাজ, বিয়ের পরে না জানি বউ কত লম্বা ফর্দ ধরিয়ে দেবে। বাচ্চা কাচ্চা হলে চাকুরে বউ কত দিক সামলাবে? ভালবাসার জন্যে আর ভালবাসা-র ভিত শক্তপোক্ত করার জন্যে মায়ের যুবক খোকাবাবু তখন রাতারাতি 'রাইচরণ'।

এইসব দেখে শুনেই বোধহয় ওই পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যুবক মায়ের শরণ নিয়েছে। নির্দায়, নির্ভার জীবন। বিয়ে না করা পর্যন্ত ঝঞ্ঝাট বাড়ানোর দরকার কী? তাছাড়া ছেলেদের বান্ধবী নিয়ে বাড়িতে আসা, রাত পর্যন্ত নিজের ঘরে তার সঙ্গে সময় কাটানো এ নিয়ে মায়েরা খুব বেশি আপত্তি করেন না। সুতরাং কোথাও যখন তেমন অসুবিধে নেই, বটতলায় শুয়ে বসে থাকাই ভাল।

মেয়েরা এ ধরনের প্রশ্রয় পাওয়ার কথা চিন্তাও করেন না। কারণ আমেরিকান সমাজে এখনও পারিবারিক কাঠামো যেভাবে বজায় রয়েছে, সেখানে বাবা-মার বাড়িতে থেকে কিছু ডিসিপ্লিন মানতেই হবে। ছেলে বা মেয়ে বাড়িতে গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড এনে অনেক রাত পর্যন্ত নিজের ঘরে কাটালে, অধিকাংশ অভিভাবকই বিরক্ত হন। সরাসরি জানিয়ে দেন—বাড়িতে এসব তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। ছেলেদের ক্ষেত্রে কোনও কোনও দুর্বলচিত্ত মা যদি বা বরদাস্ত করেন, মেয়েকে কিছুতেই বয়ফ্রেন্ড নিয়ে রাত পর্যন্ত আড্ডা দেওয়ার অনুমতি দেবেন না। বিশেষ করে ইতালিয়ান, গ্রিক, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ ও ল্যাটিন আমেরিকান পরিবারগুলিতে মেয়ের ব্যাপারে এই রক্ষণশীল মনোভাব এখনও বজায় আছে। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের আলাদা থাকার এই হচ্ছে প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়ত আমেরিকায় লেট নাইট এটিকেট জাতীয় একটি অলিখিত সামাজিক প্রথা আছে। প্রাপ্তবয়স্ক নারী, পুরুষ সান্ধ্য আড্ডার শেষে সকলেই কিন্তু বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয় না। রাত ঘনীভূত হলে নিজেরাও আরও ঘনীভূত হওয়ার আশায় একটি ঘর খোঁজে। সেক্ষেত্রে মেয়েটির অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে যাওয়াই রেওয়াজ। শোভনও বটে। আগ্রহ তো পুরুষেরই প্রকাশ করার কথা। মেয়েটি কেন আগ বাড়িয়ে বলতে যাবে—তোমার বাড়িতে রাত কাটানো যাক? দৃশ্যটি সচরাচর যা হয়—আড্ডার শেষে ছেলেটি মেয়েটিকে তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে এসে এক কাপ কফি খেয়ে যাওয়ার ছুতো করবে। ক্রমশ রাতের কফি থেকে ভোরের কফি খাইয়ে—হে বন্ধু বিদায়।

বহু আমেরিকান মেয়ের একার সংসারটিও বেশ পরিপাটি। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সাজানো, গোছানো বাড়িটিতে সে যেভাবে থাকে, তার দ্বিগুণ উপার্জন করলেও খোকাবাবু

তেমন ফিটফাট থাকতে পারে না। সুতরাং নিশিযাপনের জন্যে মেয়েটির অ্যাপার্টমেন্টই প্রশস্ত। ব্যাচেলরের অগোছালো রাজ্যপাটে, নয়তো তার মাতৃভবনে ঢুকে পড়ে আর যাই হোক, মায়াময় রাতটাত সৃষ্টি করা যায় না। মধ্যরাতে 'এক পেয়ালা কফি' নিয়ে রহস্য রোমাঞ্চ, ভোর রাতে 'এক মুঠো আকাশ' দেখার প্রসন্নতা থেকে বিদায়ের বিষণ্ণতা—পটভূমির অভাবেই ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক আর জমে ওঠে না। সারা রাত ধরে খোকাবাবুর বাবার অ্যাজমাজনিত দমফাটা কাসি, মায়ের ঘন ঘন টয়লেট ফ্ল্যাশ করার শব্দ, তাঁর প্রাতঃকালের কলকাকলি, কুকুর সোহাগ, বেড়াল সোহাগ—শুনে শুনে খোকার সোহাগিনী ফিসফিস করে বলে—'কাসির শব্দ, কুকুর, বেড়াল নিয়ে, বাসর রাত্রি-ই রচিবো না মোরা প্রিয়ে...।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ছেলেরা নিজেদের সুবিধেমত মায়ের আশ্রয়ে আর বান্ধবীর প্রশ্রয়ে দিব্যি আছে। যখন যে ঘরটি তার দরকার, ব্যবহার করছে। অবশ্য এরা বাবা-মায়ের সঙ্গে ও বেশ কিছু সময় কাটাচ্ছে। ওই যে রবার্ট নামে ছেলেটি, যার বন্ধুরাও নাকি বাবা, মার সঙ্গে থাকে, তাদের একটি দল আছে। এরা নিয়মিত ফুটবল গেম, সফটবল গেম দেখতে যায়। বিয়ার ফেস্টিভ্যালে যায়। প্রায়দিনই বাবা-মায়েরাও সঙ্গে যান।

ওই বয়সী যেসব ছেলে আলাদা থাকে, তাদের কাছে রবার্টরা বেশ কৌতূহলের পাত্র। একদল প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে কী করে মেয়েদের মতো মায়ের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরছে, তাদের সঙ্গে খেলার মাঠে বসে হল্লা করছে, ঘড়ির কাঁটা ধরে সন্ধে ছ'টার সময় ডিনার খাচ্ছে, লেট নাইট টি ভি শো দেখতে বসে বাবা-মার সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ছে—এরা ভেবেই পাচ্ছেন না।

রবার্টরা বলছে—আমরা মহানন্দে আছি। সাবালক হয়েছি কিনা প্রমাণ করার জন্যে আলাদা থাকার দরকার হয় না। মেয়েরা সেটাই প্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা দেখাতে চায়, তারা কত স্বনির্ভর। এ জন্যেই বাবা-মাকে ছেড়ে অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে সর্বক্ষণ খেটে মরছে। কী লাভ? বাড়িতে থাকার সুখ সুবিধে আমরা যা পাচ্ছি, ওরা তার মর্মই বুঝছে না। খালি আমাদের 'মায়ের খোকা' বলে বিদ্রূপ করছে। করুক গে। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা। অন্তত এ মুহূর্তে কখনই নয়।

খেয়াল করবেন, আমি যাঁদের সম্পর্কে লিখছি, তারা হচ্ছে ভগ্নাংশ মাত্র। আমেরিকায় কুড়ি থেকে তিরিশের নীচে যাদের বয়স সেইসব যুবকদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ আপাতত বাবা-মায়ের সংসারে বাস করছে।

এদের মায়েরা কী বলছেন? দেখা যাচ্ছে, বহু ডিভোর্সি মা আছেন, যাঁদের সবদিক থেকেই সুবিধে হয়েছে। এক তো এঁদের নিঃসঙ্গ জীবনে ছেলে কাছে থাকাতে একাকিত্বের ভার অংশত লাঘব হয়েছে। তার ওপর বাইরের কাজে অনেক সাহায্য পাচ্ছেন। বাগানের ঘাস কাটা থেকে বাড়ির ছোটখাটো মেরামতের কাজ, যা কিনা স্বামী তাঁর ঘাড়ে ফেলে পালিয়েছেন, খোকাবাবুই করে দিচ্ছে। রবার্টের মা অবশ্য ডিভোর্সি নন। তাঁর স্বামী রীতিমত কাজের মানুষ। রবার্টকে তেমন কাজকর্ম করতে হয় না। কিন্তু একটি কাজ করেই সে মাকে খুশি রাখে। সে হচ্ছে অনবরত হাসিয়ে যাওয়া। তাঁর এই কোলের ছেলেটি মহারসিক। মাকে সারাক্ষণ হাসিয়ে হাসিয়ে আনন্দে রেখেছে। মাসে মাত্র একশো ডলার করে মাকে

নিজের খরচ হিসেবে দেয়। রবার্টের বাবার মতে—আমরা ওকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছি। নিজের মতো আছে। আমরাও শান্তিতেই আছি।

মেরিলন বলডাস্যানোর ছেলে ড্যানির বয়সও চব্বিশ বছর। মার সঙ্গে থাকে। স্টিল-স্ক্রু তৈরি করে এরকম একটি কোম্পানিতে তার সেলসম্যানের চাকরি। বছরে মাইনে পায় তিরিশ হাজার ডলার। ইচ্ছে করলেই আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সামান্য স্বাধীনতাহীনতার পরিবর্তে সে স্নেহময়ী মা'র কাছে যা আদর যত্ন পাচ্ছে, সে আর কোথাও পাবে না। বান্ধবী ট্রিশ্ কখনও ভাবতে পারবে, মা রাত একটার সময় উঠে খোকার খিদে পেয়েছে বলে রাঁধতে বসেছেন। কোনও পদ দু'বার চেয়ে খেলে মা যত খুশি হন, অন্য কেউ হবে সেরকম? মেয়েরা তো আজকাল লেফট ওভার বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু মায়েরা রোজ রোজ রাঁধতে ভালবাসেন। এইসব অপূর্ব তথ্য আবিষ্কার করে ড্যানি আপাতত মার কাছেই থানা গেড়ে বসেছে। আলাদা থাকতে হলে বাড়ি ভাড়া দিয়ে আর এত নবাবি করা যেত না। সপ্তাহ চারদিন সন্ধেবেলা 'পাব'-এ গিয়ে মদ্যপান করছে। যখন তখন ৩৫ ডলার দিয়ে কনসার্টের টিকিট কেটে গান বাজনা শুনতে যাচ্ছে। বছরে হাজার ডলার খরচ করে শুধু অ্যাটলান্টিক সিটিতে। ক্যাসিনোতে জুয়ো খেলার জন্যে বন্ধুরা প্রায়ই নাচায় তো! ড্যানির আরও কত শখ আছে, যা আলাদা থাকলে আর মেটাতে পারত না। মায়ের দয়ায় কী না করতে পারছে?

মস্ত গাড়ি নতুন বাড়ি করার জন্যেও মায়ের আশ্রয় সবচেয়ে দরকারি। বার্নি নামে আটাশ বছরের এক যুবক বেশ বড় চাকরি করে। ছ'বছর আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে থাকার পর বুঝে গেল কেন তার বন্ধুরা দলে দলে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। কারণ সঞ্চয় বলে কিছু থাকছে না। এদিকে পন্টিয়্যাক ফায়ারবার্ড গাড়িটা বিক্রি করে বার্নির ভীষণ ইচ্ছে যে সে একখানা কনভার্টিবল জিপ চেরোকি গাড়ি কেনে। কিন্তু এতরকম খরচ বেড়ে গেলে ভবিষ্যতের জন্যে তো কিছু জমানো যাবে না। সব দিক ভেবে সে এখন মার কাছে চলে এসেছে। মা যে কত খুশি হয়েছেন, সে তো বোঝাই গেছে। তার বালিশের তলায় চকলেট পেয়েছে দু'দিন। একগাদা চিনি মাখানো রঙিন সিরিয়ালের বাক্স, যা কিনা বার্নি ছোটবেলার পর আর চোখেই দেখেনি, দাঁতে পোকা হবে বলে মা আর আনতেন না, এখন সেই ড্র্যাকুলা সিরিয়ালও কিনে আনছেন।

প্যাট্রিক নামে ছাব্বিশ বছরের একটি ছেলে এখন নিজের বাড়ি কেনার তালে আছে। তিরিশ বছর বয়সের আগে নাকি মার বাড়ি ছেড়ে নড়বে না। তার দাদাও আছে ওই বাড়িতে। তার বয়স তিরিশ। দু'জনে নিজ নিজ বাটির ডাউন পেমেন্টের ডলার জমিয়ে তারপর মাকে ছেড়ে যাবে। এদের মাতৃভক্তি আর বিষয় বুদ্ধি দুয়ের মধ্যেই বেশ ভার[illegible] লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ওদিকে যুবতীরা বৈষয়িক চিন্তার বদলে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অর্জনে ব্যস্ত। শহরতলিতে বাবা, মায়ের মস্ত বাড়ি। যাবতীয় আরামের উপকরণ ছেড়ে তারা বড় বড় শহরের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে একটি, দুটি মেয়ের সঙ্গে থাকছে। আরশোলা, ইঁদুর যারা কস্মিনকালে চোখে দেখেনি, তারা স্বাধীনতার জন্যে এদেরও বরদাস্ত করতে প্রস্তুত। এরা কন্যাসন্তানদের ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দিতে আসে না। ইঁদুর চোখ কুঁচকে বলে না—মাঝরাত অবধি

কোথায় ছিলে? আরশোলা গজর গজর করে বলে না—টোনি যদি তোমার বয়ফ্রেন্ড হয়, তো এরিকের সঙ্গে মুভিতে যাওয়ার কী আছে?

শহরতলির হিসেবি যুবক কাজে অকাজে মহানগরে যায়। বান্ধবীদের পায়রার খোপে ঢুকে অবাক হয়ে ভাবে, এরা সাধ করে এমন বাড়িতে থাকে? স্টিরিও সেট বাড়িতে ফেলে রেখে জানলার পাশে পোর্টেবল সি ডি প্লেয়ার। রান্নাঘরের কাউন্টার স্পেসে তিল ধারনের জায়গা নেই। ইস্ত্রি করতে হলে খাওয়ার টেবিল খালি করতে হয়। তবু এখানেই স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি। শহুরে ইঁদুর আর মেঠো ইঁদুরের গল্পের উপসংহার বদলে গেছে। বদলে গেছে খাঁচার পাখি আর বনের পাখির চরিত্র। বনের পাখি সাধ করে খাঁচায় ফিরে গেছে। খাঁচার পাখি জন-অরণ্যে।

তবু তাদের দেখাশোনা হয়। মেয়েটি আশা করে ছেলেটি আলাদা সংসার করবে, সেখানে তার ডাক পড়বে। ছেলেটি বলে—এখন নয়, কবে, কখন কিছুই বলা যাবে না। রবার্টের সঙ্গে তার গার্লফ্রেন্ডের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে। নিউ ইয়র্কের রেস্তোরাঁয় কাজ করে ডনা নিউবার্খার। নিউ জার্সির বাড়ি ছেড়ে সে ম্যানহাটনে অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে আছে। মাঝে মাঝে উৎসাহী যুবকদের কাছে ডেটের আমন্ত্রণ পায়। সকলকেই তো আর পছন্দ হয় না। দেখে শুনে যাকে ভাল লাগল ডনা তাকে জিজ্ঞেস করল—নিউ ইয়র্কে থাকো নিশ্চয়ই?—নাঃ মার সঙ্গে থাকি, শহরতলি অঞ্চলে। ডনা জানে, এরা অদূর ভবিষ্যতে আলাদা বাড়ি নেবে না। শখের মার্সেডিজ কেনার জন্যে ডলার জমাবে, একা একা দেশ বেড়াবে, মাঝে মাঝে সন্ধেবেলায় ডনার সঙ্গ চাইবে, ডনার অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটিয়ে যাবে, হয়তো কোনওদিনই নিজের শহরতলির বাড়িতে নিয়ে যাবে না। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে বলবে—ইট্‌স টু আর্লি টু টেক্ এ ডিসিশন। ডনা তাই খোকাবাবুর ডাকে সাড়া দেয়নি।

কিন্তু লেখা তো শুরু হয়েছিল মাকে নিয়ে। ডনার দুঃখ নিয়ে শেষ করলে চলবে কেন? ছেলের জীবনে মায়ের ভূমিকা কিছু কম? তারা যদি যৌবনকালে মায়ের সংসারেই থাকে, সমালোচনা করার উপযুক্ত পয়েন্টই তো পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, খরচ বাঁচানোর জন্যে থাকে বললে ভারী বিশ্রী শোনাচ্ছে ঠিক কথাই। সেবা, যত্ন পাওয়ার জন্যে থাকে বললেও খুব একটা নিঃস্বার্থ বসবাস বলা যায় না। সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যে? হ্যাঁ, সে ঘটনাও দেখছি। ডিভোর্সের পর কাচ্চাবাচ্চা সমেত বউ বাড়িটা দখল করে নিল, স্বামী সুটকেস বগলে আবার সেই বুড়ি মা'র কাছে। অবশ্য নিজের প্রেমিকা থাকলে অন্য কথা। কিন্তু বুড়ির দরজা সর্বদাই খোলা। আমার পরিচিত মিসেস শিলেনের পাঁচটি ছেলে মেয়ে। কয়েক বছর আগে উনিশ বছরের মেয়ে সিভিয়র ডিপ্রেশন থেকে আত্মহত্যা করেছে। মেজো মেয়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে কলেজে পড়ায়, একাই থাকে। শুধু মন খারাপ হলে মার কাছে আসে। এবং প্রায়শই তার মন খারাপ থাকে। ছেলের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে আট বছর বাদে। বউ তার বাচ্চাদের নিয়ে স্বামীর বাড়িতে। ছেলে মিসেস শিলেনের কাছে। বাচ্চাদের কাস্টডি পাবে না বুঝে ছেলেরও মন মেজাজ খারাপ। মিসেস শিলেনের ছোট মেয়ে ওয়েন্ডি আমাকে বলে—আমার মা আর কতজনকে সান্ত্বনা দেবে? এখনও দিদির সুইসাইডের তারিখ এলে গ্রেভ ইয়ার্ডে গিয়ে বসে থাকে। বাড়িতে একটার পর একটা অশান্তি চলেছে। মা যে কেন ভেঙে পড়েনি...। মিসেস শিলেনের শান্ত মুখখানা দেখে সেইসব মায়েদের মনে পড়ে, যাঁরা

নিজেদের শহর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে সহজে কোথাও যেতে চান না। কেউ যদি এসে ফিরে যায়? সুখে, দুঃখে অবিচল মহাবোধিবৃক্ষ। কয়েকটি সন্তানের জননী। শাখা প্রশাখা বিস্তারিত জীবন। কার কখন তাঁকে মনে পড়বে, বড় বেশি প্রয়োজন হবে, কে বলতে পারে? জীবনভর শুধু কড়া নাড়ার অপেক্ষা আর বারেবারে দরজা খুলে দেওয়া।

২৯ অক্টোবর ১৯৯৪

বিশেষ রূপে বহন

বিবাহ শব্দের অর্থ বিশেষ রূপে বহন কেন হবে—এ নিয়ে এমন তর্কাতর্কি হয়েছে যে আর বেশি কথা বাড়াতে চাই না। কিন্তু কে কাকে বহন করে? এই "হযবরল" মার্কা দুনিয়ায় শাড়ি পরা উধো আর পাতলুন পরা বুধো পরস্পরের পোঁটলা ঘাড়ে আজ লাফাতে লাফাতে, কাল হোঁচট খেতে খেতে চলেছে। আবার মাঝে মাঝে গানও গাইছে! তুমি যতো ভার দিয়েছ সে ভার...

আসলে ওই "বিশেষ" কথাটা খুব এনার্জি দেয়। বেশ দামি কথা তো। উধো, বুধো কখনই নিজেদের অস্তিত্বকে অন্যের বোঝা বলে মনে করছে না। সমাদরে বহনযোগ্য মহার্ঘ কিছু ভেবেছে নির্ঘাৎ!

উধো বুধোর কথা থাক। এখন আমি দৃশ্যমান বোঝা আর তার বাহকদের কথা লিখব। সে বহনের পরিণতিও যে কী মধুর হতে পারে, এ মধুমাসে সেই সব কাহিনী শোনাব। পয়লা নম্বর প্রেমকথার নাম দেওয়া যাক—"তুমি ডাক দিয়েছ"। স্থান ভার্জিনিয়া। সাল পঁচাত্তর। পাত্র পাত্রী দুই বাঙালি ও একটি সাহেব।

বরের নাম অনিরুদ্ধ। বউয়ের নাম মাস্তু। তার ভাল নাম কেউ শোনেনি। অনিরুদ্ধ হাসপাতালে রেসিডেন্সি করে। ওই সময় ডাক্তারদের যেমন রুটিন, উদয়াস্ত ডিউটি আর পড়াশোনার চাপ। অনিরুদ্ধ খুবই ব্যস্ত থাকে। মাস্তুরও দুটি ছোট ছেলে নিয়ে সাংসারিক চাপ কিছু কম নয়। কিন্তু তার কাছে সংসার ব্যাপারটাই ভীষণ একঘেয়ে। ছেলে দুটোর স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি। নার্সারিতে ভর্তি করতে হলেও রোজ যাতায়াতের ঝামেলা আছে। মাস্তুর পক্ষে সেটাও কষ্টকর। তো মাস্তু বেশ একটা অনন্ত শয্যার আয়োজন করে নিয়েছিল। সারাদিন শুধু শুয়ে শুয়ে ইনসট্রাকশন। জঠর জ্বালা এমনিই জিনিস, তার পুচকে ছেলে দুটো স্বাবলম্বী হয়ে গেল। ডাক্তার বাবা সকালে তাদের দুধ, সিরিয়াল ধরিয়ে দিয়ে যায়। মা তখনও মগন গহন ঘুমের ঘোরে। ছেলেরা টি. ভি.-র কার্টুন শো দিয়ে দিন শুরু করে। দুধ সিরিয়াল শেষ করে। তারপর বিস্কুট, চকোলেট, পটেটো চিপস, ডোনাট, ব্রাউনি, আবার এক বাটি শুকনো সিরিয়াল, ঘন ঘন কোক, সেভেন-আপ, পুরনো আইসক্রিম, ফ্রিজ হাতড়ে হ্যাম, চিজ—সুবোধ বালক দ্বয় যাহা পায় তাহাই খায়। কারণ বেলা বারোটা একটা পর্যন্ত মাস্তু শয়নে পদ্মনাভঞ্চ...।

মাস্তরও অবশ্যই একটা রুটিন থাকে। ওই বেলা একটা নাগাদ তাকে আধো ঘুমে একবার ডাক বাক্স দেখতে যেতে হয়। কারণ মেইল্-অর্ডারে সে নানা শৌখিন জিনিস আনায়। প্রায়দিনই মেইল ম্যান তার সই নেওয়ার জন্যে ডোর বেল বাজায়। তারপর দুপুর থেকে টি.ভি.-তে সোপ অপেরা শুরু হয় বলে মাস্তর একটু তাড়া থাকে। বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত সেইসব মেলোড্রামা দেখে মাস্তর খেয়াল হয় ছেলে দুটোকে আর্লি ডিনার করিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যে তারা নিজেরাই বাথটবে ঝুড়, ঝাঁপাই করে চান সেরে নিয়েছে। সারা বাথরুমে স্নানযাত্রার রেসিডিউ। আড়াই বছর আর চার বছরের দুটি শিশু পেটমোটা টুথপেস্ট, বার-সোপ, লিকুইড সোপ, শ্যাম্পু বাবল বাথ, মাস্তর বডি জেল, হেয়ার কন্ডিশনার, হেয়ার রিমুভার, অনিরুদ্ধর শেভিং ফোম, আফটার শেভ, ডিওডোরেন্ট, টয়লেট টিস্যুর প্রভূত সাপ্লাই ইত্যাদি নাগালে পেলে যা যা করে আর কি! একদিন শুধু কমোডের ঢাকনি বন্ধ করে তার ওপর দাঁড়িয়ে মেডিসিন ক্যাবিনেট খুলতে গিয়ে মাস্তর কাছে চড় খেয়েছিল বড়টা। তারপর থেকে অনিরুদ্ধ সব ওষুধপত্র লুকিয়ে রাখে।

সন্ধের মুখে ছেলেদের আর্লি ডিনার দিয়ে দেয় মাস্ত। হয় স্যান্ডউইচ, নয় ফ্রোজেন্ ফ্রায়েড চিকেন্, নয়তো কেনা মিটবল স্প্যাগেটি-সস দিয়ে এক প্লেট স্প্যাগেটি ধরিয়ে দেয়। খুব বায়না ধরলে ফোন করে পিৎজা আনিয়ে নেয়। বাড়ির রান্না করা খাবার দাবার আর খাওয়া হয় না ওদের। কারণ মাস্ত তখনও কিছু বানিয়ে উঠতে পারে না। অনিরুদ্ধ যখন ফিরে আসে, তখন মাস্ত সবে রান্নার তোড়জোড় করছে। পঁচাত্তর সালে রান্নাঘরে মাইক্রো-ওয়েভ ওভেন ছিল না। ফ্রোজেন মুরগিকে বরফ মুক্ত করার জন্যে কম সে কম কয়েক ঘণ্টা সময় লাগত। রান্না করা ঠাণ্ডা খাবার গরম করতেও সাধারণ ওভেনে সময় লাগবে অন্তত কুড়ি মিনিট। তো, মাস্তর তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা থেকে রান্না ঘরে হুড়োহুড়ি এবং নিয়মিত দায়সারা গোছের খাওয়া দাওয়া। দিনান্তে একবার আহার, তারও ওই মেড্-ইজি-ফর্মুলা দেখতে দেখতে আর রোজ সিংক ভর্তি বাসন মাজতে মাজতে অনিরুদ্ধ রেগে যেত। ছেলেদের অযত্ন, অ্যাপার্টমেন্টের অগোছালো অবস্থা। মাস্ত সপ্তাহে সপ্তাহে লন্ড্রি করতে চাইবে না, গাড়ি চালানো শিখেও সহজে কোনও বাইরের কাজ সারতে যাবে না—এই নিয়ে অনিরুদ্ধর সঙ্গে মাঝে মাঝেই ঝগড়া। মাস্তর সাফ জবাব—এসব করতে ভাল লাগে না। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা টিকল না। অনিরুদ্ধই ডিভোর্স নিল। ছেলে দুটোকে মাস্ত নেয়নি। অনিরুদ্ধ কাস্টডি পেয়েছিল। প্রথম বছর দুই তার মা এসে সামাল দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে সামারে ওরা অনিরুদ্ধর দিদির কাছে বস্টনে গিয়েও থাকত। পরে অনিরুদ্ধ একজন মহারাষ্ট্রীয় মাইক্রোবায়োলজিস্টকে বিয়ে করেছে। ছেলেরা বরাবর ওদের সঙ্গেই আছে। এখন ওরা থাকে মিশিগানে।

মাস্তর যে কী ভাল লাগত, সে কথা জেনে নিয়েই অবশ্য অনিরুদ্ধ বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মাস্তর একঘেয়ে জীবনে তার ডাক্তার স্বামী যে বৈচিত্র্যের সন্ধান দিতে পারেনি, সেই বৈচিত্র্য নিয়ে এল আমেরিকার ডাকওলা। মেইল্ ম্যানের নাম পিটার। ওই যে অবেলায় ঘুম চোখে মাস্ত মেইল দেখতে বাইরে যেত, তখন থেকেই পিটারকে তার পছন্দ। প্রথম প্রথম রূপবান ডাক-হরকরার সঙ্গে একটু আধটু মশকরা। ক্রমশ মাস্ত এমনই আকর্ষণ বোধ করতে লাগল যে তুচ্ছ সংসার ফেলে দিয়ে ডাকওলাকেই ডাক দিল। পরস্পরকে

ডাক দিতে দিতে যা হয় আর কি? পিটার ভাল গিটার বাজায়। মাস্তুর সঙ্গে গুরু পাঞ্জাবি পরে ভার্জিনিয়ার দুর্গাপুজোয় যায়। বাঙালিরা বলে—পাতি সাহেব। মাস্তুকে সে বিশেষরূপে বহন করছে বলেই মনে হয়। কারণ একবার নিউ ইয়ার্স পার্টিতে এক ফুট বরফ পড়েছিল বলে পিটার মাস্তুকে হাঁটতে দেয়নি। অন্য বাঙালি বউরা যখন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটি হাঁটি, পা পা করে পার্কিং লট ধরে চলেছে, পিটার তখন নিজের ভ্যানখানা হলের দোর গোড়ায় নিয়ে এল। এবং মাস্তু তার কণ্ঠলগ্না হয়ে ভ্যানে পৌঁছে গেল। পত্রবাহক থেকে কলত্র বাহক। এই সমাদরের জন্যেই মাস্তুর হরকরার সঙ্গে ঘরকরা। অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে যাওয়া। ডাক্তার তাকে সেই ডাক দিতেই পারেনি।

এবার দু'নম্বর 'প্রেমকাহিনী'। এবারও নায়ক সেই বাহক। সে "ইউনাইটেড পার্সেল সার্ভিস" সংক্ষেপে ইউ. পি. এস-এ কাজ করে। নাম ডেভ হিল। ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। প্রফেশন্যাল রানার লিন জেনিংস যে সব সময় স্নিকার বা রানিং শ্যু পরবে, এ আর নতুন কথা কী? নাইকি স্নিকার কোম্পানিতে মাঝে মাঝেই সে জুতোর অর্ডার পাঠায়। কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন জুতোর অর্ডার? রানারের রানিং-এরও একটা সীমা আছে তো? আবার প্রত্যেক সপ্তাহেই নাকি ইউ.পি.এস-এ জুতো পাঠাতে হবে। নাইকি কোম্পানির কেমন সন্দেহ হয়েছিল। মহিলা এত জোড়া স্নিকার নিয়ে করছে কী?

পরে জানা গেল জুতোর জন্যে নয়, ইউ.পি.এস-এর ডেভ হিলকে সপ্তাহে সপ্তাহে দেখার জন্যে লিন জেনিংস ওই কৌশল করেছিল। তখন নাকি ডেভকে অভিনেতা কেভিন কসনারের মতো দেখতে ছিল। ইউ. পি. এস-এর খয়েরি পোশাক পরে যেই না জুতোর বাক্স হাতে লিনের দরজায় এসে দাঁড়াত, লিন একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত। প্রত্যেক সপ্তাহে জুতোর অর্ডার দিয়েই প্রতীক্ষা। কে দিল আবার আঘাত আমারই দুয়ারে...

ক্রমশ অতিথি আর অচেনা থাকল না। চার চারটে বসন্তকাল কেটে গেল। লিনের ঘরবাড়ি জুতোর বাক্সে ছেয়ে গেল। শুধু জুতো নয়, ইউ. পি. এস. ওই পাড়ায় আর যা যা ডেলিভারি দেয়, তার অনেক মাল লিনের গ্যারেজে ধূলিমলিন হয়ে পড়ে থাকল। তারপর লিন জেনিংস "দেবলীনা" হল। ডেভ-এর সঙ্গে তার বিয়ের পর এখন পার্সেল আসা বন্ধ হয়েছে।

এরকম ঘটনা আরও ঘটেছে। ইউনিফর্ম পরা পুরুষ মেয়েদের অনেককেই নাকি ভারী আকর্ষণ করে। হালকা খয়েরি পোশাক পরা, নম্র, ভদ্র মালবাহক ট্রাক চালিয়ে আসছে, মস্ত প্যাকেট পৌঁছে, খাতা সই করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এই ক্ষণিকের দেখাশোনাতেই দারুণ এক ইমপ্রেশন রেখে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কিছু বইয়ে, নাটকে, টি. ভি. সিরিজে আর রক মিউজিকে এদের নিয়ে মেয়েদের অনুরাগের কথা লেখা হয়েছে। "বয়েজ্ অন্য দ্য সাইড" ছবিতে ইউ. পি. এস-এর লোক ছাড়াও ইউনিফর্ম পরা পুরুষের বিশেষ যৌন আবেদনের কথা আছে। ক্যালিফোর্নিয়ার পপ গ্রুপ "ববস" কিছুদিন আগে "ড্রাইভ বাই লাভ" গান রেকর্ড করেছে। গানের বিষয় হচ্ছে—ইউ. পি. এস. ড্রাইভারের প্রতি একটি ছবির দোকানের কেরানির প্রেম। মেয়েটি বলছে—"আই ক্যান্ট গেট দ্যাট ড্রাইভার আউট অফ মাই হেড। হি হক্কস হিজ হর্ন অ্যান্ড মাই ফেস টার্ন রেড।"

বোঝো ব্যাপারখানা! ট্রাকের হর্ন শুনেই কর্ণ খাড়া। স্বর্ণকেশীর বর্ণ বিলিতি আমড়া।

ইউ. পি. এস সব খবরই রাখে আর বেশ মজাও পায়। অ্যাটলান্টায় ওই কোম্পানির হেড অফিস। কত কোম্পানি তাদের অনুরোধ করেছে ডেলিভারি ম্যানদের ছবি দিয়ে ক্যালেন্ডার করতে চায় বলে। কিন্তু "ইউনাইটেড পার্সেল সার্ভিস অফ আমেরিকা" রাজি হয় না। তাদের ডেলিভারি ম্যানদের মধ্যে ৯৩%-ই হচ্ছে পুরুষ। ইউ. পি. এস এদের কাউকে অন্য কোম্পানির ক্যালেন্ডারের ছবি হতে দেয় না বটে, কিন্তু নিজেদের বিজ্ঞাপনের জন্যে ঠিকই ব্যবহার করে। টি. ভি. কমার্শিয়ালে দেখায় কয়েকজন পদস্থ মহিলা "বব" নামে এক ইউ. পি. এস বাহককে নিয়ে কত উচ্ছ্বসিত সংলাপ বলছেন। এক মহিলা চোখ ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে বলছেন—"টল, ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম..."। দ্বিতীয় জনও ভাবে বিভোর..."হি হ্যাজ গট ব্রাউন আইজ..."। তৃতীয় জন ফিশফিশ করে কবুল করছেন—"আই থিংক আই হ্যাভ আ ক্রাশ অন হিম।" আহা! মরিবো মরিবো সখী নিশ্চয়ই মরিবো...। শুধু, বাহন এখন তাঁকে বহন করলেই হয়।

ইউ. পি. এস কোম্পানি রমণীর মন বেশ বুঝে গেছে। কোম্পানির ফোন নম্বর শুনুন একবার! "১-৮০০-পিক্-আপস"। বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ না? ঘুরে ফিরে সেই বহনের আভাস। কিন্তু বাহকদের নায়ক হওয়ার জন্যে কী ধরনের আবেদন থাকা দরকার? প্রথম হচ্ছে সুঠাম দেহ আর মজবুত স্বাস্থ্য। কারণ দিনে দুশো খানারও বেশি মাল বইতে হবে। নানা মাপের, নানা ওজনের বাক্স হাতে কত বাড়ির বাগান পার হয়ে রমণীর রুদ্ধ দ্বারে আঘাত হানতে হবে। কোথাও আছে সিঁড়ি ভাঙার অভিযান। আরোহী, অবরোহী, কড়ি, মধ্যম থেকে "কোমলে" পৌঁছনোর জন্যেই শীতে, গ্রী ্ম, বর্ষায়, বসন্তে বাহক ছুটেছে প্যাকেটের বোঝা হাতে...বাহক...বাহক...।

চেহারার পরেই হচ্ছে ব্যস্ততার আবেদন। হ্যাঁ, ব্যস্ত পুরুষের খুব ডিম্যান্ড। যে লোক আলস্য পরিহার করে সকাল থেকে ছুটে বেড়ায়, তার উদ্দীপনা মেয়েদের মনে অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বাহক তার সুস্বাস্থ্য আর সদা ব্যস্ততার জন্যেই নায়ক হতে পারে। এরপর আরও সুযোগ আছে। রোজ রোজ দেখা হওয়ার ইমপ্যাক্ট। এমন কিছু মহিলা আছেন, যাঁদের সারাদিনে একটি পুরুষের মুখ দেখার অবকাশ হয় না। অফিসের গুদাম ঘরে মালের হিসেব লেখেন। কিন্তু সেখানে তো বাহক যায়। ওয়্যার হাউসের নিষ্প্রাণ জগতে ইউ. পি. এস। কিংবা ফেডারেল এক্সপ্রেসের মালবাহী পুরুষই প্রাণসঞ্চার করে। একটু হাসি, একটু কথা ছড়িয়ে দেয়। এক গয়নার দোকানের শিপিং ম্যানেজার মিশেল রায়ানস বলেছেন—ইউ. পি. এস-এর লোকটিই আমার জীবনের প্রতিদিনের পুরুষ।

বাহক কোম্পানিদের মধ্যে আবার এই নিয়ে রেষারেষিও আছে। ফেডারেল এক্সপ্রেস ভেবেই পায় না কেন ইউ. পি. এস-এর ডেলিভারি ম্যানদের এত চাহিদা! তারা বলছে—আমাদের বাহকরা অনেক বেশি স্টাইল জানে। আমাদের ট্রাকও অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, হতে পারে ইউ. পি. এসের লোকেদের হয়তো কিছু কিছু মহিলা পছন্দ করে। আসলে, যারা খয়েরি জামাকাপড় পরা ঘেমো পুরুষ মানুষ পছন্দ করে, তারাই ওদের দেখে মুগ্ধ হতে পারে। কিন্তু আমাদের ফেডারেল এক্সপ্রেসের ওরকম রুচি নয়। ড্রাইভার কাম ডেলিভারি ম্যানরা কী সুন্দর সাজগোজ করে। সাদা আর নেভি ব্লু কম্বিনেশনের ইউনিফর্মে তাদেরই বেশি ভাল দেখায়।

ফেডারেল এক্সপ্রেসের এক মহিলা কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। তাঁর বেশি পছন্দ ওই ইউ. পি. এস ওলাদের। কম বয়সে নিজে যখন বাহিকার চাকরি নিয়ে ফেডারেল এক্সপ্রেসে ঢুকেছিলেন, তখন নিজেদের নেভি পোশাক নয়, অন্য দলের খয়েরি পোশাক দেখেই তাঁর তখন একজনকে ভাল লেগেছিল। ওই ট্রাক চালিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে গিয়ে আলাপ। দুজনে দুই কোম্পানির চাকরি করতেন তো কী হয়েছে? একই পেশায় ছিলেন বলে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তবে ইউ. পি. এস-ওলা বিবাহিত লোক বলে নেভির সঙ্গে খয়েরির মিলন হয়নি। বোঝার ওপর শাকের আঁটি কে চাপাতে চায়?

এক ভারতীয় কন্যার কাহিনী শুনুন। তার নাম সুমিতা সিনহা। ওয়াশিংটনে অ্যাটর্নি। সেও বলেছে তার বয়ঃসন্ধিকালের কথা। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় তাদের নিজস্ব ব্যবসা। সুমিতা তখন টিন-এজার। মায়ের দোকানে সামারের ছুটিতে কাজ করত। সঙ্গে আর একটি ওর বয়সী মেয়েও থাকত। রোজ বেলা এগারোটা বাজলেই দু'জনের এক সঙ্গে শিহরণ। ইউ. পি. এস-এর ট্রাক দোকানে মাল ডেলিভারি দিতে আসবে। প্রতিদিন এক দৃশ্য। দারুণ সুন্দর এক আমেরিকান ট্রাকের ড্রাইভিং সিট থেকে লাফ দিয়ে নামবে। তামার বরণ গায়ের রং, তুলোর বরণ কেশ, টানটান শরীরে খয়েরি রঙের বেশ। সুমিতা আর তার মিতা মুগ্ধ হয়ে যেত। এক তো ছেলেটা তার শার্টের হাতা গুটিয়ে রাখত বলে ট্রাইসেপ, বাইসেপ সব জেগে উঠত। দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল তার অহংকারী ভাব। কখনও বেশি বকবক করত না। হাতের মাসল-এ ঢেউ তুলে, একটি দুটি কথা বলে রাশি রাশি বাক্স নামিয়ে দিয়ে ফিরে যেত। এখনও অ্যাটর্নি সুমিতা তার চেহারা ভোলেনি।

দেখা যাচ্ছে আমেরিকার অনেক মহিলারই এমন মধুর স্মৃতি আছে। ক্যারেন নামে একজন মার্কেটিং একজিকিউটিভ-এর বয়স ঊনত্রিশ বছর। এরমধ্যে তিনজন ইউ. পি. এস ম্যানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন। প্রথমবার কলেজ ক্যাম্পাসে থাকতে, দ্বিতীয়বার পাড়ার জিমনেশিয়ামে আর শেষবার ক্রিসমাসের সময়। ন্যানসি নামে একজন সেক্রেটারির নাটকীয় সংলাপ শুনুন—"এ জীবনে যদি কোনও পুরুষকে বিশ্বাস করা যায়, তবে সে আমার ইউ. পি. এস. ম্যান। সে আসে, আমার প্রয়োজন মেটায় আর তখনই ফিরে যায়। প্রতিদানে কখনও কিছু আশা করে না। যেন স্বপ্নের মানুষ, বাস্তবে এমন পুরুষের দেখা পাওয়া যায় না...।"

শ্যারণ নামে এক সাইকোথেরাপিস্ট মহিলা তো বলছেন—এই প্রবণতা রীতিমত বংশগত ব্যাপার। মা থেকে মেয়ের মধ্যেও আসে। তিনি নিজে টোনি আর জন নামে দুজন ডেলিভারি ম্যানের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলেন। দু'বারই বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। আবার এখন শুনছেন ফ্লোরিডাতে তাঁর বুড়ি মারও এক অবস্থা। তবে বুড়ির দেহাতীত প্রেম। ইউ. পি. এস-এর বাহক তাঁর কাছে অলৌকিকবার্তা বহন করে আনছে। যখনই সে বুড়ির দরজায় আসছে, হাতে বাক্স দিচ্ছে আর হেসে বিদায় নিচ্ছে, বুড়ির যেন অবর্ণনীয় অনুভূতি হচ্ছে। এই আধ্যাত্মিক সংযোগের কথা তিনি শ্যারণকে জানিয়েছেন। সাইকোথেরাপিস্ট কন্যা বলছেন—অসম্ভব কিছু নয়। একজন আন্তরিকভাবে কিছু তোমার হাতে দিচ্ছে, তুমি প্রত্যাশার বস্তুটি গ্রহণ করছ। আবেগের এই ঠোকাঠুকি থেকে স্পিরিচ্যুয়াল কানেকশন হতে পারে।

পোশাকের মাহাত্ম্যের কথা তো আগেই বলেছি। জেফ নামে একজন প্রফেসর ইউ. পি. এস-এর উপদেষ্টার কাজ করেন। মার্কেট রিসার্চের খাতিরে জেফকে ট্রাক চালিয়ে খয়েরি পোশাক পরে মাল ডেলিভারিও দিতে হয়েছে। তো কলেজে "করপোরেট ইমেজ মেকিং" কোর্স পড়ানোর সময় প্রফেসর জেফ এক আধদিন ওই পোশাক পরে গিয়েছিলেন। আগে যেসব ছাত্রীরা তাঁকে নিরস মাস্টারমশাই ছাড়া কিছু ভাবত না, তারাই নাকি তাঁকে দেখে মোহিত হয়ে গেছে। ক্লাসের পরে বারবার কাছে এসে বলেছে—স্যার, খয়েরিতেই আপনি আহামরি? "এমরি ইউনিভার্সিটির" ওই প্রফেসরকে ছাত্রীরা এখন থেকে সারা বছর ইউ. পি. এস-এর উর্দি পরে ঘুরতে বলেছে। অধ্যাপক যে বাহকের পোশাকে এমন আবাহন পাবেন ভাবতেও পারেননি।

বাহকদের এই ভাবমূর্তি সম্পর্কে তাঁরা নিজেরা কী বলেন? নানা মুনির নানা মত। অনেকেই মহিলাদের এত নিবিড় মনোযোগ পছন্দ করেন না। স্কট নামে এক ডেলিভারি ম্যান তো অতিষ্ঠ হয়ে নিজের কোম্পানিকে বলে কয়ে রুট বদল করেছেন। কারণ আগে যে পাড়ায় ট্রাক নিয়ে যেতেন, সেখানে এক মহিলা দিন দুপুরে এত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলেন যে বলার নয়। প্যাকেজ দেখলেই ধন্যবাদের ছুতোয় গেরিলা আক্রমণ। স্কট সংসারী মানুষ। ওইসব 'অস্থায়ী বন্দোবস্তের' মধ্যে পড়তে রাজি নন। তাই ও পথ আর মাড়াননি। জর্জ নামে অন্য এক ডেলিভারি ম্যান বলেছেন—কাস্টমারদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে ভালই লাগে। কিন্তু সবেরই একটা সীমা আছে। মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধে হয়। অথচ অভদ্রতাও করা যায় না। আমরা যেন দুপুরের পাঁচালি শুনতে বেরিয়েছি। কসমেটিকস ডেলিভারি দিতে গেছি, এক মহিলা তাঁর ঠোঁট কেন বেশি ফাটছে, তাই নিয়ে কথা বাড়াতে শুরু করলেন। বুক-শেলফ ডেলিভারি দিতে গেছি, এক মহিলা তাঁর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কান্নাকাটি হওয়াতে আমাকে দিয়ে দেওয়ালে তাক লাগানোর তাল করছেন। বলছেন, পরের উইক-এন্ডে যদি ওঁর সঙ্গে হাত লাগিয়ে তাক লাগাই। আর কত বুড়ি যে আমাকে চেপে ধরে প্যাকিং বাক্স খুলিয়ে নিয়েছে। আর এক একজন যুবতী গৃহিণী এমন বিপজ্জনকভাবে শরীর দেখায়...

তবে মোটামুটিভাবে বাহকদের এই কাজ আর উষ্ণ আবাহন ভালই লাগে। তাঁদের পথ চলাতেই আনন্দ। পত্রবোমা বাদে আর সব কিছু বহন করাতেও আনন্দ। নয়তো এ কাজ নিতেন না।

ডেলিভারি লাইনে নারীর প্রথম অবদান কী, সে তো সবাই জানেন। দ্বিতীয় অবদান নিয়েই একটু খটকা লাগছে। ইউ. পি. এস.-এ ৯৩% ভাগ ডেলিভারি ম্যান। মহিলাদের নামমাত্র সুযোগ দিয়েছে দেখা যাচ্ছে। ফেডারেল এক্সপ্রেসেও বাহিকার সংখ্যা বেশি নয়। নাকি এ কাজে তাঁদের আগ্রহ কম? প্যাটি অ্যান্ডারসন নিউ জার্সিতে ফেডারেল এক্সপ্রেস ট্রাক চালিয়ে মাল দিতে আসেন। বাহকদের মতো প্যাটিরও কিছু স্তাবক আছে। মাঝে মাঝে কারা যেন তাঁর ট্রাকের উইন্ডশিল্ডে ওয়াইপারের নীচে ফুল গুঁজে রেখে যায়। কিন্তু অন্তরালে থাকে। প্রকাশ্যে প্রেম নিবেদন বলতে জাহাজের অফিসে ক'বার ডক-ওয়ার্কাররা কাছাকাছি এসেছিল। ডেট করতে চেয়েছিল। প্যাটি রাজি হননি। প্যাটি মনে করেন, প্রতিদিন যাঁরা একক দায়িত্বে কোম্পানির হয়ে কাজ করেন, তাদের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটি

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জন-সংযোগের কাজ, অথচ সঙ্গে দ্বিতীয় কোনও কর্মী নেই। অচেনা, অজানা লোকের বাড়ি যেতে হয়। বিশ্বাসযোগ্যতার দিকটি দু'পক্ষেরই বিশেষ প্রয়োজন। যিনি যাচ্ছেন, আর যাঁর বাড়িতে যাচ্ছেন, দুজনের মধ্যে কাজের ও ভদ্রতার সম্পর্কের অতিরিক্ত কিছু থাকার কথা নয়। কাজের সময় নষ্ট করে বাহক, বাহিকাদের রসালাপের জন্যে তো আর কোম্পানি মাসে মাসে মাইনে দিচ্ছে না?

তাহলে আমাদের মাস্তর বরাত খুবই ভাল ছিল বলতে হবে। পিটার যদি প্যাটির মতো এমন নীতিবাগীশ হত, শুধু এয়ার লেটার আর খামের চিঠি পৌঁছে দিয়ে ডাক বিভাগের দায়িত্ব পালন করেই সাদা ভ্যানে চেপে চলে যেত, তবে মাস্তর ডাকে কে সাড়া দিত? কেই বা তাকে জীবনভর গিটার শোনাত? আমি কাকে নিয়ে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির গল্প লিখতাম? "পাতি সাহেবে"র খোঁজই তো পেতাম না। এক ডাকে কত কাজ হল।

৬ মে ১৯৯৫

স্বর্গের সিঁড়ি

রিলিজিয়াস কাল্‌ট বা তন্ত্র বিষয়ে নানা দেশে নানা মতবাদ জনপ্রিয়। বিশেষ ধরনের এইসব ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীরা বলেন—এর দুটি বিপজ্জনক দিক আছে। প্রথমত—এরা নিজেদের ক্ষতি করে। দ্বিতীয়ত অন্যদের বিভ্রান্ত করে তাদেরও সর্বনাশ করে। উপধর্মের অনুশীলন মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের পরিবর্তে তার সুস্থ চিন্তার বিকৃতি ঘটায়।

প্রকৃতপক্ষে, উপাসনার কোনও বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় না থাকার ফলে সে সম্পর্কে অবিশ্বাস, ভীতি অথবা বিদ্বেষ জন্ম নিতে পারে। যে কারণে, আমেরিকায় হরেকৃষ্ণ মুভমেন্টও কালট-এর পর্যায়ে পড়ে বহু ক্ষেত্রে সন্দেহ ও বিরূপভাব সৃষ্টি করেছে। আমেরিকান ছেলেমেয়েদের মগজধোলাই করে তাদের নেড়ানেড়ির দলে ঢোকানোর অভিযোগে ইসকনের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমাও হয়েছে। এরকমই অভিযোগ উঠেছে আমেরিকার অন্যান্য কাল্‌টদের বিরুদ্ধে। সায়েন্টোলজিস্ট, জেহোভাস উইটনেসেস, চার্চ অফ দ্য স্যাটার ডে সেইন্টস ইত্যাদি ধর্মবিশ্বাসী দল সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। একমাত্র 'স্যানটেরিয়ান' (যারা ধর্মের জন্যে পশু পাখি বলি দেয়) দল ছাড়া কারোরই ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। হিংসাত্মক আচরণের ঘটনা না ঘটলে, আমেরিকায় সংবিধান অনুযায়ী কোনও নাগরিকের ব্যক্তিগত ধর্ম আচরণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

'কালট' শব্দটির মধ্যে স্বীকৃতির অভাব লক্ষ্য করবেন। ঈশ্বর আরাধনার মতো মহৎ কাজ নয়, যেন অপদেবতার উপাসনাই এদের লক্ষ্য। ওপরে যে সম্প্রদায়গুলির উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে একমাত্র স্যানটেরিয়ান ছাড়া বাকিরা ক্রমশ জাতে উঠে যাওয়ায়, তারা আর কাল্‌ট হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক গবেষণা ও তুলনামূলক ধর্মের পড়াশোনার বহর বেড়ে যাওয়ার ফলে 'বৈষ্ণব ধর্ম' এখন নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের

'হিন্দুইজম' ক্লাসের প্রধান পাঠ্য বিষয়ে গৌরাঙ্গের গৌরব রক্ষা হয়েছে।

তাহলে কালট বলতে এ দেশে এখন কাদের বোঝাচ্ছে? সেই একই বিশেষণ, অর্থাৎ যারা নিজেদের ও অপরের মতিভ্রম ঘটিয়ে পরিবার ও সমাজের ক্ষতি করছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত চাঞ্চল্যকর কোনও ঘটনা ঘটছে, ততক্ষণ অবশ্য এদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দল বলে সমালোচনা করা ছাড়া কিছু করার নেই। কিন্তু ধর্মের নামে দলগত আত্মহত্যা বা হত্যার ঘটনায় সরকার সশস্ত্র মোকাবিলায় নেমে পড়ে। তন্ত্রগুরু ডেভিড কোরেশ ও তাঁর দলের আত্মঘাতীমূলক ঘটনায় ৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। অর্ডার অফ দ্য সোলার টেম্পল-এর প্রেরণায় আত্মহত্যা করেছে ৭৪ জন। সদ্য সদ্য ঘটে গেল ক্যালিফোর্নিয়ার 'হেভন্‌স গেট' দলের ভয়ঙ্কর আত্মহত্যা কাণ্ড। অলৌকিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এইসব দলকেই রিলিজিয়াস কাল্‌ট বলা হচ্ছে। আর, অন্যান্য চক্রগুলি হচ্ছে কাল্‌ট। টেকসাসের বিচ্ছিন্নতাবাদী দল রিপাবলিক অফ টেকসাস, ওহায়োর রুবিরিজ ও মন্ট্যানার ফ্রিমেন দলকে রিলিজিয়াস কাল্‌ট গ্রুপ বলা যাবে না। এরা ধর্মযুদ্ধ উপলক্ষে নয়, রাষ্ট্রনৈতিক মতবিভেদের ওপর ভিত্তি করে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যেহেতু এদের মধ্যে গুরুস্থানীয় নেতা আছে, তার কিছু অনুগত শিষ্য আছে, যেহেতু এদের জীবনযাপন ও লক্ষ্য হচ্ছে—রাষ্ট্রের যাবতীয় বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো, সেই কারণে এই চক্রগুলিকে কাল্‌ট বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়ের প্রভাবে মগজধোলাই-এর ফলে গড়ে ওঠা দল। শুধু আমেরিকায় নয়, জাপানেও 'আউম সুপ্রিম ট্রুপ' নামে কাল্‌ট' ৯৪ এবং' ৯৫ সালে সাবওয়েতে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে গণহত্যা ও দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

একটি বিষয়ে দু দলেরই সাদৃশ্য আছে। যদি কেউ একটি অশুভ ধারণা তথা আদর্শকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে, যে তার জন্যে সে গণহত্যা এবং আত্মহত্যা—দুয়ের জন্যেই প্রস্তুত, তবে তাকে 'কাল্‌ট'-এর সদস্য বলে ধরতে হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে টেকসাসের রাষ্ট্রবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী দল আর ক্যালিফোর্নিয়ার রিলিজিয়াস কাল্‌ট গ্রুপ 'হেভন্‌স গেট'-এর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। দু দলই সমান মরিয়া। 'হেভন্‌স গেট' দল তো আত্মহত্যার আগে তাদের কম্পিউটারের ওয়েবসাইটে জানিয়েও গেছে যে—ডেভিড কোরেশ আর তার অনুগামীদের প্রতি মার্কিন সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদেই এরা সশরীরে স্বর্গে চলে যাচ্ছে। তবে এটি তাদের আত্মহত্যার পরোক্ষ কারণ। প্রত্যক্ষ কারণ অন্য, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। যাই হোক, এ দেশে জীবনসন্ধানী ও সত্যসন্ধানী দলের উৎপত্তি ও প্রচার বাড়ছে। আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথে সদ্‌গুরু লাভ হল, কি বদগুরু জুটে গিয়ে ধনেপ্রাণে মারা পড়তে হল—সে বিচার পরে। মোট কথা, নতুন কোনও তত্ত্ব, নতুন কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে ফেরা। ষাটের দশকের হিপি কালচারও জীবনের সেই অর্থ খোঁজার জন্যে। যা পাইনি সেই মোর অক্ষয় ধন, যা পেয়েছি, বড় সেই নয়...হয়তো এমনই অভাববোধ থেকে সমমানসিকতার লোকজন একত্র হয়ে যায়। নয়তো আমেরিকার আরাম, ঐশ্বর্য ছেড়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে কম্বল জড়িয়ে পড়ে থাকবে কেন মানুষ? আজ তিরিশ বছর পরে আমেরিকায় সেই ফ্লাওয়ার চিলড্রেনরা কোথায়? সময়ের স্রোতে হুজুগ ভেসে গেছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ, রাষ্ট্রের সমরনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছাত্র আন্দোলনের উত্তেজনায় প্যারাসাইটের মতো কিছু ছেলেমেয়ে আক্ষরিক

অর্থে 'গেঁজিয়ে গেল'। অতীত ইতিহাস চর্বিত চর্বন করে অধিকাংশই বলে—শৃঙ্খলা ভাঙার নেশা ছাড়া আর কোনও বড় উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের। মুক্ত চিন্তা, মুক্ত নীতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, দায়হীনতা আর বিভ্রান্তির আপাত সুখভোগ ছাড়া মহৎ কোনও ব্যাপার স্যাপারই ছিল না এদের মনে। আর্থিক অনিশ্চয়তা অনেক নেশা ঘুচিয়ে দেয়। কালটিস্টদের ক্ষেত্রেও তাই। দলের সমর্থন, নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা শক্ত। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে একক মোকাবিলায় যারা দুর্বল, সাধারণত তাদের মধ্যে থেকেই কাল্‌ট অনুগামীর দল ভারী হয়।

'হেভন্‌স গেট' দল ছিল এরকমই একটি রিলিজিয়াস কাল্‌ট গ্রুপ। স্যানডিয়েগোর কুড়ি মাইল উত্তরে পাহাড়ি এলাকায় তাদের আশ্রম। বাসিন্দারা বলতেন, দ্য মনেস্টারি। বিশাল বাড়ি। সঙ্গে বাগান। গত এপ্রিল মাসে সেই বাড়িতে ৩৯টি মৃতদেহ পাওয়া গেল। পুরো দলটিই স্বর্গে যাবে বলে আত্মহত্যা করেছে। খুবই সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা—ড্রাগ আর অ্যালকোহল মিশিয়ে পানীয় তৈরি করেছেন। জনে জনে পান করেছেন। তারপর প্লাস্টিক ব্যাগ মাথায় ঢুকিয়ে শুয়ে পড়েছেন, যাতে দমবন্ধ হওয়ার পথও প্রশস্ত থাকে। ৩৯ জনের পক্ষেই অবশ্য একসঙ্গে যাত্রা সম্ভব হয়নি। প্রথমে ১৫ জন, তারপরে ১৫ জন; তারপরে ৭ জন, আর শেষে ২ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই ভাগাভাগির কারণ হচ্ছে একদল এক দলকে পুণ্যক রথে তুলে দেবেন বলে সাহায্য করেছেন। সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিপাট্য আর নৈপুণ্যের ছাপ ছিল। সারা বাড়ির ঘরে ঘরে বাঙ্ক বেডগুলিতে একই ধরনের চাদর, বালিশ দিয়ে পরিপাটি করে বিছানা পাতা। মৃতদেহগুলির প্রত্যেকের পরনে এক পোশাক। ঢোলাঢালা কালো শার্টের ওপরে কুঁচি দেওয়া। টিউনিকগুলো ঝকঝকে নতুন সাদা/কালো নাইকি স্নিকার। কালো প্লাস্টিকের হাতঘড়ি। বাঁ হাতের অনামিকায় চওড়া সোনার আংটি। প্রত্যেকের মাথার চুল এক কায়দায় ছোট করে কাটা। শেষের দুজন বাদে মোট ৩৭ জনের মৃতদেহের ওপরে বেগুনি রঙের চৌকোনা চাদর ঢাকা দেওয়া। প্রত্যেকের হাতের ব্যাজে লেখা 'হেভন্‌স গেট'। হাতের নীচের দিকে সেলাই করা দ্বিতীয় ব্যাজের গায়ে লেখা 'অ্যাওয়ে টিম'। প্রত্যেকের শার্টের পকেটে একটি করে ৫ ডলারের নোট আর কিছু খুচরো কয়েন রাখা। সঙ্গে পানীয়র রসায়ন পদ্ধতি লেখা ছোট্ট কাগজ। প্রত্যেকের পাশে একরকমের সুটকেসের মধ্যে ভবিষ্যতের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হয়েছে। যাঁরা চশমা পরেন, তাঁদের চশমাও মুড়ে রাখা আছে। ওই বাড়ির সাতটি শোবার ঘরে ২১ জন মহিলা আর ১৮ জন পুরুষ এভাবেই শেষ যাত্রার আয়োজন করেছেন। একদল অন্য দলকে এই কাজে সাহায্য করেছেন। কিন্তু শেষের দুজন বেগুনি ঢাকা পাননি, তার কারণ তখন আর ঢাকা দেওয়ার লোক ছিল না। নয়তো এক যাত্রায় পৃথক শয্যা বা সজ্জা হত না। হ্যাঁ, ৩৯ জনের মধ্যে দলপতি সহ মোট ছজনের পুরুষাঙ্গ ছিল না। ছেদ করার কারণ—দলপতি যৌনবোধকে নিবৃত্ত করার উপদেশ দিতেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে কেন এই নেতা এতজন অনুগামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন? কী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল? কেনই বা বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ ওই 'কালটে' যোগ দিয়েছিল?

কুড়ি বছর ধরে মার্শাল অ্যাপল হোয়াইট একে একে লোক জড় করেছিলেন। এক অদ্ভুত

তন্ত্রের দীক্ষা দিয়েছিলেন। খ্রিস্টান ধর্ম, নস্টিসিজম (খ্রিস্টপূর্ব ও আদি খ্রিস্টোত্তর যুগে যে তন্ত্র অনুশীলনের দ্বারা পার্থিব বস্তুকে 'অশুভ' এবং জ্ঞানের সাহায্যে যুক্তির কথা প্রচার করা হয়েছে), অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং মহাকাশে অন্য পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলে তিনি এক নতুন তত্ত্বের প্রচার করেছিলেন। বলা যেতে পারে এক মিশ্রণ তৈরি করেছিলেন। মহাকাশের সেই স্তরকে এঁরা বলতেন পরবর্তী স্তর। অ্যাপল হোয়াইট বুদ্ধি খাটিয়ে কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়েছিলেন। দলের সবাইকে কম্পিউটার শিক্ষায় তৈরি করে নিয়েছিলেন। এর ফলে একে তো প্রচারের কাজ সহজ হয়েছিল। দ্বিতীয় কথা, দলের উপার্জনের পথ খুলে গিয়েছিল। নিজেদের প্রচারের জন্যে ওয়েবসাইটে খবর রাখতেন। এছাড়া অনেকগুলি বাইরের কোম্পানির জন্যে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটস তৈরি করে মোটা উপার্জন হত। বাড়িতে বারোখানা কম্পিউটার। মার্শাল অ্যাপল হোয়াইট ছিলেন একজন প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ মিনিস্টারের ছেলে। পেশায় গানের শিক্ষক এবং অপেরা গায়ক। এ তাঁর প্রথম জীবনের কথা। তারপর একবার হৃদ্‌রোগের অসুস্থতায় হিউস্টনের হাসপাতালে থাকার সময় প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। বেঁচে ওঠার পর জীবন জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে লাগল। ওই হাসপাতালের নার্স বনি লু। প্রেমে পড়ে দুজনই মরণোত্তর জীবন এবং জ্যোতিষ চর্চা নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। দুজনে মিলে হিউস্টন শহরে থেকে 'ক্রিশ্চান আর্ট সেন্টার' খুললেন। সেখানে ধর্মের বাণীর পাশাপাশি নিউ এজ ফিলজফি অর্থাৎ নতুন ধরনের ধর্ম অনুশীলন, অলৌকিক বিশ্বাস, অবাস্তব ধ্যানধারণার প্রচার শুরু করলেন। তাঁরা নিজেদের ধর্মগুরু মনে করতেন। বিশ্বাস করতেন 'নিউ টেস্টামেন্টস্থ বুক অফ রিভিলেশনের সেই 'দুই সাক্ষী'ই হচ্ছেন তাঁরা দুজন। তাঁরা এ কথাও প্রচার করলেন যে দুজনের একই সঙ্গে অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাঁরা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন যে ক্রুদ্ধ অবিশ্বাসী লোকেরা তাঁদের দুজনকে হত্যা করল। তারপর মৃতদেহ ছেড়ে দুই আত্মাই মেঘের ওপর চড়ে স্বর্গে পৌঁছে গেলেন।

এ ভাবেই অরিগনের ওয়ার্ল্ড পোর্টে অ্যাপল হোয়াইটরা কুড়িজন সভ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু '৭৫ সালে এই নিয়ে কাগজে খুব লেখালেখি হওয়াতে তাঁদের বদনাম হয়ে গেল। একজন মহিলা সভ্যের স্বামী মামলা ঠুকে দিলেন। অভিযোগ—অ্যাপল হোয়াইট তাঁর গাড়ি চুরি করেছেন। দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তাঁকে ছ মাস জেল খাটতে হল। তারপর তাঁদের দল ছোট হয়ে গেলেও অভিযান থেমে গেল না। সত্তরের দশকের শেষাশেষি দুজনে মিলে পারিবারিক সম্পত্তি বাবদ প্রায় তিনশো হাজার ডলার পেলেন। এবার দৈন্যদশা শেষ হল। ক্যাম্পিং করে থাকার বদলে ভাড়া করা ভাল বাড়িতে উঠে এলেন। ডেনভার আর টেকসাস—দু জায়গাতেই বাড়ি ভাড়া নিলেন। কিন্তু দল ক্রমশই ভেঙে যাচ্ছিল। '৮৫ সালে বনি লু মারা গেলেন। সঙ্গিনী বিহনে অ্যাপল হোয়াইট শোকে অভিভূত। তাঁর গভীর বিষাদ দলের মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। যে ক'জন সভ্য ধোপে টিকে ছিলেন, তাঁরাই তখন দলকে বাঁচিয়ে রাখতে উঠে পড়ে লাগলেন। হারানো সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। '৯৪ সাল নাগাদ 'টোটাল ওভারকামার্স অ্যানিমাস' নাম দিয়ে ২৪ জন সদস্য আবার সংযুক্ত হলেন। একশো হাজার ডলার খরচ করে সে সময় 'ইউ এস এ টুডে' পত্রিকায় নিজেদের সংস্থার প্রচার অথবা বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলেন।

উদ্দেশ্য—সদস্য সংগ্রহ। এঁদের মূল কথা—এক এবং একমাত্র স্বর্গ হচ্ছে অন্য লোকে। সেখানে যেতে হলে মহাকাশযান আশ্রয় করতে হবে। হেভন্‌স গেট-এর সভ্য হবার পর প্রত্যেককে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। আত্মীয়স্বজনকে চিঠিপত্র দেওয়া বা তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়া চলবে না। বছর তিনেক আগে 'স্যানডিয়েগো অলটারনেটিভ নিউজপেপারে' বিজ্ঞাপন দেখে ডেভিড বেসনার নামে উনিশ বছরের একটি ছেলে 'টোট্যাল ওভারকার্মাস'দের একটি চিঠি দিয়েছিল। তারপর মাসের পর মাস ধরে কাল্‌ট সদস্যদের কী আগ্রহ। তারা সমানে ডেভিডকে দলে নিতে চাইছেন। কারণ সে নাকি 'ঈশ্বর নির্বাচিত' এবং অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। স্বর্গের রথ তার জন্যে সব সময়ই প্রস্তুত থাকেব ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। ডেভিডের বাবা তো ছেলেকে কিছুতেই ঠেকাতে পারছেন না। ঠিক চলে যাবার আগে ছেলের নিজেরই খটকা লাগল।

এরা বলছে মৃত্যুর আগেই স্পেস ক্র্যাফট চলে আসবে। সশরীরে মহাকাশে চলে যাওয়া যাবে। তাই যদি হয়, তবে অ্যাপল হোয়াইটের সঙ্গিনী বনি লু মারা গেলেন কেন? তাঁকে নেওয়ার জন্যে কোনও স্পেস ক্র্যাফট এল না কেন? এই সন্দেহ থেকেই ডেভিড মত পরিবর্তন করল। সে আর ওই দলে গেল না। কিন্তু কাল্‌ট নাছোড়বান্দা। প্রতিদিন দু-তিনবার করে তার বাড়িতে ফোন আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ডেভিডকে ফোনে ধরতে পেরে বহু উপরোধ, অনুরোধ। কেন সে দলে আসবে না। তার কৈফিয়ত দিতে হল। বার বার বারণ করা সত্ত্বেও তাদের নিরস্ত করা যাচ্ছিল না। এক সময় হাল ছেড়ে দিলেও আবার গত বছরের শেষে ডেভিডকে বিরাট এক চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সঙ্গে অ্যাপল হোয়াইটের স্বর্গীয় বক্তৃতার দু ঘণ্টার লম্বা ক্যাসেট। শেষ পর্যন্ত ডেভিড যে প্রভাবিত হয়নি সে জন্য এখন তার বাবা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

আত্মহত্যার আগে পর্যন্ত 'হেভন্‌স গেট' কাল্‌ট মেম্বাররা যে কী মোহের ঘোরে ছিলেন, রেখে যাওয়া একশোটি ভিডিও ক্যাসেটে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। কেবলই তাঁরা বলেছেন—'পৃথিবী ছেড়ে যাব ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে। সেখানে কিছু পাব ভেবে ভাল লাগছে। এর মধ্যে দুটি ক্যাসেট আগেই কয়েকজন ভূতপূর্ব সদস্যকে পাঠানো হয়েছে। শেষবারের মতো তাঁদের 'হেভন্‌স গেট'-এর সদস্য হওয়ার জন্য বোঝানো হয়েছে। সেই একই আহ্বান—আমরা স্বেচ্ছায় পরবর্তী স্তরে চলে যাচ্ছি। তোমরা এসো। আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। একসঙ্গে আনন্দে যাত্রা করি।

মার্শাল অ্যাপল হোয়াইট ইন্টারনেটে রেড অ্যালার্ট, 'হেভন্‌স গেট' মেসেজ রেখেছিলেন।

আত্মহত্যার প্রেরণায় দলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় তিনি সফল হয়েছেন। কালট-এর প্রভাব কীভাবে মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, বাইরে থেকে অনুমান করা কঠিন। চূড়ান্ত নৈরাশ্য থেকে যখন কোনও মানুষ ভাবেন এই গ্রহে আমার জন্যে আর কোনও সুখ নেই, প্রতিশ্রুতি নেই, তখনই অলৌকিক মহাকাশযান আর স্বর্গের স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব। হেভন্‌স গেট কাল্‌ট দল সেই স্বর্গের সন্ধানে গেছে।

২১ জুন ১৯৯৭

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা

এদেশের বেশিরভাগ অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে তেরোতলা নেই। এলিভেটরের বোতামঘরের গায়ে তেরো সংখ্যাটাই নেই। হাসপাতালে, অফিস বিল্ডিং-এ কোথাও দেখিনি। বারোর পরেই চোদ্দো তলায় উঠে যাওয়া। অপয়া সংখ্যা বলে সবাই এড়িয়ে যায়। সবচেয়ে অশুভ দিন ফ্রাইডে দ্য থার্টিনথ। কোনও মাসে তেরো তারিখে শুক্রবার পড়ল তো হয়ে গেল। আর এমনই বরাত আমাদের, ঘুরে ফিরে হয় এক, নয়তো তিন—এর মধ্যেই আটকে আছি। বাড়ির নম্বর একত্রিশ। অনেক বছর আগে যখন অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম, তার ঠিকানাও একত্রিশ। নিউ ইয়র্কে থাকতে তিন নম্বর ফ্লোরে থ্রি ডি অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম। মেয়ের জন্মতারিখ একত্রিশ। এছাড়া তেরোও যে কত ব্যাপারে ঘুরে ফিরে এল, তার ঠিক নেই। আমেরিকানরা আনলাকি থার্টিনকে যতই এড়িয়ে চলুক, সে ঠিক আমাদের বিশেষ সংখ্যা হয়ে ঢুকে পড়বে।

মেয়ে কলেজ পাস করার পর চাকরির ফাইনাল ইন্টারভিউ পেয়েছিল একেবারে মোক্ষম দিনে। তেরো তারিখ, শুক্রবার। সে তো ধরেই নিল, চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হবে না। শুধু অপয়া তারিখের জন্য তীরে এসে তরী ডুববে। প্রথম ইন্টারভিউ কলেজ ক্যাম্পাসে হয়ে গিয়েছিল। এটা দ্বিতীয় ইন্টারভিউ। নিউ ইয়র্কে বিজনেস গ্রুপের সান্ধ্য জমায়েতে গিয়ে কীসব কঠিন কঠিন আলোচনায় যোগ দিতে হবে। তার ওপর রিক্রুটিং নির্ভর করছে। ওর তখন একুশ বছর বয়স। রাত অবধি ম্যানহ্যাটানে একা একা গাড়ি নিয়ে ঘুরবে ভেবে একটু চিন্তা হয়েছিল। ঠিক করলাম, আমরা ওকে সেন্ট্রাল পার্কের সামনে সেই হোটেলেই নামিয়ে দেব। মাঝে ঘণ্টা দু-তিন কোথাও কাটিয়ে আবার তুলে নিয়ে আসব।

তাই করলাম। মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে ইন্ডিয়ান কনসুলেটের দীপক আর উত্তরা সেনগুপ্তর বাড়িতে সময় কাটাতে চলে গেলাম। আগে থেকে বলে রেখেছিলাম। সুতরাং খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজবে দিব্যি সময় কেটে গেল। ফ্রাইডে দ্য থার্টিন নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে মেয়েটার কথা মনে হয়েছিল। চাকরি পেলে হয়।

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ উঠে পড়লাম। রাস্তায় বেরিয়ে দু ব্লক হেঁটে গাড়ির সামনে পৌঁছে চক্ষুস্থির। পার্কিং ভায়োলেশনের জন্য পুলিস ওয়াইপারের আড়ালে টিকিট গুঁজে দিয়ে গেছে। অথচ কোথাও নো পার্কিং জোন লেখা নেই। মিটার পার্কিং স্ট্যান্ডের সামনেই গাড়ি রেখে গিয়েছি। তবে কী ছুতোয় টিকিট দিল? ভাল করে রাস্তার নোটিস পড়ে দেখলাম সাতটার পর থেকে ফ্রি পার্কিং ছিল। তখন তাড়াহুড়ো করে ঘড়ি দেখিনি। শুক্রবার তো! উইক এন্ড পড়ে গেছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছি। তখন বোধহয় সাড়ে ছ'টার বেশি বাজেনি। আধঘণ্টার জন্যে মিটার পার্কিং-এর ডাণ্ডার মাথায় কয়েন ঢুকিয়ে দিয়ে, কাঁটা ঘুরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এখন পঞ্চাশ ডলার ফাইন দিতে হবে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। পুলিসেরও নজর বটে। মাত্র ক'মিনিটের জন্যে ধরেছে। পার্কিং মিটারে কয়েন দেওয়া নেই বলে সুদে আসলে উসুল করার ব্যবস্থা করেছে। সাধে কি আর লোকে বলে পুলিসের চক্ষুলজ্জা নেই। একটু লজ্জা করে দূর দূর দিয়ে চলে গেলেই তো আমাদের ক'মিনিটের

অগ্রিম বুকিং দেখতে পেতিস না। তা না, মিটারে চোখ ঢুকিয়ে ঘড়ির নাড়িনক্ষত্র দেখেছে। মনের ভুলে ক'পয়সা ফাঁকি দিয়েছি বলে পঞ্চাশ ডলারের ঘা দিয়ে গেছে। কেন যে লোকে রাষ্ট্রদ্রোহী হতে চায়, এইসব মুহূর্তে বোঝা যায়।

যাক, তেরোর শুভরাত্রি তো এরকমই হবে। পুলিসের সমন গাড়িতে ভরে নিয়ে মেয়েকে তুলতে গেলাম। সে ইন্টারভিউ দিয়ে এল, না পার্টি থেকে ফিরল বোঝার উপায় নেই। সেখানে কোম্পানির লোকেরা নাকি বলেছে—সকলের সঙ্গে মেলামেশা করো। ওয়াল স্ট্রিটের নানা কোম্পানির লোকজন এসে জুটেছিল। তাদের সঙ্গে জ্ঞানগর্ভ কথা চালিয়ে যেতে হবে। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং, স্টক, বন্ড, প্রক্সি, সলিসিটেশন, কোম্পানি মার্জার—এই সব বৈষয়িক কচকচির মধ্যে সেও সাত কথা চালিয়ে গেছে। খুব দামি ওয়াইন আর ফ্রেঞ্চ খাবার দাবার খেয়েছে। আরও দু-তিনটে কর্মসন্ধানী ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কিন্তু চাকরিটা হবে কিনা জানে না। কারণ তারিখটা সুবিধের নয়।

সেবার কিন্তু চোটটা শুধু পঞ্চাশ ডলারের ওপর দিয়েই গিয়েছিল। মেয়ে চাকরিটা পেয়েছিল। নিউ ইয়র্কে দু'বছর সেখানেই কাজ করেছিল। সেই একবার, আর পরে আর একটা ঘটনায় তার তেরো নম্বরের ওপর ভীষণ বিশ্বাস এসে গেল। এখন সে এক আর তিন তারিখ দেখে নানা রকম প্ল্যান করার চেষ্টা করে। কোথাও নম্বর বাছতে হলে ১, ৩, ১৩, ৩১—এইগুলো খোঁজে। তার ধারণা এ পর্যন্ত ১৩ আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি করেনি। উলটে আনন্দবর্ধন করেছে। কেন না, সে ৩১ তারিখেই জন্মেছিল।

কিন্তু উনিশ হচ্ছে খুব বাজে তারিখ। আমার রিষ্টিযোগ-এর নোটিস নিয়ে তিনবার ঘুরে গেছে। উনিশের এই ফিনিশের টেনডেনসি কমবার বুঝিনি। এদেশে তিনবার উনিশে মার্চ হাসপাতালে ছিলাম। একবার মরমর, দুবার স্টেবল। এজন্যে 'নয়' আমার পছন্দের সংখ্যা নয়।

এ তো গেল নিজেদের সংখ্যাতত্ত্ব। সাহেবদেরও কত কী আছে। ইহুদিরা শনিবার বিয়ে করে না। এখানে বাঙালি ইহুদি কন্বিনেশনে যে ক'টা বিয়ে দেখলাম, হয় শুক্রবার নয়তো রবিবারে। গোঁড়া ইহুদিরা শনিবারে এমনই কর্মবিমুখ যে হাইরাইজ বিল্ডিং-এর এলিভেটরে চড়ে না। কারণ বোতাম টিপে চালাতে হবে। দু'বছর আগে নিউ ইয়র্কের 'মাউন্ট' সায়নাই হসপিটালে' এক বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম। ইহুদি অধ্যুষিত হাসপাতাল। 'এমপ্লয়িজ ওনলি' লেখা এলিভেটর শুক্রবার মাঝরাতের পর ফাঁকা। কারণ ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী শুক্রবার রাত থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত 'স্যাব্যাথ' অর্থাৎ বিশ্রাম ও প্রার্থনার সময়। হাসপাতালে ইহুদি ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্য কর্মীরা ওই সময় কাজ করবেন না। এজন্যে মাউন্ট সায়নাই হসপিটালেও এমপ্লয়িজ ওনলি এলিভেটর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকতালে আমরা ঢুকে পড়ে বোতাম টিপে নীচে নেমে এলাম।

মানুষের কত রকম বিশ্বাস থাকে। এক মহিলা ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে ভাল চাকরি করেন। চল্লিশের ওপর বয়স। দুটি ছেলে মেয়ে আছে। তিনি নাকি কুড়ি বছর আগে এক রাত্রিবেলায় নির্জন শহরতলির রাস্তায় অন্য গ্রহের প্রাণী দেখেছিলেন। হুবহু 'এলিয়েনে'র দৃশ্য। বিচিত্র যানে চড়ে বিচিত্র দর্শন লোক এসে নামল। আবার আকাশে উধাও হয়ে গেল। এটি মিশিগানের ঘটনা। ফিলাডেলফিয়ার পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসে ২৯ বছর বয়সী

একজন আইনের ছাত্র চাকরি করে। তার গলায় চেনের সঙ্গে ছোট্ট একটি টোটকা ওষুধের ব্যাগ ঝোলে। রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে কেনা। ছেলেটির দৃঢ় বিশ্বাস ওই ওষুধের ব্যাগ সব সময় তার জীবন রক্ষা করছে। এমনকি প্রতিদিন নিরাপদে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করছে। অথচ সে কোনওদিন টোটকার ব্যাগ খুলেও দেখেনি। ভেতরে কী আছে তাও জানে না। কিন্তু, তাবিজ, মাদুলির মতো করেই বিশ্বাসের সঙ্গে ধারণা করে আছে। নিউ জার্সির একজন ৫৭ বছর বয়সী আমেরিকান ব্যবসায়ী বাড়িতে কয়েকটি স্ফটিক রাখেন। এদেশে এবং দক্ষিণ ইউরোপের নানা দেশে জিপসি জ্যোতিষী বা ভাগ্য গণনাকারী মহিলারা স্ফটিকের গোলকের সাহায্যেই ব্যবসা চালান।

আমেরিকায় হাজার হাজার লোক কোনও না কোনও অলৌকিকে বিশ্বাস করে। 'নিউ এজ মুভমেন্ট' এখন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন রকমের ধর্মচর্চা, জাদুবিদ্যা, ডাইনি তন্ত্র, মুষ্টিযোগ, কল্পবিজ্ঞান, জড়িবুটি, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা—এসবই নিউ এজ মুভমেন্টের মধ্যে পড়ে। বই-এর ছড়াছড়ি। আমেরিকান বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী—পাঁচ বছর আগে এ ধরনের বই বিক্রি হয়েছিল ৫.৬ মিলিয়ন কপি। দেড় বছর আগে সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৯.৭ মিলিয়নে পৌঁছেছে। আমেরিকায় এখন প্রতি বছর টোটকা ওষুধ বিক্রি হয় প্রায় দু-বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। অবশ্য শুধু ওষুধের দাম নয়, এর মধ্যে টোটকা চিকিৎসকদের দক্ষিণাও ধরা হয়েছে। অ্যারোমা থেরাপিস্ট (যাঁরা গন্ধের সাহায্যে দেহ ও মনের রোগ সারান), চ্যানেলার্স (অলৌকিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে যিনি মানুষের সমস্যা দূর করেন), ম্যাক্রোবায়োটিক অর্থাৎ বিশেষ কয়েকটি শস্যকণার সাহায্যে খাওয়াদাওয়ার বিধিনিষেধ করে যাঁরা চিকিৎসা চালান এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যাঁরা নানা প্রক্রিয়ার শিক্ষা দেন—এঁদের ওষুধ ও পারিশ্রমিক যোগ করেই ওই দু-বিলিয়ন ডলারের হিসেব দেওয়া হয়েছে। বছর তিনেক আগে একটি সমীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে—যাঁদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ৪৫% লোকই বলেছেন তাঁরা ধ্যানের মাধ্যমে এক ঐশ্বরিক শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেন। আমেরিকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার উপধর্মীয় দল আছে। এইসব ছোট ছোট 'চক্রে' প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বাইরে নতুন কোনও অনুভব এবং বিশ্বাসের জন্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্যে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে। দ্য নিউ এজ সেই হিসেবে ধর্ম সমন্বয় থেকে উদ্ভূত নতুন ভাবনার কথা বলছে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানফ্রান্সিসকো ও উপকণ্ঠে নিউ এজ চর্চার ঝোঁক বেড়েছে। হিন্দুধর্মের অতীন্দ্রিয় বাদ আর তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের পছন্দসই অংশ নিয়ে কেউ কেউ নবধর্মে স্বদীক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ধর্মের যে অংশটুকু তার কাছে আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, সে সেরকম ভাবেই বেছে নিচ্ছে। স্যানফ্রান্সিসকোর 'ফিল্ডস বুক স্টোর' আমেরিকার পুরনো বই-এর দোকানগুলির মধ্যে একটি। মেটাফিজিক্যাল অর্থাৎ সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনবিদ্যার (অধিবিদ্যা) যত বই, সব সেখানে পাওয়া যায়। ম্যাসাচুসেটস্-এর বিখ্যাত দার্শনিক হেনরি ডেভিড থরোর বই থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের প্রাসঙ্গিক রচনা এবং নিউ এজ পত্রিকাগুলির মাসিক সংস্করণ—প্রত্যেকটি মজুদ আছে। পত্রিকাগুলির নাম—'কমন বাউন্ডারি', 'নসিস' এবং 'নিউ ওয়ার্ল্ডস'।

স্যানফ্রান্সিসকোর আশি মাইল দক্ষিণে স্যান্টাক্রুজে আছে 'গেটওয়েজ বুক স্টোর'।

সেখানে বই ছাড়াও 'নিউ এজ' বাজনার ক্যাসেট, ভিডিও টেপ, বারান্দায় ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য বাজনাওলা ঘণ্টা ইত্যাদি বিক্রি হয়। বই-এর দোকানের বুলেটিন বোর্ডে—'সুগন্ধি চিকিৎসা', 'পাহাড়ে ওঠার সময় পদে পদে ধ্যান,' 'ঐক্যবদ্ধ সমকালীন বাদ্যবৃন্দ' ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে। সবই দেহ ও আত্মার উন্নতির জন্যে।

'নিউ এজ' কালচার আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে ক্রমশ মধ্য পশ্চিমের রাজ্যগুলিতেও প্রভাব বিস্তার করছে। অরিগন, কলোরাডো, নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা থেকে উইসকনসিন পর্যন্ত এর চর্চা চলেছে। সমান্তরাল পৃথিবীর অস্তিত্ব, অর্থাৎ অন্যান্য গ্রহেও সভ্য প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস, বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত নয় এমন অলৌকিক সত্যের প্রতি বিশ্বাস, আত্ম-অন্বেষণ, পূর্ব ও পরজন্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা—অপ্রত্যক্ষ নানা অনুভূতি নিয়েই 'নিউ এজ'-এর অনুশীলন। দীক্ষাগুরুরা বলছেন—সবই সম্ভব। আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, পূর্বজন্মে পরিভ্রমণ, অন্য গ্রহ থেকে মহাকাশযান ও প্রাণীর আবির্ভাব, তাদের হাতে অপহৃত হওয়ার ঘটনা—সব ঘটে।

'নিউ এজ' কথাটির তাৎপর্য হল—নতুন যুগ আসছে। জ্যোতিষবিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের সম্পর্ক আছে। গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানের ওপরে সবকিছু নির্ভর করছে। দশ বছর আগে একাধিক গ্রহের সমকেন্দ্রাভিমুখী হওয়া উপলক্ষে 'নিউ এজ' চিন্তাধারা আরও প্রেরণা লাভ করল। নব্বই দশকের প্রথম দিকে নেপচুন ও ইউরেনাস-এর সংযোগকে এঁরা অনেকেই এক অস্তিত্বের অবসান থেকে নতুন যুগের সূচনা বলে মনে করেছিলেন। এই নতুন যুগের ভোরে অলৌকিক মহাকাশযান আর পৃথিবী বহির্ভূত প্রাণীর ব্যাখ্যা হচ্ছে—এরা নাকি আধুনিকোত্তর যুগের ভৌতিক অথবা অশরীরী অস্তিত্বের বিকল্প। ভূত, দেবদূত, পরী, বামনের মতোই নতুন শতাব্দীর নতুন অশরীরী। মানুষ চিরদিন বিদেহী অস্তিত্বের কথা বলেছে। দৃশ্যমানের কাছাকাছি অদৃশ্যের সহাবস্থান নিয়ে গল্পকথার শেষ নেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারার বিবর্তন একদিকে যেমন পুরাণের ভূত, প্রেত, রাক্ষসকে অস্বীকার করেছে, তেমনই অন্যদিকে একস্ট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল অর্থাৎ পার্থিব অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত 'এলিয়েন' জাতীয় কল্পনাকে আশ্রয় করেছে। পাতালের রাক্ষসীর বদলে মহাকাশের প্রাণীদের দ্বারা আক্রমণের কথা ভাবছে। ফ্লাইং সসার বা ইউ. এফ. ও (আনআইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট) নিয়ে গল্প লেখা, হলিউডে ছবি তৈরি—বছরের পর বছর এই ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ, অতি-আধুনিক যুগেও মানুষ অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইছে। ইউ. এফ. ও নিয়ে লেখা বইগুলি অধিকাংশই নানা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করা হয়েছে। আইডা ক্যালেবার্গের 'প্রোজেক্ট আর্থ' এবং মিশেল লাভিনের 'দ্য এলিয়েন অ্যাবডাকশন সার্ভাইভ্যাল গাইড' পড়লে বোঝা যায়—কত লোক ভিন্ন গ্রহের 'উড়ন্ত চাকি' কিংবা বনেবাদাড়ে স্পেসশিপ থেকে নামা অদ্ভুত চেহারার প্রাণীদের দেখেছেন বলে বিশ্বাস করেন। এ সম্পর্কে সুইস মনোবিজ্ঞানী কার্ল ওস্তাভ ইয়ুন ১৯৫৮ সালে লিখেছিলেন—যারা ফ্লাইং সসার ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের উত্তরণের কল্পনা করে। মানুষ মনে মনে যেখানে পৌঁছতে চায়, মহাকাশচারী প্রাণীর আবির্ভাব অথবা মহাকাশযানের কল্পনা তাকে সেই অপ্রত্যক্ষ লোকে নিয়ে যায়।

ক্রিশ্চান ধর্মের মূলকথা যেমন বিশ্বাস, নিউ এজ চক্রের দার্শনিক ভিত্তির অন্যতম উপাদান হল সংযোগ অর্থাৎ কমিউনিকেশন। ক্রমশই এই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এরা নিজেকে মনে করে কোনও অদেখা শক্তির বাহক। বিভিন্ন চ্যানেল বা মাধ্যমের সাহায্যে যখন যেভাবে নির্দেশ আসবে, সেভাবেই প্রতিক্রিয়া ঘটবে। তারা তখন সেই ভাব অথবা ভাবনাকে প্রচার করবে। এজন্যে নিউ এজ বিশ্বাসীরা 'চ্যানেলিং'-কে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। 'ইন্টারনেট'কেও তারা কমিউনিকেশনের কাজে লাগাচ্ছে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে চিন্তার সংযোগ ঘটাচ্ছে। তবে 'চ্যানেলিং' বলতে প্রকৃতপক্ষে 'অলৌকিক সংযোগ' বোঝায়. প্রাচীন গ্রিক শব্দ নসিস-এর অর্থ জ্ঞান। 'নিউ এজ' সেই ভাবধারায় আত্মজ্ঞানকেই ঈশ্বর উপলব্ধির পথ বলে মনে করে। অর্থাৎ, আত্মা এবং ঈশ্বর অভিন্ন। নস্টিসিজম এবং পরবর্তী সময়ের ইস্টার্ন মেটাফিজিক্যাল তত্ত্ব, পেগ্যানিজম—এ সবেরই মূলতত্ত্ব থেকে 'নিউ এজ' তার অধ্যাত্ম দর্শন রচনা করেছে। ক্রিশ্চান ধর্মের মূলধারার সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। করা এই নবধর্মের পৃষ্ঠপোষক? দেখা যাচ্ছে—এ যুগে ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ইহুদি সমাজে বহু সংখ্যক লোক চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাস এবং অনুশীলনে আস্থা হারাচ্ছে। আচার, বিধি মানতে চাইছে না। তাদের কাছে স্ব-অধ্যায়, আত্মজ্ঞান অর্জন—ইত্যাদি চিন্তা ক্রমশই গুরুত্ব লাভ করছে। বিকল্প ধর্ম আচরণের আগ্রহ জন্মাচ্ছে। এ জন্যে কোনও ধর্মগুরু বা মাধ্যমের ওপর নির্ভর করতে হবে না। প্রতি রবিবার উপাসনালয়ে গিয়ে ধর্মকথা শুনতে হবে না। আচারবিধি পালন করতে হবে না। গির্জার জন্যে চাঁদা দিতে হবে না। আবশ্যিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে হবে না। পুরোহিতের কর্তৃত্ব, নির্দেশ, আদেশ কিছু থাকবে না। প্রথানুগত্যের দায় থাকবে না।

অথচ এত নেতি নেতি সত্ত্বেও নিউ এজ কাল্ট মেম্বাররা প্রায়শই একজন শক্তিমান এবং সম্মোহক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দলবদ্ধ হন। তার ফলাফল যে সব সময় শুভ হয় না, তার প্রমাণ গায়ানার জোনস টাউন অথবা সদ্য ঘটে যাওয়া হেভ্নস গেট কাল্টদের গণ আত্মহত্যার ঘটনা। স্যানডিয়েগোর কাছে নিউ মেক্সিকো রাজ্যের র‍্যানচো স্যান্টাফের একটি বাড়িতে নিউ এজ গ্রুপের নেতা মার্শাল অ্যাপল হোয়াইট-এর নির্দেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। শেষ করার আগে জাদুবিদ্যা ও ডাইনি ইত্যাদি সম্পর্কে এদেশের মানুষের কৌতূহল নিয়ে কিছু তথ্য জানাচ্ছি। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ ঘটছে।

নিউ ইংল্যান্ডে আছে কভেনস্ 'ট্র্যাডিশন্যালিস্ট কভেনস্' নামে জাদুকর ও ডাইনি চক্র। এরা প্রতি ঋতুতে উৎসব করে। বসন্তের প্রথম রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে 'অ্যালেকসান্দ্রিয়ান ক্যানডল ম্যাস' হয়। অন্ধকারে হাতে মোমবাতি নিয়ে মন্ত্র পড়ে। এদেরই দলের ডাইনিতন্ত্রে দীক্ষিত মহিলা এলিজাবেথ র‍্যাভেন কেবট তুকতাকের সাহায্যে চিকিৎসা করেন। শরীরে যে কোনও অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর জাদু স্ফটিকের স্পর্শ নাকি মন্ত্রের মতো কাজ করে। ডাইনিদের গোপন উৎসবের নাম 'উইকা'। সেখানে মহিলা পুরোহিত উৎসব পরিচালনা করেন। ধ্যান, ভাবমূর্ছা, অতীত ও ভবিষ্যৎ দর্শন, অলৌকিক শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে রোগ নিরাময়, জটিল সমস্যার সমাধান—এ সবই জাদুচক্রের অনুশীলনের বিষয়। জ্যোতিষবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, চক্রে বসে দলবদ্ধ সাধনা (?), কথার মায়াজাল বিস্তার ইত্যাদি হচ্ছে এদের অধীত বিদ্যা। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন—জীবনের কোনও

অপ্রাপ্তি, অভাববোধ, দারিদ্র্য, ক্ষমতাহীনতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদির জন্যে ক্ষুব্ধ মানুষ এ ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করে। আমেরিকায় যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ডাইনি বা জাদুকর আছে, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিন্তু এ কথা খাটে না। জ্ঞানের আগ্রহ বা অজানা বিদ্যা সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল থেকে অনেকে এই পথ নিয়েছে। আগুনের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পার হওয়া, সম্মোহন বিদ্যা আয়ত্ত করা, ছবিওলা বিশেষ ধরনের বাইশটি তাস দেখে ভবিষ্যৎ গণনা, জড়িবুটির গুণাগুণ, স্ফটিকের গোলকের ব্যবহার—এ বিদ্যায় অনেক কিছু শেখার আছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অ্যানথ্রোপলজি নিয়ে পড়তে গেলে ডক্টরেটের থিসিসের জন্য নেটিভ আমেরিকানদের সঙ্গে ফিলড্ ওয়র্কেরও প্রয়োজন হয়। সেই সুযোগে জাদুকর, ডাইনিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা এতই সূক্ষ্ম যে আমেরিকায় 'অলৌকিক তত্ত্ব' ক্রমশই তর্ক ও বিতর্কের 'আলোচ্য বস্তু' হয়ে উঠছে। 'নিউ এজ' চিন্তা বিভিন্ন শাখায় পক্ষবিস্তার করছে। আত্মজিজ্ঞাসা থেকে আত্মহত্যার ঘটনা বাদ দিলে সুস্থ চিন্তাই বলা যায়। ডাইনি থেকে বেদান্তের সার সন্ধান—সবই অলৌকিক। নিজেকে জানার জন্যে চটজলদি উপধর্মের পথ অথবা কঠোর অধ্যাত্ম সাধনা—নিউ এজ আপাতত এই দুয়ের মধ্যে যোগ বিয়োগ কষছে। আমরা এখনও তেরো-তেই আছি। পশ্চিম উপকূলের ঢেউ পূর্ব উপকূলে এসে লাগলে 'উনিশ'-এর দোষ কাটানোর উপায় জেনে নিতে পারব। ডাইনি বুড়ি হয়তো বলতে পারবে 'বিশে' বিষক্ষয় হয় কিনা। তার হাত ধরে বাইশখানা কার্ড আর ক্রিস্ট্যাল বল কিছু হদিস দেবে নিশ্চয়ই!

২৮ জুন ১৯৯৭

ভূত বাংলো

"শ্মশান ভালবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে বলে নিরবধি...মাগো..."

এ গান "অ্যানা"কে আমি শোনাতে চেয়েছি বারেবারে। কিন্তু পারিনি। কারণ, ট্র্যানস্লেশনের অক্ষমতা। এক তো শাক্ত পদাবলীর শক্ত ব্যাখ্যা। তার ওপর অলংকারের ভার। "আর কোনো সাধ নাই মা চিতে। সদাই আগুন জ্বলছে চিতে। চিতাভস্ম চারিদিকে, রেখেছি মা আসিস যদি...।"

যমের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে বসে ওইসব যমকের নিহিতার্থ বোঝানো আমার কর্ম নয়। এই ডাচ রমণী যত নাচই শিখে থাকুন, শ্মশানের নাচ জানা অসম্ভব। নিজের বাড়িটাকে শ্মশান বানিয়েছেন বটে, সে তো অন্য কারণে।

সত্যি বলতে কি, পরিবেশটা ভাল লাগছিল না। ভেবে দেখুন, আমরা ক'জন মহিলা যে মস্ত বাড়িটার দোতলার ঘরে নেমন্তন্ন খেতে বসেছি, তার নীচের তলাতেই আরও ক'জন অন্ন জল ত্যাগ করে পড়ে আছেন। একেবারে পার্মানেন্ট হাঙ্গার স্ট্রাইক। শরবৎ খেতেও

উঠে বসবেন না।

আসলে, নীচের তলায় ফিউনার‍্যাল হোম। সেখানে ঘরে ঘরে তাঁরা বাক্সবন্দী হয়ে আছেন। মিসেস অ্যানা ভ্যান্ডার মের শ্বশুরবাড়ির ব্যবসা হচ্ছে ফিউনার‍্যাল সার্ভিস। কাছাকাছি দু-তিনটি শহরে ওঁদের ফিউনার‍্যাল হোম আছে। ফলাও ব্যবসা। অ্যানার স্বামী, আর দুই ছেলে মিলে চালান। ছেলেরা ফিউনার‍্যাল ডিরেক্টর। এ ব্যবসায় প্রেসিডেন্ট থাকে কি না জানি না। তাহলে বুড়ো নিশ্চয়ই তাই। তিনি রোটারিয়ান।

ভেবেছিলাম ওঁদের বাড়ি হয়তো শহরের অন্য কোনও দিকে হবে। ঠিকানা মিলিয়ে পৌঁছে তো চক্ষুস্থির। "ভ্যান্ডার মে কলোনিয়াল ফিউনার‍্যাল হোম"-ই হচ্ছে ওঁদের দোকান কাম মওকান। শ্মশান কাম হাউস। ছোটখাট "হোয়াইট হাউসের" মতো বাড়িটার পুরো একতলাটাই পার্লার। একদিকে "এমবামিং রুম"। মৃতদেহ পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার পর তার চোখের পাতা, ঠোঁট—সব সূক্ষ্ম সেলাই করে বন্ধ করে দেয়। এরপর সাজগোজ, মেক-আপ। একদিন/দেড়দিন মতো দেহ সাজানো থাকে। লোকেদের দেখার জন্যে সকাল, সন্ধে মিলিয়ে ঘণ্টা চারেক "ভিউইং"-এর সময়। বাকি সময় কফিনসুদ্ধু খুব ঠাণ্ডা চেম্বারে রাখে। কবর দেওয়া নয়তো দাহ করার দিন সকালে ওখানেই ফিউনার‍্যাল সার্ভিস হয়।

অনেকদিন আগে এক আমেরিকান ভদ্রলোকের "ভিউইং"-এ ভ্যান্ডার মে কলোনিয়াল ফিউনার‍্যাল হোমে এসেছিলাম। তারপর এই এলাম। নেমন্তন্ন খেতে। শুধু অন্য ফ্লোরে। এই যা তফাত। লাঞ্চে বসে আরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই একই কথা ভাবছিল। হিলডা বলে এক মহিলা তো অ্যানাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন—বাড়িটা কি প্রথম থেকে ফিউনার‍্যাল হোম ছিল? নাকি তোমরা এরকম প্ল্যান করে তৈরি করিয়েছ?

আনা বললেন—আগে ফিউনার‍্যাল হোমই ছিল। আমরা মুভ করে আসার আগে ওপরের দুটো ফ্লোর এক্সপ্যান্ড করে নিয়েছিলাম।

—নীচে গেলে একটু ডিপ্রেসিং লাগে না?

—তুমি ডিপ্রেসিং বলছ? অনেকে জিজ্ঞেস করে কোনও আনক্যানি ফিলিং হয় কি না? কিন্তু ঠিক হয় না। তাছাড়া, আমাদের এনট্র্যান্স অন্যদিকে। "বিজনেস ফ্লোর" বলে ওদিকে তো যাইও না।

হিলডা বুঝলেন ভূত অবধি এগোনো যাবে না। আমি তাও জিজ্ঞেস করলাম—আপনার ছেলেরা ছোটবেলায় ভয় টয় পেত না?

—ওরা বড় হওয়ার পরে এখানে এসেছি। তখন ওরা দু'জনেই অ্যাপার্টমেন্টে চলে গিয়েছিল। আসলে বাড়ি আর বিজনেস অফিস এক জায়গায় হলে একটু সুবিধে হয়। আমার হাসবেন্ডের বয়স হয়েছে। চোখের প্রবলেম। রাতে গাড়ি চালাতে চায় না। আর, এ তো টোয়েন্টি-ফোর আওয়ার্সের বিজনেস।

সত্যি কথাই। জন্ম, মৃত্যু তো আর সময় বুঝে হয় না। রাত বিরেতে হাসপাতাল থেকে খবর এলেই বডি আনার ব্যবস্থা করতে হয়। তারপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ভিউইং-এর ব্যবস্থা। সবই ফিউনার‍্যাল পার্লারের কাজ। বুড়ো মালিক যদি রাতে চোখে কম দেখেন তবে তো খুব মুশকিল। সে জন্যেই বোধহয় এ বাড়িতে উঠে এসেছেন। মাঝরাতে গাড়ি

অ্যাকসিডেন্ট করে নিজে ভূত হওয়ার চেয়ে অন্য ভূতেদের সঙ্গেই আপস করে নিয়েছেন। বাড়ির একতলায় তাদের ফুলশয্যার ব্যবস্থা করে দিয়ে আড়ালে চলে যান। দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। বুড়ো-বুড়ির মাথায় একটাই কনসেপ্ট—"ওরা থাকে ওধারে"। ভয় ব্যাপারটাই তো আপেক্ষিক।

আমেরিকায় এখন কবরখানার জমিতেও বাড়ি উঠছে। "ভূতপূর্ব"দের জমিজমা বেদখল করে বিল্ডাররা হাউসিং ডেভেলপমেন্ট বানাচ্ছে। হ্যারি ওয়াটসন নামে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক এই সুযোগে একটু দাঁও মেরেছেন। তাঁর ধারণা, ভূত নয়, তিনি ইতিহাস কিনেছেন। ওয়াটসনের বাড়ির সামনের জমিতে বহু পুরনো একটি কবর আছে। জন টাইলার সিনিয়র নামে এক দেশভক্ত সাহেবের কবর। তিনি ১৮২৬ সালে মারা গিয়েছিলেন। জন টাইলার আমেরিকান রেভলিউশনে যোগ দিয়েছিলেন। নর্থ ক্যারোলাইনার কারবরো শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন প্রথম স্টুয়ার্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক। এছাড়া জনসেবামূলক কাজকর্মও করেছেন। জন টাইলারের অবদানের কথা ভেবে ওই কাউন্টির কমিশনাররা তাঁর কবর সরাতে দেননি। অধ্যাপক ওয়াটসনকে কবরসুদ্ধু জমি গছাতে গিয়ে বিল্ডার অবশ্য দশ হাজার ডলার কম নিয়েছে। ওই পাড়ার অন্যান্য বাড়িটার দাম দুশো তিরিশ হাজার থেকে তিনশো পঁচিশ হাজার ডলারের মধ্যে। ওয়াটসন কিনেছেন দুশো কুড়ি হাজারে। তাঁর ধারণা খুব জিতেছেন। কারণ কবরের আভিজাত্য ছাড়াও বাগানে প্রচুর বড় বড় গাছ আছে। আজকাল এইসব নতুন নতুন ডেভেলপমেন্টে তো বড় গাছওলা জমি পাওয়া যায় না। দুই ছেলেমেয়ে, কুকুর আর গিন্নিকে নিয়ে তিনি বাড়ি, বাগান, কবর—সবই উপভোগ করছেন। নথ ক্যারোলাইনার চ্যাপল হিল ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। এত বড় বাড়ি কেনার সাধ্যই ছিল না। নেহাত ভূতের ভয়ে বাকি লোকেরা পালিয়েছে বলেই ওরকম বনেদি পাড়ায় তাঁর পক্ষে বড় বাড়ি কেনা সম্ভব হল। তবে মিস্ত্রি, মজুররা বেশ বেগড়বাই করেছিল। বিল্ডার বলা সত্ত্বেও দু-একজন কবরের ধার মাড়ায়নি। বাড়ির কাজ করবে কি, জমিতেই পা দেয়নি। যাই হোক ভাত ছড়িয়ে কাক পাওয়া গেছে। নতুন বাড়িও উঠেছে। হ্যারি ওয়াটসন খুশি বটে, কিন্তু পাড়ার লোকেরা সকলেই তো আর সমান সাহসী নয়। কারও কারও গা ছমছম করে। কিংবদন্তি আছে জন টাইলারকে নাকি দাঁড়ানো অবস্থায় কবর দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন। ওই অঞ্চল পাহারা দিতে পারেন। এই শুনেই কিছু লোক ভয় পেয়েছে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বলেছেন—একদিন মাঝরাতে খুব ঝড় হল। হঠাৎ আমাদের গ্যারাজের দরজায় কী ধাক্কাধাক্কির আওয়াজ! তখন ওয়াটসনরা ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল। ওদের বাড়ি তো বন্ধ। কে ধাক্কা মারবে? মনে হয় ঝড় বৃষ্টিতে ভিজতে রাজি নয় বলে, কবর থেকে ভূতটাই পালিয়ে এসেছিল। আমরা দরজা খুলিনি।

আমেরিকায় ক্রমশ বাড়িঘরের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে, 'ডেভেলপার'রা শহর ছাড়িয়ে বহু দূরে দূরেও বাড়ি করতে বাধ্য হচ্ছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরনো চাষের জমি কিনে নিচ্ছেন। যেসব জমিতে আর চাষ আবাদ হয় না, সেখানে বাড়িঘর বানাচ্ছেন। কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে ওই জমির নীচে দেড়শো দুশো বছরের কবরখানা রয়েছে। বহু বছর কেউ জানতেও পারেনি। ১৮০০ শতক পর্যন্ত এ দেশের অধিকাংশ শহরেই কোনও নির্দিষ্ট

গোরস্থান ছিল না। গির্জার জমিতে কবর দেওয়া হত। কিন্তু তার বাইরে পৌর প্রতিষ্ঠানের জমিতে মৃতদেহ কবর দিতে দেওয়া হত না। বহু পরিবার নিজেদের জমিজমার মধ্যেই পারিবারিক গোরস্থানের জন্যে জায়গা বেছে নিতেন। সেখানে বংশপরম্পরায় মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। যেহেতু অধিকাংশ কবরের ওপরেই নাম ধাম লেখা বড় বড় ফলক বসানো হত না, কিংবা স্তম্ভের ওপর ক্রুশ বসানো থাকত না, ওপর থেকে সমান জমি দেখে কিছু বোঝারও উপায় নেই। হাউসিং ডেভেলপাররা চাষের জমি ভেবে কিনে নিচ্ছেন। সাব ডিভিশন অফিস থেকেও তেমন খবরাখবর দিতে পারে না। ভূত অথবা ভূতল রহস্য ভেদ করছে মিস্ত্রি, মজুররা। তারাই কবরখানার খবর দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত সারা আমেরিকার তুলনায় দক্ষিণের রাজ্যগুলিতেই জমি, বাড়ির ব্যবসা অনেক ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। গ্রাম বা শহরতলি প্রধান রাজ্যে লোকে প্রথমেই নিজস্ব একটি বাড়ি কেনার কথা ভাবে। কিন্তু অধিকাংশ নাগরিক মানুষ প্রথম জীবনে অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। এইসব কারণে আমেরিকার ভার্জিনিয়া, ক্যারোলাইনা ইত্যাদি রাজ্য থেকে শুরু করে দক্ষিণ প্রান্তের টেকসাস পর্যন্ত জমি, বাড়িওলা মানুষজনের সংখ্যাই বেশি। বিষয় সম্পত্তির দামও অনেক কম। যাই হোক, যত্রতত্র জমি কিনে বাড়ির ব্যবসা করতে গিয়ে বিল্ডাররা কবরে গিয়ে ঠেকছেন। আর কবর মানে তো কেবল একটি নয়, অন্তত ডজনখানেক পাওয়া যাচ্ছে। নর্থ ক্যারোলাইনার রকি মাউনটেনে থাকেন আর ওয়ার্ড সাটন নামে এক ভদ্রলোক। তিনি প্রফেশন্যাল গ্রেভ ডিগার। সমাধি খনন বিশারদ। যখনই কোনও বিল্ডার নতুন জমি কিনে একটি কবরের সন্ধান পান, তিনি খনন বিশারদকে ডাকেন। সাটন বিলক্ষণ জানেন, ওই একটিই নয়, আশেপাশে অন্তত আরও ডজনখানেক পাওয়া যাবে। তাঁর কোম্পানির কাজ হচ্ছে—ল্যান্ড ডেভেলপারের খরচে কবরগুলি তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় বসিয়ে দেওয়া। সে জায়গা অবশ্য পৌর বিভাগের অনুমোদন অনুযায়ী ঠিক করতে হবে। সাটন এখন ভীষণ খুশি। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হওয়াতে জমি/বাড়ি তৈরি আর বিক্রির হার খুব বেড়ে গেছে। সাটন প্রতি বছর পুরনো কবর উদ্ধারের ডাক পাচ্ছেন। তাঁর ধারণা এ বছরে অন্তত চারশো মতো মৃতদেহ তুলতে পারবেন। কেননা, গত বছরে সাড়ে তিনশো মৃতদেহ তুলেছিলেন। তার আগের বছরে দুশো। এভাবে প্রতি বছর বাড়তে থাকলে "ওল্ড গ্রেভ ডিগিং" ব্যবসা গোল্ড ডিগিং-এর মতোই হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তো কবর উদ্ধার নয়, কতরকম অভিজ্ঞতাও তাঁর হচ্ছে। সব মিলিয়ে তাঁর এখন দ্বিগুণ রোজগার।

নিয়ম হচ্ছে—সম্ভাব্য ক্রেতাদের মিথ্যে কথা বলে জমি/বাড়ি গছিয়ে দেওয়া চলবে না। এই আইনের নাম—"ডিস্‌ক্লোজার ল"। প্রত্যেক রিয়েল এস্টেট এজেন্ট তাঁর সম্ভাব্য ক্রেতাকে জানাবেন, যে-জমির ছ'ফুট নীচে কী আছে। জমির ম্যাপ দেখিয়ে কোথায় কোথায় কবর উদ্ধার করা হয়েছে, সব হেঁটে হেঁটে দেখিয়ে দিতে হবে। "পোলটারজাইস্ট" ছবিটা দেখেছিলেন? সেখানে ভূতের তাণ্ডব মনে পড়ছে? একটা পাজি এজেন্ট কবরখানার ওপর বাড়ি তুলে বিক্রি করে দিল। নাম কা ওয়াস্তে শুধু কবরের ওপরের ফলকগুলো ভেঙে দিয়েছিল। এদিকে ভেতরে ভূতেরা ইনট্যাক্ট। তারপর তো একেবারে বিভীষিকার রাজ্য। ছবিটা দেখতে গিয়ে কত লোক ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। এখন তাই "রিয়েলটর"রা

কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। হানা বাড়ি হোক, কবরখানা লোপাট করা জমি/বাড়ি হোক, তাকে ঝেড়ে কাশতেই হবে। এ জন্যে অবশ্য ব্যবসার ক্ষতিও হয়। বেশিরভাগ লোককেই "দোষ পাওয়া" জমি/বাড়িতে ঢোকানো যায় না। ওই ইতিহাসের মাস্টারের মতো সমাধিপ্রীতি আর কার থাকে? গোরস্থানের গণ্ডগোলে অনেকেই যেতে চায় না।

জমির নীচে কবরের সন্ধান পেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডেভেলপাররা সেগুলি অন্যত্র উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। যাঁরা করেন না, তাঁরা সম্ভাব্য ক্রেতাদের কবরের কথা জানিয়ে দেন। তারপর ক্রেতারা যা ভাল বুঝবেন, সে তাঁদের ব্যাপার।

এমনিতে গ্রেভ ডিগারদের কাজ হল কবরখানায় চাকরি করা। তারা স্থানীয় "সেমেটরি" গুলিতে বাঁধা মাইনের কাজ করে। কিন্তু ওই যে মিস্টার সাটন-এর কথা লিখেছি, তিনি আমেরিকার নানা জায়গায় ব্যবসা করেন। হাউসিং-ডেভেলপার রয় যেমন তাঁকে কবর তুলতে ডাকেন, সেরকম বড় বড় অফিস এবং রোড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি থেকেও ডাক আসে। কোম্পানিরা অফিস বড় করতে চাইছে, আরও জমি দরকার। কোথাও নতুন রাস্তা তৈরি হবে, জমি সমান করা দরকার। যে কোনও জায়গাতেই মাটির নীচে কবর থাকতেও পারে। যদি তা হয়, তখন সাটন "উৎখাতের" কাজ নেন। অনেক সময় ব্যক্তিগত কারণেও কেউ তাঁর আত্মীয়ের কবর এক সেমেটরি থেকে অন্য সেমেটরিতে নিয়ে যেতে চান। সাটন সব ধরনের কাজ করেন। মজুরিও ভালই নেন। যদি শুধু একটি মৃতদেহ তুলে অন্য জায়গায় কবর দিতে হয়, তবে এক হাজার ডলার নেন। কিন্তু অনেকগুলি হলে ডিসকাউন্ট দেন। তখন দেহ পিছু সাড়ে তিনশো থেকে পাঁচশো ডলার মতো নেন। ওই খুচরো আর পাইকারির তফাত আর কি! এগুলি বহু পুরনো কবর। অন্তত একশো বছর আগেকার। সাটন দেখেছেন—শরীর বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দাঁত, কাঁধ আর হাতের সংযোগ স্থানের হাড়, কোমরের পেছন দিকে নীচের অংশের হাড়া আর উরুর হাড়—দেহের এই অংশগুলি সব শেষে বিনষ্ট হয়। ওইসব টুকরো টুকরো হাড় নিয়েই সাটন "মৃতদেহ" স্থানান্তরের কাজ শেষ করেন। সাটনের কর্মপদ্ধতি খুব পেশাদারি। প্রথম কাজ হচ্ছে কবর খোঁজা। সে জন্যে বেজায় লম্বা এক লাঠি নিয়ে আসেন। মাটির নীচে লোহার লাঠি চালিয়ে দ্যাখেন শক্ত পাথরে ঠেকছে কি না। যদি নিরেট পাথরে টেকে, বুঝতে হবে ওখানে কবর থাকার সম্ভাবনা কম। কিন্তু লাঠি যদি ক্রমশ নরম মাটিতে নেমে যেতে থাকে, তাহলে কবর থাকতে পারে। এরপর ট্র্যাকটর চালিয়ে কবর খুঁজে বার করেন। শাবল দিয়ে হাড় গোড় উদ্ধার করে ছোট্ট একটি পাইন কাঠের বাক্সে ভরে নেন। দু' ফুট লম্বা, ষোলো, ইঞ্চি চওড়া আর এক ফুট উঁচু বাক্সগুলো সাটন নিজেই তৈরি করেন। যতদিন না কবরের কাজে লাগছে, তিনি আর তাঁর কর্মচারীরা বাক্সগুলোর ওপর বসেন। ডেস্কের মতো ব্যবহার করেন। খাবারের ট্রে হিসেবেও দিব্যি কাজ চলে যায়। সব শেষে গোরস্থানে প্রস্থান। একশো/দেড়শো বছরের মৃতদেহের জন্যে সাড়ে তিন হাত জমি লাগে না। প্রমাণ মাপের কফিনও লাগে না। শুধু অস্থি নিমজ্জনের জন্যে দু' ফুট বাই ষোলো ইঞ্চি কাঠের বাক্স।

লোকে কতরকম ব্যবসা করে। এক বাঙালি ভদ্রলোক ট্যুরিস্ট ভিসায় আমেরিকায় এসেছিলেন। দেশে ফিরতে আর মন চায় না। সানফ্রানসিসকোর এক "টুম্ব স্টোনের" দোকানে কাজ জুটিয়ে নিলেন। দোকানের কালো মালিক তাঁকে স্পনসর করবেন, এই

আশায় কবরখানায় ফলক ঘাড়ে করে নিয়ে যেতেন। চটপট গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্যে মালিকের মেয়েকে কাচ্ছা বাচ্চা সমেত বিয়েও করে ফেললেন। ইমিগ্রেশন পাওয়ার পরে সমাধিওলার মেয়ের প্রেমের সমাধি হয়ে গেছে। সেই কৃষ্ণকলিকে "চলি" বলে বাঙালি লস এঞ্জেলস চলে গেছেন।

ভূত বাংলো থেকে সমাধি ফলক...নিশুতি রাতে আর বেশি খননকার্যে দরকার নেই। ভূত ভূত বলে ডাকাটাও উচিত হয়নি। ক্ষম মোরে প্রেতেশ্বরঃ।

৯ মে ১৯৯৮

খেলাঘরের সংসার

বাড়িটা এমনিতেই খেলনার গোডাউন। অ্যাটিকে (ছাদের ঘরে), গ্যারাজে, বেসমেন্টের ক্লসেটে বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে অজস্র পুরনো খেলনা। কোনও ঘরে দেরাজ খুললে অপলকে চেয়ে থাকে সোনালি চুলের পোর্সেলিনের পুতুল। কোথাও বসে আছে ধুলোপড়া ভিডিও গেমের বাক্স। গ্যারাজের একধারে কট্‌কটে কমলা রঙের টিনের কুকিং রেঞ্জ আর খেলার রেফ্রিজারেটর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নিরবধি কাল। তবু মেয়ের দুঃখ, কেন তার মার ছেলেবেলাকার খেলনাগুলো নিয়ে একবারও তার খেলা করা হল না। অথচ তার খেলার বয়স কবেই পার হয়ে গেছে।

আমার কখনও মনে হয় না এ যুগের ছেলেমেয়েদের চেয়ে আমাদের খেলার সামগ্রী কোনও অংশে কম ছিল। আমার মেয়ের বারবি ডলের যত সংগ্রহ-ই থাক, কথা বলা পুতুল, জলপান এবং বিয়োগ করা সদ্যোজাত পুতুল, বাজনার সঙ্গে নেচে চলা ব্যালেরিনা পুতুল, বৈচিত্র্য যতই থাক। পাড়া মাৎ করে পুতুল বিয়ে দেবার আনন্দ সে পায়নি। ফুচকার সাইজের লুচির সঙ্গে গুঁজিয়া আর দানাদার সাজিয়ে বরযাত্রীদের নেমন্তন্ন খাওয়ানোর মজা সে কবে পেয়েছে? সে খেলার ছুরি দিয়ে গাজর কেটে নকল কুকিং রেঞ্জে বেক করতে দিয়েছে। আমি কালীঘাটের খুদে লোহার বঁটিতে ফার্নপাতা কুচিয়েছি। লোহার উনুনে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট্ট কড়া বসিয়ে 'তরকারি' রেঁধেছি। সে স্ক্র্যাব্‌ল্, পাজ্‌ল্, মনোপলি, ট্রিভিয়াল পারসুট আর লেগো খেলেছে। আমরা মেকানো, ওয়ার্ড মেকিং আর "জ্ঞানের আলো"র বাক্সে টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে কত জ্ঞান সঞ্চয় করেছি। তার ডল হাউসে চীনে মাটির বেসিন, বাথটব থাকলেও আমাদের জুতোর বাক্স দিয়ে তৈরি তিন মহলা বাড়িতে ফার্নিচার কিছু কম ছিল না। সেই সংগ্রহশালায় রথের মেলা থেকে কেনা সত্যিকারের কাঠের খাট, আলমারি আর ড্রেসিং টেবিল শোভা পেত। দুই পাল্লার আয়নার কী বাহার! খাটে লাল টুকটুকে গদি পাতা থাকত। ঠাকুরের খাট বিছানা থেকে রিজেক্ট হয়ে যাওয়া সাটিনের লেপ, বালিশ, পাশ বালিশ—সব হাতিয়ে নিয়ে পুতুল সাম্রাজ্য সাজাতাম আমরা। ভগবানের দান। মানুষের দান তো ছিলই। এক একটা জন্মদিনে কম

লাভ হত? গোলাপি নয়নে আকাশি রং করার কাঠের গদি আঁটা গোল গোল সোফা সেট ছিল না আমাদের? চীনে মাটির গোলাপ আঁকা টি সেট দেখিনি আমরা? বেঁটে টি পটে চিনির জল ভর্তি করে ছোট্ট ছোট্ট কাপে ঢেলে ঢেলে মিছিমিছি চা খাইনি প্রতিদিন? দম দেওয়া মোটর গাড়ি, ভাল্লুক পুতুল, সেলুলয়েডের 'মেরি গো রাউন্ড", সব কটার চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারোটা বাজিয়েছি কোন কালে? কোন বাজনা বাজাইনি? ট্যাং ট্যাং করে পুচকে পিয়ানো বাজিয়েছি। লম্বা জলতরঙ্গে লাগাতার কাঠি পিটিয়েছি। দমাদ্দম পিটুনি খেয়ে ড্রাম ফেঁসে গেছে। কর্তালের মতো দু'দিকের হ্যান্ডেল ধরে হাপরের মতো দেখতে কি একটা বাজিয়েছি অনবরত। সাত সকালে মাটির বেহালা নিয়ে ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর : মুঝকো অপনে গলে লা গা লো অ্যায় মেরে হামরাহি...''। খেলার সংসারে প্রহরে প্রহরে কন্‌সার্ট।

শুধু খেলনার আলমারির ভেতরকার জিনিসগুলো টেনে নামানোর উপায় ছিল না। অবশ্য হাতির দাঁতের বুদ্ধমূর্তি কিংবা গোরুর গাড়ি নিয়ে কোন খেলাই বা জমত? যাই হোক, খেলার জন্যে উপকরণের অভাব ছিল না। হয়তো সেই না দেখা সাম্রাজ্যের জন্যেই আমার মেয়ের দুঃখ থেকে গেছে। ওর খেলার সাজ সরঞ্জামের বহর দেখে কত সময় আমার হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর গল্প করেছি তো। একবার ক্রিসমাসের সময় খেলার রান্নাঘরের জন্যে একটা ব্লেন্ডার চেয়ে নিয়েছিল। সেই ছোট্ট মিক্সিতে ফলের রস টস করা যেত। মিল্‌ক শেক, ব্যানানা শেকও তৈরি হত। আমার যে ছোটবেলার রান্নাঘরে ব্লেন্ডার ছিল না, কিন্তু সত্যিকারের ছোট্ট শিলনোড়া ছিল। আর মাঝে মাঝে বাড়িতে "শিল কাটাও"-ওলা এলে সেই ছোট্ট শিলনোড়াতেও খুদে খুদে চন্দনের ফোঁটার মতো দাগ দিয়ে যেত, সে কথা শুনে মেয়ে ওই দুটো জিনিসের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পায়নি বটে। কিন্তু এটুকু বুঝেছিল খেলার সংসারে তার মার কোনও অভাব ছিল না।

আসলে আমেরিকাতে এখন পুরনো দিনের খেলনার কদর ক্রমশ বাড়ছে। অ্যান্টিক শপে গেলে দেখি বহু পুরনো খেলনা, পুতুল বিক্রি হচ্ছে। ছুটির দুপুরে লোকেরা বাড়ির উদবৃত্ত জিনিস দিয়ে গ্যারাজ সেল দেয়। সেখানেও খেলনা পাতি নামিয়ে দেয়। ডল হাউসগুলো দেখার মতো। একবার একটা ছোট্ট কাঠের দোলনা দেখেছিলাম। মাথায় কুঁচি দেওয়া কাপড়ের ঘেরাটোপ। ভেতরে টুপি সোয়েটার পরা খোকাপুতুল আধো ঘুমে এলিয়ে আছে। বুড়ি আবার ঘুরতে ফিরতে দোলনা ঠেলে দিয়ে যাচ্ছিল।

পুরনো ছড়ার বই, রূপকথার বই, ডিজনির কার্টুনের বই এসবই এখন সংগ্রহের বস্তু। ডক্টর স্যুস হলেন আমেরিকার যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর বই শিশুদের নিত্যসঙ্গী। ছবির ধরনগুলো সুনির্মল বসুর ছড়ার ছবির মতো। সেই বই-এর কয়েকখানা কবে কোন বন্ধুর ছেলেকে দান করে বসেছিলাম। তখন কি জানি যোগীন সরকারকে খয়রাত করা মানে বইগুলোর মালিকের শৈশবের অমূল্য সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া! হাসি খুশি চলে গিয়ে রীতিমত কান্নাকাটি। এখন নতুন করে ডক্টর স্যুসের বইগুলো অর্ডার দিয়ে আনালেও নাকি হবে না। লাল, নীল ক্রেয়ন ঘষা পৃষ্ঠাগুলো কে ফিরিয়ে দেবে?

আজকাল খেলনার দোকানে হাই টেক্‌নোলজি ভিডিও গেমের পাশাপাশি আবার ফিরে আসছে স্কিপিং রোপ, মার্বেলের বাক্স, 'ট্রোলস' নামে আদিবাসী চেহারার ছিমছাম পুতুল,

স্ক্র্যাবলস আর রবারের নরম খেলনা। ক্রেতারা ভিডিও গেমের বদলে এ ধরনের খেলার জিনিস কিনছেন বুঝে দোকানের মালিকরা স্টক বাড়াতে শুরু করেছেন। তাঁরা বহুদিন আগেকার ক্যাটালগ হাতড়ে আবার হারানো খেলনা উদ্ধার করছেন। বারো, চোদ্দো বছর আগে দোকানে দেখতাম 'ক্রিপ ক্রলার' নামে রবারের সরীসৃপ ধরনের পোকামাকড়। আবার তারা দোকান ছেয়ে ফেলেছে। এক ফুট লম্বা নরম প্লাস্টিকের তৈরি সেই জি আই জো সৈনিক পুতুলও আবার সেলোফেনের মোড়ক থেকে উঁকি দিচ্ছে। অথচ মাঝে এদের কোনও চাহিদা-ই ছিল না। "প্যাকম্যান", "অ্যাটারি"র মতো কমপিউটার গেম এসে ছোটদের মনোহরণ করেছিল। তখন নরম নরম নকল পোকামাকড় নিয়ে কে খেলবে? কিন্তু ক্রমশ এমনই হল আমেরিকার বাজার যে দামি দামি খেলনা কিনতে বাবা মায়ের প্রাণ যাচ্ছে। ফলে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কমদামি জিনিস। একশো ডলারের গেমের বদলে দশ ডলারের ট্রোলস পুতুল। ব্যবসায়ীরাও অতিরিক্ত দামি খেলনা তৈরির ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। বরং যে জিনিস সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে, ক্রিসমাসের জন্য ঢালাও অর্ডার দিয়ে সে সবই আনাচ্ছেন তাঁরা। মা, বাবা, দাদু, দিদিমা সবাই খুশি। সাধ্যের মধ্যে কত কিছু কিনে দেওয়া যাবে। ছোটদের বোঝাতে হবে, কমপিউটার গেমের বদলে এমন জিনিস পাবে তোমরা, যা নিয়ে এক সময় তোমাদের মা, বাবারাও খেলেছে। মা যেমন ট্রোলস পুতুল নিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, তুমি সেই বামন মার্কা ঝাঁকড়া চুলো উদোম পুতুল নিয়ে খেলবে। ট্রোলস পুতুলগুলো মুখখানা অনেকটা ই টি-র মতো। আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী ট্রোল এক ধরনের বামন বা দৈত্য। টিউটোনিক লোকগাথায় এদের কথা আছে। এরা নাকি গুহায় থাকত, পাহাড়ে পাহাড়ে চলে বেড়াত। পুতুলগুলো বেশির ভাগই খয়েরি রঙের নরম প্লাস্টিকে তৈরি। ছেলেমেয়ের ভেদাভেদ নেই। ই টি-র মতো মায়াময় চাউনি আর মাথার ওপর খাড়া খাড়া এক বোঝা খড়ের আঁটির মতো চুল। চাবির রিং থেকে গাড়ির আয়নার পাশে সর্বত্র এখন তাদের দোদুল্যমান মূর্তি। এক ইঞ্চি থেকে দু'ফুট পর্যন্ত সাইজের ট্রোলস আপাতত হু হু করে বিক্রি হচ্ছে। কেউ তাদের ছোট্ট জিনস আর টপ পরাচ্ছে। কেউ পরাচ্ছে স্কার্ট, ব্লাউজ। কেউ সাজাচ্ছে নাবিকের পোশাকে। যার যেমন ইচ্ছে। "নসুবালা"রা সেজে সেজে হয়রান!

এদেশে "টরেস আর আস্" খেলনার দোকান হিসেবে খুবই নামকরা। তাদের মুখপাত্রদের ধারণা আমেরিকায় রিসেশনের বাজারে সাধারণ মানুষ এ ধরনের সাদাসিধে জিনিসই কিনতে চায়। যাতে ব্যাটারি কেনার খরচ নেই, হাজার রকম আনুষঙ্গিক উপকরণ কেনার ঝক্কি নেই, সহজে ভেঙে চুরে যায় না বা মেশিন বিকল হয়ে বসে না, সেরকম খেলনাই তাদের কিনতে সুবিধে হয়। ছোটদের কাছে প্রধান আকর্ষণ বাজারে কী খেলনা এসেছে আর সকাল, সন্ধে টি ভি-র বিজ্ঞাপনেই বা কোন কোন খেলনা দেখাচ্ছে। বাড়িতে যেসব ক্যাটালগ আসে, তাতেই বা কোন খেলনার রঙিন ছবি বড় করে দেওয়া হচ্ছে। এই বুঝে খেলনা কোম্পানিরা সাধারণ খেলনাগুলোকেই নতুন করে আকর্ষণীয়ভাবে দেখাচ্ছে। আর ছোটরা তাতেই উৎসাহিত। খেলনা কোম্পানির বক্তব্য, পুরনো খেলনাই যে ভাল জিনিস আর নতুন নতুন দামি 'গেম'গুলো তামাদি হয়ে যাচ্ছে, তা নয়। শুধু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে সাময়িকভাবে তারা এই পন্থা নিয়েছে। আবার সুদিন

ফিরলে অন্যরকম হবে। ষাটের দশকে সেই নভেলটি কোম্পানি ওই 'বামন দৈত্য' বাজারে ছেড়েছিল। আবার তারা পূর্ণ উদ্যমে টোকা-চুলো পুতুল বানাচ্ছে। বেগুনি, গোলাপি, কমলা, সবুজ নয়তো তুঁতে রং-এর চুলের বোঝা মাথায় নিয়ে ট্রোলস জন্মাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

এই যে, খেলনার পেছনে বেশি খরচ না করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে, এর মূলে কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই একমাত্র কারণ নয়। অন্য কারণও আছে। এখন যারা বাবা, মা হয়েছে তারা তাদের ছেলেবেলার কিছু অনুষঙ্গকে গান, বই আর খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে চাইছে। তাদের শৈশব, কৈশোরের স্মৃতি বহনকারী সেই সব অমূল্য বস্তুকে ফিরে পেতে হলে বাড়িতে কমপিউটার গেম এনে লাভ নেই। বিচিত্র কলকব্জা সুদ্ধু চমক দেওয়া খেলনা কিনে এনে হারানো দিনের পুতুলের মুখ দেখা যাবে না। তাদের বিশ্বাস—যে খেলা তাদের আনন্দ দিয়েছে, সেই খেলাই ছেলেমেয়েদেরও যথার্থ আনন্দ দেবে। একেবারে সেই পরিবেশটি ফিরিয়ে আনা চাই। এখানে কিছু বিপরীত ভাবনাও কাজ করছে। এই মায়েরা কলেজ জীবনে নারী স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে বলেছিল—আমরা অন্তর্বাস পুড়িয়ে ফেলাতেই বিশ্বাসী। পুতুল খেলার মধ্যে দিয়ে আমাদের সংসারে-বন্দি থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ছেলেদের খেলা আর মেয়েদের খেলা বলে আলাদা কিছু নেই। সব কিছুতেই সম অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আজ তারাই মা হয়ে নিজের মেয়েদের জন্যে ইলেকট্রনিক খেলনার বদলে বারবি ডল আর তার ঝলমলে পোশাক কিনে আনছে। যে পুতুল নিজেরা খেলেছে, মেয়েকে সেই পুতুল আর তার ছোট্ট ছোট্ট রঙিন অন্তর্বাস, বহির্বাস, হিল তোলা জুতো কিনে দিচ্ছে। বাবারাও উলটো সুর গাইতে কিছু কম যায় না। আমেরিকা 'যুদ্ধবাজ' দেশ বলে এক সময়ে তাদের কী আন্দোলন। ভিয়েতনাম নিয়ে কত পথসভা! মিলিটারি ড্রাফটে নাম না লেখানোর জন্যে দলে দলে ওয়াশিংটনে গিয়ে জিগির দেওয়া। আবার এখন তারাই সস্তা দরে জি আই জো পুতুল কিনে ছেলেকে উপহার দিচ্ছে। কারণ ওই বন্দুক ঘাড়ে রবারের সেপাই ছিল তার নিজের খেলার সাথী। শৈশবের এমনই মহিমা আর বাৎসল্যও এমন বিষম বস্তু, যে যৌবনের আদর্শ, মতবাদ সব চুলোয় যাবার দাখিল। "হ্যামব্রো কোম্পানি" এক সময় ওই জি আই জো পুতুল বানিয়ে খুব ব্যবসা করেছিল। মাঝে শান্তিকামী মার্কিন যুবক আর ইলেকট্রনিক খেলনার তাড়া খেয়ে রবারের সেপাইরা বন্দুক বগলে পালিয়েছিল। এখন আবার যুগের দাবিতে ধড়াচুড়ো পরে ফিরে এসেছে।

খেলনা ব্যবসায়ীরাও বেশ সুবিধে পেয়ে গেছে। কারখানায় নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি আর ছাঁচ বানাতে হচ্ছে না। পুরনো দিনের ছাঁচে ঢেলে প্লাস্টিকের টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর ছানা আর কেঁচো বানিয়ে দিব্যি ব্যবসা জমে যাচ্ছে। দামি দামি সদ্য আবিষ্কৃত খেলনার অগ্রিম অর্ডার দেওয়া মানে প্রচণ্ড খরচের ধাক্কা ছিল। এখন তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনের খরচও অনেক কমিয়ে দেওয়া গেছে। "এস নভেল্‌টি" কোম্পানির অনুমান এ বছরের মধ্যে মোট ১২৫ লক্ষ ডলারের বামনাবতার (ট্রোলস) বিক্রি হয়ে যাবে। খেলনার ব্যবসায়ে কোনও বিশেষ খেলনা যদি এক লক্ষ ডলারের বেশি বছরে বিক্রি হয়, তো তার খুব কাটতি আছে বলে ধরতে হবে। এ বছর বারবি পুতুল আর "নিনজা টার্টলস" নামে

কচ্ছপ সম্প্রদায়ের খেলনার বিক্রি ইতিমধ্যে এক কোটি ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। 'বামনাবতার' তৈরি করছে অন্য কোম্পানিরাও। রঙিন বুড়ির চুলের মতো কেঁশো ভর্তি মাথা নিয়ে তুলতুলে বামনগুলো নাকি তাদের কোম্পানি থেকেও হু হু করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এক লক্ষ ডলার মতো বাড়তি বিক্রি। রিসেশনের বাজারে তাদের পোয়া বারো। নিখরচায় এই 'ট্রোলসগুলো তৈরি করতে লাগে পুতুল পিছু মাত্র দুই ডলার। ছোটদের এই পুতুল ধরিয়ে দিয়ে দোকানদার আর বাবা, মা দু'দলই নিশ্চিন্ত। খেলনার ব্যবসায়ীরা বলছেন প্রচণ্ড দামি দামি খেলনা তৈরির যা খরচ ছিল, বামনের পেছনে সে তুলনায় নাম মাত্র খরচ হচ্ছে। লাভ হচ্ছে অনেক বেশি। আর এমন চাহিদা বেড়েছে যে বহু দোকানে এখন শুধু ট্রোলসের স্টক মজুদ রাখাই মস্ত কাজ হয়েছে।

ইদানীং বাড়িতে হাতে হাতে খেলনা, পুতুল তৈরি করার রেওয়াজও ফিরে আসছে। শিকাগোতে "ম্যাকসওয়েল ওয়েলিংটন" কোম্পানি খেলনা তৈরি করার যাবতীয় উপকরণ বিক্রি করে। এরা বহু বছর ধরে প্লাস্টিকের লেস তৈরি করে। প্লাস্টিকের লেস নানা শৌখিন জিনিসের জন্যে লাগে। পুতুলের জন্যে তো বটেই। চাবির রিং বানাতে, ফুল তৈরি করতে, খেলনার বাড়িঘর সাজাতে, বারবি পুতুলের পোশাক সেলাই করতে, নানা কাজে ব্যবহার হয়। এ বছর নাকি রেকর্ড সেল হয়েছে। কুড়ি লক্ষ ফুটেরও বেশি লেস বিক্রি হয়ে গেছে। আমেরিকার দাদু-দিদিমাদের জন্যে ছোটরা চাবির রিং আর ফুল তৈরি করবে। দিদিমা-ঠাকুমারা নাতনিদের জন্য পুতুল সেলাই করবেন। লেসে লেসে ছয়লাপ কাণ্ড। গার্লস স্কাউট ক্যাম্পে মেয়েরা লেস দিয়ে বেল্ট, আর হাত, পায়ের গয়না তৈরি করছে। পুতুল তৈরির উপকরণও খুব বিক্রি হচ্ছে। ক্র্যাফ্‌ট ক্লাসে ছোটরা এখন মহাব্যস্ত। একেকটি পুতুল এমন দেখতে হচ্ছে যে দোকানের পুতুলকে হার মানায়। সাজসরঞ্জামে তো কোনও ত্রুটি থাকে না। ওয়েস্ট্রিম ক্র্যাফ্‌টস করপোরেশন নামে অন্য একটি কোম্পানিও এখন হাতের কাছের উপকরণ বিক্রি করে প্রচুর আয় করছে। পাইপ পরিষ্কার করার সরু সরু তার, আইসক্রিমের কাঠি—এসবই খেলনা তৈরি করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুতুলের কাঠামো বানাতে কত কী লাগে! টেকসাসের ডালাসে "মিশেল স্টোরস ইনকরপোরেটেড" নামে একটি কোম্পানির মূল অফিস। এদের সারা আমেরিকায় ১৬০টি ক্র্যাফ্‌ট স্টোর আছে। এরা আবার "নিউ কিডস ক্লাবস" নামে একটা ক্লাব খুলেছে। নাম মাত্র চাঁদা দিয়ে যেসব ছোট ছেলেমেয়েরা এর সদস্য হবে, তারা অনেক কম দামে খেলনা তৈরির উপকরণ কিনতে পারবে। এখনই নাকি সারা আমেরিকায় সত্তর হাজার খুদে সদস্য আছে। দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে খেলনার বাজার করার চেয়ে, সবরকম উপকরণ আনিয়ে নিয়ে বাড়িতে বসে বসে সকলের সঙ্গে খেলনা তৈরি করার মজাও কিছু কম নয়। অনেক কম খরচে প্রায় দোকানের মতোই একটি ভাল্লুক, খরগোশ নয়তো টয়ট্রেন বানানো যাচ্ছে। কত রকম গাড়ি তৈরি করা যাচ্ছে। বাড়ির মডেলগুলো দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। আমাদের এখানে "লি-ওয়ার্ড" নামে এরকম একটা ক্র্যাফ্‌টস স্টোর আছে। আমেরিকায় যত রকম বাড়ি দেখি, অবিকল তার ছোট্ট সংস্করণের জন্যে উপকরণ সুদ্ধু বাক্স বিক্রি হয়। স্প্লিট লেভেল, বাই লেভেল, র‍্যাঞ্চ হাউস, ভিকটোরিয়ান স্টাইল, জর্জিয়ান স্টাইল, সেন্টার হল কলোনিয়াল, কেপ কড স্টাইল, ইংলিশ ডিউডর স্টাইল—সব মডেলের জন্যে প্রতিটি জিনিস মজুদ

আছে। যার আসল বাড়ি যেমন, সে হুবহু একটি মিনিয়েচার বানিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারে। ইদানীং বাড়ি তৈরির উপকরণও নাকি বেশ বিক্রি হচ্ছে। কেনা ডলস হাউসের তুলনায় খরচ হবে চার ভাগের মাত্র একভাগ।

স্ক্র্যাবল এক সময় সবাই খেলত। তারপর ভিডিও গেমের যুগে স্ক্র্যাবল পুরোপুরি বাক্সবন্দি হয়ে রইল। আমাদের লুডো খেলার মতো। আবার এ বছরে স্ক্র্যাবল বিক্রি হয়েছে ১.৭ লক্ষ বাক্স। তিন বছর বাদে বাড়তি ৫০০,০০০ বাক্স বেশি বিক্রি হল। হয়তো ড্যান কুয়েলের "পোট্যাটো" বানানোর দৌড় দেখে বাবা মায়েরা স্ক্র্যাবল কিনে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কোনও কোনও খেলা এমন জমে যায় যে সহজে সেগুলো জনপ্রিয়তা হারায় না। অর্থের সঙ্গতির সঙ্গেও যে তার নিবিড় কোনও সংযোগ আছে এমন নয়। আমেরিকাতে এসে পর্যন্ত কত নতুন নতুন খেলা দেখলাম। তবু পুরনো খেলার নেশা যায় না। ক্রসওয়ার্ডের নেশা এ জীবনে ঘুচবে না। আজও 'বেসবল' ভাল বুঝি না। বাঙালি ছুটির দিনে গলফ কোর্সে যাক, স্কোয়াশ খেলুক, বোলিং অ্যালিতে যাক, যাই-ই খেলুক না কেন, বাঙালি পিকনিকে গিয়ে সকার আর ক্রিকেট খেলবেই। প্রতি বছর পিকনিকের মাঠে ব্যাট বল আর উইকেট নিয়ে হইহল্লা। অনভ্যাসে প্রত্যেকেই ঘন ঘন আউট এবং তারপর চিৎকার করে স্বগতোক্তি "প্র্যাকটিস নেই। ফর্ম পড়ে গেছে।" আসলে মাঠে নামাতেই যত উত্তেজনা। আমরা এখনও মিউজিক্যাল চেয়ার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দৌড়ই আর মধ্যেখানে বসে চোখবাঁধা গান্ধারীর মতো হ্যারি বউদি হারমোনিয়মে এলোপাথাড়ি বাজনা বাজাতে বাজাতে হুট করে থেমে যান। আমাদের স্পুন রেসের সময় চামচের গায়ে আর মার্বেলের নীচে চুইংগাম লাগাতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে ভারতী। একটা প্রাইজ নিয়ে নাকি বাড়ি ফিরবেই। সবচেয়ে জমে যায় "টাগ অফ ওয়ার" খেলা। আমরা উত্তর নিউ জার্সি আর দক্ষিণ নিউ জার্সি ভাগ হয়ে যাই। আবার বুদ্ধি করে স্বামী, স্ত্রী প্রতিপক্ষ হয়ে যাই। আবার বুদ্ধি করে স্বামী, স্ত্রী প্রতিপক্ষ হয়ে যাই, যাতে অন্তত একজন জিতে যাওয়া দলে থাকতে পারি। কত শলা পরামর্শ, কত ফন্দি ফিকির। রুমাল জড়িয়ে শক্ত হাতে দড়ি ধরা, যাতে হাত ছেড়ে না যায়। মাটিতে নাকি পা গেঁথে সকলের সঙ্গে পায়ে পা ঠেকিয়ে রেডি হতে হবে। কোন দলে বেশি মোটারা গিয়ে ভিড়েছে, তাই নিয়ে তর্কাতর্কি। আমাদের হাইস্কুলের ছেলেমেয়েরা হেসে বাঁচে না। তখন তাদের হাতেই হুইসল। পিঁ পিঁ করে বাজিয়ে দিতেই সমস্বরে চিৎকার আর হুড় হুড় করে দড়ি টানা। বিশাল বপু এক মহিলা গিয়ে ছিটকে পড়লেন। পেছনের লাইনে যাদুগোপালের ঘাড়ে। মহিলার কেডস পরা পায়ের লাথি খেয়ে রসিক যাদুগোপালের কাঁপা কাঁপা গলায় আর্তনাদ—"দেহি পদপল্লব মুদারম।" এই সব খেলা গত কুড়ি বছর ধরে খেলে আসছি। স্কুলে শেখা খেলাগুলোই আমাদের পেয়ে বসেছে। এদেশের ছেলেমেয়েরা জীবনেও এসব দেখেনি। পিকনিকে গেলে ওরা বাস্কেটবল আর ভলিবলে ভিড়ে যায় প্রতিবার।

কয়েকটা খেলা শুধু সঙ্গে আনতে পেরেছি। খেলনাগুলো আর কোথায় ফিরে পাব? কুঁচি দিয়ে কাপড় পরানো ঘোমটা দেওয়া ডলপুতুল, হুঁকো হাতে দাড়িওলা, স্প্রিং-এর ঘাড় নড়নড়ে বুড়ো, কৃষ্ণনগরের আরশোলা, টিকটিকি, ট্রামের মতো দেখতে লাল টুকটুকে

জাপানি গাড়ি আর গোলাপ ফুল আঁকা চীনেমাটির টি সেট, পুতুলের খাট আলমারি আমি কবেই হারিয়ে ফেলেছি। আবোল তাবোল, টুনটুনির বইগুলো কে কোথায় নিয়ে গেছে! শুধু কবি বিষ্ণু দের দেওয়া "নালক" আর গিরীন্দ্রশেখর বসুর "লালকালো" অক্ষত অবস্থায় এদেশে এনেছি. বইপত্রই তবু কিছু থেকে গেছে। আমার হারানো সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

গ্রিটিংস কার্ড

কেলি মার্শালের যমজ মেয়ে হবার খবরে আমাদের লেক কমিউনিটি সেন্টারে বেশ সাড়া পড়ে গেল। কেলি দীর্ঘকাল নিঃসন্তান থাকার পরে অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে একসঙ্গে জোড়া সন্তানের মা হয়ে গেছে—ওর এরকম ডবল প্রমোশনে আমরা খুব আনন্দ পেলাম। এখন আমাদের সামনে ঢের কাজ। ফুল নিয়ে ওকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া, বাড়িতে গ্রিটিংস কার্ড পাঠানো। তারপর দুই কন্যার উপহার-টুপহার নিয়ে যাওয়া তো আছেই।

এদেশে কার্ডের দোকানে যাওয়া প্রায় পানের দোকানে যাওয়ার মতোই নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠছে ক্রমশ। বছরের পর বছর ধরে শুভ, অশুভ নানা ঘটনায় কত লোককে কত কার্ড পাঠিয়েছি, যোগ করলে নির্ঘাৎ দু'লক্ষ মতো দাঁড়াবে। বড়দিনের সময়েই বড় পর্বটা যায় অবশ্য। বাকি সময়ে বিয়ে, বিয়ের তারিখ, জন্মদিন, জন্ম ঘোষণা, সাধ, আইবুড়ো ভাত, অন্নপ্রাশন, নতুন বাড়ি কেনা, কিন্ডারগার্টেন থেকে ক্লাস ওয়ানে ওঠার গ্র্যাজুয়েশন, হাইস্কুল ও কলেজ গ্র্যাজুয়েশন, শোকবার্তা, দুর্ঘটনা, হাসপাতালে থাকা, অপারেশন হওয়া, হঠাৎ মনে পড়া, দীর্ঘদিন ভুলে থাকার পর লজ্জা পেয়ে কৈফিয়ৎ যাবতীয় ব্যাপারে কার্ড পাঠানোর রেওয়াজ এদেশে।

কেলির জন্যে কার্ড খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। হয় কারও একটাই ছেলে হয়েছে। না হয় একটা মাত্র মেয়ে জন্মেছে। ছেলেদের কার্ডের রং বেশির ভাগ আকাশি, নয়তো হলুদ নীলে মেশানো নকশা। ভেতরের গাবদা গোবদা বাচ্চা। ফুটবলে লাথি মারছে। নয়তো গ্যাঁট হয়ে সাইকেলে বসে অনাবিল হাসছে। ছেলের বাবা-মার উদ্দেশ্যে কত কথা—

আজ তোমাদের কোলে
আহা! এল এক মোটা ছেলে
ঘর ভরে যাক ব্যাট আর বেসবলে...

মেয়ের কার্ডেরও কী বাহার। গোলাপি আর সাদার নকশাই বেশি। ভেতরে পালঙ্কের মতো বিছানায় শুয়ে রাজকন্যার মতো গোলাপি মেয়ে। চোখে ঘুম ঘুম চাউনি। সেখানেও কত কবিতার ছড়াছড়ি—

সুখী কে তোমাদের চেয়ে?
ঘরে এল ছোট মেয়ে
হবে পুতুলের সাথে পুতুলের খেলা
কত গান গেয়ে গেয়ে।

আরও নানা ছড়ায় ভর্তি রকমারি কার্ড সেখানে। আমি বাজে অনুবাদ করে আর রসভঙ্গ করতে চাই না। কিন্তু কেলি তো মহা সমস্যায় ফেলেছে। যমজ মেয়ের কার্ড পাই কোথায়! হয়েছে দুটো বাচ্চা। আমি তো আর একখানা কার্ড পাঠিয়ে দায় সারতে পারি না। দু' মেয়ের জন্যে অবশ্য আলাদা দু'খানা পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু শুনেছি আরও বড় কার্ডের দোকানে গেলে যমজ স্পেশাল কার্ডও নাকি থরে থরে সাজানো থাকে। অন্য দোকানেও যাব ঠিক করলাম।

এরপর হলমার্ক কোম্পানির অজস্র কার্ডে ভর্তি দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম। যমজ কার্ডের ছড়াছড়ি সেখানে। 'টুইন সেকশন'ই আছে র‍্যাকের একপাশে। যমজ ছেলে যমজ মেয়ে, যমজ এক ছেলে ও এক মেয়ে—সব ব্যবস্থা সেখানে। সবগুলোই পড়ে পড়ে দেখছিলাম। যমজ ছেলের কার্ডে অনেকটা জগাই মাধাই ধরনের হাত তুলে নাচের দৃশ্য। অন্য কার্ডে শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াইয়ের মতো ঝুটোপুটি চলছে। সঙ্গে কবিতা—(অনুবাদের দুর্বলতা ক্ষমা করে নেবেন)

ওহে নতুন বাবা মা,
একদানে পেলে রামা শ্যামা?
গুলিয়ে যাবে ইস্কুলেতে
পরিও নাকো এক জামা।

যমজ মেয়ের কার্ডও চমৎকার। একই দোলনায় শুয়ে দুলছে দুই বোন। পেছনে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে যুবক যুবতী। পণ টন দেবার চিন্তা নেই তো! নীচে গোলাপি আখরের কবিতা—

তোমরা কত সুখী
এক ঢিলে দুই পাখি
এরা জন্ম থেকে বন্ধু হবে
লাগবে না আর সখী।

যাই হোক। একটা কার্ড পছন্দ করে কেলি মার্শালকে পাঠিয়ে দিলাম। পরে ওর বাড়িতে গিয়ে দেখি অনেক কার্ড 'কমন' এসে গেছে।

সেবার রণবীর বোসের ছেলের অন্নপ্রাশনের কার্ড কিনতে গিয়েও পাইনি আমি। কারণ এদেশে আমেরিকানদের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান বলে কিছু নেই। কেউ কেউ এক বছরের জন্মদিনের কার্ড কেনার তাল করেছিল। কিন্তু ছেলেটা ছ'মাস বয়সে সে কার্ড নেবে কেন? শেষ পর্যন্ত হাতে লিখে কার্ড তৈরি করা হল। দুটো পৈতেতেও সেই একই পন্থা অবলম্বন করেছি। অনেকেই করেছিল।

আইবুড়ো ভাত বা সাধের জন্যে কিন্তু দিব্যি ভাল ভাল ইংরেজি কার্ড কিনতে পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে এদের অনুষ্ঠান অনুযায়ী 'ব্রাইডাল শাওয়ার'। ছবি জুড়ে মহেন্দ্র দত্তর

ছাতার মতো বড় গোল ছাতা আঁকা। তলায় রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। নয়তো ছোট্ট ছোট্ট ছাতা ভেসে বেড়াচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে। শুভেচ্ছার সঙ্গে বৃষ্টির তুলনা বোধহয়। সেই শুভেচ্ছা বর্ষণের নীচে একলা এক মেয়ে দাঁড়িয়ে, অথবা একটি ছেলে। সামনে 'সংসার পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে' জাতীয় নেগেটিভ সাবধান বাণীর বদলে, 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গোছের সুখের লম্বা রাজপথের ছবি। অনুষ্ঠানের ধরনও অনেকটা বাঙালির আইবুড়ো ভাতের মতো। বিয়ের ক'দিন আগে থেকে আমেরিকান পাত্রী বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে 'ব্রাইডাল শাওয়ার' উপলক্ষে নেমন্তন্ন খায় এবং উপহার পায়। পাত্রের ব্যাপারটি অন্যরকম। তাকে নিয়ে ব্যাচেলার্স পার্টি হয়। কখনও ভাঁড়ামো করার জন্যে একজন বয়স্কা গণিকাও নেমন্তন্ন পায়। রঙ্গ রসিকতা করে, নেচে গেয়ে চলে যায়। আমাদের বাঙালি মহলে ইদানীং পাত্রীর 'ব্রাইডাল শাওয়ার' বছরে বেশ কয়েকটি হচ্ছে। একদিকে বাটিতে মুড়ো, ল্যাজা এবং টেবিলের পাশে থালাতে চালের প্যাকেট থেকে অতি কষ্টে উদ্ধার করা দুটি একটি ধান, দুর্বার বিকল্পে ঘাসের চাপড়া এবং প্রদীপের বদলে জ্বলন্ত মোমবাতি সাজানো। অন্যদিকে উপহারের প্যাকেট হাতে পাতানো মাসি, পিসি, দিদি, বউদির দল। হাতে অবশ্যই হলমার্কের ছাতাওলা কার্ড। বেবি শাওয়ার তো লেগেই আছে বারো মাস। আমাদের দেশের সাধ দেওয়ার মতো ব্যাপার।

ইদানীং আমেরিকান বাবারা বেশ মনঃক্ষুণ্ন। কার্ডের ব্যবসাদাররা নাকি 'মাদার্স ডে' কার্ডে যত ভাল ভাল কবিতা আর সন্তানের হৃদয় নিংড়ানো বাণী ছাপিয়ে দেয়, ফাদার্স ডে কার্ডে তার অর্ধেকও থাকে না। একে পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কী বলা যায়? বাবাদের ধারণা—এর মূলে আছে মায়েদের ষড়যন্ত্র। বাবা যেন বাড়িতে ভিলেন। সবসময় বাচ্চাকে বলা হচ্ছে—'দাঁড়া, বাবা বাড়ি আসুক। তখন সব বলব।' অর্থাৎ বাবা হচ্ছেন ঘাতক টাইপের চরিত্র। অতএব সন্তানরা তাকে গদগদ ভাষায় কী লিখবে? কথাটি আদৌ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। 'মাদার্স ডে' মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে পালন করা হয়। সব ছেলেমেয়েই সেদিন মাকে একটি ভাল কার্ড দেবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এর মূল ভাবনাগুলি এরকম—মা হচ্ছেন জীবনের সেরা সম্পদ। নানা ছড়া, কবিতা, বড় বড় কবিদের উদ্ধৃতি ইত্যাদি নিয়ে দারুণ সব কার্ড বাজারে আসে প্রতি বছর। দীর্ঘ সময়ে এত রকম কার্ড দেখে আসছি যে প্রত্যেক বছর মনে হয়, এরকম লেখা এতদিন পড়িনি। একটি কার্ডের ছবি মনে পড়ছে। একটি মা ইঁদুর খুব সাজগোজ করে বসে আছে। তাকে ঘিরে দামি উপহার হাতে আরও কিছু ছোট ইঁদুর। দূরে গাছের আড়ালে দীন হীন চেহারার একটি নেংটি ইঁদুর, হাতে সামান্য ক'গাছি বুনো ফুলের ডাল। নীচে লেখা—

"মা, আমি তোমার সবচেয়ে অযোগ্য সন্তান।
তবু আমাকেই সবচেয়ে ভালবাস জানি।
তাই ছোট্ট একটা ফুলের তোড়া নিয়ে লুকিয়ে আছি।
তোমায় একলা পেলে, তখন দেব।"

'ফাদার্স ডে' কার্ডেও আছে এরকম নানা ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন। প্রতি বছর জুনের তৃতীয় রবিবারে 'ফাদার্স ডে' হয়। ছেলেমেয়েরা উপহার ও কার্ড পাঠায় বাবাকে। নেমন্তন্ন করে অথবা বাবার বাড়িতেই ডিনার খেতে আসে। 'ফাদার্স ডে' কার্ডের নানা

কবিতার মধ্যে, কথার মধ্যে সরস মন্তব্যই বেশি চোখে পড়ে। একটি কার্ডে দেখেছিলাম কলেজে পড়া মেয়ে বাবাকে লিখছে—

"বাবা, জীবনে যত কিছু দিয়েছ, ইচ্ছে করে তোমাকেও যেন প্রতিদানে তাই-ই দিতে পারি কোনওদিন। কিন্তু সমস্যা একটাই। তুমি সারা জীবন আমাকে যা যা উপদেশ দিয়েছ, সেগুলো আর তোমাকে দেওয়া যাবে না। কারণ? উপদেশগুলো আমি মনে রাখিনি যে।"

প্রত্যেক পরিবারের জন্যে যেন বিশেষ বিশেষ ভাবনার কার্ড থাকে। মেয়ের জন্মদিনে মা-বাবার মনোমত কার্ডের অভাব নেই। মেয়ে বিয়ে করে দূরে চলে যাবার পর তার প্রথম জন্মদিনে মা একটি কার্ড পাঠালেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাপের বাড়ির একটি ঘর অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। বাথরুমে ভেজা তোয়ালের গাদা, খাবার টেবিলে হ্যান্ডব্যাগ, সানগ্লাস, চাবি, কোল্ড ড্রিংকের বোতল। মেয়ে টেলিফোনের রিসিভার কানে নিয়ে জুতো সুদ্ধ পায়ে সোফায় শুয়ে অনর্গল হেসে যাচ্ছে।

নীচে শুধু লেখা—

ক্যারেন,

আমাদের বাড়িটা আর সেরকম নেই। সব কিছু সাজানো, গোছানো পড়ে থাকে। হাসি নেই, শব্দ নেই। তোমার জন্মদিন, অথচ বাড়িতে ডোরবেল বাজছে না।

মা-বাবা।

ছেলে প্রথম বছর কলেজে চলে যাবার পর তার জন্মদিনে মা, বাবা যে কার্ড পাঠালেন তাতে লেখা—

তর্কাতর্কির অভাবে আমাদের কথার ধার কমে যাচ্ছে। বাড়ির ফাস্ট এইড বক্সের কোনও তুলো ব্যান্ডেজ, ওষুধ খরচ হয় না। টেলিফোন এত কম আসে। রাতে গ্যারাজ বন্ধ করার শব্দে ঘুম ভাঙে না আর। ধুলো, কাদা, ঘাম আর হা হা হাসি, চিৎকার ছাড়া যে ছেলেকে মানায় না, তার জন্মদিনে

বাবা ও মা

এইসব কার্ড ক্রমশ বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এ সমাজে চিঠিপত্র লেখার রেওয়াজ কম। টেলিফোনেই যোগাযোগ থাকে খুব বেশিরকম। অথচ রোজকার কথাবার্তায় এমন আবেগ প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। কার্ড কোম্পানি নানা গবেষণা করে এমন সব লেখা ছাপাচ্ছে, প্রায় মনের কথাটি তুলে ধরার মতোই ব্যাপার স্যাপার। সৎ বাবা, সৎ মা, দিদিমা, ঠাকুমা, দাদু, ঠাকুর্দা, কাকা, কাকি, মাসি, মেসো, ভাই, বোন, ছেলে, মেয়ে, কম বন্ধু, বেশি বন্ধু, স্কুলের টিচার, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নী, সহকর্মী, ডাক্তার—সকলের জন্যে মন ভোলানো কার্ড। তবে মাঝে মাঝে উটকো ঝামেলাও হয়। কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে জানলে চেনাশোনারা গেট ওয়েল কার্ড পাঠান। এ রেওয়াজ বাঙালি মহলেও চালু আছে। অ্যাপেন্ডিক্স নয়তো গল ব্লাডার অপারেশনের সময় কে ক'খানা কার্ড পেয়েছেন, তার ওপরেই জনপ্রিয়তার বিচার হয়। কিন্তু সবাই কিছু ঢাক পিটিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে চান না। এক এক জন থাকেন তো, যাঁরা বাড়িতে বড় বিপদ আপদ ঘটে গেলেও বাইরে জানাতে চান না পাছে লোকে সহানুভূতি দেখায়। নিন্দের সমস্যা নিয়ে অন্যকে জ্বালাতন করতে চান না হয়তো। রবি লাহিড়ি এরকম চাপা মানুষ। লুকিয়ে লুকিয়ে হাইড্রোশিল

অপারেশন করাতে গেছেন নিউ ইয়র্কের এক হাসপাতালে। যেখানে বাঘের ভয়, রমা মিত্র যে ওখানে নার্স, লাহিড়ির খেয়াল ছিল না। সে নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা হলেও নিউ জার্সির বাঙালি রুগিকে দেখে খুব মায়া মমতা করেছে। অপারেশনের খবরটাও চাউর হয়ে গেছে কী ভাবে। লাহিড়ি বাড়ি ফিরে ফোনের জ্বালায় অস্থির। বাঙালি নার্সদের কোনওরকম প্রফেশনাল এথিকস নেই বলে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ছে প্রতিদিন। 'গেট ওয়েল' কার্ডে কার্ডে বাড়ি ছয়লাপ। আমরা সামাজিক জীব। মানুষের অপারেশনের পরে খোঁজ নেব না? কার্ডের কায়দাই বা কত। ছবি আঁকা আছে—হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার—রুগি চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। পাশে মুখোশ পরা ডাক্তারের দল। জোর লাইটের নীচে ছুরি কাঁচি চলছে। নীচে লেখা—

প্রিয় রবি

তোমার অপারেশনের জন্যে বড়ই উদ্বেগ ছিল। এখন ভাল থাকো—

অমল, রজত, দীপিকা, সোনালি

পড়েই হাসি পাচ্ছিল আমার। অপারেশন হবার পর তো খবরটা বাইরে ছড়াল। এরা নাকি বড়ই উদ্বেগে ছিল। অবশ্য ওদের দোষ নেই। কার্ডে যেমন লেখা থাকে, তাই কিনেছে।

কার্ড কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নামী হল হলমার্ক কোম্পানি। তাদের মজাদার কার্ডের শাখা কোম্পানির নাম শু বকস গ্রিটিংস। সরস মন্তব্যগুলো আঁকাবাঁকা হাতের লেখার মতো করে দেওয়া থাকে। কাগজে চেহারাও সাদামাটা হয়। রসিক লোকেরা পাঠায় অন্য রসিক সমঝদারকে। মননশীল সমাজে শু বকস গ্রিটিংস কার্ডের বিশেষ কদর। বিয়ের তারিখে বর বউকে কোনও গতানুগতিক কার্ড দিতে না চাইলে শু বকস গ্রিটিংস-এর শরণাপন্ন হয়। পঁচিশ বছরের বিবাহবার্ষিকীর কার্ডের ছবি হল—শোবার ঘরে বউয়ের জিনিসের জন্যে বরের জিনিস রাখার জায়গা নেই। আলমারি, তাক, ড্রয়ার—সবই বউয়ের পোশাক, জুতো, ব্যাগ, বইপত্র দিয়ে ঠাসা। বরের জিনিস মেঝে থেকেই সরিয়ে দালানে পাঠানো হয়েছে। প্যান্ট সিঁড়িতে, টাই গড়াগড়ি খাচ্ছে বাগানে, জুতো রাস্তায়। শুধু বিছানায় এক চিলতি জায়গা দখল করে বর প্রাণপণে খাট থেকে ঝুলে আছে। বাদবাকি খাট জুড়ে বউ গাদা খানেক বালিশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুচকি হাসছে। পঁচিশ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে বরের আকুল আবেদন—

"আমায় একটু কেবল শুতে দিও পাশে।"

শাশুড়িদের কার্ড নিয়েও নানা সরস মন্তব্য। কার্ডের ব্যবসায় একেবারে চূড়ান্ত লাভ হয় ক্রিসমাসের সময়। ইহুদিদের জন্যেও আছে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কার্ড। তবে বড়দিনের সময় যত লোক যত লোককে দেশে বিদেশে কার্ড পাঠায়, এমন আর কোনও সময় নয়। ক্রিশ্চানরা গ্রিটিংস কার্ডে মেরি ক্রিসমাস শব্দটি দেখলে তবেই কিনবে। কিন্তু ইহুদিরা কিনবে না। হিন্দু, মুসলমান তো নয়ই। তাদের পছন্দের কার্ডে সিজনস গ্রিটিংস এবং শুধু মাত্র হ্যাপি নিউইয়ার থাকা চাই। হলমার্ক ছাড়াও, আমেরিকান গ্রিটিংস কোম্পানি, অ্যামবাসাডর, ইউনিসেফ থেকে ভারি সুন্দর সুন্দর কার্ড তৈরি হয়। কার্ডেরও আবার সেল চলতে থাকে। মরসুমের প্রথমে যে কার্ডের দাম ছিল ১২ ডলারে কুড়িটি, ক্রিসমাসের দু-চারদিন আগে তার দাম কমে অর্ধেক হয়ে গেল। কারণ অধিকাংশ লোকই কার্ড পাঠিয়ে

দিয়েছে। ক্রিসমাসের পরে তো একেবারে জলের দর হয়ে গেল। এক বাক্স দামি কার্ডে প্রচণ্ড সস্তা লেবেল মেরে দিতেই হু হু করে বিক্রি। ক্রেতারা অবশ্যই দূরদর্শী। পরের বছরের বড়দিনের জন্যে এত সস্তায় কিনে রাখা দূরদর্শিতা ছাড়া যায় কী? এ সময় কার্ড নিয়ে নানা মজা হয়। একবার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তৃপ্তি জোয়ারদার একেবারে ২৩ ডিসেম্বর নাগাদ দারুণ একখানা কার্ড পাঠিয়েছিল। লাল রবিন পাখির ছবি আঁকা কার্ডখানা সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম রান্নাঘরের তাকে। বছর ঘুরে গেল। আবার দেখি ডিসেম্বরের গোড়াতে সেই রবিন পাখি আঁকা কার্ডই এসে গেল তৃপ্তির কাছ থেকে। গত বছরের কার্ডেরই বাক্স থেকে পাঠানো বুঝতে পারলাম। রহস্যটা আমার জানা আছে ভালই। প্রত্যেকবার শেষ মুহূর্তে কার্ড ফুরিয়ে যায় আর নতুন বাক্স কিনতে হয় আমাকেও। তার থেকে তখন আর অর্ধেকও খরচ হয় না। কারণ বড়দিন পেরিয়ে গেছে ততদিনে। তখন বাকিগুলো তুলে রাখি পরের বছরে অন্য মহলে পাঠাবার জন্যে। বাক্সের গায়ে লিখে না রাখলেই গণ্ডগোল। গতবারেও শেষ মুহূর্তে এক বাক্স কিনেছিলাম। ডায়েরিতে লিখে রেখেছি—বরফের ওপর স্লেজ গাড়ি আঁকা কার্ড—'৯১-এর ক্রিসমাসে কাকে কাকে দ্বিতীয়বার পাঠানো যাবে না। তৃপ্তি যদি আবার রবিন পাখি পাঠায় ওকেও পদ্ধতিটা বলে দিতে হবে।

১০ আগস্ট ১৯৯১

বিলম্বিত মধ্য যৌবন

মাধুরীদি এবার দেশ থেকে ফিরে সামান্য উত্তেজিত। লোডশেডিং বা ম্যালেরিয়া জন্ডিসের জন্যে নয়। দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তাঁর আপত্তি। 'দক্ষিণাপথে' বাজার করতে গেছেন। অনবরত ঘি রঙের কাপড় চোপড় দেখাচ্ছে। যেন ওঁকে অন্য কোনও রং মানায় না। এত ছিপছিপে শরীর রেখেছেন। অথচ হকার্স কর্নার থেকে দু দুবার কারা যেন হাঁক মেরেছে—এই যে মাসিমা, সায়া ব্লাউজ লাগবে না? মাসিমা শুনেই কী রকম থপথপে চেহারার মানুষ মনে হয় না? ঘরে বাইরে এক অবস্থা। গায়ে বেগুনি রঙের সিলকের ওপর রং বেরঙের পুঁতির কাজ করা চুড়িদার কুর্তা কিনেছেন বলে জায়েরা চাপা গবেষণা চালিয়েছে। একজোড়া নাতি নাতনির দিদিমার পরনে বেগুনি সালোয়ার। ওই আমেরিকাতেই সম্ভব। তবু তো ম্যাজেন্টা রঙের রাজকোট শাড়িখানা যে নিজের জন্যে কিনেছেন, সে কথা আর গায়ে পড়ে ভাঙেনি। মেয়ের নামে চালিয়েছেন। কিন্তু কেনই বা এত লজ্জা পেতে হবে? সাজগোজের কোনও বয়স আছে নাকি? কে বলেছে মধ্য পঞ্চাশে বেগুনি পরা চলবে না?

আমেরিকায় ইদানীং বয়স ভুলে থাকার রেওয়াজ অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বরাবর এমনটি ছিল না। সেই হিপিদের যুগকেই ধরা যাক। এখন যারা মধ্য চল্লিশে পৌঁছেছে কৈশোর শেষে তারা মনে করত সবুজের অভিযানে একমাত্র তাদেরই অধিকার। বলত

তিরিশের ঊর্ধ্বে মানুষ আর বিশ্বাসযোগ্য থাকে না। চল্লিশ মানে তো বার্ধক্যের শুরু। 'উডস্টক' অভিযানে সামিল আর ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী সেই ছেলে মেয়েদের পরিচয় ছিল 'ফ্লাওয়ার চিলড্রেন' নামে। গতানুগতিকতা বিরোধী সেই নতুন প্রজন্ম আমেরিকার তাবৎ রীতি নীতিকে অস্বীকার করার উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। মূল ভাবনা বলতে ছিল তারুণ্যের জয়গান। তারপর দীর্ঘ সময় চলে গেছে। এদের বয়স এখন চল্লিশের কোটায়। অবধারিত নিয়মে এদের কাছে তারুণ্যের সংজ্ঞা বদল হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে চল্লিশেই নাকি জীবনের প্রকৃত সূত্রপাত। পোশাকে আশাকে তো বটেই, জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় এরা "শুরু"-র পথিক বলে মনে করছে নিজেদের। ক্যালিফোর্নিয়ার এক অধ্যাপক বলেছেন চল্লিশ বছর বয়সটাকে মধ্য বয়সের শুরু বলে মোটেই চিহ্নিত করা চলে না। বরং একে যৌবনের রমরমা বলা যায়।

'রক অ্যান্ড রোল' বাজনা কোনকালে বাতিল হয়ে গেছে। অন্তত এ যুগের ছেলে মেয়েরা 'পুরাতনী গানের' মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাকে। কিন্তু শিল্পীদের তরুণ-তরুণ হাবভাব কখনও যায়? বিটল্‌সের পল ম্যাকর্টানি, 'দ্য হু' আর 'রোলিং স্টোনস' এর দল নব উদ্যমে গান বাজনা করে বেড়াচ্ছে এধার ওধার। মধ্য চল্লিশের শ্রোতারাও মুগ্ধ হয়ে ভিড় জমাচ্ছে। ব্রুস স্প্রিংসটিন যে কিনা নতুন যৌবনের দূতের মতোই প্রাণবন্ত শিল্পী, তারই বয়স হয়ে গেল প্রায় বিয়াল্লিশ। নিউ জার্সির জনপ্রিয় সন্তানটি নির্ঘাৎ এখনও বহু বছর নেচে, গেয়ে দর্শক মাতিয়ে রাখবে। অবসর নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

সেন্সাস্ ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী এ বছরে অন্তত ৩.৮ মিলিয়ন ছেলে মেয়ে মধ্য চল্লিশে পৌঁছবে। এদের কাছে তো বয়স কোনও সমস্যাই নয়। কারণ চল্লিশকে জীবনের স্বর্ণযুগ বলে ভেবে নিতে পারলে প্রৌঢ়ত্বের বিষণ্ণতা ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারবে না। এরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করতে চাইছে—মনের প্রস্তুতিই দেহ মনকে বুড়িয়ে যেতে দেয় না। পুরনো হয়ে যাবার ভাবনাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে প্রভূত প্রাণ স্ফূর্তি নিয়ে বাঁচা দরকার। এক পুরুষ আগে পর্যন্তও জীবনযাত্রা এমন পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হত না। তুলনামূলকভাবে এ যুগে যৌবনকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা অনেক বেশি। শারীরিক ও মানসিক দুই অর্থেই চেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্য সচেতনতার দরুন খাদ্য রুচির বদল ঘটেছে। ব্রেকফাস্টে সসেজ, বেকন্, ডিম খাওয়া, সে তো ইতিহাস হয়ে গেছে। পরিবর্তে ওটমিল সিরিয়াল আর ফলের জয় জয়কার। লাঞ্চে হ্যাম স্যান্ডউইচ? রাম কহো। কোলেস্টেরল বাড়লে কেলেংকারি হবে না? বরং স্যালাডের ঘাসপাতা চিবিয়ে শরীরকে মেদবর্জিত রাখ। রাতে বিফ স্টেক বন্ধ বহুকাল। কালেভদ্রে চলুক ক্ষতি নেই। কিন্তু নিয়মিত সাদা মাংস নয়তো মাছ চালাও। হ্যামবার্গার, পিৎজা মধ্য যৌবনের শখের খাদ্যের তালিকায় তামাদি হয়ে গেছে। সিগারেট তো সাক্ষাৎ বিষ। নীলকণ্ঠ হবার সাধ নেই আর। কেক, পুডিং আইসক্রিমের পাশে কোনকালে ট্যাঁড়া পড়ে গেছে। খড়ি গোলা জলের মতো স্কিমড মিল্কের বাক্স রেফ্রিজারেটরের সিংহভাগ জুড়ে আছে। আর আছে দুধ ক্ষীরের বিকল্প দিয়ে তৈরি নানারকম মিষ্টি। প্রায় দ্রোণাচার্যের পরিবারের মতো খাদ্য ব্যবস্থা। পিটুলি গোলায় যদি যৌবন বাঁচিয়ে রাখা যায়, তো তাই-ই সই। আর সাবধানের মার নেই, এটাও তো প্রমাণ হয়ে গেছে। আমেরিকায় মানুষের পরমায়ুর হার বেড়ে গেছে না কত? নেহাৎ অপঘাতে

না মরলে সত্তরের কোটা তো বাঁধা। অতএব হাতে এত সময় যখন আছে, চল্লিশ বছর বয়সটাকে অবজ্ঞা করার কোনও কারণ নেই। এ বয়সে যে কোনও অভিযান সম্ভব। কতজন প্রথম বার বিয়েই করছে চল্লিশে পৌঁছে। পুরনো বিয়ে ভেঙে দিয়ে নতুন করে প্রেমে পড়ছে। চল্লিশ উত্তীর্ণ যুবক জীবনে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দরুন প্রেমের বাজারে রীতিমত দামি মানুষ। মেয়েরাও কতজন প্রথম বার মা হচ্ছে উত্তর চল্লিশে। ক্রিস্টিনা আমাদের পরিচিত। সম্প্রতি একচল্লিশ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করল। আগের পক্ষের দুটি বড় বড় মেয়ে আছে। এখন আবার নতুন স্বামীর সংসারে সন্তানসম্ভবা ক্রিস্টিনা। মনে প্রাণে নতুন করে মা হবার উৎসাহ। অথচ ওর নিজের মা এই বয়সে না কি পাকা গিন্নি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চেহারা, হাবভাব, সাজগোজ, গলার স্বর, চাউনির মধ্যে বয়সের ভার এসে গিয়েছিল। আর ক্রিস্টিনা প্রায় যুবতীর মতো চেহারা নিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে সেরে ফেলেছে। বয়স নিয়ে ওর দুশ্চিন্তা নেই। কারণ বয়স বাড়লে যৌবন চলে যায়, এই ঘটনাটিতেই ওর বিশ্বাস নেই।

কিন্তু শারীরিক পরিবর্তনকে কি অস্বীকার করা সম্ভব? সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শারীরিক পরিবর্তনকে মানুষ প্রাধান্য দেয় প্রধানত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে। অনেকটাই পরিস্থিতি নির্ভর প্রতিক্রিয়া। বয়সের আবেদন হারিয়ে যাচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতার জোর চলে যাচ্ছে, সংসারে প্রভাব প্রতিপত্তি থাকছে না—এইসব ভাবনায় মানুষ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যে বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হতে পারে, তার অনেকটাই প্রচলিত ধারণা এবং সমাজব্যবস্থার প্রভাবে। সেদিক থেকে সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ঘটলে মানুষ নিজেকে বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় বলে ভাবতে পারে এবং উৎসাহ ফিরে পায়। হয়তো জীবনের বিভিন্ন সময়েরই কিছু অবদান থাকে। যৌবনের সংজ্ঞা নিয়েও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। অনেককাল ধরে চল্লিশ বছর বয়সকে ভাবা হত যৌবনের অবসান হিসেবেই। প্রৌঢ়ত্বের শুরুও বটে। এখন পঞ্চাশকে সেইভাবে বিচার করা হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন কুড়ির সঙ্গে চল্লিশের মানসিকতার বিশেষ প্রভেদ নেই। চল্লিশে পৌঁছেও একজন মহিলার যাবতীয় প্রবণতা তাঁর কুড়ির দিনগুলোর মতোই থাকা সম্ভব। জীবনযাত্রাই তাঁকে সেই প্রাণ স্ফূর্তি দেয়। শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা যদি প্রথম যৌবনের মতো থাকে, মানসিক তৎপরতা যদি একই ভাবে বজায় থাকে, তবে ভোগ সুখের ইচ্ছে হারিয়ে যাবে কেন? এখনও পুরুষের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা দেখলে তার রোমাঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ নিজেকে সে যুবতী বলেই ভাবছে। নিয়মিত ব্যায়াম, মেদ বর্জিত পুষ্টিকর খাওয়া দাওয়া, উপযুক্ত সাজসজ্জা, রূপচর্চা ছাড়াও মানসিকভাবে এ যুগের জীবনদর্শনকে গ্রহণ করার চেষ্টা থাকছে। অবশ্য কিছু কিছু সত্য আছে, যাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ঘড়ির কাঁটার মতো সময় এগিয়ে চলে। শারীরিক পরিবর্তনও অনুভব করা যায়। মানসিক ভাবেও কোনও কোনও ঘটনায় প্রতিক্রিয়া হয় আগের তুলনায় দেরিতেই। আবেগ তেমন তীব্র থাকে না। কিন্তু সে জন্যে বিচলিত হয়ে প্রৌঢ়ত্ব মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এঁদের প্রশ্ন—মাথার চুলে পাক ধরলেই উচ্ছ্বাস প্রশমিত হবে কেন? নাচ, গান বন্ধ করতে হবে কেন? যে যেমন ভাবে আনন্দ পায়, তার জন্যে সেই ব্যবস্থাই ভাল। চল্লিশের যাত্রীরা এখন এ জন্যে আশ্বস্ত যে, একটা বয়সে তাঁদের কাছে এই বয়সটাই ছিল আশঙ্কার বিষয়। অথচ পৌঁছে আবিষ্কার করছেন এখনও অনেক

প্রতিশ্রুতি আছে সামনে। মনে কোনও ক্লান্তি নেই। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর দেহও মজবুত। তবে আর ভয় কী?

কিন্তু এ সব তো হল তাঁদের মনের কথা। ডাক্তারি শাস্ত্র কী বলে? আসলে ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকে নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেমন গবেষণা হয়নি এখনও। বরং পঁয়ত্রিশ বছরকে সে তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারি মতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হচ্ছে শারীরিক অর্থে চূড়ান্ত অবস্থার সময়। জীবনকে যদি পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে পঁয়ত্রিশ হচ্ছে তার তুঙ্গ অবস্থা। তারপরই অপরদিকে অবতরণের সূত্রপাত। এ জন্যে মেয়েদের সন্তান ধারণের ক্ষেত্রেও পঁয়ত্রিশের পরের সময়টিকে আর প্রশস্ত বলে মনে করা হয় না। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে এর পরবর্তী সময়ে মানুষের শরীর খুব ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। অর্থাৎ যা কিছু দেহগত পুষ্টি, সমৃদ্ধি, সব পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্তই অটুট থাকে। তারপর থেকে কম বেশি ক্ষয় শুরু হয়। তবে পরিবর্তনটি ধরা পড়ে কিন্তু চল্লিশের গোড়াতেই। প্রথমত দেহে চর্বি বৃদ্ধি পায়। শারীরিক পরিশ্রমের পরে ব্যথা বেদনা হয়। ফুসফুসের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। অল্প পরিশ্রমে হাঁফ ধরে যায়। বাত জাতীয় ব্যথা বেদনা, হজম শক্তির দুর্বলতা, দাঁতের রোগ দেখা যায়। চোখে ফোকাসের সমস্যার দরুন ৪০-৪২ বছর বয়সের মধ্যেই সাধারণত বাইফোকাল চশমার প্রয়োজন হয়। কারণ চোখের লেনসের ইলাস্টিসিটি কমে আসতে থাকে।

চল্লিশ বছর বয়স হলে ডাক্তারি পরীক্ষাগুলিও বিশেষ ধরনের হয়। পুরুষের কিছু কিছু ক্যানসারের প্রতিরোধ হিসেবে (কোলন ক্যানসার, রেকটাম ক্যান্সার ইত্যাদি) বিশেষ ধরনের পরীক্ষা করা হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্যাপ্ টেস্ট ইত্যাদি শুরু হয়ে যায় অবশ্য কলেজ জীবন থেকেই। জরায়ু বা ওভারির ক্যানসারের আশঙ্কায় মেয়েদের এমনিতেই বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে পরীক্ষার জন্যে আসতে হয়। তবে চল্লিশ বছর বয়সের পর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ম্যামোগ্রাম এর ওপর। স্তনে ক্যান্সার রোগ দেখা দেওয়ার প্রবণতা এ দেশে খুবই বেশি। সে কারণে এই বিশেষ ধরনের এক্স-রে চালু হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর মেয়েদের প্রতি বছরে, অন্তত পক্ষে প্রতি দু বছরে তো বটেই, ম্যামোগ্রাম করানোর জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়। এ দেশে মেয়েরা স্বাস্থ্য বিষয়ে মোটামুটি ভাবে বেশ সচেতন। ফলে শরীরের যত্ন এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপর থাকেন। নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টাও আছে। বাইরের জগতে কোনও না কোনও কাজে জড়িত থাকার ফলে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে না। একেবারে অকেজো হয়ে "কাউচ পোটোটো"র মতো শুধু ঘরে বসে টিভি দেখা মানে জীবনটা নেহাৎই গোল্লায় গেল আর কি? সন্ধেবেলা নাচের ক্লাস, বোলিং অ্যানিতে যাওয়া, জার্মান, ফ্রেঞ্চ নয়তো স্প্যানিশ শিখতে যাওয়া, নয়তো রাতের কলেজে ভর্তি হয়ে নতুন পড়াশোনা—যৌবনের দিনগুলোতে ফেরাতে গেলে সেই পরিবেশ তো চাই। মাধুরীদি উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন। চাকরি, সংসার, ছুটির দিনে বাংলা স্কুল চালানো। ক্লাবের থিয়েটার পরিচালনা কত কী। শুধু দিদিমা হয়ে গেছেন বলে বয়সের সীলমোহর লাগানো কি ঠিক?

৮ জুন ১৯৯১

ম্যালেরিয়ার বড়ি সত্তর ডলারে

ওষুধের দোকানে চেকবই সঙ্গে না থাকলে কুইনিনের বড়ি কেনা যেত না। কে জানত ছোট্ট এক কৌটো ভর্তি চিনি মাখানো রঙিন ক্লোরোকুইনিন কিনতে সত্তর ডলার বেরিয়ে যাবে?

দেশে বেড়াতে যাবার আগে যথারীতি একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। অসুখ বিসুখ হয়েছে বলে নয়, হতে পারে এই সম্ভাবনায়। তৃতীয় বিশ্বে যাওয়া বলে কথা। সেখানেই জন্ম হয়েছিল বটে। কিন্তু এতকাল আমেরিকার জল হাওয়া খেয়ে ধাতটা সাহেবি হয়ে গেছে না! জন্মভূমিতে ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস, আন্ত্রিক, টাইফয়েড লাগাতার লাইন করে জাল পেতে বসে আছে। কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে? তখন এত সাধের ছুটি হয় কাটবে মশারির মধ্যে, নয় ঘর আর বাথরুম ঘুরে। তারচেয়ে আগাম বন্দোবস্ত করে রাখা ভাল। কিন্তু আমেরিকান ডাক্তার আবার সহজে ওষুধ, ইনজেকশন দিতে চায় না। ইনভেস্টিগেশন আর প্যাথিলজিক্যাল রিপোর্টের ওপর যাবতীয় প্রেসক্রিপশন ঠুকবে। আমি মেয়ের সম্ভাব্য ম্যালেরিয়া ঠেকানোর জন্য ডাক্তারকে কুইনিন লিখে দেবার জন্যে দড়ি ছেঁড়া করতে লাগলাম। শিশু চিকিৎসা বিশারদ নাকে চশমা এঁটে "ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের" রিপোর্ট হাঁটকে সাফ জবাব দিয়ে দিলেন—'উহুঁ, ইন্ডিয়ার জঙ্গলে ছাড়া ও মশার উৎপাত অত নেই। বড় জোর ভিলেজে আছে। তুমি তো যাচ্ছ ক্যালকাটা। শুধু শুধু এত কড়া ওষুধ আমি দেব না।' কে বোঝাবে 'সিটি অফ জয়' এখন মশাদের জয়গানে মুখরিত। বিরক্ত হয়ে টাইফয়েড, কলেরার ইনজেকশন দেবার জন্যে বললাম। আবার সেই জাবদা রিপোর্ট হাঁটকানো শুরু হল। তারপর দাড়িওলা ইহুদি ডাক্তার চশমার ফাঁক দিয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'শুধু শুধু এত ইনজেকশন দেব কেন? ফোটানো জল আর বাড়ির রান্না খাওয়াবে ইন্ডিয়াতে গিয়ে।'

এসব অনেক দিনের কথা। আমি অবশ্য শুধু উপদেশ শুনেই রণে ভঙ্গ দিইনি। ভারতীয় ডাক্তারের তো অভাব নেই এদেশে। তাঁদের মধ্যে আত্মীয়, বন্ধুও আছেন কজন। একবার বলতেই সমস্যা বুঝে গেলেন এবং পটাপট ফুঁড়ে দিলেন কলেরা, টাইফয়েড না হওয়ার ছুঁচ। সঙ্গে হেপাটাইটিস টেকাতে গামা গ্লোবিউলিন না কী যেন মোটা দাঁড়ার কনকনে ইনজেকশন। লিখে দিলেন ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বড়ির প্রেসক্রিপশন। দেশে রওনা হবার দু'সপ্তাহ আগে থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে খাওয়ার জন্যে বাইরে চিনি মাখানো ভেতরে হাকুচ তেতো আদি ও অকৃত্রিম কুইনিন। সেই বড়ি কিনতে গিয়েই তো দাম শুনে চক্ষুস্থির। তাও একদিনে পাওয়া যায়নি। বিশেষ অর্ডারের ওষুধ বলে দোকানে আসতেও সময় লেগেছিল বেশ কদিন।

আমেরিকায় ওষুধের দাম খুবই বেশি। দুভাবে ওষুধ কেনা যায়। বিনা প্রেসক্রিপশনের ওষুধের নাম 'ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ'। সর্দি, কাশি, জ্বর, পেশির ব্যথা, পেট খারাপ, অ্যালার্জি, হজমের গোলমাল, অম্বল, হাঁপানি থেকে শুরু করে যাবতীয় ছোটখাটো রোগের সাময়িক উপশমের জন্য থরে থরে কাউন্টারে সাজানো এই সব ওষুধ সুপার বাজারেই পাওয়া যায়। বড় বড় ওষুধ কোম্পানির তৈরি ওষুধগুলোর দাম একটু বেশি হলেও পাশেই

সাজানো থাকে সেই বিশেষ সুপারমার্কেট কোম্পানির তৈরি নিজস্ব জেনেরিক ওষুধ। দাম প্রায় অর্ধেক। কাজও হয় দিব্যি। আসলে নামী কোম্পানির ভাল ওষুধের পেটেন্টের সময়সীমা যখন ১৭ বছর বাদে পেরিয়ে যায়, তখন যে কোনও কোম্পানি সেই ফর্মুলা দিয়ে ওষুধ বানিয়ে সস্তায় বাজারে ছড়াতে পারে। আমেরিকার সুপার বাজারে লম্বা লাইলন জুড়ে থাকে ওষুধের বিভাগ। ব্যান্ড এইড থেকে শুরু করে ফার্স্ট এইডের যাবতীয় সরঞ্জাম। সুপার বাজারের নিজস্ব প্রোডাক্ট কিনলে খরচ অনেক কম পড়ে। তবে জেনেরিক ওষুধের ওপর অনেকের ভরসা কম। অথচ ওষুধে কাজ না হলে ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনস্ট্রেশন (F.D.A.) থেকে জেনেরিক ওষুধ অনুমোদনই করত না। যাই হোক, শারীরিক এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে দামি কোম্পানির ওষুধই দ্বিগুণ দামে কিনে নেন বেশির ভাগ ক্রেতা। এসব হল—'ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ'-এর কথা।

প্রেসক্রিপশন ড্রাগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিছু আলাদা। ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধের জন্যে রোগীকে স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানি কোনওরকম আর্থিক পূরণ দেয় না। যেহেতু ডাক্তারের অনুমোদন ছাড়াই লোকে ইচ্ছেমত ওষুধ কিনেছে, তার জন্যে স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানির দাম দেবার কোনও দায়িত্ব থাকছে না। কিন্তু প্রেসক্রিপশনের ওষুধ ডাক্তারের নির্দেশে কিনতে হচ্ছে, অর্থাৎ সেটি রোগীর পক্ষে জরুরি। সেক্ষেত্রে ওষুধের দাম ফেরত দেবে বিমা কোম্পানি। ফলে লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন গোছের অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ইদানীং নামী কোম্পানির একশোটি ব্লাড প্রেসারের বড়ির জন্যে প্রায় পঞ্চাশ ডলার দাম পড়ছে। অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল দশ দিনে কোর্সের জন্যে লাগছে কুড়ি/পঁচিশ ডলার। এইসব ওষুধেরও বিকল্প আছে। জেনেরিক কোম্পানির তৈরি সস্তার পেনিসিলিনের দাম অর্ধেকেরও কম। কিন্তু সব ডাক্তার সস্তার ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখতে চান না।

জেনেরিক ওষুধ নিয়ে নানা সমস্যা শুরু হয়েছে। এরা শুধু ওষুধ তৈরি করে। নামী কোম্পানির রিসার্চের জন্য যা খরচ, এদের সেসব নেই। তৈরি ফর্মুলা নিয়ে ব্যবসা। কিন্তু ইদানীং কিছু কোম্পানির বিরুদ্ধে F.D.A অভিযোগ এনেছে। অনুমোদনের সময় নামী কোম্পানির তৈরি ওষুধ নিজেদের নমুনা বলে চালানো, ঘুস দিয়ে অনুমোদন আদায়ের চেষ্টা ইত্যাদির কারণে এরা অভিযুক্ত হয়েছে। নিউ জার্সির স্থানীয় ভারতীয় জেনেরিক কোম্পানি "পার ফার্মাসিউটিক্যাল" তো যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ কারণে। ফলে ডাক্তাররা নামী কোম্পানির ওষুধই দিতে চান। দাম পড়ে অনেক বেশি।

স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানিগুলি আমেরিকায় ওষুধের দাম অত্যন্ত বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে প্রতিবাদ তুলেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। প্রধান বক্তব্য কিছু কিছু ওষুধের জন্যে আমেরিকা নামী ওষুধ কোম্পানিগুলি প্রতি রোগী পিছু বছরে যে হাজার হাজার ডলার আয় করছে, তার যুক্তি কী?

ওষুধ নির্মাতা কোম্পানিগুলির স্পষ্ট উত্তর—ওষুধের দাম বেশি না হলে খরচে কুলিয়ে ওঠা অসম্ভব। প্রথমত, ওষুধ আবিষ্কার, পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচই তো প্রচুর। তারপর আগে F.D.A-এর অনুমোদন পাবার জন্যে ওষুধটিকে উপযুক্তভাবে উপস্থিত করার ব্যবস্থা। আমেরিকায় "ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন" নামে যে ব্যবসায়ী সংস্থা

আছে, তাদের বক্তব্য—১৯৮৭ সালের হিসেব অনুযায়ী একটি মাত্র ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে গবেষণার কাজে ২৩১ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। ইদানীং যে কোনও একটি নতুন গবেষণার জন্যে খরচ হয় ৭০ মিলিয়ন থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত। গবেষণা করে সেই ওষুধ আবিষ্কারের পর পেটেন্টের অনুমোদন পেতেই লাগে প্রায় সাত বছর। এ সময়ের মধ্যে আছে সেই রাসায়নিক মিশ্রণ নিয়ে জন্তু জানোয়ারের ওপর পরীক্ষাকার্য, বিষক্রিয়ার প্রভাব, মানুষের শরীরের ওপর পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি। তারপর সময় থাকে মাত্র দশ বছর। সেই ওষুধকে বাজারে বিক্রি করে লাভের অংশ কোম্পানির ঘরে তুলবার জন্যে। কারণ গবেষণা থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত মেয়াদ থাকে সেই পেটেন্টের। তারপর সেই রাসায়নিক মিশ্রণের ওপর আবিষ্কারক কোম্পানির আর কোনও এক্তিয়ার থাকে না। জেনেরিক কোম্পানি সস্তায় বাজারে যে ওষুধ ছাড়ে, তার গবেষণার কৃতিত্ব ওই নামী কোম্পানির হলেও তখন আর তার কোনও লাভ থাকে না। অর্থাৎ তাদের তৈরি রাসায়নিক মিশ্রণ পেটেন্ট হিসেবে সবসুদ্ধ সতেরো বছর মাত্র তাদের আয়ত্তে থাকে। সুতরাং শেষ দশ এগারো বছরের বিক্রির ওপরই তাদের অতিরিক্ত উপার্জন। একটি নামী কোম্পানির 'সেফেনোস্পোরিন' নামে রাসায়নিক গবেষণায় খরচ হয়েছে ১৫০ মিলিয়ন ডলার। তাদের সেই ওষুধ বাজারে বিক্রি হয় তিন ডলারে একটি ক্যাপসুল। দিনে একটি মাত্র ক্যাপসুল এবং মোট দশ দিনের কোর্স। অর্থাৎ তিরিশ ডলার ক্রেতার খরচ। ব্রংকাইটিস, টনসিলাইটিস, নিউমোনিয়া, ইউরিন্যারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছে শিশুদের কানের ইনফেকশন সারানোর জন্যে। সম্প্রতি গনোরিয়ার জন্যেও দশ দিনের ক্যাপসুল দেওয়া হচ্ছে। ওষুধটি ভীষণভাবে বিক্রি হচ্ছে। কোম্পানির ক্যাপসুল পিছু তৈরির খরচ পঞ্চাশ সেন্টেরও কম। লাভের অংশ যাবে পরবর্তী কোনও নতুন ওষুধের জন্যে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ গবেষণার কাজে।

কিন্তু ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের উপদেষ্টা কমিটির অন্তর্ভুক্ত 'টেকনোলজি অ্যাসেসমেন্ট অফিসে' অর্থনীতিবিদরা তাঁদের রিপোর্টে জানিয়েছেন—ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারদের দেওয়া খরচের হিসেব বা সংখ্যাকে সেখানে যাচিয়ে দেখা হয়নি। সম্পূর্ণ তথ্য নির্ভর কিনা সে কথাও জানা যায়নি। সমালোচকদের ধারণা ওই হিসেবে শুধুমাত্র অনুমাননির্ভর। অনুমানের ভিত্তিতেই ধরে নেওয়া হয়েছে কোনও নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সফলতা ও বিফলতার হার, খরচ, সময়ের দাম এবং আর্থিক ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

কয়েকদিন আগে ফার্মাসিউটিক্যাল রিসার্চের উপদেষ্টা প্যানেলের একটি মিটিং হয়েছে ওই টেকনোলজি অ্যাসেসমেন্ট অফিসেই। সেখানে ওষুধ কোম্পানিগুলির প্রতিনিধিরা বলেছেন যে ওই হিসেব সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর। পৃথিবীর বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি 'মার্ক অ্যান্ড কোম্পানি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন—'ওষুধের সফলতার হার নির্ভর করে প্রধানত গবেষণার ওপর। একটি মিশ্রণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং প্রভূত ধারণা তৈরি করতে যে কী ভীষণ সময় ও অর্থের প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা অসম্ভব।' আপজল কোম্পানির গবেষণা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট জেকব স্টাকি একটি গবেষণা প্রকল্প প্রসঙ্গে বলেছেন—'ওষুধ কোম্পানিগুলিতে অনেক সময়েই গবেষণার জন্যে বাইরের রসায়নাগার থেকে মালমশলা সংগ্রহ করতে হয়। এই কাজ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং

ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। সেখানেও দাম এবং রয়্যালটির খরচ দিতে হয় বেশিরকম। সুতরাং কোম্পানির নিজস্ব খরচ যে কতদূর যেতে পারে, আগে থেকে অনুমান করাও সম্ভব নয়।'

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যামজেল নামে বায়োটেকনোলজি কোম্পানি অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেছেন—'একটি ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে গবেষণা থেকে তৈরি হওয়া পর্যন্ত যে কী ভীষণ অর্থের প্রয়োজন, তার সম্পূর্ণ হিসেব এককথায় লিখে দেওয়া কঠিন। যতদিনে সব আয় ব্যয় হিসেবের মধ্যে আসে, ততদিনে পেটেন্টের মেয়াদের সঙ্গে সে হিসেবও তামাদি হয়ে যায়।

অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন প্রভূত লাভের দিকে লক্ষ রেখে ওষুধ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। কিন্তু ওষুধ ব্যবসায়ীদের যুক্তি অন্য। তাঁদের বক্তব্য—বাড়তি লাভ যা হয়, তা চলে যায় পরবর্তী নতুন ওষুধের গবেষণার কাজে। কোম্পানির অর্থ মজুদ না থাকলে গবেষণা বন্ধ হয়ে যাবে। মার্ক কোম্পানি এ বছর এক বিলিয়ন ডলার খরচ করছে নতুন গবেষণার কাজে। একটি নতুন ওষুধ কোম্পানি CO তাদের গবেষণার জন্যে ৩০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত এই অর্থ লাভজনক শর্তে (৪২%) সুদ সমেত ফেরত দিতে চেষ্টা করা হবে আগামী দশ বছরের মধ্যে। যদি লাভ না থাকে তবে তাদের ক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার প্রশ্ন নেই। বিনিয়োগের অভাবে ওষুধ কোম্পানিগুলির মূলধন পাওয়া কঠিন হবে। নির্মাতাদের বক্তব্য—ওষুধ আবিষ্কার ও তৈরির সময় চিকিৎসার উৎকর্ষের দিকে প্রাধান্য দেওয়াই তাদের কর্তব্য, ডলার বাঁচানোর দিকে নয়। গত বছরে সারা আমেরিকার ওষুধ নির্মাতা কোম্পানিগুলি মোট ৯.২ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে গবেষণা ও প্রস্তুতির কাজে। অথচ সে তুলনায় আমেরিকায় জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষা খাতে খরচ হয়েছে ৬৭৬ বিলিয়ন ডলার। মাত্র ২% এর কম খরচ হয়েছে ওষুধের গবেষণার জন্যে।

এদেশে ওষুধের দাম ক্রমশ যে হারে বেড়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া খুব স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানিগুলির আন্দোলনই ওয়াশিংটনকে নাড়া দিয়েছে। সেখানে নাকি এমনও কথা উঠেছে যে ইউরোপের মতো ওষুধের দাম সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে এদেশেও। প্রাইভেট ওষুধ কোম্পানিগুলিকে পাবলিক ইউটিলিটি রেগুলেশনের আওতায় ফেলে দেওয়াও অসম্ভব নয়। একজন এইডস রোগীর প্রশ্ন—ওষুধ কোম্পানিগুলির মূল লক্ষ্য কী? রোগীদের জন্যেই তো ওষুধ? তাদের আয়ত্তে থাকছে কি এইসব মহার্ঘ ওষুধ? এইডস-এর ওষুধ এ.জি.টি-র দাম নিয়েও গত বছর নির্মাতা কোম্পানি বারোস ওয়েলকাম বিশেষ প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছে।

ওষুধ নির্মাতাদের বক্তব্য—আমেরিকায় হাসপাতালে যাবার যে ভীষণ খরচ, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকারের বিবেচনা করা প্রয়োজন, ভাল ওষুধ কতখানি জরুরি। প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসার সাহায্যে ঘরে বসেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। এতকাল ধরে গবেষণার ক্ষেত্রে যতখানি সুযোগ ছিল, ক্রমশ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ ও গবেষণার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে নতুন ওষুধ, নতুন আবিষ্কার। ওষুধ সৃষ্টি করা করা এমনই এক শিল্প, যে এই প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ মানব কল্যাণের জন্যে প্রভূত সময় এবং পরিশ্রম দেওয়া প্রয়োজন। ব্যয়ের অঙ্ক আপাতদৃষ্টিতে বেশি মনে হলেও

এটি অপরিহার্য আনুষঙ্গিক মাত্র।

সেবার ম্যালেরিয়ার বড়ির দামে চমকে যাবার পর গৌরী সেনের ওপর সামান্য করুণা হয়েছিল। স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানি দাম চুকিয়ে দিলেও এতখানি অপচয় বরদাস্ত হচ্ছিল না। আর স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানিও কিছু অকারণ দাতব্য করে না। প্রিমিয়াম নিয়েই করছে। ইদানীং ভারতীয়দের উদ্ভাবনী শক্তির দৌলতে জলের দরে কুইনিন কেনা যাচ্ছে। রহস্য আর কিছুই নয়। গোটা কতক বড়ি কেউ না কেউ দেশ থেকে সঙ্গে আনছে। রিলে রেস চলছে। সেই বড়ি মুখে দিয়ে একদল কলকাতা রওনা দিচ্ছে। রক্তে প্রতিষেধক ঢুকে গেল। গিয়ে মুড়ি মুড়কির দরে কিনে খেয়ে আবার ফেরার সময় দেশোয়ালিদের জন্যে একমুঠো নিয়ে আসা। ফলে প্রায় নিখরচায় ম্যালেরিয়া নিরোধ। শুধু এদেশে জন্মানো এবং বড় হওয়া ছেলেমেয়েগুলো বেজায় আপত্তি করছে। চিনির প্রলেপ ছাড়া সাদা ভয়ানক তেতো বড়ি তারা খাবে কেন। যখন লজেন্সের মতো ক্লোরোকুইনিন এদেশে কিনতে পাওয়া যায়? সত্তর ডলার বাঁচানোর আনন্দে গোটা কতক সত্যি লজেন্স সহযোগেই তাদের মুখে চালান দেওয়া হচ্ছে। সিনকোনার রাসায়নিক সংস্করণ—সাদাসিধে বড়ি!

২৯ জুন ১৯৯২

এইডস ভীতি

আমেরিকায় অবিবাহিতা অথবা একক জীবনে অভ্যস্ত মেয়েদের স্বাধীনতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু লেখার নেই। আমেরিকান মেয়েদের একক জীবন কোনও সামাজিক বা সাংসারিক বিধি নিষেধের চাপে প্রভাবিত নয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রী প্রসঙ্গে নয়, প্রধানত পরিণত বয়স্কা এবং সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় তাঁর নিজের সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পায়। পারিবারিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারটি বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে যতখানি তাৎপর্যপূর্ণ, এঁদের ক্ষেত্রে ঠিক সেইভাবে প্রযোজ্য হয় না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে অবিবাহিতা অথবা ডিভোর্সি মহিলামাত্রই রুচিবদ্ধভাবে স্বাধীনতা একটিই অর্থ করছেন, অথবা জীবনের অন্যান্য স্বাধীনতার মতো যৌন জীবনেও ইচ্ছেমত পুরুষসঙ্গী খুঁজে নিচ্ছেন। তবে একথা ঠিক যে, ইউরোপীয় দেশগুলি মতো এদেশেও এই বিশেষ সম্পর্কটির ক্ষেত্রে সংস্কার বা লোকলজ্জার চাপ বলে কিছু নেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এঁরা এই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে থাকেন। যৌনতাকে জীবনধর্মের অঙ্গ বলে মনে করেন।

কিন্তু সম্প্রতি এইডস রোগ এমনই এক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে সঙ্গী নির্বাচন এবং দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন ক্রমশ দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দু' বছর আগে মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারের "ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিসটিকস" থেকে এই বিষয়ে একটি সমীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। জানা গেছে, অবিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে যাঁরা নিয়মিত যৌন স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে থাকেন তাঁদের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ মহিলাই

জানিয়েছেন, তাঁদের জীবনযাত্রার ধারা এইডস-এর ভয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অল্পদিনের চেনাশোনা সঙ্গী সম্পর্কে আগে তাঁদের যেমন কোনও দ্বিধা ছিল না, ইদানীং ঘটনাচক্রে দৈহিক মিলন ব্যাপারটি মোটেই তাঁরা প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। মোট ৮,৪৫০ জন অবিবাহিতা মহিলাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বয়সের ক্ষেত্রে সীমারেখা ছিল ১৫ বছর বয়সী মেয়ে থেকে ৪৪ বছর বয়সী মহিলা পর্যন্ত। "ন্যাশনাল উইমেনস্ হেলথ নেটওয়ার্ক"-এর তথ্য থেকেও জানা গেছে যে গত কয়েক বছরে আমেরিকায় মহিলাদের জীবনযাত্রার ধারা বেশ লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সরকারি সমীক্ষার ফলাফল এইরকম—ওই ৮,৪৫০ জনের মধ্যে ১৬% মহিলা বলেছেন তাঁরা আগে একাধিক পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ মিলিত হতেন। কিন্তু বর্তমানে এইডস-এর আতঙ্কে বিশেষ পরিচিত একটি মাত্র পুরুষকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বৈচিত্র্যের চেয়ে নিরাপত্তার প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে। ৯% মহিলা বলেছেন—দৈহিক সম্পর্ক ক্রমশই অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে তাঁদের জীবনে। ১২% মহিলা বলেছেন একাধিক পুরুষ সঙ্গীর সংস্পর্শে আসা তাঁদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে বলে ঠিক এইডস-এর আতঙ্কের জন্যে এখনই অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। কিন্তু বিশেষ কয়েকজন পরিচিত পুরুষকে এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে নিশ্চিন্ত আছেন। আর ৫% মহিলা বলেছেন, এইডস-এর ভয়ে তাঁরা এমনই ভীত হয়ে পড়েছেন যে যৌনজীবন থেকে পাকাপাকিভাবে ইস্তফা দিয়েছেন। ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিসটিকস-এর সমীক্ষকদের মতে একটি রোগের জন্যে মহিলা সমাজে জীবনযাত্রার এরকম পরিবর্তন সত্যিই লক্ষণীয় পর্যবেক্ষণ।

অবিবাহিতা এই মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী, সামান্য চাকরিজীবী, উচ্চপদস্থ কর্মী অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষই আছেন। একটি বিষয়ে এঁরা প্রায় সকলেই একমত হয়েছেন যে, এতদিন পর্যন্ত তাঁরা যে যৌন স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছেন, তাতে নাকি এইডস-এ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আদৌ নেই। কারণ তাঁদের পুরুষ সঙ্গীরা সে ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। অন্তত ৭০% মহিলা তো প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই জানিয়েছেন যে—"অ্যাকুয়ার্ড ইমিউন ডিফিশিয়েন্সি সিনড্রোম্" বা এইডস-এর সংক্রমণের সম্ভাবনা তাঁদের ক্ষেত্রে নেই-ই বলা চলে। এই রোগের ভাইরাস থেকে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ইদানীং বেড়ে গেছে বলে তাঁর ভবিষ্যতের জন্যে সাবধান হতে চাইছেন।

এই মহিলারা জানে যে এইডস রোগাক্রান্ত পুরুষের সঙ্গে সহবাসের ফলে অথবা ড্রাগ আসক্ত এইডস রোগীর ব্যবহার করা ইনজেকশনের সূঁচ নিজের দেহে ব্যবহার করার ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা ভীষণই প্রবল হয়ে ওঠে। আবার এঁদের মধ্যে অজ্ঞতার দরুন ২০% মহিলার ভয় জন্মেছে যে স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে গেলেও নাকি সুঁচ থেকে এইডস হতে পারে। অজ্ঞতার নমুনা আরও আছে। এইচ আই ভি পসিটিভ (রক্তপরীক্ষায়) লক্ষণযুক্ত পুরুষসঙ্গীর দেহে যেহেতু রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়নি, অনেক মহিলার ধারণা, তখনও তাঁদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনও ঝুঁকি থাকে না। অথচ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বিপজ্জনক। অর্থাৎ পুরুষ নিজের রক্ত পরীক্ষার ফলাফল গোপন করে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ওই অজ্ঞ মহিলাদের বিভ্রান্ত করতে পারেন। এইডস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু সঙ্গিনীর জীবনে সংক্রমণের

আশঙ্কা গোড়া থেকেই থাকা সম্ভব। অথচ ২৯% অবিবাহিতা মহিলার ধারণা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নয়।

গবেষণায় জানা গেছে এই যে জীবনযাত্রার পরিবর্তন, সেক্ষেত্রে কালো এবং হিসপ্যানিক সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যেই আতঙ্ক বেশি পরিমাণে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরা পরিবর্তনে মুখ্য অংশ নিয়েছেন। তুলনায় মধ্যবিত্ত সাদা সমাজের মহিলা সে ভাবে প্রভাবিত হননি। চাকরিজীবী মহিলাদের মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। দরিদ্র, নিম্নশ্রেণীভুক্ত মহিলারা যৌন জীবনযাত্রা সম্পর্কে এখন যেমন ভীত এবং সচেতন হয়ে পড়েছেন, উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে নানা পদস্থ কর্মী মহিলারা সেভাবে সচেতন হওয়া দরকার মনে করছেন না। এখানেও দেখা যাচ্ছে প্রথম শ্রেণীরা নানা কারণে যে উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবন যাপন করতেন, তাঁদের পুরুষ সঙ্গীরাও যে আর্থ-সামাজিক স্তর থেকে আসতেন, সেখানে ড্রাগ-আসক্ত, সমকামী এবং উভয়কামী পুরুষের সংখ্যাও বেশি থাকা সম্ভব ছিল। অতএব এইডস সংক্রমণের আশঙ্কাও অমূলক নয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে অন্তত তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী সামাজিক রুচি, মান, মর্যাদার প্রশ্ন ছিল। সঙ্গী নির্বাচনেও নেই বাছ বিচার ছিল। অতএব এইডস-এর নামে আতঙ্কিত হবার তাঁরা অন্তত সেরকম বিশেষ কোনও কারণ দেখছেন না। অবশ্য এই যুক্তির সমর্থনেও কিছু তথ্য দেওয়া যায়। অ্যাট্‌ল্যান্টার "দ্য সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কনট্রোল" থেকে জানা গেছে এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী মোট ১৬,৮০৫ জন মহিলার এইডস রোগ ধরা পড়েছে। আর এঁদের মধ্যেই অধিকাংশই হচ্ছেন কালো এবং হিসপ্যানিক সম্প্রদায়ভুক্ত। গরিব ঘরের মেয়ে। রোগের কারণ প্রধানত ইনট্রাভেনাস ড্রাগ ব্যবহার অথবা ড্রাগাসক্ত পুরুষের সংসর্গ।

উচ্চ শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনটি এসেছে, সেটি হল স্বাস্থ্যসম্মত উপায় বিষয়ে সচেতনতা। এঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ অবিবাহিতা জীবনে জন্মনিরোধক বড়ির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। কারণ অবাঞ্ছিত গর্ভ সঞ্চারেই ছিল আপত্তি। কিন্তু এইডস-এর প্রভাব এঁদের জীবনে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়াও সংক্রমণের ঝুঁকি এনে দিয়েছে। ফলে কনডোম ব্যবহারের প্রচলন খুব বেশি হয়েছে ইদানীং। অজ্ঞাত কুলশীল সঙ্গী নির্বাচনে এঁদের আগ্রহ না থাকলেও পরিচিত পুরুষ সঙ্গীর আকর্ষণ তো থাকতেই পারে। আর সেই পুরুষটিরই অতীত ইতিহাস জানতে গিয়ে কোথায় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে কে জানে? সেই সব মতিভ্রমের জন্যে এতকাল পরেই যে সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দেবে না কে হলফ করে বলতে পারে? সুতরাং আর ঝুঁকি নেওয়া চলে না কোনওমতেই।

বিভিন্ন 'নারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র' থেকে চিকিৎসক এবং সমাজবিজ্ঞানী, সমাজসেবিকারা বলছেন—এই সচেতনতা এবং পরিবর্তন আসা খুবই জরুরি। খুব ধীরে হলেও এই যে ক্রমশ ক্রমশ মহিলা সমাজে যৌন স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সাবধানী মনোভাব জন্ম নিচ্ছে, এর ফলে বহু অবাঞ্ছিত মৃত্যু রোধ হতে পারে। মহিলাদের এ বিষয়ে নিয়মিত ওয়াকিবহাল করা উচিত। নানা কেন্দ্রে এইডস নিয়ে তথ্য সরবরাহ করা দরকার। নিয়মিত রক্তপরীক্ষা, দৈনিক জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি জানতে চাওয়া—চিকিৎসকরা, সমাজকর্মীরা যদি এ কাজে অগ্রণী না হন, বিংশ শতকের মৃত্যুবাণটিকে রোধ করা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত "অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অফ মেডিসিন"-এর একটি

চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, যেখানে এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত টিন এজারদের চিকিৎসা করা হয়। সেখানে খবর নিয়ে জানা গেছে, কমবয়সী মেয়েরাই এখন এইডস নিয়ে খুব সচেতন এবং সাবধানী হয়ে উঠছে। কিন্তু রোগটির বিষয়ে জানা আর নিজের জীবনে তার থেকে দূরে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন তো ঠিক এক কথা নয়। দ্বিতীয় চেষ্টাটি তখনই সফল হবে, যখন বিবাহপূর্ব জীবনে যৌনতার প্রয়োজন সম্পর্কে এরা নতুন করে ভাবতে শিখবে। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনায়াস ঘনিষ্ঠতার নজির ক্রমশ কমে আসছে। 'ডেট' করা মানেই মস্ত কিছু আবিষ্কারের নেশা নয়। গ্রুপ ডেটিং বা দলবদ্ধভাবে পার্টির প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে। তবে রাতারাতি হাওয়া বদল তো কোথাও ঘটে না। সেক্ষেত্রে ওই গর্ভসঞ্চার বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার চেয়েও এইডস সংক্রমণের ভয়েই বেড়ে যাচ্ছে কনডোম ব্যবহারের আবশ্যিকতা।

নিউ ইয়র্ক শহরের রাতের বাজারেও মন্দা চলেছে। মার্কামারা ৪২ নং রাস্তার উত্তেজনা দেখার জন্যে এক সময় ট্যুরিস্টদের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছে বেশ প্রকট হয়ে উঠত। সে রাস্তাও যেন তার অতীতের জাঁকজমক হারিয়েছে। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলছে তাবৎ নীল সিনেমার জগৎ। দর্শক আছে। কিন্তু শো ভাঙার পরে "বারলেক্স" অথবা ম্যাসাজ পার্লারের খদ্দের তুলনামূলকভাবে কমে আসছে। প্রসঙ্গটি এই কারণে উল্লেখ করছি যে ব্যবসা কেন্দ্রের মূলধন বলতে যে দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের ব্যবহার করা হয়, সেখানেই ঘাটতি পড়ছে। ম্যাসাজ পার্লারে এক সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে আসা বেআইনি বাসিন্দা থাই, ফিলিপিনো, কোরিয়ান মেয়েদের প্রচুর সংখ্যায় ব্যবহার করা হত। নিউ ইয়র্ক শহর থেকে নিউ জার্সিতে আসার পথে লিংকন টানেলের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। এক সময় সন্ধের পরে টানেলে ঢোকার আগে গাড়ির সারির আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকত অজস্র রূপসী গণিকার দল। বেশি রাতে চীনে পট্টি দিয়ে ফেরার সময় গাড়ির দরজার হাতল ধরে এগিয়ে আসা চীনে দালালও দূরে পুতুলের মতো সাজসজ্জা করা চীনে সুন্দরীর হাসি—আমেরিকায় প্রথম আসার কৌতূহল চরিতার্থ করতে সেই সব দৃশ্য এখন প্রায় গল্পকথার সামিল না হলেও সেরকম সুলভ কিন্তু নয়। কারণ সাধারণভাবে মানুষের মনে আতঙ্ক ঢুকে গেছে। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার জন্যে এত বড় গুণাগার দিতে ক্রেতা, বিক্রেতা কেউই বোধহয় আর রাজি নয়। অর্থাৎ বেহিসাবি, বেপরোয়া মনোভাবটির মধ্যে সামান্য বদল ঘটছে।

"গুণাহ্‌গার" শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিয়ে হঠাৎ একদিন ভাবতে বসেছিলাম। মাস চারেক আগের ঘটনা। সান্‌ফ্রানসিস্‌কোর ইউনিয়ন স্কোয়ারে একা একা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। হাতে কিছু সময় থাকায় দিনের বেলা হাঁটা পথে ঘুরে ঘুরে মানুষজন দেখা, এই আর কি! হেঁটে হেঁটে ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে আর কত দূরই বা যাওয়া যায়। তারই মধ্যে মানুষ যত দেখেছি, সংখ্যার জন্যে নয়, তাদের কয়েকজনের ভয়াবহ রোগগ্রস্ত চেহারা আর ভিক্ষের বাটি হাতে বিষণ্ন দৃষ্টির জন্যেই ওই গুণাহ্‌গার শব্দটি বোধহয় আমার চিন্তার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার এইডস রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসেবে সানফ্রান্‌সিসকোর সমকামী এবং উভয়কামী সমাজ এবং তাদের ড্রাগ আসক্তিকে অংশত দায়ী করা হয়। সঙ্গিনীরা হয় সেই প্রবণতার শিকার। বস্তুত, আমেরিকার পথে ঘাটে নোংরা

পোশাক পরা, ততোধিক জরাজীর্ণ স্বাস্থ্যের যুবতী মেয়ের এরকম হতশ্রী রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি। নিউ ইয়র্কের পার্কে 'হোমলেস'-দের দেখি। কিন্তু গৃহহীন মানেই শীর্ণ, কোটরে ঢোকা চোখ, কঙ্কালসার মানুষ তারা নয়। অথচ সানফ্রান্সিসকোর অভিজাত পাড়ায় বিখ্যাত 'ওয়েস্টিন সান্‌ফ্রান্সিস' হোটেলের আশপাশে ক্ষুধার্ত, নির্জীব, এইডস-এ আক্রান্ত মেয়েগুলো ভিক্ষের বাটি নিয়ে যখন বিড়বিড় করে বলেছিল—"উই আর ডাইং। উই হ্যাভ নো প্লেস টু গো। প্লিজ গিভ আস সাম মানি..."। তখনও ভাবতে পারছিলাম না এইডস রোগের পরিণতি কতদূর হতে পারে! কী ভয়াবহ বিদীর্ণ চেহারা! সাদা ফর্সা পা দুটো লাল ফোস্কার মতো দাগে ভর্তি। মাথার চুল কমে এসেছে। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কী যে বলতে চেষ্টা করছে, কাছে থেকেও যেন বোঝা যাচ্ছে না। কে জানে কোন পরিবারে জন্মেছিল? কোথায় কী ভাবে যৌবনের দামি সময়টুকু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আজ ফুটপাতে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। ওদের ডলারের বদলে খাবার কিনে দিতে উপদেশ দেন সমাজকর্মীরা। নয়তো পয়সা পেলেই ড্রাগের আড্ডায় গিয়ে জুটবে। আমার সামান্য দান নিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা পার হবার জন্যে এগিয়ে গেল। চলন্ত কেবলকারের লোকজনদের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। মাঝে মাঝে মাথা তুলে আকাশ দেখছে।

হোটেল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা কালো দারোয়ানটি হয়তো আমাকে লক্ষ করছিল। সিঁড়িতে পৌঁছতে বলল—"ইউ লুক স্যাড ম্যাম্। বাট উই ক্যানট ডু এনিথিং! ক্যান্ উই?"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আরও আস্তে বলে উঠল—"পারহ্যাপস্ দে আর পেয়িং দেয়ার প্রাইস্ হু নোজ...।"

আর তখনই 'গুণাহ্‌গার' শব্দটা মনে হয়েছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা যদি অপরাধ হয়, তার শাস্তি নাকি এত ভয়ানক? বিনা বিচারে খুন জখমের জন্যেও তো এমন দৈহিক দণ্ড দিতে হয় না মানুষকে?

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

হাসপাতালের সুখাদ্য

শম্পার মেয়ে হয়েছে শুনে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। বাচ্চাকে নার্সারি রুমে দেখে এসে আবার শম্পার কেবিনে গিয়ে বসলাম। তখন ওদের ডিনার টাইম শেষ হয়ে আসছে। বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই খেতে দিয়ে দেয়। একটা কেবিনে দুজন করে রুগি। পাশের মহিলা খেতে খেতে আপন মনে টিভি দেখছেন। শম্পারও এতক্ষণে খেয়ে নেবার কথা। কিন্তু দেখলাম, ওর খাটের সঙ্গে লাগানো টেবিলে ট্রে সুদ্ধ খাবার তেমনই পড়ে আছে। ও একবাটি জিলেটিন পুডিং খেতে খেতে হাসল।

—মেয়েটা একদম ন্যাড়া হল কেন বলো তো?

—দেখতে দেখতে চুল গজিয়ে যাবে। তোমার মাথায় এত চুল।

—কণ্ড রঞ্জুর তো টাক।

—বাবার মতো চুলের ধারা পেয়েছে বলছ? আমাদের হাসাহাসির মধ্যে শম্পা পুডিং শেষ করে জল খেল। ন্যাপকিনে মুখ মুছল।

—আগেই পুডিং খেয়ে নিলে? ডিনার খাবে না?

—দূর! ওই অখাদ্য কে খাবে? একদম রুগির খাবার।

—হাসপাতালে আবার কী দেবে?

—আমি কি রুগি নাকি? দীপু হবার সময় কলকাতায় নার্সিংহোমে ছিলাম। সাতদিন ধরে গরম গরম লুচি, আলুর দম, ফিশ ফ্রাই! কী খাওয়া! আর এখানে কেবল সেদ্ধ চালাচ্ছে।

আমার মনে হয়েছিল শম্পা বাচ্চা হতে চারদিনের জন্যে হাসপাতালে এসে বড্ড লোভ করছে। আমেরিকায় হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে লুচি খাওয়ার তাল। কেন? কী এমন অখাদ্য দিয়েছে? ওই তো দেখছি ছোট্ট একবাটি জলের মতো স্যুপ। তাতে নুডলস ভেসে বেড়াচ্ছে। হুস হুস করে খেয়ে ফ্যাল। সঙ্গে আবার রোল রুটি, মাখন, ক্র্যাকার। পড় প্লেটে বেক করা চিকেন ব্রেস্ট। তাতে খয়েরি রঙের গ্রেভি মাখানো। এক পাশে চটকানো আলুসেদ্ধর গোল্লা। টেনিস বলের সাইজ। পাশে পাশে একটু করে গাজর আর কড়াইশুঁটি সেদ্ধ নৈবেদ্যর স্টাইলে চুড়ো করা। ছড়ানো লেটুসপাতার বুকের ভেতর এক বিন্দু ছানা। সঙ্গে এক গেলাস ঠাণ্ডা দুধ।

ওইসব খাওয়া যায় না? তখন নিজে সদ্য দেশ থেকে ফিরেছি। অতি ভোজনে পরিপাক যন্ত্র সামান্য দুর্বল। শম্পার অখাদ্যগুলো দেখে ভাবছিলাম এরকম ফ্যাকাশে রান্নাই বাঙালির জাতীয় খাদ্য হওয়া দরকার। তা নয়, কচুরি, সিঙাড়া, রোল, মোগলাই উড়িয়ে উড়িয়ে অ্যান্টাসিড দিয়ে মুখশুদ্ধি।

কিন্তু শম্পা শেষ পর্যন্ত কিছুই খেল না। আমার কথায় খাবারগুলো আর একবার নেড়ে চেড়ে বলল—সব এক টেস্ট। কাল বাড়ি গিয়ে ভাত খেয়ে বাঁচব।

এরপরে হাসপাতালের সুখাদ্যের মহিমা নিজেই জানতে পেরেছিলাম। ব্যবস্থাটি অত্যন্ত পরিপাটি। রুগি ভর্তি হবার পরেই হাসপাতালের ডায়েটিশিয়ান মহিলা এসে উপস্থিত হন। নিউট্রেশনে ডিগ্রি নিয়ে কলেজ পাশ করা এইসব পুষ্টি বিশেষজ্ঞ আমেরিকায় প্রত্যেক হাসপাতালে তাবৎ রুগির মেনু তৈরি করেন। যেমন রুগি, তেমন পথ্য। আগেই তাঁকে বলে দিতে হবে রুগির কোনও খাবারে অ্যালার্জি আছে কিনা। এছাড়া রোগ সংক্রান্ত খাওয়ার বিধিনিষেধ তো তিনি নিজেই জানবেন। কারণ প্রত্যেক রুগির অসুখের ইতিহাস তাঁকে দেওয়া হয় ভিজিট করার সময়েই। আমার বেলায় এলেন এক গেরামভারি ফিলিপিনো মহিলা। শুরু হল প্রশ্নমালা।

—কী কী খেলে অ্যালার্জি হয় বলো দেখি?

তখন শারীরিক কষ্টে মরছি। তাও ভেবে ভেবে দেখতে হল। ওই মুহূর্তে কী কী আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে কোনও কিছুই খাওয়ার কথা ভাবতে পারছিলাম না। কিন্তু অ্যালার্জি বলে নাকি তাকে? কী মুশকিল! একটা অ্যালার্জিওলা খাবারের নামও মনে আসছে না? মহিলার অসীম ধৈর্য। আবার বললেন—কোনও কিছু খেলে তোমার রি

অ্যাকশন হয়? আমার সেটা জানা দরকার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়ই তো! আনারস, আনারস। ওটা খেলেই অনেক পরে গলা খুশখুশ করে। তারপর মাঝরাতে কী কাশি যে কাশতে হয় আমাকে...। নিউট্রিশনিস্ট এবং ডায়েটিশিয়ান মহিলা চটপট কীসব লিখে নিলেন। ততক্ষণে অনেক মাথা খাটিয়ে আর একটা অ্যালার্জিওলা ফল খুঁজে বার করেছি। নিজেকে সর্বভুক ভাববই বা কেন? শরীরের ব্যথা বেদনা অগ্রাহ্য করে চিৎকার করে উঠলাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরও আছে। কিউই ফ্রুট খেলেও কিন্তু একটু গলার ভেতর চুলকোয়। অবশ্য বেশিক্ষণ না।

মহিলা বললেন—তোমার বোধহয় হাওয়াইয়ান ফ্রুটে অ্যালার্জি। কলা সহ্য হয়?

—কলা? নাঃ কলায় কোনও প্রবলেম নেই।

—ঠিক আছে। তোমার ডায়েটে পাইনঅ্যাপল আর কিউই ফ্রুট বাদ যাবে। রোস্ট বিফের সঙ্গে ভেজিটেবলস তো থাকবে।

—অ্যা! রোস্ট বিফ? আমি সেটাও খাই না।

—কিন্তু তোমার ব্লাড কাউন্ট কমে গেছে। রেড মিট একটু খাওয়া দরকার। তাহলে ভিল স্টু খাও।

—গরুর বদলে বাছুর? নাঃ ওসব খাই না আমি।

—তুমি কি ভেজিটেরিয়ান? সেটা কিন্তু চার্টে লেখেনি। তাহলে তো ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত সব ডায়েট পালটে দিতে হবে আমাকে।

এই মরেছে! অপারেশনের পরে একদিন বাদ দিয়ে সকাল বিকেল নোনতা ছানা (কটেজ চিজ), স্প্যাগেটি আর সারা আমেরিকার রাশি রাশি তরকারি সেদ্ধ খাইয়ে মারবে।

আমি বেদনায় কঁকিয়ে উঠে বললাম—'আর কথা বলতে পারছি না। মাছ, চিকেন যা হয় দাও।

দু'দিন পরে যদি বেঁচে থাকি, তখন তিনবেলা কী খাব, না খাব, এখন থেকে এত ফর্দ দেওয়া যায়? মহিলা আর কথা না বাড়িয়ে নোট বই পেন্সিল হাতে চলে গেলেন। তারপর এক সপ্তাহ ধরে ডায়েটিশিয়ানের বিবেচনায় খুব সুখাদ্য খেয়েছি আমি। এমন বলা যাবে না যে সেসব খাদ্য জোর করে আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল অথবা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল আমাকে। বরং বেশ অনুমতি টনুমতি নিয়েই সেসব রান্না করা হত। এ ব্যাপারে একেবারে রেস্টুরেন্টের কায়দায় মেনুকার্ড ধরিয়ে দিত আগের দিন। তার মধ্যে সবাই অবশ্য সব খাবার অর্ডার দিতে পারবে না। শরীর বুঝে পথ্য আগেই বলেছি। তবে তাতেও এতরকম চয়েস থাকত যে পড়ার সময় রীতিমত চিন্তা করতে হত। কী ছেড়ে কী অর্ডার দেব। ব্রেকফাস্টেই কত কায়দা। সিরিয়াল নেব, না কি টোস্ট নেব? সিরিয়ালের আবার কত ভ্যারাইটি। সঙ্গে ফল, ডিম, দুধ, ফলের রস। ব্রেকফাস্টের সূচিপত্রে মন দিয়ে পেনসিল দিয়ে দিয়ে টিক মারত আবার কেবিনের দ্বিতীয় রুগি এক খুনখুনে বুড়ি। আবার ঘোলাটে চোখ তুলে খিকখিক করে হেসে বলত—আজ আবার একটা ফ্রেঞ্চ ওমলেটে দাগ দিয়ে দিচ্ছি। কোলেস্টেরল বাড়বে বলে মেয়ে ডিম খেতে দেয় না। যত বাজে থিয়োরি। এই ঊনআশি বছরে কম ডিম খেয়েছি আমি? বেঁচে তো আছি।

একদিন বুড়ি ফ্রেঞ্চ ওমলেটে টিক মারছে তো দ্বিতীয় দিন আমি ক্রামবলড এগ নিচ্ছি।

পরদিন বুড়ি নিচ্ছে জলে সেদ্ধ করা ডিমের পোচ তো আমি ফ্রায়েড এগ। বুড়ি মনের সুখে ওতপ্রোতভাবে জেলি মাখিয়ে পাঁউরুটি খাচ্ছে তো আমি বাদাম কিসমিস ছড়ানো ওটমিল সিরিয়াল। বুড়ি কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে প্রন জুস খাচ্ছে তো আমি ভিটামিন সি-র বাসনায় টম্যাটো জুস। বুড়ি মেয়ের চোখের আড়ালে বসে দিব্যি ফ্যাট যুক্ত দুধ খেয়ে যাচ্ছে। আমি ওজনের চিন্তা ভুলে গিয়ে চকলেট মিল্ক। মোট কথা একদিন আগে থেকে অর্ডার দিয়ে আমরা যুগলে ইচ্ছে মতো ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু লাঞ্চের সময় এলেই বুড়ির হরিষে বিষাদ। আমাদের ব্রেকফাস্ট দিত সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে প্রায় আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত। আর লাঞ্চ দিতে শুরু করত বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে। আগের দিন ভলান্টিয়ার মেনু কার্ড নিয়ে এসে জানিয়ে দিত কী কী খাবার ডায়োটিশিয়ান আমাদের খেতে পরামর্শ দিয়েছেন। তারই মধ্যে দেখেশুনে আমরা অর্ডার দিতাম। হাসপাতালে এরকমই নিয়ম। আগের দিন সব অর্ডার জমা পড়ে যায়। লাঞ্চে সাধারণত নানা রকমের স্যান্ডউইচ, স্যালাড, দুধ আর পুডিং থাকত। নয়তো রাশিয়ান স্যালাডের মতো মাছের টুকরো, মাংস, ফল, তরকারি মেশানো মেয়নেজ দেওয়া স্যালাড। কিংবা এগ স্যালাড, চিকেন স্যালাড—স্যালাডের নামাবলি যাকে বলে। অথচ ওই সময়ই কিছু খেতেই ভাল লাগত না। এক তো অসুস্থ অবস্থায় খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়। একটানা শুয়ে বসে থেকে ব্রেকফাস্টই যথেষ্ট মনে হত। তার ওপর স্যান্ডউইচগুলো তেমন জুৎসই লাগত না। নামেই সব বাহার ছিল। ক্যালোরি বর্জিত স্বাদগন্ধহীন সস, ফ্যাট ফ্রি মেয়নেজ, রুগির পুষ্টিবর্ধন করতে খোসাসুদ্ধ লাল আটার স্যান্ডউইচ ব্রেড, মাখন তোলা দুধ থেকে তৈরি চিজ, জলে সেদ্ধ করা হ্যাম নয়তো চিকেনের স্যান্ডউইচ মিট, তেলের জল মাখানো টুনাফিশ, সঙ্গে নুন গোলমরিচ মাখানো একগাদা আলুভাজাও নেই—জমে কখনও? স্যালাডের ঘাসপাতা চিবিয়ে চিবিয়ে বুড়ি ক্লান্ত। অভিমান করে দু'দিন স্যান্ডউইচ খেল না। কারণ বুড়ির স্যান্ডউইচের মাংসে নাকি এক ফোঁটা নুন নেই। চিজে এক ফোঁটা নুন নেই। মেয়নেজও নুনবর্জিত। আসলে তার দুটি পায়ের পাতা দেখতাম ফুলে ঢোল। ডাক্তার নুন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই জন্যে সল্ট ফ্রি ডায়েটে রেখেছিলেন। কিন্তু বুড়ির ক্রমশ খাওয়ার ইচ্ছে চলে যাচ্ছিল। নুনের জন্যে জেহাদ।

ডিনারের সময় হাসপাতাল সরগরম। বিকেল থেকে ভিজিটিং আওয়ার্স আর তার মধ্যেই ডিনার দিয়ে যায়। রুগিদের বাড়ির লোকেরা বসে থেকে যত্ন করে খাইয়ে টাইয়েও দেন। কিন্তু কেবিনে কেবিনে ডিনারের ঢাকা খোলামাত্র কী যে একটা মাংস মার্কা গন্ধ ভেসে আসত। ওটাই শেষের দিকে আর বরদাস্ত হত না। হয়তো খিদের অভাব থেকেও এরকম হওয়া সম্ভব। অল্প সময়ের ব্যবধানে উপর্যুপরি একই ধরনের খাবার আসতে থাকলে যে একরকম অনীহা জন্মায়, সে প্লেনে যাবার সময় কিচেনের কাছাকাছি যার সিট পড়ে, সে বিলক্ষণ জানে। নিউ ইয়র্ক থেকে এয়ারইন্ডিয়া চেপে আকাশে ওড়ার পর ওই একবারই যা 'আকবর প্যালেসের' ল্যাম পসন্দা পছন্দ করে খাওয়া যায়। তারপর লন্ডনের 'গেলর্ডের' মেথি গোস্ত অবধিও ঠিক আছে কিন্তু ক্রমাগত বসে বসে শূন্যে ওড়ার পর বাহরিনের কাছাকাছি প্লেনের রান্নাঘরে রামপাখির

মাখখনওয়ালা যখন গরম হতে থাকে, তখন চোখ বন্ধ করে বসরার গোলাপের চিন্তা না করলে খাদ্যরুচি ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

যাই হোক, হাসপাতালের ডিনারের কথায় ফিরে আসি। শম্পাকে যেরকম খেতে দিয়েছিল ওইরকমই সব পদাবলি। ম্যাকরনি আর চিজ, নয়তো চিকেন ব্রেস্ট বেকিং করা, না হলে রোস্ট বিফ, ভিল স্টু, রোস্ট পর্ক, সসেজ অ্যান্ড পেপার জাতীয় একটি মেইন কোর্স। বাদবাকি আনুষঙ্গিক তো আগেই বলেছি। সব মাংস থেকে এক গন্ধ বেরচ্ছে। মশলাবিহীন মাংস সেদ্ধ হলে যেমন গন্ধ বের হতে পারে। গ্রেভির মধ্যে কনস্টার্চের লেই লেই ভাব।

একদিন সাহস করে হ্যালিবাট মাছের ফিলে চাইলাম। কারণ ফ্যাকাসে মুরগিবক্ষ আর জুতোর শুকতলার মধ্যে তফাৎ করতে পারছিলাম না ততদিনে। ভাবলাম নানারকম মাছের ফিলে তো বাড়িতেও এনে বেকিং করি। ফিশ ফ্রাই বানাই। আর বাইরে সি ফুড রেস্তোরাঁয় গেলেও কত মুখরোচক মাছের প্রিপারেশন খাই। হাসপাতালে মাছের খেলা দেখব না একবার? আগের দিন বেশ লম্বা টিক মেরে দিলাম 'বয়েল্ড ফিলে হ্যালিবাট'-এর পাশে। বুড়ি বারবার সাবধান করেছিল। বলেছিল, হাসপাতালের কোল্ড স্টোরেজের ফ্রোজেন মাছ এমনিতেই সুস্বাদু হবে না। তার ওপর বয়েল্ড মানে স্রেফ আভনে দিয়ে আধ পোড়া করে আনবে।

আমি পাত্তা দিলাম না। বুড়ির বড্ড তরিবতের বাতিক লক্ষ করেছি। স্যান্ডউইচ নিয়ে রাগারাগি। একটা ছোট্ট জলপাই-এর টুকরোর জন্যে এক ঘণ্টা বসে থাকবে। অলিভ না দিলে নাকি স্যান্ডউইচের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হয় না। এক চাকতি পেঁয়াজ না পেলে কিছুতেই টেরল হ্যাম স্যান্ডউইচ খাবে না। শুকনো পারসম্যান চিজের গুঁড়ো না ছিটিয়ে স্প্যাগেটি খাবে না। হাজার বায়নাক্কা। আমার সেসব ছিল অল্প বয়সে। এখন তো রান্নার পরিশ্রম বাঁচাতে যাহা পাই তাহা খাই। সুতরাং হাসপাতালের হ্যালিবাট কী এমন অখাদ্য লাগবে? বুড়ির উপদেশে কর্ণপাত করলাম না।

পরদিন বিকেলে ডিনারের ঢাকা খুলে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গলা মাখন আর পাতিলেবুর জারক রস মেখে শুয়ে আছে তিন টুকরো গোবদা হ্যালিবাট। একটু পোড়া পোড়া চেহারা। কিন্তু খেতে মোটেই অখাদ্য নয়। বুড়ির দেখাদেখি আমিও বেশ জোগাড়ে হয়ে উঠেছি ততদিনে। নার্সকে ডেকে গোলমরিচের গুঁড়ো, আরও একটু চিজের গুঁড়োটুড়ো আনিয়ে নিলাম। পরদিন বুড়িও মাছ চেয়েছিল। কিন্তু নুনবিহীন মাছ পেয়ে রাগ করে ফেলে দিল। আমার মাছের আইডিয়াটা পরে আরও দু'একজন বাঙালি মেয়ের হাসপাতালে থাকার সময় কাজে লেগেছিল। জয়তি বলে একজন শুধু চিংড়ি মাছ সেদ্ধই সেঁটে ছিল তার পায়ে ভেরিকোজ ভেইন অপারেশনের সময়। স্পেশাল ডায়েট বলে মোটা মোটা বাগদা চিংড়ি সেদ্ধ ম্যানেজ করেছিল। কারণ অন্য মাছে তার আঁশটে গন্ধ লাগে। ভাত তো হাসপাতালে চাইলেই দেয়। বয়েল্ড রাইস বা স্টিমড রাইস আমেরিকানরা যথেষ্টই খায়। সুতরাং জয়তি চিংড়ি সেদ্ধ, ভাত আর মাখন দিব্যি চালিয়ে গিয়েছিল। কাঁচালঙ্কার জন্যেই যা একটু ঘাটতি ছিল।

আমেরিকার হাসপাতালে রুগিদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সকলের জন্যে সমান

ব্যবস্থা। ফ্রি বেড, পেইং ওয়ার্ড, কেবিন ইত্যাদি হিসেবে কোনও শ্রেণী বিভেদের ব্যাপার নেই। প্রাইভেট রুম, সেমি প্রাইভেট রুম হিসেবে কোনও কেবিনে একজন, কোথাও দুজন, কোথাও তিনজন, বড় জোর চারজনের ওয়ার্ড। ইনসিওরেন্স কোম্পানি যাকে যত খরচ দেবে, সে সেইমত ঘর পাবে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সার্ভিস দেবার ব্যাপারে কোনও তফাৎ করবে না। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও তাই। রুগির কেস বুঝে ডায়াটিশিয়ান তার মেনু লিখবে। এদেশে হাসপাতালে দেখেছি প্রত্যেক রুগি হাসপাতালের খাবার খায়। কারণ বাইরের খাবার বিশেষ প্রয়োজন না হলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ফলের ঝুড়ি, চকলেট নয়তো ফুলের তোড়া এই নিয়ে লোকে রুগি দেখতে যায়। প্রত্যেক হাসপাতালের ভেতর মস্ত ক্যাফেটেরিয়া থাকে। রুগির আত্মীয়স্বজন ইচ্ছেমত সেখানে যে কোনও সময় সস্তায় ভাল খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে পারেন। এমার্জেন্সির সময় এতে খুবই সুবিধে হয়। আর রুগিদের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় সুবিধে যে হাসপাতালে থাকাকালীন যে কোনও সময় খিদে পেলে নির্ধারিত রুটিনের বরাদ্দ খাবার ছাড়াও তাঁরা কিছু না কিছু খাবার পেয়ে যাবেন। হয়তো শরীরের ক্লান্তির জন্যে সময়মত লাঞ্চ বা ডিনার খেতে পারলেন না। পরে যখন ইচ্ছে হবে নার্সদের জানালে তাঁরা হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়া বা কিচেন থেকে অন্তত স্যুপ, স্যান্ডউইচ, ফল, কেক ইত্যাদি আনিয়ে দেবেন। তার জন্যে কোনও খরচ দিতে হবে না। আমার ধারণা বেশ কিছু জিনিস এঁদের হাতের নাগালেই থাকে। কারণ চা, কফি, দুধ, কোকোকোলা, ফলের রস, আইসক্রিম, জিলেটিন, বিস্কুট, ক্র্যাকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এনে দেন। সম্ভবত প্রত্যেক ফ্লোরে নার্সদের যে স্টেশন থাকে, তার কাছাকাছি এসব মজুদ থাকে। রাত্রে রুগিদের ঘুমোতে যাওয়ার আগেও এঁরা জানতে চান কারও কিছু খেতে বা পান করতে ইচ্ছে করছে কিনা, বুড়ির দেখাদেখি আমি রোজ আইসক্রিম নয়তো দুধ বিস্কুট চেয়ে খেয়েছি। বিশেষ করে বিকেলের ডিনারে ওষুধের গন্ধ মার্কা চিকেন স্যুপ আর মাংস বাদ দেবার দরুন বুড়ির উপদেশে রাত একটু 'ফিলার' দেওয়া জরুরি মনে করতাম।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিন্তু মোটেই মানতে চায় না যে তাদের খাবার ঠিক রুগিদের রসনার অনুকূল নয়। তাদের বক্তব্য—হাসপাতাল খাদ্যরসিকের ছুটি কাটানোর জায়গা নয়। এখানে অসুস্থ মানুষের জন্যে এমন রান্না দেওয়া হয়, যাতে সহজে তার হজম হয় আর শরীরে পুষ্টি হয়। বহু রুগির বহু বিধিনিষেধ থাকে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা রান্না করা তো সম্ভব নয়। তাই যে কেটারিং কোম্পানি হাসপাতালে রান্না সাপ্লাই দেয়, তাকে মোটামুটিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত এবং পুষ্টিকর খাবারই তৈরি করতে বলা হয়। তারপর বাড়তি কিছু ব্যবস্থা থাকে।

কিন্তু নিউ ইয়র্কের কিছু কিছু হাসপাতালে সম্প্রতি রুগির খাদ্য বিষয়ে প্রচলিত ধারণা বদলে দেবার চেষ্টা চলছে। যেমন নিউ ইয়র্কের কর্নেল মেডিকেল সেন্টার নামে যে নামকরা হাসপাতাল, সেখানে এ ব্যাপারে ডাক্তার আর ডায়েটিশিয়ানরা বেশ চিন্তা ভাবনা করেছেন। এদেশে মিট লোফ খুব প্রিয় খাবার। মাংসের কিমার সঙ্গে সামান্য ময়দা, ডিম, বেকিং পাউডার ও অন্যান্য জিনিস মিশিয়ে আভনে পাঁউরুটির মতো বেক

করা হয়। তারপর স্লাইস করে খাওয়া। কর্নেল মেডিকেল সেন্টারে এক ডাক্তার টার্কি নয়তো চিকেনের কিমা দিয়ে তৈরি মিটলোফ রুগিদের জন্যে বরাদ্দ করেছেন। আবার রুগিদের মনোরঞ্জনের জন্যে বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার কোম্পানি বিল ব্রাসের সঙ্গে নাম মিলিয়ে সেই সুখাদ্যর নাম রাখা হয়েছে বিল ব্র্যাস মিট লোফ। ওই হাসপাতালে প্রতিদিন তিনশো রুগিকে খাবার দেওয়া হয়। অধিকাংশ রুগিই পুষ্টিকর মিট লোফ খেতে, পারবেন। ওখানে 'স্পা কুইজিন' নামে ফ্যাটবর্জিত ডিনারেও দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা অসুস্থ হলেও মেদবহুল হয়ে বাড়ি ফিরতে চান না, তাঁদের জন্যে স্পেশাল ডায়েট দেওয়া হচ্ছে। ধরুন একজন মডেল রুগি হয়ে পড়েছে। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তার সুঠাম দেহটি যেন অটুট থাকে। স্থানীয় পাউরুটির কারখানা থেকে নানা স্বাদের ও গন্ধের রুটি, বান, রোল দেওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। হাসপাতালের মুরগির মাংসে কোনও স্বাদ নেই বলে রুগিরা চিরকাল ধুয়ো তুলে আসছে। এখন থেকে ওরকম ওষুধ খাওয়ানো গোদা গোদা মুরগির বদলে কচি মুরগি বলি হবে। সেই কচি মুরগিদের শুধু ভুট্টার দানা খাইয়ে পালন করা হয়। আমরা সুপার বাজারে গোদা মুরগির চেয়ে দ্বিগুণ নাম দিলে ওই খোকা মুরগি পাই। স্বাদের অনেক তফাৎ সত্যি কথাই। তাই কর্নেল হাসপাতালে এবার থেকে ছোট্ট মুরগির রোস্ট দেওয়া হবে নাকি। মনে হয় ছালসুদ্ধ বেকিং করার সেই একঘেয়ে গন্ধটা হাসপাতালের ঘর আমোদিত করবে না।

হাসপাতালের খাবার মুখরোচক করার জন্যে ডাক্তার, নিউট্রিশনিস্ট সকলেই একমত হয়েছেন। স্পা লাঞ্চের মেনু হল—এক গুচ্ছ স্যালাডের বুকের মধ্যে ভাপে সেদ্ধ করা চিকেন ব্রেস্ট। নয়তো এক থালা রকমারি ফলের চুড়োয় গোল্লা পাকানো কটেজ চিজ (অল্প দুধের ফ্যাট যুক্ত ছানা)। ক্রমশ রান্নায় নুন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার বদলে তেজপাতা, গোলমরিচ, সাদা তিল, তারচিনি—এসব সেদ্ধ করে রান্নার সুগন্ধ বাড়ানো হচ্ছে। যেমন কোনও রুগি মেনুকার্ডের আইটেম দেখে দেখে খাবার পছন্দ করবেন। তখন প্রত্যেক খাবারের পাশে ক্যালোরির সংখ্যা, ফ্যাটের পরিমাণ সব লেখা থাকবে। যেমন ভেজিটেরিয়ান নাচো স্যালাড হচ্ছে ১৮০ ক্যালোরি। ভুট্টার দানা থেকে তৈরি হচ্ছে নাচো। পটেটো চিপসের মতোই একে ভুট্টার চিপস বলা যায়। তা তার সঙ্গে কিছু তরকারিপাতি মিলিয়ে হয়ে গেল ভেজিটেরিয়ান নাচো স্যালাড। এরকম ভাবেই পাওয়া যাবে কম ফ্যাটযুক্ত প্রোটিন খাবার বয়েল্ড স্যালিসবেরি স্টেকস। সঙ্গে শেরি আর মাশরুমের সস মাখানো। সেরির সঙ্গে ব্যাঙের ছাতার থ্যাঁতলানো রস দিয়ে সরু একটি স্টেক খাওয়া। আলু সেদ্ধর মণ্ড আর কড়াইশুঁটির ছোট্ট ঢিবি মিলিয়েও সামান্য ক্যালোরি হবে।

আবার নতুন জিনিস হচ্ছে 'গোরমে ডাইনিং প্রোগ্রাম।' অর্থাৎ রাজকীয় খাওয়ার ব্যবস্থা। তাতে হাসপাতালের একঘেয়ে বাসনের বদলে আসল রুপোর থালায় নয়তো দামি চিনেমাটির ডিনার সেটে খেতে দেওয়া হবে। মেনুও একটু শৌখিন হবে। নরওয়ের স্যামন মাছের মধ্যে ঢালা হবে টক দই আর মৌরিবাটা দিয়ে তৈরি করা সস। তবে রাজকীয় মেনুর জন্যে নাকি একটু বাড়তি দাম দিতে হবে। মানে সার্বজনীন খাদ্য ব্যবস্থা থেকে একটুখানি বড়লোকি ব্যাপার ঢোকানো হচ্ছে।

কিন্তু নিউট্রিশন বিশেষজ্ঞরা কিছু কিছু জনপ্রিয় খাদ্য বন্ধ করে দেবার চেষ্টাও করছেন। কিশ নামে একটি বেকিং করা সুখাদ্য (প্রচুর ডিম দিতে হয়), আইসক্রিম, ডিম, সসেজ, বেকন—এসব নাকি হাসপাতালের রুগিদের অত খাওয়ানো চলবে না। উপকারিতার চেয়ে এতে অপকারিতাই বেশি। ক্রমশ কর্নেল মেডিকেল সেন্টারে এগুলো আর মেনুতে রাখা হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিবেশনের সময় নতুনত্ব থাকলে তাতেই রুগিরা খেতে উৎসাহিত হবে। এতদিন ধরে হাসপাতালে হাসপাতালে পাঁশুটে রঙের সাদামাটা ট্রেতে খাবার আনা হত। তেমনই ছিল শুধু সাদা রঙের ন্যাপকিন। আর এখন ট্রের ওপর কী সুন্দর লাল নীল ডোরা ডোরা ম্যাট পাতা হচ্ছে। সঙ্গে গাঢ় গোলাপি রঙের ন্যাপকিন। রুগিরা ভাবছে যেন কোনও বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে বসেছি। তাদের মন ভাল হয়ে যাচ্ছে। এগুলো কি জরুরি নয়?

কর্নেল মেডিকেলের নতুন ধরনের মেনু কিন্তু সর্বজনপ্রিয় হয়নি। মডেল আর নাচিয়ে গাইয়েদের পছন্দ হয়েছে অবশ্য। তারা রুগি হয়ে এলেও অকারণে ওজন বাড়াতে চায় না। তাই রুপোর থালায় ব্যাঙের ছাতার রস দিয়ে সরু ফিনফিনে মাছ সেদ্ধ খাবে বলে বেশ উৎফুল্ল। কিন্তু কিছু রুগি রেগে লাল। এতগুলো করে ডলার দিয়ে হাসপাতালে থাকবে। আর বলে কিনা ডিম দেবে না, সসেজ দেবে না? কিশ বন্ধ, বেকন বন্ধ? একমাত্র ব্রেকফাস্টই তো তবু খাওয়া যায়। কারণ ওগুলোর মধ্যে হাসপাতাল মার্কা সেই রান্নার বিকট গন্ধ ঢোকাতে পারে না। ফ্রোজেন মাংসের জুতোমার্কা স্বাদ অন্তত সসেজে পাওয়া যায় না। অথচ এখন ডাক্তাররা সর্দারি করে মুখরোচক জিনিসগুলোই বরবাদ করতে বসেছে। আমাদের কোলেস্টেরল বাড়লে তোর কী? তুই তখন চিকিৎসা করে কমাবি। না হলে ডাক্তার হয়েছিস কেন? আর বেশি প্রবলেম না হলে আমরাই বা তোর কাছে হাসপাতালে আসব কেন? সব খেতে দিবি। তারপরে রোগ সারাবি।

নাঃ, এইসব ডায়ালগ কোনও রুগির নয়। আমি কল্পনা করছিলাম। চিলটন মেমোরিয়াল হাসপাতালের তিনশো বারো নম্বর কেবিনে শুয়ে আছি। চার হাত দূরে বুড়ির খাট। হাসপাতালে রুগিদের ফ্রেঞ্চ ওমলেট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে শুনে সেই খুনখুনে বুড়ি তার ছোকরা ডাক্তারকে শাসাচ্ছে। আমি অপেক্ষায় আছি। ডিমের পরেই আইসক্রিম আন্দোলনে গলা মেলাব। বুড়ি আমায় চকলেট আইসক্রিমের মোক্ষম নেশা ধরিয়ে দিয়েছে।

১৭ অক্টোবর ১৯৯২

বেঁচে থাকার রহস্য

এক খুনখুনে বুড়ি রোজ কলা কিনতে আসে। সুপার মার্কেটের কাছে তার অ্যাপার্টমেন্ট। বাজার হাট করার ফাঁকে একটু জনসংযোগ সেরে নেয়। গায়ে আদ্যিকালের একটা ভেলভেটের কোট। কলারে নকল ফারের বাহার। তার কানে পায়রার ডিমের মতো মস্ত দুল। ঠোঁটে, গালে গাঢ় গোলাপির ছড়াছড়ি। হাতে গুটি তিনেক হলুদ রঙের পাকা কলা।

চেক আউট কাউন্টারের কমবয়সী মেয়েটা কলা ওজন করতে করতে বলেছিল—'একটা কলা কিন্তু বেশ নরম হয়ে গেছে। নেবে তুমি?'

বুড়ির একগাল হাসি—'ওটা বাড়ি ঢুকেই খেয়ে নেব। বেঁচে থাকলে কালকে বাকি দুটো। এখন আর আধপাকা কলা কিনি না। কবে আছি, তবে নেই...ইউ নেভার নো।'

বড় গভীর উপলব্ধি! চির স্থির কবে নীর? আন্দাজে এক কাঁদি আধপাকা কলাও ইনভেস্ট করা চলে না। ডাহা লস্!

ঝুড়িতে কাঁদিছে ছটি কলা বর্তমান
সাঁটিবার আগে আমি চির-অন্তর্ধান
'প্রবাসীর চিঠি' তুলি দিলা 'বর্তমান'।

মোট কথা, বেঁচে থাকা ভারী রহস্যের ব্যাপার। আর দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা মানে তো একেবারে মোহন সিরিজ। পরমায়ুর রহস্য উদঘাটনের জন্যে আমেরিকা এখন উঠে পড়ে লেগেছে। গবেষণার অন্ত নেই। এদেশে দীর্ঘায়ু বলতে কিন্তু শুধু আশি, পঁচাশি বোঝায় না। এখন আমেরিকায় প্রায় সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার নাগরিকের বয়স একশো বছরের ওপরে পৌঁছে গেছে। গত দশ বছরের মধ্যে এই হার লক্ষ করা গেছে। সেন্সাস ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী পঁচাশি বছরের বেশি বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এরা সবাই কিন্তু অসুস্থ বা অথর্ব অবস্থায় নেই। বহাল তবিয়তে থাকা শ'খানেক একশো বছর বয়সী মানুষকে নিয়ে সম্প্রতি এক সমীক্ষা আর গবেষণা শেষ হয়েছে। জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী ছাড়াও ওয়াশিংটন ডি সি-র 'অ্যালায়েন্স ফর এজিং রিসার্চ' আর 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এজিং' ইত্যাদি সংস্থা থেকে চিকিৎসক, সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ সেবক ও মনস্তত্ত্ববিদরা এই রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করেছেন। প্রধান উদ্দেশ্য হল—কী প্রক্রিয়ার সাহায্যে বৃদ্ধবয়সেও মানুষ যথাসম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন, সেটি জানবার চেষ্টা করা। সেই বার্তাগুলি জানা গেলে তখন বার্ধক্য অভিমুখী অন্যান্য মানুষদের সাহায্য করাও সম্ভব হবে। দীর্ঘায়ু মানুষের ক্ষেত্রে চিকিৎসা, সরকারি ভাতা, সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কতখানি প্রয়োজনীয়—সেসব ভালভাবে জানার জন্যেই এই অনুসন্ধান।

মেরি এলিয়ট নামে এক বৃদ্ধার বয়স একশো দু'বছর। ওই গবেষণার জন্যে যেদিন তাঁর সাক্ষাৎকার নেবার কথা, তার ঠিক আগের দিন তিনি নিজের মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন। সাতাত্তর বছরের মেয়ের শোক তাঁকে সেভাবে বিচলিত করেনি। যথাসময়ে

সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন এবং কীভাবে দীর্ঘায়ু জীবনে কর্মক্ষম থাকতে চেষ্টা করেন, সে সবই শান্তভাবে বলেছেন। কীভাবে তিনি শোক সংবরণ করতে পারছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে মেরি বলেছেন—মৃত্যু শোক সহ্য করা অভ্যাস হয়ে গেছে। নিজের বাবা, মা, ভাই, বোন, দুই স্বামী, অসংখ্য আত্মীয়, বন্ধু এবং একটি সন্তান ইতিমধ্যে হারিয়েছেন। বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সহ্য করা ছাড়া উপায় কী? পরিস্থিতিকে মেনে নিতেই হবে।

বার্ধক্য বলতে আমরা যে ধরে নিই, মানুষ খুব অসহায় হয়ে পড়েন, শরীর আর মন ভেঙে গেলে কোনওমতে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেন মাত্র—আমেরিকার শতবর্ষজীবী বহু মানুষই সে কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, রঙ্গ রস আর আবেগের জোয়ার দেখে ওই বিজ্ঞানীরা তো রীতিমত অবাক! এমন প্রাণস্ফূর্তি তাঁরা আশাই করতে পারেননি। একশো বছরের বৃদ্ধ সাইকেল চড়ে পাড়া বেড়াচ্ছেন। একশো তিন বছরের বৃদ্ধা খানাডোবার পাড়ে বসে নিবিষ্ট চিত্তে মাছ ধরছেন। ভাবা যায়?

জীবনীশক্তিতে ভরপুর এইসব মানুষের শারীরিক আর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের মূল উৎস কী? প্রত্যেকে যে এক ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, তাও নয়। ন'বছর ধরে সমীক্ষার পরেও সঠিক ফর্মুলা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে দীর্ঘকাল বাঁচার জন্যে কী কী উপাদান লাগে, তার সম্ভাব্য বিচার, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নির্বাচিত ওই একশোজন বৃদ্ধ বৃদ্ধার নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক অবস্থান, মানসিক প্রবণতা, বংশধারার প্রভাব ইত্যাদি মিলিয়ে প্রত্যেকের আলাদা তথ্যপঞ্জি তৈরি হয়েছে। এক এক জনের সঙ্গে প্রায় পঁচিশ তিরিশ ঘণ্টার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে! অবশ্য একসঙ্গে নয়, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে এঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হত। প্রশ্নের ফিরিস্তিও কম ছিল না। শরীর থেকে মন, কিছু বাদ নেই। একশো বছর বয়স হলেই বা। মনে সাধ আহ্লাদ থাকতেই পারে। 'আপনি কি সম্প্রতি কারও প্রেমে পড়েছেন?'—এমন প্রশ্ন তো প্রত্যেককে করা হয়েছিল। বেশ কয়েকজন নাকি ফিকফিকিয়ে হেসেছেন এবং একটু একটু প্রেমে পড়ার কথা কবুল করেছেন। তেমনি শরীরের যাবতীয় খুঁটিনাটির খবরও দিয়েছেন। গ্যাস, অম্বল, প্রস্টেট, ক্যানসার—কার কোথায় কষ্ট সব জানিয়েছেন।

আমেরিকায় বৃদ্ধ মানুষরা কখনও কখনও নিঃসঙ্গতা আর অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায় আত্মহত্যা করে বসেন। কিন্তু এই একশো নম্বরি দলের মধ্যে বরং অন্যরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। একশো দু'বছরের এক বৃদ্ধ খুব হাসিয়েছেন। তাঁকে নাকি সমানে ইনভেস্টমেন্ট ব্রোকাররা ফোন করে জ্বালাতন করে। কেবলই লোভ দেখায় যে ওইসব ইনভেস্টমেন্ট থেকে তিনি ২৫ বছর পরে বা তার মধ্যেই কত লাভ করতে পারবেন। বৃদ্ধ হেসে খুন। বলেছেন—'পঁচিশ ঘণ্টা টিকে থাকি কিনা তার ঠিক নেই, তো পঁচিশ বছরের জন্যে ইনভেস্টমেন্ট। কোন কালে বই'পত্র কেনা বন্ধ করে দিয়েছি, শেষ করে যেতে পারব না—এই চিন্তায়। খবরের কাগজও মাসকাবারি বন্দোবস্তে কিনি না। সপ্তাহের হিসেবে কিনি। এখন মনে হচ্ছে—রোজ রোজ কিনে এনে পড়ে নেওয়া উচিত। কে জানে, সপ্তাহের মাঝখানে পটল তুললে বাকি পয়সাগুলো জলে যাবে কিনা?'

একজন কালো বৃদ্ধার নাম ম্যামি ক্যালহাউন। বয়স এখন একশো এক বছর। জর্জিয়ার গ্রিফিন শহরে স্কুল টিচার ছিলেন। ১৯১৩ সালে ম্যামি তাঁর পরিবারে প্রথম গ্র্যাজুয়েট

হয়েছিলেন। সে সময় আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে বর্ণবৈষম্য খুব প্রবল ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মেয়ের পক্ষে কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়া সহজ ছিল না। এখন তাঁর ধারণা—'মানুষের জীবনযাত্রার অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রত্যেকের জন্যেই উপযুক্ত সুযোগ আছে। সাফল্যের জন্যে কঠিন সংগ্রাম করতে হলেও আগের তুলনায় পথ সুগম হয়েছে। কত ভাল ভাল কলেজ। শিক্ষাব্যবস্থার কম উন্নতি? সবই ভগবানের দান।'

এই যে প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে এ মনোভাব গড়ে তুলতে হয়। ম্যামির নেয়ে ন্যাটালি বলেছেন—'মার একদিকে যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস খুব বেশি, তেমনই তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস। কখনও কোনও নৈরাশ্যজনক কথাবার্তা বলেন না। পরচর্চা করেন না। সবসময় আমাকে বলেন—কোনও তুচ্ছ বিষয়কে যেন বড় করে না দেখি। বলেন—ওঁর মৃত্যুর পরে যেন শোকে অধীর না হই। ধৈর্য আর ঈশ্বর বিশ্বাস থাকলে জীবনযাপন কখনও অসহ্য হয় না।

এসব তো গেল মনোভাবের কথা। শারীরিক অবস্থা এত বয়সে কতদূর সুস্থ রাখা সম্ভব? ডাক্তারদের মতে যাঁরা মেদবর্জিত বা খুব কম ফ্যাটযুক্ত খাবার খান, তাঁদের আয়ু বেশি হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল—ওই দলের মধ্যে কারওই খাওয়া দাওয়ার তেমন ধরাকাট নেই। অধিকাংশ বৃদ্ধ বৃদ্ধা নিয়মিত বেকন, সসেজ, ডিম খেয়ে চলেছেন। নিউট্রিশন বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন যে মাত্র একশো জনের ব্রেকফাস্টের নমুনা নিয়ে সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার বৃদ্ধ বৃদ্ধার স্বাস্থ্য বিচার করা যায় না। অর্থাৎ কম চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়াই উচিত। হয়তো ওই প্রজন্মের দৈনিক অভ্যাস ছিল বেশি মাংস খাওয়া। তাতেই তাঁরা ধাতস্থ হয়ে গেছেন। এ প্রজন্মের আর অত বাড়াবাড়ি সহ্য হবে না। কারণ এদের দৈহিক পরিশ্রমের অভ্যাস কমে গেছে। পরিবেশগত দূষণ থেকেও খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

দেখা গেছে—ওই একশো জন একশো বছর বা তার বেশি বয়স্ক দল প্রতিদিন গড়ে ১,৬০০ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য খেয়ে থাকেন। সপ্তাহে একদিন অ্যালকোহল পান করেন। এঁদের মধ্যে আগে কেউ কেউ ধূমপান করলেও এখন আর একজনও করেন না। এঁরা অধিকাংশই ম্যাকারনি, চিজ বা নুডলস জাতীয় খাবার, মিষ্টি আলু, চিনি সহ চা পছন্দ করেন।

গবেষণার আগে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন বুঝি একদল রুগ্ন, ক্লান্ত আর বিষণ্ণ মানুষ তাঁদের সমীক্ষার বিষয় হবেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল একেবারে অন্য ব্যাপার। একশো তিন বছরের এক বৃদ্ধার সঙ্গে কিছুতেই সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করা যায় না। তিনি নাকি মহাব্যস্ত থাকেন। কখনওই গবেষণাকারীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। শেষে পাঁচজন বিজ্ঞানী মিলে ধরে বেঁধে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত মহিলা সমাদর করে বসিয়েছেন। কথাবার্তা বেশ জমে উঠছে। কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে এক বৃদ্ধ এসে খবর দিলেন—ওঁদের ছিপে মাছ উঠেছে। পুকুরে নাকি আরও মাছ খলবল করছে। ব্যস! বৃদ্ধার সাক্ষাৎকার মাথায় উঠল। বঁড়শি আর কেঁচোর চার নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তৈরি। বাধ্য হয়ে পাঁচজন বিজ্ঞানী বিদায় নিলেন। ততক্ষণে বুড়ি গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে। আর এ বছরে সে বৈতরণী পার হয়ে চলেই গেছে।

অ্যাটলান্টার আর এক বৃদ্ধ হচ্ছেন ঘোর কর্মযোগী। একশো বছর বয়সেও দৌড়ঝাঁপের কামাই নেই। তাঁর কথা হল—'কুঁড়ে হয়েছ কি জরা তোমায় আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরবে।' তিনি রোজ ব্যায়াম করেন। হয় রোয়িং মেশিনে চড়ে বসে গুণে পঁচিশবার রোয়িং করেন। যেন ড্যাং ড্যাং করে ডাঙায় ডিঙ্গা চালাচ্ছেন। নয়তো বাইসাইকেল চেপে ঘরের মধ্যেই প্যাডল করছেন। গণেশের বিশ্ব পরিক্রমা। কখনও সিঁড়ি ভাঙার খেলা। একমনে দোতলার সিঁড়ি থেকে নামছেন উঠছেন, আবার উঠতে নামতে নামতে উঠেছেন, আবার উঠতে উঠতে নামছেন। দশ বছর আগে যখন তাঁর নব্বই বছর বয়স, নাতির সঙ্গে এক বছরের জন্যে কমপিউটার কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। এখন কমপিউটার নিয়েই অনেকখানি সময় কেটে যায়।

যাঁরা বার্ধক্য নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদের কারও কারও মতে দীর্ঘায়ু হওয়ার ক্ষেত্রে বংশধারার বিশেষ প্রভাব থাকে। একই পরিবারে দীর্ঘায়ু লোক বেশি দেখা যায়। আবার স্বল্পায়ু পরিবার তো থাকেই, যেখানে বেশ কিছু মানুষ দীর্ঘজীবী হন না। পারিবারিক রোগও এর অন্যতম কারণ। খাদ্যরুচি, জীবনযাত্রা, মানসিকতারও কিছু ভূমিকা থাকা সম্ভব। পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ওষুধপত্র খাওয়া, নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও রোগ প্রতিষেধক ইনজেকশন ইত্যাদি বয়স্ক মানুষের পক্ষে বিশেষ জরুরি হয়ে পড়ে। নার্সিংহোমে বা বাড়িতে যেখানেই থাকুন, পারিবারিক এবং সামাজিক তত্ত্বাবধানে থাকার ফলে এঁদের সেবা যত্নের ত্রুটি হয় না। পাশ্চাত্য সমাজে নৈতিক বিধিনিষেধের চাপ না থাকার কারণে এঁরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সাহচর্যের জন্যে সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর কাছে থাকতে পারেন। নিঃসঙ্গতা থেকে যে বিষাদ সৃষ্টি হয়, এঁরা ইচ্ছে হলে সে পরিস্থিতি এড়াতে পারেন। যানবাহনের অভাবে ঘরে বন্দি হয়ে থাকার প্রশ্ন নেই। অর্থের অভাবে প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর সমস্যা নেই। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্যে বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে একেবারে প্রত্যন্ত শহরেও। সমাজসেবীরা নানা ট্রিপে বেড়াতে নিয়ে যান। থিয়েটার, সিনেমা, বাজার, হাট, লাইব্রেরি—সর্বত্র এঁদের জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা থাকে। টিকিটের বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়। সারা বছরের নানা উৎসবে এঁদের জন্যে কত আয়োজন। অর্থাৎ এঁরা যাতে বয়স্ক হবার অপরাধে সমাজবহির্ভূত না হয়ে পড়েন, সরকারি ভাবেই তার জন্যে অনেক বন্দোবস্ত থাকে। চার্চে, সিনেগগেও এঁরা বয়স অনুযায়ী দল পেয়ে যান। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের অ্যাডাল্ট স্কুলে এঁদের ভর্তির হার বেড়ে যায়। ভাষা শেখা, গান, নাচ, পিয়ানো অথবা বেহালা শেখা ছাড়াও রান্নার কোর্স, মেডিটেশন কোর্স, ফার্স্ট এইড কোর্স, ক্র্যাফ্‌ট কোর্স, কমপিউটার ট্রেনিং, কাঠের মিস্ত্রির কাজ, রিয়েল এস্টেট এজেন্টের ট্রেনিং—শেখার জিনিসের অভাব নেই। এই সুযোগে পরিচিতের সংখ্যা বাড়ে। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ দম্পতি অথবা বিধবা, বিপত্নীক, ডিভোর্সি মানুষদের একাকীত্ব দূর হবার সম্ভাবনা থাকে। কাজকর্ম আর পড়াশোনার মধ্যে ব্যস্ত থাকলে, ধর্মীয় আচার আচরণের মধ্যে জড়িত থাকলে বার্ধক্য এলেও স্থবিরত্ব আসতে সময় লাগে। দেশের জল হাওয়ার গুণে শরীর স্বাস্থ্যও সহজে নষ্ট হয় না। শীত নেহাত অসহ্য হলে বার্ধক্যের বারাণসী ফ্লোরিডা তো আছেই। ওই স্টেটের এক একটি কাউন্টিতে শুধু বৃদ্ধ বৃদ্ধারাই কলোনি বানিয়ে ফেলেছেন।

দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কারণ হিসেবে স্বাস্থ্যই যে প্রধান ভূমিকা পালন করে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্যানসার, কার্ডিও ভ্যাসকুলার রোগ, অ্যালঝাইমারস ডিজিস, আর্থ্রাটিস, অস্টিওপরেসিস ইত্যাদি অসুস্থতার চিকিৎসা, মহিলাদের হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এবং নিয়মিত চেকআপ ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারটি প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। আমেরিকাতে ওষুধ কোম্পানিগুলি ওষুধের গবেষণা এবং নতুন ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রতি বছরে প্রায় এগারো কোটি ডলার খরচ করে। মার্কিন সরকারের ওই একই খাতে বরাদ্দ থাকে প্রায় সমপরিমাণ অর্থ। বায়োমেডিকেল রিসার্চের জন্যেই কত কোটি ডলারের সদ্ব্যবহার হয়।

১৯০০ সালে আমেরিকার মানুষ পঞ্চাশ বছরের বেশি বাঁচলেই তাকে দীর্ঘায়ু বলে ধরা হত। আর এখন অন্তত ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কোনও মানুষ বেঁচে থাকবে বলেই আশা করা যায়। দীর্ঘজীবী মানুষের সংখ্যা যে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, তার কারণ অনেক। হার্টের অসুখের জন্যে এত আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়েছে যে বছরে প্রায় ছশো হাজার রোগী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসার গুণে প্রায় পাঁচশো হাজার স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী জীবন ফিরে পাচ্ছেন। ওষুধের কল্যাণে, ফিজিক্যাল থেরাপির সাহায্যে তাঁরা আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারছেন। আলসারের চিকিৎসার জন্যে এতরকম ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে যে রোগ যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে বিনা অপারেশনে। '৭৬ সাল পর্যন্ত ব্লিডিং আলসারের রোগীদের অপারেশনের ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ওই বছরে একশো পঞ্চান্ন হাজার রোগীর আলসার অপারেশন হয়েছিল। '৮৪ সাল নাগাদ দেখা গেল বছরে ষোলো হাজারের বেশি অপারেশন হচ্ছে না। কারণ ততদিনে আলসার উপশমের ভাল ওষুধ বাজারে এসে গিয়েছে।

এভাবেই ক্যানসার নিয়ে গবেষণা চলছে। ক্যানসারের সম্ভাব্য কারণ এবং বয়সের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, কোন বয়স থেকে কী কী সতর্কতামূলক পরীক্ষা করানো উচিত—এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে। হার্টের অসুখের সঙ্গে পরিবেশ এবং বংশধারার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, নানারকম ব্যথা বেদনা উপশমের জন্যে নিরাপদ ওষুধপত্র ব্যবহার, বাত ও টিস্যু সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা, মানসিক বিষাদ ও স্কিজোফ্রেনিয়ার উন্নততর চিকিৎসা, অ্যালঝাইমার্স ডিজিসের রুগির মনে রাখার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে উপযুক্ত চিকিৎসা—নানাভাবে বয়স্ক মানুষকে সুস্থ রাখার চেষ্টা হচ্ছে। বায়োমেডিকেল রিসার্চের অগ্রগতি থেকে আশা করা যাচ্ছে আগামী পঁচিশ বছরে প্রায় ৪.৪ লক্ষ কার্ডিও ভ্যাসকুলার রোগী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবেন। আনুমানিক ৮৩ হাজার লিউকিমিয়ার রোগী দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন।

আমেরিকায় গত কুড়ি বছরে মলিকিউলার বায়োলজি ও জেনেটিক্স বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ধরনের গবেষণা ও প্রসার হয়েছে, তার ফলে এদেশে বায়োটেকনোলজি কোম্পানিগুলিতে দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ আবিষ্কারের কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হচ্ছে। গত দশ বছরে আবিষ্কৃত এবং অনুমোদিত পনেরো-ষোলোটি ওষুধ আর ভ্যাকসিন ইদানীং চিকিৎসার প্রয়োজনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অ্যানিমিয়া, ক্যানসার, হেপাটাইটিস, হার্টের রোগ, এইডস, নার্ভাস সিসটেম ও ইমিউন সিস্টেম সংক্রান্ত জটিল অসুস্থতার

চিকিৎসার জন্যে আধুনিক বায়োটেকনোলজির ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হচ্ছে।

এছাড়া বয়স্ক মানুষ যে রোগে রীতিমত অথর্ব হয়ে পড়েন, সেটি হল রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস আর অস্টিও আথ্রাইটিস। এক বাতেরই নাকি শ'খানেক ভ্যারাইটি আছে। সেই বাত ব্যাধি থেকেও উদ্ধার পাওয়ার চিকিৎসা শুরু হচ্ছে। আমেরিকার ৬১টি ওষুধ কোম্পানি আপাতত বাত ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে একশো ষোলো রকমের ওষুধ বানাতে ব্যস্ত। শোনা যাচ্ছে, আগামী ২৫ বছরের ভেতরে বাতে পঙ্গুদের গিরি লঙঘন করার ক্ষমতা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে যাবে।

পঁচিশ, পঞ্চাশ নিয়ে কচকচি অনেক হল। শুরু করেছিলাম একশো বছর নিয়ে। লেখাটি না শেষে ওষুধ কোম্পানির ক্যানভাসিং হয়ে দাঁড়ায়। আসলে রোগ বালাই দূর হলে যে পরমায়ু বেড়ে যায়, এমন ধরনের সম্ভাবনার আভাস দেবার চেষ্টা করেছিলাম। সম্ভাবনা, আভাস, চেষ্টা—এই যে সব ধোঁয়াশা টাইপের কথা লিখছি, তার কারণ বেঁচে থাকার রহস্য ভেদ করা অত সহজ নাকি? ফর্মুলা, থিয়োরি কোনও কিছুই তো ফুল প্রুফ নয়। পরমায়ু হল যথার্থ মহৌষধি। একমাত্র এই টনিকের দৌলতে সেঞ্চুরি করা যায়। এখানে এক আমেরিকান দম্পতির পঁচাত্তর বছরের বিবাহ বার্ষিকী হল। দুজনের বয়সই একশো পার হয়ে গেছে। বেশি বয়স অবধি বেঁচে থাকার সুখ সুবিধে নিয়ে তাঁরা ছোট্ট বক্তৃতা দিয়েছেন। বিবাহবার্ষিকী বলে কথা। দুঃখের কথা কেউ ভাঙে নাকি সেদিন?

তবু দুঃখের কথা থাকে। বার্ধক্যের অভিজ্ঞতা সতত সুখের নয়। দেশে বিদেশে এমন অশীতিপর মানুষ দেখেছি যাঁরা সন্তানের মৃত্যুর পর বলেছিলেন—দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে এই শাস্তি ভোগ করছি।

সেই খুনখুনে বুড়ি রোজ গুনে গুনে কলা কেনে। পাকা কলা তাঁর নিত্য বরাদ্দ। কারণ, তাঁর নাকি খুব পটাশিয়াম দরকার। আগে টিভির বিজ্ঞাপনে দেখতাম এক রাশিয়ান বুড়ি গভীর মনোযোগ দিয়ে চেটে চেটে দই খেয়ে যাচ্ছে। শুধু টক দই খেয়ে সে সেঞ্চুরি করেছে। এরকমই নাকি টক দই-এর সঞ্জীবনী শক্তি। আবার শুনছি প্রভূত কার্বোহাইড্রেট খেয়ে বেঁচে আছে একশো বছর বয়সী সেই একশো জন মানুষ। শুধু বেঁচে নেই, মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কুলে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ একটু প্রেমে পড়ছে। শোক তাপ পেলে তাকে ঈশ্বরের দান বলে সান্ত্বনা খুঁজছে। একশো বছর বয়সে আর কি অসাধ্য সাধন সম্ভব?

তবে তো ভাতেরও ক্ষমতা কিছু কম হওয়া উচিত না। ক্রমশ যেন বেঁচে থাকার রহস্য টের পাচ্ছি। ফর্মুলা হল—আমেরিকার হলদে কলা (একটি পচামার্কা হয়, হোক), রাশিয়ার টক দই (সেখানে আকাল বলে মাদ্রাজি দোকানের সাপ্লাই) আর ভারতের বাসমতি চালের এক বাটি ভাত। সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিনি আর মেক্সিকোর আঁশওলা আম। লাড্ডু পাকিয়ে এই যদি নিত্য ফলার করা যায় অনায়াসে শ'খানেক শীত, বসন্ত পার হয়ে যাবে। অবশ্য মন চাঙ্গা রাখার জন্যে অন্যান্য উপকরণ তো নিশ্চয়ই দরকার। ফ্লোরিডার সাগর বেলায় গিয়ে ঝিনুক খোঁজার ছলে শ্লেষ্মা জড়িত কণ্ঠে গান গেয়ে পরিচয়...।

রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, দন্তশূল, স্পন্ডিলাইটিস সব ব্যথা সেরে যাবে। ওই অ-মৃত ফর্মুলার ব্যবসা চালিয়ে আমেরিকার বায়োটেকনোলজির সঙ্গে পাল্লা দেব আমি। ফল নিয়ে ফলাও মৃত সঞ্জীবনীর কারবার! সবাইকে শতবর্ষে পৌঁছে দেব। ঘুরে ঘুরে ম্যারেজ

অ্যানিভার্সারি হতে থাক। শুধু ওই আন্তর্জাতিক লাড্ডু নিজে কক্ষণও খাব না। অ-মৃতে অরুচি আর কি? মায়াজালের মশারি টাঙিয়ে বেঁচে আছি। একশো বছর অবধি বেঁচে থাকার লোভে 'শোক' নামে সেই শাস্তির ঝুঁকি কেন নেব আমি? কে বলতে পারে খোদার ওপর খোদকারি করতে গিয়ে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি হয়ে যাবে কিনা?

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

আপনি এল ব্যাকটেরিয়া

দেড়শো মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে মোট চারজন শিখা থাকে। এক নামের একাধিক মহিলাকে সাধারণত পদবি দিয়ে আলাদা করতে চেষ্টা করি। শিখা দত্তগুপ্ত, শিখা চৌধুরি, শিখরিণী চ্যাটার্জি। বাকি থাকল এক। তাকে বলি টক শিখা। অগ্নিশিখা, বহ্নিশিখার বদলে স্রেফ টক শিখা। এর পেছনে বহু পুরনো একটা ঘটনা আছে।

সে বছর আগস্ট মাসে ভ্যাপসা গরম পড়েছিল। অরুণাভর বাড়িতে তার ছোট্ট মেয়ের জন্মদিনের পার্টি। বউ শিখা বেশ অনেক লোক ডেকেছিল। আমরা সন্ধে লাগতেই লং আইল্যান্ডে ওদের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেছি। কিন্তু নিশাচর বাঙালি তো সব দেশেই আছে। তারা চাঁদ না উঠলে নেমন্তন্নে যায় না। আমেরিকায় গরমকালে চাঁদ উঠতে কম করেও রাত নটা বাজে। তা সেই নটা, সাড়ে নটা বাজিয়ে পূর্ণ চাঁদের মায়ায় পথ ভুলে তারা এল। তারপর কাটলেট সহযোগে তরল সেশন। ছোট অ্যাপার্টমেন্টে লোক গিজ গিজ করছে। শিখা সন্ধে লাগতে রান্না বান্না সাজিয়ে রেডি থাকলে কী হবে, আড্ডার ঝোঁকে আর অফুরন্ত কাটলেটের সাপ্লাই দেখে তরল সেশনের সদস্যরা আর ভাত-টাত খেতে চায় না। আমরা দূরের যাত্রী, যারা নিউ জার্সি বা ফিলাডেলফিয়া অঞ্চল থেকে গেছি, তারা রাত বাড়ছে দেখে উসখুস করছিলাম। ভেতরে লোকের ভিড়ে গরমও লাগছিল। শেষ পর্যন্ত বাল্যভোজ বসিয়ে দেওয়া গেল। ছোটরা ডাইনিং টেবিল ঘিরে বসে অনন্তকাল সময় নিয়ে ওদের স্পেশাল রান্না ফ্রায়েড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ম্যাকারনি স্যালাড খেতে লাগল। সেই পর্ব মিটতে রাত দশটা, সাড়ে দশটা। তখনও কেক কাটা বাকি। কিন্তু ডঃ যাদুগোপাল আর বসে থাকতে চাইছিলেন না। এমনিতেই শুনেছিলাম ওঁর নাকি "গেসট্রিকের ধাত। এসিডিটি হইলেই ইরিটেশন হয়।" যাদুগোপাল শিখাকে সেই 'ইরিটেশনের' কিঞ্চিৎ আভাস দিতেই ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেল।

শিখা অনেক রকম রান্না করেছিল। নিরামিষ, আমিষ দুইই অপর্যাপ্ত। টেবিল ঘিরে লম্বা লাইন দেখে তরল সেশনের সদস্যরা আরও গড়িমসি করছিল। কিন্তু আমরা যাদু-গোপালের নেতৃত্বে অনেকেই খাবার নিয়ে নিলাম।

—সুক্তানি কোনও দিন টক খাই নাই! বড়ই নূতনত্ব হইসে। ডঃ যাদু-গোপালের মতো সমঝদারের কথা শুনে সুক্তো টেস্ট করে দেখলাম। সামান্য টক ভাব আছে বটে। কে জানে?

কোনও দেশের সুক্তায় দই টইও পড়ে হয়তো।

—ফুলকপিটা হইসে এক্কেরে পানটাবি রান্না। কত যে টমাটো দিসে!

এবার যাদু-পত্নীর উচ্ছ্বাস কানে এল। আমি ফুলকপির তরকারি বাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু ডাল বাঙালির জাতীয় খাদ্য। খেয়ে দেখলাম তাতেও অম্লরস। এবং সামান্য হড়হড়ে ভাব। হড়হড়ে ছোলার ডাল আগে কখনও খাইনি। 'বড়ই নূতনত্ব হইসে...।'

এরপর রুই মাছের টক ঝোলকে দই মাছ ভেবে যারা খেয়েছিল এবং অম্বল মার্কা মাংস—তাদের সকলের সঙ্গে পরদিন প্রাতঃকালে আমরাও সপরিবারে ধরাশায়ী হয়েছিলাম। তরল সেশনের দল গভীর রাতে গরল খাদ্য খেয়েও বিষক্ষয় করতে পারেনি। মোটকথা সেই চাঁদনি রাতে, বদ্ধ অ্যাপার্টমেন্টের ভ্যাপসা গরমে, কয়েকদিনের তৈরি রান্নাগুলো দুপুর থেকে পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ যাদুগোপাল সেদিন "টকের ডালও খুব উপাদেয় হইসে" পর্যন্ত প্রশস্তিবাচনের পরেই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু চাটনি বাদ দেবার সময় বলেছিলেন—"কত রকম টকই তো খাইলাম আজ। এককেরে অনাস্বাদিত পূর্ব রান্না!" ভদ্রলোক সম্ভবত 'এসিডিটি' থেকে ইরিটেশনের স্টেজে পৌঁছে গিয়েছিলেন। শিখার পদাবলীর কল্যাণে আমাদের অনেকেরই পরে মিনি ডায়ারিয়া মতো হয়েছিল। সেই থেকে ওর নাম হয়ে গিয়েছে টক শিখা। টক হয়ে যাওয়া রান্না থেকে টকসিমিয়া। শুধু বাচ্চাগুলো কেনা খাবারের দৌলতে সে যাত্রা বেঁচে গেল।

আর একজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আমাদের দুশ্চিন্তা হত। মহিলা শীতকালে তাঁর গ্যারাজকে রেফ্রিজারেটরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতেন। গাদা গুচ্ছের লোক নেমন্তন্ন করে তিন-চারদিন আগে থাকতে অফিস ফেরত রাত জেগে সুখাদ্য বানাতেন। তারপর সেই গামলা গামলা ডাল, ডালনা আর ফ্রিজে না আঁটিয়ে সোজা হিম-শীতল গ্যারাজে চালান করে দিতেন। কে তাঁকে বোঝাবে যে রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা আর গ্যারাজের শীতকালে তাপমাত্রার মধ্যেও বিস্তর ফারাক থাকে। শেষে বেশ কয়েকবার চুনের মতো বুড়বুড়ি কাটা ডাল সাপ্লাই দেবার পর জনতার প্রতিবাদে শিক্ষা পেয়েছেন। সবচেয়ে বিপদ হয় ক্লাবের কোনও অনুষ্ঠানে বা পুজোর সময় এঁদের কিছু রান্নার ভার দিলে। বারোয়ারি ব্যাপার ভেবে আরও অবহেলা করেন। তবে সাধারণত দুটি একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এ ধরনের ব্যাপার সচরাচর ঘটে না। আমেরিকাতে রেফ্রিজারেশন কালচার বহু বছর ধরে চলে আসছে। সপ্তাহে একদিন বাজার হয় আর বড়জোর দুদিন রান্না। সেই সরবরাহ থেকে গোটা সপ্তাহ নিশ্চিন্তে কেটে যায়। ডিপ ফ্রিজে কাঁচা মাছ, মাংস মজুত থাকে মাসের পর মাস। প্যাকেটের গায়ে লেখা সর্বশেষ ব্যবহারের তারিখ দেখে দেখে রান্না করা হয়। মেশিনের ভেতরকার ঠাণ্ডা অবস্থা অথবা বাইরের ফুটন্ত অবস্থার মধ্যে রাখা থাকলে পুরনো রান্না নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জাগানো হয়—কাঁচা মাছ, মাংস ডিপ ফ্রিজ থেকে সরাসরি বাইরে না এনে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে রেফ্রিজারেটরের নীচের দিকের তাকে রেখে দেওয়া উচিত। তাতে ঠাণ্ডা অবস্থার মধ্যে থেকেই তার জমাট বাঁধা ভাব কমতে থাকবে। পরে কিছুক্ষণ বাইরে রেখে রান্না করা উচিৎ। কিন্তু সরাসরি ডিপ ফ্রিজ থেকে বাইরে এনে দীর্ঘ সময় ফেলে রাখার ফলে মাছ, মাংস কাঁচা অবস্থাতেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাছ মাংসের ভেতরের অংশ ঠাণ্ডা থাকলেও বাইরের অংশ ঘরের গরমে নষ্ট হয়ে

যেতে পারে। মাছের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি সাবধান হওয়া দরকার। রেফ্রিজারেটরের ভেতরকার তাপমাত্রা সঠিকভাবে না রাখার জন্যে অনেক বাড়িতে প্রায়ই রান্না খারাপ হয়ে গেছে বলে শোনা যায়। দোকানের দুধ, অরেঞ্জ জুস্, স্যান্ডউইচের পাতলা মাংসের স্লাইস ইত্যাদি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ভাল না থাকলেই খেয়াল করতে হবে। ফ্রিজের ঠাণ্ডার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলে জিনিসপত্র সহজে নষ্ট হবে না। রান্না করার পর বেশিক্ষণ বাইরে ফেলে রাখলে সে রান্না ফ্রিজেও সহজেই নষ্ট হতে পারে। কারণ দীর্ঘ সময় ঘরের তাপমাত্রার প্রভাবে তার মধ্যে বিষক্রিয়া সঞ্চারিত হতে শুরু করে। টক শিখার সেই অতরকম রান্নার গামলাগুলো সময় থাকতে ফ্রিজে ঢুকেছিল কিনা, ফ্রিজে অতিরিক্ত খাবার রাখা হচ্ছে বলে তার ভেতরে ঠাণ্ডার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছিল কিনা, নির্ধারিত সময়ের আগে সমস্ত রান্না বাইরে এনে অতিরিক্ত সময় ঘরের তাপমাত্রার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল কিনা, কাজ এগিয়ে রাখার জন্যে রান্নাগুলিকে অনেকক্ষণ ধরে সামান্য সামান্য গরম করা হয়েছিল কিনা জানি না। ত্রুটি অনেক রকমই হওয়া সম্ভব। এদেশে যখন কোনও খোলা মাঠে উৎসব হয়, সেখানেও প্রচুর খাবারের স্টল তৈরি হয়। কিন্তু একটানা খাবার বাইরে ফেলে রাখা চলে না। ফুড ইনসপেকটর এসে হাজির হন। নিয়ম হচ্ছে হয় গ্রিলে বা বার-বি-কিউ উনুনের আঁচে ট্রে সুদ্ধু গরম খাবার অনবরতই প্রচণ্ড গরম অবস্থায় রাখতে হবে। নয়তো কোনও ভ্যানের মধ্যে রেফ্রিজারেটর রেখে তার ভেতর খাবারগুলি ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখতে হবে। প্রয়োজন মতো বার করে এনে গরম করে বিক্রি করতে হবে। ইদানীং মাইক্রোওয়েভ আভনের সুবিধে থাকতে ভারতীয় মশলাপাতির দোকানগুলোও নোনতা জল-খাবার বিক্রি করার অনুমতি পেয়েছে। দোকানের ফ্রিজে রাখা কচুরি, ঘুগনি নিমেষের মধ্যে মাইক্রোওয়েভে গরম করে দিচ্ছে। হয় হিমশীতল, নয় ফুটন্ত। মাঝামাঝি অবস্থায় খাবার ফেলে রাখা যাবে না।

নিউ ইয়র্কে ভারতীয় রেস্তোরাঁর রমরমা ব্যবসা। আমেরিকার অন্যান্য শহরেও ক্রমশ ভারতীয় রেস্তোরাঁ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর আছে অসংখ্য বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ। সেখানে বাইরের চাকচিক্য কম। তবে রান্নার গুণে আর সস্তার জন্যে ব্যবসা ভালই চলে। কোনও রকম গাফিলতির জন্যে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কিন্তু এই সব ভারতীয় বা বাংলাদেশি রেস্তোরাঁগুলোর লাইসেন্স বাতিল হওয়ার ঘটনা সচরাচর শোনা যায় না। অর্থাৎ ঠাণ্ডা/গরম থিয়োরি আর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকছে। না হলে দেওয়ালে সিটির ফুড ইনসপেকটরের সার্টিফিকেট ঝোলানো থাকবে না। আচমকা উদয় হয়ে খাদ্য পরীক্ষা করে অসন্তুষ্ট হলে, মালিককে সাময়িক দোকান বন্ধ করতে বলে যাওয়াই ফুড ইনসপেকটরদের কাজ। তিনমাস বাদে আবার নতুন করে হানা দিয়ে দেখবে। তাদের হাত থেকে ক্লিন বিল সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত পোলাও কালিয়া রান্না বন্ধ।

চীনে রেস্তোরাঁগুলোর মধ্যে এক আধটার ওপর প্রায়ই এরকম কোপ পড়ে। চীনে ম্যান মাথায় টুপি না পরে নুডলস ভেজেছে, কিংবা ফুটন্ত সাবান জলের বদলে কুসুম কুসুম গরম জলে প্লেট ধুয়েছে, নয়তো চিংড়ির খোলায় বোঝাই প্ল্যাস্টিকের বস্তার মুখ সুন্দর করে ফিতে দিয়ে বাঁধেনি। এ সবই অস্বাস্থ্যকর অপরাধ। ফলে নোটিশ জারি হয়ে যায়।

নিউ ইয়র্কে জাপানি রেস্তোরাঁয় কাঁচা মাছের সুখাদ্য 'সুশি' খেয়ে আমার মেয়ে স্টমাক

ভাইরাস হয়ে শয্যা নিয়েছিল। প্রস্তর যুগের 'খাদ্যাভ্যাস' নিয়ে তাকে বকাবকি করতে করতে গ্যাসট্রো-ইন্‌টেসটিনোলজিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম। জাপানিদের "সুশি"-কে অখাদ্য বলেছি বলে ডাক্তার যা তথ্য দিলেন, শুনে চমকে ওঠার জোগাড়। কাঁচা মাছের নাকি কোনও দোষ নেই। তবে কার দোষ? যে হাতে করে নেড়ে চেড়ে দিয়েছে তার। রান্নাঘরের সেই কর্মচারী জাপানিও হতে পারে। কিংবা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির লোক হতে পারে, যারা খুব সম্ভব বড় বাথরুম সেরে ঠিক মতো হাত টাত ধোয় না। তাদের অপরিষ্কার নখের মধ্যে সঞ্চারিত জীবাণু থেকে সুশির মাছ সংক্রামিত হয়েছে। এবং সেই ট্যাপা মাছ খাইয়া আমার কন্যা অসুস্থ।

থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির লোকেরা নিউ ইয়র্কের বহু রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে ভিড়ে গেছে, ঠিক কথা। জাপানি সুশি বারে ঢুকতেই পারে। তাদের ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা কে জানতে গেছে? চীনে, জাপানি, ভিয়েতনামি, পাকিস্তানি, থাই, কোরিয়ান—বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?

যাইহোক, ফুড কনট্যামিনেশন আর তার কারণ নিয়ে আমেরিকানরা এত সচেতন থাকলেও, হঠাৎ-হঠাৎ কিছু অঘটন ঘটে যায়। কিছুদিন আগেই আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ওয়াশিংটন স্টেটে এরকম ঘটনা ঘটে গেল। "জ্যাক ইন দ্য বক্স" নামে হ্যামবার্গারের দোকানে খেয়ে দুটি শিশু মারা গেল। অসুস্থ হল প্রায় স্বাড়ে তিনশো লোক। হ্যামবার্গারের বিফের কিমা ঠিকমত রান্না না হওয়াতে এই কাণ্ড।

তারপর থেকে রাজধানী ওয়াশিংটনে মাংস ছাড়া কোনও আলোচনা নেই। সেনেট সাব কমিটিতে মস্ত বক্তৃতা দিলেন "সেক্রেটারি অফ এগ্রিকালচার" মাইক এস পি। যেসব ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁয় হ্যামবার্গার তৈরির জন্যে মাংস কেনা হয়, তাদের এখন থেকে কড়া নিয়ম মানতে বাধ্য করতে হবে। ফেডারেল অথরিটি থেকে লোক পাঠিয়ে নিয়মিতভাবে কসাইখানার পরিবেশ পরীক্ষা করতে হবে। সেখানে সম্পূর্ণ সুস্থ পশুকে হত্যা করা হচ্ছে কিনা দেখে এবং মাংসের গুণাগুণকে বেশ কয়েকবার মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পাশ করিয়ে তবে হ্যামবার্গার তৈরির অনুমতি দিতে হবে। এগ্রিকালচার বিভাগ আর স্টেট হেলথ অফিশিয়ালদের বক্তব্য—'ফুডমেকার' ইনকরপোরেটেড নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানি নানা ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁতে মাংস বিক্রি করে। "জ্যাক ইন দ্য বক্স'-ও সেখান থেকে মাংস কেনে। হ্যামবার্গার তৈরির সময় কিমা সম্পূর্ণ সেদ্ধ করা হয়নি। ফলে তারমধ্যেই কোলাই ব্যাক্‌টিরিয়া সংক্রমণ হয়েছে এবং যারা ওই হ্যামবার্গার কিনে খেয়েছিল, তারা ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ফেডারেল এগ্রিকালচার বিভাগ থেকে রেস্তোরাঁর কাঁচা মাংস পরীক্ষার সময় সাধারণত চোখে দেখা এবং গন্ধ পরীক্ষা করে তবে ছাপ দেওয়া হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে ব্যাকটেরিয়াল কনটেন্ট খুঁটিয়ে দেখার জন্যে আরও বিশেষ রকম পর্যবেক্ষণ করা দরকার বলে জানানো হয়েছে। ইউ এস এগ্রিকালচার বিভাগের ফুড, সেফটি অ্যান্ড ইনসপেকশন সার্ভিস এ জন্যে নতুন ভাবে চিন্তা করছে। কসাইখানাতে প্রায় সব সময় পরীক্ষক রাখতে হবে। কাঁচা মাংস যে কোনও অবস্থায় পরীক্ষা করা হবে। নিহত জীব জন্তুর শরীরের মধ্যে অস্বাভাবিক টিস্যু, টিউমার অ্যাবসেস ইত্যাদি থাকলে তার মাংস কোনও মতেই সরবরাহ

করা যায় না। এ নিয়ম অবশ্য অনেক বছর আগে থেকেই করা হয়েছে।

সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এ ব্যাপারে সরাসরি কিছু সমাধানের ব্যবস্থা করেছেন। খাদ্যে বিষক্রিয়া রোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে মোট আরও একশো ষাট জন মাংস পরীক্ষককে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এঁরা গরু, ভেড়া, শুয়োরের মাংস ছাড়াও, মুরগি, টার্কি, হাঁস ইত্যাদি মাংসও পরীক্ষা করবেন। নতুন কর্মী নিয়োগ করা সত্ত্বেও কিন্তু পুরনো পদগুলির অধিকাংশই শূন্য থাকবে। আমেরিকায় মোট নয় হাজার স্লটারিং হাউস ও মিট প্রসেসিং প্ল্যান্ট আছে। মোট ইনসপেকটরের সংখ্যা সাত হাজার দুশো জন। ৫৫০টি আসন ভর্তি করা হয়নি প্রধানত আগের প্রশাসনের বাজেট কমানোর জন্যে। '৭৮ সালে প্রায় সাড়ে আট হাজার মিট ইনসপেকটর ছিলেন। এঁদের কাজ স্লটার হাউস এবং প্রসেসিং প্ল্যান্ট থেকে কোনও দূষিত মাংস যেন রিটেল স্টোরে না যায়, তার ওপর লক্ষ্য রাখা। রেগান, বুশের আমলে ছাঁটাই হয়ে যাওয়া মিট ইনসপেকটরদের বক্তব্য—যেখানে জাতীয় স্বাস্থ্য জড়িত, সেখানে এত কম সংখ্যক কর্মী দিয়ে নয় হাজার প্ল্যান্টের মাংস পরীক্ষা করা সঙ্গত নয়।

এগ্রিকালচার বিভাগ থেকে সেক্রেটারি মাইক এস পি মোট তেত্রিশ দফা প্রস্তাব রেখেছেন। এর মধ্যে প্রধান হল জনসাধারণের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, ফুড ইনসপেকটরের কাজের গুরুত্ব বুঝতে হবে। শুধু মাংস পরীক্ষাই নয়, যেসব পশু পাখিকে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের খাদ্য, পানীয় কিরকম হওয়া উচিত, ইনসপেকটরদের সেদিকেও কঠোর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সবচেয়ে জরুরি হল মাংসের প্যাকেটের গায়ে লেবেল দিতে বাধ্য করা হবে। সেই লেবেলে লেখা থাকবে কতক্ষণ ধরে এবং কত তাপমাত্রায় সেটি রান্না করা দরকার। আর নতুন নিয়ম অনুযায়ী হ্যামবার্গার-এর কিমা অন্তত ১৫৫° ফারেনহাইটে রান্না করতে হবে। আগে ১৪০ ডিগ্রিই ছিল যথেষ্ট। এদিকে অ্যাটল্যানটার "ফেডারেল সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল" জানাচ্ছে—ওই "জ্যাক ইন্ দ্য বক্স" ফাস্ট ফুডের দোকানের হ্যামবার্গারগুলো নাকি ১২০° ফারেনহাইটে রেখে অর্ধপক্ক অবস্থায় রোল রুটির মধ্যে বসিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। অর্থাৎ কিছু অংশ কাঁচা থাকাতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হয়েছিল।

আমেরিকায় "ম্যাকডনাল্ড" আর "বার্গার কিং" নামে দুটি ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁ এ ব্যাপারে অনেকদিন আগেই সাবধান হয়েছে। আশি সাল নাগাদ একবার "ম্যাকডনাল্ড"-এর হ্যামবার্গার থেকে ই কোলাই সংক্রমণের ঘটনা হওয়ার পর ফুড মাইক্রোবায়োলজি বিশেষজ্ঞ-র উপদেশ অনুযায়ী এরা রান্নার তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখন, সেখানে ১৬০° ফারেনহাইটে বিফ কিমা রান্না করা হয়। "বার্গার কিং"-এও একই প্রণালী "হার্ডিস" ও "ওয়েন্ডস" নামে আরও দুটি এরকম রেস্তোরাঁর হ্যামবার্গারের কিমা ১৬৫° ফারেনহাইট তৈরি হয়। "ট্যাকো বেল" নামে মেক্সিকান ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁয় বিফের কিমা দু'বার রান্না হয়। প্রতিবার ১৬৫° ফারেনহাইটে। আবার শিকাগো অঞ্চলে বহু রেস্তোরাঁ কিছুতেই ১৪০° ফারেনহাইটের বেশি তাপে কাঁচা মাংস রাঁধতে রাজি নয়। তার ফলে নাকি মাংস চিমড়ে হয়ে স্বাদ গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে। মোটকথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য হল তারা যখন তখন রেস্তোরাঁয় লোক পাঠিয়ে পরীক্ষা নেবে। সেইসব পরিদর্শক থার্মোমিটার ঢুকিয়ে

মাংস রান্নার তাপ পরীক্ষা করবে। তৈরি হয়ে যাওয়া কিমার চ্যাপ্টা বলগুলোর মধ্যে, অথবা মুরগির টুকরোর মধ্যে যদি গোলাপি আভা দেখতে পায়, তো সব টেনে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে। কারণ গোলাপি আভা বেরচ্ছে মানেই মাংস সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়নি। আর লাল্‌চে রস বেরচ্ছে দেখলেও ফেলে দেবে। ঠিক ঠিক আঁচে সেদ্ধ হয়ে গেলে পরে মাংসের গভীরে যখন নাকি ছাইরঙা আকাশ দেখতে পাওয়া যাবে, তখন বিক্রি করতে অনুমতি দেবে।

খরচের বহর খাদ্য দফতরে এমনিতেও কিছু কম নয়। প্রত্যেক বছর বারোটি কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি এক কোটি ডলার খরচ করে শুধু এ জন্যেই মোট ৩৫টি আইন প্রযোজ্য রেখে এ দেশের খাবারের গুণাগুণ আর নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করতে এই খরচ হয়। ইনসপেকশনের ব্যাপারটি নানা ক্ষেত্রে নানা কারণে গুরুত্ব পায়। কৃষি দফতরের দায়িত্বে গরু, ভেড়া, শুয়োর, হাঁস, মুরগির মাংস পরীক্ষার কাজ। খুব ঘন ঘন এই সব জন্তুর মাংস পরীক্ষা করা হয়। নিয়মিত বলাই ভাল। কারণ লোকেরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এই মাংস কেনে। এদিকে যে প্রসেসিং প্ল্যান্টে খরগোস, হরিণ, বন্য পাখির মাংস কেটে, পরিষ্কার করে প্যাকেট করা হয়, সেখানে বছর দুই/তিন অন্তর প্ল্যান্ট পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনস্ট্রেশন।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আরও ১৬০ জন ইনসপেকটরকে চাকরিতে নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়ার ফলে, "সায়েন্স্ ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট" ইত্যাদি দলগুলি ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে আরও কিছু নতুন পরিকল্পনার কথা বলছেন। প্রথমত রাষ্ট্র আর রাজ্যের নিয়ম কানুন এক হতে হবে। সারা আমেরিকায় ওয়াশিংটনের স্বাস্থ্য দফতর যেমন বলে দেবে, ঠিক সেইভাবে খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষা করতে হবে। ফারেনহাইট কামানো, বাড়ানো নিয়ে মাংস রান্নায় উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করা চলবে না। সেনেট, কমিটির কাছে এগ্রিকালচার সেক্রেটারি এস পি বলেছেন—নতুন করে খাদ্যের বিষক্রিয়া দূর করার পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এখন যা যা নিয়ম চালু আছে, সেগুলি বজায় রেখে আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হবে।

নতুন ডেমোক্র্যাটিক সরকার জনগণের স্বাস্থ্য চিন্তা করে কাঁচা মাংসের জীবাণু নিধন যজ্ঞের আয়োজনে তৎপর। আমরা মানে জনসাধারণের কিছু দায়িত্ব অবশ্যই আছে। বাজার করার মুহূর্ত থেকে, ডিপ ফ্রিজের ভাঁড়ারে তোলা, রান্না করা, খাওয়া এবং হজম করা পর্যন্ত শুধু আমি, মুরগি, ভেড়া আর ছাগল। তখন আর মাঝখানে বিল ক্লিনটনও নেই, ফুড ইনসপেকটরও নেই। তখন শুধু আমার কর্মফল। সে গুরু দায়িত্ব কিরকম?

এক তো মাংস কিনেই বাড়ি চলে আসা। মাঝে কোথাও পাড়া বেড়ানোর স্কোপ নেই। বাড়ির তালা খুলেই ফ্রিজের ডালা খোলা। মাংস ডিপ ফ্রিজে চালান দাও। সে সময় বাজারের ঠোঙার পাহাড় সাজিয়ে রেখে ফোনে রসালাপ কদাপি নয়। মাংসকে আবার এমন বন্দি করে রাখতে হবে, যাতে ডিপ ফ্রিজেও তার জলীয় পদার্থ অন্য খাবারে না লাগে। ম্যাংগো আইসক্রিমের কৌটোর গায়ে মুরগির জল লাগলেই সর্বনাশ। কৌটোর গায়ে কনট্যামিনেশনের সম্ভাবনা। ভুল করে বাইরে আইসক্রিমের কৌটো অনেকক্ষণ ফেলে রেখেছি কি মরেছি। মুরগির জলবিন্দু থেকে আইসক্রিমের মহাভারত অশুদ্ধ!

এরপর রান্নার জন্যে মাংস থেকে বরফ ছড়ানো। পুরো ঘটনাটাই হিমশীতল পরিবেশে

ঘটাতে হবে। ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে এনে রামপাখিকে রেফ্রিজারেটরে 'শয়ান' দেব। সে আধবেলা শুয়ে থেকে বরফ মুক্ত হবে। কিন্তু ভুলেও তাকে রান্নাঘরের সিঙ্কে শুইয়ে গরম করা চলবে না। ওই আধ ঠাণ্ডা শরীরেই হয়তো—আপনি এল ব্যাক্‌টেরিয়া তারে ডাকা হয় নাই।

এরপর আছে লাগাতার রেঁধে যাওয়ার উপদেশ। মাংস যেভাবেই রান্না করি মন দিয়ে শেষ করতে হবে। মশলা মাখানো মাংস বেশিক্ষণ বাইরে রাখা চলবে না। অর্থেক রেঁধে গ্যাস বন্ধ করে টি ভি দেখতে বসলেই বিপদ। বার-বি-কিউ গ্রিলে ব্রয়েল করতে গিয়ে সাত তাড়াতাড়ি ক্ষান্ত দিলেই ব্যাকটেরিয়ার টেরর। কখনও বরফ বিমুক্ত কাঁচা কিমা "এতখানি লাগবে না" ভেবে ডিপ ফ্রিজে আবার চালান করা উচিত নয়। সবটুকু রেঁধে ফেলা অবশ্য কর্তব্য। ভুরি ভোজনের পরে উদবৃত্ত মাছ, মাংস ঝট করে ফ্রিজে ভরে ফেলতে হবে। খেয়ে উঠে শরীর ঢিশ ঢিশ করছে বলে গড়িমসি করলে চলবে না। ব্যাকটেরিয়া ওত পেতে আছে। আর একটা উপদেশ—কাঁচা মাছ, মাংস নাড়াচাড়া করলে ভীষণ বেশি করে সাবান ডলে ডলে হাত ধুতে হয়।

আসলে এসব সতর্কবাণী মানলে ভাল। না মানলে? হয়তো "ই-কলি"র আবির্ভাবে পেটের মোচড়ে আকুলিবিকুলি হলেও হতে পারে। "জ্যাক ইন দ্য বক্স' আর টক শিখা মিলে অজ্ঞতার কারণে কিছু লোককে যাতনা দিয়েছে তো! সরল মনে গরল খেয়ে কী তরল অবস্থা। জাপানি সুশি বারে কাঁচা মাছ খেয়েই হোক, কিংবা নিউ ইয়র্কের চায়না টাউনে আরশোলা অধ্যুষিত রান্নাঘরের "পিকিং ডাক্" খেয়েই হোক—আপনি এল ব্যাক্‌টেরিয়া তারে ডাকা হয় নাই! ঘটনাগুলো কালে ভদ্রে ঘটে এই যা।

কিন্তু ব্যাকটেরিয়াদের সঙ্গে এবার ডেমোক্র্যাটদের জোর লড়াই শুরু হচ্ছে। এমনিতেই বারো মাস সুপার বাজারে মাংস পরিদর্শকদের মাংসের প্যাকেট হাতে নিয়ে "গন্ধ চুরির মামলার" ঢঙে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। রেগন বুশ জমানাতেও কোনও দিন বাসি মাংস পাইনি। এবার তো আরও বেশি ইন্সপেকটর মাঠে নামছেন। অভিনব পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা!

দৃশ্যপট বদলে নিয়ে চিন্তা করুন। কলেজ স্ট্রিটে বাঙালির পাঁঠার দোকানে নয়তো কসবার স্লটার হাউসে সমবেত ইন্সপেকটররা মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসে আছেন। ফুটপাথের মটন রোলের দোকানে কাতারে কাতারে মাইক্রোবায়োলজিস্ট। রোলগুলো চেখে নয়, চোখে দেখার ডিউটি দিচ্ছেন।

১৩ মার্চ ১৯৯৩

বসন্ত বিদায়

জীবনের বহু বছর বসন্তের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে কেটে গেল। পৃথিবীর যে প্রান্তে যখন গেছি, বসন্ত তার কিরণ মাখা পাখা তুলে নেচে নেচে এসেছে। তবু আমার নাগাল পায়নি। কিন্তু কত কাল আর পালিয়ে বাঁচব? এবার যেন মনে হচ্ছে যে কোনওদিন সে আমায় ছুঁয়ে যেতে পারে। যে কোনও মুহূর্তে এক সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ পাপড়ির বুকে একটি শিশির বিন্দু আবিষ্কার করতে পারি। তারপর রাতারাতি শত শত গোলাপে-শিশিরে মেশামিশি। উপমাটি অবশ্যই পরস্মৈপদী। আমেরিকায় ডাক্তারি ছাত্রদের রোগের সামান্য লক্ষণ চেনাতে চিকেন পক্‌স্‌কে এমন কাব্যিক অলংকারে সাজানো হয়েছে।

বড়ই দুশ্চিন্তার কথা যে—ওই অলংকার শৈশবে আমার অঙ্গের বিবিধ ভূষণ হয়নি। এবং এই বয়সে ধারণ করতে বাধ্য হলে সে যে কী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হবে ভেবেই মুষড়ে পড়ি। আমার ডাক্তার বন্ধুকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি—'এমন দিন কি আসবে, যখন আর বসন্তের ভয় থাকবে না? সে হেসে বলে—'আশি নব্বই বছরেও তোমার জীবনে দুরন্ত বসন্ত আসতে পারে। বসন্তের কোনও বয়স নেই।'

সে কি আর জানি না? বসন্ত তো চিরনবীন! আমার আশি নব্বই বছর তার কাছে কী? রোগটা অনায়াসে ছোটবেলায় হয়ে যেতে পারত না? একুশ দিন ইস্কুলে যেতে হত না। মাছের মতো মশারির জালে শুয়ে নীহার গুপ্তর কালো ভ্রমর পড়তাম। সকাল সন্ধে গায়ে হলুদ। আর নিমপাতা দিয়ে সুড়সুড়ি। দেশলাই বাক্সে শুনে শুনে গুটি জমানো। ক্যালামাইন লোশন দিয়ে চন্দন পরা। ডেটলের গন্ধে জেগে ওঠা। আবার লাইসলের গন্ধে ঘুমিয়ে পড়া। সময়কালে দুর্ভোগ মিটে যেত। সে ভাগ্য করে আসিনি তো, যে কোনও কিছু অল্পের ওপর দিয়ে যাবে। বসন্ত আমার জন্যে কী রাজকীয় সম্ভার সাজিয়ে বসে আছে কে জানে?

মাস দুই আগের কথা। পাশের বাড়িতে চারটে বাচ্চার কিচিরমিচিরে উৎকর্ণ হয়ে ভাবছিলাম, ওদের ইস্কুলের কী হল? রোজ তিনজন সকালবেলা বাসে উঠে চলে যায়। ছোট জনের আড়াই বছর। সকালে সে মার কোলে চড়ে দাদা, দিদিদের হাত নাড়ে। তারপর পাড়া নিঝুম। কিন্তু সেদিন যেন চারটেরই ছুটির মেজাজ। মাঠময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আমি বেরচ্ছি দেখে সদলবলে মার পেছন পেছন আমড়াগাছি করতে চলে এল। দেখি চারজনেরই মুখময় শ্রাবস্তীর কারুকার্য। কারও গোলাপ পাপড়ির ওপর শিশিরবিন্দু টলমল করছে। কারও শুকোবার মুখে। কারও শুকিয়ে পাপড়ি খসে পড়েছে। এই জার্মান পরিবারটি সদ্য আমাদের প্রতিবেশী হয়ে এসেছে। এখনও তেমন আসা যাওয়া হয়নি। তাই জানিও না যে কবে ওদের বসন্ত উৎসব শুরু হয়েছে। মা বিনীতভাবে জানালেন—আর ওদের ঘরে আটকে রাখা যাচ্ছে না। দু সপ্তাহের মধ্যে সবকটাই পড়েছে। বেশি ভোগান্তি হয়নি। এবার সব একে একে স্কুল যেতে শুরু করবে। বসন্ত সেনাদের মুখে ফিকফিক হাসি। আমি বিদ্যুৎ বেগে ছেড়ে দে বাপ বলে স্টিয়ারিং-এর পেছনে। এই গেল এ বছরের প্রথম এনকাউন্টার।

দ্বিতীয় এনকাউন্টার হল একমাস আগে। পরিচিত একটি মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। সেই শিশু দর্শনে যাওয়া। গিয়ে দেখি শিশু কন্যার দাদাটির উশকো খুশকো চেহারা। মুখখানা কালচে মেরে গেছে। শুনলাম কদিন আগে গুটি কতক চিকেন পক্স হয়ে গেছে। মা বলল, 'ওর থেকে তো আমারও হল। এদিকে এইটুকু বাচ্চা...।'

—'তাই তো! কিন্তু তোমাকে দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না।

—'ওষুধ খেয়ে কমালাম। না হলে অনেক বেশি হতে পারত।'

—'অ্যাঁ, চিকেন পক্সের ওষুধ আছে? কে বললে? কী ওষুধ?

আমার অনুসন্ধিৎসার বহর দেখে মেয়েটি বলল, ডাক্তারই ওকে ওষুধ দিয়েছেন। মাত্র হাতে গোনা কটা শিশিরবিন্দু বেরতে না বেরতেই বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে নাকি। বাঃ অতি সুসংবাদ তো! জ্ঞান বর্ধনের জন্যে আমার ডাক্তার বন্ধুকে জেরা করব ঠিক করলাম। ইত্যবসরে শিশু কন্যাটিকে যারপরনাই আদর করলাম। এক তো তার মায়ের শরীর দুর্বল। তার ওপর বাচ্চাটা এতই স্বাস্থ্যবতী আর তুলতুলে মার্কা যে কাছে বসে থাকলে অনবরত আদর করতে ইচ্ছা করবেই। যাই হোক তারপর বাড়ি ফিরলাম। তারপর ফোনে খবর পেলাম রাতারাতি খুকিটিও বসন্তের দখিনা পবনের স্পর্শ পেয়েছে। আর সর্বাঙ্গে গুটি বেরিয়ে খুবই কষ্ট পেয়েছে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত রকম রোগেরই প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়েছে। এদেশে ছোটদের হাম হয় না, মাম্পস হয় না, হুপিং কাশি হয় না। বহু বছর আগে এ সব রোগ উৎখাত হয়ে গেছে। ডিপথিরিয়া, টিটেনাস, পোলিও-র চিন্তাও দূর হয়েছে। শুধু এই চিকেন পক্সকে তাড়ানো যায় না? প্রতিষেধক নয়তো ভাল ওষুধ পত্র থাকলে অনাগত শিশুদের সঙ্গে আমিও তো বেঁচে যাই। আত্মরক্ষার তাগিদেই অনেক খবর জোগাড় করতে শুরু করলাম।

এখানে একটা কথা বলে নিই। বসন্তের মোকাবিলায় একবার কিন্তু সম্মুখ সমরেও পড়েছিলাম। কলেজের ডর্ম থেকে আমার মেয়ে বেশ বাড়াবাড়ি রকমের চিকেন পক্স আর ধূম জ্বর নিয়ে এসেছিল। গুটি বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে আসাতে পুরো সময়টাই আমাদের কাছে ছিল। দেখেছিলাম বেশ যন্ত্রণাদায়ক রোগ। তাকে সারিয়ে তোলার সময় নিজের জন্যে ভালই হোমওয়ার্ক সেরে রেখেছিলাম। তখন শয়নে স্বপনে শিশিরবিন্দু খুঁজেছি। রোগীর জন্যে কেনা ওটমিল সাবান, শ্যাম্পু, ওটমিল বাথ পাউডার, ক্যালাড্রিল লোশন, বেনাড্রিল ক্যাপসুল সব একটু করে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখছিলাম। আমারও চিকেন পক্স হতে যাচ্ছে বলে একরকম নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু যে যাত্রাও রেহাই পেয়ে গেলাম। বছর খানেক অপেক্ষা করে দুত্তোর বলে ওটমিল টয়লেটে ফেলে দিলাম। আবার কোনও বসন্তর দিন এলে দেখা যাবে।

চিকেন পক্সের ওষুধ প্রসঙ্গে যা জানলাম। অ্যাসাইক্লোভির (Acyclovir) নামে একটি ওষুধ ইদানীং কোনও কোনও রোগীকে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণত যাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতার বিশেষ অভাব থাকে তাঁদের চিকেন পক্স ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ওষুধ দিলে অল্প সময়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। অন্যান্য জটিল উপসর্গকেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। ডায়াবেটিস, লিউকোমিয়া, ক্যানসার, এইডস ইত্যাদি রোগে যাঁরা অসুস্থ, তাঁদের চিকেন পক্স হবার লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকরা কোনও অতিরিক্ত ঝুঁকি নেন না। তবে

এই ওষুধ সংক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না প্রয়োগ করলে ঠিকমত প্রতিক্রিয়া হয় না।

বড় বয়সে চিকেন পক্স হলে কোনও কোনও রোগীর অন্যান্য উপসর্গ থেকে গুরুতর অসুস্থতা দেখা দেয়। নিউমোনিয়া, ব্রেন সংক্রান্ত রোগ, সেরিব্রাল অ্যাটাক, রক্তে সংক্রমণ, দৈহিক ক্ষতের সংক্রমণ ইত্যাদি। যে জন্যে প্রয়োজনমতো ওষুধ ব্যবহার করলে পরিণত বয়সের রোগী হয়তো এইসব উপসর্গ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। ছোটদের ক্ষেত্রেও যদি ক্যান্সার, লিউকোমিয়া, হজবিনস ডিজিস, এইডস, ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকে তবে, চিকেন পক্সে সংক্রমণ হলে একই কারণে অ্যাসাইক্লোভির ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়।

ডাক্তার রাখী গাঙ্গুলি নিউ ইয়র্কের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। তাঁর বক্তব্য—চিকেন পক্সের মতো রোগ যত ছোট বয়সে হয়ে যায়, ততই নিরাপদ। সাধারণত সামান্য কিছু গুটি বেরনো আর জ্বর ছাড়া বিশেষ কষ্টভোগ থাকে না। কতগুলি নিয়ম মানলে অল্পদিনের মধ্যে রোগী সুস্থ বোধ করে। গুটি বেরনোর পর ২/৩ দিন বাদে এ রোগ আর ছোঁয়াচে অবস্থায় থাকে না। এজন্যে সাত দিনের মধ্যেই ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো যেতে পারে। চিকেন পক্সের রোগীর শারীরিক কষ্ট অনেকভাবেই কমানো যায়। প্রথম থেকে ওটমিল সাবান মাখিয়ে বাথটবে ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করানো দরকার। জলের মধ্যে ওটমিল পাউডার ছড়িয়ে দিলে স্নানের পরে শরীর জ্বালা, চুলকানির ভাব থাকে না। বালতির জলে ওটমিল পাউডার মিশিয়ে স্নান করানো যেতে পারে। মাথার মধ্যে চিকেন পকস হয়েছে বলে শ্যাম্পু বাদ দেবার কোনও কারণ নেই। ওটমিল শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুলে ক্ষতগুলিতে যন্ত্রণা আর চুলকোনোর কষ্ট কমে যায়। স্নানের পর ভাল করে প্রতিটি গুটিতে ক্যালাড্রিল জাতীয় লোশন মাখালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গুটি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। বেনাড্রিল ক্যাপসুল বা কোনও অ্যান্টি হিস্টামিন ওষুধ খেলে গুটিগুলো থেকে চুলকানির কষ্ট অনেক কমে যায়। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে চিকেন পক্সের সময় তেমন ধরাবাঁধা না করলেও অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় হাই প্রোটিন খাবার বাদ দিতে বলা হয়। চিকেন পক্সের সময় জ্বর আর যন্ত্রণার উপসমের জন্য অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া সম্পূর্ণ বারণ কারণ ওই অসুস্থতার সময়ে অ্যাসিপিরিন থেকে ছোটদের ক্ষেত্রে সিনড্রাম নামে জীবাণুর আক্রমণ হতে পারে। ডাক্তারদের মতে, মাত্র অ্যাসেটামাইনোকেন জাতীয় ওষুধ (টাইলেনল, অ্যানাসিন থ্রি) দেওয়া যেতে পারে। অ্যাসপিরিন কখনই নয়। তবে এখনও আমেরিকার ডাক্তারদের মতে চিকেন পক্স বিনা ওষুধে সারানোর রোগ। যদি ওটমিল অ্যান্টিহিস্টামিন আর টাইলেনল দিয়েই সেরে ওঠা যায়, তবে অন্য ওষুধের প্রয়োজন নেই।

এবার আসছি চিকেন পক্সের প্রতিষেধক সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। স্মল পক্স যদি টিকে নিলে ঠেকানো যায়, তবে চিকেন পক্সকেই বা দমন করা যাবে না কেন? আমেরিকাতে ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম মার্ক অ্যান্ড কোম্পানি সময় বুঝে সেই প্রতিষেধকও বাজারে নিয়ে আসছে। আপাতত 'ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনস্ট্রেশন' ওষুধটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। মার্ক সংস্থা জানাচ্ছে, ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী এ প্রতিষেধক অত্যন্ত নিরাপদ আর শতকরা ৯৭ ভাগ শিশুদের ক্ষেত্রেই

এই প্রতিষেধক কার্যকর হবে। জাপানে দশ বছরেরও বেশি আগে চিকেন পক্সের ভ্যাকসিন চালু হয়ে গেছে। সেখানে ছোটদের অন্যান্য ভ্যাকসিনের সঙ্গে এটি দেওয়া হয়। অথচ আমেরিকাতে অনেক আগেই এ ওষুধ বাজারে আসার সম্ভাবনা সত্ত্বেও নানা কারণে বিলম্ব ঘটেছে। ডাক্তাররা আর 'ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনস্ট্রেশন' মিলে এই প্রতিষেধকের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছেন না। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য এই ভ্যাকসিনের কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষেধক ক্ষমতা নেই, বড়জোর বছর দশেক। তারপর আবার ভ্যাকসিন নিতে হতে পারে। ছোটবেলায় এ রোগ হলে প্রায় বিনা চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু সেই সময় প্রতিরোধ করে রেখে তারপর বেশি বয়সে সংক্রামিত হলে রোগীর পক্ষে একই রোগ বেশি বিপজ্জনক হতে পারে। তাছাড়া আরও সমস্যা আছে। ভ্যাকসিন যেহেতু চিকেন পক্সেরই ভাইরাস থেকে প্রস্তুত করা হচ্ছে, সেহেতু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবেও সামান্য চিকেন পক্সের মতো অসুস্থতা হওয়া সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে চিকেন পক্স কি এমনই অসহ্য রোগ যে বাচ্চাদের কোনও মতে হতে দেওয়া উচিত নয়? অ্যাটলান্টার সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন'কে বছর খানেকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে মার্ক কোম্পানির ভ্যাকসিনকে অনুমোদন করা যায় কিনা। তারপর ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনস্ট্রেশন মার্কেটিং-এর জন্য অনুমতি দেবে।

আমেরিকাতে চিকেন পক্সের কোনও ধরা বাঁধা সময় নেই। মে-জুন মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ঘরে ঘরেই হচ্ছে শোনা যায়। বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছনোর সময়ের মধ্যে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ ছেলে মেয়ের সংক্রমণ হয়ে যায়। কুড়ি বছর পর হয়ে যাবার পর আক্রান্ত হয় শতকরা ২.৫ জন। তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিশু আক্রান্ত হয় পাঁচ থেকে ছ বছর বয়সের মধ্যে। শতকরা ৬০ জন। রোগের গুরুত্ব বিচার করলে হাম বা পোলিওর তুলনায় এটি অনেক নিরীহ প্রকৃতির। হাম থেকে পরে নিউমোনিয়ার জটিলতা দেখা দেওয়া সম্ভব। পোলিও থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা তো খুবই বেশি। চিকেন পক্স দীর্ঘমেয়াদি রোগ নয়। সাধারণত কোনও শারীরিক ক্ষতি করে না। একবার হয়ে যাওয়া মানে সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ত। সচরাচর দ্বিতীয়বার হয় না। সেই হিসেবে এ রোগ ঠেকিয়ে রাখার জন্য 'জাতীয় ইমিউনিজেশন প্রোগ্রামের' এত খরচ করা দরকার কী?

হয়তো রোগের গুরুত্বের জন্যে যতটা নয়, ঝামেলার জন্যেই তাকে দূরে রাখার চেষ্টা চলছে। ছোটদের স্কুল কামাই, বাবা অথবা মার অফিস কামাই করে বাড়ি বসে থাকায় কাজকর্মের ক্ষতিও বিবেচনা করা হচ্ছে। ছোঁয়াচে রোগ বলে ছেলে-মেয়েকে বেবি সিটারের কাছে রেখে যাওয়া যাবে না। ডে কেয়ার সেন্টারে পাঠানো যাবে না। স্কুলেও যাওয়ার উপায় নেই। অথচ এর চেয়েও জটিল কিছু হলে তখন কী হবে? কত বার ছুটি নেওয়া যায়? তার চেয়ে ইনজেকশন ঠুকে দেওয়া ভাল। শুধু বাবা, মার বাড়িতে বসে থাকার জন্যেই নাকি মাইনে কাটা যায় বছরে কয়েক লক্ষ ডলার। বসন্তের গুনাগারে! অবশ্য সারা আমেরিকায় বাবা-মার ক্ষয় ক্ষতির হিসেব দিচ্ছি। আর এ রোগের গুরুত্ব নেই তাও নয়। যে শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব থাকে, তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। হাঁপানির জন্যে যাদের স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেতে হয়, তাদের চিকেন

পক্স হলে বিশেষ জটিলতা হতে পারে। প্রতি বছর এদেশে চিকেন পক্স সংক্রান্ত গুরুতর অসুস্থতার কারণে অন্তত শ'খানেক লোকের মৃত্যু হয়। অন্তসত্ত্বা মায়ের চিকেন পক্স হলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। জন্মগত শারীরিক ত্রুটির আশংকা থাকে। চিকেন পক্সের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হলে এই সব বিপদ এড়ানো যাবে। রোগটি না হলে অনেক ধরনের আনুষঙ্গিক অসুখও ঠেকানো যাবে।

বসন্ত বিদায় নিয়ে তর্কাতর্কি সমানেই চলেছে। ভ্যাকসিনেরও নানা ঝুঁকি আছে শোনা যাচ্ছে। একবার শরীরে ভাইরাস ফুঁড়ে দিলে সে নাকি চিরস্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসবে। হয়তো বেশি বয়সে সিঙ্গলস ধরনের চর্মরোগ হয়ে দেখা দেবে। সেও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। অজানা কোনও উপসর্গ শুরু হওয়াও বিচিত্র নয়। চিকেন পক্স ভ্যাকসিন যে উপাদান দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে 'ভ্যারিসেলা জসটার ভাইরাস' নামে জীবন্ত সেই উপাদান হয় হার্পিস ভাইরাসেরই সমগোত্র। এই ধরনের ভাইরাসগুলি একবার শরীরে জায়গা করে নিলে পাকাপাকিভাবে থেকে যায় আর দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করতে পারে। সাধারণত এই ধরনের ভাইরাসগুলি নার্ভের মধ্যে অথবা লিম্ফ্ টিস্যুতে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিন্তু হঠাৎই সক্রিয় হয়ে উঠে রোগের সূত্রপাত ঘটায়। হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস যদি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন বারবার ঠোঁটে জিভে নয়তো যৌন অঙ্গে হার্পিস দেখা দেয়। সেইরকম ভ্যারিসেলা ভাইরাস যদি নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে ওঠে, তখন শিঙ্গলস বা হার্পিস জসটার নামে ফোস্কার মতো কষ্টকর চর্মরোগ সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে, পরিণত বয়সে বা প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল এরকম মানুষের হয়তো একবার চিকেন পকস হয়েছিল। তাঁদের অনেক বছর পরে শিঙ্গলস হয়েছে। সব দিকেই বিপদ। তবে একটি কথা ঠিক যে চিকেন পক্স ছোট বয়সের সামান্য রোগভোগ ছাড়া কিছু নয়। তাকে দূর করতে গিয়ে এ দেশের নতুন প্রজন্মকে ভবিষ্যতে হার্পিস বা শিঙ্গলস এর মতো কষ্টকর উপসর্গের মধ্যে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে কি? অবশ্য সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন ওই ভ্যাকসিন থেকেই নাকি শিঙ্গলস বেমালুম ঘুমিয়ে পড়তে পারে। ভ্যাকসিন ভাইরাস নাকি সে ভাবেই বানানো হচ্ছে। বরং একবার ফুঁড়ে দিলে দশ বছর বাদে চিকেন পক্সই ফুটে উঠতে পারে। জাপানে একবার ফুঁড়লে শতকরা ৯৭ জন শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। বয়সন্ধিক্ষণের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের চিকেন পক্স হয় না। বেশি বয়সের লোকেদের অন্তত বার দুই ঠুকে দিতে হয়। তখন বছর কয়েক নিশ্চিন্ত।

এদিকে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও হিসেব নিকেশ চলছে। মার্ক কোম্পানি কত দাম চাইবে কে জানে? গবেষণার সময় নাকি এক ডোজ ভ্যাকসিন বানাতে ৩৫ ডলার পড়েছিল। যোগ বিয়োগ করে দেখা যাচ্ছে বসন্তের টিকে বাবদ প্রতি এক ডলার খরচ পিছু সমাজ লাভ করছে সাড়ে পাঁচ ডলার। এতে মা, বাবার কাটা যাওয়া মাইনে টাইনেও ধরা হয়েছে। বসন্তের গুনাগার বিচার করলে মস্ত লাভ। পরোক্ষ ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করে সময় থাকতে ফুঁড়ে দেওয়াই শ্রেয়। স্কুল কামাইও বেশিদিন হবে না।

তবে অন্যদিকে জাতীয় খরচ বেড়ে যেতে পারে। শৈশবে গোলাপ পাপড়িতে শিশির বিন্দু জমল না। বুড়ো বয়সে টিকের গুণ চলে গিয়ে সবাই চিকেন পক্সে যায় যায়। হাসপাতালের খরচ, ব্রেইন ইনফ্লেমেশন, নিউমোনিয়ার বাড়তি খরচ। যারা সেবা করতে

এল, তাদের কারও কারও মাইনে কাটা গেল। পুরনো টিকের তেজ মরে গিয়ে তারাও কেউ কেউ শয্যা নিল। একদল বুড়ো বুড়ি ফিউন্যারাল হোমে চলে গেল। টিকে কেলেংকারির একশেষ! আমার হাতে এখন চিন্তা করার মতো এক বছর মাত্র সময় আছে। ভাবছি টিকা লউন-এর আবেদন পেলে হাত বাড়িয়েই দেব। নয়তো ভ্যারিসেলা জসটার ইমিউন গ্লোবিউলিন ইনজেকশন আছে। তাতেও বসন্ত হতাশে ফিরে যাবে। টিকে, ইনজেকশন, ওষুধপত্রের নাম সব জেনে বসে আছি। তাদের সুফল, কুফলও জানা হয়ে গেছে। অল্প বিদ্যে ভয়ঙ্করী হলেও বসন্ত সমাগমে হয়তো একেবারে অপ্রস্তুত হতে হবে না। তবে প্রস্তুতিও যে কত রকমের হয়, উদাহরণ না দিয়ে লেখা শেষ করতে পারছি না। এক মহিলা দেশে যাবার আগে খবর পেলেন চারদিকে জোর চিকেন পকস হচ্ছে। তাঁর দুটি ছোট ছোট ছেলে। শুনেছেন এই বয়সে হয়ে গেলে ঝামেলা কম হবে। দেশে বেড়াতে যাবার পর হলেও মহা মুশকিল। তাই হুট করে দুই দামাল ছেলে নিয়ে এক বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। কারণ তাঁদের দুই ছেলে মেয়ের সর্বাঙ্গে গুটি বেরিয়েছে। জ্বরে ব্যাথায়, চিকেন পক্সের যন্ত্রণায় দুই ভাইবোন কষ্ট পাচ্ছে। বাবা মা ক্ষতিগ্রস্ত। তার মধ্যে ওই মহিলা ছেলেদের খাটের উপর ভিড়িয়ে দিয়েছেন। সমানে উৎসাহ দিচ্ছেন—'ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দে। ওদের পাশে শুয়ে পড়। দে, দে, কাঠিতে তুলো পাকিয়ে ওদের গা চুলকে দে না।' ছেলে দুটোর ঘোর অনিচ্ছে। খাট থেকে নেমে পড়তে চাইছে। অসুস্থ ভাইবোন দুটো এদের কাণ্ড কারখানা দেখে বিরক্ত। মহিলার বাড়িতে ফেরার নাম নেই। ছেলে দুটোর গায়ে ভাইরাস ঢুকিয়ে তবে বাড়ি ফিরলেন। হাতে এক মাসের বেশি সময় আছে। শিশিরবিন্দুর ছোঁয়া পেলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড নিলেও ছেলে দুটো ভুগে এবং সেরে উঠে স্বচ্ছন্দে ইন্ডিয়া রওনা হতে পারে। এমন অপূর্ব সংস্পর্শ কি হাতছাড়া করা যায়? প্রচণ্ড মাখামাখি করিয়ে তারপর ছেড়েছেন। রোগীর বাড়িতে সবাই অতিষ্ট। তাড়াতাড়ি বিদায় করার চেষ্টায় পিৎজা কিনে এনে এদের খাইয়েও সহজে রেহাই পায়নি। মহিলা নাকি পরে আবার হানা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ছেলে দুটো যেতে রাজি হয়নি।

তারপর কী হল বলুন তো? হ্যাঁ, ক্যালকুলেশন অনুযায়ী বসন্ত এল বটে। তবে আমেরিকায় নয়। কলকাতা পৌঁছনোর পরে। প্রচণ্ড গরম, লোড শেডিং। ক'দিন বাদে জগাই মাধাই ন্যাড়া হয়ে, কালীবর্ণ মূর্তি নিয়ে ফিরে এসেছিল। তাদের দেখার পর নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় করবে না?

৩১ জুলাই ১৯৯৩

রোগ প্রতিরোধে দূরদর্শন

যৌন রোগ এমন এক ব্যাধি, যা শুধু দেহকেই নয়, একই সময় রোগীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকেও সংক্রামিত করে। শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে থাকে উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার লজ্জা, ভয় আর যৌন রোগের কারণে এক ধরনের অপরাধবোধ। কোনও যৌন-রোগগ্রস্ত মানুষ প্রকাশ্যে তাঁর উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করেন না। অলিতে গলিতে 'গোপন রোগের চিকিৎসা-র বিজ্ঞাপন। যৌন-ব্যাধির সঙ্গে সামাজিক লজ্জার ব্যাপারটিকে সহজে অতিক্রম করা যায় না।

ওই রোগের গোপনীয়তা রক্ষার মধ্যে অপরাধ কিছু নেই, যদি সময়মত চিকিৎসা করিয়ে রোগটি সরিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু যখন দ্বিতীয় কর্তব্যটি অবহেলিত থাকে, অর্থাৎ রোগী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকেন এবং তাঁর সঙ্গীকেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেন না, তখন তাঁকে দায়িত্ব জ্ঞানহীন জীবন যাপনের ফলে, সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর দেহে ওই বিপজ্জনক রোগটি ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকায় যৌবনের অবাধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও যৌন-রোগ সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ বদলায়নি। মোটামুটি সেই একই মনোভাব—অসচ্চরিত্র লোকজনদের যৌন ব্যাধি হয়। একশো বছর আগে এদেশের অধিকাংশ হাসপাতালে সিফিলিস রোগীদের ভর্তি করা যেত না। সামাজিক বিচার অনুযায়ী রোগটি ছিল—ব্যাভিচারের শাস্তি। এ প্রসঙ্গে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক লিখেছিলেন—একশো বছর আগে আমেরিকায় যৌন-ব্যাধিকে 'পাপের শাস্তি' বলা হত। আজও সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সে যুগে শুধু বারবণিতাদের সংসর্গ থেকে সিফিলিস ছড়ানোর কারণে আমেরিকার রক্ষণশীল সমাজ পাপীদের দুর্গতি নিয়ে মাথা ঘামাত না...

কিন্তু যৌন রোগ তো কেবল পাপী পুরুষদের দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। অবধারিতভাবে তাদের পুণ্যবতী, সতী স্ত্রীদেরও আক্রমণ করল। ক্রমশ মার্কিন পরিবারগুলিতে সিফিলিস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে—এই দুশ্চিন্তায় স্বয়ং রাষ্ট্রই হাল ধরল। মার্কিন সরকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে বিজ্ঞানী স্বাস্থ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের যৌন-রোগ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রতিরোধের কাছে নিরোগ করল। এবং সিফিলিস, গনোরিয়ার মতো দুরারোগ্য ব্যাধিকেও অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে নিরাময় করা সম্ভব হল। এদেশে এমন আইনও পাস করা হল যে—বিয়ের আগে প্রত্যেক পুরুষকে ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়ে সার্টিফিকেট আনতে হবে। যৌন রোগ লুকিয়ে বিয়ে করার পথে বাধা পড়ল।

যে বিষয় নিয়ে লিখছি, সেখানে এমন কিছু তথ্য থাকবে, যা আপাত বিচারে প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠযোগ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি এখানে দূরদর্শনে যে বিজ্ঞাপন দেখছি, সে সব কমবয়সী ছেলে মেয়েদের উদ্দেশেই প্রচারিত হচ্ছে। যৌন-রোগ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করার জন্যই ক্লিনটন প্রশাসন এভাবে সরাসরি বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছে। আমার মনে হয়—যৌন রোগের সমস্যাকে এখন শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সংক্রমণ

বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। বয়ঃসন্ধির পরে ছেলে মেয়েদের মধ্যে যৌন চেতনার প্রভাব, যুগের এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তনকে যেমন আর রক্ষণশীলতার দোহাই দিয়ে অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না, সেই কারণেই এইডস ও অন্যান্য যৌন-সংক্রমণ বিষয়ে হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্যগুলি পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

প্রকাশ্যে যৌন রোগ নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে আমেরিকাতেও বহুদিন পর্যন্ত সামাজিক বাধা বেশ প্রবল ছিল। এই বিংশ শতকের প্রথম দিকেও অনেক পত্র-পত্রিকা 'সিফিলিস' আর 'গনোরিয়া' শব্দ দুটি ছাপার অযোগ্য বিবেচনায় প্রকাশ করত না। নিষিদ্ধ শব্দ নিয়ে একবার কী গণ্ডগোল বেধে গেল! এদেশের বিখ্যাত মহিলা পত্রিকা 'লেডিজ্ হোম জার্নাল'-এর জনপ্রিয়তা বরাবরই খুব বেশি এবং এখনও তা বজায় রয়েছে। কিন্তু ১৯০৬ সালে 'লেডিজ হোম জার্নাল' ভেনেরিয়াল ডিজিস্ সংক্ষেপে ভি ডি নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে পঁচাত্তর হাজার পাঠিকাকে হারিয়েছিল। যৌন-রোগ বিষয়ে ওই প্রবন্ধে নাকি বেশ কিছু নিষিদ্ধ শব্দের ব্যবহার হয়েছে—এই অভিযোগ জানিয়ে সেই বিপুল সংখ্যক পাঠিকা দীর্ঘদিন গ্রাহক মূল্য পাঠাননি। পরে অবশ্য উত্তেজনা থিতিয়ে গিয়েছিল।

১৯১২ সালে এক মহিলারও এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচারে খুবই সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রথম যুগের উদ্যোগী নারী বলা যেতে পারে। তো, তাঁর মনে হয়েছিল, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বার্তার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কাছে সিফিলিস্ আর গনোরিয়ার বিষয়েও কিছু সতর্কবাণী প্রচার করা উচিত। তিনি 'হোয়াট এভরি গার্ল শ্যুড নো' নাম দিয়ে যৌন-রোগ প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্যামফ্লেট ছাপিয়ে ফেললেন। তারপর গাঁটগচ্চা দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ডাকে পাঠাতে শুরু করলেন। কিন্তু সে সব আর মেয়েদের কাছে পৌঁছল না। মার্কিন পোস্ট অফিস অশ্লীলতার প্রচার রোধ করার জন্যে সমস্ত প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করে নিল। হরিদাসীর গুপ্তকথা চলে গেল ডাক বিভাগের খপ্পরে।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার পরে আমেরিকা সরকার আর লজ্জায় চুপ করে থাকতে পারল না। নিষিদ্ধ রোগ নিয়ে সোচ্চার না হলে সৈন্যসামন্তদের আক্কেল দেবে কে? তখন থেকে ভি ডি সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা শুরু হল। মিলিটারি ব্যারাকে উপদেশাবলী বিতরণ, প্যামফ্লেট দেওয়া, সৈন্যদের রক্ত পরীক্ষা—ইত্যাদি সবরকম ভাবেই ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা চলল। বিদেশের ছাউনিতে ছাউনিতে মার্কিন সরকারের আবেদন ছড়িয়ে পড়ল—'সৈনিকগণ ঘরে ফেরার দিন এলে সুস্থ সবল দেহ আর পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে স্ত্রী অথবা মানসীর কাছে যেও'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যারাকে ব্যারাকে পোস্টার ঝুলত—'ভি ডি-র চিকিৎসা আছে। কিন্তু অনুশোচনায় নিরাময় হয় না।' অর্থাৎ রোগ লুকালেই বিপদ। সময়ে ডাক্তার দেখালে অনুশোচনাপর্ব আসবে না।

যাই হোক, ক্রমশ 'ভেনেরিয়াল ডিজিজ' শব্দ দুটিও আর চালু থাকল না। গত চোদ্দো পনেরো বছর থেকে যৌন-ব্যাধির নতুন নামকরণ হয়েছে—সেক্সুয়্যালি ট্র্যান্সমিটিডে ডিজিজ। সংক্ষেপে এস টি ডি।

আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় বারো মিলিয়ন নারী, পুরুষ কোনও না কোনও ধরনের

যৌন-রোগে আক্রান্ত হন। এর মধ্যে এইডস রোগীদের সংখ্যাও ধরা হয়েছে। তবে এইডস-এর তুলনায় অন্যান্য যৌন রোগের সংক্রমণই যুবক যুবতীদের মধ্যে বেশি হচ্ছে। চিকিৎসকদের ভাষায়—'নন্ এইচ আই ভি সেক্সুয়্যাল্ ইনফেকশনস'-এর তালিকায় আছে সিফিলিস্, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, ট্রাইকোমনিয়াসিস্, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস হার্পিস্ এবং হেপাটাইটিস বি। সময়মত চিকিৎসা না করালে ওই প্রতিটি সংক্রমণই অন্যান্য জটিলতা থেকে জীবন বিপন্ন করতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সন্তান সম্ভাবনার অনিশ্চয়তা, সার্ভিক্যাল ক্যান্সার ছাড়াও অন্যান্য রোগ হওয়া সম্ভব। এদেশে যৌন রোগে আক্রান্ত রোগীদের তিনভাগের মধ্যে দু'ভাগই হচ্ছে কম বয়সী ছেলে মেয়ে। এদের বয়স সাধারণত পঁচিশ বছরের নীচে। সবচেয়ে উদ্বেগের কথা—গত পাঁচ বছরে সিফিলিস আর গনোরিয়ার সংক্রমণ খুব বেশি হয়েছে। যাদের এই দুটি রোগ হচ্ছে তাদের অধিকাংশ'রই বয়স কুড়ির নীচে। '৮৬ সাল থেকে '৯১ সালের হিসেব অনুযায়ী পনেরো থেকে উনিশ বছরের মেয়েদের মধ্যে সিফিলিসের সংক্রমণের হার তার আগের পাঁচ বছরের তুলনায় শতকরা একশো তিরিশ ভাগ বেশি হয়েছে।

আমেরিকায় প্রতি বছর সিফিলিসে আক্রান্ত হয় ১২০,০০০ সংখ্যক লোক। গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয় ১.১ মিলিয়ন মানুষ। ক্ল্যামাইডিয়ার সংক্রমণ হয় ৪ মিলিয়ন লোকের মধ্যে। ট্রাইকোমনিয়াসিস্ হয় ৩ মিলিয়ন লোকের। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস-এর যাট রকমের উপসর্গ আছে। যৌনাঙ্গে আঁচিল জাতীয় সংক্রমণও এর মধ্যে পড়ে। আমেরিকাতে প্রতিবছর অন্তত এক মিলিয়ন লোক আক্রান্ত হয়। উপস্থিত ২৪ থেকে ৪০ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ওই যাটরকম উপসর্গের কোনও একটি ধরা পড়েছে। জেনিটাল হার্পিস্-এর সংক্রমণ হয়েছে—এমন রোগীর সংখ্যা এখন ৩১ মিলিয়ন। 'হেপাটাইটিস বি ভাইরাস' বহন করছে ১.৫ মিলিয়ন লোক। এর প্রত্যেকটি দৈহিক সম্পর্কের দ্বারা সংক্রমিত হয়ে থাকে। এছাড়া এইডস-এর সংক্রমণ তো ক্রমশই বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছচ্ছে।

ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এবার সরাসরি দূরদর্শনের মাধ্যমে জনসাধারণকে সতর্ক করতে শুরু করেছে। ক্লিনটন প্রশাসন এ বিষয়ে আর কোনও আড়াল, আবডাল রাখার পক্ষপাতী নয়। প্রশাসনের উদ্দেশ্য হল—বহুল প্রচারের মাধ্যমে আমেরিকার যুবক যুবতীদের ভয়াবহ যৌন রোগ ও এইডস বিষয়ে সচেতন করা। প্রধান উপদেশ—১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছেলে মেয়েরা যেন শারীরিক সংসর্গ থেকে বিরত থাকে। কারণ এই দলই নাকি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়ে থাকে। অ্যাটলান্টার 'সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কনট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে—বিবাহিত হোক বা না হোক, ৮৬% পুরুষ আর ৭৬% মেয়েই কুড়ি বছরের কাছাকাছি পৌঁছে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করে। সুতরাং কম বয়সী লোকজনকে দুভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। হয় প্রথম উপদেশ মেনে চলো নয়তো সংক্রমণের প্রতিরোধের জন্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করো। যেহেতু শুকনো উপদেশ, আর এক-আধ লাইন ব্যঞ্জনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে ছেলে মেয়েদের ঠিকমত বোঝানো যাচ্ছে না, সেহেতু কিছু উত্তেজনাপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিতে হবে। শুধু কম বয়সীদের জন্যেই নয়, সর্বসাধারণের জন্যেও। সোপ অপেরাতে যেমন রোমান্টিক মুহূর্ত দেখানো হয়, সেরকমই নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। জনপ্রিয় রক-শিল্পী, দূরদর্শন

শিল্পীদের দিয়ে বিজ্ঞাপনে অভিনয় করাতে হবে। তবেই আকর্ষণ বাড়বে এবং লোকেরা স্বাস্থ্য দপ্তরের বক্তৃতা কানে নেবে।

'৯৪-এর জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু হয়ে গেছে। হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট ও সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমেরিকার চারটি ন্যাশন্যাল ব্রডকাস্ট টেলিভিশন নেট ওয়ার্ক তো বটেই, সঙ্গে বিভিন্ন কেব্‌ল্ টেলিভেশন আর রেডিও স্টেশনগুলিও এখন কন্ট্রোসেপটিভ ব্যবহারের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করছে। রেডিও, শোনার লোক এদেশেও আছে। গাড়িতে অহোরাত্র খবর শুনছে। ডাক্তারের অফিসে, হাসপাতালের রিসেপশন হলে, দোকানে, বাজারে সর্বক্ষণ রেডিও বাজছে। সুতরাং প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেতারের ভূমিকা মোটেই সামান্য নয়। তবে তারা রোমান্টিক দৃশ্যগুলি দেখাতে পারছে না। সরকার প্রদত্ত শ্রুতি নাটক টাইপের টেপ বাজিয়ে দিচ্ছে।

সরকারের এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস-এর সেক্রেটারি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নিন্দেও হয়েছে বেশ। ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ ক্যাথলিক বিশপস্-এর সেক্রেটারি তো রেগে লাল। তাঁরা সংযমের ওপর জোর দিতেই বলে আসছেন বরাবর। আর ওয়াশিংটন থেকে কী অসভ্যতা শেখাচ্ছে! তাছাড়া এইডস-এর প্রতিরোধের জন্য কন্ট্রোসেপটিভই শেষ কথা হল? বিশপের প্রত্যাশা—দূরদর্শন চ্যানেলগুলি কিছু প্রতিকার করবে। আমেরিকার ঘরে ঘরে এই বিভ্রান্তিকর এবং অনৈতিক খবর চালাচালি না করে তারা সোজা সরকারের মুখের ওপর না বলে দেবে।

রিপাবলিকান দলের কেউ কেউ বেশ বিরক্ত হয়েছেন। টেক্সাসের কংগ্রেস ম্যান তো রেগে বলেছেন—ওইসব বিজ্ঞাপন কাদের পয়সায় চলবে? ব্যক্তিগত বিচারে যে জিনিস দর্শনযোগ্য মনে হয় না, কেন তার জন্যে আমরা ট্যাক্স দেব?

এইডস রোগীদের সহমর্মী দল অ্যাক্ট আপও প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য—ক্লিনটনের নাচতে নাচতে চলে যাওয়া কনডোমগুলি কোনওদিন কারও জীবন বাঁচাবে না...কোনও কিছুই ভাল ভাবে শেখানোর দৃশ্য নেই...দর্শকদের নজর কাড়ার মত্তো তেমন মুহূর্তই নেই...।

রিপাবলিকান জমানাতেও 'এইডস প্রিভেনশনের' উদ্দেশ্য নিয়ে দূরদর্শনে একটু আধটু প্রচার চলত। তবে জন্ম নিয়ন্ত্রকের ব্যবহার সম্পর্কে আভাসে, ইঙ্গিতে যা বলা হত, নেহাত মনোযোগী দর্শক ছাড়া কাদের বোধগম্য হত কে জানে? যুবক যুবতীরা কান করত কিনা সন্দেহ! কিন্তু বর্তমানের ডেমোক্র্যাটিক সরকার শুধু ব্যঞ্জনায় বিশ্বাসী নয়। রীতিমত পরিকল্পনা আর অর্থ ব্যয় করে কেন্দ্রীয় সরকার ঢালাও ক্যাম্পেনের ব্যবস্থা করেছে। সঙ্গে গভর্নমেন্টের এজেন্সিগুলি, স্টেট এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা যোগ দিয়েছে। ক্যাম্পেনের নাম দেওয়া হয়েছে—সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনস নিউ এইচ আই ভি প্রিভেনশন ক্যাম্পেন। শুধু এইডস নয়, অন্যান্য যৌন রোগ সম্পর্কেও এই বিজ্ঞাপন সতর্ক করবে। তবে মূল লক্ষ্য জন্ম-নিয়ন্ত্রক ব্যবহারের সাহায্যে এইডস প্রতিরোধের প্রচার। সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর ডিরেক্টরের বক্তব্য—অতীতে কখনও এভাবে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, এখানে আমরা কী বিষয় নিয়ে প্রচার করছি। যখন আমাদের দেশের ছোট ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে

প্রশ্ন করবে—কেন আমরা এই ভয়ঙ্কর রোগকে ছড়িয়ে যেতে দিয়েছি, তখন কী উত্তর দেব?

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরাও মনে করছেন যে দেশে বছরে ১২ মিলিয়ন লোকের ওই ধরনের সংক্রমণ হয়, আর অধিকাংশ রোগীর বয়স থাকে ২৫ বছরের নীচে, সে দেশে বাস্তব সম্মত বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া উপায় কী?

বিজ্ঞাপন চালু হয়েছে গত ৪ জানুয়ারি থেকে। পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট হিসেবে মোটামুটি রাতের দিকে প্রাইম টাইমে প্রচারিত হওয়ার কথা। কিন্তু বড় বড় ন্যাশন্যাল নেট ওয়ার্ক কোম্পানিগুলি বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও, ঠিক কোন সময়ে টেপ বাজাবে, সে স্বাধীনতা নিজেদের হাতে রেখেছে। কারণ দর্শকদের যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটবে, এ সম্ভাবনার কথাও বিবেচনায় থাকা দরকার। এ জন্যে একেকটি চ্যানেল ইচ্ছেমত সময় নির্বাচন করছে।

মোট সাতটির মধ্যে একটি দুটি বিজ্ঞাপন ডবল ভার্সানে করা হয়েছে। স্প্যানিস ও ইংরেজি দুটি ভাষাতে তোলা এক বিজ্ঞাপনে ২৪ বছরের এক তরুণী অভিনয় করেছেন। তিনি নিজে গত ন বছর ধরে এইডস-এর ভাইরাস বহন করেছেন। 'এইডস'-এর কাউনসেলর। দুটি বিজ্ঞাপনের একটিতে তিনি বলছেন—এইডস প্রতিরোধের জন্য যুবক যুবতীরা যেন সব সময় জন্ম-নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে। আর অন্য বিজ্ঞাপনে বলছেন—এইডস-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে শারীরিক সংসর্গ থেকে দূরে থাকা।

'অ্যামেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন' ওই সাতটি বিজ্ঞাপনই দেখাবে। কিন্তু সঙ্গে কিছু বাড়তি নীতি কথা জুড়ে দেওয়া বিজ্ঞাপনই তাদের বেশি মনোমত হয়েছে। যেখানে আছে—সংযমই নিরাপত্তা, নেহাত যদি সংযম হারাতে হয়, তবে জন্ম নিয়ন্ত্রক তোমাকে রক্ষা করবে। এই ধরনের টেপ তারা রাত এগারোটার সময় বাজাবে। আর যে টেপে ওই মহিলা সবাইকে শারীরিক সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, সেটি অ্যামেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বাজাচ্ছে রাত ন'টার পরে। তাও আবার বুধ আর শুক্রবার ওই সময়ে চালাচ্ছে না। কারণ বুধবারে ওই সময় 'হোম্ ইনপ্রুভমেন্ট' নামে একটি পারিবারিক শো হয়। তাই সাড়ে ন'টার পরে বিজ্ঞাপন দেবে। আর শুক্রবার 'থিয়া' নামে ওই রকমই আর একটি সর্বজন দ্রষ্টব্য অনুষ্ঠান থাকে। সে কারণে ওই বিজ্ঞাপনকে রাত দশটার ওপরে চালান করে দেওয়া হয়েছে।

সি বি এস চ্যানেল থেকেও কিছু রক্ষণশীলতার খবর পাওয়া গেছে। যে দুটি বিজ্ঞাপনে কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে ওই মহিলার কথাবার্তা আছে। এ চ্যানেল তার কোনওটিই বাজাবে না। অন্য পাঁচটি বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার করবে। তবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে একেবারে তো অগ্রাহ্য করা যায় না। তাই প্রথম যে দুটি টেপ দূরদর্শনে দেখাতে চাইছে না, তার পরিবর্তে একটি টোল ফ্রি টেলিফোন নম্বর পর্দায় ছাপিয়ে দিচ্ছে। যারা জন্ম-নিয়ন্ত্রক ব্যবহার প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ পেতে ইচ্ছুক, তারা ওই নম্বরে বিনা খরচে ফোন করতে পারে। ইংরেজি অথবা স্প্যানিসে ছবিসহ প্যামফ্লেট পেয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে সি বি এস দর্শক হারানোর ভয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

কিন্তু এন বি সি আর ফক্স কর্পোরেশন সাতটি বিজ্ঞাপনই চালাতে আরম্ভ করেছে।

এছাড়া সি এন এন, ব্ল্যাক এন্টারটেনমেন্ট টেলিভিশন, হিসপ্যানিক কেব্‌ল নেট ওয়ার্ক ইত্যাদিও বিজ্ঞাপনগুলি প্রচার করার কথা বিবেচনা করছে। সরকারের খরচে একটি প্রাইভেট বিজ্ঞাপন কোম্পানি ওই টেপগুলি তৈরি করেছে। কী দেখানো হচ্ছে সেখানে, যার জন্যে বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় উঠেছে? ট্র্যাডিশন্যাল ভ্যালুজ কোয়ালিশনের রেভারেন্ড লু শেলডন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন—এই বিজ্ঞাপনগুলি লঘুমাত্রার পর্ণোগ্রাফির কাছাকাছি গেছে। কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের দৈহিক উত্তেজনার জোগান দেওয়া ছাড়া এগুলির দ্বারা আর কোনও কাজ হবে না।

ফ্যামিলি রিসার্চ কাউন্সিল-এর প্রতিনিধিরা বলেছেন—বিজ্ঞাপনগুলি রীতিমত উত্তেজনামূলক। কণ্ঠস্বরেও উপদেশের ভাব নেই...।

ওয়াশিংটনের ওই দুটি কনজারভেটিভ গ্রুপের সঙ্গে রিপাবলিকান সমর্থকরা সুর মিলিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য—এইডস প্রিভেনশন প্রোগ্রাম কীভাবে সাজাতে হয়, ক্লিনটনদের উচিত ছিল তা রিপাবলিকানদের কাছেই শেখা—কীভাবে রেগন, বুশ যুবক যুবতীদের নীতিবোধ জাগ্রত করে গেছেন। সেই দুটি প্রশাসনে এইডস প্রতিরোধের জন্যে শুধু শারীরিক শুদ্ধতার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হত। আর এখন অন্য পরামর্শ দেওয়া শুরু হয়েছে।

যাই হোক, এইডস প্রতিরোধমূলক বিজ্ঞাপনগুলিতে কী দেখানো হচ্ছে, তার যথাসম্ভব আভাস দিতে চেষ্টা করছি। যে বয়ঃসীমার ছেলে মেয়েদের জন্যে এই প্রচার, শুকনো উপদেশে তারা কর্ণপাত করবে না ভেবে, খোলাখুলি কিছু সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞাপনে দেখানো হচ্ছে—বন্ধ ঘরে দুটি ছেলে মেয়ে ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। আবছা অন্ধকারে মেয়েটির প্রশ্ন—তুমি কি সবদিক থেকে প্রস্তুত? ছেলেটির ইতস্তত উত্তর—না, ভুলে গেছি। মেয়েটির সারমন জারি—তবে আজ নয়। তখনই ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

এবার পেছনে মহিলা কণ্ঠে উপদেশ বাজতে থাকল—এর পরের বার, আর ভুলে যেও না। যখনই সান্নিধ্য কামনা করবে, তখনই এর প্রয়োজন হবে।

এবার পুরুষ কণ্ঠে ঘোষণা—যদি নিয়মিত সঠিকভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা যায়, তবে এইচ আই ভি সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে। ওই ভাইরাস থেকে 'এইডস' হয়...এই পদ্ধতিতে নিজের জীবন রক্ষা করো।

একেবারে হুবহু অনুবাদ করা সম্ভব হল না। সামান্য পরিবর্তিত রূপ বলতে পারেন। অন্য একটি বিজ্ঞাপনেও মোটামুটি ওইরকমই নিবিড় দৃশ্য দেখাচ্ছে। হঠাৎ খাটের কোণা থেকে জন্ম-নিয়ন্ত্রক উঁকি মারল। তারপর অদৃশ্য কণ্ঠের বক্তৃতা—কোনও কিছুই তো আর মন্ত্রবলে পাওয়া যায় না। তাই উপযুক্ত ব্যবস্থার পর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ। এইডস এর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ...।

বিজ্ঞাপনের নমুনা হিসেবে এই দুটিই যথেষ্ট। বাকি পাঁচটির মধ্যে সবগুলি দেখার সুযোগ পাইনি। অন্য যে দুটি দেখেছি, আড়ং ধোলাইয়ের ভয়ে সে আর অনুবাদের চেষ্টা করব না। প্রয়োজনও নেই।

যে প্রসঙ্গ দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে আসি। আমেরিকায় 'ন্যাশনাল এস টি ডি হটলাইন' নামে যে টেলিফোন নম্বর দেওয়া থাকে, সেখানে নিখরচায় ফোন করে ছেলে-মেয়েরা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জানাতে পারে। সম্প্রতি ওই হটলাইন থেকে

নানা ভাবেই রোগমুক্ত জীবন যাপনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের সতর্ক করা হচ্ছে। উপদেশগুলি এইরকম—প্রথমত দৈহিক সম্পর্ক থেকে দূরে থাকলে যৌন রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত যদি একটি মাত্র সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী, দু'জনের কারুরই কোনও সংক্রামক ব্যাধি না থাকে, ইনট্রাভেনাস ড্রাগ ব্যবহারের অভ্যাস না থাকে। তবেও যৌন ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু একদিক সঙ্গীর সংস্পর্শে আসার ফলে যে কোনও মুহূর্তে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। কারণ একাধিক লোকের ব্যক্তিগত জীবন বা অভ্যাস জানা সহজ নয়। তাদেরও অন্যান্য সঙ্গী সাথী থাকা সম্ভব, যাদের দেহে এইডস অথবা অন্যান্য রোগের সংক্রমণ হয়েছে। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে একটি মাত্র সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও যৌন-রোগের আক্রমণ হয়েছে। সে ক্ষেত্রে সেই সঙ্গীর অতীত জীবনের কোনও অভ্যাস এর কারণ হতে পারে। মেয়েদের বছরে অন্তত একবার স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে চেক আপের জন্যে যাওয়া দরকার। অবশ্য রুটিন 'প্যাপ স্মিয়র' টেস্ট থেকে শুধু হিউম্যান প্যাপিলোমা বাইরাস ছাড়া অন্য কোনও যৌন সংক্রমণ ধরা যায় না। তবে কোনও কারণে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্ক্রিনিং-এই ধরা পড়বে। আমেরিকান সোশ্যাল হেলথ অ্যাসোসিয়েশন থেকে স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞদের অফিসে নানা বিষয়ে পুস্তিকা পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য—চেক আপ করতে আসা মেয়েরা যেন সেগুলি বাড়িতে নিয়ে যাবার সুযোগ পান।

মেয়েদের হার্পিস জাতীয় রোগ সম্পর্কেও সতর্ক করা হচ্ছে। নিজের অথবা সঙ্গীর শরীরে কোনও বিশেষ ধরনের ক্ষত দেখলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার। ন্যাশনাল এস টি ডি হটলাইন থেকেও কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মেয়েরা যেন এ ব্যাপারে পুরুষ সঙ্গীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেন। এইডস অথবা অন্য কোনও যৌন-রোগের সংক্রমণকে মেয়েরা ডায়ফ্র্যাম্, জন্ম-নিরোধক বড়ি, ইন্ট্রা-ইউট্যারিন ডিভাইস অথবা কন্ট্রাসেপটিভ ইমপ্ল্যান্ট দিয়ে রোধ করতে পারেন না। সন্তান সম্ভাবনা রোধ আর সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় এক নয়। প্রথমটি সাময়িক এবং ইচ্ছাধীন অবস্থা। দ্বিতীয়টি আবশ্যিক, কেন না যৌন-রোগ তাঁর জীবন বিপন্ন করতে পারে।

এইডস প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যদি সরাসরি বিজ্ঞাপন মারফৎ কম বয়সী ছেলেমেয়েদের (যারা অনূর্ধ্ব পঁচিশ) সতর্ক করা যায়, বেপরোয়া জীবনযাপনের বিপজ্জনক ফলাফল সম্পর্কে ক্রমশ সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তবে রক্ষণশীল দলেরা যতই সমালোচনা করুন, হয়তো বর্তমান প্রশাসনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না। যখন দূরদর্শনের ওই বিজ্ঞাপনগুলি আমাদের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে কিছু অস্বস্তি সৃষ্টি করবে, তখন সেই সংখ্যাটির কথা মনে রাখতে চেষ্টা করব। এদেশে বছরে বারো মিলিয়ন নারী পুরুষ কোনও না কোনও যৌন রোগের শিকার হয়। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবু, নিয়ন্ত্রণ আর প্রভাব বিস্তারের মধ্যে কখনও কখনও দ্বিতীয়টির ওপর নির্ভরতা থাকলে কিছু কাজ সম্পন্ন করা যায়। মার্কিন সরকার বিজ্ঞাপন মারফৎ যুব সমাজের মধ্যে সেই প্রভাব বিস্তারের দায়িত্বই নিয়ে থাকবে।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

হয়রান চিকিৎসক

আমাদের ডাক্তার বন্ধুরা কোটের পকেটে 'বিপার' নিয়ে ঘোরেন। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের বাঁধাধরা সময় আর হাসপাতালের কাজের পরে যখন ছুটি নেন, বিশ্রামের অবকাশে কোথাও সামাজিকতা রক্ষা করতে যান, সাধারণত হাসপাতালে আর ডাক পড়ে না। কিন্তু 'অন কল' থাকলে বিপার যন্ত্রটি সর্বদা সজাগ থাকে। যে কোনও জায়গায় আড্ডা জমে ওঠার মুখে আচমকা পিঁ পিঁ শব্দে বিপার জানান দেয়—ডাক্তার তোমার ডাক পড়েছে।

হার্ট সার্জেন হিরণ্ময় হালদার কারও হৃদয় বিদারণের বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে বেশি দূরে বেড়াতে যান না। আগাম নেমন্তন্ন থাকলে বাতিল করে দেন। সার্জারির পরে রোগীর হাল বুঝে বড়জোর মাইল পঁচিশ রেডিয়াসের ভেতরে হয়তো একটা ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে গেলেন। কড়া ধাতের রোগী হলে ভাল। সে ডাঃ হালদারকে পার্টি থেকে রসমালাই পর্যন্ত খেয়ে ফেরার সময় দেবে। অসময়ে রসভঙ্গ করবে না। কিন্তু নরম পাকের রোগী হলেই মুশকিল। হাসপাতাল তখন শ্যামের বাঁশি বাজিয়ে ডাক পাঠাবে। আনিভার্সারি পার্টিতে মাঝপথে ইস্তফা। হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয় আধোখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়...'বিপার'-এর সংকেতের তাড়নায় তখনই হালদারকে হাসপাতালে ফোন করে খবর নিতে হবে। দরকার হলে গাড়ি নিয়ে ছুটতে হবে। কারণ 'অ্যানিভার্সারি'র মতো হৃদয় বিনিময়ের স্মরণ সভার চেয়ে হার্ট সার্জারির মতো হৃদয় বিদারক ঘটনার দাবি অগ্রগণ্য। রোগীর বাড়ির লোকজন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুখিয়ে আছে না?

এইসব এমার্জেন্সি হলে হিরণ্ময় হালদারের পার্টিতে গিয়ে শ্যাম্পেন টেস্ট করা হবে না। কে কোনকালে কাকে হৃদয় ও মাল্যদান করেছিল। অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে তার উচ্ছ্বসিত ফিরিস্তি শোনা হবে না। ডান্স ফ্লোর, রসমালাই আর কেক পড়ে থাকবে। হার্ট সার্জেন হিরণ্ময় হালদার হু হু করে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে হনহনিয়ে ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিটে হাজির হবেন। তারপরেই যুদ্ধ শুরু। রোগীর হৃদয় নিয়ে জঙ্গ বাহাদুরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা। হিরণ্ময় হালদারের কানে কানে যেন আচ্ছন্ন রোগীর প্রচ্ছন্ন অনুযোগ...আপনারই হাতে দিল দিয়া আউর দর্দ লিয়া!

ওই অবস্থায় সার্জন হালদারের হাল ছাড়লে চলবে? সুমহান ব্রত নিয়েছিলেন না? অন্যের জীবনের জন্যে নিজের তুচ্ছ জীবনকে উৎসর্গ করার নামই তো ডাক্তারি। তারই ডাকে সাড়া দেওয়া। সেই নিবেদিত জীবনের বিপুল ব্যস্ততার মাঝে ছুটির বাঁশি যদি বা বাজে, হাসপাতালের 'বিপারে'র ডাক আবার কাজের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

উদয়াস্ত কাজের চাপে অধিকাংশ ডাক্তারের ব্যক্তিগত সময় বলে কিছু নেই। অবশ্য জনসেবার সঙ্গে উপার্জনের অতিরিক্ত তাগিদ থেকেই এরকম কর্মযোগ চলেছে। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে পেশাগত টেনশন থেকে অনেকেই খুব ক্লান্তি বোধ করছেন। 'ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র হেলথ সার্ভিস বিভাগের এক ডাক্তার আছেন। নাম ডঃ মায়ার্স। তিনি মনে করছেন, এখন তাঁর পেশা বদল করতে পারলেই ভাল হয়। অথচ ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়বেন। ভাল ছাত্র ছিলেন। ডাক্তার

হিসেবে পশারও যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই ডঃ মায়ার্স ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। চিন্তা করছেন মেডিকেল প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে হেলথ ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নেবেন কিনা। কারণ অতিরিক্ত কাজের চাপ আর সহ্য হচ্ছে না। আমেরিকার অধিকাংশ ডাক্তারের মতোই তাঁকেও প্রতি মুহূর্তে যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিতে হয়। এমার্জেন্সি ছাড়াও তাকে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর একজন রোগী দেখতে হয়। এই চাপ তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে এমন পরিশ্রান্ত করে তুলেছে যে, তিনি পেশা বদল করা ছাড়া উপায় নেই বলে ভাবছেন।

অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকায়ও ডাক্তারদের ভীষণ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই সাফল্য অর্জন করতে হয়। ছাত্র জীবনে ইনটার্নশিপ, রেসিডেন্সি আর কঠিন কঠিন 'বোর্ড একজ্যাম' পাস করার পরিশ্রম গেছে। পেশাগত জীবনে হাসপাতালের বিভাগীয় দায়িত্ব, মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার কাজ আর নিজস্ব প্র্যাকটিস ইত্যাদির মাপকাঠিতেই তাঁর সাফল্যের পরিমাপ হয়। এদেশে রোগীরা নিজেদের অধিকারবোধ সম্পর্কে এতই সচেতন এবং সক্রিয় যে, প্রতি পদে যাচিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি থাকবেই এবং চিকিৎসা সম্পর্কে সন্দেহ হওয়া মাত্র মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। এ জন্যে ডাক্তারদের ম্যাল প্র্যাকটিস ইনসিওরেন্স করতে হয়। বছরে মোটা রকম প্রিমিয়াম দিতে হয়। নয়তো রোগী মামলায় জিতে ক্ষতিপূরণ চাইলে অতি বড় ডাক্তারকেও খেসারত দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হবে। তার ওপর জেল হাজতের ভয়। টেনশনের উপাদানের কোনও অভাব নেই।

যাই হোক, কাজের চাপ থেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই বলেন—আমাদের এই জীবিকার যে মানসিক সন্তুষ্টি এবং বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের চ্যালেঞ্জ থাকে, তার জন্যেই লোকে ডাক্তারি পড়ে। অথচ ইদানীং কাজের বোঝা ভারী হতে হতে যেন দুর্বহ হয়ে উঠছে। সেই সন্তুষ্টি বা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আনন্দ, আগ্রহ—দীর্ঘদিন বজায় থাকছে না। বস্টনে 'বেথ ইজরায়েল হসপিট্যাল' থেকে এ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। জানা গেছে—ওই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন বলেছেন—আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু করতে বলা হলে আমরা মোটেই আর ডাক্তারি পড়ব না।

এদেশে 'ইউনাম লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি অফ আমেরিকা' প্রধানত ডাক্তারদের জন্যে লাইফ ইনসিওরেন্স বিক্রি করে। ওই কোম্পানি জানিয়েছে—গত বছরে প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ডাক্তারদের 'ডিস্‌এবিলিটি ক্লেইম' শতকরা ষাট ভাগ বেশি হয়েছে। ডলারের হিসেব অনুযায়ী ওই অঙ্ক হচ্ছে ১.৩৮ মিলিয়ন। অর্থাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে চিকিৎসকরা নির্ধারিত সময়ের আগে অবসর নিতে চাইছেন। ওই বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ডিসএবিলিটি বেনিফিট হিসেবে মোটা রকম অর্থ সংগ্রহ করছেন। ডাক্তাররা নিজেদের শারীরিক সমস্যা হিসেবে যে ধরনের উপসর্গের উল্লেখ করেছেন, বিমা কোম্পানির বিচারে সেগুলির মোটেই গুরুত্ব নেই। ডাক্তাররা নিজের পেশার ব্যাপারে আগ্রহী থাকলে ওই সব ছোটখাটো উপসর্গ কোনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না—এ কথাই বিমা কোম্পানি জানিয়েছে। অর্থাৎ 'ডিসএবল পার্সন' বলে নিজেদের চিহ্নিত করার প্রধান কারণ হল—আগে আগে অবসর নেওয়া। যাতে পরিশ্রম ছাড়াই মাসে মাসে মোটা

মাসোহারা পাওয়া যায়। অবশ্য সব ডাক্তারই যে এভাবে ছুটি নিতে চাইছেন, তা নয়। তাঁদের অসুস্থতা না হোক, এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা নিশ্চয়ই দেখা দিচ্ছে, যে কারণে তাঁরা এই পরিশ্রম ও মনোযোগ সাপেক্ষ পেশা বজায় রাখতে চাইছেন না। এছাড়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিশক্তি, কর্মক্ষমতা কমে আসে—এই পরিস্থিতিতে ডাক্তাররা, বিশেষত সার্জেনরা সময়মতো অবসর নেওয়াই সঙ্গত মনে করেন।

• আমেরিকায় স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কথাটি সব সময় শোনা যায়। জীবিকা সংক্রান্ত টেনশন কীভাবে দূর করা যায়, সেই নিয়ে নানা গবেষণা চলেছে। ঘন ঘন সেমিনার বসছে। ইদানীং ডাক্তারদের স্ট্রেস দূর করার জন্যেও বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সাহায্য করা হচ্ছে। বস্টনের বেথ ইজরায়েল হসপিটালে এ জন্যে যে কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে, তার নাম সেন্টার ফর ফিজিশিয়ান ডেভেলপমেন্ট। '৯২ সালে ওই কেন্দ্রটি খোলার পর থেকে এ পর্যন্ত সেখানে সত্তর জন পরিশ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হয়েছে। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকেই কেসগুলি পাঠানো হয়েছিল।

ওই সেন্টারের প্রধান কর্ত্রী হলেন একজন মহিলা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তাঁর নাম গিগি হার্শ। মনোরোগের চিকিৎসক হিসেবেও বটে, আবার একই পেশায় নিযুক্ত থাকার কারণেও শ্রীমতী গিগি হার্শ ডাক্তারদের বিশেষ চোখে দেখেন। প্রত্যেকটি কেস খুব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করেন। তিনি একদল ডাক্তারের ডাক্তার। তাঁর কাজ হচ্ছে রোগী কাম ডাক্তারদের মনের ভার লাঘব করা। তাঁদের পুনরুজ্জীবিত করা। ডাঃ গিগি রোগীদের মনের পুনরুজ্জীবিত করা। ডাঃ গিগি রোগীদের মনের মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখতে চেষ্টা করেন, কী কারণে তাঁরা কাজের চাপ সহ্য করতে পারছেন না। কীভাবে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করলে তাঁরা স্বস্তি পাবেন, জীবিকাকে দুর্বহ বোঝা বলে মনে করবেন না। তিনি জানতে চান—একজন ডাক্তার কি তাঁর কাজের রুটিন বদলাতে চাইছেন? এতদিন যে রোগের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তার পরিবর্তে অন্য কোনও রোগ নিয়ে নতুন করে পড়াশোনা করতে চাইছেন। যাকে বলে ফিল্ড বদল করা, সেইরকম কিছু ভাবছেন? নাকি হসপিটাল অ্যাডমিনস্ট্রেশনের কাজ তাঁর অসহ্য লাগছে। তিনি অধ্যাপনার কাজে ফিরে যেতে চাইছেন? অথবা প্রাইভেট প্র্যাকটিসই শুধু করতে চান। হসপিটালের প্রশাসনে থাকতে চান না? নাকি স্কুল অফ মেডিসিনে পড়াতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির চাপে পদোন্নতি হচ্ছে না বলেই মনোকষ্টে আছেন?

এইসব খবর জানার জন্যে ডাঃ গিগি হার্শ রোগীদের বস্টনের সেন্টারে ডেকে পাঠান। সেখানে তাঁর নিজস্ব একটি টিম আছে। সেই টিমে ম্যারেজ কাউনসেলর থেকে শুরু করে, এম. বি. এ. ডিগ্রি নেওয়া বিজনেস বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, সমাজবিজ্ঞানী—সবাই আছেন। তাঁরা বেশ কয়েকদিন ধরে রোগীর সঙ্গে 'সেশনে' বসেন। মজা হচ্ছে, এঁরা নিজেরাও কিন্তু ভুক্তভোগী। অনেকেই নিজস্ব পেশায় একঘেয়েমি আর ক্লান্তি আসতে ফিল্ড বদল করেছেন।

ওই সেন্টারের উদ্দেশ্য পরিশ্রান্ত ডাক্তারদের মানসিক ক্লান্তি থেকে রক্ষা করা। তাঁরা যেন অনুভূতির এমন এক পর্যায়ে না গিয়ে পৌঁছন, যা তাঁদের এবং তাঁদের চিকিৎসাধীন রোগীদের ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও খিটখিটে নিরুৎসাহী চিকিৎসকের

দ্বারা কোনও রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত নয়। আগে তাঁকে ধাতস্থ হতে হবে। তারপর তিনি অন্যের ধাত বুঝতে যাবেন। ওই সেন্টারের কর্মসূচির মধ্যে আছে—এমপ্লয়ি অ্যাসিসট্যান্স প্ল্যান ফর ফিজিশিয়ানস। সারা আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতাল, নানা হেলথ অর্গানাইজেশন, রিসার্চ সেন্টার ছাড়াও এইচ. এম. ও নামে নির্দিষ্ট হেলথ ইনসিওরেন্স প্ল্যানের জন্যেও ডাক্তারের দরকার। এইসব যোগাযোগ ঘটানোর কাজে বস্টনের ওই সেন্টার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। বৃহত্তর চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সেন্টারের যোগসূত্রের ফলে ওই ডাক্তারদের পছন্দমত কাজের জায়গার সন্ধান দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে। সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য—নানাভাবে ডাক্তারদের মানসিক ভার মুক্ত করতে সাহায্য করা।

বেথ ইজরায়েল হসপিটালের ওই সেন্টার সম্পর্কে অন্যান্য ডাক্তাররাও সন্তোষজনক মন্তব্য করেছেন। তাঁরা কেউ কেউ বলেছেন—চিরকাল শুনছি ডাক্তাররা শুধু গাদা গাদা ভিজিট নেয়। দেশগুদ্ধ লোকের কী আনন্দ। কেন? না, এবার ক্লিনটনের আমলে ডাক্তারদের রোজগার কমে যাবে। ওরা জব্দ হবে। অথচ, আমাদের সুখ, দুঃখ নিয়ে কেউ ভেবেছে কোনওদিন? কী প্রচণ্ড চাপের মধ্যে প্রফেশনে টিকে থাকি জানে কেউ? বেথ ইজরায়েলের ওই সেন্টার ডাক্তারদের মনের কথা ভেবেছে...।

আমেরিকার ডাক্তারদের অপর্যাপ্ত উপার্জন নিয়ে অন্যান্য প্রফেশন্যাল লোকেদের যে কিঞ্চিৎ মনোকষ্ট থাকে—এ কথা মিথ্যে নয়। তাই ডাক্তারদের মানসিক অবসাদ, অত্যধিক পরিশ্রম ইত্যাদির কথা শুনলেও তাঁরা তেমন কান দেন না। তাঁরা বলেন—ডাক্তাররাই আমেরিকায় সবচেয়ে সুখ ভোগ করে চলেছেন। যেমন অফুরন্ত রোজগার, কেমনই নিরঙ্কুশ কাজের স্বাধীনতা।

এই কারণে এখনও আমেরিকায় প্রতিটি মেডিকেল কলেজে বছরে বছরে আবেদনপ্রার্থীর সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেশে ডাক্তারদের বার্ষিক আয় (গড় হিসেবে) ১৯০ হাজার ডলার থেকে ৩০০ হাজার ডলার। সম্প্রতি এই হার ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। সুতরাং উপার্জন নিয়ে তাঁদের অসন্তোষের প্রশ্ন নেই। আর চাকরি কিংবা ব্যবসা সংক্রান্ত যে স্ট্রেসের কথা তাঁর বলছেন, কিংবা হাসপাতালের প্রশাসনিক রাজনীতির কথা, সে আর কোন প্রফেশনে নেই? কাজের জগতে অধিকাংশ মানুষই এই ধরনের স্ট্রেস সহ্য করছেন। শুধু ডাক্তারদের ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটবে—এমন আশা করা চলে না।

একজন সফল চিকিৎসকের সারা জীবনের পরিশ্রম আর কর্ম সংক্রান্ত মানসিক চাপের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়—এই পেশায় নিয়োজিত থাকা মানেই অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা। হাই স্ট্রেস লাইফ বলতে যা বোঝায় তাই। এ জন্যে তাঁদের বিবাহিত জীবনেও বহুক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। বরাবরই বেশি। কাজপাগল স্বামীর প্রচুর উপার্জন নিয়েই সব স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। নিঃসঙ্গতার কারণে ডিভোর্স নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম ব্যস্ত পুরুষ মানুষকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। ডাক্তারদের কাজ সর্বস্ব জীবন থেকে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, তা কিন্তু নতুন কিছু নয়। চিরকালই তাঁরা এরকম প্রফেশনাল জীবন কাটিয়ে চলেছেন। তবে, সম্প্রতি তাঁদের যে বাড়তি টেনশন শুরু হয়েছে, তার কারণ কাজের পরিবেশ বদলে যাচ্ছে। ঈশ্বরের পরেই ডাক্তার, তিনি যা করবেন, তাইই যথার্থ চিকিৎসা বলে মেনে নিতে হবে—এই জাতীয় ভয় ভক্তির বদলে রোগী এখন ক্রেতা হয়েছেন।

ডাক্তার তাঁকে চিকিৎসা বিক্রি করছেন। ভূষিমাল গছালেই গোলমাল। অবশ্য মেডিকেল ডিগ্রি আর বোর্ড সার্টিফিকেশনের মতো মেধা ও শ্রমসাপেক্ষ দীর্ঘ পড়াশোনার শেষে, অভিজ্ঞতার রসদ নিয়ে ডাক্তাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য 'বিক্রেতা' হয়ে ওঠেন। তবু তাঁদের কাজের ধারা আর আগের মতো রুটিন বাঁধা নেই। রোগী দেখার পাশাপাশি পেপার ওয়ার্কের বিশাল বোঝা কাঁধে চেপেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণা ও সর্বাধুনিক ওষুধপত্রের প্রয়োগ বিষয়ে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকতে হচ্ছে। সেমিনার, কনফারেন্স—ঘোরাঘুরির বিরাম নেই।

যেসব সাইকোলজিস্ট কাউনসেলিং করেন, তাঁরা জানিয়েছেন—ইদানীং ডাক্তারদের কাছে সমাজের প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। সর্বস্তরেই সেই প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টায় তাঁদের কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। নর্থ ক্যারোলাইনা রাজ্যে ডুরহ্যাম শহরে ওই বেথ ইজরায়েল হসপিটালের সেন্টারের মতোই গড়ে উঠেছে সেন্টার ফর প্রফেশন্যাল ওয়েল বিইং। সেখানে বছরে দুশো জন ডাক্তার কাউনসেলিং করাতে যান। ওয়ার্কশপ, আলোচনাচক্রের মাধ্যমে তাঁদের অত্যধিক মানসিক চাপ দূর করার চেষ্টা হয়। কাউনসেলররা বলেন—যে কোনও প্রফেশনেই ছুটি নেওয়া বিশেষ দরকার। যে ডাক্তার বলেন, আমার বেড়াতে যাওয়ার সময় নেই। অসম্ভব কাজের চাপ, তাঁকেও নিয়মিত ছোট ছোট বিরতি দিতে হবে। নয়তো স্ট্রেস থেকে রেহাই নেই। তিনি প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মাঝেও একদিন/দু'দিন ছুটি নিয়ে পাহাড়ে স্কি করতে যেতে পারেন। সেখানে বরফের ঢালে ভেসে গিয়ে, গড়াগড়ি দিয়ে প্রভূত এনার্জি নিয়ে ফিরবেন। নবোদ্যমে নব নব রোগীর নাড়ি টিপবেন। ডাক্তার চাঙ্গা, রোগীও চাঙ্গা।

ক্যানসাস রাজ্যে টোপেকা শহরেও এরকমই একটি সেন্টার খোলা হয়েছে। নাম দ্য মেনিংগার ক্লিনিক। সেখানে প্রফেশনস ইন ক্রাইসিস প্রোগ্রামে নানা পেশাদারি মানুষ ছাড়াও বছরে অন্তত একশো জন ডাক্তার চিকিৎসা করাতে আসেন। ওই সেন্টারের ক্লিনিক্যাল রিসোর্সেস ডিরেক্টর জানিয়েছেন—গত দশ বছরে কাউনসেলিং-এর সাহায্য নিতে এসেছেন, এমন ডাক্তারের সংখ্যা শতকরা চল্লিশভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া আছে ম্যানেজ্‌ড-কেয়ার প্ল্যানস নামে ডাক্তারদের নিজস্ব যৌথ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে পার্মানেন্ট মেডিকেল গ্রুপ ফেসিলিটিস এ ভাবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ডাক্তারদের জন্যে কাউনসেলিং ও সাপোর্ট প্রোগ্রাম চালু রেখেছে। সেখানকার প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি হল—ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ডাক্তারদের শরীর স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

লেখার শুরুতে যে বেথ ইজরায়েল হসপিটালের প্রোগ্রামের কথা উল্লেখ করেছি, এবার তার উদ্‌ভাবনা প্রসঙ্গে জানাই—গিগি হার্শ নামে ৩৯ বছর বয়সী ওই ডাক্তার মহিলাই প্রথম এ কাজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, এরকম কাউনসেলিং-এর প্রয়োজন আছে। কম বয়সে এমার্জেন্সি রুমের অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান হিসেবে গিগি কর্মসমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছেন। লাগাতার পরিশ্রম আর দায়িত্বের চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় টিকে থেকেছেন, যে জন্যে তাঁর পারিবারিক জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে সময় টেনশন রিলিজ করার মতো কোনও সেন্টার ছিল না।

তখন থেকেই ডাঃ গিগি হার্শ ভেবেছিলেন, ভবিষ্যতে পরিশ্রান্ত ডাক্তারদের কাউনসেলিং-এর জন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর সেই ইচ্ছেকে কাজে পরিণত করেছেন। কাউনসেলিং সেন্টার থেকে ডাক্তারদের নানা পরামর্শ দেওয়া হয়। সচরাচর তাঁদের জীবিকা বদল করার প্রশ্ন আসে না। তবে যে ডাক্তার ক্রমশই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, হতাশা এবং বিষাদ থেকে কাজে আগ্রহ হারিয়েছেন, তাঁকে জনকল্যাণের স্বার্থেই সাময়িক বিশ্রাম নিতে বলা হয়। তাঁর ক্ষেত্রে পেশা পরিবর্তনের পরামর্শও দেওয়া হয়। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ফিল্ড বদল করার পরিবর্তে, কর্মক্ষেত্রে রুটিনের কিছু পরিবর্তন, ব্যায়াম, পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত সময়, হবি তৈরি করা। বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যাঁরা কাউনসেলিং-এর সাহায্য নিতে যান, সেইসব ডাক্তাররা বলেন—পেশা বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই কঠিন। এতদিনের কেরিয়ার, সুনাম, সাফল্য, প্রাচুর্য, এক কথায় ছেড়ে যাওয়া যায় না। আমাদের হয়েছে দু'দিকেই সমস্যা। পশার ছাড়তে চাই না, রোগীদের ফেলে রেখে বিশ্রাম নিতে পারি না, অথচ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত থাকি। কাজে আগ্রহ থাকে না। এই অবস্থায় জোর করে কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর। আবার যদি কাজের সময় কমিয়ে দিই, রোগীর সংখ্যা কমে যায়। তখন আমাদের ব্যবসায় ক্ষতি হবে। ব্যস্ত ডাক্তার না হলে লোক তার ওপর ভরসা করে না। সব সময় যে পারিবারিক সহযোগিতা পাই, তাও নয়। স্ত্রী বলেন, তাঁর স্বার্থত্যাগের জন্যেই আমি আজ নাম, যশ, অর্থ পেয়েছি। অনুযোগ অস্বীকার করা যায় না। ছেলে-মেয়েরা বলে তারা আমার সাহচর্য পায়নি, তাদের স্কুল, কলেজের বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারিনি। এ সবই আমার অত্যধিক কর্মব্যস্ততার ফল। আমার জীবিকা অর্থকরী হলেও, পারিবারিক ক্ষেত্রে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। ইচ্ছে থাকলেও ঠিকমত রিল্যাক্স করতে পারি না। কাজ যেন তাড়া করে বেড়ায়।

বেথ ইজরায়েল হসপিটালের প্রোগ্রামে ভর্তি হতে গেলে সেশন পিছু তিন থেকে চার হাজার ডলার খরচ পড়ে। কনসালটেনশনের সেশনগুলির সময়ের মেয়াদ হচ্ছে চার দিনের। এছাড়া টেলিফোন মারফৎ প্রারম্ভিক আলাপ আলোচনা আর সেশনের পরে কিছুদিন ফলো-আপ জাতীয় কথাবার্তা চলে।

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির হেলথ সার্ভিসের জন্যে যুক্ত ডঃ মায়ার্স হচ্ছেন ইন্টারন্যাল মেডিসিনের ডাক্তার। ওই সেন্টারে কাউনসেলিং-এর সাহায্য নেওয়ার জন্যে যেতে চান। কিন্তু পেশা পরিবর্তন করার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছেন না। বহু বছরের শিক্ষা ও পরিশ্রম থেকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। রাতারাতি ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে নতুন কোনও কাজ শুরু করা আদৌ সম্ভব কিনা জানেন না। খুবই দ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন।

সাইকোথেরাপির সাহায্যে ডাক্তারদের মানসিক চাপ মুক্তির প্রচেষ্টা এ দেশে নতুন নয়। বিশেষ করে সাইকিয়াট্রিস্টদের মধ্যে ডিপ্রেশান, আত্মহত্যার প্রবণতা, অ্যালকোহল আসক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি হয় বলে জানা গেছে। সেই হিসেবে ট্র্যাডিশনাল থেরাপি বহুদিন থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছে। ইদানীং বস্টন, ডুরহ্যাম, টোপেকা ও নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়াও আমেরিকার নানা শহরে পরিশ্রান্ত, কর্মক্লান্ত চিকিৎসকদের কাজের চাপ ও মনের

ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে ফিজিশিয়ানস থেরাপি সেন্টার খোলা হয়েছে। হয়রান ডাক্তাররা রণে ভঙ্গ দিলে রোগীর হয়ে লড়াই করবে কে? জঙ্গ বাহাদুরদের ঢাল তরোয়ালে জং ধরার আগেই থেরাপির তার্পিন তেল ঢালতে হবে।

১৮ মার্চ ১৯৯৫

নেশা বনাম পেশা

জিম জেনসেন নিউ ইয়র্ক থেকে দূরদর্শনে খবর বলেন। গত কুড়ি বছর ধরে নিয়মিত স্থানীয় সংবাদ পরিবেশন করে আসছেন। দীর্ঘদিনের পরিচিত হাসিমুখ। কিন্তু যখন হঠাৎ কয়েকদিন জনপ্রিয় এই ঘোষককে অনুপস্থিত দেখি, ধরে নিই জিম আবার বোধ হয় "রি-হ্যাব্ সেন্টারে" ভর্তি হয়েছেন। এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটেছে। জিম জেনসেন অ্যালকোহল আসক্তি থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেশ কয়েকবছর আগে তাঁর ছেলে মারা গেছে। সেই থেকে ডিপ্রেশনের সূত্রপাত। ক্রমশ বিষাদ থেকে অতিরিক্ত মদ্যপান, নেশার কারণে চূড়ান্ত অবসাদ, আত্মহত্যার চেষ্টা—জিম জনসেন এই চক্রের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। প্রৌঢ় এই মানুষটি বছর দেড়েক আগে হাডসন নদীর ওপর ট্যাপান সি ব্রিজ থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন। নেশা আর ডিপ্রেশনের ফলে তাঁর পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত। কর্মজীবনেও ছেদ পড়ার সূচনা হয়েছিল। শুধু দূরদর্শন কোম্পানির হস্তক্ষেপের জন্যে জিম চাকরি বজায় রাখতে পেরেছেন।

এ তো হল শুধু একজন লোকের অতিরিক্ত মদ্যপানের আসক্তির কথা। আমেরিকায় এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা কর্মজীবনের চাপ থেকে মুক্ত থাকার আশায় মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পেশার ক্ষতি করছেন। এদেশে যাঁদের করপোরেট চিফ বলা হয়, তাঁদের মধ্যেই কিছু সংখ্যক মানুষ ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের নেশার জন্যে চিকিৎসার সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছেন। গোপনীয়তা রক্ষার দায় বলেও কোম্পানির সেরকম কিছু নেই। যা ঘটছে, বহুক্ষেত্রে তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বভাবের সংশোধন হলে ভাল। নয়তো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেখে করপোরেট চিফকেও বিদায় দেওয়া হবে। করপোরেট বোর্ড মেম্বাররা মনে করেন—শেয়ার হোল্ডারদের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করার দায়িত্ব থাকে। কোম্পানির কোনও চিফ একজিকিউটিভ অফিসার ড্রাগ কিংবা অ্যালকোহল ব্যবহার করে যদি নিজের কাজের ক্ষমতা নষ্ট করেন, তবে কোম্পানির স্বার্থে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। এই সমস্যাকে আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। বহুদিন পর্যন্ত বিভিন্ন কোম্পানির বোর্ড মেম্বাররা জেনে শুনেও উচ্চপদস্থ কর্মীদের ব্যক্তিগত অভ্যাস নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু ক্রমশ সে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্কের সেন্টার অন অ্যাডিকশন অ্যান্ড সাবসট্যান্স অ্যাবিউজ-এর প্রধান জোসেফ ক্যালিফ্যানো বলেছেন—নেশাগ্রস্ত লোকেদের রোগগ্রস্ত বলে মনে করলেই আর গোপনীয়তার প্রশ্ন ওঠে না। বর্তমানের সামাজিক

দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, মাদক দ্রব্যে আসক্তি হচ্ছে গুরুতর এক অসুখ।

মোট কথা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ এ বিষয়ে বেশ সোচ্চার হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। গত অক্টোবর মাসের কথা। ইউনিয়ন প্যাসিফিক করপোরেশন ঘোষণা করল তাদের চেয়ারম্যান চার থেকে ছসপ্তাহ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্যে ছুটিতে থাকবেন। তাঁকে অ্যালকোহল ট্রিটমেন্ট প্রোগ্রামে ভর্তি করা হয়েছে। চেয়ারম্যানের নাম ড্রু লুইস। ইনি আগে ছিলেন সরকারের যানবাহন সচিব। কিন্তু মদালস্যের জন্যে ইউনিয়ন প্যাসিফিক করপোরেশন তাঁকে একটানা চেয়ারে বসতে দেয়নি। মাঝে নেশা ছুটিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এখন তিনি সুস্থ আছেন।

কিন্তু কীভাবে এঁদের আসক্তির কথা জানা যায়? কাজ কিছু সহজ নয়। কে আর নিজেকে অ্যাডিক্ট বলে মানতে চায়? এক কথায় নিজেকে মাতাল, গেঁজেল ইত্যাদি ভূষণে বিভূষিত করা—ক'জন পারে বলুন? বরং নিজের ভাব-মূর্তি সংরক্ষণের জন্যে হয়তো দুটো একটা মিথ্যে কথাই বলতে হয়। করপোরেট চিফ বলে কথা। কোম্পানির লাঞ্চ আওয়ারে স্রেফ এক গেলাস কোক খেয়ে নিলেন। কারণ ফিরে গিয়ে আবার চেয়ারে বসতে হবে। চোখ, কান খোলা রাখতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝেই ককটেল পার্টি আর বিজনেস ডিনার আছে না? ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সুরায় সুরায় সুর মেলাতে সাঁঝ বেলাতে দেখা করা। ব্যবসার খাতিরে নেশা। রসময়দের ক্ষেত্রে তারাই সর্বনাশা! কারণ এদেশে সকলেই তো আর ব্যবসার খাতিরে আকণ্ঠ মদ্যপান করে না।

অফিসের মধ্যে প্রথমে তো কেউই তার নেশা ভাঙের কথা ভাঙতে চায় না। বার কতক হাতে নাতে ধরা না পড়লে প্রমাণ করাও মুশকিল। অথচ এই গোপনতা থেকেই সমস্যা আরও গভীর হয়। নিউ ইয়র্ক স্টেটের রচেস্টার শহরে মাইক্রোটেল ফ্র্যানচাইজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের অফিস। তার প্রেসিডেন্ট আর চিফ একজিকউটিভ অফিসার ছিলেন লরেন অ্যানসলি। ওই কোম্পানির বাজেট হোটেল চেইন ব্যবসার সূত্রপাত হয়েছিল লরেন অ্যানমনির পরিকল্পনা থেকেই। ন ফুট × বারো ফুট মাপের হোটেলের ঘর তৈরি করে সস্তায় স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্যে কোম্পানি ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসা করেছিল। '৯২ সালে ডিসেম্বর মাসে মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে অ্যানসলি মারা গেছেন। হেরোইনের ওভার ডোজ ছিল মৃত্যুর কারণ। অথচ তাঁর এক সহকর্মী বলেছেন—লরেন যে মদ্যপান করতেন, সেও আমরা এই প্রথম জানতে পারলাম। প্রকাশ্যে কখনও তাঁকে ড্রিঙ্ক নিতে দেখিনি। অফিসেরও পারফরম্যান্সের কোনও ত্রুটি লক্ষ করিনি। তবে ছুটির পরে সন্ধেবেলায় কিংবা শহরের বাইরে গেলে কী করতেন জানি না। হয়তো অপরিমিত মদ্যপান করতেন। কারণ এখন তো নানা খবর কানে আসছে। হেরোইন ব্যবহার করতেন বলে বিশ্বাস হয় না। বোধ হয় আত্মহত্যার জন্যেই সংগ্রহ করেছিলেন।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যাঁরা ক্ষমতার খুব উঁচু আসনে থাকেন, তাঁদের অনেকের মনে সব সময় অসাফল্যের দুশ্চিন্তা থাকে। দায়িত্বের গুরুত্ব অনুযায়ী কোম্পানির প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারছেন কিনা, সে নিয়ে চাপা উদ্বেগ আর ভয় থাকে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে—মদ্যপান করে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। যে কোনও নেশাতেই খুব দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকার এই ধরনের ঝুঁকি আছে।

একথা ঠিক যে এঁরা চাকরি সূত্রে বিজনেস মিটিং, কনফারেন্স, লাঞ্চ, ডিনার ইত্যাদিতে ঘন ঘন যান বলে, মদ্যপানের সুযোগও বেশি থাকে। এক্ষেত্রেও আবার শ্রেণী বিভাগের উদাহরণ আছে। যাঁরা হায়ার লেভেল একজিকিউটিভ, তাঁরা মদ্যপানের প্রভাব সত্ত্বেও নিজেদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাধার ক্ষেত্রে বেশ সচেতন থাকেন। ব্যবহারে, আচারে, আচরণে ভারসাম্যের কোনও অভাব ধরা পড়ে না। কিন্তু লোয়ার লেভেল ম্যানেজাররা অনেকেই সে তুলনায় স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখতে পারেন না।

তবে ওই দুই লেভেলে যা কিছু ঘটে, তার খবর অবশ্য একজিকিউটিভদের নিজস্ব গণ্ডির বাইরে যায় না। কারণ এঁদের কাছে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা ওপরওলাদের ভয় পান। চাকরির খাতিরে সমীহ করেন। বসকে মাতাল বলে ধরিয়ে দিয়ে কে আর নিজের কাজের ক্ষতি করতে চায়?

যাই হোক, ড্রাগ অথবা অতিরিক্ত অ্যালকোহলের প্রভাবে বেশ সন্দেহজনক ব্যবহার না করলে চিফ একজিকিউটিভরা পদাধিকার বলেই অভ্যাসটি গোপন রাখতে পারেন। এছাড়া, আরও উপায় আছে। যখন তাঁরা ক্রমশ বুঝতে পারেন যে, নেশার প্রতিক্রিয়ার জন্যে আর আগের মতো কাজকর্মে মন দিতে পারছেন না, বুদ্ধির ধার কমে যাচ্ছে। তখন সময় বুঝে দক্ষ সহকারী নিয়োগ করেন। খুঁজে খুঁজে তাঁদেরই চাকরি দেন, যাঁরা তাঁর দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন। ঠিক মতো কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন। নিউ ইয়র্কে ডব্লু আর ল্যাজার্ড অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বোচ্চ প্রধানের নাম ছিল ওয়ার্ডেল আর ল্যাজার্ড। বছর দুই আগে তিনি নিজের কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্যে মোট ছ'জন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞকে চাকরি দিয়েছিলেন। সে সময় কোম্পানির বিস্তারের পরিকল্পনা থেকেই নতুন লোকজন নিচ্ছেন বলে তাঁর ভাইস চেয়ারম্যানের ধারণা হয়েছিল। গত বছর মে মাসে ওয়ার্ডেল আর ল্যাজার্ড মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ—একই সঙ্গে কোকেন আর অ্যালকোহলের ওভার ডোজ। অথচ তাঁর ভাইস চেয়ারম্যান বলেছেন—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে মিঃ ল্যাজার্ড দীর্ঘদিন থেকে ড্রাগে আসক্ত ছিলেন। তাঁকে দেখে কখনও কিছু সন্দেহ হয়নি।

কিন্তু সেন্টার অফ অ্যাডিকশন অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজ-এর কাউসেলরের বক্তব্য—ওই দু'বছর আগেই ল্যাজার্ড নিজের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। কোম্পানির প্রসারের পরিকল্পনাকে নিজে কাজে পরিণত করতে পারবেন না ভেবেই নতুন লোক নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সময়মত অন্যদের ওপর দায়িত্ব দেওয়ার ফলে তাঁর অসুস্থতা ও অক্ষমতা ধরা পড়েনি। মারা যাওয়ার পর ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের নেশার কথা জানা গেল। অন্তত কোম্পানির লোকেরা তখন জানতে পারলেন।

উচ্চপদস্থ কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবন ও অভ্যাস সম্পর্কে কোম্পানির মালিকদের অজ্ঞতা বহুক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণ হয়। কয়েক বছর আগের ঘটনা। নামকরা কিছু বড় কোম্পানির চিফ একজিকিউটিভদের গলফ আউটিং-এ পাঠানো হয়েছিল। গলফ কোর্সে পান ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। তো, একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির চিফ সাহেব খুব মদ্যপান করেছেন। নেশার ঝোঁকে অন্যদেশের লোকজনদের বিশেষ করে

ওরিয়েন্টালদের নিয়ে হাসাহাসি করেছেন। ক্লায়েন্টদের মধ্যে এক জাপানি তো রেগে লাল। ঠিক এক ঘণ্টা পরে জাপানি বোম ফেলেছেন। পেরেন্ট কোম্পানিকে ফোন করে এক বিলিয়ন ডলারের অ্যাকাউন্ট বরবাদ করে ছেড়েছেন।

সেই ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির খুব শিক্ষা হয়েছিল। মদ্যপ লোকটি অ্যালকোহল-অ্যাবিউজ-এর জন্যে চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন। যখন স্বভাব শুধরে ফিরে এলেন, তখন চাকরির প্রথম দায়িত্ব ছিল জাপানিদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করে অর্ডার ফিরিয়ে আনা।

তবে এখনও সব কোম্পানি সিনিয়র একজিকিউটিভদের নেশা তাড়ানোর কাজে সমানভাবে যোগ দেয়নি। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারটি তো আছেই। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে গাফিলতিও আছে। অথচ চিকিৎসা কেন্দ্রের অভাব নেই। ম্যাসাচুসেটস-এর বেলমন্ট শহরে আছে লেভিনসন ইনস্টিটিউট। ম্যানেজমেন্ট সাইকোলজিস্ট হ্যারি লেভিনসনের তত্ত্বাবধানে এই রি-হ্যাব সেন্টারটি গড়ে উঠেছে। নিউ ইয়র্কে আছে বি. এফ. এস. সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েটস ইনকরপোরেটেড। ম্যাসাচুয়েসটস-এর লিডারশিপ কনসালটিং গ্রুপ ও ডঃ জেফরি শেলার নামে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের তত্ত্বাবধানে সিনিয়র একজিকিউটিভদের মনের চিকিৎসা করে। ডঃ স্পেলার বলেছেন—গত পাঁচ বছরে মাত্র দশবার তিনি বিভিন্ন কোম্পানির সিনিয়র একজিকিউটিভদের মদ্যপানে আসক্তির জন্যে চিকিৎসা করেছেন। প্রতিবার কোম্পানির থেকে এ বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ এসেছে। আর আসক্ত লোকটির বার্ষিক ছুটির সঙ্গে সময় ঠিক করে নিয়ে তবে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ কোম্পানির ভেতরে, বাইরে কেউ জানবে না তিনি রি-হ্যাবে গেছেন।

গত বছর আগস্ট মাসের কথা। নর্থ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্স কোম্পানির কো-চেয়ারম্যান গ্যারি উইলসনকে সাময়িকভাবে বোর্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কারণ জানা গেল তিনি ছুটিতে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে সঙ্গে নাকি মারিজুয়ানা রেখেছিলেন। নর্থ ওয়েস্ট এই খবর লুকিয়ে রাখেনি। সরাসরি ঘোষণা করে দিয়েছে। তারা মনে করে এসবই হচ্ছে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়।

ফল যা হবার তাই-ই হয়েছে। যদিও বিশেষ অনুসন্ধান থেকে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, উইলসন ড্রাগ ব্যবহার করেননি। বা এখনও করেন না, তা সত্ত্বেও তাঁর মানসম্মান নষ্ট হয়েছে। কারণ, নেশার জিনিস তাঁর সঙ্গে ছিল। জরিমানা দিয়েছেন সাড়ে পাঁচশো ডলার। বদনাম ঘোচাতে উকিল আর ডাক্তারের ফি বাবদ কিছু গেছে। এখন চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্যে আবার নাকি ড্রাগ টেস্টিং-এ যেতে হবে। নর্থ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্স হচ্ছে আমেরিকার চতুর্থতম বৃহৎ বিমান সংস্থা। তারা গ্যারি উইলসনকে আদ্যোপান্ত পরীক্ষা না করে নেবে না বলে জানিয়েছে।

চিফ একজিকিউটিভদের নেশার কথা প্রকাশ করে দেওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। এমনিতেই কিছু পলিটিকস থাকে। প্রতিযোগিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা আর দলাদলি থেকে অশান্তি। ভেতরে ভেতরে একে অন্যকে অতিক্রম করে যেতে চান। নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করতে চান। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচারে এ ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই কোনও নতুন ঘটনা নয়। তার ওপর যখন নেশার জন্যে কাউকে সরিয়ে দেওয়া হয়

বা সাময়িক ছুটি দিয়ে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হয়, তখন ডামাডোলের সুযোগে পলিটিকস আরও বেড়ে যায়। ক্ষমতা দখলের চেষ্টার পাশাপাশি এক ধরনের অনিশ্চয়তার ভীতি জন্মায়। চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের চাকরিতে মানসিক চাপ কোন পর্যায়ে পৌঁছলে লোকে নেশার আশ্রয় নেয় এইসব কথা চিন্তা করে তাঁরা আশঙ্কিত হন।

লেখার শুরুতে ইউনিয়ন প্যাসিফিক করপোরেশনের ড্রু লুইসের অ্যালকোহল আসক্তির উল্লেখ করেছিলাম। তিনি কিন্তু নিজে থেকে কোম্পানিকে সব জানিয়েছিলেন। দশ দিনের নোটিস দিয়েছিলেন বলা যায়। তারপর চিকিৎসা করতে চলে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর ব্যবহারের অসঙ্গতি বা কর্মক্ষমতার অবনতি কি কেউই লক্ষ করেননি? কোম্পানির চুক্তি—কোনও রকম বৈলক্ষণই দেখা যায়নি। কিন্তু এখন অ্যানালিস্টরা বলছেন—তাই তো! তখন কয়েকটা ব্যাপার খেয়াল করিনি তো। গত বছর ড্রু লুইস যখন অ্যানালিস্টদের সঙ্গে কোয়ার্টারলি মিটিং করতেন, কঠিন কঠিন প্রশ্ন পেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধীনস্থ কর্মীদের দিকে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁরা উত্তর দিতেন। বিশেষ করে অ্যানালিস্টরা যতবার সংখ্যাতত্ত্ব, হিসেব নিকেশ সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে বসতেন, সঠিক পরিসংখ্যান জানতে চাইতেন, ততবারই ড্রু অন্যদের ভিড়িয়ে দিতেন। বোঝা যাচ্ছে, সে সময় কিছুই তাঁর মনে থাকত না বা আগ্রহ থাকত না। অ্যানালিস্টরা এখন বলছেন যে ওই সময় তাঁরা ভাবতেন ড্রু নির্ঘাত অন্যদের হাতে কলমে কাজ শেখাচ্ছেন। তাই প্রশ্ন পাওয়া মাত্র তাদেরই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন।

ইউনিয়ন প্যাসিফিক-এর মতো অন্যান্য কোম্পানি থেকেও চিফ একজিকিউটিভ অফিসারদের মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, ড্রাগ ও অ্যালকোহল অ্যাবিউজ এর চিকিৎসা ব্যাপারটি ক্রমশ গুরুত্ব পাবে। লরেন অ্যানসলি বা ওয়ার্ডেল আর ল্যাজার্ড-এর আত্মহত্যাই এ অভ্যাসের শেষ পরিণতি নয়। গভীর বিষাদ ও অ্যালকোহলের প্রভাব মুক্ত থাকার জন্যে জিম জেনসেনের মতো মানুষ নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অ্যালকোহল কাউনসেলিং আর মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্যই জিম এখনও তাঁর দীর্ঘদিনের চাকরিটি বজায় রাখতে পেরেছেন। দূরদর্শন কোম্পানি একাধিকবার তাঁর নার্ভাস ব্রেক ডাউনের চিকিৎসা করিয়েছে। পুত্রশোক, বিষাদ, মাদকাশক্তি, আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে গুরুতর অসুস্থ জিমকে সুস্থ করে তুলেছে। সহানুভূতিসম্পন্ন দর্শকরা তাঁকে প্রতিদিন 'স্থানীয় সংবাদে'র সময় দেখতে চান। জিম ছুটি নিলে ফিরে এসে খবরের শেষে বলেন—এবার আর 'রি হ্যাব সেন্টারে' নয়, আমি বেড়াতেই গিয়েছিলাম।

২০ মে ১৯৯৫

নয় অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা

সেই সহযাত্রিণীর নাম অথবা মুখ কিছুই আর আজ মনে রাখার কথা নয়। তবু যে মনে আছে, সে শুধু তার বাবা, মার জন্যে। সাতাশি সালের জুন মাসের শেষে নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লি যাচ্ছি। ডিপারচার লাউঞ্জে ঠিক আমাদের পেছনে মেয়েটি স্যুটকেস নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিল। কাচের দেওয়ালের বাইরে পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে তার বাবা-মা। চেক-ইন করে দোতলার লাউঞ্জে পৌঁছেছি। একটু পরে তার বাবা, মা চলে এলেন। নিজেরাই আলাপ করলেন। নিউ জার্সির মরিস টাউনে থাকেন। মেয়ে একা যাচ্ছে বলে দুজনে বেশ উদ্বিগ্ন। মেয়ের নাম রোমা ভার্মা। কলম্বিয়া ইউনির্ভাসিটির ছাত্রী। বছর কুড়ি বয়স। সামারে ইন্ডিয়া বেড়াতে যাচ্ছে। একই ফ্লাইটে যাচ্ছি দেখে ওঁরা বলেছিলেন মেয়েটির কোনও দরকার হলে যেন একটু সাহায্য করি। মেয়ে বোধহয় ওঁদের উদ্বেগ দেখে লজ্জা পাচ্ছিল। সিকিউরিটি এনক্লোজারের গেটের পাশে ওঁরা কতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। মার কান্না কান্না মুখ। মেয়েকে দেশে বেড়াতে পাঠিয়ে রীতিমত দুশ্চিন্তায় থাকবেন বলে মনে হচ্ছিল।

প্লেনে তার সিট আমাদের কাছাকাছি ছিল। সারাপথ বই তার সঙ্গী। লন্ডনে ট্র্যানজিট লাউঞ্জে সামান্য কথাবার্তা হল। লন্ডন থেকে দিল্লির ফ্লাইটে বেশিরভাগ সময় তার মাথার ওপর রিডিং লাইট জ্বলছিল। গায়ে কম্বল জড়িয়ে বই হাতে বসেছিল। এক সময় দেখলাম বিষণ্ণ সুন্দর সেই মুখ অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে আছে। কখনও চোখ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে দিয়ে ঘুমের চেষ্টা করছে। প্লেনের মধ্যে ঘুম হওয়াটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। তাই, মেয়েটির নির্ঘুম যাত্রা অথবা বয়সোচিত অন্যমনস্কতার মাঝে ব্যবহারগত কোনও অসঙ্গতি খুঁজে পাইনি।

বছর দুই আগে এখানে হিন্দু টেম্পলে লক্ষ্মীশংকরের ভজনের প্রোগ্রাম হল। সেখানে ভার্মাদের সঙ্গে দেখা। আমাদের চেনা এক কাশ্মীরি পরিবার ওঁদের বন্ধু। পরে তাঁদের কাছে শুনেছিলাম রোমা কলম্বিয়া প্রেসবিটেরিয়ান মেডিকেল কলেজে রেসিডেন্সি করছে। গত ক্রিসমাসে মরিস টাউনের বাড়িতে এসেছিল। ছুটির শেষে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাওয়ার পর হসপিটালের কাছে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। রোমার মাঝে মাঝে 'ডিপ্রেশন' হত। অথচ মেধাবী ছাত্রী। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে আবার পড়াশোনা শুরু করত। এভাবেই মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে কোর্স শেষ করেছিল। বাবা, মা আশা করেছিলেন, রোমার মানসিক অবস্থার আর অবনতি হবে না। 'প্রোজ্যাক' রোমার আত্মহত্যা এখানকার ভারতীয় পরিবারগুলিকে ভাবিয়ে তুলেছে।

তবে আমেরিকায় ডিপ্রেশনজনিত অসুস্থতার হার তুলনামূলক বিচারে ভারতীয়দের মধ্যে খুবই কম বলা যায়। অ্যাংজাইটি বা উদ্বেগ থেকে মনোরোগের চিকিৎসা করিয়েছেন, এমন মানুষদের সম্পর্কে নিউ জার্সির সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর এল মালহোত্রা বলেছেন— অ্যাংজাইটি এমনই একটি রোগ, যাকে অসুস্থতা বলে স্বীকার করতে বেশ সময় লাগে।

অ্যাংজাইটি কেন হয়? জাগতিক অর্থে ব্যর্থতা, আশাভঙ্গ ইত্যাদিই শুধু এ রোগের মূল কারণ নয়। পঁচিশ বছরের একটি ভারতীয় যুবক আমেরিকায় পড়াশোনা করছে। বড়

কোম্পানিতে ভাল চাকরি পেয়েছে। তার প্রত্যাশা অনুযায়ী সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। মন, মেজাজ, ভালই থাকে। অফিসে, বাড়িতে কোথাও কোনও সমস্যা নেই। এভাবেই দিন কেটে যাওয়ার কথা। কিন্তু ছেলেটি ক্রমশ নিজের মধ্যে কিছু পরিবর্তন বুঝতে পারে। যে চাকরির জন্য তার এত আগ্রহ ছিল, উদ্যম ছিল, সেই চাকরিই যেন আর ভাল লাগে না। সকালে উঠে মনে হয়—আবার একটি অর্থহীন দিন।

অফিসে এসে যুবকটির কাজে মন বসে না। নিজের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সংশয় শুরু হয়। ছোটখাটো ভুলত্রুটি ঘটে। দরকারি কাজের কথা মনে থাকে না। ভাবে কখন ছুটি হবে। কখন বাড়ি গিয়ে বাঁচবে। অথচ বাড়িতে ফিরেও স্বস্তি নেই। মাসল টেনশন থেকে কাঁধে, পিঠে যন্ত্রণা হয়। চোয়ালে ব্যথা করে। অকারণ দাঁতে দাঁত ঘষে।

এ সবই অতিরিক্ত উদ্বেগজনিত অসুস্থতা। নানা উপসর্গের মধ্যে আছে—নিঃশ্বাসের কষ্ট, ঢোঁক গেলার অস্বস্তি, হাঁফ ধরে যাওয়া, বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা, মুখের ভেতর শুকিয়ে যাওয়া, চেতনা হারিয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, হাত ঘেমে যাওয়া, হাত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, পেটে অস্বস্তি, মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন, কখনও খিদের অভাব, কখনও অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা, গলার ভেতর কোনও কিছু আটকে আছে এরকম বোধ হওয়া, অনিদ্রা, দিনের বেলা আচ্ছন্নভাব, শুয়ে থাকার ইচ্ছে, খিটখিটে মেজাজ, সহজেই রেগে ওঠা ইত্যাদি। যদি কোনও লোকের এর মধ্যে অন্তত পাঁচ/ছটি লক্ষণ বেশ কিছুদিন ধরে উপস্থিত থাকে, তবে তিনি অ্যাংজাইটি ডিস্‌অর্ডারে ভুগছেন বলে ধরে নিতে হবে। ছ'মাসের ভেতরে সাইকোথেরাপি এবং ওষুধপত্রের সাহায্য নিলে রোগী মানসিক স্বস্তি পেতে পারেন। অবচেতন মনের যে সব চিন্তা থেকে অ্যাংজাইটির সূত্রপাত হয়েছে বলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা নির্ণয় করেন, থেরাপির সাহায্যে তা দূর করার চেষ্টা হয়। তবে প্রথমে ফিজিক্যাল চেক-আপ করানো দরকার। ওই যুবকটির বন্ধুরা তাকে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে বলায়, সে সরাসরি জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে গিয়েছিল। তিনি চেক-আপ করে যখন দেখলেন যে তার হাইপারটেনশন, হাইপার থাইরয়েডইজম, হার্ট ডিজিজ—কোনও কিছুই হয়নি তখন তাকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠালেন। সেখানে থেরাপি সেশন আর স্নায়ুর চিকিৎসা সংক্রান্ত ওষুধপত্র ব্যবহার করে ছেলেটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছে। কাজেকর্মে আবার উৎসাহ ফিরে পেয়েছে। সকলের ক্ষেত্রে ওষুধপত্রের দরকারও হয় না। চিকিৎসক রোগীর মনের অতিরিক্ত ভয়, দুর্ভাবনা, রাগ, অশান্তির মূল কারণগুলি সম্পর্কে তাকে সচেতন করেন।

কিন্তু ডিপ্রেশনকে এই পর্যায়ে ফেলা যাবে না। গত পঁচিশ বছর ধরে আমেরিকায় মানসিক অসুস্থতার গবেষণার ক্ষেত্রে ক্লিনিকাল ডিপ্রেশনকে গুরুতর রোগ হিসেবে ধরা হয়েছে। আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে যাচ্ছেন। প্রাইভেট চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন। প্রাইভেট চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানিগুলি চিকিৎসার খরচ দিচ্ছে। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। কয়েক লক্ষ মার্কিন নাগরিক ডিপ্রেশনের চিকিৎসার ফলে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে পারছেন। ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বলতে ঠিক কী বোঝায়? এ প্রসঙ্গে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বোঝায়? এ প্রসঙ্গে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন—এ ঠিক দুদিনের মন খারাপের অবস্থা নয়। যে কোনও মানুষেরই

প্রত্যেক দিন তো সমান যায় না। মাঝে মধ্যে মন মেজাজ খারাপ থাকে। কিন্তু যখন কারও দু-তিন সপ্তাহ ধরে মন বিষণ্ণ থাকে, এবং ক্রমশ মাঝে মাঝেই এই ভাব ফিরে আসতে থাকে, তখন বুঝতে হবে, তার মধ্যে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের সাধারণ লক্ষণগুলি দেখা দিচ্ছে। ডিপ্রেশনকে জটিল মানসিক ব্যাধি বলা যায়, কিন্তু 'উন্মাদনা' কখনই নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ম্যানিক-ডিপ্রেশন অথবা বাইপোলার ডিজিজ হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী রোগ। এদেশে প্রতি একশো জনের মধ্যে একজন ম্যানিক ডিপ্রেশনে ভোগেন। সারা জীবনই এঁদের বিষণ্ণতার যন্ত্রণা থাকে। লক্ষণগুলি হচ্ছে—অসংলগ্ন চিন্তাধারা, মুডের অদ্ভুত পরিবর্তন, অনিদ্রা, অত্যধিক আবেগ তাড়িত ব্যবহার, অসংযত আচরণ। সিভিয়র ডিপ্রেশন সাধারণত ওই ম্যানিক ডিপ্রেশনের লক্ষণগুলির পরে দেখা দেয়। হঠাৎ হঠাৎ শুরু হয়, কখনও আপনা থেকেই চলে যায়। এমনও হয়, ম্যানিক-ডিপ্রেশনের অসুস্থতা যাঁর আছে, জীবনের কোনও বিশেষ ঘটনায় রোগটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের মত হচ্ছে—ম্যানিক ডিপ্রেশন রোগটি হচ্ছে বংশগত।

ডিপ্রেশনের লক্ষণ কী ভাবে বোঝা যায়? নানা কারণে মন খারাপের সূত্রপাত হতে পারে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, মানসিক ঘাত প্রতিঘাত, বড় কোনও অসুখ, দুর্ঘটনা, দীর্ঘদিন কর্মহীন হয়ে থাকা—এ সবই ডিপ্রেশন সৃষ্টি করতে পারে। আবার এমনও ঘটে, পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে নয়, বংশগত কারণে, বায়োলজিকাল ফ্যাকটর থেকে ডিপ্রেশন হয়। এর উপসর্গগুলি এইরকম—সর্বক্ষণ বিমর্ষভাব, উৎকণ্ঠা, শূন্যতাবোধ, হতাশা, অপরাধবোধ, নিজেকে অপদার্থ, অক্ষম বলে ধরে নেওয়া, যৌন আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে যাওয়া, রাতের পর রাত জেগে থাকা নয়তো অতিরিক্ত ঘুম, বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকা, ক্ষুধাবোধের অভাব, নয়তো অতিরিক্ত খাওয়া, ক্লান্তি, অস্থিরতা, খিটখিটে মেজাজ, মনঃসংযোগের অক্ষমতা, শারীরিক কষ্টের মধ্যে মাথার যন্ত্রণা, পেটে ব্যথা, এবং জীবন সম্পর্কে গভীর হতাশার কারণে মৃত্যু ও আত্মহত্যার চিন্তা।

যে সব মানুষের মধ্যে এই লক্ষণগুলির বেশ কয়েকটি ধরা পড়েছে এবং বিনা চিকিৎসায় উপশম হচ্ছে না, তাঁরা ডিপ্রেশনে ভুগছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ডিপ্রেশনের লক্ষণ হল—অতিরিক্ত জেদ, বায়না, খেলার সঙ্গী বা স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে সমানে ঝগড়া, মারামারি করা এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব। এরা স্কুলে যেতে চায় না। সারাক্ষণ অসুখের অজুহাত দেয়। বয়ঃসন্ধি কালে এরা নিষ্ঠুর আচরণ করে, গুম হয়ে থাকে, নয়তো যে কোনও ছুতোয় মারামারি, ঝগড়া লাগায়। পড়াশোনায় পিছিয়ে যায়, বন্ধুবান্ধব পায় না। কৈশোরের পর অন্যান্য লক্ষণগুলি ধরা পড়ে। ড্রাগ এবং অ্যালকোহলে আসক্তির পেছনেও ডিপ্রেশনই প্রধান কারণ। বার্ধক্যে ডিপ্রেশনের লক্ষণ হল—এই বৃদ্ধবৃদ্ধারা পুরনো দিনের কথা ভুলে থাকেন। সারাক্ষণ নিজের শারীরিক ব্যথা বেদনা আর পারিপার্শ্বিক সংক্রান্ত অভাব, অভিযোগের কথা বলেন। নয়তো একেবারে গুটিয়ে থাকেন।

ডিপ্রেশন কি সত্যিই বংশগত রোগ? রেচেল নামে এক মহিলার মাঝে খুব দুঃখসময় গেল। অনেক কষ্টে দাঁড় করানো একটি ব্যবসার ক্ষতি হওয়া ছাড়াও আপনজন বলতে নিজের ভাই মারা গেল। তারও আগে থেকে রেচেল বিষণ্ণতা, বিরক্তি, অস্থিরতাবোধ

ইত্যাদির কারণে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। ডায়াবেটিস থেকেই এরকম হচ্ছে বলেছিলেন চিকিৎসক। পারিপার্শ্বিক বিপর্যয়ের ফলে রেচেল আরও ভেঙে পড়লেন। সে সময় তাঁর বান্ধবীর পরামর্শে সাইক্রিয়াট্রিস্ট দেখাতে তিনি জানতে চাইলেন রেচেলের পরিবারে কেউ ডিপ্রেশনে ভুগতেন কিনা। রেচেল জানতেন তাঁর মায়ের পরিবারে দু'জনকে হাসপাতালে রেখে সিভিয়ার ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করানো হয়েছিল। একজন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। চিকিৎসক তারপর রেচেলকে ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুললেন।

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে—ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে বংশধারার একটি ভূমিকা অবশ্যই আছে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকা সত্ত্বেও, জীবনে মোটামুটি ভাবে সফল কোনও মানুষ যদি মাঝে মাঝেই মনোকষ্টে ভোগেন, হতাশা এবং নৈরাশ্য থেকে বিমর্ষ থাকেন—তবে তাঁর বংশগত কারণেই ডিপ্রেশনের সূচনা দেখা দিয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়।

তবে ব্লাড প্রেশার, হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, আথ্রাইটিস-এর মতো বংশগত রোগ হলেও ডিপ্রেশনের ইতিহাস কি সেভাবে জানা সম্ভব? প্রথম বহু বছর আগে মনোরোগের একটি মাত্র নাম ছিল—পাগলামি। 'পাগলের বংশ' বলা হত বটে। কিন্তু ডিপ্রেশনের লক্ষণ নিয়ে আলাদা করে কেউ মাথা ঘামাত না। চিকিৎসাও হত না। অবহেলাজনিত কারণে সেই বিষাদ রোগই একসময় দুরারোগ্য ব্যাধি এমনকি উন্মাদনা বলেই চিহ্নিত হত। তবে সকলের ক্ষেত্রে নয়। তাই শুধু 'বিষণ্ণতার' খোঁজ খবর পাওয়া কঠিন। কিন্তু স্মরণশক্তি প্রখর হলে অনেকেই অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারেন। 'পরমা' ছবির সেই বিধবা পিসির মতো কেউ হয়তো ছিলেন কোনও পরিবারে। বাল্য বিধবা পিসিমার হাস্যকর ছুঁৎমার্গ নিয়ে কি কখনও ভেবেছি? ঘরে ঘরে পাগল জেঠিমা, কাকিমাদের বিষাদ পর্বের মধ্যেই সন্তান জন্মাত। আবার তাঁরা ছাদে চুল ছড়িয়ে বসে বিড়বিড় করতেন। কারও ঠাকুমা আজীবন অসুস্থ বলে বিছানা থেকে নামতেন না। এঁদের 'ডিপ্রেশন' ছিল কিনা কে বলতে পারে? পুরুষদের মদ্যপান প্রসঙ্গেও আমেরিকান চিকিৎসকরা বলছেন—ডিপ্রেশনের সঙ্গে তার কিছু যোগ আছে। ক্রনিক অ্যালকোহলিকরা হচ্ছে চিরকালের আসক্ত মানুষ। তারা বেশ নিয়ম করে গুছিয়ে বসে মদ খেয়ে যায়। কোনওদিন কর্তব্যে অবহেলা করে না। ডিপ্রেশনের জন্যে নয়, মনের ভারী ফুর্তি থেকে মদ খায়। কিন্তু যখন দেখা যায়—যাদের এরকম নেশার অভ্যাস নেই, তারা সময়, অসময় নেই, একটানা বেশ কয়েকদিন ধরে ড্রিংক করে ঝিম মেরে থাকছে, আবার বেশ কিছুদিন একেবারেই ড্রিংক করছে না, এবং আবার বিষণ্ণতা থেকে ওইরকম পরপর কয়েকদিন অসময়ে মদ্যপান করছে—তখনই সন্দেহ হয় সে ডিপ্রেশনে ভুগছে। কারণ এই প্যাটার্ন ঠিক স্বাভাবিক নয়।

ডিপ্রেশনের সম্ভাবনা কাদের বেশি থাকে? আমেরিকায় যার যত স্ট্রেস, তার ততই ঝুঁকি থাকছে। দরিদ্র, বিবাহবিচ্ছিন্না মায়ের হল প্রধান ভিকটিম। পারিপার্শ্বিক চাপ আর জীবন সংগ্রামই তার কারণ। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে করতে মানসিক ভারসাম্য হারানো তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে স্ট্রেস আছে মানেই ডিপ্রেশনে ভুগছে, এমন নয়। নির্ভর করছে সে কতখানি নিতে পারছে, তার ওপর। এরপরেই আছেন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা।

নিঃসঙ্গতাবোধ, শারীরিক কষ্ট, ক্ষেত্র বিশেষে আর্থিক অসাচ্ছল্য থেকে বিষণ্ণতা বোধ আসছে। ডিভোর্সের অভিজ্ঞতা, সন্তান শোক, স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু—যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত ডিপ্রেশনের উপযুক্ত শর্তগুলির অভাব নেই। টিন এজার ছেলেদের তুলনায় টিন এজার মেয়েরা দ্বিগুণ হারে স্পর্শকাতর। তাই তাদের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশনের সম্ভাবনাও দ্বিগুণ থাকছে। পুরুষদের চেয়ে মহিলারাই যে বেশি মানসিক রোগে অসুস্থ হন, তার প্রধান কারণ হচ্ছে—মহিলারা চিকিৎসা করাতে যান বলে রেকর্ড থাকে। সংসারের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে এই আশংকায় তাঁরা সময় থাকতে ভয়ে ভয়ে থেরাপিস্টের কাছে চলে যান। স্বামীরাও তাঁদের চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান। কিন্তু পুরুষ নিজের 'মন খারাপ' সহজে স্বীকার করতে চান না। সম্ভবত পৌরুষহানির কিছু ব্যাপার থাকে। চাকরির জগতে জানাজানি হবে বলে সতর্ক থাকতে চান। মানসিক রোগ যে দুর্বলতার লক্ষণ, এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চিকিৎসা করাতে দেরি করেন। স্ত্রীরা চেষ্টা করেও সব সময় তাঁদের বোঝাতে পারেন না। তবে ক্রমশ ডিপ্রেশনকে শারীরিক ব্যাধির মতোই দেখা হচ্ছে বলে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটেছে। অফিস থেকেই ছুটি দিয়ে চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সুস্থ হলে আবার যথাস্থানে ফিরে আসা।

চিকিৎসা পদ্ধতিও অনেক রকম। 'টকিং থেরাপি' করে মানসিক রোগীর অন্তর্নিহিত সমস্যা এবং যন্ত্রণার কারণ খোঁজার চেষ্টা হয়। তাঁদের সে সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হয়। ব্যবহারিক প্রয়োগ বা শিক্ষার সাহায্যে রোগীর জীবনের নেগেটিভ প্যাটার্নকে বিপরীত পথে চালনা করতে শেখানো হয়। বিশেষজ্ঞরা সাইকোডায়নামিক থেরাপি করছেন ইদানীং। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—শৈশব থেকে রোগীর মনে মানসিক সমস্যার যে মূল গভীরভাবে গেঁথে গেছে, তাকে আবিষ্কার করে বাইরে নিয়ে আসা। কখনও ওয়ান-টু-ওয়ান সেশন, কখনও গ্রুপ থেরাপি—দু'ভাবেই চিকিৎসা চলতে থাকে।

চিকিৎসকেরা সাধারণত থেরাপি আর ওষুধ দুই মিলিয়ে ডিপ্রেশন সারিয়ে তোলেন। আগেকার ওষুধপত্রের চেয়ে এখন অনেক ভাল ভাল অ্যান্টি-ডিপ্রেস্যান্ট ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে।

বিভিন্ন অ্যান্টি ডিপ্রেস্যান্টের মধ্যে প্রোজ্যাকের বিক্রি খুব বেশি। বছর খানেক হল বাজারে এসেছে নতুন ওষুধ এফেকসর। এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া যেমন কম, রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা তেমনই বেশি। দশ বছর ধরে গবেষণা ও তিনশো মিলিয়ন ডলার খরচ করে আমেরিকান হোম প্রোডাক্ট কোম্পানি এফেকসর তৈরি করেছে। অন্যান্য ওষুধগুলি সেরোটনিন নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্রেন কেমিক্যালের লেভেল বাড়িয়ে দিয়ে রোগীর ডিপ্রেশন কমাতে সাহায্য করে। এফেকসর সেক্ষেত্রে দু'রকম ব্রেন কেমিক্যালের লেভেল বাড়িয়ে দিয়ে আরও শীঘ্র রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারে। দ্বিতীয় ব্রেন কেমিক্যালের নাম নরিপাইনফ্রিন। এর লেভেল নেমে গেলে সিরিয়াস ডিপ্রেশনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এফেকসর এ জন্যে দুটি কেমিক্যালের লেভেল বাড়িয়ে দিচ্ছে। হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করার পর একটি স্টাডিতে দেখা গেছে—মেল্যাঙ্কলিক ডিপ্রেশনের রোগীদের মধ্যে শতকরা বাষট্টিজন 'এফেকসর'-এর উপকার পেয়েছে। প্রোজ্যাক কাজ দিয়েছে মাত্র ৩৯% ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে। জন্তুদের ওপর প্রয়োগ

করে দেখা গেছে সমস্ত অ্যান্টি ডিপ্রেস্যান্ট ওষুধের মধ্যে এফেকসর সবচেয়ে আগে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

ডিপ্রেশনের রোগীদের মধ্যে যাদের কোনওভাবেই সুস্থ করা যায় না, কোনও ওষুধেই ফল পাওয়া যায় না, তাদেরও এফেকসর দিয়ে উপকার পাওয়া গেছে। তবে সাধারণত ৫% থেকে ১০% রোগীর কোনও চিকিৎসাতেই ফল হয় না। অন্যান্য ওষুধে যাদের কাজ হয়নি, এমন রোগীদের মধ্যে শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ রোগী ওই ওষুধে সুস্থ হয়েছে। বিশেষ করে যাদের মানসিক অবস্থার জন্যে হাসপাতালে দিতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে এফেকসরই প্রধান ওষুধ এখন। চল্লিশ বছরের এক মহিলা গত আট বছর ধরে বারবার ড়িপ্রেশনে অসুস্থ হয়েছেন, অ্যাংজাইটি অ্যাটাকে শয্যাশায়ী অবস্থা। প্রোজ্যাক বা অন্যান্য ওষুধে রোগের উপশম হয়নি। পাঁচ বছর এই অবস্থায় থাকার পর তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টা ধরা পড়ল। হাসপাতালে শক থেরাপি করেও বিশেষ কাজ হল না। এই সময় নতুন ওষুধ এফেকসর দেওয়াতে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। গত তিন বছরের চিকিৎসায় সুস্থই আছেন। মাঝে আর ডিপ্রেশনের লক্ষণ ফিরে আসেনি। এফেকসরের আর একটি নাম ভেনল্যাফ্যাক্সিন।

আমেরিকায় মোট জনসংখ্যার ১৪% ভাগ মানুষ মানসিক অসুস্থতায় ভোগেন। সারা জীবনে অন্তত বেশ কয়েকবার এঁরা হয় ডিপ্রেশনে, নয় অ্যালকোহল আসক্তিতে, নয় তো অন্য কোনও মনোরোগে আক্রান্ত হন। সমীক্ষায় জানা গেছে—এদেশের অর্ধেক সংখ্যক লোক জীবনে একবার না একবার মানসিকভাবে অসুস্থ বোধ করেছেন। কিন্তু আমেরিকান সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য—মাইল্ড ডিপ্রেশন, সাময়িক উদ্বেগ, অস্থিরতা দূর করতে চিকিৎসার দরকার হয় না। লোকে ডাক্তারের কাছেও যায় না। তাই, মানসিক রোগী বলতে ওই ১৪%-কেই বোঝানো হচ্ছে।

ডিপ্রেশনের কারণ কী? মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন—দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত মনোকষ্ট, অভাব, অভিযোগ, নৈরাজ্য, আত্মবিশ্বাসের অভাব, প্রত্যাখ্যানের দুঃখ—এইসব মিলিয়ে গভীর বিষাদের জন্ম হয়। শারীরিক অসুস্থতা, দুর্ঘটনা থেকে প্রতিবন্ধী জীবন—ডিপ্রেশনের কারণ হতে পারে। আবার যাঁর আপাতদৃষ্টিতে কোনও সমস্যা নেই, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, সামাজিক বিচারে যাঁকে 'সুখী মানুষ' বলেই ভাবা হয়, তাঁরও গভীর বিষাদের যন্ত্রণা থাকা সম্ভব। শূন্যতাবোধ জাতীয় অনুভূতি বলা যায়। চিকিৎসকেরা বলছেন—মানসিক চাপ অসহ্য হওয়ার আগে চিকিৎসার সাহায্য নিলে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ইত্যাদি এড়ানো যায়।

সাধারণত দেখা যায় স্বল্প শিক্ষিত অথবা সীমিত উপার্জনের আর্থিক চাপের মধ্যে থাকেন, এমন মানুষই অ্যাজাইটির শিকার হন। অর্থাৎ অনিশ্চয়তা, ভয়, দুশ্চিন্তা বাড়তে বাড়তে অতিরিক্ত উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। শহরে থাকা শ্বেতাঙ্গ মেয়ে যাঁদের বয়স কুড়ি থেকে তিরিশের ভেতরে, তাঁদেরও মনোরোগের সম্ভাবনা থাকে। অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার থেকে একটি মেয়ে হয়তো ১৮/১৯ বছর বয়স থেকেই ভ্যালিয়াম ধরনের ওষুধ, ড্রাগ ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। কুড়ি, পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর মানসিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যা ডিপ্রেশনেরই নামান্তর। তবে ওই যে ১৪%, তার মধ্যেও ৮৯%-ই হচ্ছে স্কিৎজোফ্রেনিয়া আর ম্যানিক ডিপ্রেশনের রোগী। চিকিৎসকদের মতে—শেষের রোগ দুটি

দুরারোগ্য ব্যাধি। বাদ বাকি ডিজঅর্ডারগুলিকে সারিয়ে তোলা কোনও সমস্যাই নয়।

তিন বছর আগে ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের নির্দেশে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান থেকে সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজ অ্যান্ড সাইকিয়্যাট্রিক ডিজঅর্ডারের ওপর এই সমীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। মোট ৩৪টি স্টেটে ৮,০৯৮ জন নাগরিক এ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। '৯৩ সালে এদেশে মেজর ডিপ্রেশনের জন্যে শতকরা দশজন, অ্যালকোহল আসক্তির জন্যে ৭.২% লোক, ড্রাগ ডিপেনডেন্সের জন্যে ২.৮% লোক, প্যানিক ডিজঅর্ডারের জন্যে ২.৩% এবং স্কিৎজোফ্রেনিয়া ও অন্যান্য মনোরোগের জন্যে ০.৩% লোক চিকিৎসা করিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে ডিপ্রেশন ও মুড-ডিজঅর্ডার হয়েছে মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২৪ জনের। পুরুষের ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ জনের। অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার হয়েছে মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩১ জনের পুরুষের ক্ষেত্রে শতকরা ১৯ জনের। তবে পুরুষ নেশার ব্যাপারে অনেক এগিয়ে আছেন। ড্রাগ ও অ্যালকোহল আসক্তির ক্ষেত্রে (অবশ্য সারা জীবনে মাত্র একবারের ঘটনাকেও সমীক্ষায় ধরা হয়েছে) শতকরা ৩৫ জন। তুলনায় মেয়েদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন কোনও না কোনও সময় ওই ধরনের আসক্তির শিকার হয়েছেন। এছাড়া পুরুষ এগিয়ে আছেন সমাজবিরোধী মনোভাবে। অ্যান্টি-সোশ্যাল পার্সোনালিটি, পারসিসটেনট ক্রিমিনাল, ডেসট্রাকটিভ বিহেভিয়ার ইত্যাদিও মনোরোগ। পুরুষের মধ্যে ৫% আর মেয়েদের মধ্যে শতকরা ১% ধরা পড়েছে।

এদেশে ডিপ্রেশনের লক্ষণ সাধারণত ২৫-৩০ বছর বয়সী লোকজনদের মধ্যেই দেখা যায়। স্বল্পশিক্ষা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যত-এর অন্যতম কারণ। ড্রাগ ও অ্যালকোহলের ভূমিকাও আছে। অথচ কালো সমাজে মনোরোগের প্রভাব মোটেই প্রবল নয়। ডিপ্রেশন, অথবা মুড-ডিজঅর্ডার জাতীয় অসুস্থতার উদাহরণ তাদের মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগেরও কম। তবে মনোবিজ্ঞানীরা এই তথ্যকে সমর্থন করছেন না। মানসিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও যদি চিকিৎসকের কাছে না যাওয়া হয়, তবে সেই সব রোগীদের সংখ্যা কোনও হিসেবের মধ্যে আনা সম্ভব নয়। শ্বেতাঙ্গ সমাজে আর্থিক সচ্ছলতার কারণে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে বেশি। তাই কেসগুলি জানা যাচ্ছে। আরও একটি সম্ভাব্য কারণ হল—অতিরিক্ত প্রত্যাশা, তীব্র প্রতিযোগী মনোভাব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সামাজিক ভাবমূর্তি রক্ষা, সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে শ্বেতাঙ্গ সমাজ অনেক বেশি সচেতন। যে কারণে প্রতিকূল অভিজ্ঞতায় মানসিক চাপও দুর্বহ হয়ে ওঠে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা, মনোবেদনা থেকে বিষণ্ণতা রোগে অসুস্থ হন। হয়তো ট্র্যাংকুলাইজার অথবা অ্যালকোহলের ওপর নির্ভরশীলতা শুরু হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা মানসিক চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে ওষুধপত্র ও থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এই বিশদ তথ্য সংগ্রহের পরেও রোমা ভার্মার ম্যানিক ডিপ্রেশনের কারণ সম্পর্কে চিকিৎসকরা কী বলেছিলেন, প্রোজ্যাক ব্যবহার করা সত্ত্বেও কেন তার বিষাদ দূর হল না, পারিবারিক স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত মেধাবী সেই মেয়ে কেন-ই বা আত্মহননের পথ বেছে নিল—সেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। কলম্বিয়া প্রেসবিটেরিয়ান হসপিট্যালে তার অটপসি হয়েছিল। মরিস টাউনে ফিউন্যারাল। ভারতীয় ছেলেমেয়েরা অনেকেই গিয়েছিল। আমাদের কাশ্মীরি বন্ধুরা বলেছিলেন—ভার্মাদের মতো এমন লাভিং পেরেন্টস মেয়ের

ওপর কখনও কোনও প্রেশার ক্রিয়েট করতেন না।...শেষবার ক্রিসমাসের সময় এসে মাকে বলেছিল 'আমাকে নিয়ে আর বেশি চিন্তা কোরো না"...বরং বেশ খুশি খুশি ভাব নিয়েই ফিরে গিয়েছিল।

তারপর? সহসা দেখিল কোন ভূত?... অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল...। এয়ার ইন্ডিয়ায় বই হাতে নিয়ে বসে আছে, সুন্দর, বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক সেই মুখ—মনে পড়ে।

১৯ নভেম্বর ১৯৯৪

কথা নয়, শুধু ধ্যান

ডক্টর যাদুগোপাল আর রয়্যাল এয়ারে চড়বেন না ঠিক করেছেন। বাঙালি সহযাত্রীর ভয়ে 'রয়্যাল জর্ডন' আর 'কে এল এম রয়্যাল ডাচেস'—দুইই তাঁর কাছে ভয়াল হয়ে উঠেছে। কারণ—কথার নদী আর সুটকেসের পাহাড়। সহযাত্রীদের এই অসহনীয় ভূগোল তাঁর ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট করছে। নিউ ইয়র্ক থেকে কলকাতা পর্যন্ত, বিশেষ করে আমান কিংবা অ্যামস্টারড্যামের ট্রানজিট লাউঞ্জে 'বাংগালির বাসী মুখে হাসাহাসি আর অনর্গল বাইক্যস্রোত যাদুগোপালের মাথা ধরিয়ে দেয়।

এর ওপর আছে উটকো দায়িত্বের ঝামেলা। পথে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা গছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এক এক জন লোক বেশ তৈরি থাকে। কেউ কলকাতা যাচ্ছে খবর পেলেই হল। হয় বউ, বাচ্চা, নয়তো দেশ থেকে বেড়াতে আসা বুড়ো বাবা, মাকে তার ভরসায় প্লেনে চাপিয়ে দেবে। এদিকে নিজে হাওয়া! মাঝখান থেকে যাদুগোপালের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তিনি তখন বাধ্য হয়ে ছড়িদার হন। প্লেনে ফাঁকা সিট পেলেও চক্ষুলজ্জায় শুয়ে পড়তে পারবেন না। সঙ্গের 'সাথী'দের হাসিমুখে 'শয়ন' দিতে হবে। বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই জানলার ধারে বসতে চায়। যাদুগোপালের গা ঘেঁষটে বসতে হবে বলে মহিলারাও মাঝের সিটটা টপকে যায়। যাদু সব বোঝেন। তারা ওভারহেড কম্পার্টমেন্ট খুলে, ডিঙি মেরে ডালা বন্ধ করতে পারে না। যাদুর দিকে হেসে তাকায়। যাদুর হাইট পাঁচ ফুট চার। তাঁকেও ভজ গৌরাঙ্গ স্টাইলে দু'হাত তুলে ডালা বন্ধ করতে হয়। জানলার সিটে বসেও কি কেউ স্থিতধী থাকে? যাদুর ঘুম চটকে দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে বাথরুমে যায়। এইসব অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনায় বিরক্ত হওয়া উচিত নয় বুঝেও যাদুর রাগ হয়। আসলে তিনি একা ট্রাভেল করতে পছন্দ করেন। প্লেনের দীর্ঘ যাত্রার সারা পথ আপন মনে থাকতে চান। যাদুর বউ যেবার সঙ্গে যান, তখনও বিশেষ ঝামেলা বাড়ান না। স্বামীর স্বভাব জানেন বলে 'ম্যায় চুপ রহুঙ্গি' স্টাইলে সারা পথ মটকা মেরে পড়ে থাকেন।

কিন্তু সব সময় তো আর এমন সৌভাগ্য হয় না। ডক্টর যাদুগোপালকে প্রায় প্রায়ই দেশে যেতে হয়। নামকরা বিজ্ঞানী। অনবরত সেমিনার, লেকচার ট্যুর, কনফারেন্স। নেমন্তন্ন এড়াতে পারেন না। আর, ঠিক যাবার মুখেই সহযাত্রী জুটে যায়। দলে বুড়ো মানুষ আর

কুচো কাচা থাকলে যাদুগোপাল তো আর এড়িয়ে যেতে পারেন না। প্লেনে উঠে কাছাকাছি বসতেও হয়। কিছুক্ষণ কথা সরিৎ সাগর। তারপর এঁকে বেঁকে আধোঘুম। মাঝে মাঝে চটকা ভেঙে বকর বকর। যাদুগোপাল মনে মনে গাইতে গাইতে যান। এত ডিসটারবেন্স হয়। একবার গাইছিলেন—'যাত্রী আমি, ওরে যাত্রী আমি...,' হঠাৎ ফাটা গলায় এক বৃদ্ধার প্রশ্ন—'কর্ডলেস ফোন নিয়ে যাচ্ছি। ধরবে না তো?' স্বরভঙ্গের মাঝে সুরভঙ্গ। যাদুগোপাল চোখ খুলে উত্তর দিলেন—'আপনারে ডিক্লেয়ার করতে হবে। রেড চ্যানেলে দারাইতে হবে...।'

বৃদ্ধা হাই তুলে বললেন—'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গেই তো দাঁড়াব।'

এইগুলোই যাদুগোপালের ঝামেলা মনে হয়। তিনি এমন কিছু জিনিস নেননি যে কাস্টমসে ডিউটি চাইতে পারে। দেশের লোকের জন্যে মাইক্রোওয়েভ কিংবা ল্যাপটপ কমপিউটার নিতে তিনি রাজি হন না। একটাই কারণ যে, কাস্টমসের ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে। অথচ এই বৃদ্ধার ছেলে মাকে কর্ডলেস ফোন দিয়েছে। তার মানে যাদুগোপালের আর দমদমে নেমে গ্রিন চ্যানেল ধরা হবে না। বৃদ্ধার ফোন বগলে নিয়ে রেড চ্যানেলে ঢুকে বিস্তর সময় নষ্ট করতে হবে। 'যাত্রী আমি, ওরে যাত্রী আমি', গাইবেন কি, মুডটাই চলে গেল।

এরপর দমদমে পৌঁছে দলবল নিয়ে ইমিগ্রেশনের ঝক্কি। ঘুরন্ত স্যুটকেস আবিষ্কার। যাদুগোপালের নিজের ওজন একশো একচল্লিশ পাউন্ড। অথচ মাল টানতে হচ্ছে তার পাঁচগুণ। বেঁটে পর্দা ভেদ করে রাশি রাশি সুটকেস ঢুকে পড়ছে। দমাদ্দম শব্দে নেচে নেচে লাট খেতে খেতে আসছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যান্ডেল ধরে নামানো আর জড় করা। যাদুগোপালের দৃঢ় ধারণা—পরের মাল টেনে টেনেই তাঁর হার্নিয়া হয়েছিল। এখন সার্জারির পরেও রেহাই নেই। বুড়ো মানুষদের তো আর মাল নামাতে বলা যায় না। বাচ্চা কাচ্চা, যুবতী, কাউকেই নয়। সে শিক্ষা যাদু পাননি। ফলে চক্ষুলজ্জার জন্যে নিজেরা যা মুটেগিরির শিক্ষা হচ্ছে, সে আর বলার নয়। নীরব ভ্রমণের সুখ তো আগেই গেছে।

যাই হোক, এ লেখার উদ্দেশ্য মৌনতার উপকারিতা। শব্দদূষণ, বাক্যদূষণে অতিষ্ঠ হয়ে যারা নাকি নৈঃশব্দের সন্ধানে যায়, তাদের দেহ মনের প্রভূত উপকার হয়ে থাকে। নির্জনে ধ্যান আর মনে মনে গানও হচ্ছে অপূর্ব থেরাপি। আর একটি উপায় হচ্ছে—কোনও প্রিয় স্মৃতিচারণে মগ্ন থাকা। এমন কোনও মধুর ভাবনা বা প্রিয় অনুষঙ্গে মনকে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হবে, যা শান্তভাব সৃষ্টি করে।

শিকাগোর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর ডেবরা ক্ল্যামেন এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ওই মহিলা সেখানে 'স্ট্রেস রিডাকশন' অর্থাৎ মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমানোর বিষয়ে পড়ান। ক্ল্যামেন প্রতিদিন কাজের ফাঁকে একটু অবসর নিয়ে একটি সাদা আরবি ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে আসেন। দিনের মধ্যে মোট পনেরোবার এই চাপড়ানি চলে। কিন্তু প্রতিবার মাত্র আধ মিনিট করে।

ভাবছেন কলেজ ক্যাম্পাসে কিংবা ডাক্তারের অফিসে তিনি সাদা আরবি ঘোড়া

রাখছেন কোথায়? আসলে তা নয়। এ হচ্ছে স্মৃতির ঘোড়া রোগ বা ঘোড়া চিকিৎসা। ডেবরা ক্ল্যামেন ছোটবেলায় ইলিনয়ের ডিকাসনে থাকতেন। তাঁদের নিজস্ব একটি ঘোড়া ছিল। সাদা আরবি ঘোড়া। নাম জেট। টিন-এজার বয়সে জেট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। রোজ তার পিঠে চড়তেন। চাপড়ে চাপড়ে আদর করতেন। সেই স্মৃতি এখনও তাঁকে আনন্দ দেয়। ক্ল্যামেন এই অনুভূতিকে নিজের রি-ল্যাক্সেশন অর্থাৎ মানসিক চাপ মুক্ত করার কাজে প্রয়োগ করে দেখেছেন যখনই পরিশ্রান্ত মনে হত, তিনি চোখ বন্ধ করে একটি দৃশ্য কল্পনা করতেন। বিশাল উন্মুক্ত পরিবেশে তিনি যেন ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। মৃদু মৃদু চাপড় দিচ্ছেন। এই কল্পনা করে তাঁর মন প্রসন্ন হত। ক্রমশ-ক্রমশ তিনি ঘোড়ার ধ্যান বাড়িয়ে দিলেন। এখন প্রতিদিন মোট পনেরো বার এই 'নিভৃত চিন্তা' ক্ল্যামেনকে উদ্বেগমুক্ত হতে সাহায্য করে। 'স্ট্রেসে'র পরিমাপ অনুযায়ী তিনি কখনই এক থেকে দশ পর্যন্ত বাড়তে দেন না। তিনের কাছাকাছি এলেই কাজ বন্ধ করে ঘোড়ার ধ্যানে বসে যান। স্বপ্নের 'জেট' আবার তাঁর মনকে সেট করে দেয়।

এ ধরনের মেডিটেশনকে বলে গাইডেড ইমেজারি। সারা আমেরিকায় বিভিন্ন শহরে ক্ল্যামেন সেমিনারে যান। ডাক্তার আর ডাক্তারি ছাত্রদের এই প্রক্রিয়া শেখান।

ইদানীং অনেক ডাক্তারই বলছেন—সব সময় শব্দ আর কথার মধ্যে বসে না থেকে, কিছুক্ষণ কোনও একটি ভাবনার মধ্যে আচ্ছন্ন থাকা ভাল। দেহ, মনের বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হন। ডক্টর ডেবরা ক্ল্যামেন দশ বছর ধরে এ নিয়ে ওয়ার্কশপ করছেন। তিনি কিন্তু প্রথমেই বলেন না যে নির্জনে বসে কিছু চিন্তা করো। বলেন—যখন ঘরে বাইরে নানা চাপ থাকে, মানুষের টেনশন, স্ট্রেস বাড়তে বাড়তে তুঙ্গে উঠে যায়। ওই অবস্থা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এ জন্যে মনকে ভারমুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। সম্ভব হলে এমন একটি জায়গা বেছে নিতে হবে, যেখানে একা বসে দু'দণ্ড বিশ্রাম করা যায়। নিজের মধ্যে মগ্ন থাকার মতো উপযুক্ত পরিবেশ কোথায় পাওয়া যায়? দেখা গেছে, অধিকাংশ লোকই এ ক্ষেত্রে নির্জনতা বেছে নিয়েছেন। ফাঁকা জায়গা, লেক, পার্ক, নয়তো সমুদ্রের ধারে একান্তে কিছু সময় বসে থাকছেন। এরা কেউই কিন্তু লোকজন, হট্টগোল, কিংবা গান বাজনার শব্দের মধ্যে গিয়ে বসছেন না। নিঃস্তব্ধ পরিবেশে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করতে চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে সমুদ্রের গর্জন কিংবা পাখির ডাক কোনও অবাঞ্ছিত শব্দ সৃষ্টি করছে না। নৈসর্গিক শোভা আর নীরবতা মনকে বিশ্রাম দেয়। এক ধরনের সখানুভূতি সৃষ্টি করে। স্ট্রেস দূর করার জন্যে 'সাময়িক মৌনতা অবলম্বন'—এই প্রক্রিয়া অনেক ডাক্তারই সমর্থন করে থাকেন। মনকে উদ্বেগ শূন্য রাখা এবং কিছুক্ষণ সব কাজ থেকে বিরত রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকারি। ক্রমশ এই 'বিরতি'কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকায় বিজ্ঞানীরা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশা বা ব্যবসায় জড়িত সংস্থাগুলিও জানাচ্ছে—প্রাচীনকালের বৌদ্ধ সাধনায় এবং মঠ ও উপাসনালয়ে যুগ যুগ ধরে যে ধ্যান, ও মৌনব্রতের অনুশীলন চলে এসেছে, সুস্থ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তার কোনও অবদান আছে।

গত বছর 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনে'র মেডিকেল জার্নালে এ বিষয়ে লিখেছিল

যে—ট্রান্সডেন্টাল মেডিটেশনের সাহায্যে হাই ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। হাইপারটেনশন কমাতে বাজারে যে ওষুধগুলি পাওয়া যায়, তার তুলনায় মেডিটেশনের ক্ষমতাও কম নয়। অবশ্য যদি ভালভাবে অনুশীলন করা যায়। এই চিকিৎসার কোনও অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই। তবে এটি হচ্ছে একটি 'স্টাডি'র ফলাফল। ট্র্যান্সডেন্টাল মেডিটেশন সম্পর্কে আস্থা থাকলেও বিনা ওষুধে হাইপারটেশন নিয়ন্ত্রণে থাকবে—এ কথা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন না।

ক্যালিফোর্নিয়ায় 'ওয়েস্ট ওক্‌ল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারে'ও এরকম স্টাডি হয়েছে। সেখানে একদল লোককে নিয়ম করে ধ্যানে বসানো হয়েছিল। একেক জনের একেক উপসর্গ। প্রচণ্ড মোটা, অতিরিক্ত নুন দেওয়া খাবার খেতে অভ্যস্ত, ভীষণ মদ্যপান করে আর সিগারেট খায় কিংবা এতসব সমস্যা নিয়েও কোনও ব্যায়াম করে না, চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে বসে কাটায়—এরকম লোকেদের তো হার্টের রোগ হতেই পারে। এইসব ঝুঁকিসম্পন্ন লোকেদের রোজ দু'বেলা কুড়ি মিনিট করে ধ্যানে বসিয়ে দেওয়া হল। চোখ বন্ধ করে বসে খুব মন দিয়ে একটি মন্ত্র শুনতে হবে। আসলে মৃদু স্বরে ওঁ শব্দ শোনানো হচ্ছিল। বেশ কিছুদিন এই ধ্যানে যোগ দেওয়ার পরে, তাদের ওই উপসর্গগুলি কমে আসতে শুরু করল। এ জন্যে শরীর ও মনের পক্ষে ক্ষতিকর অভ্যাস বা নেশা দূর করার প্রয়োজনে মেডিটেশনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর হারবার্ট জনসন তাঁর 'রিল্যাক্সেশন রেসপন্স' পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায় এরকমই প্রমাণ দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রেও একজন লোক প্রতিদিন দু'বেলা একটি সুন্দর কথাকে (যা তার মনকে তৃপ্তি দেয়) নিয়ে একমনে চিন্তা করতে বসে। ওই বিশেষ কথাটির ওপর তার মনোযোগ সন্নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করে। নিয়মিত অভ্যাসে ক্রমশ একাগ্রতা আসে। ডক্টর জনসন বলেছেন—পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেছে, সে সময় যদি অন্য সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে মন থেকে একেবারে সরিয়ে রাখা যায়, তবে শরীরেও বেশ কিছু পরিবর্তন প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে এই জাতীয় একাগ্রতা ও অন্যান্য চিন্তা দূরে রাখার অভ্যাস করলে শরীরে তার সুফল পাওয়া সম্ভব। এ একেবারে পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত সত্য। কোনও অনুমান নির্ভর অভিমত নয়। ডক্টর বেনসন এ সম্পর্কে বই লিখেছেন। সেই বই-এর খুবই চাহিদা। কেননা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এখন বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু নির্জনে বসে ধ্যান করার মতো এত সময়ই বা কোথায়? আর, নির্জনতাই কি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়? ম্যাসাচুসেটস-এ 'ইনসাইট মেডিটেশন সোসাইটি সেন্টারে' প্রতি ছুটির দিনে এরকম অনুশীলন হয়। ক্লাসের নাম 'ইনটেনসিভ সাইলেন্ট রিট্রিট'। পরিচালিকা শ্যারন সলজবার্গ। সেখানকার পরিবেশই অন্যরকম। আশ্রমের মত না হলেও ধ্যানের জন্যে নির্দিষ্ট বাগান, ছোট ছোট ঘরও আছে। কিন্তু বড় বড় শহরে এত ফাঁকা জায়গা নেই। থাকলেও ইচ্ছেমত, নিজের সুবিধে অনুযায়ী সময় বার করা শক্ত। কিন্তু নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা আর লোকজনের ভিড় সত্ত্বেও ধ্যানের সময় খুঁজে নিতে হয়। তবে এ মেডিটেশনের পদ্ধতি অন্যরকম। এর নাম—'লাভিং কাইন্ডনেস মেডিটেশন।' পথে, ঘাটে, দোকানে, বাজারে, ট্রামে, বাসে এমনকি এলিভেটরে চড়েও এই ভালবাসাবাসি মেশানো ধ্যান শুরু করা যায়। আসল কথা হচ্ছে যানজটের ঝঞ্ঝাটে পড়েও ধৈর্য রাখা। মনে করুন কোথাও

লম্বা লাইনের পেছনে পড়ে আছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তি ধরে যাচ্ছে। অন্য কাজ পড়ে আছে। অথচ লাইন এগোচ্ছে না। আশপাশ থেকে লোক ঢুকে পড়ছে। না, মেজাজ গরম করবেন না। নীরবে ভালবাসতে থাকবেন। মুদির দোকানে বেজায় ভিড়। দোকানি নিড়বিড় করছে। কিংবা পাত্তা দিচ্ছে না। আপনি ওই লাভিং কাইন্ডনেস মেডিটেশন চালিয়ে যাবেন। একদম চুপ করে থেকে মনে মনে মুদি ও ভিড় করে থাকা ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে গাইবেন—আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি...আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি...হাতে টিন...চিনি চিনি...কেরোসিন চিনি টিনি...মনে মনে ফর্দ যে লিখেছি...ব্যস! প্রসন্নতায় মন ভরে যাবে।

এ পরামর্শ কিন্তু আমি দিচ্ছি না। মেডিটেশনের সপক্ষের মনোবিজ্ঞানীরা 'থটস্ অফ ফ্রেন্ডশিপ'-এর শক্তির কথা বলছেন। ব্যাঙ্কের ক্লার্ক থেকে শুরু করে হাসপাতালের আউটডোরের ডাক্তার, নার্স প্রত্যেককে বন্ধু ভেবে নিতে হবে। তাহলে আর রাগ হবে না। সব অপেক্ষাই তখন মধুর প্রতীক্ষার মতো মনে হবে। ধ্যানের এমনই মহিমা। এক মেডিটেশন স্পেশালিস্ট আবার বৌদ্ধধর্মের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—'বুঢ়া (সিদ্ধার্থা গাউটামা ইন দ্য সিকসথ সেনচুরি বি. সি.) টট দিস্ মেডিটেশন অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিডোট টু ফিয়ার।' সুতরাং বন্ধুত্ব ও ভালবাসা দিয়ে ভয়কে জয় করুন।

আমেরিকায় 'প্রাণায়াম' এখন রিল্যাক্সেশন টেকনিকের অন্যতম প্রধান পদ্ধতি। বিভিন্ন 'ইয়োগো সেন্টারে' ব্রিদিং মেডিটেশনও শেখায়।

নীরবতার জন্য যে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দরকার, আমরা নিজেরাই তা হারিয়েছি। হয়তো কথা বলছি না অনেকক্ষণ। কিন্তু সে অন্য কারণে। রেডিও, টিভি, কম্পিউটার নিয়ে বসে আছি। কথা বলার দরকারই হচ্ছে না। শোনারও ইচ্ছে নেই। টিভি-র মতো এমন বন্ধু আর কে আছে? কখনও বা 'জননী', কখনও বা নাচ গান, কথামালার শেষ আছে? সুতরাং এ আপনার মৌনব্রত নয়। নিঃশব্দে আত্মমগ্ন হয়ে বসে থাকা নয়।

এদেশে অধিকাংশ লোকই গত বত্রিশ বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে একঘণ্টা করে বাড়তি ছুটি ভোগ করছে। অর্থাৎ কাজের সময় সামান্য কমিয়ে দেওয়াতে '৬৫ সাল থেকে এই বাড়তি সময় লাভ হয়েছে। কিন্তু হলে কী হবে? টিভি দেখার উৎসাহ আর সময় বেড়ে গেছে। বাগানে কিংবা বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকার বদলে বরং টিভিতে একটা পুরনো শো দেখে নেওয়া যায়। তার মানে সব সময় কিছু দেখা, শোনা বা বলা চাই।

ডিউক ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলের ডক্টর রেডফোর্ড উইলিয়ামস বলেছেন—নীরবতার জন্য একা থাকারও দরকার নেই। আসল কাজ হবে অন্যকে কথা বলতে দিয়ে নিজে শুধু শুনে যাওয়া। এও অভ্যাস সাপেক্ষ কঠিন কাজ। বক্তিয়ার খিলজিদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু নিজেকে বক্তার ভূমিকা থেকে মাঝে মাঝে সরিয়ে নিয়ে, নীরব শ্রোতা হতে পারলে ওই যে অনাস্বদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা হবে, তাতেই মনে প্রসন্নতা আসবে। আয়ু বেড়ে যাবে। কথায় বলে না, বেশি কথায় আয়ু ক্ষয় হয়? ডক্টর উইলিয়ামস বলেছেন—গবেষণা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেছে উদ্ধত এবং অধৈর্য প্রকৃতির লোকেদের পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে যে কোনও বড় রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা চার থেকে সাতগুণ বেশি

থাকে। এ ধরনের বদমেজাজি লোকেরা কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। আলাপ, আলোচনার মধ্যে অনবরত বাধা দিতে থাকে। নিজেদের প্রতি মুহূর্তেই ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত মনে করে। আরও রেগে ওঠে এবং শুধু নিজে তর্ক চালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কারুর কথা শোনার মতো সহিষ্ণুতা নেই। এদেরই কথা বলা কমানো দরকার। কেননা অযথা মেজাজ খারাপ করার ফলে শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয়।

ডক্টর যাদুগোপাল অবশ্য এ ধরনের মানুষ নন। শান্তিপ্রিয়, রসিক প্রকৃতির এই পণ্ডিত লোকটি নিজের মনে থাকতে ভালবাসেন। লাগাতার বক্তা অথবা শ্রোতা—কিছুই হতে চান না। বিশেষ করে প্লেনে উঠে একটু একাকিত্ব আশা করেন। যাদুগোপালকে ওই 'লাভিং কাইন্ডনেস মেডিটেশনের' পরামর্শ দিতে গিয়েছিলাম। সহযাত্রীদের বয়স বুঝে মাতা, কন্যা, প্রেমিকা ইত্যাদি ভেবে নিয়ে সারা পথ মনে মনে ভালবাসতে বাসতে যাওয়া। তাহলে জানলার সিট ছেড়ে দিতে কষ্ট হবে না। মাঝের সিটে গা ঘেঁষে বসে শিহরন জাগবে। দমদমে মাল নামাতে নামাতে মনে হবে—তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার...

কিন্তু যাদুগোপাল বললেন, তাঁর ধ্যানের উপযুক্ত 'ক্যান্ডিডেট'রা কোনও যাত্রাতেই তাঁর মুখাপেক্ষী হন না। একবারও শরণ নেন না। সেই সব মহিলাদের জন্যে যাদুগোপাল আর কোন জানলার সিট ছেড়ে দেবেন? পাশে বসে মনে মনে গান আর ধ্যান—আজ পর্যন্ত সে মেডিটেশন আর হল না।

কিন্তু বাঙালি সহযাত্রী পছন্দ হয় না বলে যাদুগোপাল কি সত্যি সত্যি 'কে এল এম' আর 'রয়্যাল জর্ডন'-এর ফ্লাইট নেবেন না? তাহলে কী ভাবে কলকাতায় যাবেন? ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে? সেখানেও তো বাঙালি প্যাসেঞ্জার অনেক থাকে। কলকাতার ফ্লাইটে বাঙালি থাকবেন না, এ হয় নাকি?

যাদুগোপাল খুক খুক করে হাসলেন—'আপনাগো কইলকাতা আর বাংগালির নাই। বম্বে থিক্যা তো ডোমেস্টিক ফ্লাইটে গ্যালাম। পাশে সব মানদ্রাজি আর গুজরাটি। মাউড়াও সিল। ওইগুলিই ভাল। আমারে চিনেও না। কথাও কয় না। কাগজ পড়ে। ব্রিফ কেস খুইল্যা কী সব দ্যাখে। তারপর ঘুমায়।'

'—আর আপনি? সারাক্ষণ মনে মনে গান গাইলেন?'

—'হ্যাঁ। মহাসিন্ধুর ওপার হতে ধরসিলাম।'

১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

অথ মার্জার কথা

দেশে থাকতে কুকুরের আঁচড়, কামড় এবং প্রভূত আদর যে ভাবে আমার ওপর বর্ষিত হয়েছিল, বেড়ালের বেলায় তার বিন্দুমাত্রও নয়। এখনও চোখ বন্ধ করলে অন্তত কুড়ি, পঁচিশটা পোষা কুকুরের ল্যাজ নাড়া দেখতে পাই। নাম ধাম বলে দিতে পারি। আমাদের আত্মীয় মহলে সারমেয়প্রীতি ছিল প্রবল। সেই সব ল্যাজ বিশিষ্ট টম, জিম ল্যাসি, মিকি আর ল্যাজ কাটা গামা, বাহাদুর, ডিংকি, বাঘাদের আমার বিলক্ষণ মনে পড়ে। পাড়ার ঘিয়ে ভাজাদেরও কদাচিৎ স্মরণ করি। অথচ কুকুরের সেই দীর্ঘ ছায়া মিছিলের বাইরে এ মুহূর্তে শুধু পাশের বাড়ির বেড়াল 'হরিদাসী'কেই মনে করতে পারছি।

তেজস্বিনী এবং খাদ্য রসিক হরিদাসী আমাদের ভীষণ আপত্তি এবং উপেক্ষা সত্ত্বেও যখন তখন এসে উদয় হত। তারপর খাবার টেবিলের নীচে জায়গা দখল নিয়ে আমাদের কুকুরের সঙ্গে ধুমোধুমি লড়াই। সেই মহাপ্রলয়ের হুঙ্কার, শাসানি, আঁচড়, কামড়, ঝুটোপুটির ফলে বিশাল দেহ কুকুর অবধারিতভাবে পর্যুদস্ত হত।

আমেরিকায় এসেও মার্জার সমাজ থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে চেয়েছি। তবু ইচ্ছের বিরুদ্ধেও কিছু কিছু মোলাকাত এড়াতে পারিনি। আগে ডেলাওয়্যারে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মাঝে মাঝে রাত্রে থেকে যেতাম। আজকাল সে পাট তুলে দিয়েছি। কারণ ওই হরিদাসী মার্কা বেড়াল। তার ডাক নাম সুইটি। ভাল নাম ইসাবেলা গাঙ্গুলি। স্পেনের রানি ইসাবেলার চোখের মণির মতো নাকি বেড়ালটার চোখের রং। সেই কপিশ চাউনি সর্বক্ষণ আপনার অন্তর ভেদ করে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ সোফায় শুয়ে শুয়ে এমন গা ঝাড়া দেবে যে আপনার প্লেটের রসগোল্লা লোমের পলেস্তারা মেখে নিমেষে বুড়ির চুল। সবচেয়ে বিপদ, রাত বাড়লেই ইসাবেলের খবরদারি বাড়ে। এমন নির্ঘুম মেনি বেড়াল জীবনে দেখিনি। সারারাত আপনার শোবার ঘরের সামনে আড়ি পেতে বসে আছে। বাথরুমে যাবার জন্যে উঠেছেন কি মরেছেন! তার ল্যাজে, পায়ে জড়িয়ে একশা কাণ্ড। বাথরুমে যে একসঙ্গে দুজন ঢুকতে নেই, এমন বেসিক ট্রেনিংও তার নেই। নানা কসরত করে বাইরে বসাতে হয়। আবার ঘরে ফেরার সময় দেখবেন আগে ভাগে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে আছে। স্পেনের রানি তখন অঙ্কশায়িনী হবার তালে। তাকে পালঙ্কচ্যুত করে কার সাধ্য? ইসাবেলা গাঙ্গুলির লোমশ দেহ এবং সবুজ চাউনি সহ হুমদা মুখ মোটেই আমাদের কাছে গাঙ্গুলি বাড়ির ভাষা অনুযায়ী 'সুইটি' বলে মনে হয় না। তার ওপর সারারাত চৌকিদারি। ইসাবেলার মোকাবিলা আর পোষায় না বলে নানা ছুতো দেখিয়ে ডেলাওয়্যারে রাত্রিবাস বন্ধ করেছি।

কিন্তু বিল্লি নেহি ছোড়তি। বহুকাল আগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক বেড়াল ছানা জুটে গিয়েছিল। ঝোপের মধ্যে কোন মেনি বেড়ালের বেজায় প্রসব বেদনা উঠেছে দেখে পাড়ার এক বুড়ি তাকে মদত দিতে গিয়েছিল। মেনির প্রাইভেসির জন্যে কার্ডবোর্ড দিয়ে 'লেবার রুম' ঘিরতে ব্যস্ত। মজা দেখতে ছোটদের ভিড় জমে গেল। আমার মেয়েকে খেলার মাঠ থেকে বাড়িতে আনে কার সাধ্য? বেড়ালের অনেক বেবি হচ্ছে শুনে মহা উত্তেজনায় দৌড়

লাগিয়েছ। ধরে বেঁধে বাড়ি আনতে হল।

তারপর যথারীতি বেড়াল ছানাদের চোখ ফুটতেই তারা চরে বেড়াতে লাগল। কীভাবে যে একটা বাচ্চা বাগানের ইটের বার বি কিউ উনুনের তলায় সেঁধিয়ে গেল কে জানে? তার মধ্যে ঝমাঝম বৃষ্টি। মেনির কোনও পাত্তা নেই। এদিকে ছানারা কেঁদে কেঁদে হয়রান হচ্ছে। শেষে মেয়ে তাকে ঘাড়ে করে বাড়ি নিয়ে হাজির। আমি 'হরিদাসী সিনড্রোমে' ভুগি। তবু অত ছোট্ট প্রাণীটার ওপর নিষ্ঠুর হওয়া গেল না। দিনকতক গ্যারাজেই বিছানাপত্র করে তাকে শোয়ানো হল। আর দুধের জোগান তো দিতেই হত। খবর পেয়ে পাড়ার বাচ্চাদের আনাগোনা বেড়ে গেল। শুনলাম বেড়ালের নাম রাখা হয়েছে রকি। কে একটা ছোট্ট বল উপহার দিয়ে গেল। তাই নিয়ে বেড়ালের কী খেলা। আমার কেমন সন্দেহ হল রকি এ বাড়িতেই মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসছে। তখনই হরিদাসী আর ইসাবেলার জ্বালাতন মনে পড়ল। মেয়েকে বোঝালাম বেড়াল ছানাকে বিদায় করতে হবে। বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হল। আমার হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা নিয়ে পাড়ার শিশুমহলে ঘোর বিষাদের ছায়া। কিন্তু আমি কোনওমতে নরম হচ্ছি না। এরকম দিন আমাদের ছোটবেলাতে কম গেছে নাকি? শীতকালে ফুটপাথে যত নেড়ি কুকুর জন্মাত, তাদের সেই মায়াময় চাউনি আর টিকটিক করে ল্যাজ নাড়া দেখেও গুরুজনরা কখনই আমাদের মতো দ্রবীভূত হতেন না। দু'চারদিন চটের বিছানায় শুইয়ে আর টিনের ক্যাপস্ট্যান সিগারেটের কৌটোর ভেতরে দুধ ঢেলে খাওয়ানোর পরেই তাদের খেদিয়ে দিতে হত বলে আমরা কি কম কান্নাকাটি করেছি সে সময়? মেয়েকে সেই সব উদাহরণ শোনালাম। কিন্তু তাতেও ফল ভাল হচ্ছে না দেখে আর রকির দৌরাত্ম্য বাড়ছে লক্ষ করে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়তে হল। বাড়িতে তখন একটা বদরিকা পাখি পুষেছিলাম। এদেশে তাকে প্যারাকিট বলে। রকি যে চিরকাল তুলতুলে বেড়াল ছানা হয়ে থাকবে না আর সুযোগ পেলেই ফাঁকা বাড়িতে নিরীহ পাখিটার ঘাড় মটকাবে এই সাংঘাতিক সম্ভাবনা আভাস দিতে মেয়ে নিরস্ত হল।

কিন্তু বেড়াল খেদানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। গ্যারাজে ছোটদের সভা বসে গেল। রকির ভবিষ্যৎ নিয়ে পাড়ার বাচ্চাদের ভীষণ দুশ্চিন্তা। বাস্তুহারা হবে বলেই বোধহয়! শেষ পর্যন্ত অ্যানথনি রায়ান নামে পাকা ছেলেটা ঠিক করল রকির ভার সেই নেবে। কারণ তাদের বাড়িতে দাদু খুব দয়ালু মানুষ আর সব সময়ই বাড়িতে থাকেন। তবে মাকে না জানালে মুশকিল। রকির হিতাকাঙ্ক্ষীরা গুটি গুটি রায়ানদের বাড়ি গেল।

কিছুক্ষণ বাদে বিপুল হর্ষধ্বনির মাঝে মিছিল আমাদের গ্যারাজে ফিরে এল। অ্যানথনির মা গররাজি হলেও দাদুর নিজের বাড়ি এবং তিনি রকিকে বেসমেন্টে থাকতে দিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু অ্যানথনির দাদা বিলি বিশেষ খুশি নয়। তার কুকুরদের নাকি বেশ অসুবিধে হবে। রকি বিদায় পর্বের সূচনায় বিলির বক্তৃতা শুরু হল—'রকির দিদি ওকে প্রথমে খুঁজে পেলেও এখন আর রাখতে চাইছে না। যাই হোক, আমরাই এখন থেকে রকির ভার নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা সবাই ওকে এতদিন চটকে মজা করেছ। আরও চটকাবে জানি। তাহলে রকির খরচটাও একটু ভাগ করে নাও।'

ছোটরা একটু বোকো বোকো মুখে এর তার দিকে চাইতে লাগল। খরচের নামে ভয় পেয়েছে বোধহয়। বিলি আবার মিটি মিটি হেসে বলতে লাগল—'রকির দিদি সপ্তাহে

সপ্তাহে ক্যাট ফুড কিনে দেবে। ঠিক তো? দুধ তো আমরাই দেব। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ওকে ইনজেকশন দেওয়াব। আর মিশেল, তুমি ওর পায়খানার খরচ দেবে...'। সকলের হি হি হাসি। বেড়ালের নিত্যকর্মের জন্যে পেতে রাখার ট্রে, বালির প্যাকেট এসবই কিনতে হবে নাকি মিশেলকে। আর রকিকে নিয়মিত চটকানোর অধিকার পেতে হলে বাদ বাকি সবাইকে খাবারের বাটি, জলের বাটি, গলার বকলস আর ছোট্ট ঘণ্টিও নাকি কিনে দিতে হবে। বিলির বৈষয়িক বুদ্ধিতে আমি চমৎকৃত। দায় উদ্ধার হবার স্বস্তিতে সপ্তাহে সপ্তাহে টিন ভর্তি বেড়ালের খাদ্য কিনে দেওয়াও সহজ মনে হল। দেখা গেল, বাচ্চাগুলো সবাই ওর প্রস্তাবে মাথা নেড়ে রাজি। হঠাৎ তারপরই চিৎ করে শুইয়ে বিলি একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপরই গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কে ওর নাম রকি রেখেছে, অ্যাঁ?'

সুজান ভয়ে ভয়ে স্বীকার করল ওরই দেওয়া নাম ওটা। বিলি হেসে অস্থির। 'মেয়েদের নাম রকি হয় কোনওদিন? এ তো মেয়ে বেড়ালছানা। আজ থেকে ওর নাম রকস্যান হয়ে গেল।' সকলে হেসে লুটোপুটি।

ঘণ্টা খানেক বাদে মার্জার বিদায়পর্ব মিটল। তারপর মাস খানেক পর্যন্ত বেড়ালের খাদ্য সরবরাহের নাম করে টুনা ফিশের টিন আর চিকেনের লিভার ভর্তি কৌটো হাতে নিয়ে মেয়ে অনবরতই অ্যানথনির বাড়িতে যেত। শেষে মিসেস রায়ান আমাকে অনেক বারণ করাতে বেড়ালের খাবার কেনা বন্ধ করতে হল। ভদ্রমহিলার ছেলের দাবি দাওয়ার বহর শুনে রীতিমত লজ্জা পেয়েছিলেন।

রকি বা রকস্যান কিন্তু সহজে আমাদের মায়া কাটাতে পারেনি। দুটো রাস্তা পার হয়ে যখন তখন বাগানে এসে বসে থাকত। গ্যারাজের দরজার বাইরে মিউ মিউ ডাক শুনতাম। নয়তো পেছনের কাচের দরজার ওপরে নাক ঠেকিয়ে বসে থাকত। ক্রমশ চেহারাটা হরিদাসীর মতোই লাগত। দিশি হরিদাসী এঁটো পাতের ভাত খেয়ে খেয়েই বীরবিক্রমে কুকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়ত। আর মার্কিনি হরিদাসী অপর্যাপ্ত খাঁটি দুধ আর গাদা গাদা মাছ মাংসের সঙ্গে মালটি ভিটামিনের ড্রপ খেয়ে আরও জাঁদরেল হয়েছিল নির্ঘাত। বেড়াল তপস্বী হয়ে কাচে নাক লাগিয়ে বসে থাকলে কী হবে, এদের জাতকে বিশ্বাস নেই। ওকে দেখলেই বাড়ির ভেতর থেকে পাখিটা ডানা ঝটপটিয়ে উঠত। ক্রমশ আমল না পেয়ে পেয়ে বেড়ালটার আসা যাওয়া কমে গিয়েছিল।

আমাদের পরিচিত বাঙালি মহলে স্যান্ডি, হুইস্কি, কিটি, সিলকি, বিউটি, ফ্লাকি নামে আরও কটা হরিদাসী বহাল তবিয়তে আছে। এঁরা দেশে বা অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে বেড়ালদের বোর্ডিং-এ রেখে যান। খরচ ভালই পড়ে। ফিরে এসে আবার তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নেন। কেউ কেউ বেড়াল সোহাগি মার্কিনি প্রতিবেশীর কাছেও গচ্ছিত রেখে যান। তবে সেখানেও গ্যারাজেই থাকতে পায় ওরা। অন্যের বেড়ালকে সহজে কেউ নিজের বাড়িতে ঢোকাবে না। তবে খাওয়া দাওয়ার ত্রুটি হয় না। এক গ্রিক পরিবারকে জানি গোটা পাঁচেক বেড়ালকে বাগানে সংসার পেতে দিয়েছেন। আলাদা কাঠের ঘর তৈরি করেছেন বাগানে। শীতকালে হিটার জ্বালিয়ে রেখে দেন। বেড়ালদের নাম রেখেছেন অ্যাপোলো, অ্যাথিনা, দিমিত্রি আরও সব কী কী যেন। দেখা হলে বেড়ালের কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে পাগল করে দেন স্বামী স্ত্রী দুজনেই। আমেরিকায় বেড়ালের খাদ্য নিয়ে 'পিউরিনা'

কোম্পানি চুটিয়ে ব্যবসা করছে বহুকাল। পিউরিনা ক্যাট চাও, পিউরিনা চিকেন ডিনার ইত্যাদি কতরকম পদ। বোধহয় বেড়াল আর কুকুরের মাংস বাদে এদেশের হরিদাসীরা দুনিয়ার মাছ মাংস খেতে পায়। রুটি, দুধের তো অঢেল বন্দোবস্ত। আমাদের বন্ধু দীপঙ্কর ছাত্র অবস্থায় এক বুড়ির বেড়ালের ভার নিয়েছিল। বুড়ি একমাসের জন্যে ইওরোপ বেড়াতে গেল। দীপঙ্কর তার বাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়ে বেড়ালের দেখাশোনা করত। এক রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বাইরে বেরয়নি। এদিকে ফ্রিজে খাবার দাবার সব শেষ। খিদের চোটে ও বেড়ালের খাদ্য টুনা ডিলাইট-এর টিন কেটে চেখে দেখেছিল। আঁশটে গন্ধ গদগদে মাছের চাকতিগুলো সুখাদ্য না হলেও প্রাণ ধারণের জন্যে নাকি এক আধবার গিলে ফেলা যায়। তবে দীপঙ্করের কাণ্ড দেখে আর চেনা খাবারের গন্ধ পেয়ে বুড়ির বেড়াল রাগে গরগর করছিল। তাকে দু'চার টুকরো দিতে তবে শান্ত হল।

এদেশে বেড়ালদের পত্রিকাগুলোর ভালই কাটতি। 'ক্যাটস' ম্যাগাজিনের অফিসের ঠিকানাও মজার। এক নম্বর 'পার' প্রেস অথবা গরগর প্রেস। ফ্লোরিডা থেকে প্রকাশিত 'ক্যাটস' ম্যাগাজিনের বছরে ১২টি সংখ্যার জন্যে চাঁদা হচ্ছে পনেরো ডলার। তাও নাকি বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে এখন। এমনিতে বছরে উনিশ ডলার লাগে। বেড়ালদের যতগুলো পত্রিকা আছে, তার মধ্যে এর কাটতি সবচেয়ে বেশি। বনেদি কাগজ বটে। '৪৫ সাল থেকে বেড়াল পোষার যাবতীয় উপদেশ আর পরামর্শ দিয়ে আসছে। ছবি ভর্তি ঝকঝকে পত্রিকাতে প্রতি মাসে বেড়ালদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা, শিক্ষা, সুখ, শান্তি নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রবন্ধ লেখেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আছেন পশু চিকিৎসক আর পোষা জীবজন্তুর নিজস্ব উকিলরা। মানে বেড়ালদের স্বার্থরক্ষাতে এই উকিলরা মামলা চালান। ক্যাটস পত্রিকায় আরও নানা খবর থাকে। কী কী সুখাদ্য নতুন বাজারে এসেছে, বেড়ালদের প্রসাধন দ্রব্য কতরকম আছে, ভাল জাতের বেড়াল উৎপাদনের প্রক্রিয়া (ব্রিডিং), ক্যাট শো-র খবর ও নিয়মাবলী, বেড়াল বিষয়ক নানা বই-এর সমালোচনা, বেড়ালদের নিয়ে লেখা কবিতা, গল্প, ছবির বই ছাড়াও প্রতি বছর ভাল জাতের বেড়াল উৎপাদনকারীদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হয় 'ক্যাটস' পত্রিকার পাতায় পাতায়।

পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও কম কাজ নয়। বেড়ালের আদর যত্ন নিয়ে কত জনের কত জিজ্ঞাসা। বেড়াল বিশেষজ্ঞরা উপদেশ দিচ্ছেন প্রশ্ন ধরে ধরে—মাসে দু থেকে তিনবারের বেশি বেড়ালদের চান করিও না। না হলে বেড়ালের চামড়ার দামি চকচকে তৈলাক্ত ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। বেড়ালের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করতে যে অপারেশন করিয়ে নেওয়া হয়, তার ফলে মোটেই তাদের ওজন বাড়ে না। মোটা বেড়ালের জন্যে দায়ী হচ্ছে তার বংশের ধারা। নয়তো মালিকের অতিরিক্ত সোহাগ। অর্থাৎ অসম্ভব বেশি করে খেতে দেওয়া। জলাতঙ্ক রোগ ক্রমশ নানা রাজ্যে ছড়াচ্ছে। ঘরের বেড়ালকে নিয়মিত তার প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেওয়াবে। অনেক বেড়াল এঁটুলির ওষুধ গায়ে মাখলে চট করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই যে কোনও এঁটুলির পাউডার কিনলে প্রথমেই তার সর্বাঙ্গে মাখাবে না। একটুখানি গলার দিকে মাখিয়ে দিয়ে সারাদিন লক্ষ করবে। যদি বেড়াল ভিরমি না খায়, বুঝবে কোনও ক্ষতি হয়নি। তখন বেশ করে লোমের ফাঁকে ফাঁকে মাখাও। শীতের দিনে কিংবা সর্দি কাশি লেগেছে এমন বেড়ালকে মোটেই বাথটবে জল দিয়ে দিয়ে চান করাবে না। জল দেখলে

ঘাপটি মারে এমন বেড়ালকেও জোর জবরদস্তি না করে এদের এরারুটের গুঁড়ো মাখিয়ে গা পরিষ্কার করে দাও। বেড়ালদের তরল ওষুধ খাওয়ানো মোটেই শক্ত নয়। তাদের সামনের দু'খানা পায়ের ওপর একটু একটু করে মিষ্টি ওষুধ ঢালতে থাকো। দেখবে কেমন চেটেপুটে সাবাড় করে দেয়। (শিব্রাম চক্রবর্তীর বিনির চামচে দিয়ে বেড়ালকে ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ানোর চেয়ে সহজ নিঃসন্দেহে!)! হ্যাঁ গোঁফঅলা বেড়ালের গোল বাটিতে মুখ ডুবিয়ে খাবার খেতে বেশ অসুবিধে হয়। গোঁফগুলো দুমড়ে মুচড়ে ব্যথা দেয় বলে ওরা রাগ করে অর্ধেক খেয়ে উঠে যায়। ফলে শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। সবসময় ওদের ছড়ানো বগি থালায় খাবার সাজিয়ে দেবে। বুড়ো এবং কুঁড়ে বেড়ালকে ব্যায়ামের সাহায্যে চাঙ্গা করবে। প্রতিদিন তাকে ব্যায়াম করাতে নিজেও সঙ্গে লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে ডিগবাজি খাবে। তাতে মালিকের দেখাদেখি বুড়ো বেড়ালও নেচে উঠবে। তার ছোটবেলার বল, উলের গোলা, এগুলো খুঁজে পেতে এনে তাকে রীতিমত নাচন কোঁদন করাতে বাধ্য করবে। মোটা সোটা আহ্লাদি বেড়াল মানেই ভাবনার কথা। মোটা বেড়ালের হার্টের অসুখ, শ্বাসকষ্ট তো বাঁধা। গেঁটে বাতের সম্ভাবনাও প্রবল। চামড়ার জেল্লাও কমে যায়। কারণ মোটা বেড়াল গা গতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের শরীর চেটে চেটে পরিষ্কার করতে চায় না। বেড়ালের ব্যবহার নিয়ে মালিকের দায়িত্ব কতখানি? উকিলের মতে তোমার বেড়ালের যদি পূর্ব ইতিহাস নিন্দনীয় না হয়, তাকে অযথা উত্যক্ত করা না হয় এবং তুমি তাকে বরাবর সুশিক্ষা দিয়ে থাকো, তবে চিন্তার কিছু নেই। এরপর যদি সে কাউকে আঁচড়ে কামড়ে দেয় তো বলে দেবে লোকটাই তাকে খুঁচিয়েছিল। তোমার কোনও দায়িত্ব নেই। তারপর কোর্টে মামলা উঠলে আমরা দেখব। আর যদি বেড়ালের অতীত আচরণ নিন্দনীয় হয় এবং তুমি তাকে মাথায় তুলে থাকো, তবে কিন্তু তোমার ঘাড়েই মামলা চাপবে। বেড়ালের ডাক্তারের কাছে ধাওয়া করে প্রতিপক্ষের উকিল তার সব রেকর্ড পরীক্ষা করবে জেনে রেখো। 'খ্যাপা' বেড়ালের বৈশিষ্ট্য থাকলেই কেস খারাপ হয়ে যাবে। এছাড়া অন্যান্য উপদেশ হল—জল আর দুধ, দুইই বেড়ালের খাওয়া দরকার। দৈনিক যতটা জল তার খাওয়া উচিত, তার বদলে দুধ খাইও না। আর সারা বাড়ির যত তরল ওষুধ, বাড়ি ও গাড়ি পরিষ্কার করার কেমিকেলস, গোলা সাবান—এগুলো শক্ত করে ছিপি এঁটে রাখবে। বেড়াল তরলপদার্থ পেলেই চেখে দেখা অবশ্য কর্তব্য মনে করে। সুতরাং সাবধান।

সারা আমেরিকায় যত বাড়ি আছে, তার মধ্যে শতকরা তিরিশ ভাগ বাড়িতেই পোষা বেড়াল আছে। এদেশে পোষা বেড়ালের সংখ্যা ৬৩ লক্ষেরও বেশি এখন। সুপার বাজারে এমনিতে মাংস আর ফল ও সবজি বিক্রি হয় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে। এখন নাকি তারপরেই বিক্রি হয় বেড়ালের খাবার। একটা বিভাগ তো ভর্তি থাকে দেখি শুধু বেড়ালের খাবার সাজানো তাক দিয়ে। টিন আর বাক্স বন্দি কত রকমের মাছ, মাংস, ডিম আর সিরিয়ালের ঘটা! প্রতি খাবারের সঙ্গে নানা ভিটামিন মেশানো থাকে। এছাড়া নিয়মিত বেড়ালের ডাক্তারি পরীক্ষা, ইনজেকশন, ওষুধ, জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য বাড়তি ইনজেকশন, চার পায়ের নখ কাটানো, কত ব্যবস্থা। বেড়ালের জন্যে মেডিকেল ইনসিওরেন্স করা যায়। কম খরচে চিকিৎসা হয়। কুকুর বেড়ালদের জন্যে বিউটি পার্লার আছে। যাদের সময় কম, তাঁরা বেড়াল বগলে পার্লারে চলে যান। চান করে, পাউডার মেখে,

ব্রাশ দিয়ে লোম পরিষ্কার করিয়ে বেড়াল একেবারে রূপসী বিদ্যেধরী হয়ে বাড়ি ফেরে। নখে নেলপালিশ, কানের পাশে রঙিন ফিতের চুল বাঁধা কালো হরিদাসীর সে কী রূপ! যেন সাঁওতাল মেয়ের কান আলো করে আছে ক্যামেলিয়া ফুল!

প্রত্যেক বছর এদেশে হাজার খানেক 'ক্যাট শো' হয়। সবচেয়ে নাম করা হল নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে বার্ষিক বেড়াল প্রদর্শনী। সম্প্রতি অষ্টম বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল। নিউ ইয়র্কের মানুষ ভারী বেড়াল প্রিয়। গত বছর তো ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের বেড়াল উৎসবে এমন ভিড় হয়েছিল যে শেষকালে দমকলের লোক ডেকে ভিড় সামাল দিতে হল। ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রতি বছর এটির আয়োজন করে ক্যাট ফ্যান্সিয়ারস অ্যাসোসিয়েশন। পার্শিয়ান বেড়াল, অ্যাবিসিনিয়ান বেড়াল ছাড়াও আমেরিকার নিজস্ব মেইন কুন নামে বিরাট বেড়াল এবারে অনেক এসেছিল।

খাঁচার কী বাহার! যেন ছোটখাট একটি মঞ্চ সজ্জা। তিনদিকে ঝলমলে সিল্ক, স্যাটিনের লেস বসানো পর্দা ঝুলছে। দু'পাশে ড্রপ সিন সরে যাওয়ার মতো কায়দা। মাঝখানে বসে আছেন মধ্যমণি রূপসী হরিদাসী অথবা গম্ভীর কাবলি।

ওদিকে একের পর এক স্টল বসেছে। কোথাও বেড়ালের খাবারের স্টল। কোথাও বেড়ালের 'নিত্যকর্মের' রকমারি ট্রে, বালির বস্তা, জীবাণুমুক্তকারী স্প্রে সাজানো রয়েছে। কোথাও হরিদাসীর গয়নার দোকান। গলার কারুকার্য করা বকলস রুপোর ঘন্টি, পায়ের মল, লকেট কোনও কিছুর অভাব নেই। আবার বেড়ালের পোশাক পরিচ্ছদও বাদ নেই। সেগুলোর সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে ম্যাচ করে তৈরি মালিকের পোশাক। বেড়াল যদি ফুল পাতা মার্কা জামা পরে তো মালিকের গেঞ্জিতেও একই নমুনা আঁকা থাকবে। তবে সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল 'জনি ক্যাট প্রাইভেসি স্ক্রিন' নামে স্টলটি। নিত্যকর্ম সংক্রান্ত মজার মজার দৃশ্য দেখিয়ে এক ব্যবসায়ী সংস্থা সেটি খুলেছিল।

এই ধরনের 'ক্যাট শো'তে নানা জন নানা উদ্দেশ্যে আসেন। অ্যানিমাল শেলটারস সোসাইটি, হিউমেন সোসাইটিস, পেট অ্যাডপশন এজেন্সিস ছাড়াও আসেন অ্যান্টি ভিভিসেকনে দল। শেষোক্ত দলের কাজ হল জীবিত জন্তু জানোয়ারের দেহ থেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং প্রক্রিয়াটি বন্ধ করার জন্যে উদ্যোগ নেওয়া। আর বেড়াল মনোবিজ্ঞানী এবং শোক সংহত করার বিশেষজ্ঞ হিসেবে আসেন থেরাপিস্টরা। বেড়াল মরে গেলে নয়তো অসুস্থ বেড়ালকে তার মঙ্গলের জন্যে চিরঘুমের ব্যবস্থা করতে হলে মালিক এবং তাঁর পরিবারের যে মনোকষ্ট হয়, তারই সান্ত্বনার জন্যে মনোবিজ্ঞানী আর থেরাপিস্টরা ব্যবস্থা করেন।

এবারের বেড়াল প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে দেড় বছরের লাল পার্সিয়ান বেড়াল ইন্ডি। সাধারণত দু'ভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। নানা বেড়াল বাহিনী থাকে, তাদের মধ্যেই সাধারণত গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এদের বেড়াল ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য, লোমের ঘনত্ব, ওজন, বংশ মর্যাদা, অন্যান্য বিষয় বিচার করে বিচারকরা নম্বর দেন। আর পোষা বেড়ালদের বিচার হয় আলাদা শ্রেণী বিভাগ করে। সেখানে পোষা হরিদাসীর গোঁফের দৈর্ঘ্য, ল্যাজের বাহার আর মালিকের সঙ্গে তার সাদৃশ্য মিলিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়। মানে মালিকেরও যদি হুমদো মুখে এক ঝুড়ি লম্বা গোঁফ থাকে, চোখের মণির রং

এক হয়, গায়ের রঙের মিল থাকে, হাবভাব একরকম হয়—পুরস্কার একেবারে বাঁধা। পোশাক ও গয়না মিলিয়ে পরলেও নম্বর বেশি পাওয়া যায়। মোট কথা বেড়াল ও মালিকের মধ্যে সম্বন্ধ গাঢ় হওয়া দরকার। এছাড়া কোনও প্রতিযোগিতার জন্যে নয়, শুধু অতীতের মান মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকটি বনেদি বেড়াল আসে দর্শকদের দর্শন দিতে। এবারে চেরি পপ নামে দশ বছরের একটা লাল পার্সিয়ান বেড়াল এসেছিল ছোট্ট সাদা ধবধবে খেলার রোলস রয়েস গাড়িতে বসে। সে আগে আগে বহু পুরস্কার পেয়েছে। এখন শুধু প্রদর্শনীর মান বাড়াতে আবির্ভূত হয়।

আমেরিকায় বেড়ালের এমন আদর মানে কি এদেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা দুঃখী বেড়াল নেই? ঠিক সেই অর্থে না থাকলেও অন্য অর্থে অবশ্যই আছে। রাস্তায় বেড়াল দেখা যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু তাদের অন্ন জোটে না এমন অবস্থা নয়। শিকারী টাইপের হাবভাব। মাঠে, ময়দানে, ঝোপে ঝাড়ে ইঁদুর, পাখি, পোকা, মাকড় ধরে খাচ্ছে। আর বেড়ালদের খেতে দিতে বেড়ায় এমন মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে, শুধু পথের বেড়ালদের দয়ার অপেক্ষায় থাকা। হোমলেস মানুষও নিয়ম করে বেড়ালদের খেতে দেওয়ার ব্যাপার উৎসাহী। ফলে বড় বড় শহরে বেড়ালদের আরও মজা। হোটেল, রেস্তোরাঁয় ফেলে দেওয়া খাবারের একটা বড় অংশ যায় বেড়ালের পেটে। সুতরাং পেটের জ্বালায় দোরে দোরে ঘোরার বালাই নেই। তবে বেড়ালের দুঃখ অন্য জায়গায়। প্রতিদিন কাগজে দেখি বেড়াল অ্যাডপশনের জন্যে অ্যানিমাল শেলটার থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। করুণ সব ছোট্ট ছোট্ট হরিদাসীর মুখ। কারও মালিক এক হরিদাসী থেকে শত হরিদাসীতে বিশ্বাসী নয়। ছানাগুলোকে এজেন্সিতে দান করে গেছে। কারও মালিক দুরারোগ্য রোগে অসুস্থ অথবা দুর্ঘটনায় আহত, নয়তো নিহত। বেড়ালকে দান করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কোনও বাড়িতে এতদিন বাচ্চা না থাকার কারণে হরিদাসীই কন্যাসমা প্রতিপালিত হচ্ছিল। হঠাৎ মালকিন সন্তানসম্ভবা জেনে এক বাড়িতে শিশু আর বেড়ালের সহ অবস্থানে ভয় পাচ্ছেন। কোথাও মালিক সপরিবারে বিদেশে চলে গেছেন। কারও বেড়াল পুষে অ্যালার্জি হচ্ছে। এইসব অবাঞ্ছিত বেড়ালেরা 'শেলটারে' এসে দিন গোনে। বিজ্ঞাপন মারফত এদের নতুন আশ্রয় খুঁজে দেবার চেষ্টা করে ক্যাট অ্যাডপশন এজেন্সিগুলো। এদের স্বভাব চরিত্র, অতীত ইতিহাস, বংশ মর্যাদা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির দৌলতে আশ্রয় মিলেও যায় বহু বাড়িতে। কিন্তু অমনোনীত দল পড়ে থাকে খাঁচা বন্দি হয়ে। শেলটার আর কতকাল খেতে দেবে? একসময় ঘুমের ওষুধ দিয়ে মহানিদ্রায় পাঠিয়ে দেয়। আর তার আগে ঘন ঘন ছবি ছেপে আকুল আবেদন জানায় বেড়ালের জবানিতে—'আমি লক্ষ্মী স্বভাবের হরিদাসী। রোগমুক্ত এবং কখনও বংশবৃদ্ধি করব না। মাঠে ঘাটে ঘুরে ঘুরে হুলোদের সঙ্গে মাখামাখি করে বাড়িতে রোগ জীবাণু আনব না। সে শিক্ষা আমার নয়। মালিক ক্যানসারে মারা গেছেন। তোমরা আমায় থাকতে দেবে?'

বেড়ালদের এক একটা বিজ্ঞাপন পড়লে মায়া হয়। মেরে ফেলা হবে জেনে বাঁচার অদম্য ইচ্ছে। তবু আমার সাহস হয় না। হরিদাসী প্রীতি প্রগাঢ় থাকলে তো কবে রকিকেই পুষে ফেলতাম। কিন্তু সেই দিশি হরিদাসীর লড়াই আর ইসাবেলার তীব্র চাউনি যে আজীবন আমার বেড়ালভীতি জাগিয়ে রাখল। রকির লাইসেন্স করানোর সময় তার আদি

ঠিকানা হিসেবে মিসেস রায়ান আমাদের আগের বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়ে এসেছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে। গ্যারাজে কিছুদিন বাসও তো করেছিল বেড়ালটা। নেহাত পোষা বদরিকা পাখিটার প্রাণের ভয় না থাকলে হয়তো বেড়ালটাকে বাইরে বাইরেই খেতে দিয়ে পুষতে পারতাম। যাক, সাহেব বাড়িতে গোমাংস খেয়ে টেয়ে আর ইংরেজি ট্রেনিং নিয়ে রকি ব্যাপটাইজড হয়ে জাতে উঠে গেছে। আমাদের গ্যারাজে চটের বিছানায় শুয়ে কৃপাভিক্ষার জন্যে ওর জন্ম হয়নি। এ হরিদাসীর জীবন সার্থক।

৯মে ১৯৯২

বেড়ালের বংশ গৌরব

ভুসো কালির মত রঙ, খশখশে লোমওলা পয়লা নম্বর বেড়ালটার নাম চিলেক। পাঁশুটে বরণ দ্বিতীয়টার নাম চিরোশ। টার্কির ফুটপাতের ফসল। এখন ইমিগ্রেশন পেয়ে 'অভিবাসী'। বেড়াল দুটোর গ্রিনকার্ড না থাক, লিগাল স্টেটাস আছে। টার্কি থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে আসেনি। দস্তুরমত কাগজপত্র সমেত খাঁচায় চড়ে মার্কিন অভিবাসন দফতরের ছাপ টাপ নিয়ে ঢুকেছে। যখন এদের চোখে দেখিনি, শুধু গুণকীর্তন শুনেছি, তখনই 'ভেরি রেসপেকটফুল অ্যান্ড মডেস্ট' দুই বেড়াল ছানার খবর আপনাদের দিয়েছিলাম। এরা নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। ম্যানহাটনে আমার মেয়ের রুমমেট লিন্ডা ইপোলিটোর পোষা বেড়াল। লিন্ডা 'পিস কোর'-এ কাজ করতে টার্কি গিয়েছিল। ফেরার সময় বেড়ালছানা জুটিয়ে এনেছে। রাস্তার বেড়ালের বংশে জন্মালেও এরা নাকি অপরূপ রূপসী। আমি কিন্তু চিলেক, চিরোশের রূপের আকর্ষণে নয়, নেহাত নিজের গরজেই তাদের দর্শন করতে গিয়েছিলাম। বেড়ালের ভয়ে তো আর মেয়ের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে পারি না।

সত্যি বলতে কী, এমন কিছু অসাধারণ সুন্দরী নয় তারা। অবশ্য এক্ষেত্রে আমার বীতরাগের ব্যাপারও আছে। জীবনে যতগুলো পোষা বেড়াল দেখেছি, কলকাতার হরিদাসী থেকে পেনসিলভানিয়ার ইসাবেলা গাঙ্গুলি, কি আমার বিতাড়িত রকস্যান—রূপে আমায় কেউ ভোলাতে পারেনি। ম্যাও গেয়েও নয়। আসলে, কাউকেই সুনজরে দেখিনি তো! যে জন্যে ওই টার্কিশ ছানা দুটো সম্পর্কেও আগ্রহ ছিল না। দেখেও আদৌ বিমোহিত হইনি। সে ভাবে দেখতে গেলে কলকাতার হরিদাসীও কম রূপসী ছিল না। তখন অনাদরে চাইনি মুখের দিকে। স্বদেশের সেই সব উপোসী রূপসীদের তুলনায় ফুটপাতের তরুণ তুর্কির কন্যারা কী এমন আহামরি বুঝলাম না। ওই, টার্কিশ তোয়ালে আর এমনি তোয়ালের মধ্যে যেটুকু তফাত। এরা লোমে ভারী।

তবে সাদর অভ্যর্থনা যাকে বলে চিলেক, চিরোশ, দেখাল বটে! আমার চরণে নত হয়ে, গড়িয়ে পড়ে। সে কী বিনম্র আবাহন। তারপরেই ল্যাজের ঝাণ্ডা উড়িয়ে কুচ-কাওয়াজ। অবশেষে সোফা ঘেঁষে বসে দেবীদর্শনের স্টাইলে চেয়ে থাকা। মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,

তোমাকে গ্রিট করছে বুঝতে পারছ! আমি আমল দিইনি। বেড়ালের জন্য 'মায়াবাদ' নয়। এমন গায়ে পড়া এবং পায়ে পড়া এক জোড়া বেড়ালের সঙ্গে থাকা অভ্যেস হলে, পরে পড়াশোনার শেষে মেয়ে যে অন্তত একটাকে ঘাড়ে করে বাড়ি নিয়ে যাবে না—কে বলতে পারে? দুটোই খুব বশংবদ হয়েছে। লিন্ডা মাঝে মাঝে ওর রিসার্চের কাজে বাইরে যায়। তখন এরা আমার মেয়ের হেফাজতেই থাকে। রোজ একটা না একটা কাণ্ড বাধায়। মেয়ে টেলিফোনে লম্বা বিল তুলে সে সব কাহিনী সবিস্তারে শোনায়। চিলেক বন্ধনে বিশ্বাসী। টেলিফোনের ঢেউ খেলানো তার নিজের গলায় পেঁচিয়ে যখন তখন লটকে পড়ে। তাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচানো ওদের নিত্য কাজ। চিরোশের একটু বারদোষ দেখা দিয়েছে। তিনদিন জানালা টপকে ব্রডওয়ের দিকে পালিয়েছিল। ছাত্রছাত্রীরা মিলে টুনা ফিসের ফ্যান ফিরিয়ে এনেছে। সন্ধেবেলা গিয়ে দেখেছি দুটোই কোলে বসে টিভি দেখছে। পরীক্ষার সময় অবশ্য বেড়ালদেরও খুব রাত জাগতে হয়। দুই ছাত্রী যে যার ঘরে আলো জ্বেলে কমপিউটর আঁকড়ে বসে আছে। আর চিলেক, চিরোশ ঘুমের চেষ্টায় ইস্তফা দিয়ে এক চোখ খুলে শুয়ে আছে। লম্বা লম্বা হাই তুলেছে। কখনও ল্যাজের ঝাণ্ডা দুলিয়ে রান্নাঘরে ঘুরছে। আবার পরদিন বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে। কলেজ পাড়ার বেড়াল তো, অধ্যবসায়ে সামিল না হোক, লাইফ স্টাইলটা মেলাতে চাইছে আর কী!

আমায় যে খাতির করতে ছুটে আসে, তার একমাত্র কারণ হয়তো লোভ। হাতে খাবারের ব্যাগ দেখলেই নতজানু অবস্থা থেকে একদৌড় রান্নাঘরে। টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে সে কী মনোযোগ। সে কী নিরীক্ষণ! একটা ঘরে প্লাস্টিকের কৌটো ফ্রিজে রাখছি আর চিলেকের চোখের খেলা দেখছি। চিরোশ এক ফাঁকে ঝাণ্ডা নামিয়ে নেমে পড়েছে। মাটিতে রাখা খালি ঠোঙার পাশে আহ্লাদে গড়াগড়ি দিচ্ছে। অথচ এইসব খাবার ওদের দেওয়া হয় না। ওরা টিনের মাছ, মাংস খায়। একটুখানি করে দুধ। তবু রান্নার গন্ধ পেলে মহা উত্তেজনা। একদিন ওদের অ্যাপার্টমেন্ট গল্পগাছা সেরে বাড়ি ফিরব। লক্ষ করলাম চিলেক, চিরোশ ত্রিসীমানায় নেই। ভাবলাম, নিশ্চয়ই লিন্ডার ঘরে ঘুমচ্ছে। রান্নাঘরে ঢুকে দেখি মেঝেতে রাখা একটা বড় ঠোঙা ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে। দুটোই ভেতরে নেমে পড়েছে। প্রচণ্ড হুটোপাটি করছে। ওই ঠোঙায় আগের দিন চাইনিজ খাবার এসেছিল। চিলেক চিরোশ চীনে খুশবু পেয়েই নেমে পড়েছে।

ওদের সুশিক্ষিত করার কাজে মেয়ে একটু কড়া হয়েছিল। আমি থাকলে ওদের বেডরুমে ঢোকা বারণ। সত্যিই ঢোকে না কিন্তু। বারান্দায় ল্যাজ বিছিয়ে বসে ঘন ঘন উঁকি মারে। একটু ইন্টারভ্যাল দিয়ে দিয়ে ডাক ছাড়ে। মুখ বাড়ালেই মেয়ে ধমক দেয়। আ...উ...ট.। আমি বলি—হ্যাট! খুব কাজ হয়।

কিন্তু ওই যা কিছু কড়াকড়ি, সে কেবল আমি থাকার সময়। নয়তো ওরা যে সারাক্ষণ মেয়ের ঘরে ঢুকে তুর্কি নাচন নাচছে। তার প্রমাণ তো কার্পেটে লেগে থাকা লোমটোম থেকেই টের পাওয়া যায়।

হঠাৎ চিলেক, চিরোশের রাজধানী যাত্রার খবর পেলাম। লিন্ডা ইলোপিটো নিজের থিসিসের শেষ পর্বে ওয়াশিংটনে থাকবে। বেড়ালরাও সঙ্গে যাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবলাম ঝামেলা মিটল। ওই অ্যাপার্টমেন্টে নতুন মেয়ে এল জ্যানেট ফ্রস্ট। কলম্বিয়া

প্রেসবেটেরিয়ান মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। ভারী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন স্বভাব। লিন্ডা বা আমার মেয়ে পড়াশোনা আর বেড়াল পরিচর্যার চাপে যে সব কাজ মোটেই করতে চাইত না, এই ভাবী ডাক্তারটির যেন সেগুলোই হবি। সব কাজেই দারুণ পরিপাটি। নিয়মিত কার্পেট পরিষ্কার করছে, কাঠের মেঝে ওয়্যাক্সিং করছে। দেওয়ালে ঝকঝকে ওয়াল পেপার, জানলায় জানলায় টবের গাছ, অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলেই ভাল লাগে। শুধু মেয়ে মাঝে মাঝে বলে চিলেক, চিরোশ চলে গিয়ে একটু খালি খালি লাগছে।

শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্যে একজন যে তখন গোকুলে বাড়ছে কী করে জানব? জ্যানেটের মেডিকেল কলেজের বন্ধু টেরিজার অ্যাপার্টমেন্টে ছিল হোঁৎকা বেড়াল ক্লিওপেট্রা। টেরিজার রুমমেটের বেড়ালে অ্যালার্জি ধরা পড়াতে ক্লিওপেট্রার বাস উঠল। টেরিজা বেচারি এই মাঝপথে লিজ ব্রেক করে কোথায় যায়? বাবা, মা, থাকেন অ্যাটল্যান্টায়। যদি অন্তত কয়েকটা মাস আমার মেয়ে আর জ্যানেট ওদের কাছে বেড়ালটাকে থাকতে দেয়, তবে টেরিজা ঠিকই তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে।

করুণ আবেদনে কাজ হল। একটা পোষা বেড়ালকে তো আর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেওয়া যায় না! পরের সপ্তাহে ক্লিওপেট্রার আবির্ভাব হল। পারস্যের নামজাদা বংশের মেয়ে বলে রানির নামে নাম রাখা হয়েছে। কিন্তু নামেই যদি চেহারার ভোল পালটাত, তবে আর ভাবনা ছিল না। এ যে কী কিম্ভূত বেড়াল, লিখে বর্ণনা দিতে পারব না। যেন কালো একখানা ভোট কম্বল জড়িয়ে ঘুরছে। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো যেখানে সেখানে লোমের থোপনা বসানো। পিঠ আর ঘাড়ের পাশ দিয়ে অর্কিডের মতো লোমের ফোয়ারা দুলছে। এমন উদ্বৃত্ত লোমের পাহাড় জন্মে দেখিনি। মাথার দিকটা দেখলে মনে হয় কেশর দুলিয়ে ছোটখাট কালো সিংহ বসে আছে। ক্লিওপেট্রাকে দেখে আমি প্রায় মূর্চ্ছা যাচ্ছিলাম। নেহাত সে বেজায় অহংকারী বলে আমাকে পাত্তা দেয়নি। নয়তো টার্কির ফুটপাত প্রজন্ম চিলেক, চিরোশের মত পায়ে পড়তে এলেই হয়েছিল আর কী?

ক্লিও যে সদ্বংশজাতা, সে বিষয়ে জ্যানেট এবং আমার মেয়ে দু'জনেই নিঃসন্দেহ। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলেই স্থান পরিবর্তনে বিচলিত হল না। টেরিজাকে পায়ে পায়ে খুঁজে বেড়াল না। নতুন লোকেদের কাছে মাথা নত করার তো প্রশ্নই ওঠে না। রান্নাঘরে হানা দেওয়া নেই। হুটোপাটির বালাই নেই। হয় আধশোয়া স্টাইলে সোফায় পড়ে থাকে। নয় জানলায় বসে আকাশ দেখে। ঘড়ির কাঁটা ধরে টিনের খাবার খায়। যথাকালে ক্লোসেটের আড়ালে ঢুকে বালির ট্রেতে বসে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সমাধা করে আসে। অপারেশন হয়ে গেছে বলে অন্য কোন প্রাকৃতিক আকর্ষণও নেই। খাওয়ার লোভও নাকি এত কম যে সাধাসাধি করলেও একফোঁটা দুধ বেশি খায় না। পড়ে থাকা খাবার ছুঁয়ে দেখে না। আমার মেয়ে রান্নাঘরে এটা সেটা ফেলে রেখে আড়াল থেকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিল—ক্লিওপেট্রা সে সব শুঁকতেও যায়নি। বেড়াল তপস্বী বোধহয় একেই বলা উচিত। লোভ, মোহ, কাম, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এমন সাত্ত্বিক জীবন যার তার পক্ষে ওই রাজসিক নামটাই তো অর্থহীন হয়ে গেছে। যাক, নামে কী যায় আসে? তা, এই হল ক্লিওপেট্রা সমাচার। কতদিন ওই অ্যাপার্টমেন্টে বসে থাকবে কে জানে? তবে লক্ষ করেছি, অহংকারী লোকেদের তো চট করে বন্ধু হয় না। এ বেড়ালটাও চালে মটমট করতে গিয়ে তেমন মায়া

বাড়াতে পারছে না। আমি খুব নিশ্চিন্ত যে ওই কালো অর্কিডের ঝোপ নিয়ে মেয়ে বেশি মাতামাতি করবে না। এখন শুধু ওদের ইলেকট্রিক বিল একটু বেশি হতে পারে। কারণ বেড়ালটা ফ্যানের হাওয়া খুব বোঝে। ঝুপসি লোমের বোঝা নিয়ে পাখার দিকে আড়ে আড়ে চায়। থাবা ঢুকিয়ে নাকি দু-একদিন টেবল ফ্যান চালু করতে গিয়েছিল। জ্যানেট বুঝতে পেরে ফ্যান চালিয়ে দেওয়াতে পেট চিতিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হাওয়ার চোটে ঝুমকো ঝুমকো মাথার কেশর উলটে পালটে গিয়ে বেড়ালের সে এক পাগলের চেহারা! সেই থেকে ক্লিওপেট্রার জন্যে উদয়াস্ত ফ্যান ঘোরে। সে একা লিভিং রুমের সোফায় শোয়। গায়ে পড়ে অন্যদের বেডরুমে শুতে যায় না।

এদেশে পুটপাতের বেড়াল, কুলীন বেড়াল সবই আমার দেখা আছে। কিন্তু বেড়াল বিশেষজ্ঞ তো আর নই, তাই বৈচিত্র্যের সন্ধান দিতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল ক্যাট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে খবর চেয়ে পাঠাই। কতরকম বেড়ালের বংশ পরিচয় পাই। স্ফিংস নামে একটা জাত আছে, তাদের গায়ে নাকি লোমই নেই। ঘিয়ে ভাজা। কুকুরের সঙ্গে সামান্য মিল আছে। এক জাতের বেড়ালের নাম আমেরিকান কার্ল। কান দুটো বেজায় কোঁকড়ানো। মানচকিন নামে এক জাতের বেড়ালের পাগুলো এমন বেঁটে বেঁটে, যে মনে হয় বুকে হেটে যাচ্ছে। যাঁরা এ ধরনের অভিনব বেড়াল পোষেন, তাঁরা বলেন এখন এই হচ্ছে ফ্যাশন। যা অন্যের নেই, তেমন দুর্লভ কোনও বেড়াল খুঁজে আনতে হবে। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্যাট অ্যাসোসিয়েশন থেকে যে বার্ষিক বেড়াল প্রদর্শনী হয়, সেখানে ওই বিচিত্র বেড়ালদের ঠিক মান সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। বিচারক ক্যাথরিন ক্রকোর্ড তো এত রেগে গেছেন যে পরিষ্কার জানিয়েছেন সামনের নভেম্বরের প্রদর্শনীর পরে তিনি পদত্যাগ করবেন। বেড়ালের নাম করে যে সব হাস্যকর বর্ণসংকর প্রজন্মকে প্রদর্শনীতে আনা হয়, তারা কুলীন বেড়ালদের অপমান করার জন্যেই আসে। মানচকিন, স্ফিংস কেউ বেড়াল পদবাচ্য নয়। এদের মালিকরা কেন এই প্রদর্শনীর মর্যাদা নষ্ট করতে আসেন?

ব্যস! জোর ঝগড়া লেগে গেছে। ওই ক্যাট অ্যাসোসিয়েশনেরই এক সদস্য মানচকিন বেড়াল পোষেন। তাঁর ভীষণ গায়ে লেগেছে। বলেছেন, মাথায় বুদ্ধি থাকলে কেউ এই মন্তব্য করতে পারে না। মানচকিনের বিরুদ্ধে যারা দলাদলি করছে, তাদের কেউ কোনওদিন বেড়াল চেনাতে পারবে না। তাদের উচিত নিজেদের মাথার চিকিৎসা করানো। সুস্থ মস্তিষ্ক নয় বলেই ভাল বেড়াল চিনতে শেখেনি।

যাদের নিয়ে এত তর্কাতর্কি, সেই মানচকিন বেড়ালদের দেখতে ঠিক সাধারণ বেড়ালদের মতো গড়ন। বেড়ালের সাধারণত যত বড় পা হয়, তার অর্ধেক সাইজ।

বিতর্কিত মানচকিনদের জন্মরহস্য অবশ্য আজও জানা যায়নি। '৮৩ সালের ঘটনা। লুইসিয়ানা রাজ্যের রেভিল শহরে একটি গাড়ির নীচে বসেছিল এক বেঁটে বেড়াল। বুলডগের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে বসে ভয়ে কাঁপছিল। একজন গানের দিদিমণি দেখতে পেয়ে উদ্ধার করলেন। বাড়ি এনে দেখলেন ছোট্ট ছোট্ট পাওলা মেনি বেড়ালটার বাচ্চা হবে। সেই বেড়াল থেকেই মানচকিনদের বংশবৃদ্ধি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এদেশে মোট কত সংখ্যক মানচকিন জন্মেছে, সঠিক জানা যাচ্ছে না। তবে পোষা বেড়ালদের যেহেতু সংখ্যা জানা যায়, সেই হিসেবে তিনশোরও বেশি মানচকিন আমেরিকানদের বাড়িতে আছে।

মানচকিন ব্রিডাররা বাজার আর চাহিদা বুঝে বেড়ালের ফসল ফলাচ্ছেন। মানচকিনের চাহিদা নাকি খুবই বেশি। ম্যাসাচুসেটস-এর ওয়েস্ট শ্রীংফিল্ড শহরে একুশ শয্যা বিশিষ্ট একটি বেড়ালাবাস আছে। লোকেরা সেখানে বেড়াল কিনতে যায়। ওই বেড়ালাবাসের মালিক জানিয়েছেন মানচকিনের চাহিদা এমনই বেড়েছে যে প্রতিদিন অন্তত আট/নয় জন লোক খোঁজ করতে আসেন। দেড় হাজার ডলার দাম দিয়ে ওই বেড়াল কেনার জন্যে অনেকেই নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্রমশ মানচকিন জাতে উঠছে বলেই তাঁর ধারণা।

আমেরিকায় বেড়ালের বংশপরিচয় চিরকালই বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। একশো বছর আগে পর্যন্ত সরকারি খাতায় উচ্চবংশীয় বেড়ালের খবরাখবর থাকত। সদ্বংশজাত বেড়াল বলতে ঠিক যাদের বোঝায়, সে ওই সরকারি বিবরণ থেকেই জানা যেত। কিন্তু এখন অন্যান্য সূত্রেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকায় দুটি বৃহৎ বেড়াল প্রতিষ্ঠান (ক্যাট রেজিস্ট্রি) ছাড়াও ছোট ছোট সংস্থাও আছে। দক্ষিণ নিউ জার্সিতে আছে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান দ্য ক্যাট ফ্যানসিয়ারস অ্যাসোসিয়েশন। মোট ৬৪৫টি 'বেড়াল ক্লাব' মিলে গড়ে তুলেছে। সদস্যদের মধ্যে মানুষ ছাড়াও আছে ৭৫ হাজার বেড়াল। মোট ছত্রিশ জাতের বেড়াল দেখতে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নাম ইন্টারন্যাশনাল ক্যাট অ্যাসোসিয়েশন। টেকসাসের হার্লিংগেন শহরে এদের মূল দপ্তর। চারশো বেড়াল ক্লাব মিলে ওই অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করেছে। এখানে তিনশো হাজার রেজিস্টার্ড বেড়াল সদস্য আছে। মোট পঞ্চাশ জাতের বনেদি বেড়াল ওই সদস্যপদ পূর্ণ করেছে।

মানচকিন বেড়ালদের অজ্ঞাতকুলশীল বলে যারা অবজ্ঞা করেছে, তারা হচ্ছে নিউ জার্সির ওই ক্যাট ফ্যানসিয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের লোকেরা। কিন্তু তারা-ই তো আর সর্বেসর্বা নয়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ইন্টারন্যাশনাল ক্যাট অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডে ভোটাভুটি হল। ৭-৪ ভোটে মানচকিন সমর্থক দল জিতে গেল।

নিন্দুকদের অবশ্য চুপ করানো অসম্ভব। তারা প্রদর্শনীর আগে পরে সমানে ঘোঁট পাকিয়েছে। মানচকিনদের নামে যা তা বলেছে। কেউ বলছে পায়ের গড়ন যাদের এত কুচ্ছিৎ, তারা আবার বেড়াল নাকি? কেউ নাক সিঁটকেছে—বেড়াল না ছাই, বুনো বেজির মত চোর চোর হাব-ভাব! শটকে শটকে পালাচ্ছে। বেড়ালের মতো গাম্ভীর্যই নেই...।

কারুর ভীষণ আপত্তি যে মানচকিন যখন উঁচু হয়ে বসে থাকে আর বিস্তৃত থাবাগুলো ঘোরায়, ঠিক মনে হয় বুনো খরগোস কানখাড়া করে বসে আছে। বেড়াল যদি খরগোসের মতো হাবভাব করে তাকে কখনই সদ্বংশজাত বলা চলে না।

এ তো গেল নিন্দুকদের ব্যাখ্যা। স্বয়ং বিচারকও কি কম সমালোচনা করেছেন! মহিলার নাম তো আগেই জানিয়েছি—ক্যাথরিন ক্রফোর্ড। তিনি সদ্য ফ্রান্স থেকে ঘুরে এসেছেন। সেখানেও বেড়াল প্রতিযোগিতার নম্বর দিতে গিয়েছিলেন। আমেরিকায় ফিরে এসে ক্যাট অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডকে কড়া চিঠি দিয়েছেন। মানচকিন বেড়াল সমর্থকদের সম্পর্কে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন—এই দল আমেরিকার বেড়াল কৌলীন্যের অমর্যাদা করছে। নিজেদের অকারণ হাস্যাস্পদ করে তুলছে। বেড়ালদের জগতেও অবিচার করা হচ্ছে। যে ক্যাট ব্রিডারের এতটুকু নীতিবোধ আছে, সে কখনও মানচকিনের মতো

অদ্ভুত চেহারার বেড়াল সৃষ্টি করে তাদের করুণার পাত্র তুলবে না।

ওই বিচারকের সমর্থনে গলা মিলিয়েছেন আর এক মহিলা। তিনিও বোর্ড মেম্বার। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বেড়াল নিবাসের মালিক এই মহিলার বক্তব্য—মানচকিন উৎপাদকরা প্রকৃতির ওপর খবরদারি করতে গিয়ে ক্রমশ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এক শ্রেণীর অসহায় প্রাণী সৃষ্টি করছেন। আরও কয়েক প্রজন্মের পরে মানচকিন বেড়ালদের পাগুলো এত ছোট হয়ে যাবে যে তারা নিজেদের দাড়িও চুলকোতে পারবে না। মেয়ে বেড়ালদের আরও শাস্তি হবে। এমনিতেই বেড়ালরা মা হবার সময় এত পেটমোটা হয়ে যায় যে থাবা দিয়ে সহজে নিজেদের গা, মাথা পরিষ্কার করতে পারে না। তা হলে যে বেড়ালের পায়ের মোটে দৈর্ঘ্য নেই মা হবার সময় তার শরীরের কী অবস্থা হবে? পেট তো মাটিতে ঠেকে যাবে। হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে যাবে। 'ড্যাসন্ড' জাতীয় কুকুরের তবু অন্য সুবিধে আছে। ওদের সামনের পা জোড়া বাইরের দিকে পাতা থাকে। পেছনের পা জোড়া ভেতরের দিকে ছড়িয়ে রাখে। বেঁটে পায়ের জন্তুদের এভাবেই ভারী শরীরের ভারসাম্য রাখতে হয়। কিন্তু মানচকিনের দাঁড়ানোর পক্ষে ওই সুবিধে নেই। পেটে বাচ্চা এলে হাঁটা চলাই কষ্টকর হয়।

এ তো গেল বিরোধী পক্ষের স্লোগান। কিন্তু মানচকিনবাদীরা তা মানবেন কেন? ইন্টারন্যাশনাল মানচকিন সোসাইটির সেক্রেটারি সম্প্রতি এক মানচকিন মেনিফেস্টোর খসড়া করেছেন। তিনি ওই বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে বলেছেন—আমাদের পরম প্রিয় বেড়ালদের হেনস্থা করার জন্য, যা খুশি তাই বলে বেড়াচ্ছে। গুজব ছড়াচ্ছে। মানচকিন বংশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যারপরনাই মিথ্যা বলছে।

ক্যাট অ্যাসোসিয়েশনের আর এক সদস্য তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলছেন, ছোট-পা বেড়ালদের পেছনে যাঁরা দল বেঁধে লেগেছেন তাঁরা কি ছোট-পা কুকুর দেখেননি? সাহস থাকে তো ওই কুকুরদের তাড়া করুন...। মানচকিনরা মোটেই প্রকৃতির উদ্ভট খেয়াল খুশির সৃষ্টি নয়। এদেরও নিজস্ব জাতধর্ম আছে। মনে করুন, আপনি পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেছেন। দেখলেন একদল বামন বসে বসে চড়ুইভাতি করছে। আপনি কি ভয় পেয়ে যাবেন? না তাদের উচ্ছেদ করতে চাইবেন? তারাও ঈশ্বরের জীব। আপনি কি তাদের অস্তিত্বকে মর্যাদা দেবেন না? আচার, আচরণ, উপভোগ করবেন না? তাহলে বামন বেড়ালের অপরাধ কী?

একজন চিকিৎসক নিজের গবেষণার প্রয়োজনে কয়েক বছর আগে এক জোড়া মানচকিন বেড়ালের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। মানুষের বংশগত রোগের কারণ আবিষ্কার করাই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। গিনিপিগের বদলে বেড়াল দুটোকে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর বিবৃতি হচ্ছে—মানচকিন মোটেই উদ্ভট বেড়াল নয়। যে কোনও স্বাভাবিক বেড়ালের মতো এরা দ্রুত বেগে দৌড়তে পারে। পর্দা বেয়ে বেয়ে উঠতে পারে। বেড়ালসুলভ অধিকাংশ কাজই এরা পারে। শুধু লাভ দিয়ে উঁচু টেবিলে বা তাকে চড়তে পারে না।

কথাটা কিন্তু চিন্তা করার মতো। জীবনে লাফ দেওয়া কি খুবই জরুরি? এক লাফে গাছে চড়া, তিন লাফে মগডালে চড়ে বসা, জলের পাইপ বুকে জড়িয়ে ছাদে ওঠা—সব

মানুষই কি পারে? তাদের পদযুগল দুর্বল বলে কি তারা মনুষ্যপদবাচ্য নয়? তবে তো শ্রীচরণের জোরে চোরেরাই হবে মুখ্য কুলীন? রণে ভঙ্গ দিয়ে বাকি সবাই ভঙ্গ।

ওই যে ডাক্তার, তিনি মানচকিন বেড়াল দুটোর আগাপাশতলা এক্স-রে করেছিলেন। প্রত্যেক জয়েন্ট আর হাড় পরীক্ষা করে দেখেছেন কোথাও গেঁটে বাতের সম্ভাবনা ধরা পড়েনি। এরা যে কালক্রমে পায়ের সাইজ খুইয়ে একেবারে খঞ্জ বেড়াল হয়ে যেতে পারে—তার কোনও লক্ষণই ধরা পড়েনি। ডাক্তার সেই থেকেই মানচকিনদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করছেন।

মানচকিন বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কিন্তু গোঁ ধরে বসে আছেন। বেঁটে-পা বেড়ালদের জন্মাতে দেওয়া নাকি নেহাতই নীতিবহির্ভূত কাজ হচ্ছে। এর মধ্যে ঘুষ দেওয়ার ঘটনাও ঘটে গেছে। মানচকিন ব্রিডাররা ক্যাট অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের কয়েকজন গণ্যমান্য সদস্যকে বেড়াল ঘুষ দিয়েছে। সহানুভূতি আর ভোট পাবার আশায় ক্ষমতাসম্পন্ন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেড়াল ছানা ঢুকিয়ে দিয়ে আসছে। মায়া থেকে কী না হয়? এর ফলে নাকি প্রতিষ্ঠানের পতন ঘনিয়ে আসছে। বিরোধী পক্ষের মহিলা সদস্য গ্যাটি অ্যাড্রিউজ ভীষণ উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন। তিনি মে মাসের ক্যাট শো-তে গিয়ে স্পষ্ট দেখেছেন মানচকিন বেড়ালদের শরীরে বেশ কিছু খুঁত আছে। নিজেও বিচারমণ্ডলীতে ছিলেন তো। এইসব খুঁত নিয়ে প্রশ্ন করলে মানচকিন ব্রিডাররা কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। যেমন—তোবড়ানো হাঁটু, পুঁটলি পাকানো ল্যাজ, বেলুনের মতো লম্বাটে মাথা, বেড়ালদের স্বাভাবিক চেহারার সঙ্গে একটুও মেলে না।

এই তীব্র নিন্দার খবর পেয়ে ইন্টারন্যাশনাল মানচকিন সোসাইটি ওই মহিলাকে ডাইনি বুড়ি বলেছে। শুনে তিনি খেপে গিয়ে বলেছেন—এর বিহিত করে ছাড়বেন।

যাঁরা বেড়াল পোষেন, তাঁরা এইসব গালাগালির খবরে খুবই বিমর্ষ। বেড়ালদের পৃথিবী ক্রমশ কিছু ক্ষমতাশালী মানুষের হাতের মুঠোয় চলে যাচ্ছে। নিজেদের বংশ পরিচয় নিয়ে যাদের কোনও মাথাব্যথা নেই, কালো, ধলো, মেনি, হুলোর বাছ-বিচার নেই, তাদের নিয়েই কিনা এত পলিটিকস। যাঁরা মানচকিন পুষেছেন, তাঁরা তো রীতিমত ক্ষুব্ধ। অপমানিত হয়েছেন।

বেড়াল আর তার মালিককে এভাবে হেয় করলে মালিকেরই যে বেশি কষ্ট হবে, সে তো বোঝাই যায়। দেখা যাচ্ছে মহত্বের কোনও দাম নেই। নাম, ডাকওলা বংশের বেড়াল তো যে কেউ পুষতে পারে। ডলার ফেললেই চালিয়াতি করা যায়। আরব, শ্যামদেশ, পারস্য আর মিশরের রাজকুমারীদের অনায়াসে অঙ্কশায়িনী করা যায়। কিন্তু অখ্যাত বেড়ালকে ঘরে আনে ক'জন? মানচকিনের মতো, আমেরিকান ওয়্যার হেয়ারের মতো পেডিগ্রি-শূন্য বেড়াল নিয়ে মাতামাতি করার জন্যে উদার মন চাই। এ ব্যাপারে নিজেকে আমি ঠিক মহৎ বলছি না, কিন্তু বেড়ালের বংশ পরিচয় দেখে তো আর ব্যবহারের তফাত করিনি? প্রত্যেকটাকে 'দ্যাখ মার' করেছি। কে রকস্যান, কে স্যান্ডি, কে গুয়েনাভিয়ের ব্যানার্জি আর কে ইসাবেলা গাঙ্গুলি, কারুর ম্যাও সামলাইনি। চিলেক, চিরোশের মতো ফুটপাতের বেড়ালও যা, ক্লিওপেট্রার মতো রানিও তাই—আমার চোখে সব এক। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মায়া যে হয় না তা নয়। আমার বন্ধু বিজয়লক্ষ্মী তার মেয়ে সুমিতার পোষা

বেড়াল 'পাবলো'কে দুর্গাপুজোর সময় নিজের বাড়িতে আনিয়ে নিল। ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠীর জীব এরা অ্যাপার্টমেন্টে পড়ে পড়ে কাঁদবে—এই যুক্তি দিয়ে স্বামী পরিমলের মন ভেজাল। পরিমলদার কোনওদিন বেড়ালপ্রীতি ছিল না। কিন্তু মেয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে বেড়াল পুষেছে বলে কিছু বলতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠীর দিনই ওঁদের বাড়িতে ষষ্ঠীর জীবের সাড়ম্বরে বোধন হল। পাবলো এখন প্রায়ই লং আইল্যান্ড থেকে নিউ জার্সির বাড়িতে সুমিতার সঙ্গে ছুটি কাটাতে আসে। আবার গম্ভীর মুখে গাড়ির জানলার ধারে বসে হাইওয়ের শোভা দেখতে দেখতে ফিরে যায়। বিজয়লক্ষ্মী আমাকে বলে—ফোনে 'পাবলো' বলে ডাকলে, ওদিক থেকে সাড়া আসে—মিয়াঁও।

আমার শুনতে বেশ লাগে। মেয়েকে এই সব অনুভূতির কথা অবশ্য ভাঙি না। ভুটিয়া কুকুর মার্কা ক্লিওপেট্রাকে দেখে মনে মনে বলি আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি...। হরিদাসীর জুলজুলে চাউনি মনে পড়ে।

৫ আগস্ট ১৯৯৫

বহুরূপে সম্মুখে তোমার

বেড়ালের সঙ্গে এ জীবনে হৃদ্যতা হল না। তবু তারা আচমকা লাফ দিয়ে আমার ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়ে। লেখায় খানিক জায়গা জুড়ে বসে থাকে। কেন কে জানে? আবার সেই ছায়াসঙ্গিনীদের হামলা টের পাচ্ছি। তবে এবার আর কায়াহীনের মতো কাহিনী নয়। রীতিমত আহ্লাদী চেহারায় কানের এক পাশে ঝুঁটি বেঁধে তারা আমার মেয়ের অ্যাপার্টমেন্টের জানলায় চড়ে বসে আছে। বেড়ালের মালিক বিড়ালাক্ষী লিন্ডা ইপোলিটোর কক্ষ থেকে আমার কন্যার গবাক্ষ—দুই-ই তাদের প্রিয় জায়গা।

নিউ ইয়র্কের ম্যানহার্টনে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির পাড়ায় পুরনো পুরনো বাড়ির মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের অ্যাপার্টমেন্ট। ওই রকমই একটি অ্যাপার্টমেন্টে সিনিয়র ছাত্রী লিন্ডার সঙ্গে আমার মেয়ের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। লিন্ডা পি. এইচ. ডি.-র ছাত্রী। আগে থেকে ওখানে আছে। থিসিসের কাজে মাঝে মাঝে বাইরে যায়। কিন্তু তার পেয়ারের বেড়াল দুটোকে নিয়েই সমস্যা। তাই এমন একজন রুমমেট খুঁজছিল, যে আন্তরিকভাবে বেড়ালের পরিচর্যা করবে।

আমরা একটু বিরক্ত হয়েছি। কস্মিনকালে বাড়িতে বেড়াল পুষিনি। "রকস্যান" নামে ছোট্ট একটা বেড়ালছানাকেও বছর পনেরো আগে এক আমেরিকানের বাড়িতে পাচার করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি নিজে তো বেড়াল সহ্যই করতে পারি না। অথচ মেয়ে ৬ট করে একজোড়া মেনির "ছোড়দি" হয়ে থাকতে যাচ্ছে। "বড়দি" লিন্ডা ইপোলিটোর ভাষায় মার্জার যুগল বড়ই রেসপেক্টফুল অ্যান্ড লাভিং। অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও ভালবাসাসহ বসবাস করে। আমার মেয়ে গত মাসে নিউ জার্সির এক রেস্তোরাঁয় বসে লিন্ডা ইপোলিটোর কাছে

দীর্ঘ ইন্টারভিউ দিল বলা যায়। জীবে প্রেম বিষয়ে প্রভূত আলোচনা। অনেক ছাত্রীই লিন্ডার অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করতে চেয়েছিল। কিন্তু লিন্ডা তাদের ইন্টারভিউ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বেড়াল পরিচর্যা বিষয়ক আলোচনাতেই তারা ফেল করেছিল মনে হয়। যাই হোক, আমার মেয়েকে তার পছন্দ হল। মেয়েও কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একেবারে গা ঘেঁষে ওই বেড়াল নিবাসে থাকাই মনস্থ করল। 'বড়দির' আন্তর্জাতিক জ্ঞান, দার্শনিক কথাবার্তা, জীবে প্রেমের উদাহরণ ইত্যাদির সম্যক পরিচয় পেয়ে বেড়ালের 'নতুনদি' তথা 'ছোড়দি' আমাদের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করল যে বাধ্য হয়ে আগাম বাড়ি ভাড়ার চেক পাঠিয়ে দিলাম।

আমাদের পরবর্তী কথোপকথন হয়েছিল এই রকম—

—তুই বেড়ালসুদ্ধু বাড়ি তো কখনও থেকেছিস?

—না। তুমি তো রকস্যানকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

—বাজে বকিস না। বেড়ালের কী লোভ জানিস? বাইরে যা ফেলে রাখবি, তাই খেয়ে নেবে।

—বাইরে কিছু রাখব না। সব ফ্রিজে রাখব।

—অত খেয়াল থাকে নাকি? লোমে লোমে বাড়ি বোঝাই করবে। বেড়াল হচ্ছে হাড় নোংরা জাত।

—একদম উলটো বলছ! বেড়াল সব সময় নিজেকে ক্লিন করে।

—মাসে মাসে এতগুলো ডলার ভাড়া দিয়ে, আবার দুটো বেড়ালকে খাওয়ানো, লিটার পরিষ্কার করা, তুমি এককথায় রাজি হয়ে গেলে? তাহলে পড়বে কখন শুনি?

—অনেক সময় পাব। আমাকে তো উইকে মাত্র দু/তিনদিন করতে হবে। বাকি দিন লিন্ডা করবে।

—যেখানে সেখানে বেড়ালদুটো হিসি করবে, পটি করবে, বমি করবে, তখন মজা বুঝবে। কোনওদিন কিছু পরিষ্কার করেছ? পাখি পুষেছিলে, সেও আমার ঘাড়ে।

তর্ক বাড়তে থাকে। বেড়ালরা যে ভীষণ লজ্জাশীলা হয়, তারা গোপন কাজকর্ম গোপনেই সারে এবং নির্ধারিত স্থানে। এজন্যে যেখানে সেখানে নোংরা পড়ে থাকার প্রশ্নই নেই, বাথরুমের স্যান্ডবক্সে ক্রিয়াকলাপ সমাধা করে আসে, বেড়ালরা বমি কোথায় করে কেউ জানে না, ইত্যাদি সুসংবাদ পেয়েও আমি শান্ত হই না।

—বেড়াল কিন্তু বেশ ফেরোশাস হয়। আঁচড়ে, কামড়ে দিতে ওস্তাদ!

—লিন্ডা ওদের ডি-ক্লু করিয়েছে বলল। নখই নেই। বাড়ির বেড়াল তো।

—আবার নখ গজাতে কতক্ষণ?

মেয়ে বিজ্ঞের মতো বোঝায়—ডি-ক্লড বেড়ালদের আবার কখন ক্লজ বেরোয় জানো? যখন কেউ ওদের অ্যটাক্ করতে আসে। ধরো কুকুর তেড়ে এল। কিংবা তুমি কর্নার করে মারতে গেছ, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নখ বেরিয়ে আসবে।

—ওরে সর্বনাশ! তুমি যেন ও দুটোকে মারতে যেও না কোনওদিন।

আমার দুশ্চিন্তা দূর করতে মেয়ে বক্তৃতা চালিয়ে যায়—

—সবচেয়ে অ্যাডভানটেজ কী বলো তো? অ্যাপার্টমেন্টে ইঁদুর থাকবে না।

—মোটেই সব অ্যাপার্টমেন্টে ইঁদুর থাকে না।

কথাটা বলেই মনে পড়ে—একবার স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে এক ব্যাচেলরের রান্নাঘরে নেংটি ইঁদুর দেখে এমন আর্তনাদ করে উঠেছিলাম যে পাশের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে এসেছিলেন। সে বোধ হয় বাহাত্তর সালের ঘটনা। নিউ ইয়র্কের ইঁদুরের সঙ্গে অনেকেরই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। এমনকি স্বয়ং সুচিত্রা মিত্রকেও এক নেংটি দর্শন দিয়েছিল। তখন কুইনস-এ তাঁর ছেলে কুনাল থাকত। একদিন ভোর রাতে সুচিত্রা মিত্র রান্নাঘরে ঢুকতেই নেংটির সঙ্গে চোখাচোখি। তাঁর ডাকাডাকিতে কুনালের বউ প্যাম দৌড়ে গেল। নেংটি তখন কিচেন ক্যাবিনেটের আড়ালে শেলটার নিয়েছে। উত্তেজিত প্যাম শোবার ঘরে ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত কুনালের ঝুলন্ত হাত ধরে টানাটানি—বাবু! চুহা! গেট আপ্। বাবু! চুহা! কুনাল পরে বলত—ঘুম চোখে উঠে বুঝতেই পারছি না, বউ আমাকে মার সামনেই ইঁদুর বলছে কোন সাহসে? সুতরাং, ইঁদুর যে নিউ ইয়র্কের হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্টে থাকে না, এমন নয়। এমনকি নিউ জার্সিতে ডাঃ যাদুগোপালের প্রাসাদোপম বাড়িতেও বেসমেন্টে ইঁদুর সংসার পেতেছিল। কোন 'মাওড়া' বন্ধু নাকি বেসমেন্টের ঘরে থাকার সময় হঠাৎ হঠাৎ জানলার কাচ, জাল সব উঠিয়ে দিয়ে মুক্তবায়ু সেবন করত। সেই ফাঁকে মেঠো ইঁদুর মাটির নীচের ঘরে নেমে পড়েছিল। যাদুগোপাল অনেক পরে টের পেয়েছিলেন। তারপর প্রাণঘাতী ইঁদুরকল কিনে এনে স্প্রিঙের এপারে গাদা খানেক করে বাদামের মাখন লাগিয়ে রেখে দিতেন।

—লুভি ইন্দুর গুল্যান পিনাট বাটার খাইতে আইস্যা বেবাক খতম হইসে। রাত্রে ট্র্যাপ রাইখ্যা দিসি। সকালে উইঠ্যাই দেখি ঘাড়ে বাড়ি খাইয়া শ্যাষ। তখন লেজ ধইরা সোজা একরে বরফের গাদায়। উইনটারেই ঢুকছিল তো। মোট ছয়টা পাইসিলাম। তারপরেও কয়দিন ট্র্যাপ পাইত্যা অবজার্ভ করসিলাম। আর আসে নাই।

কিন্তু ধেড়ে ইঁদুর মারা নিয়ে এখানে কী ঝামেলা হয়ে গেল! উত্তর নিউ জার্সিতে হিলসাইড শহরের ঘটনা। কার্ল নামে একজনের বাগানে অনবরত তারা এসে টমেটো খেয়ে যায়। বেড়া দেওয়া বাগান। তবু নিস্তার নেই। খরগোশ কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। কার্ল শেষমেশ একটা বড় খাঁচার মধ্যে টমেটো ঝুলিয়ে চোর ধরতে গিয়েছিল। প্রথম রাতে কেউ ধরা পড়ল না। দ্বিতীয় দিন ধরা পড়ল বেশ মোটা সোটা একটা ইঁদুর। টমেটোর লোভে খাঁচায় ঢুকে আটকা পড়ে গেছে। কার্ল ভোরবেলায় টমেটো চোরকে আবিষ্কার করেই সোজা লোক্যাল হিউমেন সোসাইটিকে ফোন করল। জ্যান্ত ইঁদুর ধরে নিয়ে যাওয়া ওদেরই কাজ। বিশেষ করে অত বড় ইঁদুর নিয়ে কী করা উচিত আমরা তো জানিও না। কার্ল বেশ বুদ্ধি করেই খবর দিয়েছিল। তারপর কফির মগ হাতে নিয়ে বাগানে বসে বসে কলে পড়া জন্তুর হালচাল লক্ষ করছিল। হিউমেন সোসাইটির গাড়ি আর আসে না। ইঁদুর নিয়ে যাওয়ার কোনও ব্যস্ততাই নেই। হঠাৎ কার্ল দেখে ইঁদুরটা গরাদের ফাঁক দিয়ে মুণ্ডু বের করে ইতিউতি দেখছে। ক্রমশ ক্রমশ খেলিয়ে খেলিয়ে শরীরটাও বাইরে আনার চেষ্টা করছে। কার্ল লক্ষ করছিল ইঁদুরের সফলতার হার বেশ ঊর্ধ্বগামী আর বেশি সময় দিলে নির্ঘাৎ খাঁচা থেকে বেরিয়ে চম্পট দেবে। আবার রাতে এসে টমেটো খেতে বসবে। কার্ল তখন ঝাঁটার কাঠি নিয়ে এল। যতক্ষণ না হিউমেন সোসাইটির গাড়ি আসে, ইঁদুরটাকে

ঠেলেঠুলে খাঁচায় বসিয়ে রাখা উচিত। কাঠি ফুটিয়ে ফুটিয়ে ভেতরে ঠেলে দিচ্ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ইঁদুরও বন্দি থাকবে না। লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কার্ল বাধ্য হয়ে ঝাঁটার কাঠির খোঁচায় তাকে রক্তাক্ত করাতে হুট করে মরে গেছে।

হিউমেন সোসাইটির গাড়ি এল। স্বেচ্ছাসেবকরা জ্যান্ত ধেড়ে ইঁদুরের বদলে রক্তাক্ত মরা ইঁদুর দেখে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। ঝাঁটার কাঠির কাহিনী খুঁটিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিল। অকুস্থলের ছবি তুলল। খাঁচার মধ্যে শহিদ মুষিক। তারপর খাঁচাসমেত শহিদকে নিয়ে চলে গেল। কার্ল তো আসলে খাঁচাটা কেনেনি। শহরের পার্ক অ্যান্ড রিক্রিয়েশন অফিসের কাছ থেকে ইঁদুর ধরতে চেয়ে নিয়েছিল। কাজ হয়ে গেলে ফেরত দেওয়ার কথা। কিন্তু হিউমেন সোসাইটি খাঁচা দুলিয়ে চলে যাওয়াতে মুশকিল হল। একদিন অপেক্ষা করে কার্ল সোসাইটির কাছে খাঁচা ফেরত চাইতে গিয়েই বিপদে পড়ল। খাঁচাটা নাকি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কার্লের নামে কোর্ট থেকে সমন জারি করা হয়েছে। অভিযোগ এই মর্মে—'ইঁদুরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ও অস্বাভাবিক উপায়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার অপরাধ।' হিউমেন সোসাইটির অফিসারদের বক্তব্য—অতবড় ইঁদুর কখনই ওই খাঁচা থেকে পালিয়ে যেতে পারত না। তাকে মেরে শেষ করে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। এই নির্দয় কাজের জন্যে অপরাধীকে কোর্টে যেতে হবে আর মোটা রকম জরিমানা দিতে হবে।

নিরুপায় কার্ল এখন উকিল লাগিয়েছে। একদিন তাকে টিভি-তে দেখাল। "অ্যানিম্যাল রাইট্স অ্যাকটিভিস্ট'-দের সঙ্গে সে তর্কযুদ্ধে নেমেছে। কার্ল বলছে—আমি তো মারতে চাইনি। ইঁদুরটাকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম। মারার ইচ্ছে থাকলে তো প্রথমেই অন্য কিছু দিয়ে চেষ্টা করতাম। তাহলে আর হিউমেন সোসাইটিকে আসতে বলব কেন? আমার বিরুদ্ধে অকারণ অভিযোগ আনা হয়েছে। রোজ রোজ টমেটো খেয়ে যাবে, আর তাকে আমি খাঁচা থেকে পালিয়ে যেতে দেব?

ইঁদুরের অপমৃত্যুতে শোকাহত লোকেরা বলছেন—তাই বলে ঝাঁটার কাঠি বিঁধিয়ে দিয়ে ইঁদুর মারতে হয়? দেখা যাক মামলার ফল কী দাঁড়ায়? শুধু তো ইঁদুরের মামলা নয়। এর ওপর আছে কালো কাঠবেড়ালির মামলা। এক মহিলা সন্ধের পর একটি পার্কের ভেতরে পিচের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন নাকি পার্ক বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশ যথারীতি খপ করে ধরল। এবং সমন ধরিয়ে দিল। এক তো ট্রেস্পাসিং-এর অভিযোগ, তার ওপর ওই পার্কের বাসিন্দা এক কালো কাঠবেড়ালীকে নার্ভাস করে দেওয়ার জন্যে অভিযোগ। সমনে লেখা ছিল—ট্রেসপ্যাসিং অ্যান্ড স্কেয়ারিং এ ব্ল্যাক স্কুইরল। মহিলা প্রসিকিউশনের ভয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন। জজসাহেব একমাস জেল দিতে পারেন। আর জরিমানা তো দিতেই হবে।

কাঠবেড়ালির মামলার খবরটা চাউর হওয়ার পর আমাকে বেশ সতর্ক হতে হল। ঝোপে ঝাড়ে তাদের বংশবৃদ্ধির কারণে এমনিতেই দেখে শুনে চলি। কিন্তু তাদের ক্রীড়াভূমির সীমানা যেন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বাড়ির পেছনে মুক্তমেলা বসিয়েছে বহুকাল। এখন সামনের সিঁড়িতে বসে পুঁতির মতো চোখ ঘুরিয়ে তাকায়। তারপরেই ঝোপের মধ্যে উধাও। ডাকবাক্স যেখানে, সেখানে পেভমেন্টের ধারে বেশ একটা গভীর সুড়ঙ্গ লক্ষ করছি। কে কবে পা মচকে পড়ব ভেবে গর্তটা ভরাট করা দরকার মনে হল।

ক্রিস আমাদের চেনা মিস্ত্রি। দেখে শুনে বলে গেল একদিন এসে সিমেন্ট আর ইট দিয়ে জায়গাটা সমান করে দেবে।

তার পরের দিনই বোধহয় চিঠি আনতে গিয়ে দেখি মেইলম্যান ঝুঁকে পড়ে হাসছে। ভ্যানের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল—ওহ বয়! দে মাস্ট হ্যাভ এ ওয়াচ!

—কে? কাদের কথা বলছ?

—তোমার চিপমাংক্ পপুলেশন লক্ষ করছ? ওই গর্তটার মধ্যে সবচেয়ে ছোটগুলো থাকে। রোজ ঠিক এই সময় বাইরে এসে খেলবে। যে-ই আমার ভ্যান দেখবে, অমনি গর্তে ঢুকে যাবে।

কাঠবেড়ালির শিশু সন্তানদের দূর থেকে দেখেছি বটে। হাতের পাতার ওপর ধরে যায়, এত ছোট্ট। রোগা রোগা চেহারা। চুনে, হলুদে মেশানো পিঠ আর ল্যাজের রং। তির তির করে পালায়। এরা যে ওই সুড়ঙ্গে থাকে জানতাম না। মুক্তমেলার হট্টগোল থেকে দূরে এই গর্ভগৃহ। মেইলম্যান-ই খবরটা দিয়ে গেল। ক্রিসকে বারণ করে দিলাম। এতগুলো আনারকলি দেওয়াল চাপা পড়ে 'অলবিদা অলবিদা' গাইছে সঙ্গে ফুটপাতে বসে ওদের মায়েদের 'দেবতার গ্রাস'...আমার সহ্য হবে না। পার্কের কালো কাঠবেড়ালি যদি মহিলার গাড়ি দেখেই চিন্তিত হয়ে থাকে, তবে এ পাড়ার খয়েরিদের সম্মিলিত মাতৃশোক চিন্তা করুন! নাঃ চুনে-হলুদ মার্কা কাঠবেড়ালি ছানাদের হত্যামামলায় আসামী হতে চাই না। তারচেয়ে সপরিবারে পা মচকে চুন-হলুদের অভাবে উগ্র গন্ধ মলম লাগিয়ে বসে থাকব। হিউমেন সোসাইটির খপ্পরে পড়ার আগে সাবধান হওয়া ভাল। ক্রিস এল। দেখে বলল—আগে হোস্‌পাইপ দিয়ে জল ছেড়ে ছানাগুলোকে বাইরে নিয়ে আসব। তারপর গর্ত বুজিয়ে দেব।

আমি বারণ করেছি। মেইলম্যানটাই আমাদের ডোবাতে পারে। রোজ তার টহলের সময় এক লহমার জন্যে ওদের দেখেই কী উচ্ছ্বাস। হঠাৎ সিমেন্টের কবর দেখলে কোথায় রিপোর্ট ঠুকে দিয়ে আসবে কে বলতে পারে?

গত বছরের শেষে 'ভূত-অপসারণ' নামে একটা ঘটনা লিখেছিলাম। একই ধরনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কিন্তু এবার গরমকালে আবার নতুন অভিজ্ঞতা হল। বেড়াল, ইঁদুর, কাঠবেড়ালির উপাখ্যানের উপসংহারে আর একটি উদ্ভট জন্তুর আবির্ভাবের ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তবে তাকে আমি চোখে দেখিনি। শুধু দাপট সহ্য করেছি।

এবার সারা শীতকাল ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালা হয়নি। যে জন্যে ছাদের চিমনি থেকে ফায়ার প্লেসের মাঝখানে যে ফাঁপা অংশ, তার একেবারে নীচে শেষ প্রান্তে ড্যামপার বা ভালভটা আর খোলার দরকার হয়নি। ফায়ার প্লেস কাচের শাটার দিয়ে ঘেরা। ভেতরেও লোহার ট্রে পরিষ্কার করে রাখা আছে। আর ছাদের দিকের ড্যামপারও শক্ত করে এঁটে বসানো। অথচ দুপুরবেলা ওখান থেকে হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব আওয়াজ পাচ্ছিলাম। মার্চ, এপ্রিল মাস থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। দিনে এক অভিজ্ঞতা। রাতে অন্যরকম। দিনের বেলা ফ্যামিলিরুমে বসে হঠাৎ হঠাৎ ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ পেতাম। যেন কেউ দেওয়ালের মধ্যে বসে শ্বাস ফেলছে। কখনও ড্যামপার-এর ঠিক ওপরে খশখশ আওয়াজ। নিঝুম দুপুরে গরর গরর করে গর্জন। আবার সারাদিন চুপচাপ। মাঝে মাঝে রাতে শোবার

ঘরের মাথার দিকের দেওয়ালের গায়ে দড়াম করে ধাক্কা। কখনও ছাদের ওপর ধুপ করে লাফ।

শীতকালে অনেকের বাড়ির ছাদের খাঁজে কাঠবেড়ালিরা আশ্রয় নেয়। কিন্তু অ্যাটিকে অর্থাৎ ছাদের লম্বা ঘরের ভেতরে ঢোকা তো সম্ভব নয়। দোতলার সিলিং-এর ওপরে সবটাই অ্যাটিকের ঘর। বাড়ির ভেতর থেকে লফ্‌ট দিয়ে সেখানে ঢুকি। কিন্তু বাড়ির বাইরের দেওয়াল বা ছাদ থেকে তো সেখানে ঢোকার কোনও উপায় নেই। তাহলে নিশুতি রাতে হচ্ছেটা কী? এক এক রাতে মনে হয় চিমনির মধ্যে ঝুটোপুটি চলছে। ধাঁই করে পতনের আওয়াজ। হঠাৎ একদিন দুপুর থেকে নীচের তলার ফায়ার প্লেসের আড়ালে লাগাতার কিচকিচ ডাক। অনেকটা পাখি ডাকার মতো। আবার সেই আগের গরর গরর আর খশখশানিও কানে এল।

এইসব রহস্য উন্মোচনে আমার যা গরজ, এমন আর কারও নয়। অন্যপক্ষে প্রথমে অবিশ্বাসপর্ব, ক্রমশ সংশয়পর্ব এমন পরিশেষে স্থিতপ্রজ্ঞভাব—এভাবেই চলতে থাকে।

শ্রবণ শক্তির উপর নির্ভর করে অদেখা নিশাচরের গতিবিধি ওয়াচ করতে করতে সন্দেহ হল—নির্ঘাৎ চিমনিতে গোটা দুই র‍্যাকুন ঢুকেছে। কারণ কাঠবেড়ালি পরিবৃত জীবনে কখনও এমন দাপট সহ্য করতে হয়নি। তারা সারাদিন মাঠে ঘাটে খেলে বেড়ায়। কিন্তু র‍্যাকুনের স্বভাব অন্যরকম। বেড়ালে, শেয়ালে মেলানো মুখ। চোখের নীচে সাত-পোঁচ কালি। লোমভর্তি লম্বা ল্যাজের ওপর কালো কালো চক্কর। নিশাচর জীব বলে দিনে কখনও দেখতেই পাই না।

"ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিসেস' নামে একটা প্রাইভেট কোম্পানির নাম নিলাম আমাদের শহরের পৌরবিভাগ থেকে। ইতিমধ্যে, টেলিফোন গাইড ঘেঁটে আরও অনেক লোকের নামধাম পেয়েছি, যারা চিমনিক্লিন করতে এসে 'র‍্যাকুন রিমুভ্যাল'ও করে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। আমার অনুমান মোটেই ভুল নয়। চিমনিতে দেখছি র‍্যাকনই বেশি ঢোকে। কিন্তু আন্দাজে অচেনা লোক না জুটিয়ে পৌরবিভাগের রেফারেন্স নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ক্লার্ককে বাড়িতে ডাকলাম।

বিশাল লম্বা, শক্ত সমর্থ চেহারার এক সাহেব এসে প্রথমেই ফায়ার প্লেসের কাচের শাটার খুলে ওপরের ড্যাম্পারের গন্ধ শুঁকতে বসে গেল। বড় বড় নিঃশ্বাস টেনে এবং ফেলে ঘোষণা করল—ইয়াপ। ইউ আর রাইট! র‍্যাকুনের গন্ধ পাচ্ছি।

আমি ততক্ষণে বাথরুমের দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি। নিশ্চয়ই এবার ভাল্‌ভ খুলে পটাপট র‍্যাকুন ধরবে আর সঙ্গে আনা মস্ত খাঁচায় ভরবে। আমি তার আগেই বাথরুমে ঢুকে লুকিয়ে পড়ব। জলাতঙ্ক ডেঞ্জারাস রোগ। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ক্লার্ক কিছুই করল না। বাইরে গিয়ে মই লাগিয়ে ছাদে উঠল। চিমনির ওপর থেকে উঁকি মেরে গভীর পর্যবেক্ষণে মগ্ন হয়ে থাকল। তারপর নেমে এসে বলল—ইউ শুড হ্যাভ কলড মি বিফোর। উইন্টারের শেষে মাদার র‍্যাকুন অন্তত তিন, চারটে বাচ্চা পেড়েছে। ওই ফায়ার প্লেসের দেওয়ালের পেছনেই ওরা থাকে। কিন্তু এখন বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে। ভাল্‌ভ খুলে টেনে নামাতে গেলে সবাই মিলে কামড়ে দেবে। তাই, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

—কিন্তু কোনওবার তো এরকম হয়নি। এবার চিমনি দিয়ে ঢুকল কী করে?

—ছাদের ওপর চিমনি-ক্যাপ ভেঙে গেছে। ভেতরের জাল কেটে নেমে পড়েছে। নতুন ক্যাপ বসিয়ে দিয়ে যাব। তবে তার আগে র‍্যাকুনদের বাইরে আনতে হবে।

ফ্র্যাঙ্ক সেদিন ছাদে দাঁড়িয়ে চিমনির ফোকরে মুঠোমুঠো ন্যাপথালিনের বল ফেলে দিয়ে গেল। র‍্যাকুন নাকি ওই গন্ধ সহ্য করতে পারে না। তারপর বিশাল লম্বা তার দেওয়া এক জোরালো ল্যাম্প নিয়ে ছাদে উঠে গেল। সার্চ লাইটের মতো আলো একেবারে নীচ পর্যন্ত নামিয়ে রাখল। বাড়ির গা বেয়ে কটকটে কমলা রঙের মোটা তার ঝুলে আছে। প্লাগপয়েন্ট আছে গ্যারাজে। শুনলাম প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ওই আলো জ্বলবে। কারণ র‍্যাকুন আলো সহ্য করতে পারে না। ফ্র্যাঙ্ক-এর এসব কাজে বিপুল অভিজ্ঞতা। ২৫ বছর পুলিশের চাকরির পর রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। পুলিশ অফিসার থেকে জীবজন্তু ধরার ব্যবসা ফেঁদেছে। চাকরি জীবনে ট্রেনিং তো নেওয়াই ছিল। আমাদের শহরে যে দু' তিনবার ভাল্লুক এসেছিল, ফ্র্যাঙ্কই নাকি তাদের ঘুমের ওষুধের তীর ছুড়ে থলে বন্দি করে জঙ্গলে ছেড়ে এসেছিল। গৃহস্থের বাড়ি থেকে জন্তু জানোয়ার উদ্ধার করে তাদের বনবাস দেওয়াই ওর এখনকার পেশা। ফ্র্যাঙ্কও লোক্যাল হিউমেন সোসাইটি'র আজীবন সদস্য। বাড়িতে পোষা র‍্যাকুন, কুকুর, বেড়াল, পাখি আর গোসাপ আছে। ব্যাগ খুলে দুটো ছবি দেখাল। পুলিশ অফিসারের পোশাকে স্মার্ট ফ্র্যাঙ্ক। কোলে র‍্যাকুন নিয়ে বসে হাসছে। বারবার আফসোস করছিল আগে ডাকলে এখানে এসে কতগুলো র‍্যাকুন ছানা বাড়ি নিয়ে যেতে পারত। এখন তো আর পোষ মানবে না। বনবাস দেওয়া ছাড়া গতি নেই।

র‍্যাকুন পরিবারের নির্বাসনের জন্যে ন্যাপথালিন, জোরালো আলোর ব্যবস্থা করেই ফ্র্যাঙ্ক নিশ্চিন্ত হল না। ছোট্ট রেডিওতে রকমিউজিকের স্টেশন ধরে ফায়ারপ্লেসের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে গেল। র‍্যাকুনরা নাকি আদৌ সঙ্গীত পিপাসু নয়। তার ওপর রক নিউজিক তো সহ্যই করতে পারে না। গানের শুঁতোয় আস্তানা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমার কানের গুঁতো কে সামলাবে? অষ্টপ্রহর সংকীর্তন চললে তো মহা মুশকিল। ফ্র্যাঙ্ক বলে গেল—এক রাত্তিরেই ওরা উদ্বাস্তু হয়ে চলে যাবে। রাতে ওরা মোটেই আর এখন ওখানে থাকে না। আগে বাচ্চা হওয়ার জন্যে এসেছিল। বাচ্চাগুলোকে শক্ত সমর্থ করা পর্যন্ত ওখানেই রাতে ফিরে ফিরে আসত। খাবার এনে খাওয়াত। তাই অত ধুম ধাড়াক্কার আওয়াজ। র‍্যাকুন দম্পতির লীলাখেলার ঝুটোপুটি। এখন ওরা সদলবলে রাতে বাইরে চরতে বেরয়। অন্ধকার গাঢ় হলেই ফায়ারপ্লেসের দেওয়াল বেয়ে হাঁচোড়পাঁচোড় করে চিমনি দিয়ে ছাদে ওঠে। তারপর বাড়ির ছাদে গিয়ে দৌড় মারে। ছাদের গায়ে নুনে পড়া চেরি গাছের ডালে চড়ে তরতরিয়ে বাগানে নামে। আবার ভোরের আলো ফোটার আগে ওই পথেই চিমনির মধ্যে ফিরে আসে। সেই জন্যে দুপুরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ পাই। এরা তখন নাকি জড়াজড়ি করে লম্বা ঘুম দেয়। কিন্তু এই যে ফ্র্যাঙ্ক শব্দ, গন্ধ আর আলো রেখে যাচ্ছে, আর ওরা ভোরবেলা চিমনিতে ঢুকবে না। ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে বিরক্ত হয়ে ফিরে যাবে। ঠিক দু'দিন বাদে ফ্র্যাঙ্ক এসে আলো তুলে নেবে। ছাদে চিমনির মুখে লোহার নতুন ক্যাপ বসিয়ে দেবে।

ঠিক তাই-ই হল। দিনে, রাতে র‍্যাকুনদের কোনও সাড়া শব্দ পেলাম না। রক মিউজিক বন্ধ করে মাঝে মাঝে কান পেতে থাকি। রেচক, কুম্ভক কিছুই শোনা যায় না।

দুদিন বাদে ফ্র্যাঙ্ক ফিরে এল। র‍্যাকুনের নির্বাসন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে আলো তুলে নিল। রক মিউজিক বন্ধ করল। ছাদে উঠে নতুন চিমনি ক্যাপ লাগিয়ে দিয়ে এল। সবসুদ্ধ পারিশ্রমিক নিল একশো পঁচাত্তর ডলার। দেড়শো ডলার নির্বাসনের জন্যে, পঁচিশ ডলার চিমনি ক্যাপের জন্যে।

আমি বললাম—সবই তো হল অনুমানের ওপর। র‍্যাকুনগুলোকে একদিনও চোখে দেখলাম না। সাপটাপ ছিল না তো? হয়তো এখনও আছে। গণ্ডগোলে চুপ মেরে গেছে। যদি আবার কোনও শব্দ পাই। তখন কী করব?

—আবার আমাকে ডাকবে। তখন কোনও ফি নেব না। আবার নতুন করে খুঁজব। সাপ হলেও তুলে নিয়ে যাব।

—সাপকেও জ্যান্ত নিয়ে চলে যাবে?

—নয়তো কী? জঙ্গলে ছেড়ে আসব। পুষতেও পারি।

রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার হেসে ওঠে।

আপাতত শব্দহীন বাড়িতে স্বস্তিতেই আছি। আর কোনও উপদ্রব হবে বলে মনে হয় না। শুধু ম্যানহাটনে যখন মেয়ের অ্যাপার্টমেন্টে বেড়াতে যাব, বেড়াল দুটো পায়ে পায়ে ঘুরবে। তাদের নির্বাসন দেওয়ার কোনও এক্তিয়ারই নেই। সেই 'রেসপেক্টফুল অ্যান্ড লাভিং' বেড়ালদের প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করার জন্য মেয়ে আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছে। রামের জীব ডাকবাক্সের নীচের গর্তে, কেষ্টর জীব ম্যানহাটনের ঘরের জানলায়—বহুরূপে সম্মুখে আমার কে বা কাহারা আছে জানি না। হৃদয় প্রসন্ন হও।

২২ অক্টোবর ১৯৯৪

শুয়োর সংস্কৃতি

শূকর সংস্কৃতির জন্যে আয়ওয়া রাজ্যের বেশ খ্যাতি ছড়িয়েছে। প্রত্যেক বছর শূকর সুন্দরীদের আন্তঃরাজ্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হয়। বালতির মতো বেঢপ মাথায় 'পর্ক্-কুইন্'-এর মুকুট চাপিয়ে বসে থাকে সেরা রূপসী শুকরিণী। কাগজে তার ছবি ছাপা হয়। আয়ওয়ার ছোট ছোট শহরের এয়ারপোর্টের দোকানে শূকর স্মরণিকার ছড়াছড়ি। চীনে মাটির ফুলদানি কিনতে চান? দুধ সাদা একটি শুয়োর দন্ত বিস্তার করে চেয়ে আছে। গাঢ় গোলাপি কান ফুলের পাপড়ির মতো, এলানো। নুন, গোলমরিচের শিশি কিনবেন? দেখবেন শো-কেসে জোড়া জোড়া শুয়োর ছানা মাথায় ছ্যাঁদা নিয়ে দাঁড়িয়ে। টি-পট চান? ছাই রঙা পোর্সেলিনের তৈরি সুগোল শূকরী মাতা পেয়ে যাবেন। আয়ওয়ার ঘরে ঘরে শুয়োরের কদর। গ্রামে প্রতি তিনজন চাষীর মধ্যে অন্তত একজনের শুয়োরের কারবার। যে কোনও বেকার এবং স্বল্পশিক্ষিত যুবকের প্রথম উপার্জনের জন্যে সহজ মূলধন হল শুয়োরের বাচ্চা। সামান্য পুঁজি নিয়ে নিশ্চিত রুজি রোজগারের জন্যে শুয়োর-ই শিওর শট। কী ই

বা লাগে বলুন না? এক ফালি, জমি, মাথায় একটু চাল বসিয়ে নিয়ে দু-চারটে শুয়োরকে খেতে দেওয়া। গরমকালে পরতে দেওয়ারও বালাই নেই। দ্যাখ না দ্যাখ শুয়োরের পাল বাড়তে থাকবে। তখন বংশ বিস্তারের জন্যে আবার ওই দু-চারটেকে খোয়াড়ে পুরে রেখে বাকিদের মিছিল শুদ্ধু ঘাতকের লরিতে চাপিয়ে দেওয়া। এক এক পাল বিক্রি হবে আর বেকার যুবকের হাল ফিরতে থাকবে। শুয়োরের 'হলোকাস্ট' আর সাহেবের ব্রেকফাস্ট। দুই আবহমান কাল ধরে চলছে, চলবে। কিন্তু সকলেই তো শুয়োরের ব্যবসায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কেউ কেউ একটু গুছিয়ে নেওয়ার পর আর শুয়োর চালাচালি করতে চায় না। চাষী হতে চায়। জমিতে ভুট্টা ফলানোর স্বপ্ন দেখে। আয়ওয়া রাজ্যে ভুট্টাচাষীদের ভারী মান সম্মান। তো, সেই মান পাওয়ার রাজ্যে ভুট্টাচাষীদের ভারী মান সম্মান। তো, সেই মান পাওয়ার আশায় অনেকে শুয়োর ব্যবসার লাভের অঙ্কের সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া চাষী ঋণ যোগ করে চাষের জমি কিনে ফেলে। খোয়াড় থেকে খামার। বরাহ সরবরাহে ইস্তফা দিয়ে ভুট্টার মৌরসি পাট্টা। তবে এখনও পর্যন্ত শুয়োরের ব্যবসা বহু পরিবারের একচেটিয়া রয়েছে।

ইদানীং শুয়োরওলাদের মধ্যে ভীষণ ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়েছে। ছোট ব্যবসাদারদের সঙ্গে বড় শিল্পপতিদের সংঘাত। সম্প্রতি যা যা ঘটেছে জানাচ্ছি।

আয়ওয়ার ক্ল্যারিয়ন শহরটি এত ছোট যে মাত্র দুটি ট্রাফিক সিগন্যাল আছে। ভারী শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা। রোজ রোজ খবরের কাগজও বেরয় না। একটি সাপ্তাহিক কাগজ ক্ল্যারিয়নের খুটিনাটি খবর নিয়ে বেরয়। বেশির ভাগই তুচ্ছ ঘটনার বিবরণ। পপলার লেনের বাসিন্দার ঘাস কাটার সময় লন মোয়ারের গর্জনে কভেনট্রি রোডের খোয়াড়ের শুয়োররা বেজায় হুড়োহুড়ি করেছে। এসব হচ্ছে সাপ্তাহিক পত্রিকার স্থানীয় ঘটনার প্রতিবেদন। ব্যবসা বাণিজ্যের পৃষ্ঠাও আছে। সেখানে ভুট্টা চাষ আর শুয়োর প্রতিপালনের ব্যবসার লাভ ক্ষতির হিসেব-ই প্রধান বিষয়।

কিন্তু ক্ল্যারিয়নের শুয়োররা হঠাৎ শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে উঠেছে। এতদিন তারা ছিল কুটির শিল্পের উপাদান। কুটিরের নীচে বংশ বৃদ্ধি করে মধ্যবিত্ত মানুষের আয় বৃদ্ধি করত। চাষীদের সঙ্গে শুয়োর ব্যবসায়ীদের কোনও ব্যবসাগত স্বার্থের সংঘাত ছিল না। কিন্তু এখন শুয়োর ব্যবসা ক্রমশ হাইটেক এগ্রিকালচার হয়ে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাচ্ছে। আয়ওয়ার রাইট কাউন্ট্রির ছোট ছোট গ্রাম মার্কা শহরগুলোয় বিরাট বিরাট কারখানা গড়ে উঠেছে। শুয়োর তৈরির কারখানা। জীব-বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে হাজার হাজার শুয়োর ছানা জন্মের আগে থেকেই তাদের ওপর নানা পরীক্ষা চলছে। সমজাতীয় শুয়োর উৎপাদনের জন্যে, তাদের জাতি, বর্ণ, বর্গ সব কিছুর বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে দিতে এমন সব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে যে জন্মের পরে এবং জবাই হওয়ার আগে পর্যন্ত সবাইকে মনে হচ্ছে হুবহু এক শুয়োর। হাইটেক করপোরেট ইন্ডাস্ট্রির ছাঁচে ঢালা মাল। কাতারে কাতারে এত নিখুঁত শুয়োর জন্মাচ্ছে বলে তাদের চাহিদাও বেড়ে গেছে। দামেও সস্তা। কারণ বরাহ সরবরাহের জন্যে বড় শিল্পপতিরা খুবই ঘন ঘন উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছেন। কুটির শিল্পের চালা ভেঙে পড়ার জোগাড়। গরিব শুয়োরওয়ালারা পাল্লা টানতে পারছেন না। সাপ্লাই বেশি হয়ে গেছে বলে বাজারে তাদের শুয়োরের দাম পড়ে

যাচ্ছে। এ অবস্থায় ব্যবসা চালানোই কঠিন। তার উপর নতুন উৎপাত হয়েছে দুর্গন্ধের প্রস্রবন।

ওই যে বিশাল বিশাল কারখানা, সেখান থেকে শুয়োরের মল মূত্র নিকাশি নালা এসে বাইরের আবর্জনা সরোবরে মিশেছে। আবর্জনা সরোবর অবশ্য কখনই টই টম্বুর থাকে না। সার বিতরণের মহৎ উদ্দেশ্যে শুকর বিষ্ঠার পুনর্ব্যবহার হয়। 'ম্যানিওর গানস' দিয়ে সরোবর শুষে নিয়ে, সেই উৎকৃষ্ট সার কাছাকাছি খেত খামারে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওইটুকু তো এলাকা। ফলে গৃহস্থ বাড়ির আশপাশের জমিতে সেই সার মিশে যায়। সরোবর শোষণের পর যন্ত্রপাতি থেকে পথ চলতি গাড়ির গায়েও এক আধ দিন ছিটে লাগে। আর দুর্গন্ধের কথা তো কহতব্য নয়! অতিষ্ঠ লোকজন অনেকেই বাড়ি বিক্রি করে একটু বড় শহরে চলে যাচ্ছেন। পুতিগন্ধের অত্যাচারে ওইসব কারখানার মাইল খানেকের কাছাকাছি আর বাস করা সম্ভব হচ্ছে না—এমনই অবস্থা।

বড় বড় কোম্পানির অবিবেচনায় আয়ওয়ার গ্রামাঞ্চলে চাষীদের এবং শুয়োর ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রা আর আগের মতো স্বচ্ছন্দ নেই। গত বছরে 'আয়ওয়া সিলেক্ট ফার্মস' আর নর্থ ক্যারোলাইনা রাজ্যের 'মার্ফি ফ্যামিলি ফার্মস' ছাড়াও অন্যান্য বড় বড় কোম্পানি এমন হারে উচ্চবংশীয় সুস্থ, সবল, শুয়োর উৎপাদন করিয়েছে, যার ফলে সারা আমেরিকায় শুয়োরের ছড়াছড়ি। কুড়ি বছরের মধ্যে তাদের দাম এত সস্তা হয়নি। কুটির শিল্প পারবে কেন? তাদের খরচ খরচা যা পড়ে, তার চেয়েও কম দামে আমেরিকার বাজারে কারখানাজাত 'সর্বগুণময়' শুয়োর পাওয়া যাচ্ছে। এই লড়াই সম্ভব নয় বুঝে গত বছরের শেষাশেষি আয়ওয়া রাজ্যের প্রায় চার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শুয়োরের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে।

সমস্যা আরও আছে। আয়ওয়া রাজ্য সরকার কৃষি ব্যবসায়ে কোনও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে জমি দেয় না। এ রাজ্যে ফার্মল্যান্ড বলতে ছোট ছোট মালিকানার অধীনে চাষবাস হয়। চাষের জমিতে তো বটেই, পোলট্রি ফার্মিং-এর জন্যেও করপোরেট ওনারশিপ-এর অনুমতি দেওয়া হয় না। এ জন্যে এ রাজ্যে আর একটি লাইভ স্টক-এর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। মুরগির ব্যবসা এক সময় কুটির শিল্পের আওতায় ছিল। তাকে বিশাল ফার্মে পরিণত করতে গিয়ে আয়ওয়ার পোলট্রি ব্যবসায়ীরা রাজ্য সরকারের নজরে পড়ে গেলেন। নিষেধাজ্ঞার ফলে সম্পূর্ণ লাইভ স্টক ব্যবসাই তুলে দিতে হল। এখন শুয়োরের কারখানার বাড় বাড়ন্ত, দুর্গন্ধময় পরিবেশের খবর পেয়ে রাজ্য সরকার যদি এই রাজ্য থেকে শুয়োরের ব্যবসাও বন্ধ করে দেয়, তবে বহু পরিবারে আর্থিক সমস্যা দেখা দেবে। মুরগি হাতছাড়া, শুয়োর হাতছাড়া—সাধারণ মানুষ তবে কী নিয়ে বাণিজ্য করবে? খুবই চিন্তার কথা। রাজ্য থেকে একের পর এক জীবজন্তুর ফার্ম তুলে দিলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থাই বা কী দাঁড়াবে?

এই ইস্যু নিয়ে এখন রাইট কাউন্টির বোর্ড অফ সুপারভাইজারদের ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে। বড় বড় কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছোট ছোট শুয়োর ব্যবসায়ী, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বাসিন্দারা, অনেকদিন আগে মুরগির ব্যবসা লাটে ওঠার ফলে ক্ষুব্ধ লোকজন—সকলেই ভীষণ প্রতিবাদ জানাতে আসছেন। মাঝে মাঝে এমন তর্কাতর্কি বেধে যাচ্ছে যে শান্তি রক্ষার জন্যে সুপারভাইজাররা প্যানিক-বটন টিপে

দিচ্ছেন। ঝটিতি শেরিফের অফিস থেকে সিকিউরিটির লোকজন এসে হাজির হচ্ছেন। কারখানায় ঢুকে পড়ে শুয়োরদের আতঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিল তিনজন মস্তান। গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে খালাস পেয়েছে। ওদিকে অত্যাধুনিক ডিজাইনের 'করপোরেট হগ কম্‌প্লেক্সে'র জন্যে যেসব কনসট্রাকশন সাইটে কাজ চলেছে, সেখানেও পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে। কারণ বেশ কয়েকবার মস্তানরা হানা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

এ সম্পর্কে 'আয়ওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি'র কৃষিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড টপেল জানিয়েছেন—শুয়োর ইস্যু নিয়ে এখন শহরে শহরে আন্দোলন, উত্তেজনা বেড়ে চলেছে। ছোট ব্যবসায়ীর সঙ্গে বড় ব্যবসায়ীর ঝগড়া, মনোমালিন্য, হারানো মুরগির ব্যবসার শোকে নতুন করে মুহ্যমান লোকেদের সঙ্গে 'হগ কমপ্লেক্সে'র মালিকদের ভুল বোঝাবুঝি, বন্ধু বিচ্ছেদ—নানা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটছে।

আয়ওয়ার একটি ছোট শহর কানাহোয়া। লোকসংখ্যা সব শুদ্ধু সাতশো তেষট্টি। সকলেই সুখে শান্তিতে ছিল। ভিকি অ্যান্ডারসন আর তার বর লেস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে ওই শহরের ডেভিড থমসন আর তার বউ হোলির প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। দুই পরিবারই শুয়োর প্রতিপালনের ব্যবসায় মোটামুটি আয় করত। বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, আনন্দ ছিল। চারজনে মিলে প্রায়ই বল-ডান্স করতে যেত। ক্লিয়ার লেক-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে চারজনে সার্ফ বলরুমে গিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে নাচত। এত ভাব ছিল যে, তিন বছর আগে যখন থমসনের পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভাঙল, তখন অ্যান্ডারসনই বন্ধুর ব্যবসা সামাল দিয়েছিল। শুয়োর ছানাদের মধ্যে যাদের পুরুষত্বহীন করতে হত, একা অ্যান্ডারসন তাদের ধরে ধরে অঙ্গচ্ছেদ করেছিল। কারণ বন্ধুর স্ত্রী ওই নিষ্ঠুর কাজ করতে চাইত না। মোটকথা সেই সময় অ্যান্ডারসন সাহায্য না করলে কোমর ভাঙা থমসনের শুয়োরের ব্যবসাও বসে যেত।

কিন্তু এখন তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অ্যান্ডারসন ধিক্কার দিয়ে বলে—'ও কি আর ফার্মার আছে? ও এখন ডলারের লোভে 'ফ্যাকটরি' হয়ে গেছে! ছিলি চাষী, হয়ে গেলি শুয়োরের কারখানা।'

আসলে, গত দু'বছর থেকেই মত বিভেদ শুরু হয়েছে। মিনিয়াপোলিস রাজ্যে বিখ্যাত ডেয়ারি ফার্মের নাম 'ল্যান্ড ও লেকস ইনকরপোরেটেড'। সেই কোম্পানি তাদের অজস্র শুয়োরের ভার দিয়ে দিল থমসনের হাতে। চুক্তি সই করার পর থমসনকে কারখানা খুলতে হল। ধার দেনা করে মোট সাতশো হাজার ডলার দিয়ে পাঁচখানা মস্ত বাড়ি বানাল। শুয়োরদের বাড়ি হলে কী হবে, এক একটির ভেতরে গোটা জাম্বো জেটের যাত্রীরা বসে পড়তে পারে। এমনই প্রশস্ত ব্যবস্থা। থমসন এখন ওই কারখানায় বছরে বারো হাজার করে শুয়োরের ছানা বাড়িয়ে যাচ্ছে। উৎপাদনের হার দেখে 'ল্যান্ড ও লেক' ভীষণ সন্তুষ্ট। কিন্তু থমসনের পাড়ার লোক অসন্তুষ্ট। রিচার্ড এলিয়াসন তার প্রতিবেশী। নিজের মাত্র চারশোটি শুয়োর আছে। থমসনের বারো হাজারি কারবার দেখে তার মাথা গরম। একদম সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছে। হিংসের জন্যে নয়, গন্ধের জন্যেই সে গোটা ব্যাপারটা বরদাস্ত করতে পারছে না। তার বাড়ি থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে 'থমসন হগ কমপ্লেক্স।' নিত্যদিন শুয়োরেরা নিত্যকর্ম করছে। রিচার্ড তার বাগানে বসে সুখ পায় না। ছুটির দিনে পিকনিক

লাঞ্চ সাজিয়ে বসে খেতে পারে না। শুয়োর মার্কা গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত। হ্যাঁ, সে নিজে চারশো শুয়োর প্রতিপালন করে ঠিকই। কিন্তু তাদের জন্যে আবর্জনা সরোবরের ব্যবস্থা করতে হয়নি। যখন যেমন ময়লা জমে, ঝটপট পরিষ্কার করে ফেলে। অথচ থমসনের হাজার হাজার শুয়োরের জন্যে তার আকাশ বাতাস কলুষিত হয়ে গেছে। রিচার্ড এত রেগে আছে, যে, ওই শহরের যে সব লোক থমসনের শুয়োর সাম্রাজ্যের সঙ্গে কোনও ভাবে জড়িত হয়েছে, তাদেরও বন্ধুর তালিকা থেকে খারিজ করে দিয়েছে।

থমসন আবার শহরের চার্চে ছোটদের বাইবেল পড়ায়। দুজন রাগি চাষী নিজের ছেলেদের ওই ক্লাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। কারণ তারাও গন্ধ সহ্য করতে পারছে না। থমসনের টিনএজের মেয়ের সঙ্গে স্কুলে অনেকেই ভাল ব্যবহার করছে না। 'মিস পিগি'-বলে ঠাট্টা তামাশা করছে। আপনারা যদি ছোটদের 'মাপেট মুভি' দেখে থাকেন, মনে করতে পারবেন হোঁৎকা চেহারার, প্রেমে গদগদ সেই শুয়োর কুমারীর হাবভাব কেমন হাস্যকর ছিল। 'মিস পিগি' তারই নাম। থমসন দুহিতাকে অপমান করার জন্যে স্কুলের ছেলে মেয়েরা এই নাম দিয়েছে। শুয়োর শিল্পপতির কন্যার প্রতি খুবই নিষ্ঠুর আচরণ করছে তারা। এজন্যে মাস্টারের কাছে শাস্তিও পেয়েছে কয়েকজন।

থমসনের বিরোধী পক্ষের লোকজন কী না করছে? তারা দল বেঁধে কাউন্ট্রির সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে নালিশ করাতে তাঁরাও থমসনের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অবশ্য তাঁদের ক্ষমতা বেশি নয়। বিশেষ করে আয়ওয়ার মতো রাজ্যে কৃষি অথবা শুয়োর প্রতিপালনের ব্যবসায় সহজে হস্তক্ষেপ করা যায় না। তবু কাউন্টি অফিশিয়ালরা চেষ্টার কসুর করেননি। আয়ওয়া সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে গেছেন। প্রমাণ করতে চাইছেন, থমসন মোটেই সামান্য শুয়োর ব্যবসায়ী নয়। এখন তার কারখানায় যা উৎপাদন বেড়েছে, তাকে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে ধরতে হবে। এজন্যে তার উচিত হচ্ছে নিজেদের কাউন্টি থেকে 'জোনিং পারমিট' অনুমোদন করিয়ে নেওয়া। বিনা অনুমতিতে এভাবে কারখানা চালানো যায় না। আর একথাও অফিসাররা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে থমসনকে তাঁরা কোনও মতেই 'জোনিং পারমিট' দেবেন না। রেসিডেনশিয়াল জোনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স চলবে না।

চেনাশোনা লোকেদের কাছে এত দুর্ব্যবহার পেয়ে থমসনের মন খারাপ হয়েছে। নিজেকে সে এক দল নিষ্ঠুর যোদ্ধার মাঝখানে নিরীহ মেষপালক বলে তুলনা করেছে। মনে হয় বাইবেলের প্রভাব। শুয়োরপালকের বদলে মেষপালক।

যাই হোক, এবার থমসনের শুয়োর সাম্রাজ্যের কথায় আসা যাক। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ইস্পাতের দেওয়ালে ঘেরা আধুনিক ডিজাইনের অফিস বাড়ি। গেটের ভেতরে ঢোকার পর ফার্মিং ধারণা পালটে যাবে। আগেকার দিনের মতো মাথায় ছাউনি ঢাকা শুয়োরের খোয়াড় নেই। শাবল দিয়ে তাদের মল, মূত্র তুলে ফেলা হয় না। কারণ তারা প্রায় সবসময়ই বেডপ্যানে বসে আছে। খুব কায়দা করে পর পর খাঁচা বানানো হয়েছে। এক একটিতে মোট কুড়িটা করে শুয়োর থাকে। কুড়িটারই নিজস্ব জায়গার নীচে ঢালু মেঝেতে তিরিশ ইঞ্চি গর্ত করা আছে। ওপরে ঝাঁঝরি বসান। ফুল-ফোর্সে হোস চালিয়ে খাঁচা ধোওয়ার পর আবর্জনার স্রোত নর্দমা দিয়ে বাইরের জলাধারে গিয়ে মেশে। ওই

জলাধারে (১.৫ মিলিয়ন গ্যালনের) তরল বর্জ্য পদার্থ সাময়িকভাবে থাকার পর সারের জন্যে খেত খামারে চলে যায়।

'হগ্ কমপ্লেক্সে' ছোট ছোট শুয়োরদের আদর যত্নের শেষ নেই। অটোমেটিক ফিডারের মাধ্যমে খাদ্যকণা পরিবেশনের পরে মেকানিকাল নিপল দিয়ে জল খাওয়ানো হয়। ওই ভাবে দুধও খাওয়ানো হয়। খাঁচার ভেতরে তাপমাত্রা আর হাওয়া চলাচল ঠিকমত হচ্ছে কিনা পরীক্ষার জন্যে থার্মোস্ট্যাট বসানো থাকে। যন্ত্রের জন্যেই এত সহজে শুয়োর ছানাদের যত্ন করা সম্ভব হচ্ছে। জন্ম থেকে চার মাস বয়স পর্যন্ত এরা থমসনের ফার্মে থাকে। ওই চারমাসে শুয়োর ছানা পিছু মোট বারো মিনিট করে সময় দিলেই নাকি কাজ হয়ে যায়। তার মানে একটি শুয়োর ছানার জন্যে মানুষের মনোযোগের দরকার হচ্ছে মাসে তিন মিনিট। বাদ বাকি সব যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে যাচ্ছে। তবেই না থমসন একা এত কিছু সামলাতে পারছে?

থমসনের ওপর যাদের এত রাগ, তারা কিন্তু তার দুঃখ কষ্টের দিনেও দেখেছে। আশির দশকে চাষী ঋণের সমস্যা এবং নিজেদের আর্থিক অবস্থার কারণে থমসন আর তার ভাই তাদের চাষের জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর সাত বছর কারখানায় শ্রমিক হিসেবে চাকরি করে সংসার চালিয়েছে। কিছু সঞ্চয় করে আবার সামান্য জমি কিনে ফার্মিং শুরু করেছিল। কিন্তু এবার ইচ্ছে ছিল শুধু শুয়োর ছানার ব্যবসা করবে। সেও কোনও বড় ব্যবসাদের কাছ থেকে কন্ট্র্যাক্ট নিয়ে, চারমাস অন্তর অন্তর মাল ডেলিভারি দেবে। এতে ঝুঁকি অনেক কম। হাতে হাতে নগদ বিদায়। তাই থেকেই ভবিষ্যতে কারখানা তৈরি ঋণ শোধও হতে থাকবে। সুতরাং ভাঙা কোমর জোড়া লাগার পরই থমসন 'ল্যান্ড ও লেকস ইন্‌করপোরেটেড'-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন এই চল্লিশ বছর বয়সে সে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখছে। অথচ বন্ধুরা সব শত্রু হয়ে গেছে। তাকে পুঁজিবাদী বলে, দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী বলে অপমান করছে। স্থানীয় কাগজে গালমন্দ দিয়ে চিঠি ছাপাচ্ছে। প্রথমে দুঃখ পেলেও এখন আর থমসন গ্রাহ্য করছে না। শত্রু, মিত্র, সরকার পক্ষ যে যতই চেষ্টা করুক, থমসন একাই শুয়োর কেল্লা রক্ষা করার পণ নিয়েছে। দামও তো কিছু কম পাচ্ছে না। হগ মার্কেটে দামের ওঠা, পড়া যাইই হোক, কন্ট্র্যাক্ট অনুযায়ী সে 'ল্যান্ড ও লেকস'-এর কাছ থেকে শুয়োর পিছু বারো ডলার করে পেয়ে যাচ্ছে। ইদানীং দাম অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও থমসন সেই আগের দামই পাচ্ছে। ফলে অন্যান্য শুয়োর বিক্রেতাদের চেয়ে সে অনেক বেশি লাভ করছে। ওদিকে 'ল্যান্ড ও লেকস কোম্পানির' নামে মূল ব্যবসা হলেও আয়ওয়ার রাজ্য সরকার সরাসরি 'করপোরেট ফার্মিং বন্ধ করো' বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেও পারছে না। কারণ মূল কোম্পানির নামে তো আর থমসনের কারখানার জমি কেনা হয়নি। কোম্পানি হচ্ছে শুধু শুয়োরের মালিক। আর থমসন হচ্ছে শুধু জমির মালিক। নিজের জমিতে চার মাস করে করে সে শুয়োরছানাদের থাকতে দিচ্ছে। আইনের এইসব ফাঁকফোকর দিয়ে মামলা গলে বেরিয়ে যাবে বলেই থমসন আশা করছে।

ক্ল্যারিয়ন শহরে অন্য রকম ঘটনাও ঘটছে। টিম পেট নামে ৩৯ বছরের এক ভদ্রলোকের ছোটবেলা থেকে শুয়োর ভাল লাগত। টিন-এজ বয়সে প্রতিযোগিতায় নামানোর জন্যে টিম শুয়োর নিয়ে 'রাইট কাউন্টি ফেয়ার'-এ চলে যেত। কতবার পুরস্কার পেয়েছে। ক্রমশ ক্রমশ

এত আনন্দ পাচ্ছিল যে শুয়োরের সাহচর্য হারানোর ভয়ে কলেজে পড়তেই গেল না। অল্প জমি কিনে শুয়োর প্রতিপালনের ব্যবসা করতে লাগল। এখন তাকে ব্যবসা বাড়ানোর জন্যে অনেকেই উৎসাহ দিচ্ছে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে অনায়াসে টিম ওই থমসনের মতোই বিরাট ফ্যাক্টরি বানাতে পারে। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতোই তার ব্যবসাকে ভালভাবে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু টিম আর ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। শুধু আয়ওয়া কিংবা তার কাছাকাছি রাজ্যগুলিতেই নয়, সারা আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে শুয়োর প্রতিপালনের ব্যবসা বেড়ে চলেছে, তার ফলে বাজারে শুয়োরের দাম ক্রমশ নামতেই থাকবে বলে তার দৃঢ় ধারণা। লাভের হার এত সামান্য দাঁড়াবে, যে পরিশ্রম আর মূলধন-এর বদলে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না। তার ওপর দুর্গন্ধ ছড়ানোর জন্যে প্রতিবেশীদের বিরাগভাজন হওয়া, বন্ধু বিচ্ছেদ—সমস্যা নেহাত কম নেই। তাই নানা দিক বিবেচনা করে টিম পেট এবার চাষী হবে ভাবছে। ইতিমধ্যে তার আদরের একশো ত্রিশটি শূকরীমাতা বিক্রি হয়ে গেছে। এখন তাদের শাবকদের খদ্দেররা আসছে। বিক্রি বাটা শেষ হয়ে গেলে টিম খেত খামার নিয়ে কাজে নেমে পড়বে। কিন্তু এখন খুব মন কেমন করছে। পুরনো চালাঘরে গিয়ে দাঁড়ালে তার বড় কষ্ট হয়। টিম বলেছে—'পায়ের নীচে ব্যথা লাগবে বলে ওদের জন্যে খড়ের ওপর নরম ঘাস বিছিয়ে রাখতাম। ইচ্ছে মতো মাঠে ঘাটে ঘুরে আসত। আমারও কত স্বাধীনতা ছিল। কারখানা তো নয় যে ওদের বন্দি করে রেখে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজেকেও যন্ত্রের মতোই কাজ করে যেতে হবে? এখন যুগ বদলে যাচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা বদলে যাচ্ছে। এক সময় পশু পালনে যে আনন্দ ছিল, কারখানার জীবনে হাজার হাজার পশু উৎপাদনের ব্যবসায় সেই আনন্দ কি পাওয়া সম্ভব? আমাদের মতো সামান্য লোকের পক্ষে ওই সময়ই ভাল ছিল।'

আওয়ার স্থানীয় লোকজন শুয়োর শিল্প প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে, বিপক্ষে যাই বলুক, কয়েকটি শহরে তাদের পত্তন ঠেকানো যাচ্ছে না। মেইন রাজ্য থেকে অস্টিন জে ডিকস্টার নামে মস্ত বড়লোক এক ডিম শিল্পপতি এখন ওই রাইট কাউন্টিতেই শুয়োর সাম্রাজ্য গড়তে চলে গেছেন। তাঁকে মোটা রকম ধার দিয়েছে 'মেট্রোপলিটন লাইফ ইনসিওরেন্স' কোম্পানি ছাড়াও আরও কয়েকটি কোম্পানি। ডিকস্টার যে বিশাল কারখানা তৈরি করাচ্ছেন, সেখানে বছরে সাড়ে চারশো হাজার শুয়োর উৎপাদন হবে। তিন বছর আগে সারা কাউন্টিতে যত উৎপাদন হত, এ হচ্ছে তার তিনগুণ বেশি। এরকম হারে আরও অন্যান্য লোকের ব্যবসাও যদি বাড়তে থাকে, তবে কিছু লোক রীতিমত ধনী হয়ে যাবে। গ্রামীণ শহরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বদলাতে থাকবে। ইতিমধ্যে শুয়োর কারখানায় দুশো জন স্থানীয় লোক চাকরি পেয়েছে। উনিশো কুড়ি সালের পরে এই প্রথম রাইট কাউন্ট্রির ভেতরে এতগুলি বাড়ি আর দোকানপাট গড়ে উঠেছে। জামাকাপড়ের দোকান বেড়েছে। মহিলাদের নিজস্ব দোকান হয়েছে। ক্ল্যারিয়নের মতো ছোট্ট শহরে, যেখানে সর্ব সাকুল্যে দু'হাজার সাতশো লোকের বসবাস, সেখানে এক বছরে পাঁচটি নতুন বাড়ি হয়েছে। এ সবই হচ্ছে হগ ইন্ডাস্ট্রির রমরমার জন্যে। একদিকে সর্বাধুনিক কলাকৌশলের সাহায্যে কারখানার ভেতরে ঝকঝকে খাঁচায় সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, সমগুণ সম্পন্ন হাজার হাজার শুয়োর জন্মাচ্ছে। অন্যদিকে গন্ধের তাড়নায় অস্থির লোকজন কাউন্টি অফিসে গিয়ে

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মাস্তানদের আক্রমণের আশঙ্কায় শেরিফের অফিস বাড়তি সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছে। কারণ গরম পড়েছে। শুয়োরের দেহসৌরভ আর আবর্জনা সরোবরের সুগন্ধে বাতাস ক্রমশ ভারী হচ্ছে। ঘরে ঘরে বাড়ি বিক্রির আলোচনা, তর্ক বিতর্ক। বড় বড় হগ ইন্ডাস্ট্রির কাছে চড়া দামে বাড়ি, জমি বেচে দিয়ে অন্য শহরে চলে যাওয়ার জন্যে অনেকেই ব্যস্ত। প্রতিবেশীও তাদের বলছে না—যেতে নাহি দিব। কারণ সে ও একই চিন্তা করছে।

রাইট কাউন্টি হচ্ছে আয়ওয়া রাজ্যের একেবারে কোণের দিকে খামার অঞ্চলের মধ্যে। এতকাল পর্যন্ত সেখানে বেশ একটি ঘন সন্নিবদ্ধ সমাজ ছিল। থাকলে পরস্পরকে বন্ধু মনে করত। প্রভেদ ছিল না। পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনভাবে মাথা না ঘামালেও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাব অনুযায়ী প্রকৃতির জন্যে ভালবাসা ছিল। চাষবাস, পশুপালন, সামাজিক মেলামেশা, চার্চে যাওয়া—এইই ছিল জীবনযাত্রার মূল ধারা। এখন পরিবেশ বদলে যাচ্ছে। শিল্প-প্রসারের চাপে কিছু এলাকায় বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কেউ কেউ অন্যত্র চলে যাচ্ছে। বন্ধু বিচ্ছেদ, প্রতিবেশীদের মধ্যে মনোমালিন্য, একপাল শুয়োরের আবাহনের জন্যে এতদিনের বন্ধুত্ব বিসর্জন। 'হগ করপোরেট কমপ্লেক্সে'র জন্যে বরাহ কুটির শিল্পের পতন! এজন্যে এই অঞ্চলের অনেকেই ক্ষুব্ধ। শুধু থমসনের কোনও নালিশ নেই। সে শিল্পপতি হয়েছে। বন্ধুর বদলে লক্ষ শুয়োর টাক ডুমা ডুম ডুম!

১৭ জুন ১৯৯৫

কুকুরের জন্য

ইউ এস কাস্টমস-এর গন্ধ বিশারদ কুকুরদের কথা একবার লিখেছিলাম। এবার কামড় বিশারদদের দিয়ে শুরু করি। আমেরিকার ছোটখাট কারখানায়, ওয়্যারহাউস বা মালগুদামে, গাড়ির ডিলারশিপের নিজস্ব পার্কিং লটে অনেক সময়ই রাত্রে ওয়াচ-ডগ ছেড়ে রাখা হয়। এরা দংশন বিশেষজ্ঞ কুকুর। জার্মান শেপার্ড, পিট বুল, ডোবারম্যান পিনচার—এরাই সাধারণত পাহারাওলার কাজ করে। অন্ধকারে বেড়া ডিঙিয়ে চোর, ডাকাত নামলেই হাত, পা খুবলে নেবে। টুঁটি ছিঁড়ে নেওয়ার ঘটনা অবশ্য শুনিনি। সে বোধহয় বর্ণনার বাড়াবাড়ি। যাইহোক, আগ্রাসী কুকুরদের ট্রেনিং-এর ব্যাপারটা বলি।

বাঙালির ছেলে বিবেক গুপ্ত, ভয়কে করিয়া জয়, ট্রেনার হইয়া দেখায়েছে তার শৌর্যের পরিচয়। বিবেক থাকেন আপস্টেট নিউ ইয়র্কে। জার্মান শেপার্ড ব্রিড করান। ট্রেনিং দেন। পুলিস ডিপার্টমেন্ট ওঁর কাছ থেকে কুকুর কেনে। ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসার সঙ্গে বিবেক এই দ্বিতীয় কাজটি নিজের শখের জন্যেই চালিয়ে যাচ্ছেন। একবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। চারদিকে অনেকখানি উঁচু ফেন্স দেওয়া কম্পাউন্ড। পেছন দিকে পরপর ডগহাউস। আমরা দোতলার ডেক থেকে পেছনের বাগানে তিনটে বিশাল জার্মান

শেপার্ডের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। বিবেক মাঠের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একটা হাত উঁচু করে ধরেছেন। সে হাতে প্লাস্টারের মতো মোটা দস্তানা প্রায় কাঁধ পর্যন্ত পরানো আছে। সেই হাত উঁচু করছেন, বিদ্যুৎগতিতে কুকুরগুলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কাঁধের কাছটা কামড়ে ধরছে। দস্তানার মতো জিনিসটা টেনে নিয়ে মাটিতে ফেলেছে। নেহাত মালিক বলে রক্ষে! নয়তো ফাঁকা মাঠে নেকড়ের মতো তিনটে কুকুরের ধাক্কা সামলে 'স্টেডি' থাকা সোজা ব্যাপার? আসলে এসবই হচ্ছে বিবেকের কাছে 'খেলা'। অন্য লোকের কাছে লীলা খেলা সাঙ্গ হবার ভূমিকা। কুকুরগুলো অবশ্য বিবেকের স্ত্রী চন্দনার আর ছোট ছেলে দুটোকেও মান্য করে। কিন্তু অন্য কোনও লোকের পক্ষে বিনা নোটিসে ও বাড়ির ধার মাড়ানো সম্ভব নয়। দোতলার ডেক থেকে কুকুরগুলো জ্বলন্ত চোখ, হ্যা হ্যা করে ঝুলেপড়া লম্বা জিভ আর সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়া দেখেই বুঝেছি সাক্ষাৎ যমদূত। নইলে আর পুলিসের পছন্দ হয়? বিবেক 'দংশনে'র শিক্ষা না দিলেও, আক্রমণের শিক্ষা তো দারুণ দিয়েছেন। তার আগের দিনই নাকি একটা কুকুর আচমকা ঢুকে পড়া একটা র‍্যাকুনকে ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করেছে। সজাগ পাহারাওলার কর্তব্য করেছে। অবশ্য বিবেকের ব্রিড করানো জার্মান শেপার্ড মানেই কিন্তু হিংস্র নয়। এক বাঙালির বাড়িতেই দেখেছি। বাছুরের মাপ। বিবেকের পোষা ওই তিনটের কোনও একটার বংশধর। ঘ্রাউ-ঘ্রাউ করে বেদম চেঁচায়। তবে তেড়ে আসে না। কেন না বাড়িতে পোষা কুকুর বলে আগ্রাসনের শিক্ষা দেওয়া হয়নি।

তার মানে কি পোষা কুকুর কামড়ায় না? খুব কামড়ায়। আমার হাতে, পায়ে তিনটে পার্মানেন্ট দাগ আছে। বাড়ির কুকুর কামড়েছে মানে জানবেন, এ একেবারে স্বশিক্ষিত পটুত্ব। শ্বদন্ত দিয়ে স্বশিক্ষিত কামড়। অতি অমায়িক দম্পতি আপনাকে আশ্বাস দিলেন—'না, না, প্রিন্স কিছ-ছু করবে না। একটু শুঁকে চলে যাবে।' তারপরেই ঘ্যাঁও। হাঁটুতে এক কামড়। একে নিশ্চয়ই তাঁরা কামড়াতে শেখাননি। ভদ্র, সভ্য হতেই শিখিয়েছেন। কিন্তু কুকুরটা হামলাবাজ। ট্রেনারদের বক্তব্য—বাড়ির কুকুরকে বেঁধে রাখলে সে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে। হয়তো তাই। কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাওয়া বদরাগী কুকুরকে তো আর লোক এলে ছেড়ে রাখা যায় না। বাড়ির লোক সেরকম ঝুঁকি নেবেন কেন? অতিথি কুকুরের কামড় খেয়ে হাসপাতাল ফেরত উকিলের কাছে যেতে পারেন। তখন যাও কোর্টে। 'প্রিন্স'-এর হয়ে গুণাগার দাও। কুকুরের হামলা থেকে কত মামলা ঠুকে দেয় লোকে। গামলা গামলা রক্ত পড়ুক আর নাই পড়ুক, মালিককে শিক্ষা দিতে হবে না? আবার সাধ করে নাম রেখেছে 'প্রিন্স'! আহা! রাজা হবার সাধ যায় গো চিতে!

আমেরিকায় এত যে কুকুর প্রীতি, তাও কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে বলে ছেড়ে দেয় না। 'জাতীয় কুকুর কামড় প্রতিরোধ সপ্তাহ' পালন করে এলাম এই কমাস আগেই। জুনের ৯ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত 'দ্য হিউমেন সোসাইটি অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস' আর 'দ্য ইউনাইটেড স্টেটস পোস্টাল সার্ভিস' যৌথভাবে ন্যাশনাল ডগ বাইট প্রিভেনশন উইক উদযাপনের দায়িত্ব নিয়েছিল। কুকুরের কামড়ের সঙ্গে পোস্ট অফিসের সম্পর্কটা ধরতে পেরেছেন তো? একেবারে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। চিঠি দিতে আসা মেইলম্যানের অঙ্গহানি করার ব্যাপার বদরাগী কুকুরগুলো ভীষণ তৎপর। ভেবে দেখুন, গত বছর সবশুদ্ধ ৪.৭ মিলিয়ন আবালবৃদ্ধবনিতাকে কুকুরে কামড়েছিল। তারমধ্যে ২,৮০০ জন হচ্ছে

মেইলম্যান।

গত পনেরো-ষোলো বছর আগে যে বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে, তার গায়ে আর ডাকবাক্স লাগানো থাকে না। একেবারে ফুটপাতের ধারে ড্রাইভ-ওয়ের মুখে কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর ডাকবাক্স বসানো হয়। তাহলে মেইল-ভ্যান থামিয়ে লোকটিকে আর নামতে হবে না। হাত-বাড়িয়ে চিঠিপত্র ঢুকিয়ে দেবে। শুধু কুকুরের ভয়ে নয়, শীতকালে ড্রাইভওয়েতে বরফে আছাড় খাওয়ার বিপদও এড়ানো যাবে। সেদিক থেকে মেইলম্যানদের নিরাপত্তা বেড়েছে। কিন্তু সব বাড়িই তো আর পনেরো-ষোলো বছর আগে তৈরি হয়নি। আগেকার বাড়িগুলোতে ডাকবাক্স একেবারে দরজার পাশে বসানো হয়েছিল। কখনও লম্বা ড্রাইভওয়ে পার হয়ে যেতে হয়। কখনও ঘোরানো সিঁড়ি বেড়ে উঠতে হয়। তার মধ্যে যদি কুকুর তেড়ে আসে, খপাত করে পায়ের গোছ কামড়ে ধরে, পালানো সহজ নাকি? অবশ্য বাড়িতে লোকজন না থাকলে, কুকুরও ভেতরে আটকে থাকে। মুশকিল হয় বাড়িতে থাকা বুড়োবুড়ি কিংবা যে কোনও গৃহকর্ত্রীর কাননবিহারী কুকুরদের নিয়ে। মেইলম্যানকে দেখে তাঁরা বেরন চিঠির আশায়। বেয়াড়া কুকুর থাকলে সেও ছিটকে বেরিয়ে আসে। তারপরেই হয়তো ঝুটোপুটি বেধে গেল।

শুধু মেইলম্যান নয়, পার্সেল নিয়ে আসা ডেলিভারিম্যানও কুকুরের কামড় খেতে পারে। চিঠি না হয় বাইরের ফুটপাথের ওপর রাখা বাক্সে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু পার্সেল বা রেজিস্টার্ড চিঠি তো বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং কুকুরের ভয় দূর করা দরকার। ইউ এস পোস্টাল সার্ভিস হিসেব দিয়েছে—কুকুরের অত্যাচারে তাদের ২৫ মিলিয়ন ডলার মতো অর্থব্যয় হয়। মেইলম্যান বা পোস্টাল ডেলিভারিম্যান কুকুরের কামড় খেয়ে জ্বালা, যন্ত্রণা যা ভোগ করলেন, সে তো করলেন। তারপর পোস্ট অফিসের খরচ বাড়ল। ওই কর্মচারীদের ওয়ার্কারস কমপেনসেশন বাবদ মোটা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ, চাকরির সময়ে তাঁরা আহত হয়েছেন। মামলা লড়ার জন্য উকিলের ফি দিতে হবে। ডেলিভারি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে ওয়্যারহাউসের ভাড়া গুণতে হবে। তার ওপর অনুপস্থিত কর্মীর বদলে সাময়িক লোক নিয়ে, তার মাইনেপত্র দিতে হবে। এর ওপর আছে আহত কর্মীর চিকিৎসার খরচ। কুকুরের মালিক পরে সে ক্ষতিপূরণ দেবেন, সে ওই লোকটির জন্যে। কিন্তু ইউ এস পোস্টাল সার্ভিসকে তার আর্থিক দায় দায়িত্ব পালন করতেই হবে। পোস্টমাস্টার ডেভিড এ বোলটন বলেছেন—এ মোটেই শুধু ডাক সংক্রান্ত সমস্যা নয়। এ হচ্ছে গুরুতর জাতীয় সমস্যা। এজন্যেই আমরা ওয়াশিংটনের 'হিউমেন সোসাইটি অফ ইউনাইটেড স্টেটস' এর সঙ্গে একত্র হয়ে আবেদন জানাচ্ছি।

ওই সোসাইটি জানিয়েছে, গত বছর প্রায় দু মিলিয়নেরও বেশি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমেরিকায় প্রতিবছর যত সংখ্যক লোককে কুকুরে কামড়ায়, তার মধ্যে শিশুরাই প্রধান। তারপর বৃদ্ধবৃদ্ধারা। এবং তৃতীয় সারিতে আছেন ডাকবাহকরা।

আমাদের শহরের পুরভবনেও জুন মাসে 'জাতীয় কুকুর কামড় প্রতিরোধ সপ্তাহ' পালিত হয়েছিল। সারমেয় বিশেষজ্ঞরা বক্তৃতা দিলেন। আমরা যা যা উপদেশ পেলাম, তা হচ্ছে—কখনও কুকুরের পাশ দিয়ে দৌড়ে যাবে না। কারণ কুকুরের সহজাত প্রবৃত্তি

হল 'শিকার' এর পেছন পেছন ছুটে যাওয়া। কুকুর যদি তোমাকে তেড়ে আসে, তুমি রবে নিরুত্তর। একদম চেঁচাবে না। তার চোখে চোখে তাকাবে না। অন্যদিকে চোখ ভাসিয়ে রাখবে। যতক্ষণ না কুকুরটা চলে যায়, একেবারে ছবির মতো স্থির হয়ে থাকবে। যেই দেখবে কুকুর দূরে চলে গেছে, খুব সাবধানে এক পা এক পা করে পিছু হটতে থাকবে।

এই উপদেশ থেকে আমি যা বুঝলাম—আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় কুকুরটাকে যথেষ্ট কামড়ানোর সুযোগ দেওয়া। অথচ বীর লোকেরা বলে তারা ক্যাঁক করে বুটের লাথি মেরে খেঁকি কুকুরকে শায়েস্তা করেছে। আমি যে কোন পন্থাটা নেব, বুঝতে পারি না।

আচ্ছা, এবার দ্বিতীয় উপদেশ—কখনও অচেনা কুকুরের ধারেকাছে যাবে না। বিশেষ করে বেঁধে রাখা বা ছোট জায়গায় আটকে রাখা কুকুরের কাছে ঘেঁষবে না।

এই উপদেশ না জানার জন্যেই আমি দুবার কুকুরের কামড় খেয়েছিলাম। জয়েন্ট ফ্যামিলির কুকুর এমনিতেই একটু বেয়াড়া হয়। এর কাছে বিস্কুট খাচ্ছে, ওর কাছে পাঁউরুটি খাচ্ছে। এই আমরা রোববার সকালে ছাদে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গোল মতো ডগসোপ ঘষে ঘষে মহানন্দে চান করালাম। তারপরেই সে মন দিয়ে 'অনুরোধের আসর' শোনার সময় গা ভর্তি ভেজা লোম ঝেড়ে মার খেল। আজ একজন ব্রাশ হাতে নিয়ে রাশি রাশি পাউডার ঢালছি। কাল একজন এঁটুলি তাড়াতে গ্যামাকসিন মাখাচ্ছে। অধিক যত্নে কুকুর নষ্ট। একদিন ম্যাড্রাসি সুপারি খাচ্ছিলাম। কুকুরটা চেনে বাঁধা অবস্থায় চেঁচাচ্ছিল। বাড়িতে একদল লোক বেড়াতে এসেছে। ওকে ছাড়া যাবে না। ভাবলাম ম্যাড্রাসি সুপুরি একটু খাইয়ে দিই। যেই না কাছে গিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো সুপুরি পুরে দিয়েছি, ব্যস! ঘ্যাঁও! দক্ষিণী সুপুরি নিয়ে দাক্ষিণ্য দেখাতে গিয়ে একেবারে দক্ষযজ্ঞ। হাহাকার করতে করতে 'নোবেল ফার্মেসি'তে গেলাম। একে কুকুরের কামড়, তার ওপর স্পিরিট ঢেলে পুড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। কুকুরের স্মৃতি সততই সুখের। শুধু ওই দু-বারের ভোগান্তি ছাড়া। মোট কথা, চেনে বাঁধা কুকুরকে ঘাঁটাতে যাবেন না।

তৃতীয় উপদেশ—কুকুর দেখলেই হাত বুলতে যাবেন না। আগে সে আপনাকে ঘুরে ঘুরে প্রাণভরে শুঁকে নিক। তারপর ল্যাজ নাড়াটাড়া দেখে এগোবেন। তাও আশীর্বাদ করার স্টাইলে পট করে মাথায় হাত দিতে যাবেন না। কুকুরের পিঠের পাদপীঠই প্রশস্ত। সেখানেই থাবড়ে দেবেন।

এ তো গেল প্রতিরক্ষার উপদেশ। এরপর শুনলাম কুকুরের মালিক হলে কী কী করা দরকার। প্রথম কথা বই পড়ে শিক্ষা দিতে হবে। যদি কুকুর অগ্রাহ্য করে, তবে 'ওবিডিয়েন্স ট্রেনিং' ক্লাসে ভর্তি করতে হবে। যেখানে 'কানাই মাস্টার'দের কাছে বেড়ালছানা, কুকুরছানারা ভালমত শিক্ষা পায়। মোটকথা মালিক যেন কুকুরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। যে কোনও পরিস্থিতিতে সে অন্তত মালিকের কথা শুনবে। একদম অবাধ্য হবে না। যখন মেইলম্যান চিঠি দিতে আসবে, কুকুরকে বেরতে দেওয়া চলবে না। ভেতরের কোনও ঘরে, নয়তো চেন বেঁধে রাখতে হবে। কখনও বাড়ির বাচ্চাদের দিয়ে মেইলম্যানের কাছ থেকে চিঠি চেয়ে পাঠাবেন না। পোষা কুকুরের সহজাত প্রবৃত্তি হল বাচ্চাদের রক্ষা করা। তাদের কাছাকাছি বাইরের লোককে দেখলে সে তেড়ে যেতে পারে।

কুকুরদের অপারেশন করে বীর্যহীন করার পরে তাদের মধ্যে আক্রমণের প্রবণতা কমে

যায়। এ জন্যে ছেলে এবং মেয়ে, দুই জাতের কুকুরকেই 'নিউটার' বা 'স্পে' (মেয়ে কুকুরদের ওভারি বাদ দেওয়া অপারেশন) করার পর তারা শান্ত থাকে। দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অপারেশন না করানোর দরুন কামড়ানোর প্রবণতা বেড়ে গেছে। এ সম্পর্কে 'হিউমেন সোসাইটি অফ ইউনাইটেড স্টেটস' সমীক্ষা নিয়ে দেখেছে। নিউটার বা স্পে করা কুকুরদের তুলনায়, অপারেশন না করা কুকুররা তিনগুণ বেশি হারে কামড়ায়। অর্থাৎ কুকুরদের ক্লীবত্ব হিংস্রভাব প্রশমিত করে।

হিংস্রতা নাকি কুকুরের শ্রেণী আর বংশধারার ওপর সব সময় নির্ভর করে না। যদিও এতকাল অন্য কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন কুকুর বিশেষজ্ঞরা বলছেন—কুকুরের কামড়ানো স্বভাব অনেক কারণেই হতে পারে। তার সঙ্গে 'ব্রিডিং'-এর বিশেষ সম্পর্ক নেই। যে কুকুরদের লোকজনের সংস্পর্শে বড় করা হয় না, ঠিকমত আদরযত্ন করা হয় না, মনোযোগ দেওয়া হয় না এবং অনেকক্ষণ ধরে বেঁধে রাখা হয়, তারা সুযোগ পেলেই কামড়ায়। অনাদর আর বন্দীদশাই এই রাগের কারণ। এছাড়া ট্রেনিং-এর সমস্যাও থাকে। ছোটবেলায় একটু আধটু কামড়ানোর চেষ্টা দেখলেই শাসন করতে হবে। এছাড়া অহেতুক বিরক্ত করা, খাওয়ার সময় বাধা দেওয়া ইত্যাদিও কুকুরকে বিরক্ত করা, খাওয়ার সময় বাধা দেওয়া ইত্যাদিও কুকুরকে খেপিয়ে দিতে পারে। 'ন্যাশনাল ডগ বাইট প্রিভেনশন উইক'-এ এই রকম নানা আলোচনা শুনে এলাম। যদি কুকুরের কামড় বিষয়ে আরও কিছু জানতে ইচ্ছা করে, কিংবা যদি 'দায়িত্ববান' মালিক হতে চান, তবে Humane Society of the United States. Dept. D.2100 L Street NW. Washington DC 20037-1525. U.S.A–এই ঠিকানায় চিঠি লিখলে বইপত্র পাঠিয়ে দেবে।

আমেরিকায় কুকুরের জন্যে সাইকোলজিস্টও জুটে যায়। এবার তাই দংশন প্রসঙ্গ ছেড়ে মনোদর্শনের কথায় আসি। সেদিন গাড়ির রেডিওতে এক সারমেয় মনোবিদের জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনতে শুনতে যাচ্ছিলাম। তাঁর নাম ওয়ারেন একস্টাইন। সেই এককড়িবাবু বলছিলেন—কুকুরদের জীবনের একঘেয়েমি ঘোচাতে হবে। তারা দৈনন্দিন রুটিন থেকে মুক্তি চায়। বৈচিত্র্যে আনন্দ চায়। আমরা যেমন পার্টিতে যাই, ওদেরও সেরকম পার্টি হওয়া উচিত। মাঝে মাঝে একেক বাড়িতে বেশ ক'টা কুকুরকে নেমন্তন্ন করে, ভালমন্দ খাইয়ে, একসঙ্গে নাচানাচি, বল খেলানো—এইসব করতে হবে। পার্টির শেষে কুকুরদের উপহার দিয়ে বাড়ি পাঠানো। এভাবেই তাদের একঘেয়েমি কাটাতে হবে।

বক্তৃতা শুনে হাসি পাচ্ছিল। বেড়ালের বিয়ে তো দেখিনি। কুকুরের গেট-টুগেদারও দেখা হবে কি না সন্দেহ! এককড়ির বাকতাল্লা শুনবে নাকি কেউ? কার এত সময় আছে? সারাদিন চাকরি বাকরি করে, সংসার সামলে, ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করতে করতেই দিন কাবার হয়ে যায়। পোষা বেড়াল, কুকুরের জন্যে কতটুকু সময় থাকে? তাও, যে যতটুকু পারে করে। অন্তত এক চক্কর ঘুরিয়ে আনে। বাগানে নিয়ে গিয়ে ফ্রিসবি নয়তো বল খেলে। উইক এন্ডে বরং সময় পাওয়া যায়। কিন্তু কুকুরদের পার্টি লাগাতে যাব কেন? একপাল কুকুরের হুড়োহুড়ি, তাদের রবাহুত লোকজন, বাড়িময় হাড় মাংসের টুকরো, সোফায় চড়ে ধামসা ধামসি, একেক প্রস্থ গা ঝাড়তে কার্পেটে ভোটকম্বল—সাইকোলজিস্ট এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে?

আসলে কুকুরপ্রীতির বহর দেখে দেখে এই ধরনের পরিকল্পনা তার মাথায় আসছে। সকলে না হোক, কিছু লোক তো বাড়াবাড়ি করে। স্নেহবশতই করে অবশ্য। এক মহিলা তাঁর বাড়ির কাছাকাছি ছাড়া চাকরি নেন না। কারণ লাঞ্চের সময় বাড়ি গিয়ে কুকুরকে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনবেন। আর এক মহিলা ঘেন্না পিত্তি বিসর্জন দিয়ে তাঁর ধুমসো বেড়ালের মুখে মুখ ঢুকিয়ে 'মাউথ টু মাউথ রিসাসিটেশন' করেছিলেন। বেড়ালটা তাঁর বাথরুমে ঢুকে জলভর্তি বাথটাবে নেমে পড়েছিল। তারপর খাবি খেয়ে মরো মরো। তখন ওইভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস যোগানোর চেষ্টা হয়েছিল। বেড়ালের 'নয়া জীবন' প্রমাণ করে সে আবার ল্যাজ তুলে উঠে বসেছিল।

আমেরিকায় জন্মে ইংরেজি শেখেনি এমন কুকুরও আছে। শুধু বাংলা বোঝে। আমাদের সেই রসিক বন্ধু সুজন দাশগুপ্ত ও তার স্ত্রী শমিতার সতেরো বছরের কুকুর। নাম মিষ্টি দাশগুপ্ত। জীবনে একদিনও 'কেনেলে' থাকেনি। হয় সুজন নয় শমিতা, নয় ওদের মেয়ে টুমকু—তিনজনের মধ্যে একজনকে মিষ্টির সঙ্গে বাড়িতে থাকতে হয়েছে। একরাতের জন্যেও ওরা তিনজনে একসঙ্গে কোথাও যেতে পারে না। মিষ্টি এত মায়া বাড়িয়েছে, যে এত বছরে সুজন, শমিতাকে কখনও একসঙ্গে দেশে যেতে দেখলাম না। ওরা পালা করে ঘুরে আসে। মিষ্টিকে 'ডগ কেনেলে' রাখলে সে বিজাতীয় পরিবেশে না খেয়ে, না দেয়ে পড়ে থাকবে। বাংলা মিডিয়ামে মানুষ. তো। শমিতার হাতের চটকানো ভাত, ডাল, মাংস খেয়ে জীবন কাটিয়ে দিল। আমরা ওদের বাড়িতে খেতে বসলে টেবিলের নীচ থেকে হাতে, পায়ে সুড়সুড়ির মতো আঁচড় দিয়ে খাবার চাইত, এই সেদিন পর্যন্ত। পালং শাক, মাংসের ঝোমলাখা ভাত, ডাল, চচ্চড়ি যা দিয়েছি, পরমানন্দে খেয়ে গেছে। মুখের খাবার ফুরোলেই আবার নখ বুলিয়ে আমাদের কনুইতে সুড়সুড়ি দিয়েছে।

ইদানীং মিষ্টি খুবই অসুস্থ। বয়স তো কম হল না। ক্রমশ নির্জীব হয়ে আসছে। চলতে ফিরতে পারে না। চোখে দ্যাখে না। গায়ে বেডসোর দেখলাম। চিকিৎসা আর ওদের যত্নের জন্যে বেঁচে আছে। আমাদের চোখের সামনেই বুড়ি হয়ে গেল মিষ্টি। এই সেদিনও গা ঘেঁষে আড্ডায় বসত। চেঁচিয়ে বাড়ি মাৎ করত। কুটুর কুটুর করে লজেন্স খেত। আমরা যাওয়ামাত্র এমন ঝাঁপিয়ে আসত, যে সরানো যেত না। যতক্ষণ থাকব, সেখান থেকে নড়বে না। আর, এখন যে যাই, মিষ্টির গলার আওয়াজ শুনি না। জবুথবু হয়ে বসে থাকে। থালা, বাটি থেকে খাবার খাওয়ারও ক্ষমতা নেই। শমিতা দলা দলা করে ভাত মেখে খাওয়ায়। কোলে করে বাইরে নিয়ে যায়। শমিতা শহরে না থাকলে তখন সুজনই সব সামলায়। অফিসের কাজ বাড়িতে নিয়ে এসে মিষ্টির দেখাশোনা করে। ফোন করলে বলে 'মিষ্টির জন্যে অফিসে যাইনি রে।' কী যে বন্ধনে জড়িয়েছে ওদের।

সারমেয় সমাচার শেষ করার মুহূর্তে মনে পড়ছে সেনসিলভেনিয়ায় তাদের কবরখানা দেখেছিলাম। গেটের মাথার ওপর সাদা পাথরে কুকুর। আকাশের দিকে মুখ তুলে বসে আছে। মাঠের ভেতর বুনোফুল আর ঘাসের বুকে ছোট ছোট কবর। কোথাও ফলকে লেখা—'সুসেট আওয়ার গ্রেট পেট'। কোথাও বেদির গায়ে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের মতো ছবি।

এখন শুনছি কোন শহরে পেট ফিউনারেল পার্লার খুলেছে। অ্যাপার্টমেন্ট আর

কনডোমিনিয়ামের বাসিন্দাদের তো নিজস্ব জমি নেই। পোষা বেড়াল, কুকুর মারা গেলে নিয়ে যাবে কোথায়? একশো-দেড়শো ডলার দিয়ে 'ডিসপোজ' করতেও খারাপ লাগে। তারচেয়ে ফিউনারেল পার্লারের বন্দোবস্ত ভাল। তিনশো ডলার থেকে হাজার ডলারের মধ্যে কফিন দেবে, সাটিনের বিছানা দেবে। মরা কুকুর, বেড়ালকে যথাসম্ভব সংক্রমণমুক্ত করে, সাজিয়ে গুছিয়ে, সুগন্ধী মাখিয়ে শুইয়ে রাখবে। আত্মীয়-বন্ধুরা, বিশেষ করে কলেজে চলে যাওয়া ছেলেমেয়েরা এসে শেষ দেখা দেখতে পাবে। তারপর ক্রিমেশন, নয় পেট সেমেটারি, ওই ফিউন্যারাল হোম থেকেই ব্যবস্থা করবে। আজকাল বাড়ি থাকলেও অনেকে নিজেদের জমিতে কবর দিতে চায় না। হয়তো প্রতিবেশীরা পছন্দ করে না। তাই পেট সেমেটারির সংখ্যা বাড়ছে।

অথচ এতদিন পর্যন্ত লোকে পোষা জীবজন্তুকে নিজে হাতে বাড়ির বাগানেই মাটি দিয়েছে। সাহেবদের দেখাদেখি আমরাও তো তাই করেছি। এই যে হাতে, পায়ে যার চিহ্ন নিয়ে বসে আছি, সেই ককার স্প্যানিয়েল 'গামা', তাকেও তো আমাদের জনক রোডের বাড়িতেই রেখে এসেছি। ডালিম গাছের নীচে গর্ত খুঁড়ে তার বিছানা, ছোট্ট কম্বল, সবুজ গরমজামা, খাওয়ার বাটি, গলার চেন, বাকলস—সব কিছু রেখে দেওয়া হল। চোদ্দো বছরের স্মৃতি আর এই সব তুচ্ছ বিষয় আশয় নিয়ে সে মাটির নীচে ঘুমিয়ে থাকল। সস্তার সেন্ট বলে কে যেন একশিশি অগুরু এনে ঢেলে দিয়েছিল। তারপর কতদিন সন্ধেবেলায় গেট পেরিয়ে বাড়ি ঢোকার সময় নাকে অগুরুর চড়া গন্ধ...ডালিম গাছের নীচে তার ছায়াছায়া শরীর...যেন এখনই ল্যাজ নেড়ে ডেকে উঠবে—ঘ্রাউ!

২৯ নভেম্বর ১৯৯৭

বাঙালি ও ষাঁড়ের ডালনা

ক অক্ষর গোমাংস—কথাটা অক্ষর পরিচয় বিহীন মানুষ সম্পর্কে চালু ছিল বলেই জানতাম। বিশেষণটার কোনও সাময়িক আবেদন আছে কিনা জানি না। এখন 'ক' অক্ষর উচ্চারণ করতে বেগ পেতে হয় এমন মানুষই বা কতজন আছে? আর গোমাংস ভক্ষণের মত 'অশাস্ত্রীয়' ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই বা কতজন মাথা ঘামায়? বরং আমেরিকায় বর্ণ পরিচয় গুলে খাওয়া বহু বাঙালি সুসন্তান দিব্যি গোমাংস হজম করে প্রমাণ করেছেন তাঁদের রসনায় ওই দুটোই সহজগ্রাহ্য হয়েছে অনায়াসে।

অবশ্য গোঁড়া বামুনের তো অভাব নেই। একবার এক অন্নপ্রাশনের পার্টিতে বাগানে বিশাল ভোজসভা বসেছিল। গোল গোল টেবিল ঘিরে গুচ্ছ গুচ্ছ বাঙালি ও সাহেবের জমায়েত। তখন 'ককটেল্ আওয়ার'। পানীয়ের সঙ্গে নানা মুখরোচক শুকনো খাবার পরিবেশন করা হচ্ছিল। ঘণ্টা দেড়েক বাদে ডিনার শুরু হবে।

হঠাৎ শুনলাম 'দ্যাখসেন, আনারসের সঙ্গে শুয়োর দিসে। সকালে নান্দীমুখ করসিলি। আর বিকালে শুয়ার? আবার, না খাইলে হোসটেস্ বকানি দিবো।'

উনিশশো ষাট-পঁয়ষট্টি সাল নাগাদ চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকা থেকে সোজা আমেরিকায় এসেছিলেন ডঃ যাদুগোপাল রায়। মস্ত বিজ্ঞানী। কৃতী ছাত্র হিসেবে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে নামডাকও ছিল বেশ। খুব স্পষ্ট বক্তা লোক। রসায়ন বিদ্যার চর্চা, নারীদেহের ডিটেল বর্ণনা সহ লম্বা লম্বা প্রেমের কবিতা ও রহস্য গল্প লেখা, কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে মার্কিনবাসী 'দুই দিন হইল আসা বাংগালি ছেলেগুল্যান্' সম্পর্কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ—এই কয়েকটি জরুরি কাজে নিজেকে বিশেষ ব্যস্ত রাখতেন ভদ্রলোক। তা সেদিনের সেই পার্টিতে চাঙ্ক্ পাইন্ অ্যাপ্ল অ্যান্ড স্মোক্ড্ হ্যাম্' দেখেই চুটকিটি ছেড়েছিলেন। তারপর খরচ মচর করে কাজু বাদাম চিবতে চিবতে বলেছিলেন—'কোনকালে দ্যাশ ছাড়সি। আইজ পর্যন্ত শুয়ার খাই নাই, গরু খাই নাই। আর সেদিনের পোলাগুলারে দ্যাখেন! জীবনে প্রথমবার প্লেনে বইস্যাই কয়—স্ট্যাক্ খামু। আর নিউ ইয়র্কে আইসাই তার হ্যামবার্গার চাই। ক্যান? তুই মাছ চোখে দ্যাখস নাই? বাজারে ডিম নাই? মুরগির তো জলের দর। তা হইব না। বিফ খাইয়া জাতে উঠবো।' বুঝেছিলাম 'স্ট্যাক্' বলতে বিফ স্টেকে বোঝাচ্ছিলেন।

ডঃ যাদুগোপালকে আমি ভাল চিনতাম না। কিন্তু সে সময় মহা উৎসাহে একটা বাংলা পত্রিকা বার করলাম আমরা কজন। তবে অতিরিক্ত লেখক, উদাসীন পাঠক এবং নগণ্য গ্রাহক সংখ্যার ত্র্যহস্পর্শযোগে অচিরেই তার অপমৃত্যু ঘটে গিয়েছিল। যাদুগোপাল সে পত্রিকার একনিষ্ঠ লেখক ছিলেন। ঘন ঘন পাতা ভরাতে একেবারে ওস্তাদ। এক এক বারে দু/তিনটে লেখা পাঠাতেন। একই সঙ্গে এল কবিতা—

'চাটিগাঁর কথা আমি, ভাবি কভু যদি
বহ্নিশিখার দেহ যেন ভরা নদী
সেই দেহে কত ঢেউ গনিয়াছি শুধু
আবার কি বুকে তারে পাব আমি কভু?
ওগো মোর বহ্নি তুমি এখন কোথায়?
কাছে পেলে ভরি দিব অধর চুমায়।'

আবার সঙ্গে এক প্রচণ্ড জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ—'গোমাংস ভক্ষণের অপকারিতা।' প্রত্যেক লেখার সঙ্গে মুক্তাক্ষরে একটি চিঠিও দিতেন। শেষে লিখতেন—"আপনারই যাদু।"

ভদ্রলোক মাতৃবৎ পরদারেষু ভাবছেন জেনে আমিও যশোদার মতো অপত্য স্নেহে তাঁর বটতলা মার্কা লেখাগুলো নিয়ে কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়ে পড়তাম। সে সব দিন গেছে বটে। লেখা না ছাপলে দেখা হলেই তাঁর ভর্ৎসনা, আর ছাপলে পরে বন্ধু বান্ধবরা ফোন তুলে গালাগালি।

এত বছর বাদে আমি নিজেই সেই গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে লিখতে বসেছি। কারণ আর কিছুই না, ঘন ঘন আমেরিকার হাওয়া বদল। এদের খাদ্যরুচির বদলের পেছনে অবশ্য ডাক্তারদের মস্ত ভূমিকা আছে। শরীরের কোষে কোষে, হাড়ে মজ্জায় কোন খাবার কী প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে তাই নিয়ে নিত্য নতুন থিয়োরির অন্ত নেই। গবেষণার ঠেলায় রসনার

এবং খাদ্যবাসনার দফারফা একেবারে। গোমাংস নিয়েই কত তর্কাতর্কি ছিল এই বাঙালি সমাজে। যাদুগোপালের গবেষণা ছিল যদিও রসায়ন নিয়ে, কিন্তু তাঁর বাঙালি এবং ষাঁড়প্রীতি নিয়ে প্রগাঢ় দুর্ভাবনাও কম ছিল না। সে সময় বহু বাড়িতেই বিফকারি নয়তো বিফের কিমার চপ কাটলেট, কোপ্তা কারি রান্না হত। মুরগি যেহেতু নিত্যদিনের মেনুর ব্যাপার, লোকে নেমন্তন্ন করলে সেটাকে মামুলি পদ বলে বাদ দিতেন। ভেড়ার মাংস কিনে রান্নার পরিশ্রম বেশি। কারণ, চর্বি ঠিকমত বাদ দিতে না পারলে গন্ধে মুখে তোলা যেত না। মাছও এতরকম চিনে চিনে কিনতে পারা এবং ভাল করে রান্না করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। সুপার বাজারের মাছ তেমন পছন্দসই হয় না। আর খোলা মাছের বাজার বলতে ম্যানহাটনে ৪২ নং রাস্তায় আর অন্যান্য অঞ্চলের জুইশ দোকানে এবং ডাউন টাউনে চীনে পট্টিতে যেতে হত সন্ধে হবার আগে। এই সব কারণে মাছ কেনা ছিল এক সাপ্তাহিক পর্ব বিশেষ। আর শনিবারের বাঙালির আড্ডায় মাংস তো থাকতেই হবে। তা ভেড়ার বদলে গরুই সহজলভ্য। এবং শুনেছি নাকি বড়ই স্বাদিষ্ট বস্তু বলে তারই ঝোল, কালিয়া রাঁধা হত। আশ্চর্যের বিষয়—কর্তারা বেশ সংস্কারমুক্ত হলেও গিন্নিদের সহজে রাজি করানো যেত না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখনও ওই বস্তুটি গলাধঃকরণ করেননি। এখনও করেন না। যুক্তি হল—'আপ রুচি খানা'। আমেরিকায় খাবারের তো অভাব নেই যে বড়মাংস না খেলে চলবে না। এলাহি মাছ আছে। চিংড়ি, কাঁকড়া, মুরগি, ভেড়া, ছাগল, টার্কি পাখি—প্রাণীজ প্রোটিনের ছড়াছড়ি। অনেকে ঠাট্টা করে বলেন—'হ্যাম বার্গার হট্‌ডগে যদি বা বিফ খেতে পারি, সে হল বিলিতি ব্যাপার। কিন্তু ভাতে মেখে গোরুর ঝোল অসম্ভব!' আসলে সবই সংস্কারের ব্যাপার। কেউ বলেন, 'প্রথম প্রথম এদেশে অজান্তে অনেক কিছুই খেয়ে ফেলেছি। সস্তায় পেট ভরাতে হলে যখন যা পাওয়া যেত। এখন আর এসব নিয়ে ভেবে কী হবে?' এক বাড়িতে তো যাদুগোপালের সঙ্গে মাইক ব্যানার্জির রীতিমত খণ্ডপ্রলয়। কে যাদুর পাতে একটি কাবাব তুলে দিয়েছিল। যাদু সারা বাড়ি গৃহকর্ত্রীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। হন্যে হয়ে ডাকাডাকি। যেন জীবন মরণ সমস্যা—শোনেন মিসেস দাস, কাবাবে কী মাংসে দিসেন? এগুলি কিসের কিমা কন দেখি?' মিসেস দাস অপ্রস্তুত। কারণ যাদুকে অভক্ষ্য ভক্ষণ করানোর দুঃসাহস তাঁর নেই। সত্যি কথা বলতেই যাদু প্লেট রেখে দিলেন ঠক করে। একটি অন্য প্লেট নিয়ে আবার বাকি রান্না তুলতে লাগলেন। মুখ একটু গম্ভীর। তারই মধ্যে স্ত্রী অমিতাকেও 'খাইসো নাকি? সর্বনাশ করসো!' ইত্যাদি বলতে যাওয়াতে অন্য এক অতিথি মাইক ওরফে মোহন বাড়ুজ্যে রেগে অস্থির। মাইক রীতিমত ইতিহাস হাঁটকে বৈদিক যুগেটুকে চলে গেলেন। গলার শির ফুলিয়ে যাদুকে শোনালেন—'মশাই আমিও ব্রাহ্মণ। অত থিয়োরি ঝাড়বেন না। আর্যঋষিরা গোধিকা-টোধিকা সব খেত। তারপর হালচাষে গোরু কম পড়েছিল বলে তো গোরু মারা বন্ধ হল। দুধের শর্টেজও একটা প্রবলেম হয়েছিল নিশ্চয়ই। সাপ্লাই ডিমান্ডের ব্যাপারটা বোঝেন না? গোরুর সাপ্লাই বাড়াতে হল...।' তিনটে কাবাব সাবাড় করে শান্ত মানুষ মৃন্ময়ও যুক্তি সাজিয়ে ছিল—'তাছাড়া ট্রপিক্যাল কান্ট্রি তো। গোরুর মাংস শরীর গরম করত বলেও মানা করত।'

যাদুগোপাল সম্ভবত তার পরেই ওই প্রবন্ধটা আমাদের পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। 'শতং বদ মা লিখ'র কথা ভেবে লেকচারের স্থায়িত্ব নেই জেনে কলম ধরেছিলেন মনে হয়। প্রবন্ধটা নিয়ে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অন্য কারণে। সেটা হল কয়েকটি জলবিছুটি মার্কা মন্তব্য ছেড়েছিলেন তাতে। লিখেছিলেন—'কতিপয় বঙ্গ সন্তান এদেশে গোমাংস খাইয়া গর্বিত। তাহাদের দোষ দিই না। ক্ষমার চক্ষে দেখি। ভারতের দুইশত বৎসরের পরাধীনতার প্রত্যক্ষ ফল এই দাস মনোবৃত্তি। উহারা সাহেব হইতে চাহিয়াছে বলিয়াই অকাতরে সংস্কার বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু আরও একটি দল আছেন, যাঁহারা অতি লোভের সহিত মিথ্যাচারের আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা সারা বৎসর তৃপ্তি সহকারে ষাঁড়ের কালিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অথচ স্বদেশে গিয়া সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। সাহসের অভাব। কিন্তু শিশুরা তো মিথ্যাচার জানে না। উহারাই সত্য ফাঁস করিয়া দেয়। কলিকাতার রাস্তায় ঘুঁটেওয়ালির মাথার চুপড়িতে রাশীকৃত ঘুঁটে দেখিয়ে এরকম একটি সরলমতি বালিকা চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল—ওই তো মা, হ্যামবার্গারের প্যাটি নিয়ে যাচ্ছে। তবে কেন বলেছিলে যে ইন্ডিয়াতে গেলে বিফ পাবি না?' আহা! কি অকপট অভিব্যক্তি...।

কিন্তু ক্রমশ বাঙালি এবং ষাঁড়ের মধ্যে বেশ একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। কারণ শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। মেঘে মেঘে বেলা বাড়ছে। শুধু লাল মাংস কবজি ডুবিয়ে খাওয়ার অপরাধে কে চায় যে এই অবেলায় অন্যে কথা কবে, তুমি রবে নিরুত্তর? তার চেয়ে সময় থাকতে মাতা ভগবতীর দুধ, দই, চিজেরও মাখন তোলা অংশটি নিয়ে স্বস্তিতে থাকা ভাল।

আমেরিকায় খাওয়াদাওয়ার রাজ্যে সরকারি খবরদারির নানা বিভাগ আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি প্রধান শাখার দায়িত্ব তিনরকম। পুষ্টি নিয়েও রাজনীতি চলছে। যেমন F.D.A-র কাজ হল সুপার বাজারের সব খাবারের এবং ওষুধের ওপর নজর রাখা। কেবলমাত্র মাংস, হাঁস, মুরগির মাংস, ডিম এবং যেসব খাবারে ২% ভাগের বেশি মাংসজাত দ্রব্য আছে সেগুলি বাদে বাকি সব জিনিস F.D.A-র আওতায় পড়ে। আবার আমিষ যা কিছু, সে সব পড়বে U.S.Dept. of Agriculture অর্থাৎ USDA-র আওতার মধ্যে। আর খাবারের যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব থাকে ফেডারেল ট্রেড কমিশনের ওপরে। অর্থাৎ FTC বিভাগ। যেমন ধরা যাক ফ্রিজ করে রাখা পিৎজার উদাহরণ। এই নিরামিষ পিৎজার উপকরণ বলতে আছে ময়দা, টমেটো সস, চিজ এবং মশলাপাতি। কিভাবে তৈরি হবে, কি ভাবে সংরক্ষিত হবে, সব নির্দেশ দেবে F.D.A কিন্তু যদি ওই পিৎজাতে বেশ একটু মাংসের মিশেল দেওয়া হয়। তখন তার যাবতীয় নির্দেশ দেবে U.S.D.A। আর দু ধরনের পিৎজারই বিজ্ঞাপনের ভার নেবে F.T.C.। সরকারি উদ্যোগে খাদ্য নির্বাচন বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নানা প্রভাব প্রতিপত্তির ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে নাকি U.S.D.A. এ ব্যাপারে নিরপেক্ষতার বদলে মাংস বিশেষত গোরু এবং বাছুরের মাংসের ঢালাও সরবরাহ এবং প্রচারের জন্য সক্রিয় হয়েছে। এগ্রিকালচার সেক্রেটারি এডওয়ার্ড ম্যাডিগান হলেন আমেরিকার মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের ইলিনয় রাজ্যের লোক। আগে ছিলেন সেখান থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস ম্যান। ফলে ওই অঞ্চলটি যেহেতু হচ্ছে ফার্ম বেল্ট অর্থাৎ

মাংস ও দুগ্ধজাত উৎপাদনের কেন্দ্র, স্বভাবতই তাঁর চেষ্টা হচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা পূরণ।

১৯৫৮ সালে U.S.D.A. খাদ্য নীতি প্রসঙ্গে প্রধানত চারটি বিভাগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস, ফল ও তরিতরকারি এবং রুটি, সিরিয়াল জাতীয় শর্করাপ্রধান খাদ্য তালিকা। দীর্ঘকাল এইরকমই ছিল আমেরিকানদের খাদ্য ব্যবস্থা। কিন্তু গত ৩৫ বছরে হৃদরোগ, ক্যান্সার, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাধিক্য, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে চিকিৎসক এবং পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ করলেন অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্যই এইসব রোগের উৎপত্তি ঘটাচ্ছে। এই যে দুগ্ধজাত যাবতীয় খাদ্য এবং লাল মাংসের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তার পেছনে ছিল ওয়াশিংটনের সরকারি মহলের ওপর ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত প্রভাব প্রতিপত্তি। তাদেরই লবির জোরে এরকম মেদ ও চর্বিপ্রধান খাদ্যরুচি গড়ে তোলা হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। এ নিয়ে নানা প্রতিবাদ তুললেন প্রধানত চিকিৎসক এবং পুষ্টি বিশেষজ্ঞরাই। ফল ও সবজি ব্যবসায়ীরা আর ভাত, রুটি, ম্যাকারনি উৎপাদনকারীদের নালিশ তো ছিলই। ফলে তিন বছর আগে U.S.D.A. আবার নতুন এক ফরমান জারি করেছে। এখন খাদ্য তালিকার চেহারা বদলে গেছে। সেই চারটি মূল বিভাগ আছে ঠিকই। তবে সিংহভাগ জুড়ে আছে শর্করা জাতীয় খাদ্য এবং ফল ও শাকসবজি। 'হোল গ্রেন সিরিয়াল' আর খোসা সুদ্ধ ফল, সবজির জয় জয়কার। ক্যান্সার তাড়াতে খুব নাকি কাজ দেবে এই সব আক্ষরিক অর্থে 'ভূষি মাল।' লাল মাংস তালিকায় আছে বটে, তবে খুবই মাপা তার পরিমাণ।

ইদানিং এ সব দেখে শুনে মাংসওলারা বেজায় মনমরা। রেস্টুরেন্ট, সুপার বাজারে, হোটেলে, ফাস্টফুড চেইনগুলোতে ঢালাও মাল গছাতে পারছে না। মাছ আর মুরগি নিয়ে আমেরিকানরা অসম্ভব হামলে পড়েছে। যাদুগোপালের চেলার সংখ্যাও বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। মাংসওয়ালারা নতুন করে ওয়াশিংটনে আবেদন নিবেদন জানাচ্ছে। সেক্রেটারি ম্যাডিগান তাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল। এই সব তালিকা চালু করে আমেরিকার আগামী নাগরিকদের রক্তশূন্যতায় মারবে নাকি শেষে? শিশুদের শুধু ভূষিমাল খেয়ে শরীরে তাগদ হবে? লাল মাংস কম খেলেই হৃদয় ভাল থাকে। কে তার গ্যারান্টি দিচ্ছে? তিনি ফতোয়া দিচ্ছেন, আবার গবেষণা চালাতে হবে। ছোটদের ব্রেনের খোলতাইয়ের কথা ভেবে, গরিব মানুষদের স্বাস্থ্য বিবেচনা করে তাদের আমিষের প্রয়োজন কতখানি, সব বুঝে দেখা দরকার। যদিও তিরিশজন পুষ্টি বিশারদ অনেক গবেষণা করেই খাদ্য তালিকায় আমিষের অত্যধিক পরিমাণ কমাতে বলেছিলেন।

অবশ্য লাল মাংসেও আপত্তি নেই, যদি একেবারে চর্বিবর্জিত অংশটি খাওয়া যায়। ১৯৮৮ সালে আমেরিকার সার্জেন জেনারেল উপদেশ দিয়েছেন—'চর্বি বাদ দিয়ে লাল মাংস খেতে পারো। কিন্তু গোপালন এবং গোহনন ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র হচ্ছেন জাতীয় গোপালন সমিতির কর্তা গ্যারি উইলসন। তাঁর মতে—সোনার পাথর বাটির অবস্থা। এমনিতে নাকি সব খাবারের প্যাকেটে নির্দিষ্ট মাপ করা থাকে, যা কিনা বেশ পেট ভরাবার মতো। অথচ যত দোষ মাংসের বেলায়। সে সব প্যাকেট নাকি ওজন অনুযায়ী বা দৈনিক

খাদ্য তালিকা অনুযায়ী এমন সামান্য পরিমাণে রাখতে বলা হয় যে, মহাপ্রসাদ কণিকামাত্র গোছের অবস্থা। অবশ্য সরবরাহ প্রচুর আছে। কিন্তু ক্রেতার মাথায় ঢুকে গেল মাত্র এক আউন্স মাংসই খাওয়া নিরাপদ। মাংস ব্যবসায়ীরা U.S.D.A-কে মদত দিয়ে লাল মাংসকে আবার জনপ্রিয় করতে চাইছে। এদিকে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনও লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। ওয়াশিংটনে রীতিমত মাংস নিয়ে টানাটানি। অবশ্যই গোরু ও শুয়োরের মাংস। ডাক্তারদের জেহাদ ঘোষণার মতো।

এদিকে বিজ্ঞাপনে এখন শুধু 'লিন মিটের' মুখরোচক বর্ণনা। 'বিফ ইন্ডাস্ট্রি কাউনসিল অ্যান্ড বিফ বোর্ড' মেলা পয়সা খরচ করে বড় বড় পত্রিকাতে রঙিন ছবি দিয়ে বাছুরের কচি মাংসের গুণ গাইছে। কত রকমারি টুকরো। নাম তাদের স্কিনিয়েস্ট সিক্স। এক খণ্ডের নাম রাউন্ড টিপ। এক খণ্ডের নাম রাউন্ড টিপ মাত্র ১৫৭ ক্যালরি। ৫-৯ গ্রাম হচ্ছে সবসুদ্ধ চর্বির পরিমাণ। ২.১ গ্রাম হচ্ছে স্যাচুরেটেড চর্বির পরিমাণ। এছাড়া আছে টপ লয়েন, টপ রাউন্ড, আই অফ রাউন্ড, টেন্ডার লয়েন, টপ সাবলয়েন ইত্যাদি। মাপ, ওজন সব লেখা। আবার ছালসুদ্ধ মুরগি যে কত খারাপ, ছাল ছাড়ানো মুরগিও শুধু এইসব চর্বি বর্জিত গোমাংসের মতোই গুণাগুণ সম্পন্ন সে সব তো আছেই বিজ্ঞাপনে। তার ওপর গোমাংসেই আছে ৩৮% ভিটামিন বি-১২, এবং জিংক। প্রভূত প্রোটিন, আয়রনের কথা আর কে না জানে? ইংরেজিতে আবার ইদানীং 'গুরু' শব্দটা ভীষণ চলছে। শরীর সম্পর্কে 'গুরু'রা নাকি বলছে—'একটু একটু গোরু খাও। রোজ ডন বৈঠক মারো। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে বসে বাছুরের টুকরো ঝলসে খাও। তাড়া থাকলে ফাস্ট ফুডের দোকানে থেমে টুক করে নতুন ধরনের মেদ বর্জিত গোরুর কিমার হ্যামবার্গারে কিনে নাও—গোরুর মাংসের কোনও তুলনা আছে?' গুরুদের গরুবাক্য এবং লোভনীয় বিজ্ঞাপনের মহিমা সত্ত্বেও যাদুগোপালের চেলা চামুণ্ডারা বেড়েই চলেছে। যাদু পরিতৃপ্তির হাসি দিয়ে বলেন—'স্ট্যাক' খাইয়া জীবন অ্যাট স্ট্যাক হইত্যাছে না কত! জুইশরা শুয়ার খায়? তা গো তো মান যায় না? বাংগালির যত পগানদারি! আরে, কত কনফারেন্সে বইস্যা আমি ডিনার টেবিলে চিংড়ির গাদা লইয়া বসি। সাহেবরাই লুভির চক্ষে চায়। আর কিসু না পাইলে স্যালাড, রুটিই মাইরা দিই। বলি, আমাগো ধর্মে গোমাংস ভক্ষণ বারণ। অরা যে কি শ্রদ্ধার চক্ষে চায়!

ক্যানসাস অঞ্চলের গোরু বাছুর পালনকারী ব্যবসায়ীরা ওয়াশিংটনে লবি করছেন। U.S.D.A. থেকেও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণ করা হচ্ছে যে শরীরের পুষ্টির জন্যে, বিশেষত রক্তের লাল কণিকা ইত্যাদির প্রয়োজনে সীমিত তথা পরিচিত পরিমাণ বিফ এবং ভিল খাওয়া দরকার। কিন্তু আমেরিকায় কখন যে কী হাওয়া ওঠে? সুপার বাজার গেলে দেখতে পাই মুরগি, টার্কি আর মাছের টুকরো, ফিলে ইত্যাদি কিনে শপিং কার্ট বোঝাই করছে ক্রেতারা। ল্যাম্ব পর্কের বিক্রি কমে গেছে। কিমার তাকে মুরগি আর টার্কির সাদা কিমা থরেথরে এনে রাখছে আর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। মাছের বাজারে ইহুদি, কানো, ভারতীয়, ফিলিপিনো, চীনেরা তো বরাবরই ভিড় করছে। ইদানীং দেখি সাদা আমেরিকানরাও স্যামন স্টেক আর হেরিং, ম্যাকারেল, ফ্লাউন্ডার কড, হ্যাডাক মাছের দিকে ঝুঁকেছে। স্পেনীয় দোকানে ছাগলের মাংস ঝুলছে একেবারে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় বাঙালির পাঁঠার মাংসের

দোকানের স্টাইলে। বাঙালিরা ছাগলের মাংসের প্রধান ক্রেতা। উত্তর নিউ জার্সির স্পেনীয় দোকানের কাটা ছাগলছানা ব্যাগ বন্দি হয়ে ঢুকছে দক্ষিণ নিউ জার্সির সর্দারজির দোকান শেধী সিং-এর হিমঘরে। তারপর বাঙালি ফ্রিজারে ফ্রিজারে তার দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ। প্রথম জীবনে এ দেশের জীবনযাত্রার প্রতি যে আনুগত্য ছিল, দিন যাপনের সুবিধের জন্য ভোজনং যত্র তত্র গোছেরও ব্যাপার ছিল, এখন তো তেমন নেই। অনেক বাড়িতেই বৃদ্ধ বাবা মা দেশ থেকে পাকাপাকি ভাবে থাকতে এসেছেন, নয়তো মাস চার পাঁচেকের মেয়াদে। তাঁদের সুবিধে অসুবিধের কথা ভেবেও খাদ্যরুচির বদল ঘটানোর চেষ্টা আছে। ছেলে-মেয়েরা স্কুল কলেজে হটডগ, হ্যামবার্গার খাক, বাড়িতে অন্তত বিফ, পর্ক রান্নার পাট কমে আসছে। ছেলে মেয়েদেরও ইদানীং নানা ঝোঁক। অহিংস নীতি নিয়ে সাময়িক মাতামাতি করে একদল কলেজ ক্যাম্পাসেই 'শাকাহারী' হয়ে বসল কিছুদিন। ভেজিটেরিয়ান মার্কিনি ছেলেমেয়েদের সংখ্যা তো কিছু কম নেই। এরা পশুহত্যা বিরোধী আন্দোলনে প্রায়ই গিটার বাজিয়ে গান ধরে ক্যাম্পাসের মাঠে ঘাটে। আমাদের ছেলেমেয়েরাই বা নিষ্ঠুর' হবে কোন লজ্জায়? হঠাৎ উদাহরণ দেখায় এমারসন, থরো, আইনস্টাইন এঁরা সব কোনকালে মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকরা যদি বিনা মাংসে মেধার প্রমাণ দিয়ে থাকেন, হাতির মতো বিশাল দেহধারী জানোয়ার যদি বিনা মাংসেই এমন শক্তিমান বলে পশুরাজ্যে জ্বলন্ত উদাহরণ হতে পারে, তবে খাবার টেবিলে মাংস নিয়ে জবরদস্তি কেন? আর শরীরের বিষক্রিয়ার কথা কে না জানে? হটডগ, হ্যামবার্গার খেতে নাকি খুবই ভাল। তা গোরুর বদলে ইদানীং মুরগি আর টার্কি পাখির মাংস ছেঁচেই তো দিব্যি তৈরি হচ্ছে এসব। হু হু করে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। সুতরাং বিফ বিনা খাদ্য নেই, এ যুক্তি অচল।

যে কোনও তর্ক বা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ ইত্যাদির সময় আমি বরাবর বাক্যিহারা হয়ে যাই। মনে ভাবি, এরা যা বলছে বা বিশ্বাস করছে, আমার মতামতে কিছু তো ইতর বিশেষ ঘটবে না। শুধু একবার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলাম, কেন কে জানে? ফিলাডেলফিয়া বেড়াতে গিয়ে সেখান থেকে সমুদ্রের ধারে অ্যাটলান্টিক সিটি গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। তাঁরা ফিলাডেলফিয়াতে ছেলে বউয়ের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন, আমরা ওঁদের সমুদ্র দেখাতে নিয়ে গেলাম।

সেখানে অতলান্তিকের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার পর ওঁদের কিছু খাওয়ানো দরকার ছিল। কারণ অনেক ভোরে বেরিয়েছিলেন। খাওয়ার বাছ বিচার থাকা সম্ভব ভেবে নিয়ে এমন একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিলাম যেখানে মাছ, চিকেন, নানা ধরনের স্যান্ডউইচ, পিৎজা এবং স্টেক জাতীয় সব রকমই মোটামুটি পাওয়া যায়। ওঁরা কি খাবেন জানতে চাওয়ায় বৃদ্ধা মাসিমা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—'আমরা সব জায়গায় বাবা হ্যামটাই খাই। বিফ কেন খাব বল এই বুড়ো বয়সে? এখানে পথে ঘাটে সব জায়গায় তো হ্যামবার্গারই পাওয়া যায়। দিব্যি পেট ভরে যায়। হ্যাম তো আমরা দেশে থাকতেও কয়েকবার চাইনিজ খাবারে খেয়েছি। এখানেও হ্যামবার্গারই অর্ডার দিয়ে দাও।'

আমি ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিনি। কারণ এতদিন তাঁরা বউমার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে

হ্যামবার্গারের নামে হ্যামের বদলে যে ষাঁড়ের কিমা খেয়ে চলেছেন, সে কথা জানিয়ে গৃহবিবাদ লাগানোর দরকার ছিল না। হয়তো ওঁদেরও মানসিক স্বস্তি হত না, অজান্তে সংস্কার ভেঙেছেন ভেবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ফিশ অ্যান্ড চিপসের অর্ডার দিয়েছিলাম ওঁদের এবং আমাদের জন্যে মাছভাজা আর আলুভাজা খেয়ে ভারী খুশি হয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন—'শুধু শুধু আমাদের জন্যে। তোমাদেরও স্টেক খাওয়া হল না। এক টেবিলে বসে আমাদের ঘেন্না করবে ভেবেই খেলে না বোধ হয়?'

ডাঃ যাদুগোপাল আমাকে যাদু করেছিলেন বলে নয়, ভটচাজ্যিকুলে আমার জন্ম বলে নয়, শুধু আমার নিজের ইচ্ছে হয়নি বলেই এই দীর্ঘ প্রবাসে আমি কখনও হ্যামবার্গার হটডগ খেয়ে দেখিনি। স্টেকের স্বাদ আমার জানা নেই। অবশ্য এত সাতকাহন তাঁকে শোনানোর কোনও অর্থ ছিল না। শুধু বলেছিলাম—'সমুদ্রের ধারে এলেন আর মাছ ভাজা খাবেন না এ কখনও হয়? হ্যামের নামে হ্যামবার্গার চালিয়ে দিতে পারতাম হয়তো। ইচ্ছে হয়নি। ওঁদের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সম্ভবত এইটুকুই ছিল আমার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

সুখাদ্য এবং শৈশব

আমেরিকান সমাজে ছেলেমেয়ে নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার রেওয়াজ না থাকলেও, আমাদের বাঙালি মহলে যে কোনও অনুষ্ঠানে সপরিবারে যাওয়ার কথা থাকে। পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে ছাড়াও বাড়িতে সে সময় সাময়িক অতিথি কেউ যদি থাকেন, তো তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলা হয়। একে তো ছুটির দিনে দেখা সাক্ষাৎ। তার ওপর এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব কম বেশি পথে দশ থেকে ষাট সত্তর মাইল। গুষ্টিসুদ্ধ না গেলে বাড়ির জন্যে মন ব্যস্ত থাকে। কাজের লোকও নেই যে বাড়িতে থেকে যাওয়া লোকটির জন্যে রান্নাবান্না বা ধোয়া মাজার পর্বটি সামলাবে। তাছাড়া সপ্তাহ শেষে সকলেই চান একসঙ্গে সময় কাটাতে।

কিন্তু ছেলেমেয়েরা একটু বড় হয়ে যাবার পর আর সব জায়গায় সঙ্গে যেতে চায় না। নিজেদের পড়াশোনা, পরীক্ষা, হোম ওয়ার্কের চাপ থাকে। বন্ধুবান্ধব, স্কুল টিমের খেলার প্র্যাকটিস, পিয়ানো ক্লাস, বেহালা ক্লাস ইত্যাদি নানা পর্ব। তাছাড়া সব বাড়িতে নিজেদের বয়সী ছেলেমেয়েও পায় না। ফলে বাবা মার সঙ্গে থাকতে হবে বলে অতদূর উজিয়ে গিয়ে শুধু টিভি দেখে সময় কাটাতে রাজি হয় না। তার চেয়ে নিজের বাড়িতে রাজত্ব করা অনেক ভাল। খিদে পেলে মার রেখে যাওয়া খাবার ইচ্ছেমত মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করে খেয়ে নিলেই হল। নয়তো স্যান্ডউইচ, পিৎজা খেয়ে ঝামেলা মিটিয়ে নেবে। তবু আমাদের সীমা অনেকদিন পর্যন্ত তার ছেলেমেয়েকে ধরে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত মেয়ে ঘোর আপত্তি জানাল—"না, চিকেন স্টু খাওয়ার জন্যে কিছুতেই আমি তোমাদের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়া যাব না।" সীমা তো অবাক—"কেন? শুধু চিকেন স্টু খাবি কেন?" "তাই তো দেয় আমাদের। জান, কত বাড়িতে আমাদের চপ দেয় না। প্রন দেয় না। খালি ওই বাচ্চাদের সঙ্গে আগে ডেকে গাজর দেওয়া স্টু চালাবে...।"

এই দুঃখ কিন্তু শুধু সীমার মেয়ের নয়। আরও কটা ছেলেমেয়ে একই কথা নিয়ে গজগজ করেছে। আসলে কিছু কিছু বাড়ি থাকে এরকম, যেখানে ধরেই নেওয়া হয় গরগরে রান্না বাচ্চাদের দেওয়া ঠিক নয়। ফলে শিশু থেকে কিশোর কিশোরী পর্যন্ত গাজর, বিনের সঙ্গে চিকেন সেদ্ধ আর ভাত ছাড়া কিছু পেল না। অবশ্য উদ্দেশ্য মহৎ। ঝাল বিষ রান্না নিয়ে বাচ্চাগুলো ফেলে দেবে। বাঙালির ঘ্যাঁট চচ্চড়ি কিংবা করলার তেতো ডাল মুখেও করবে না হয়তো। কাঁটা বেছে মাছ খাবে কেউ? বড়দের জন্যে পাঁঠার কোর্মায় এস্তার তেল মশলা ঢালা হয়েছে। কাটলেটের পরতে পরতে কাঁচা লঙ্কার কুচি। আন্দাজে গাদা খানেক বানিয়ে তারপর পাতে পাতে নষ্ট হবে হয়তো। এইসব ভেবে কেউ কেউ ওই স্টুয়ের গামলায় চিকেন আর তরকারি দিয়ে দেন।

জয়তীর ছেলে ফ্রায়েড রাইস ভালবাসে। মেয়ে ভালবাসে চিংড়ি মাছ। অনিতার বাড়িতে সে সবই ওভেন বন্দি রইল বড়দের খাওয়ার সময় পর্যন্ত। পরে বাড়ি ফেরার সময় মায়ের কী দুঃখ। 'আহা তোকে সাদা ভাত দিয়েছিল শুধু? ফ্রায়েড রাইস পাসনি?' মেয়ে তুলতুল বিরস বদনে বলল—'আমাকে একটুও চিংড়িমাছ দেয়নি।'

এইসব মন ভারী করা কাহিনী শুনে আমাদের মহিলা মহলে বেশ একটা প্রতিক্রিয়া হল। তারপর দেখা যাচ্ছে ইদানীং সেই স্টু শুধু তৈরি হচ্ছে, নেহাৎ গেঁড়াগেঁড়িগুলোর জন্যে। কিন্তু পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত লালন করার পরই আমরা তাদের সুখাদ্যের রাজ্যে ডেকে আনছি। এবং দেখছি দিব্যি তারা মনোযোগ দিয়ে শিক কাবাব, শাম্মি কাবাব, চপ, কাটলেট, চিকেন টিক্কা কাবাব, ঝাল শিঙাড়া থেকে শুরু করে পোলাও, মাংস সবই পছন্দমত খাচ্ছে। বুফে ডিনারের সুবিধে এই যে—যা ওদের পছন্দ তাইই শুধু তুলে নিয়ে খাচ্ছে। পাতে গাদা খানেক চাপিয়ে দিয়ে জোর জবরদস্তিও নেই, আর 'চিংড়ি পাইনি' বলে দুঃখ করারও কারণ নেই।

মুখরোচক খাদ্যের বাগানে হিংসুটে দৈত্যের মতো শিশু এবং কিশোর কিশোরীর প্রবেশ নিষেধের নিয়ম জারি যে আমরা কেন করি, সে নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আসলে তাদের হজমশক্তি নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা থেকে এরকম সাবধানী হয়ে পড়ি নিশ্চয়ই। আমাদের রান্নায় তেল, ঝাল, মশলার আধিক্য থাকে বলেও হয়তো ছোটদের রান্না, বড়দের রান্না বলে দুটো আলাদা ব্যাপার থাকে বরাবর। ফলে এইসব দুঃখ টুঃখের কাহিনী শোনা যায়। একটি ছেলে তো বিজ্ঞের মতো মাকে জিজ্ঞেসই করেছিল—'যা খেতে ইচ্ছে করে, সেগুলোয় কেন অপকারিতা? যা বিচ্ছিরি খেতে, তাতে কেন উপকারিতা?' তার মা তাকে ইস্কুল ফেরত পটেটো চিপস-এর বদলে কাঁচা গাজর চিবোতে বলেছিল বলে ছেলের এই দার্শনিক প্রশ্ন জেগেছিল।

ছোটবেলায় এ প্রশ্ন আমাকেও কম বিচলিত করেনি। আমাদের পাড়ার বিখ্যাত রাঁধুর

দোকানের কাটলেট কেন যে আমি সিকি ভাগ পাব আর তার বদলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কেন আমাকে জোর করে 'সেন মহাশয়ের' লেবুর গন্ধওলা নরম নরম সন্দেশ খেতে হবে, এ দুঃখ আমি বহুকাল সহ্য করেছি। দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ের ডেকচিতে সাজানো লাল টুকটুকে মশলা মাখানো ডিমের কারি এ জন্মে খেয়ে দেখা হল না। পরে বড় হয়ে অবশ্য আমি উজ্জ্বলার ফুটপাতে ভাজা কুচো চিংড়ির চপ খেয়ে খেয়ে অনেকবার শোধ তুলেছি। মুখ নিচু করে আতা সন্দেশ আর শাঁখ সন্দেশ খেতে খেতে আড়চোখে বড়দের কাটলেট দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেও এক দানে মেকাপ করে নেবার জন্যে ছাত্রজীবনে দক্ষিণ থেকে মধ্য কলকাতার যাবতীয় রেস্টুরেন্টে ঢুকেছি। চাওমিন থেকে মশালা ধোসা, কলেজ স্ট্রিট পাড়ার জ্ঞানবাবুর কষা মাংস থেকে দিলখুশার চাপ—সবরকম চাপের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি। ছোট থেকে লাগাতার সন্দেশ আর ফলের আতঙ্কে ভুগে ভুগে ওরকম ভাজাভুজির লোভ হয়েছিল নির্ঘাৎ। ছোটদের কষ্টটা বুঝি আমি। ওই বয়স আর ফেরে কোনওদিন? এই যে আমেরিকায় আইসক্রিমের রাজ্যে বসে আছি। কিন্তু বহু যুগ আগেকার গরমের ছুটির দুপুরে ইশারায় 'ম্যাগনোলিয়ার' গাড়ি ডেকে লুকিয়ে বারো আনা দিয়ে 'চকবার' খাওয়ার আনন্দ এবং রোমাঞ্চ আর ফিরে আসবে? রোমাঞ্চ এ কারণে যে গাড়ির রংটা ঘন হলুদ হলেও গায়ে গাঢ় নীল দিয়ে টানা হাতের লেখাটা হয়তো 'ম্যাগনোলিয়া' ছিল না। ছিল একই রকম কায়দায় লেখা—'ম্যানজুলা'। এবং বলা বাহুল্য গুরুজন অনুমোদিত আইসক্রিম কোম্পানি নয় সেটা। কিন্তু আমাদের সে বয়সটায় কোম্পানির কৌলীন্য নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার ছিল না। প্রত্যেক নিঃঝুম দুপুরে প্রত্যেক পাড়ায় 'ম্যাগনোলিয়ার' গাড়ি ঘন ঘন না এলে আমরা আইসক্রিম খাব না? 'ম্যানজুলাই কী এক অনাবিল আনন্দ দিয়ে যেত। শুধু ভয়ে ভয়ে একবার মাত্র আমরা ভাইবোনদের কাছে ফিশফিশ করে আলোচনা করেছিলাম—'শেষ কালটায় কি রকম তেতো তেতো লাগে না রে?' এখন মনে হয়, স্যাকারিনের জন্য ভ্যানিলা আইসক্রিম শেষকালটায় কিঞ্চিৎ তিতকুটে ঠেকত। সে যাই হোক, মোট কথা বয়সের সঙ্গে লোভের একটা সম্পর্ক থাকবেই। বড় হবার পর এত স্বাধীনতা আসে। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা থাকে নাকি আগের মতো?

আমেরিকাতে ছোটদের 'লোভ' ব্যাপারটি ভালই প্রশ্রয় পায়। তাদের কাছে রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়ার আকর্ষণ খুবই বেশি। শুধু যে খেতে যাবে তা নয়, কোন রেস্টুরেন্টে কী খাবে, সেও তাদের মতামত অনুযায়ী ঠিক হবে। এদেশে 'রোপার অর্গানাইজেশন' একটি সমীক্ষা নিয়েছে। মোট যতগুলো পরিবারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে শতকরা ৫৫% বলেছেন—বাইরে ডিনার খেতে যাবার আগে প্রত্যেকবার ছোটরাই তাদের পছন্দের জায়গায় আমাদের নিয়ে যেতে বাধ্য করে। অর্থাৎ একটি পরিবার সে রাতে ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে খাবে, না ফ্রেঞ্চ, গ্রিক খাদ্য খাবে, না চীনে রেস্তোরাঁয় যাবে—সেসব ছোটরাই ঠিক করবে। বাবা মায়ের মতামতের চেয়ে তাদের ইচ্ছেই প্রধান।

'ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশনে'র হিসেব অনুযায়ী গত সাত বছরে তারা লক্ষ করেছে—আমেরিকায় যেসব শিশুর বয়স ছ বছরেরও নীচে, তাদেরও রেস্টুরেন্টে খেতে আসার বহর ভীষণ বেড়ে গেছে। ৩৬% বেশি হয়ে গেছে ইদানীং।

এর জন্যে আমেরিকান জীবনযাত্রার পরিবর্তন অংশত দায়ী। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী দুজনের ক্ষেত্রে চাকরি করার এরকম চাপ আসেনি। ছ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে, মেয়ে মায়ের সঙ্গ পেত অনেক বেশি। তখন ছুটির দিনে স্বামী স্ত্রী ডিনারে বাইরে যেতেন একটু নিজেদের মধ্যে সময় কাটাতে। ছেলেমেয়েকে বেবি সিটার বা মায়ের বাড়িতে রেখে দুজনে একসঙ্গে ডিনার খেতে যাওয়া বা থিয়েটার ফেরত রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসা। কিন্তু ক্রমশ অর্থনৈতিক কারণে এ যুগে বাবা, মা দুজনেই সারা সপ্তাহ কাজের পেছনে ছুটে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত সপ্তাহে পাঁচদিন তাদের এমন ব্যস্ত জীবন যে উইক এন্ডে আর ছোট ছেলেমেয়েকে ছেড়ে রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে ইচ্ছে করে না। যদি যেতে হয় তো সবাই মিলেই যাওয়া হোক। শুধু উইক এন্ড বলে নয়, কাজের দিনেও মা ফেরেন অফিস ফেরত ক্লান্ত হয়ে। সব দিন রান্নার পর্ব করতে ইচ্ছেও হয় না। এদিকে বাচ্চাগুলোর খাওয়ার সময় হয়ে যায়। তখন সবাই মিলে কাছাকাছি কোনও রেস্টুরেন্টে গেলে সময় বাঁচে, পরিশ্রম বাঁচে। এদেশে এখন 'কোয়ালিটি টাইম' কথাটি খুব চলছে। অর্থাৎ কতক্ষণ প্রিয়জনের সঙ্গে কাটাচ্ছি সেটা বড় কথা নয়। কিরকম ভাবে কাটাচ্ছি সেটাই আসল কথা। তা এক্ষেত্রে সারাদিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ, বকাঝকা নয় চালিয়ে বরং সারাদিন চাকরির পরে রেস্টুরেন্টে তাদের নিয়ে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, তাদের পছন্দের খাবারটি কিনে খাওয়ানো, ফেরার পথে আইসক্রিম—এ সবই হল 'কোয়ালিটি টাইম' অর্থাৎ মধুক্ষণ। আর ছোটদের তো পোয়াবারো। মাকে সারাদিন পাই বা না পাই, সন্ধেবেলা পাচ্ছি। বাড়ির একঘেয়ে খাবার জবরদস্তি খেতে হচ্ছে না। ঘুরে ঘুরে চীনে, ইতালিয়ান, আমেরিকান ডিশ। ভাল ভাল হাওয়ার গুণে হজমের কষ্ট নেই। ইন্সপেক্টরদের 'ঝটিকা সফরে'র ভয়ে রেস্টুরেন্টগুলো সদাই তটস্থ। রান্নাঘরে বাসি, পচা চালানোর উপায় নেই। তেল থেকে মাছ, মাংস, মশলাপাতি এমনকি দুধটি পর্যন্ত ফুড ইন্সপেক্টর বিনা নোটিশে হাজির হয়ে পরীক্ষা করে দেখবে। সুতরাং রেস্টুরেন্টে খেয়ে অসুস্থ হবার কথা সচরাচর শোনাই যায় না। এসব কারণেই বাবা মা নিশ্চিন্ত মনে ছানাপোনা নিয়ে খেতে বসে যান। প্রশ্ন হতে পারে, এমন জীবনযাত্রায় লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় কি না? সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে স্ত্রী বাইরে কাজ নিয়েছেন। অথচ এই হারে বাইরে ডিনার সারতে গেলে খরচও তো খুব বেশি হয়ে যায়। কথাটির যুক্তি আছে। তবে সাধারণত এই ধরনের ডিনারগুলো বেশিরভাগই ছুটির দিনে হয়। আমেরিকানদের সামাজিক জীবন বেশ সীমাবদ্ধ। আত্মীয়স্বজনের গণ্ডিও জ্ঞাতি গুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছায় না নিজের বউ ছেলেমেয়ের বাইরে পারিবারিক বা আর্থিক দায় দায়িত্ব বলে কিছুই নেই। সুতরাং এইসব খরচ তাদের গায়ে লাগে না তেমন। তবে কাজের দিনে হঠাৎ বাইরে খাওয়া মানে সস্তার ফাস্ট ফুড চেইনগুলোতে ঢোকে বেশি। তিরিশ ডলারের মধ্যে গোটা পরিবারের পেট ভরে যায়। কারণ এদেশে দামের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দেয় যে কোনও জায়গাতেই। স্ত্রী কাজ করেন, সব সময় আর্থিক প্রয়োজন মেটাতেই নয়। তাঁর শিক্ষা দীক্ষার কাজে লাগাবেন বলে এবং স্বনির্ভর হবেন বলে। অনেক ক্ষেত্রে সাংসারিক একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়াটাই নাকি বড় ব্যাপার। সারাদিন দুটো দুধের বাচ্চা পায়ে পায়ে ঘুরছে, নিজেকে

'মা' এবং 'স্ত্রী' ছাড়া আর কোনও পরিচয়ে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। এইসব গাঢ় বিষণ্ণতা থেকেই মা মুক্তি চান কর্মক্ষেত্রে। তা সে মুদির দোকানের চাকরি হয় তো তাইই সই। জীবনের আউটলেট আর কি? সুতরাং তারপর ছুটির দিনে কোয়ালিটি টাইমের জন্যে সেই পায়ে পায়ে ঘোরা বাচ্চা দুটোকেই ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়।

বস্টনের কাছে আছে 'গ্রাউন্ড রাউন্ড' নামে একটি ফাস্ট ফুড চেইন কোম্পানির হেড কোয়ার্টার। এদের হ্যামবার্গার, হট ডগ ছাড়াও বহু রকমের সস্তার মেনু আছে। এদের হিসেব অনুযায়ী এরা সারা বছর আমেরিকায় অন্তত দশ লক্ষ পরিবারকে খাবার বিক্রি করে। তার মধ্যে পাঁচ লক্ষই হচ্ছে ছোট ছেলেমেয়ে।

তবে এইসব ছোট খদ্দেরদের নিয়ে সমস্যাও থাকে। এক এক সময় রেস্টুরেন্টে বসে এমন সব দুষ্টুমি শুরু করে যে অন্যান্য লোকেরা বিরক্ত হতে পারে। অনেক রেস্তোরাঁয় এ জন্যে আলাদা লাউঞ্জ থাকে। সেই দিকেই ব্যবস্থা থাকে ছোট ছেলেমেয়েসহ পরিবারগুলি যাতে অনেকক্ষণ বসতে পারে। অনবরত চিৎকার, কান্না, হল্লা তো অন্য লোকেদের বরদাস্ত না হতেই পারে। তার ওপর আছে সমানে কাঁটা ছুরি নিয়ে লোফালুফি, জলের গেলাস ওলটানো, ন্যাপকিন ছুড়ে ফেলা, চেয়ারে দাঁড়ানো, সারা ঘরে দাপিয়ে বেড়ানো ইত্যাদি ব্যাপার। খুব ছোটদের জন্য হাই চেয়ারের বাবস্থা থাকে। নইলে উঁচু খাবার টেবিলের নাগাল পাবে না। মা শক্ত করে স্ট্র্যাপ বেঁধে দেন। যাতে দাঁড়িয়ে বা নেমে পড়তে না পারে।

রেস্টুরেন্ট মালিকদের মতে খুব ছোট বয়স থেকে এদের সঙ্গে আনা উচিত। তবেই নাকি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শিখবে। টেবল ম্যানার্স শিখবে। তবে বাড়িতেই যদি খেতে বসে দুরন্তপনা করে, তাকে একদিনে কিছু শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যে ছেলে খাবার নিয়ে সারা বাড়ি দৌড়বে, সে রেস্টুরেন্টে অন্য ব্যবহার করবে কেন? অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষাটি বাড়িতেও দাও, রেস্টুরেন্টেও দাও। মানে শিশু শিক্ষার ব্যাপারটি এসে যাচ্ছে আর কি! 'আবোল তাবোলে'র ডানপিটে ছেলে হলে কোনও রেস্টুরেন্ট ব্যবসার খাতিরেও তাকে বরদাস্ত করবে না। কোলের বাচ্চার জন্যে ফিডিং বোতল, গলায় ঝোলানোর বিব, মুখের রবারের চুষি, খেলনা সব সঙ্গে নিতে বলছে এরা। আর একই বড় বয়সের জন্যে নোট বই, রঙিন পেনসিল; ছবির বই ইত্যাদি। ভুলিয়ে রাখার সরঞ্জাম মজুত রাখলে শিশুরা বেশি জ্বালাতন করবে না। তবে হঠাৎ হঠাৎ দাবড়ানি দেওয়াও ঠিক নয়। তাতে ছোটরা বাইরে খাওয়ার নামে ভয় পেয়ে যাবে। মোট কথা বাড়িতে আর রেস্তোরাঁতে মা, বাবার সমান ধৈর্য এবং ছেলেমেয়ের সমান ট্রেনিং থাকা চাই। বাড়িতে মুখ থেকে থু থু করে খাবার ছুঁড়ছে দেখে শুধু ওরকম করে না বলে ক্ষান্ত দিলাম। আর রেস্টুরেন্টে ওই এক কাজ করে মান ডোবাচ্ছে দেখে দিলাম কষে এক থাপ্পড়—এ অসংযম চলবে না। শাসন দমন যা করতে হবে, ঘরে বাইরে একরকম। বাচ্চারা সচরাচর নিজে হাতে খাবার খেতে চায়। সুতরাং ওই কাঁটা, চামচ দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে প্রথম থেকেই। হাতে কলমে শিক্ষা আর কি! মনে আছে কলকাতার একটি ছেলে গ্র্যান্ড হোটেলে বসে অসম্ভব জোরে জোরে মাংসের নলি চুষে বার করার জন্যে হাড় নিয়ে কুস্তি করছিল। শেষে মরিয়া হয়ে কাচের প্লেটের ওপরেই

ঠোকাঠুকি চালিয়েছে। শাঁস কী পেয়েছিল কে জানে? কিন্তু পরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তার মার কী দুমদাম চড়চাপড় মারা। মার মান নিয়ে টানাটানি। আর ছেলের কান নিয়ে। পরে সে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল বাড়িতে তো সমানে প্লেটের ওপর ঠুকে ঠুকে নলিটা বেশ করে খাই। না হলে হুশ হুশ করে চুষে বের করি। তখন তো মারো না...' সে ভারী বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখেছিলাম। ছোটদের জন্যে আমেরিকার বেশির ভাগ রেস্তোরাঁয় আলাদা মেনু থাকে। বড়দের পদগুলোর চেয়ে দামও কম হয়। মজার মজার নাম সে সব সুখাদ্যের। ডিজনিওয়ার্ল্ডের কার্টুন চরিত্রগুলোর নামে নামকরণ। ওরা যা যা খেতে ভালবাসে সেরকম অনেক কিছুই একটু একটু করে সাজিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে ডিশ তৈরি করে দেয়। একটু স্প্যাগেটি, কয়েক টুকরো চিকেন, টার্কি, পর্ক, বিফ, নয়তো মাছ ভাজার সঙ্গে আলুভাজা, নানা ধরনের স্যালাড, সস দিয়ে প্লেট সাজানো। কখনও সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টা সেদ্ধ, একটা রোল রুটি, নয়তো সামান্য ভাত, টমেটো, সস, চিজ, সস বা হোয়াইট সস, যা ওদের পছন্দ তাই দিয়ে খাবারগুলো নরম করে দেবে। পরে আইসক্রিম আসবে। এতেই ওরা মহা খুশি। ভাবখানা—'আমাকেও সব কিছু দিয়েছে।' ছোট থেকে নানা রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে বিভিন্ন দেশের রান্না খাওয়ার অভ্যেস হতে থাকে। ভারতীয় ছেলেমেয়েদেরও ছোট থেকে এই যে আন্তর্জাতিক খাদ্য রুচি গড়ে উঠেছে, তারও কারণ হচ্ছে বাবা মায়ের সঙ্গে নানা জায়গায় গিয়ে খাওয়ার অভ্যেস। পরে কলেজজীবনের ক্যাম্পাসে 'ক্যাফেটেরিয়া'র খাওয়া নিয়ে অসুবিধে হচ্ছে না। আবার দেশে বেড়াতে গেলে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বা ভারতীয় রেস্তোরাঁতেও পছন্দমত খাবার পেয়ে যাচ্ছে।

এদেশে রেস্তোরাঁর মালিকরা নিজেদের ব্যবসার খাতিরে ছোট খদ্দেরদের সঙ্গে আনতে উদ্বুদ্ধ করছেন। কিন্তু আমার নিজেরও ধারণা ঘরে বাইরে যেখানেই হোক, নেহাৎ অসুস্থ না হলে শিশুর কাছ থেকে সুখাদ্যকে দূরে রাখতে নেই। মাঝে মধ্যে একটু আধটু নিয়ম ভাঙলে মস্ত ক্ষতি কিছু হয় না। সময়ের কাটলেট সময়ে না খেলে আর সে স্বাদ মেলে না। পাঠকরা বলতে পারেন, ভাল জল হাওয়ার দেশে বসে 'প্রবাসীর চিঠি'তে শিশুদের জন্যে এরকম আলগা মমতা দেখানো খুব সহজ। বিভ্রান্তিকরও বটে। আমার একটিই উত্তর—মনটাকে শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ভেবে দেখুন তো, আতা সন্দেশ আর মুসুম্বি, কমলালেবুর থালা কখনও কবিরাজি কাটলেট আর মোগলাই পরোটার বিকল্প হতে পারে কিনা?

৯ নভেম্বর ১৯৯১

গৌরীদেবীর বিকল্প রান্না

আমার স্পষ্ট মনে আছে কলকাতায় হরি সিং ট্র্যাভেল এজেন্সিতে বসে একটি কাতর মুখের ছাত্র ট্র্যাভেল এজেন্টকেই জিজ্ঞেস করেছিল—দাদা, আমেরিকায় চাল পাওয়া যাবে? রোজ রোজ ভাত খেতে পারব?

ট্র্যাভেল এজেন্ট এক বাক্যে মাথা নেড়ে বলেছিলেন—আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। চাল, চিঁড়ে, মুড়ি, খই সব পেয়ে যাবে। তখন আমার চিঁড়ে মুড়ি নিয়ে উৎসাহিত হবার সময় নয়। আমেরিকা বলতে চোখের সামনে ভেসে উঠত মাথায় মুকুট পরা স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ছবি। কবে আমার বড়মামা অধ্যাপক ˚ প্রবাসজীবন চৌধুরী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে গিয়ে আমাকে ডিজনিল্যান্ডের ছবি দেখিয়েছিলেন, সেই সব অনুষঙ্গই ঘিরে থাকত। তাই চালকাতর ছেলেটির আক্ষরিক অর্থে 'হাভাতে'পনায় আশ্চর্যই হয়ে যাচ্ছিলাম। উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার নামে কাগজে সরু গোঁফওলা, টাই ঝোলানো ছবি ছাপিয়ে আমেরিকা চলেছিস। তা না ভাত ভাত করে অস্থির!

কিন্তু এখন সেই 'হা অন্ন কোথা অন্ন' করে মরছি আমরা নিজেরাই। সুপার বাজারের চাল পছন্দ হয় না। প্রত্যেক ভারতীয় দোকানেও আবার সবরকম বাসমতী চালের চটের বস্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু বঙ্গ সন্তান সেরা চালের লোভে দশটা দোকান ঘুরতে রাজি। হাতি ছাপ ৮১৭ মার্কা, সাধু ব্র্যান্ড, সুপার সাধু ব্র্যান্ড, জল তারা রাইস, পরীব্র্যান্ড বাসমতী, দেরাদুন বাসমতী, পাকিস্তানি বাসমতী, বীরপ্রভু ব্র্যান্ড—চালের নমুনার শেষ নেই। তার মধ্যে সর্দারজি দোকানি রটিয়েছে—কুয়েতিরা নাকি এতকাল ধরে পৃথিবীর সেরা বাসমতী খেয়ে নিচ্ছিল। ইরাকিরাও। আপাতত তাদের হানাহানির কারণে হালত খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেই অপূর্ব কামিনী আতপ মরুভূমি ডিঙিয়ে সর্দারজির গুদামে ঢুকে পড়েছে। আর বাঙালিকে পায় কে? আমেরিকায় কামিনী, কাঞ্চন সব এখন নাগালের মধ্যে।

কিন্তু বহুকালের বাসিন্দা গৌরীদি বাঙালির এইসব মৌলিক খাদ্য অনুসন্ধানের ঘোর বিরুদ্ধে। বরাবর দেখে আসছি উনি গুজরাতি বা সর্দারজির দোকান বাদ দিয়েই এতকাল দিব্যি সংসার করে আসছেন। কোনও ভারতীয় মশলাপাতির বালাই নেই, লাউ, করলা কিনে খাবার বাতিক নেই, ইলিশ, চিংড়ির লোভ নেই, রসগোল্লা, পান্তুয়া বানানোর হুজুগ নেই। একেবারে স্বধর্মে অবিচল থেকে শুধু বিকল্প দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। যস্মিন দেখে যদাচার ভেবে প্রথম দিকে কেউ কেউ ওঁর শিক্ষাধীন ছিল বটে। কিন্তু ইদানীং দলছুট হয়ে পালিয়েছে।

তপন ঘোষের ছেলের মুখেভাতে ছানার ডালনা করে দেব ঠিক ছিল। গৌরীদি সমানে সুপার বাজার থেকে চীনে সেকশনের "টফু" নামে সয়াবিনের টুকরো দিয়ে ডালনা বানানোর উপদেশ দিতে লাগলেন। এদেশে দুধের এত অঢেল বন্দোবস্ত। তার ওপর একটা অন্নপ্রাশন বলে কথা। ঝেঁটিয়ে বাঙালি ভোজ খেতে আসবে। আমি কেন চীনে টফুর

তরকারিকে ছানার ডালনা বলে চালাব? গোঁজামিলের একটা সীমা থাকা দরকার আর আমার একটা প্রেস্টিজ নেই? প্রথমত ছানা কেটে বলের মতো ন্যাকড়াবন্দি করাই একটা বেশ প্রতিভার ব্যাপার। তার ওপর তাকে চৌকো চৌকো মসৃণভাবে টুকরো করা। একশো লোকের জন্যে অন্তত পাঁচশো চৌকো চাই। তাতেও আমি দমে যাইনি। হঠাৎ এরকম প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটিয়ে রবার মার্কা সয়াবিন চাংক রাঁধবই বা কেন? গৌরীদি বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিলেন—কোনও রকম একসপেরিমেন্ট করো না কেন বলো তো? ওই টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান রেসিপি নিয়ে বসে থাকো!

গৌরীদির ঘুঘনি, সিঙাড়া, চপ, মালপোয়া—সব কিছুর মধ্যেই প্রগাঢ় পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রমাণ পেতাম আমরা। ভারী নতুনত্বও বটে! টিনের ছোলা সেদ্ধর সঙ্গে টিনের টমেটো গোলা আর কেক পেস্ট্রির ওপর ছড়ানোর জন্যে যে চিনি মাখানো শুকনো নারকোলের পাউডার পাওয়া যায়—তাই মিলিয়ে বানাতেন "পাঞ্জাবি ঘুঘনি"। গিনিপিগ বলতে আমরা। ভাগ্য ভাল যে কোনও পাঞ্জাবি সেই মোক্ষম পদার্থটির খবর পায়নি। পেলে তাদের জাতের নাম ডোবানোর জন্যে অনায়াসে গৌরীদিকে চেপে ধরত।

সেই গৌরীদি 'বিকল্প রান্না'র ক্লাস নেবেন বলে আমাদের রবিবাসরীয় ক্লাবঘরে হাজিরা দিতে চাইলেন। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। আমেরিকায় থাকলে হলে স্থানীয় জীবনযাত্রার স্বাদ অবহেলা করা উচিত নয়। দ্বিতীয় প্রজন্মকে কোর্মা কালিয়া শাক চচ্চড়ি খাওয়ানোর জন্যে চাপাচাপি করাও অন্যায়। আবার একেবারে সাহেব-মেমসাহেব বানানোও চলবে না। অতএব ওঁর বিকল্প ক্লাসে আমরা অনায়াসে শিখতে পারি এমন সব রান্না, যা নাকি সব উদ্দেশ্যই সাধন করে ছাড়বে।

আমরা গুপ্ত বৈঠকে বসে ঠিক করলাম আর যাই শিখি, ওই "হাঁসজারু" মার্কা রান্না কিছুতেই শিখব না। হয় মাখন, লেবুর রস, রসুন কুচি দিয়ে বেক করা ফ্লাউন্ডার মাছের সাহেবি ফিলে খাব, নয়তো ছাঁকা তেলে রুই মাছ ভেজে ঝোল করে খাব। এনিয়ে সবচেয়ে আন্দোলন করেছিল সুমনা। কারণ ওর ছাত্রী অবস্থায় কিছুদিন টানাটানির চাপে গৌরীদির বাড়ির সুখাদ্য খেতে হয়েছিল। 'ঘণ্ট' খাবার লোভে একবার বড় বড় বাঁধাকপির টুকরো আর কাঁচা মাছের মুড়ো মেশানো ও ভেনে রেক করে 'মুড়িঘণ্ট' খেতে গিয়ে নাকি ওর প্রাণান্ত হয়েছিল। দীপংকরও ভীষণ আপত্তি জানাল। 'মাছের কচুরির' নাম করে ওকে আটার লুচির ফাঁকে ফোকরে টিনের টুনা ফিশ পুরে চালিয়েছিলেন গৌরীদি। সেই থেকে কচুরি শুনলে আঁতকে ওঠে। গুপ্ত মিটিঙে ঠিক হল গৌরীদিকে সরাসরি আঘাত দেওয়া যাবে না। উনি ক্লাস শুরু করতে পারেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অন্তত ১৫ জন না পাওয়া গেলে আমাদের কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করার খরচ উঠবে না। সুতরাং একটা চিঠি ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক কী রকম সাড়া জাগানো যায়।

চিঠিতে লেখা হল—গৌরী দাশগুপ্তের বিকল্প পদ্ধতিতে ভারতীয় রান্নার ক্লাস শুরু হচ্ছে। উৎসাহীরা এই টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। ক্লাস পিছু তিন ডলার দক্ষিণা এবং রান্নার জিনিস আনতে হবে।

গৌরীদি মহা উৎসাহে হাতা খুন্তি নিয়ে বসে আছেন। কবে সেই শুভক্ষণ আসে। আমরা

তো ধরেই নিয়েছি বিশেষ সাড়া-পাওয়া যাবে না। কিন্তু গৌরীদির প্রেরণায় শেষ পর্যন্ত জনাদশেক নববধূ কোর্স নিতে রাজি হয়ে গেল। পনেরো জন না হলে পড়তা পোষায় না। শেষে কিছুটা আড্ডার লোভে, কিছুটা ভদ্রতার খাতিরে আমরা আরও কজন জুটে গেলাম সেই অভিনব রন্ধন পদ্ধতির ক্লাসে।

কমিউনিটি সেন্টারে ছোট্ট রান্নাঘর ছিল। পাশের ঘরের বড় টেবিলে গৌরীদি ডেমনস্ট্রেশন দিতেন। আমরা টুকে নিতাম প্রথমে থিয়োরির অংশ। তারপর প্র্যাকটিক্যাল পর্ব শিখতে ছোট রান্নাঘরে গিয়ে ঠেলাঠেলি আর হাসাহাসি।

গৌরীদি খাদ্যগুণ বিষয়ে খুব সচেতন থাকায় তেল, ঝাল, মশলার পর্ব বিশেষ থাকত না বটে। কিন্তু 'মধু ইলিশ' বা 'দই ঢেঁড়স' এসব অভিনব রান্নার সময় দুশ্চিন্তা হত ওগুলো খাবে কে কে? ইলিশ মাছ দিব্যি পাই আমরা এদেশে। 'শ্যাড্' নাম তার। হাডসন নদী আর অ্যাটল্যান্টিকের মোহনায় মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ডিম পাড়তে আসে। ঝক্‌ঝকে রুপোলি চেহারা। স্বাদে গন্ধে ইলিশের সঙ্গে কোনও তফাত পাই না। গৌরীদি কড মাছের টুকরো দিয়ে কী একটা ঝোল শেখাবেন শুনেই সুমনা প্রচণ্ড নার্ভাস। ওটা আগে একবার খেয়েছিল। মারাত্মক আঁশটে গন্ধ নাকি। আমরা গৌরীদিকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ইলিশের রেসিপি শেখাতে রাজি করালাম। তারপর শুনি 'মধু ইলিশ' শিখতে হবে এবং চেখে দেখতে হবে ওখানেই।

সে-কী ডেমনস্ট্রেশন। লিখে লিখে কুল পাই না। প্রথমে ইলিশের টুকরোর গায়ে গাদা হলুদ মাখাও। তারপর এক শিশি মধু ঢেলে দাও। ওপরে সামান্য কটি কালো জিরে। তারপর ওভেনে বেক করতে দাও। তারপরেও রক্ষে নেই। আবার সেই মধুমাখা ইলিশের ওপর দু'চামচে কনডেনসেড মিল্ক ছড়াও।

সে যাত্রা সুমনা জ্বরের ভান করে সদ্য রান্না করা সেই 'মধু ইলিশ' ছুঁল না। আমরা জীবনে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম আপরুচি খানার যথার্থ ব্যঞ্জনা।

সেই মারাত্মক রান্নার ক্লাসে নববধূরা ঘন ঘন কামাই করতে লাগল। বরেরা স্যাম্পল খেয়ে অসম্ভব প্রতিবাদ করেছিল সম্ভবত। আমরা আহত গৌরীদিকে বোঝালাম কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করে আর এভাবে পরের উপকার করার কোনও মানে হয় না। আজকালকার মেয়েদের রান্না শেখার কোনও আগ্রহ নেই। অথচ আমরা এদেশে এসে এয়ার লেটার খরচ করে করে দেশ থেকে কতবার ধোঁকার ডালনা, নয়তো মাংসের বিরিয়ানির রেসিপি আনাতাম। কত সংসারমুখী মন ছিল আমাদের ইত্যাদি ইত্যাদি...। গৌরীদি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হাঁড়ি, ডেকচি নিয়ে ফিরে গেলেন।

কিছুকাল বাদে গৌরীদি নতুন পথ নিলেন। আমাদের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এতকাল মুখে বলে এসেছেন। বক্তব্য অবশ্য যুক্তিপূর্ণ ছিল। আট ডলার করে দাম দিয়ে এক পাউন্ড ওজনের চালানি পটল কিনছে বাঙালি। মুরগির চেয়ে বেশি দাম দিয়ে গুজরাতি দোকানে লাউ কিনছে। গাদা গুচ্ছের করলা, সরু সরু সজনে ডাঁটা, শুঁটকো চালানি বরবটি, ঝাল বিষ কাঁচা লংকা, ঝুঁটি ধরে ধনে পাতা। অতি বৃহৎ লাল মূলা। লম্বা লম্বা ঝিঙে কিনছে আর মোটা মোটা ডলারের চেক লিখছে। এসব খাওয়ার জন্যে আমেরিকায় আসার দরকার

ছিল? ঝিঙে পোস্ত আর কড়াইয়ের ডাল দেশে বসে খাওয়া যেত না! তাও যদি এই দুই পদ রেঁধে নিস্তার পাওয়া যেত! ছেলে-মেয়েরা খাচ্ছে বড়ি দিয়ে লাউয়ের ঘণ্ট? নাকি করলা ভাজা দিয়ে ভাত মাখছে তারা? তবু কেন এইসব নতুন আবিষ্কার শিখছি না আমরা? অনবরত উইক এন্ডে নেমন্তন্ন করো, নয়তো চর্ব চোষ্য খেতে চলো। সেই এক ট্রাডিশন কুড়ি বছর ধরে চলছে। সময়ের অপচয়, জীবনী শক্তির অপচয়, লাভের মধ্যে হাই কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেশার, নয়তো আলসার, অম্বল কত কী!

গৌরীদি শেষ পর্যন্ত আমাদের মঙ্গলের জন্যে একটি রান্নার বই লিখেছেন। এমনিতে স্কুলে লাইব্রেরিয়ান। আমেরিকানদের সঙ্গে চিরকালই বেশ বন্ধুত্ব ওঁদের। তাঁদেরই মধ্যে 'পাবলিশার' পেয়ে গেছেন। স্বাস্থ্যকর ভারতীয় খাদ্য এবং রন্ধনপ্রণালী নামে বাজারে ছেড়েছেন। নেভি ব্লু রঙের চকচকে মলাটের ওপর সোনার জলে নাম লেখা বই। দাম করেছেন ছ'ডলার। ভারতীয় মশলার দোকানে বিক্রির জন্যে রাখা আছে দেখলাম। আমাদের অবশ্য কেনার জন্যে অতদূর যেতে হয়নি। নেমন্তন্ন বাড়িতেই ছ'ডলার দিয়ে গছিয়ে দিয়েছেন অনেককে। দেবার আগে চট করে লেখিকার মতো সই টইও মেরে দিচ্ছেন। ইংরেজি ভাষায় সহজ করে লেখা বাঙালি পাক প্রণালী। কিন্তু আমার সীমিত জ্ঞানের জন্যে বহু রান্নাই আমি চিনতে পারিনি। সূচিপত্রে দেখলাম বেসনের বদলে কর্ন ফ্লাওয়ারের গোলায় বেগুনি ভেজে তার ঝোল টাইপের রান্না। আগে কখনও খাইনি। তারপর দেখলাম ক্যাবেজ ফিশ ঘ্যানটো। পড়ে দেখি সেই সুমনার ভাষায় কাটা বাঁধাকপি আর কাঁচা মুড়োর কাহিনী। ঠিক দেখি হানি হিলসাও ঢুকেছে। তারপরও কত পদ! পদাবলী যাকে বলে। শাক্ত পদাবলীই বেশি। মাংসের পদের সঙ্গে হয় মধু, নয় কনডেনসড মিল্ক থাকছেই। শুকনো নারকোল পাউডারের তো ছড়াছড়ি। হঠাৎ হঠাৎ পিলে চমকানো সব নাম। বানান করে পড়ে দেখি—'লর্ড শিবা অ্যান্ড স্যামন'। মহাদেবের সঙ্গে সার্পেন্টি টার্পেন্টি লিখলে যদি বা মানাতো। স্যামন্ মাছ কী ভাবে ভিড়ে যদি বা মানাত। স্যামন্ মাছ কী ভাবে ভিড়ে গেল বুঝে পাই না। আবার একটা পদের নাম 'টুনাফিশ অ্যান্ড গাউরি'। মহা সমস্যা তো! লাগাতার নিজের নামের সঙ্গে মাছের পদ জুড়েছেন। টুনার আবার একদিকে টমেটো সস ঢালতে হবে। অন্যদিকে মেপল সিরাপ। ফোন না করে পারলাম না। গৌরীদি যেন একটু বিদ্রূপ করেই বললেন—সে কী? এত কালের রাঁধুনি তোমরা, আর আমাদের দেশের বিখ্যাত রান্না 'কই মাছের হরগৌরী' শোনোনি? খাওনি কখনও?

আবছা মনে পড়ল বটে ওরকম একটা টক ঝাল পদ আছে বোধহয়। কিন্তু তাই বলে বানিয়ে বানিয়ে মহাদেবের সঙ্গে স্যামন আর মা দুগ্গার সঙ্গে বিলিতি টুনাফিশের নাম জড়িয়ে রেসিপি লেখা? আরও সব নাম ধামের মধ্যে চোখে পড়ল—'কলি ফ্লাওয়ার অ্যান্ড রাজশাহি ছেঁচকি।' আচ্ছা—রাজশাহি শুনলে কেমন বনেদি বনেদি মনে হয় না? তারা খাবে ছেঁচকি? আবার নতুন কায়দায় লেখা হয়েছে—'ক্যাবেজ ক্যাল্‌কাটা'। কেন? কলকাতার বাঙালিরা কি বাঁধাকপিকে নাগরিক খাদ্য বানিয়েছে নাকি? এরকমই সব উদ্ভট নাম লেখা—'বেলেঘাটাস বেলে কোপ্তা'ও ঢুকিয়েছেন। এখানে হোয়াইটিং নামে যে মাছ বাজারে পাই তাকে আমার মা এসে 'বেলে মাছের' মাসতুত ভাই বলে আবিষ্কার করেছিলেন

বটে! তা সেই জন্যে গৌরীদি হোয়াইটিং সেদ্ধ করে গুলি বানিয়ে 'বেলেঘাটাস বেলে কোপ্তা'-র মহিমা প্রচার করেছেন দেখছি। পাতার পর পাতা আবার রান্নার ছবি আঁকা। শুধু 'চাঁদিপুরিয়া চাঁদা কালিয়া' দেখে আমি অসম্ভব বিরক্ত হলাম। বাঙালি রান্নার বইতে চাঁদিপুর? সেটা ওড়িশায় না? গৌরীদির ভূগোলের জ্ঞানও গেছে! আর চাঁদা মতো দেখতে বাটার ফিশ নামে যে মাছ এখানে পাওয়া যায়, তাই দিয়ে কালিয়া? যাক, চাঁদা তবু মধুর প্রগাঢ় মাখামাখি থেকে বেঁচেছে।

গৌরীদির জবরদস্তি গছানোর প্রবণতা থেকে ওই বই অনেকেরই রান্নাঘরের ড্রয়ারে বন্দি হল বটে, কিন্তু আদৌ ব্যবহারের জন্যে মুক্তি পেল কি না সন্দেহ। কিন্তু তবু কোনও মহৎ উদ্দেশ্যই তো আর একেবারে মাঠে মারা যায় না।

অনুরাধা সবে মাত্র ওহায়ো থেকে এ অঞ্চলে এসেছে। গৌরীদি বই গছিয়েছেন কোনও পার্টিতে। সে ভাবল ছানার পোলাওয়ের এমন সহজ রেসিপি সে কোথাও পায়নি! মহা উৎসাহে 'চিজ সুইট পিলাও'-এর পাতা খুলে ময়দা, চিনি আর কী সব নিয়ে হুবহু এক্সপেরিমেন্ট করেছিল। সকলের বর তো আর মন্ত্রমুগ্ধ টাইপের স্বামী হয় না। তায় অনুরাধার বর সঞ্জয় আবার কলকাতার 'ময়রা' পাড়ার খাদ্যরসিক ছেলে। সে সেই ছানার পোলাও খেয়ে দেখার আগেই মারমার শুরু করল—ইয়ার্কি পায়া? আমাকে ছানার পোলাও বলে ময়দার বাচ্চা চালাবে? ট্যালটেলে রস জুড়ে পোড়া পোড়া ময়দার বাচ্চা ভেসে বেড়াচ্ছে। তারমধ্যে আবার আস্ত গোলমরিচের খেলা! আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—'ময়দার বাচ্চা' বস্তুটা কী? গমের বাচ্চা ময়দা হতে পারে, কিন্তু ময়দার বাচ্চা আবার কে? গৌরীদি এই তৃতীয় জন্ম পয়দা করলেন কোথা থেকে? শেষে অনুরাধাই বোঝাতে চেষ্টা করল ওই বইতে যেরকম বর্ণনা ছিল, সেই মতো মাখা ময়দার গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে মার্জারিনে ভেজে নিয়েছিল। তারপর চিনি ও গোলমরিচ ফোড়ন দেওয়া জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা যে দেখতে ঠিক চেনা চেনা ঠেকছিল না, নিজেও বুঝতে পারছিল। কিন্তু ওই যে, গৌরীদি লিখেছেন, তার মধ্যে পরে কয়েক গাছি ম্যাকারনি বা নুডলস ভেজে বেশ মাখো মাখো টাইপের করে মিশিয়ে দিলেই দারুণ বিকল্প ছানার পোলাও হয়ে যাবে! সঞ্জয় সেই অবধি যেতেই দিল না। তার আগেই তাণ্ডব নৃত্য—ইয়ার্কি পায়া? 'ময়রা' পার্টি কো ছানার পোলাও কা পিণ্ডি খিলায় গা?

ভেবেছিলাম এখানেই গৌরীগাথা শেষ করতে পারব। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা এই গেঁয়ো বাঙালির দল কোনও ভাবে তাঁর মেডইজি ফর্মুলার রান্না শিখতে পারলাম না, সেই অক্ষমতার কথা স্বীকার করে ছুটি নেব। কিন্তু ইতির পরেও আবার পুনশ্চ এসে হাজির। লং আইল্যান্ডে থাকে আমার এক জ্ঞাতি বোন, কৃষ্ণা। তার রান্নাঘরেও গৌরীদির বই শোভা পেয়েছে জানতাম না। সে পড়াশোনা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। পি. এইচ. ডি. করার চাপে বিশেষ সামাজিকতা করার সময় পায় না। তাও থিসিস সাবমিট করার পর আমাদের এক রবিবারে নেমন্তন্ন করেছিল। সব ঠিক ঠাক ঠুকে রেখেছি ক্যালেন্ডারে।

যে রবিবারে যাবার কথা, তার আগের রাতে হন্তদন্ত হয়ে কৃষ্ণার ফোন। আমি তো

রিসিভার হাতে নিয়ে ভয়েই মরছি। জানি না ওদের কী বিপদ ঘটে গেল! কৃষ্ণা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে যাচ্ছে—সারা বাড়ি ধোঁয়ায় ভরে গেছে...ফায়ার অ্যালার্ম বাজছে রান্নাঘরে...উঃ বাবা ঃ ধম করে বোমা ফাটার আওয়াজ হল জানো?

অনেক কষ্টে আসল ঘটনা উদ্ধার করা গেল। গৌরীদির বই দেখে 'ভাবনগর অ্যান্ড ভাপা দহি' বানাতে বসেছিল কৃষ্ণা। কোথায় বাংলার রেসিপি বই আর কোথায় গুজরাতের ভাবনগর। যাক গে, হয়তো গুজরাতিদের কাছে বইয়ের কাটতি হবে ভেবে ওই নামটা লাগিয়েছেন। ভূগোলে এত দুর্বল হওয়া কখনও সম্ভব? কিন্তু হোক না গুজরাতের দই। তাবলে বাড়িতে ধোঁয়ার আড়ত হবে? গুজরাতিরা এত ধোঁয়াটে স্বভাবের মানুষই নয়। কৃষ্ণা বলল, বই দেখে সব কিনেছিলাম জানো? পাইরেক্সের আভন প্রুফ বাটিতে কনডেনসড মিল্ক, আইসক্রিম, টক দই, কিসমিস—কী দিইনি? সব গুলিয়ে ফ্রিজে রাখলাম অনেকক্ষণ। তারপর যা লেখা আছে। আভন ৫০০° ফারেনহাইটে চালিয়ে দিয়ে বাটিটা ঢুকিয়ে দিয়ে চান করতে চলে গেলাম। কারণ ৪/৫ ঘণ্টা লাগবে দই বসতে। ওমা, হঠাৎ বোমা ফাটার আওয়াজ। হই হই করে আভন থেকে ধোঁয়া বেরছে। পাইরেক্সের বাটি ফেটে এত টুকরো হয়েছে যে ভেতরে সব কাচের গুঁড়ো ছড়ানো।

ওর উত্তেজনার মাঝে দম নিতে যেটুকু সময় নিয়েছিল তারই ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আর তোর দইগুলো কোথায় গেল?

আরে দই আবার কোথায় যাবে? সব স্টিম হয়ে উড়ে গেছে অত হিট পেয়েই! সারা আভনের ভেতরে র‍্যাকের গায়ে পোড়া পোড়া লেই লেই কী সব সুতোর মতো ঝুলছে।

ময়দার বাচ্চা হয়েছে। দইয়ের সুতো ঝুলছে। ভাবনগরের ভাপা দই বাষ্প হয়ে উবে গেছে। কৃষ্ণা তবু বেশি হামলা করেনি। আমেরিকান রাঁধুনি হলে তো ধোঁয়া এবং আতঙ্কের কারণে গৌরীদিকে মামলা করার ভয় দেখাতে পারত। কিন্তু গৌরীদি কি এতটাই আনাড়ি হবেন? সন্দেহ হতে আমার নিজের কপিখানা খুলে দেখলাম। হ্যাঁ, কৃষ্ণারও অজ্ঞানতা কম নেই। সব কিছু গুলে ফ্রিজে রাখার কথা আছে বটে। সে সময় বাঁচানোর জন্যে। যদি কেউ আগে আগে কাজ এগিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু একথা কোথাও লেখা নেই যে সরাসরি ফ্রিজ থেকে পাইরেক্সের বাটি ৫০০° ফারেন হাইটের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। কৃষ্ণা তাই করেছে এবং অনিবার্যভাবে 'বোম ফেটেছে।' তাছাড়া গৌরীদি ৩০০° ফারেন হাইটের কথা বলেছেন। কৃষ্ণা সর্দারি করে সময় বাঁচাতে গিয়ে আভনের তাপমাত্রা একেবারে ৫০০° তে নিয়ে গেছে। থিসিসের ভাবনায় ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়ে গেছে আর কি! আইনস্টাইন হতে না পারি, আত্মভোলা হতে ক্ষতি কি? ভারী মানায় ওটা বিদূষীদের। কৃষ্ণা এরপর 'কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ার' রেসিপিটা না বাছলেই আমরা বেঁছে যাই।

৪ জানুয়ারি ১৯৯২

হাটে বাজারে

আমেরিকার যে কোনও বড় শহরে অন্তত চার পাঁচটি সুপার মার্কেট পাওয়া যাবে। আমাদের শহরে এখন লোকসংখ্যা প্রায় ৫২ হাজার। সুপার মার্কেট আছে মোট ছটি। মোটামুটিভাবে সব বাজারেই সব কিছু মজুদ থাকে। তবে দোকানে দোকানে বিশেষ স্টক বলে একটা ব্যাপার আছে। যেমন 'কিংগ্‌স্‌ সুপার মার্কেটে' ইউরোপিয়ান আমদানির ছড়াছড়ি। টিনে ভরা ফিনল্যান্ডের মাছ, ডেনমার্কের হ্যাম, ভূমধ্যসাগরের ক্যাভিয়ার, সুইটজারল্যান্ডের চিজ, জার্মানির চকোলেট, হল্যান্ডের বিস্কুট, ইংল্যান্ডের চা, জ্যাম, জেলি-টেলি নিয়ে 'বিলিতি' প্রোডাক্টের অফুরন্ত সমাবেশ। একটু বড়লোকের বাজার। দিশি জিনিসের দামও অন্য ৫টি সুপার বাজারের তুলনায় বেশি। 'কিংগ্‌স্‌ সুপার মার্কেটের' রান্নাঘরে তৈরি নিত্যনতুন ভাল ভাল রান্না লাঞ্চ, ডিনারের জন্য কিনে আনা যায়। যেহেতু আমদানিতে বিলিতি গন্ধ আছে, সেহেতু ফ্রোজেন সেকশনে ছোট ছোট বাক্সে 'সাসোমা' আর 'চিকেন কোর্মা'-ও পড়ে থাকে। লন্ডনের কোনও পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীর রপ্তানি। কিনে এনে তেমন সুখাদ্য মনে হয়নি। যাই হোক, যাঁরা রান্না করার সময় পান না কিংবা উৎসাহ পান না, তাঁদের জন্যে 'কিংগস' নিজেদের কিচেনের রাজকীয় খাদ্য ছাড়াও দেখি, বিদেশি সবরকম খাবার মজুদ রাখেন।

ওষুধের স্টক সবচেয়ে বেশি থাকে 'প্যাথমার্ক' সুপারমার্কেটে। বাঙালিরা এ বাজারের নাম দিয়েছে পথনির্দেশ। ইস্ট কোস্টের এই অঞ্চলে প্রতি শহরে শহরে প্যাথমার্ক। বিশাল বাজার। দামও অন্যান্য বাজারের তুলনায় কম। সঙ্গে ড্রাগ স্টোর। নিজেদের কোম্পানির তৈরি জেনেরিক ড্রাগ সস্তায় বিক্রি করে। সুপার বাজারটি খুব জনপ্রিয়। নার্সারি সেকশনে রাজ্যের গাছপালা বিক্রি হচ্ছে। 'হেলথ ফুড সেকশনে' যাবতীয় স্বাস্থ্যকর খাদ্য। রোগীদের বিশেষ ধরনের খাবার আলাদা সেকশনে পাওয়া যায়।

'এ অ্যান্ড পি' (আদিতে নাম ছিল অ্যাটলান্টিক অ্যান্ড প্যাসিফিক টি কোম্পানি) সুপার মার্কেট সারা আমেরিকার শহরে শহরে। বহুকালের প্রতিষ্ঠিত বাজার। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে—মাংস, ফল আর তরিতরকারির বৈচিত্র্য। দেশি-বিদেশি উৎপাদন নিয়মিত রাখা থাকে। সারা বছর ওরিয়েন্টাল সেকশনে ট্রেতে সাজানো 'বিটারমেলোন্‌' (করলা) 'স্নেক-স্কোয়াশ' (কচি সবুজ লাউ), আর 'মুংগ বিনস্‌ স্প্রাউট' (অঙ্কুর গুদ্ধ ভেজা কাঁচা মুগের ডাল) দেখতে পাই। কুমড়োর যে এত ভ্যারাইটি আছে, কে জানত? বাটার নাট স্কোয়াশ, মাপকিন, স্প্যাগেটি স্কোয়াশ, একরন স্কোয়াশ—নামের আর রঙের বাহার নিয়ে তাক জুড়ে থাকে। কত রকম গড়ন। ঘন হলুদ, কমলা গেরুয়া রং, গায়ে ডুমকি ডুমকি দেওয়া, ঘন সবুজের ডোরা দেওয়া, কোনওটা গোল, কোনওটা লম্বা, টেনিস বলের সাইজ, ফুটবলের সাইজ, ছোট গদার সাইজ—কুমড়োর সেকশনে শুধু পর্যবেক্ষণেই মুগ্ধ হয়ে যাই। আমেরিকানরা তরকারি সেদ্ধর মধ্যে কুমড়ো চালায়। কুমড়োর মিষ্টি 'পাই' বানিয়ে খায়। 'এ অ্যান্ড পি'-র বাজারে আম, পেঁপে সারা বছর আসে। সাউথ আমেরিকার একটি আঁশযুক্ত

মামুলি আমের দাম পড়ে এক ডলার, সত্তর সেন্ট। দেশের হিসেবে পঞ্চাশ টাকার বেশি। আমাদের এখানকার হিসেবে এক ডলারের ক্রয় ক্ষমতা কিন্তু দেশের এক টাকার মতো মোটেই না। তার চেয়ে বেশি। ওই এক ডলার সত্তর সেন্ট দিলে ছোট একটা মুরগি পাওয়া যায়। সেই হিসেবে বিদেশি ফল বলে আমের ওই দাম। একটি ছোট আধ পাকা পেঁপের দাম তিন ডলার। ওই দামে ছ'খানা আপেল হয়ে যায়। তবু নস্ট্যালজিয়ার রোগী বাঙালি আপেল ছাড়িয়া একটি 'পাপাইয়া' খায়। হাওয়াইয়ান সেকশনে কলা, আনারস, নারকোলের গাদাগাদি। কলার দর পঞ্চাশ কি ষাট সেন্ট করে পাউন্ড। সামান্য ওঠে, পড়ে। নারকোল মনে হয় 'এভলিউশনে' মুভ করেনি। একটি এখনও সেই ঊনপঞ্চাশ সেন্ট। কাটতিও বিশেষ নেই।

'শপ রাইট' সুপার মার্কেট টাটকা মাছ আনে প্রচুর। অন্যান্য সুপার মার্কেটের তুলনায় এদের মাছের সেকশন অনেক বড়। সব রকম মাছের সঙ্গে মাঝে মাঝেই পাকা রুই (বাফেলো কার্প) আর ইলিশ (শ্যাড) শরীর এলিয়ে দিয়েছে দেখতে পাই। শিলিং-এর দিকে তাকিয়ে চক্ষু স্থির। এ জন্যে 'শপ রাইটে' বাঙালি, সুইশ আর ওরিয়েন্টাল জনতার ভিড় বেশি। মাছই তাদের টোপ।

'গ্র্যান্ড ইউনিয়ন' নামে বাজারটা কেন জানি না তেমন চলে না। যে পাড়ার ধারেকাছে কোনও শপিং সেন্টার নেই, সেখানে দুম করে একটি 'গ্র্যান্ড ইউনিয়ন' বসে আছে। লোকে বাধ্য হয়ে যায়। একমাত্র মাংসের ভ্যারাইটি ছাড়া বাদবাকি সবই গতানুগতিক। দাম কিছু কম নয়। আমাদের শহরের ষষ্ঠতম বাজার হল দু'নম্বর 'এ অ্যান্ড পি'। দুই এলাকায় দুটি বাজার। প্রশ্ন হল, ৫২ হাজার লোকের জন্যে ছটি সুপার বাজার যথেষ্ট কিনা। আমার মনে হয় আরও একটি দুটি বেশি থাকলেও ক্ষতি ছিল না। তাহলে বেশি প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে মার্কেটগুলো ক্রেতাদের আরও কিছু বাড়তি সুবিধে দিত। ডিসকাউন্ট কুপনের বদলে জিনিসের দামে ছাড় দেওয়া, সপ্তাহে সপ্তাহে বিশেষ সেল—এসব তো বহুকালই চলে আসছে। এখন আবার আরও নতুন নতুন উপায়ে খদ্দের টানা চলছে। 'প্যাথমার্কের' সঙ্গে 'এ অ্যান্ড পি'-কে সমানে পাল্লা টানতে হয়। এক তো নিজেদের ওষুধের ব্যবসা নেই, দোকানের মধ্যে মস্ত নার্সারি খোলারও জায়গা নেই ; শুধু কুমড়োর একজিবিশন দিয়ে কি আর সবাইকে ধরে আনা যায়? সে হিসেবে উইক পয়েন্ট নেই বলা যায় না। দোকানের মধ্যে গরম গরম ফ্রায়েড চিকেন ভেজে গন্ধ দিয়ে ভোলানোর চেষ্টাও তেমন ফলপ্রসূ হয়েছে বলে বুঝতে পারি না। সম্ভবত মরিয়া হয়ে 'এ অ্যান্ড পি' শহরের চেম্বার্স অফ কমার্সের কাছে আবেদন নিবেদন করেছিল। এখন ওই শপিং সেন্টারে এক প্রাইভেট ওষুধের দোকান হয়েছে। খাওয়া আর রোগ—এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বাঁধনে মানুষ বাঁধা পড়ে থাকে, যে সুপার বাজারের পাশে ড্রাগ স্টোর থাকলে সে এক ঢিলে দু'পাখি মারবেই। আপাতত 'এ অ্যান্ড পি'-তে খদ্দেরের ভিড় বেড়েছে। এরপর আবার তাদের নতুন টোপ—'বোনাস সেভিংস ক্লাবে' ধরে ধরে মেম্বার করছে। এমনিতে আমেরিকার বেশিরভাগ সুপার মার্কেট কোম্পানির নিজেদের ক্লাব কার্ড থাকে। তবে তাই দেখিয়ে পেমেন্ট বাকি রাখা যায় না। সুবিধের মধ্যে, চেক দিয়ে বাজার করা যায় আর চেক ভাঙিয়ে

ওই সুপার মার্কেট থেকে ক্যাশ ডলারও তোলা যায়। সময় অসময়ে ঝট করে ডলার তোলার বন্দোবস্ত। ইদানীং অবশ্য ক্রেডিট কার্ডে সাপ্তাহিক বাজার করার সুবিধেও দিয়েছে। সেও আমেরিকান এক্সপ্রেস বা ভিসা গোল্ড কার্ড ইত্যাদি বড় বড় ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে ধারে বাজার করা। মাসের শেষে কার্ড-কোম্পানির বিল অনুযায়ী দেনা শোধ। কিন্তু 'এ অ্যান্ড পি' সম্প্রতি 'প্যাথ-মার্ক'-কে জনপ্রিয়তায় ছাপিয়ে যাবার চেষ্টায় যে বোনাস সেভিংস ক্লাব খুলেছে, তাতে করে খদ্দেররা রীতিমত খুশি হয়ে পড়ছে। আমি ঘুরেফিরে দুটো তিনটে সুপার মার্কেটে বাজার করি। মাস তিনেক আগে থেকে লক্ষ করছিলাম 'এ অ্যান্ড পি'-র কাউন্টারে সেলস পার্সনদের ভারী উচ্ছ্বসিত ভাব! আমি ওদের বোনাস সেভিংস ক্লাবের মেম্বার হয়েছি কিনা জানতে চাইত। হইনি জেনে খুব আশ্চর্য। 'আপনি জানেন না আপনি কী হারাইতেছেন'—বলে হাতে ফর্ম ধরিয়ে দিচ্ছিল। সে ফর্ম আর ফিল-আপ করা হয় না। বাজারের রসিদের সঙ্গে পার্কিং লটে এসে হাওয়ায় উড়ে যায়। শেষে এক মহিলার চাপাচাপিতে পড়ে বাজারের মধ্যেই ফর্ম ভরে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতে একটা পাতলা কার্ড এসে গেল। সপ্তাহখানেক বাদে ডাকে এল—সবুজে, হলুদে মেশানো চকচকে প্লাস্টিকের কার্ড। সেই থেকে আমার যে কী বরাত খুলেছে। আমরা হচ্ছি 'এ অ্যান্ড পি'-র বিশেষ ক্রেতা! এক তো ওদের দোকানের কুপনগুলো আর কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে নিয়ে যেতে হবে না। অবশ্য আগেও অত কুপন কাটাকাটির সময় পেতাম না। বাজার করতে করতে সেল-এর কাগজে কুপন দেখে হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে চালিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন সেই ব্যাঁকাত্যাড়া কাগজের টুকরোও আর গছানোর দরকার হচ্ছে না। আমি তো স্পেশ্যাল খদ্দের। শুধু বোনাস ক্লাবের কার্ডখানা ধরিয়ে দিচ্ছি। সেলস পার্সন একবার সেই জাদুকার্ড চেক-আউট মেশিনে বুলিয়ে নিচ্ছে। ব্যস। নিজে থেকে মেশিন পট পট করে আমার বিলে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিল। কুপন ছেঁড়াছেঁড়ির বিরক্তিতে আমি যে অর্ধেক সময় কুপনগুলো কাজেই লাগাতে পারতাম না, এখন আর সেই 'মহাক্ষতি' হচ্ছে না। সপ্তাহে আশি ডলারের বাজার করলে, কুপনের ডিসকাউন্ট বাদ দিলে অন্তত সাত আট ডলার বেঁচে যাচ্ছে। এ তো গেল পয়লা নম্বর সুবিধে। এরপর দু'নম্বর হল যে সব জিনিসে ওই সপ্তাহে সেল নেই, আমি আবার তারও কোনও কোনওটার বিশেষ সেল পাচ্ছি। যেমন 'কোডাকের' ফিল্ম আমি কিনলাম্ আট ডলার দিয়ে। আর যার বোনাস কার্ড নেই, তাকে কিনতে হল দশ ডলার দিয়ে। এই যে বাড়তি খাতির, সে জন্যে আমি অবশ্য বেহিসেবি বাজার করে ফেলছি, এতেও কোনও সন্দেহ নেই। এক ডলার ৩৫ সেন্ট করে এক পাউন্ড মাখন পাওয়া যায়। আর "এ অ্যান্ড পি" সমানে আমাকে 'খাতিরের রেটে' ঊনআশি সেন্টে এক পাউন্ড মাখন গছিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, ডজন ডজন ডিম গজাচ্ছে। ৫০ সেন্ট ডজন দরে। এমনিতে পড়ত এক ডলার, দশ সেন্ট করে ডজন। খাতির পেয়ে পেয়ে আমি লাগাতার মাখন আর ডিম কিনে কিনে ফ্রিজ ভরাচ্ছি। অথচ এ বাড়ির রান্নাঘরের দেওয়ালে ফ্যাট আর কোলেস্টেরলের বিরুদ্ধে বিনে পয়সায় পাওয়া পুস্তিকা ঝুলছে! মনে হয় উদ্বৃত্ত ডিম আর মাখন নিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালাতে হবে। একই অবস্থা হয়েছে কফি নিয়ে। প্রত্যেক সপ্তাহে দামি দামি কফি—বিনের প্যাকেটের তলায় দুলিয়ে দিচ্ছে 'খাতিরের রেট'। চার

ডলারের কফি নাকি আমরা পাব মাত্র এক ডলারে। ১৩ আউন্স ওজনের সেই বিনের প্রলোভন ছাড়া যায় না। চেক-আউট কাউন্টারে মেয়েটাকে যখন এনে দিই, সে নিমেষের মধ্যে পাশের কফি-মেশিনে হুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে দেয়। ফের যখন ঠোঙায় ভরে সিল করতে থাকে, রোস্ট করা কফির অপূর্ব গন্ধে আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হয়। লেক মার্কেটের মাদ্রাজি অধ্যুষিত পাড়ায় বড় হয়েছি। ভাজা কফি গুঁড়ো করার গন্ধে আমেরিকার সুপার মার্কেটে দাঁড়িয়ে আমি 'কমলা ভিলাসের' গন্ধ পাই...।

এই 'বোনাস সেভিংস ক্লাব' গড়ে 'এ অ্যান্ড পি' ক্রমশ আমাদের ভাঁড়ার ঘরগুলোকেই 'সুপার মার্কেট' করে ছাড়ছে। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাচ্ছে কিনা কে জানে? সেল করার কায়দা কত! একদিন বাড়িতে ফ্লায়ার এল। দশ পাউন্ড আলু পাব মাত্র ৫০ সেন্টে। বিশেষ সদস্য হিসেবে অত আলু ছাড়া উচিত নয়। বাজার করতে গিয়ে দেখলাম শুধু পাঁচ পাউন্ডের ব্যাগ সাজানো রয়েছে। তরকারির ডিপার্টমেন্ট বেশ লজ্জিত। বলল—"দশ পাউন্ডের ব্যাগ আর নেই। তুমি এক কাজ করো। কার্টেসি কাউন্টার থেকে রেইন চেক নিয়ে নাও। পরের সপ্তাহে যখন বাজার করতে আসবে, তখন আলুর বস্তার সেল না থাকলেও তুমি সেল পাবে। শুধু ওই রেইন চেকটা এনো'। এখানে 'রেইন' কথাটার ব্যবহার হয় দিন বদলের ব্যাপারে। রেইন ডেট মানে হল যে কোনও বাইরের অনুষ্ঠানের জন্যে দুটি তারিখ ঘোষণা করা হয়। যদি বৃষ্টির জন্য প্রথম তারিখটা বাতিল হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় তারিখটাতে হবে। এই থেকেই দোকানে বাজারে রেইন চেক কথাটা এসেছে। মানে, আগের সপ্তাহের ডিসকাউন্টের দামে কোনও জিনিস পরের সপ্তাহেও দেওয়া হবে, যদি ঠিক সময়ে তা সাপ্লাই না দেওয়া যায়। যাই হোক, আমি আর রেইন চেক নিতে গেলাম না। দশ পাউন্ড আলুর জন্য এত কিছু আকিঞ্চন বোধ করছিলাম না। পরের সপ্তাহে আবার বাজারে গিয়েছি। কেনাকাটা শেষ করে চেক-আউট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়িয়েছি। আলু সমাচার মনেও নেই। আমার আগে এক বুড়িমানুষ প্রথমেই বোনাস সেভিংস কার্ড বের করলেন। তারপর গত সপ্তাহে 'জোগাড় করা দশ পাউন্ড আইডাহো পোট্যাটোর রেইন-চেক। শপিং কার্ড দেখিয়ে বললেন—'অত ভারী বস্তা কাউন্টারে তুলতে হবে?' সেলসম্যান নিজেই বস্তা উঠিয়ে নিল। তারপর বোতাম টিপতেই বুড়ির আর্তনাদ—'ওকি! অত দাম নয়, অত দাম নয়। খালি পঞ্চাশ সেন্টে দেব আমরা।' ছেলেটা অবাক! তিন ডলারের কমে দশ পাউন্ড আলু হয় না। বুড়ি বলে কী? বুড়ি তো ভীষণ বকাবকি করছেন ততক্ষণে। শেষে ছেলেটা দোকানের কাগজ বের করে দেখল। আমারও দেখা দরকার ছিল। আমরা 'স্পেশ্যাল মেম্বার'রা অপমানিত হব নাকি? ইতিমধ্যেই বুড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়েছি। কিন্তু কাগজ দেখে ভুল ভাঙল। প্রত্যেকটি স্পেশ্যাল জিনিসের ছবি একভাবে ছেপেছে। একভাবে দাম লেখা। আর চালাকি করে আলুর খোপটার মধ্যে বিন্দু বিন্দু করে লেখা আছে 'সেভ' আর পাশে বড় বড় করে লেখা ৫০ সেন্ট। স্বাভাবিকভাবেই লোকের চোখে পড়ছে ওই ৫০ নম্বরটা। আমরা ভাবছি আহা! এবার কার্বোহাইড্রেটের ওপর জোর দেব। 'সেভ' কথাটা দেখতেই পাইনি। তাহলে দাম থেকে মোটে ৫০ সেন্ট বাদ যাবে? 'ধুত্তোর' বলে বুড়ি আলুর বস্তা ফেলে রেখে চলে গেলেন।

সম্প্রতি সারা আমেরিকাতেই সুপার বাজারগুলো ভীষণ প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে গেছে। ক্রেতাদের ধরে রাখার জন্যে নানা উপায় আবিষ্কার করা ছাড়া ব্যবসা চালানো কঠিন। 'ওয়্যার হাউস ক্লাব' নামে একটা নতুন ব্যবসা শুরু হয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে ফোন পাই, কুপন পাই। ফোনে অর্ডার দিলে সস্তায় কাঁচা বাজার থেকে সব জিনিস পৌঁছে দিয়ে যাবে। সরাসরি কারখানা থেকে ডেলিভারি দেবে বলে খরচ বাঁচবে। হয়তো অনেকে এভাবে সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক বাজার করছেন। যে জন্যে সুপার মার্কেটের ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া ডিসকাউন্ট ড্রাগ স্টোরগুলোর সঙ্গেও দামের প্রতিযোগিতায় সুপার মার্কেট পেরে উঠছে না। ডিসকাউন্ট ড্রাগ স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে ওষুধপত্র ছাড়াও, যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য, স্টেশনারি জিনিসপত্র, লজেন্স, চকলেট, বিস্কুট, মশলাপাতি, বাদাম, নোনতা স্ন্যাক্সের প্যাকেট, বাড়িঘর পরিষ্কার করার নানা সাবান, কাপড় কাচার সাবান, টিস্যু পেপার, কার্ড, গিফট বক্স, গিফট র‍্যাপ্, ফিল্ম, পোর্সিলিনের পুতুল, খেলনা ইত্যাদি কত জিনিস। ঘন ঘন সেল চলছে। ম্যাগাজিন সেকশনে প্রতিদিন সেল। ফলে ওখানে গেলেই অনেকের কিছু বাজার হয়ে যাচ্ছে। তারপর আছে এথনিক স্টোরগুলোর আকর্ষণ। এশিয়ান, স্প্যানিশ, গ্রিক বা জ্যামাইকানরা যায় নিজেদের জাতবিরাদরির দোকানে। আমি নিজেই তো আমেরিকান 'সুপার মার্কেট' থেকে চাল, ডাল, মশলাপাতি, বাদাম, কিসমিস, আটা, সুজি কেনা ছেড়ে দিয়েছি কোনকালে। ভারতীয় দোকানে কিনি। এভাবে ক্রমশ ক্রমশ এথনিক দলগুলো তাদের মাসিক অথবা সাপ্তাহিক বাজারের কিছু অংশ অন্যত্র করছে।

সম্প্রতি সুপার মার্কেটগুলো ভালভাবে টিকে থাকার জন্যে দাম কমানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। নিজেদের তৈরি প্রোডাক্টের দাম কমিয়ে দিতে সেলে সেগুলো বিক্রি করছে। তারপরই নেম ব্র্যান্ড কোম্পানিগুলো টের পেয়ে গিয়ে 'ডাবল ডিসকাউন্ট' কুপন পাঠাচ্ছে ক্রেতাদের বাড়িতে বাড়িতে। ফলে দুদিক থেকে লাভ হচ্ছে সাধারণ মানুষের। এ বছর কাঁচা মালের সরবরাহ এত বেশি হয়েছে যে তিনটি জিনিস বাজারে প্রায় জলের দরে পাওয়া যাচ্ছে। বেকন, কমলালেবু আর বাদাম থেকে তৈরি মাখন। এ দেশে এখন টার্কি, মাছ আর মুরগি প্রায় জাতীয় খাদ্য হয়ে উঠেছে। হ্যাম, বেকন, সসেজের বাজার পড়ে যাওয়াতে দাম রীতিমত কমে গেছে। সম্প্রতি একটি সার্ভের থেকে জানা যাচ্ছে—'৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকার সুপার মার্কেটগুলিতে একদিন মোট ৩৬টি নিত্যব্যবহার্য জিনিস কিনে দামের হিসেব রাখা হয়েছিল। এক বছর পরে ঠিক ওই জিনিসগুলি কিনে দেখা গেল একমাত্র ক্যালিফোর্নিয়া বাদে প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু কিছু দাম কমে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়াতে ওই একই বাজার করতে ০.৫% বেশি দাম দিতে হয়েছে। উত্তর পশ্চিমে ওরিগন, ওয়াশিংটন স্টেটে দাম কমেছে ০.৯%। আইডাহো, কলোরাডো অঞ্চলে দাম কমেছে ১.৮%। শিকাগো, মিশিগান অঞ্চলে ২.৪%। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, ম্যাসাচুসেটস্ অঞ্চলে ১.২%, ভার্জিনিয়া, ক্যারোলাইনা অঞ্চলে ১%, ফ্লোরিডা, অ্যালাবামা অঞ্চলে ১.৯% আর টেকসাস, লুইসিয়ানা অঞ্চলে ২.৫% দাম কমেছে। আমেরিকার ৬৪টি সুপার মার্কেটের চেইনস-এর মধ্যে মোট ৫৬টি ওই জিনিসগুলির বাজার দর কমিয়েছে। জিনিসগুলির মধ্যে আছে বেকন, ছোটদের ডিসপোজেবল ডায়াপারের

বাক্স, কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবান, মাখন, চিজ, বাসন ধোয়ার লিকুইড সাবান, টুনা ফিশের টিন, লিকুইড ব্লিচ, সিরিয়াল ও ফ্রোজেন স্ন্যাকস। অর্থাৎ মোট ৩৬টি জিনিসের মধ্যে ওপরের জিনিসগুলিরই দাম কমে যাওয়াতে এই হিসেব পাওয়া গেছে।

ওহায়োর সিনসিনাটি অঞ্চলের বাসিন্দারা বেশ লাভবান হয়েছেন। ওদিকে 'ক্রোগার' নামে সুপার মার্কেটের চেইনস স্টোরগুলো অনেক জিনিসের দাম নামিয়ে এনেছে। প্রায় পাঁচ হাজার রকম জিনিসের দাম বদলানো হয়েছে। কারণ ওহায়োর "বিগস ফুডস" আর 'মেইজার ইনকরপোরেট' নামে অন্য দুটো সুপার মার্কেট এমন সেল দিচ্ছিল যে ক্রেতারা আর ক্রোগারমুখো হচ্ছিল না। এখন দাম কমাতে আবার ভিড় হচ্ছে। ওদিকে ডেট্রয়েট, আরকানসও এলাকাতেও সুপার বাজারগুলোর মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সেখানেও গত এক বছরে বাজার দর পড়েছে। আমেরিকার দক্ষিণ পূর্ব অংশে, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, অ্যালাবামা, মিসিসিপি আর সাউথ ক্যারোলাইনার বাসিন্দারা এক বছর আগের তুলনায় সবচেয়ে কম খরচে ওই ৩৬ রকম জিনিসগুলি এ বছরে কিনতে পারছেন। এর মূলে আছে 'উইন ডিক্সি স্টোর' নামে সুপার মার্কেট চেইনস। এরা সপ্তাহে সপ্তাহে 'সেলের' বিজ্ঞাপন না দিয়ে সরাসরি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে সেই দামই আপাতত বজায় রাখছে। ওই অঞ্চলে এ কারণে অন্যান্য দোকানগুলোও বাধ্য হয়ে দাম সস্তা করে দিয়েছে। আমাদের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এসব সুপার মার্কেট নেই। গত বছরের এপ্রিল মাসে 'উইনি ডিবসি' তাদের এক হাজার, একশো ছেষট্টিটি দোকানে ৫০০০ এর বেশি তৈজসপত্রের দাম কমিয়ে দিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে অন্তত হাজার খানেক ওষুধ ও টয়লেটের জিনিস, শৌখিন প্রসাধনের জিনিসের দাম কমিয়েছে। আবার এ বছরের শুরুতে এরা এদের অ্যালাবামা আর জর্জিয়ার দোকানগুলোতে আরও ৫০০০টি জিনিসের দাম আরও কমিয়েছে। ক্রমশ নাকি অন্যান্য রাজ্যেও তাই করবে। তাদের ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের সন্তুষ্ট রাখা।

কিন্তু সব জায়গাতে তো আর এমন বিবেচক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে ক্রেতারাও তেমন সন্তুষ্ট হবার সুযোগ পাচ্ছেন না। লস এঞ্জেলেস, বালটিমোর-ওয়াশিংটন অঞ্চলে আর অ্যারিজোনা রাজ্যের ফিনিক্স শহরে হয় গত এক বছর ধরে জিনিসের দাম একই আছে, নয়তো বেড়ে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়াগোতে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে। একই পরিমাণ বাজার করতে আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের লোকেদের অন্তত দশ ডলার কম লাগে। ক্যালিফোর্নিয়ার নামকরা সুপার মার্কেট চেইনস হল 'ভনস'। তাদের বক্তব্য—দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে ব্যবসা চালানোর খরচ খুব বেশি। দোকান তৈরি, শপিং মল ভাড়া নেওয়া, ওয়্যার হাউস তৈরি করা, স্টোরেজ ইত্যাদির জন্যে ভীষণ খরচ করতে হয়। কর্মচারিদের মাইনে দিতে হয় বেশি। এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে কর্মরত শ্রমিকদের দুর্ঘটনা বা আকস্মিক অসুস্থতার জন্যে মোটা রকম ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। সে জন্যে 'ভনস' জিনিসপত্রের দাম সহজে কমাতে পারছে না। মার্কেটিং অ্যানালিস্টদের বক্তব্য—দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সুপার মার্কেট ব্যবসার অর্ধেকেরও বেশি অংশ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মাত্র তিনটি কি চারটি কোম্পানির দ্বারা। তারা নিজেদের এবং পরস্পরের স্বার্থে দাম কমাতে চায় না।

ক্রেতাদের আকর্ষণ করার চেয়ে নিজেদের লাভের দিকটি ঠিক রাখাই এদের মূল উদ্দেশ্য। আর বেশ কয়েকটি চেইনস স্টোর যদি এ নিয়ম মেনে চলে, তবে আর ক্রেতারা সস্তার জিনিস খুঁজতে যাবে কোথায়? তবে অন্যান্য সস্তার বাজারও তো আছে। ওই বড় বড় দোকানগুলোতে এখন ক্রেতার ভিড় কমে যাচ্ছে। গত মাসে 'লাকি স্টোরস' নামে একটি সুপার মার্কেট তাদের ক্যালিফোর্নিয়া আর লেভাডার কিছু দোকানে প্রায় আড়াই হাজার জিনিসের দাম কমানোর ব্যবস্থা করেছে। হয়তো এরপর 'ভনস' জাতীয় বড়বাজারগুলোকেও ক্রেতাদের কথা ভাবতে হবে।

সরকারি সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব অনুযায়ী আমেরিকায় গত এক বছরে খাবার জিনিসের দাম খুব সামান্য বেড়েছে। গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম হারে (মাত্র .৭%) বেড়েছে '৯২ সালে। সে তুলনায় অন্যান্য খরচ বেড়ে গেছে ২.৯% হারে। এ দেশে খাওয়ার খরচ সবথেকে সস্তা বলে এই প্রাথমিক চাহিদার অফুরন্ত সরবরাহ সম্পর্কে সাধারণ মানুষেরও কোনও চিন্তা নেই। পেটের চিন্তা বাদ দিয়ে অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। কোন সুপার মার্কেটে কী সে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, সারা মাসের বাজারহাট নিয়ে মহিলারাই যা একটু মাথা ঘামান। আমার নিজের মনে হয় একটু মাথা গুলিয়ে গেছে। 'বোনাস সেভিংস ক্লাবের' মহামান্য সদস্য হয়ে গ্যালন গ্যালন ভুট্টার তেল বয়ে আনছি। টয়লেট টিস্যুর রোল এমন পাঁজা করে নিয়ে এসেছি যে বংশপরম্পরায় ডাইরিয়া হলেও শেষ হবে না। বলদ ছাড়াই চিনির বস্তা বয়ে এনেছি বেশ কয়েক পাউন্ড। বাড়ির মধ্যে ঢোকানোর সাহস পাইনি। গ্যারাজের এক ধারে 'মিনি সমবায়িকা' বানিয়েছি। ছোট্ট কালো পিঁপড়ের দল বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পায় না। গ্যারাজে তাদের প্রসেশন লক্ষ করছি। লাভের চিনি একটু খেয়ে গেলে আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না। আর আমার জন্ম জন্মান্তরের জন্যে কফিও কেনা রইল।

১ মে ১৯৯৩

খাদ্য অখাদ্য

গরুর ঠোঁট ভাজা গরম গরম খেয়েছেন কোনওদিন? ধবলীর তুলতুলে জিভ ভাজা? ট্রাক চাপা পড়া কাঠবেড়ালির তেলগড়ানো ছেঁচকি? আপনার কী মনে হয় শুয়োরদের কচি কচি গোলাপি নাক ভাজা বেশি সুস্বাদু হবে, না লেড়িকুত্তার টিংটিঙে ল্যাজের মুচমুচে পকৌড়ি? সাহস করে সাপ, ব্যাঙ খেয়ে দেখেছেন কি? আমার বন্ধু, মল্লিকা 'ফ্রগস লেগস' পেলে আর কিছু চায় না। চায়নায় না গিয়েও তার ঘন ঘন দাদুরি পদলেহন। শুনেছি স্বাদে গন্ধে মুরগিকেও ল্যাং মেরে চালানি ব্যাঙেরা শত ঠ্যাং এগিয়ে গেছে। ব্যাঙকে জাতে তুলেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাপতি। পাতে তুলেছিল বোধহয় চীনেরাই প্রথম। আর এখন তো পৃথিবীর

'গদিপতি'দের কাছে ব্যাঙের কী অভূতপূর্ব খাতির! অনাস্বাদিতপূর্ব এই সব ক্ষুদ্র চতুস্পদের পদচর্বণ করবেন না আপনি? আরও যে কত মুখরোচক জীবজন্তু আছে! অজ্ঞানতার কারণে তাদের দেহ-মনের খবর পাচ্ছেন না। বঞ্চিত হতে না চান তো নিজের ধাত থেকে বিবমিষা আর ভয়ভয়ভাব একদম দূর করে দিন। অখাদ্য আবার কি? আপনার কাৎলার হাঁড়িমাথা মাদ্রাজিরা চিবিয়ে খাবে? আপনি তো নিজের ঘিলুর কোয়ালিটি আর কোয়ানটিটি বাড়ানোর জন্যে ছোটবেলা থেকে কাৎলার থলথলে ঘিলু আর ঢ্যাবলা চোখ জোড়া পেলেই খেয়ে নিচ্ছেন। জৈনদের বাড়িতে এক থালা সসেজ পাঠিয়ে দিয়ে দেখবেন নাকি, সেগুলো তাঁদের কাছে খাদ্য বলে বিবেচিত হয় কিনা? মুসলিম আর ইহুদিদের বাড়িতে একজনও 'বরাহ মিহির' খুঁজে পাবেন? আপনার সুখাদ্য তাঁদের কাছে অখাদ্য। হয়তো তাঁদের খাদ্য আপনার কাছে কুখাদ্য। নজির খুঁজতে বেশি দূর যাবার দরকার নেই। যাদবপুর থেকে ছালবাকলা সমেত এক বোঝা শুঁটকি মাছ প্রেজেন্ট করে দেখুন ভবানীপুরের একটি বাসিন্দার হেঁসেলে। শুঁটকি রান্নার 'খুশবু' বকুলবাগান রোডে গন্ধ গোকুলের আচমকা আবির্ভাব ঘোষণা করে ছাড়বে। খাদ্য, অখাদ্য ব্যাপারটা এই রকমই। এবার এক সর্বভূক ভোজন রসিকের খবর দেব যাঁর কাছে জীব মাত্রেই সুখাদ্য। জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর, সরীসৃপ, প্রত্যেকে মুখরোচক। এই দুর্মূল্যের বাজারে জেনে রাখাও ভাল যে, চেনা মাছের ঝাঁক আর মাংস ছাড়াও কত অচেনা খাদ্য সম্ভার প্রকৃতির ভাঁড়ারে মজুদ আছে। দাদুরি দিয়ে শুরু করে শজারু দিয়ে শেষ। কাঁটা বেছে নিলে শজারুর মাংসেই আহা বড় মজারু...।

সর্বভূক লোকটির নাম টম স্কুইযার। বউ-এর নাম ফ্রান্সিস। এঁরা থাকেন নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেটে। বনের কাছাকাছি বসত। বনে বনান্তরে ঘুরে ঘুরে নিত্য নতুন মাংস আবিষ্কার। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী টম এক সময় মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ভিয়েতনামে লড়াই করে এসেছেন। এখন অবশ্য বনভোজন আর খাদ্য অখাদ্য নিয়েই তাঁর গবেষণা। প্রতিদিন ভ্যানে চড়ে অভিযান। কখনও সস্ত্রীক পায়দল বেরিয়ে পড়েন। এক হাতে তাঁর বালিশের ওয়াড়, অন্য হাতে আইস বক্স। হাইওয়েতে গাড়ির চাকায় চিঁড়ে চ্যাপ্টা যতগুলো জীবজন্তু চোখে পড়বে, পটাপট ঠ্যাং নয়তো ল্যাজ ধরে তুলে নেবেন। সদ্যপ্রয়াত হলে তাদের চালান দেবেন বালিশের ওয়াড়ের খোলের মধ্যে। আর অকুস্থলে কিছুক্ষণ ধরে চোখ উলটে পড়ে আছে বুঝলে আইসবক্সে বরফের বিছানায় শুইয়ে দেবেন। তারপর বাড়ি ফিরে সবকটাকে পুরে দেবেন মস্ত ফ্রিজারের গহ্বরে। টম অত্যন্ত জ্ঞানী লোক। সংরক্ষণের ব্যাপারেও কত কিছু জানেন। লোমওলা জন্তুদের ওইভাবেই বরফে জমিয়ে দিলে নাকি তার স্বাদগন্ধ দারুণ থাকে। রান্না করার দিন ছাল ছাড়ালেই হবে। গাড়ি চাপা পড়া কাঠবেড়ালি, খরগোস থেকে শুরু করে গুলতি খাওয়া দাঁড়কাক, বনমোরগ, গুলি খাওয়া হরিণ—সব টমের কাছে সমানভাবে প্রিয়। কীসে মরেছে, সেটা বড় কথা নয়। মরেছে সেটাই সার কথা। গুলি আর গুলতিতে কি কাকের মাংসের স্বাদ বদলায় নাকি? লাঠি পেটা করে ধেড়ে ইঁদুর মেরে দেখুন। আবার ইঁদুর কলে ঘাড়ধাক্কা দিয়েও দেখুন। নিত্য নতুন ভাবনা। শেরিতে চোবানো জলজ ইঁদুরের রোস্টও নাকি বড় চমৎকার। টক

দই, সর্ষের গুঁড়ো আর তেজপাতা দিয়ে মাখা গ্রাউন্ড হগ (মেঠো শুয়োর জাতীয় জন্তু) বেক করে টম এমন 'খানা' বানিয়েছেন যে লোকে খেয়ে ধন্য ধন্য করছে।

ভাবছেন, কারা টমের বাড়ির নেমন্তন্ন খেতে যায়? রবাহুত, অনাহুত লোকেরা লেখক, সাহিত্যিকের বাড়ি যায় না? তাঁরা দুটো ডালভাত খেয়ে যেতে বললে কৃতার্থ হয় না? টম স্থানীয় কাগজে জীবজন্তু নিয়ে প্রচণ্ড লেখেন। ভক্ত সংখ্যা তাঁরও কিছু কম নেই। 'কাক ভাজা' পাচ্ছে তারা। এই কত সৌভাগ্য। নর্থ ক্যারোলাইনার 'ফেয়েটভিল অবজারভার টাইমস' ছাড়াও তিন চারটে কাগজে টমের পাক-প্রণালী প্রকাশিত হয়। পয়ঃপ্রণালীর মালমশলা দিয়ে পাক-প্রণালী বানানো সোজা কথা নয়। চিংড়ির মালাইকারি আর উচ্চিংড়ের মালাইকারি স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে হুবহু একরকম করে দেখান তো? টমের সেখানেই 'ক্যালিবার'।

বিষাক্ত জিনিস বাদে টম সব কিছু রাঁধেন আর খান। তবে টম বলেছেন—'এ পর্যন্ত আমি বাদুড় ধরে খাইনি। আর কোনও জীবজন্তুর কিডনিও বিশেষ খাই না। দুর্গন্ধ লাগে।'

মরা সাপ তো টমের খুবই প্রিয়। র‍্যাটল স্নেকের মাংস নাকি মুরগির মাংসের মতো সাদা আর নরম। চাইনিজ স্নেক সুপ অনবদ্য হয়। সাপের মাংস দিয়ে সি ফুড স্যালাডের যা বিকল্প হয়, খেয়ে নাকি ধরা শক্ত। মাছ, চিংড়ি, লবস্টার, গেঁড়ি, গুগলি, কাঁকড়ার শাঁস দিয়ে যেরকম সি ফুড স্যালাড হয়, সাপের কুচি মেখেও তেমনই আঁশটে গন্ধ আর তুলতুলে টেস্ট তৈরি করা যায়। টমের প্রতিভা বহুমুখি। স্নেক ফ্রায়েড চিকেন গরম গরম এমন ভেজে দেন যে, সে যে চিকেনের মাংস নয়, সাপের পকৌড়ি, বোঝে কার সাধ্য? ওই থেকেই আমি কুকুরের ল্যাজের পকৌড়ির আইডিয়া পেয়েছি। 'ঘিয়ে ভাজা'র ল্যাজ নিয়ে তেলেভাজা।

টমের দর্শনার্থী সচরাচর খালি হাতে যায় না। রাস্তা থেকে মরা কুকুর, বেড়াল, খরগোস, র‍্যাকুন যা পায়, মহা উৎসাহে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়। নয়তো গাড়িতে চাপিয়ে নেয়। মাংস দিয়েই নজরানা দেয়। তবে টমেরও নজর আছে। সব প্রণামী গ্রহণ করেন না। 'নশ্বর দেহ' নিয়ে চট করে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। জন্তুদের দেখে শুনে, পরীক্ষা করে, তবে রান্নাঘরে ঢোকান। শীতকালে বরফে জমে কাঠ হওয়া কাঠ বেড়ালি, বাঁদর, ভাল্লুক ছানা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা থাকে না। তখন প্রকৃতির হিমঘরে অটোমেটিক রেফ্রিজারেশনের বন্দোবস্ত। কিন্তু গরমকালে বুঝে শুনে ভেট নিতে হয়। সময়টাও ভীষণ ইমপর্ট্যান্ট। টম মরা জন্তুদের নিয়ে বাজে সময় নষ্ট করতে বারণ করেন। তাই টমভক্তরা হাইওয়েতে গাড়ি চাপা পড়া ভিকটিমদের শুভস্য শীঘ্রম তাঁর করকমলে উপহার দিতে চেষ্টা করে।

টমের খাদ্যরুচি কিন্তু রাতারাতি তৈরি হয়নি। বলা যায় বংশগত ব্যাপার। তাঁর ঠাকুর্দা ছিলেন চেরোকি গোষ্ঠীর রেড ইন্ডিয়ান শিকারি। যাঁদের এখন আমেরিকায় ইন্ডিয়ান বলা হচ্ছে। আর আমরা হলাম ইন্ডিয়ান আমেরিকান। যাই হোক, সেই শিকারি ঠাকুর্দা ভেষজ ওষুধপত্র তৈরি করতে জানতেন। গাছ, গাছড়া, লতা, পাতা, শেকড় বাকড় সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। 'পসামস' (বানানে লেখে অপসামস) কিংবা ওই ধরনের লোমশ জন্তু মেরে নানা রান্না আবিষ্কারের প্রতিভা ছিল তাঁর। নর্থ ক্যারোলাইনার নদী, জলাভূমি,

বনজঙ্গলে, ঘুরে ঘুরে তিনি অনেক পশু, পাখি খুঁজে আনতেন, যেগুলি খাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের পরিবারে কোনও আপত্তি হত না। টম তাঁর ঠাকুরর্দার কাছেই বহু নতুন জিনিস খেতে শিখেছিলেন। কচ্ছপের মাংস যে কত ভাবে খাওয়া যায় সেও ওই বৃদ্ধের মাথাতে এসেছিল। টমকে তিনি ভেষজ ওষুধ তৈরি করতে শিখিয়েছিলেন। গাছপালা টম খুবই চেনেন।

হাইস্কুল পাশ করার পরে টম প্রথমে ফ্লোরিডায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে সিলভার স্প্রিং নামে একটি জায়গায় চাকরি নিলেন। কাজ হল কুমারের সঙ্গে কুস্তি করা। ফ্লোরিডায় টুরিস্ট আকর্ষণ করার জন্য এরকম কুস্তিগিরকে চাকরি দেওয়া হয়। মায়ামিতে রেড ইন্ডিয়ান কুস্তিগিরের সঙ্গে কুমারের ঝুটোপুটি লড়াই আমরাও দেখেছি। টম অবশ্য কাজটাকে একান্ত পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বন্যেরা বনে সুন্দর। চেরেকি কুমার প্রায় টারজানের মতো বনবাসী হয়ে গেলেন। ওকালা ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্যে এক গাছের ডালে বাসা বাঁধলেন। দিনে পেটের দায়ে কুমিরের সঙ্গে হাতাহাতি। রাতে ঘরের অভাবে মগডালে শয্যাপাতি। জীবনের অপূর্ব কম্বিনেশন! শুধু নিঝুম নিশুতি রাতে খালি খালি খিদে পায় কেন রে? তখন জঙ্গল পেরিয়ে লোকালয়ে যাওয়াও মুশকিল। টম সেই সময়কার দুরন্ত খিদের তাগিদেই আরমাডিল্লো ধরতে শুরু করেন। ছুঁচোমুখো কদাকার জন্তুগুলো গুটি গুটি পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ডিম আর পিঁপড়ে খেতে আসে। আর টম তাদের ল্যাজ ধরে আগুনে আহুতি দেন। ছুঁচোমেধ যজ্ঞ চলে প্রতি রাতে। তখন শুধু রোস্ট খেতেন টম। পরে ঘর সংসার করে 'স্টাফড আরমাডিল্লো' রাঁধলেন।

ওকালা ন্যাশনাল ফরেস্টে টম বেশিদিন বনবাসী ছিলেন না। টারজানের মতো লাফালাফি কতদিন আর পোষায়? ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধও কত রাত ভাল লাগে? টম কুমির, ছুঁচো সবকিছু ত্যাগ করে চলে গেলেন সোজা একেবারে ভিয়েতনামে। লড়তেই যদি হয়, মানুষের সঙ্গে লড়ব। কুমির বগলে জাপটাজাপটি ঢের হয়েছে। এবার দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে যাব। টম সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে গেলেন। 'গ্রিন বেরে' অর্থাৎ সৈন্যদলের বিশেষ সম্মানজনক 'সবুজ টুপি'র অধিকারী হয়ে টম কোথায় না গেছেন? ভিয়েতনাম, হণ্ডুরাস, সাউথ কোরিয়ার চলে গেছেন আর খাদ্য অখাদ্য নিয়ে তাঁর অ্যাডভেঞ্চার আরও জমে উঠেছে। শুকনো খোলায় বড় বড় গুবরে পোকা সেঁকে খেয়েছেন। আরশোলা সেঁকে খাওয়াও অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ছাঁকা তেলে 'অ্যানাকন্ডা' সাপ ভাজা খেয়েছেন। ভিয়েতনাম, কোরিয়ার জঙ্গলে স্থানীয় লোকেরা যা যা খায়, টমের সব খাওয়া হয়ে গেছে। বড় আনন্দ করে খেয়েছেন টাটকা বাঁদর আর কুকুরের মাংসের স্টু। সৈন্যদলের শুধু লাগাতার অখাদ্য খাওয়ার জন্যেই টম বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। আজও তাঁর ওই দিনগুলোর জন্যে মন কেমন করে। পুব-দখিনে টাটকা বাঁদর আর কুকুর যেভাবে তৃপ্তি করে সেঁটে এসেছেন, পশ্চিমের বাজারে তার কিছুই নেই। টিনে বন্দি চালানি মাংস কি আর অত সুস্বাদু হয়? বাঁদর আর কুকুরের স্বাদ চীনেরাই জানে। আমেরিকানদের বোঝাবে কে?

টম সৈন্যদলে ছিলেন ইউ এস আর্মি স্পেশাল ফোর্সেস মাস্টার সার্জেন্ট হিসেবে। সিনিয়র মেডিকও ছিলেন কয়েক বছর। সৈন্যদের মিলিটারি ট্রেনিং-এর জন্যে যে সব ফিলম

দেখানো হয়, তাতেও টম অভিনয় করেছেন। কীভাবে বনে জঙ্গলে প্রয়োজনীয় গাছ পাতা, শেকড় বাকড় চিনতে হয়, সেগুলিকে জরুরি অবস্থার সময় কীভাবে খাদ্য আর ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, টম ফিলমের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। সম্প্রতি মিলিটারি রিসার্চে কমপিউটারের সাহায্যে গাছপালার ইতিহাস নথিবদ্ধ করার কাজেও টম সাহায্য করেছেন। অনেক অচেনা গাছ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছেন। সৈন্যরা যখন যুদ্ধের সময় কোনও কারণে বনে জঙ্গলে থাকতে বাধ্য হয়, তাদের আগে থেকে নেওয়া সারভাইভ্যাল ট্রেনিং তখন বিশেষভাবে কার্যকর হয়। টম ইউ এস আর্মির সেই সারভাইভ্যাল ট্রেনিং-এ কিছু নতুন কোর্স যুক্ত করেছেন। টারজানের স্টাইলে দোদুল্যমান থাকার কোর্সই হবে মনে হয়।

টম স্কুইযার মাছ ধরতেও ভালবাসেন। শিকার করা জন্তু জানোয়ার আর মাছের কোনও অংশ নষ্ট করা তাঁর পছন্দ নয়। রেড ইন্ডিয়ানরা অপচয় করে না। টম জীবজন্তুর যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে কুটে রান্নায় দিয়ে দেন। ডিম ঘুঁটিয়ে ক্র্যাম্বলড এগস করছেন তো তার মধ্যে হরিণের মগজ মিশিয়ে দিচ্ছেন। হরিণের ঘিলু দিয়ে ডিম ভাজা। প্রোটিনে প্রোটিনে ছয়লাপ। অপঘাতে মরা জন্তুদের মাংস দিয়ে যাবতীয় রান্না। এত মুখরোচক যে বার বার চেয়ে খেতে হয়। টমের খ্যাতি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কলোরাডো থেকে কানাডা পর্যন্ত যেখানে যত করিবাজি ওষুধের সেমিনার হয়, ভেষজ উৎসব হয়, বনজ খাদ্য উৎসব হয়, সেখানেই টমের ডাক পড়ে। নিজের এলাকাতেও প্রায়ই বক্তৃতা দিতে হয়। রান্নার ডেমনস্ট্রেশন করতে হয়। 'ওয়ে মাউথ উডস স্যান্ড হিলস নেচার প্রিজার্ভ' নামে যে বন সংরক্ষণ কমিটি আছে, তাদের আয়োজিত এই ধরনের উৎসবে টমের আকর্ষণে বহু লোক জড় হয়ে যায়। শ'খানেক অনুগামী নাকি মরা জীবজন্তুর ল্যাজ দুলিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানেই রান্নার হাতে খড়ি। ফরেস্ট রোস্টারদের তো টমের ওপর ভীষণ ভক্তি। মরা জন্তুর সদগতি করার জন্যে এরকম উদ্যম সাধারণত চোখে পড়ে না তো!

কত শিক্ষিত লোকজন টমের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে যান। হয়তো গিয়েছিলেন ভেষজ ওষুধের গুণাগুণ জানতে। জঙ্গলের লতাপাতার ইতিহাস শুনতে। কিন্তু ফিরে এলেন ফড়িং ভাজার রেসিপি নিয়ে। এক মহিলা এমনই আপ্লুত হয়ে পড়েছেন যে আমাদের বক ফুল ভাজা খাওয়ার মতো শুধু লিলিফুল খেয়ে যাচ্ছেন। লিলিফুলের পাপড়ির পরতে পরতে ক্রিমচিজ মাখিয়ে খেতে হয়। আর এক মহিলা বলেছেন—আগাছার যে এমন মধুর স্বাদ হতে পারে কে জানত? তাঁর 'গার্ডেন ক্লাব' নামে একটা প্রকৃতিপ্রেমী দল আছে। টমের পেছন পেছন লাইন করে তাঁরা একদিন আগাছা ভোজনে গিয়েছিলেন। অপূর্ব অভিজ্ঞতা। টম দু-পা হাঁটছেন, পটাং করে দুটো অচেনা শাকপাতা খেয়ে নিচ্ছেন। দলও দেখাদেখি শাকাহারী আবার টম চলতে চলতে এক মুঠো অচেনা ফুল খেয়ে নিলেন। দলও তক্ষুনি ফুল নিয়ে টানাটানি। টম অনেকক্ষণ ধরে মাটি হাতড়ে তিনরকম শেকড় উপড়ে ফেললেন। তারপর ক্রমান্বয়ে খচর মচর চিবনো। একটু ছিবড়ে ফেলা। একটু রস গেলা। দেখাদেখি কাননবালার দলও মুখ টিপে টিপে শেকড় চিবোচ্ছে। টমের নেতৃত্বে আগাছা ভোজন অভিযান বেশ সফল হয়েছিল। মূল অন্বেষণে এরকম গভীর নিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। আগাছা সংরক্ষণেও টমের অশেষ কেরামতি চোখে পড়ে। নিজের পাঁচ একর জমিতে কালে

ভদ্রে ঘাস ছাঁটেন। যতটুকু না ছাঁটলে নয়। আমাদের কাছে পেঁয়াজ, রসুন যেমন নিত্য ব্যবহারের জিনিস টমের কাছে হলদে ঘাসফুল আর পালং পাতার মতো দেখতে মোটা খশখশে আগাছার তেমনই কদর। প্রায় প্রতি রান্নায় এগুলো দিয়ে সাঁতলে নিচ্ছেন। প্রভূত ভিটামিন আছে নিশ্চয়ই।

তবে টমের বুনো রান্না নিয়ে সমালোচনাও খুব হয়েছে। তাঁর রান্নার বই-এর যে তেমন কাটতি হচ্ছে না। এ জন্যে লিটারারি এজেন্টরা টমের বিকট বিকট উপকরণগুলোকেই দায়ী করছেন। অপঘাতে মরা জীবজন্তুর মাংস শুনলে কার রান্না করার ইচ্ছে হয়? সবাই তো আর কুমিরের সঙ্গে কুস্তি লড়েনি। তারা হুট-হাট আরমাডিল্লো ধরে ধরে বেগুনপোড়া বানিয়ে খায়নি। থ্যাঁতলানো বেড়ালের স্টু রান্না কে শিখবে? এজেন্টরা বারবার টমকে উপদেশ দিয়ে বলছেন যে—বই থেকে ওই 'অখাদ্য' রেসিপিগুলো বাতিল করুন। আর স্থানীয় যে সব পত্রিকায় টম 'রাঁধুনির চিঠি' লেখেন, তাদের সম্পাদকরাও ইদানীং মুশকিলে পড়েছেন। কোনও খাদ্য সম্পাদক টমের নেমন্তন্ন নিতে রাজি নয়। বারবার বলা হচ্ছে—টমবাবু, আপনি একটু মানুষের কথা ভেবে রান্না করুন। তা নয় অনবরত সাপ, ব্যাঙ আর ট্রাক চাপা পড়া ধুমসো জন্তু তুলে আনছেন। খাদ্য রসিকরা ওই নেমন্তন্নে যায় কখনও? না গেলে ভাল মন্দ সমালোচনা লেখেই বা কী করে?

টমবাবুর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কাগজওয়ালাদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রায়ই রান্নাঘরের ছবি নিয়ে আসছেন। ফ্রিজারের মধ্যে চিৎপটাং বেজি। পাশে হরিণের শিং সজনে ডাঁটার স্টাইলে গোছা করা রাখা। বোধহয় স্যুপের জন্যে। সিংকের ভেতরে রক্তাক্ত শজারু। টম যে একেবারে বেসিক থেকে উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন, তার প্রমাণ দিতেই গাদা গুচ্ছের ছবি তোলা! কোনও ছবিতে ছোরা হাতে টম কোলাব্যাঙের পেট চিরছেন। কোথাও টমগিন্নি মন দিয়ে ইঁদুর কুচচ্ছেন পাশে এক প্লেট তেলতেলে সাপ ভাজা। কাগজওয়ালারা চোখ বুজে বসে থাকে। মুর কাউন্টি সিটিজেন নিউজ রেকর্ডের খাদ্য সম্পাদক তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে টম যদি ছবি পাঠানো বন্ধ না করে তো সে কাগজের মালিকের কাছে প্রতিবাদ করবে। অখাদ্য সম্পাদক হবার জন্য সে চাকরি করতে আসেনি।

টম গিন্নি ভারী বুদ্ধিমতী। তিনি যখন লক্ষ করেন যে অকারণ ঘেন্না থেকে লোকেরা তাঁদের বাড়ির রান্নাগুলো নিয়ে নিন্দে করছে, কিংবা বই-এর কাটতি নষ্ট করে দিচ্ছে, তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। সঙ্গে নিয়ে যান সুপারমার্কেটের তৈরি হট ডগ, সসেজ তথা মাংসের কোল্ড কাট-এর দুটো একটা প্যাকেট। প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে ছাপানো থাকে খাবারটি প্রসেস করার সময় কী কী উপাদান মেশানো হয়েছে। দেখা যায়, জন্তু জানোয়ারের শরীরের বহু 'অবাঞ্ছিত' অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেমালুম কিমা বানিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। গরু, ভেড়া, শুয়োর, মুরগি কারও অনেক কিছুই বাদ দেয়নি। এইসব ফিরিস্তি পড়ে তখন নাকি অনেকের ধারণা বদলে যায়, ভাবে তাই তো? অজান্তে কত কিছু খাই তো! টম পরিবারের বক্তব্য—জেনেশুনে গরুর জিভ ভাজা আর অজান্তে ধবলীর ঠোঁটের কিমার হ্যামবার্গার খেলে আবার অত খুঁতখুঁতুনি কিসের? তার তো বরং এই ভেবে খুশি হওয়া উচিত যে টম তাকে কত আজব জিনিস খেতে শেখাচ্ছে। একটুও মিথ্যে বলছে না। ট্রাক চাপা পড়া

কাঠবেড়ালিকে ফার্ম থেকে কেনা শুয়োর ছানা বলে চালাচ্ছে না। সাপকে মুরগি বলে ভাঁওতা দিচ্ছে না। সরলতার দাম নেই?

খাদ্য অখাদ্য নিয়ে ভাবতে বসলে দেখবেন তালে গোলে কখনও না কখনও কিছু 'অবাঞ্ছিত' পদার্থ নির্ঘাৎ খেয়ে ফেলেছেন। মিষ্টিতে পিঁপড়ে খাননি? শৈশবে সাঁতার শেখার প্রেরণায় বাড়তি একটি দুটি? ওসব নিয়ে ভাববেন না। কাঁটাকেই যদি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেন, শজারু আর ইলিশ মাছে একদম তফাৎ করবেন না। লাউ কুমড়োর শাখা প্রশাখার সঙ্গে কয়েক আঁটি মাধবীলতা মিশিয়ে নেবেন। বকফুল ভাজার সঙ্গে চারটি গন্ধরাজ। টমের বই ঘেঁটে বাদ বাকি রান্নাগুলো পরে জানাচ্ছি।

২৪ জুলাই ১৯৯৩

মৎস্যপুরাণ

আণাদের কাশ্মীরি বন্ধু মোহিনী কউলের মা আমেরিকায় বেড়াতে এসে মাছের গন্ধ তাড়ানোর উপদেষ্টা হয়েছিলেন। তাঁর 'কাশ্মীর কি কলি' মোহিনীকে নতুন নতুন মাছের পদ রেঁধে খাওয়াতেন। জামাই-এর নাম 'মহারাজ'। কিন্তু স্বভাবে সে তেমন রাজসিক নয়। 'মাগ্' খেয়ে বাঁচে। মাছের সুবাস তার সহ্য হয় না। তাই শাকাহারী জামাই-এর ভয়ে শাশুড়িকে পেছনের বাগানে পোর্টেবল গ্যাসের উনুনে মাছ ভাজতে হত। সেখানেই ফ্রাই, কোর্মার পর্ব। জামাই মহারাজ বাড়ি ফেরার আগে ঝোপের ধারে বসে বসে সারা সপ্তাহের মাছ কেটে, কুটে ভেজে তুলতেন। সঙ্গী থাকত শুধু মোহিনীর হোঁৎকা বেড়াল কুইনি। পোর্টেবল উনুনের কাছাকাছি তার ধ্যানস্থ মূর্তি। ডাক্তার মোহিনী কউল সন্ধে নাগাদ হাসপাতাল থেকে ফিরে মার গায়ে ওডিকোলন স্প্রে করত। নয়তো ডিনার টেবিলে মা মৎসাগন্ধা হয়ে ক্রমাগত সৌরভ বিতরণ করতে পারেন। কুইনির মতো সকলের তো আর অগাধ মাতৃভক্তি নেই। মোহিনীর ছেলেমেয়েরাও মাছ পছন্দ করে না।

এদেশের শার্সি আঁটা বাড়িগুলোতে মাছ রান্নার গন্ধ একেবারে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আগে আগে হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ঢুকলে কোনও বাঙালির সুলুক সন্ধান পেতে দেরি হত না। শুধু ফ্লোর নম্বর জানলেই যথেষ্ট। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে হলওয়ে দিয়ে চলতে চলতে ফ্রাই-এর গন্ধ নাকে এলেই টুং করে সামনের দরজায় বেল টিপে দিতাম। মুহূর্তের মধ্যে খোলা দ্বার দিয়ে সেতারের পিড়িং পিড়িং, মাছ ভাজার গন্ধ আর বাংলায় প্রচণ্ড কোলাহল।

এখন অবশ্য গন্ধ বিদায়ের অনেক প্রক্রিয়াই আবিষ্কার করেছি। এক তো পার্টির অন্তত একদিন আগে মাছ রান্না সেরে ফেলি। তারপর রান্নাঘরে লাইসল ছেটানো, ঘরে ঘরে এয়ার ফ্রেশনার ছড়ানো। অনেকে এক মুঠো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ঘুরে ঘুরে আরতি করেন। আরতি

নৃত্যের ভঙ্গিতে যাঁদের সেরকম দখল নেই, তাঁরা নিউমোনিয়ার ঝুঁকি নিয়ে শীতকালেও রান্নাঘরের জানলা খুলে দেন। আমি কতবার গলা বন্ধ, ফুলহাতা সোয়েটার পরে 'খোলা জানলার ধারে' দাঁড়িয়ে পেল্লাই রুই মাছ ভেজেছি। মাথার ওপর গোঁ গোঁ করে একজস্ট ফ্যান কুলোর বাতাস দিয়ে আঁশটে গন্ধ তাড়াচ্ছে। দুম দাম করে শব্দ করে তেল ছিটকে যাচ্ছে। আমি কাঠের খুন্তি দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ গাদা, পেটি উলটে দূরে পালিয়ে যাচ্ছি। ঘর একেবারে হিমালয়। 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন' গাইতে গাইতে খুন্তি হাতে নেচে বেড়াচ্ছি। 'গন্ধ বিদায়' নৃত্যনাট্য।

কতকাল পর্যন্ত মঙ্গলবার মাছ রান্না বারণ ছিল। জবরদস্তি 'জয় মঙ্গলবার'। কারণ ওইদিন মেয়ে পিয়ানো শিখত। প্রথম প্রথম না বুঝে একই সময় বাইরের ঘরের পিয়ানোর হিল্লোল শুনতে শুনতে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ধাঁই করে তেলে মাছ ছেড়েছি। মুড়ো ফেটে একেবারে মাদ্রাজিদের শিব চতুর্দশীর রাত! শুধু বোমা, পটকার দমাদ্দম আওয়াজ। সেই গন্ধ বিধুর সমীরণে মেয়ে ছুটে এল। ছোট্ট ঝুঁটি নেড়ে নেড়ে তার চোখের কী ইশারা। ফিসফিস করে, হাত মুখে নেড়ে কী বক্তৃতা! আঁশটে গন্ধে আর বিকট শব্দে সে নাকি পিয়ানো দিদিমণির সামনে লজ্জায় বসে থাকতে পারছে না। অথচ আমি জানি আমেরিকানরাও যথেষ্ট মাছ খায় আর রান্নার মুহূর্তে গন্ধ বেরতে বাধ্য। কিন্তু মেয়ের মান রক্ষার জন্যে মঙ্গলবারে মাছ ভাজা বন্ধ করতে হল। সে যত বড় হয়, ততই বাড়িতে তার আমেরিকান বন্ধুবান্ধবদের আসা যাওয়া বাড়তে থাকে। আমাকেও 'গন্ধবিদায়' নৃত্যনাট্যে পারদর্শী হতে হয়। লাইসল নিয়ে ঘুরে ঘুরে আরতি নৃত্য।

এদিকে মোহিনীর মা নিজে বাগানে মাছ রাঁধলে কী হবে, গন্ধ বিতাড়নের ব্যাপারে জ্ঞান তাঁর কম ছিল না। ওঁর কাছেই শিখেছিলাম, মাছ ভাজার আগে থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত পাশের বার্নারে আপেল সেদ্ধ করতে হয়। কাশ্মীরের লোক তো! আপেলের গুণাগুণ অত আর কারা জানবে? কিন্তু একগাদা আপেল ফুটিয়ে ফেলে দেব? শেষে কিম্ভুত একটা চাটনি বানিয়ে ফেলতাম। মোহিনীর মা আরও বলেছিলেন—এক গামলা জল বসিয়ে সমানে দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ আর তেজপাতা ফুটিয়ে যেতে হবে। গরম মশলার দাপটে মাছের গন্ধের দফা রফা। সেই উপদেশ শুনে এক সসপ্যান ক্বাথ নিয়ে মরি। পুনর্ব্যবহার বা রি-সাইক্লিং-এর মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক রকম চিন্তা করেছিলাম। একটু ছানার পোলাও করব? 'আখনির' জল একেবারে রেডি তো। নাকি ইন্ডিয়ান দোকানে গিয়ে 'যষ্টিমধু'র খোঁজ করব? এমনি মধু তো আছেই বাড়িতে। ছোটবেলায় কাশি সারাতে এরকমই একটা পদার্থ মাঝে মাঝে খাইনি? আমেরিকাতেও আমার বছরে অন্তত দুবার গলা ব্যথা, সর্দি কাশি হয়। পার্মানেন্ট 'ক্বাথ' বানিয়ে রাখতে পারি না?

বাড়তি পরিশ্রমের ভয়ে শেষ পর্যন্ত কিছুই করিনি। তবে পরীক্ষা করে দেখেছি এর চেয়েও সস্তায় নৃত্যনাট্য করা যায়। এক সুইশ মহিলার কাছে শেখা। মাছ রান্নার সময় এক বাটি ভিনিগার, আর এক বাটি জল, কাউন্টারের ওপর রেখে দিলেই হল। তারা যুগলে সব গন্ধ শুষে নেবে। সুইশদের শিক্ষাই আলাদা। ওদেশে ডিসটিলড ভিনিগারের জলের দর। প্রায় বিনে পয়সায় গন্ধ তাড়ানো। আর মহারাজের শাশুড়ি বলে কিনা—'বয়েল অল

কাইন্ডস অফ গারাম মাশালা, স্পেশ্যালি সিনামন, অ্যান্ড কার্ডামন...।' হুঁঃ তবু যদি না মাঠে বসে বেড়ালের সঙ্গে বকর বকর করে সারা সপ্তাহের মাছ ভাজতে হত! মহারাজের শাগুড়ি হয়েও তো প্রাসাদে মাছ ভাজার এক্তিয়ার নেই। বনবাদাড়ে বসে বসে রান্না! তার আবার 'গারাম মাশালা' আর অ্যাপল টেকনিক! আমার পক্ষে ভিনিগারের গুণাগারই যথেষ্ট! আমার কাছ থেকে সেই সুইশ মহিলার পদ্ধতি জেনে নিয়ে কত বাঙালি মহিলা এখন ভিনিগারের বাটি সাজিয়ে মাছ ভাজে। সকলেই নতুন ইহুদি!

আমেরিকার বাঙালিরা এখনও মাছে ভাতে আছে। অন্তত আমাদের জেনারেশন। এদেশের মাছের বাজারে অধিকাংশ মাছই অবশ্য আমাদের অচেনা। তবু তাদের কাউকে কাউকে আমরা দেশের চেনা মাছের মাসতুতো ভাই বোন হিসেবে সাদরে গ্রহণ করেছি। যেমন কার্প (রুই), বাফেলো কার্প (পাকা রুই), ক্যাট ফিশ (সাদা মাগুর), হোয়াইটিং (বেলে মাছ), পার্চ (পারশে জাতীয়), সি ব্যাস (খরসুলার কাছাকাছি), পোরগি (তেলাপিয়ার মতো), ছোট কড (আড় মাছ জাতীয়) ইত্যাদি।

আবার চিনে বের করেছি খোদ ইলিশ, চিংড়ি, ট্রাউট, কাঁকড়া, লবস্টার। কোলেস্টেরলের ভয়ে ইদানীং সারা দেশ জুড়ে 'মাছ খাও', 'মাছ খাও' রব। সাহেবরা বেকড, বয়েলড নয়তো স্টিমড মাছ খাচ্ছে। খুব লোভে পড়লে ময়দার ব্যাটার লাগিয়ে মাছ ভাজা। বাঙালি মাছ বুঝে ঝাল, ঝোলও রাঁধছে, আবার ছেলে-মেয়েদের প্রেরণায় বেকড, বয়েলডও খাচ্ছে। স্যামন, ফ্লাউন্ডার, সোল (বাঙালির শোল মাছ নয়), হ্যাডক, হ্যালিবাট, স্ক্রড, কড—এদের আমরা ঝাল-ঝোল বানাই না। ফিলে নয়তো স্টেক, মাছের যেরকম টুকরো কিনি, লেবু, মাখন, নুন, গোলমরিচ মাখিয়ে আভনেই বেক করে নিই। পাঁচ-সাত মিনিটে বেকিং হয়ে যায়। অনেকে স্যামন-এর টুকরো দিয়ে ভাপা ইলিশের স্টাইলে মাইক্রোওয়েভে বেক করেন। সর্ষেবাটা, কাঁচা লঙ্কা আর সর্ষের তেলের মহিমায় চার মিনিটে স্যামনকে ভাপা ইলিশ বলে ভ্রম হয় আর কি?

সুপার মার্কেটে বাঙালির রসনা অনুযায়ী মাছের তেমন বৈচিত্র্য থাকে না। টাটকা মাছ কেনার আসল জায়গা হল মেছোবাজার। নিউ-ইয়র্কে ফুলটন স্ট্রিট মার্কেট, ম্যানহাটনের ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট, নিউ জার্সির 'নু আর্ক' শহরের মালবেরি স্ট্রিট, জার্সি সিটি আর প্যাটারসনের কোরিয়ান ফিস মার্কেট, নিউ-ইয়র্কে চায়না টাউন বা ক্যানাল স্ট্রিট এলাকায় হল বড় বড় মাছের বাজার। এয়ার কন্ডিশনড দোকানের কাচের শো কেসের ভেতরে, বাইরে মাছের পাহাড়। বরফের কুচির ফাঁকে ফাঁকে রাশি রাশি রুই, কাতলা, ইলিশ, চিংড়ি আর যাবতীয় ছোট মাছের শাখা প্রশাখা। নিউ জার্সিতে ক্রমশ সম্পূর্ণ মাছের ব্যাপারটাই কোরিয়ান ব্যবসাদারদের হাতে চলে গেছে। প্যাটারসনের যেসব দোকান আগে দেখতাম স্থানীয় আমেরিকানরাই মালিক এবং বিক্রেতা, এখন সেই প্রত্যেকটি দোকান কোরিয়ানরা কিনে নিয়েছে। ফিলিপিনোরাও মাছের ব্যবসায় ঢুকেছে।

নিউ-ইয়র্কে এখনও সুইশ মাছের দোকানগুলোর ব্যবসা ভালমতই চলছে। তাদের দোকানের চৌবাচ্চায় জ্যান্ত পাকা রুই মাছ সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কালো, কোরিয়ান আর সুইশ খদ্দেরদের সঙ্গে বাঙালিও জ্যান্ত মাছ তুলিয়ে পটাপট কাটিয়ে আনছে। এক একটি রুই-

এর কমপক্ষে আট-দশ পাউন্ড ওজন। কুড়ি-বাইশ পাউন্ড ওজনের জবরদস্ত মাছও বিক্রি হয়ে যায়। ফ্রিজারে রাখলে একটি পরিবারের বেশ কয়েক সপ্তাহের মাছের সাপ্লাই। এখনও পাউন্ড পিছু রুই মাছের দাম দেড় ডলার মতো। '৭১/৭২ সালে যখন রুই মাছ কিনতাম, সে সময় ৪৯ সেন্ট করে পাউন্ড ছিল। এখনও বাজারে মাছ বেশি এসে গেলে এক ডলার করে পাউন্ডে রুই মাছ পেয়ে যাই। সাধারণত গোটা মাছই বিক্রি হয়। কালেভদ্রে আধখানা বিক্রি করে, তখন পাউন্ড পিছু দাম বাড়িয়ে দেয়। কারণ মুড়ো, ল্যাজা নেই। ইদানীং ছোট মাছের বিক্রি ভীষণ বেড়ে গেছে। বড় বড় পারশে জাতীয় মাছের দাম রুই, ইলিশের চেয়ে বেশি। প্রায় দু'ডলার করে পাউন্ড পড়ে যায়। মাছের ফিলে বরাবরই দামি। পাউন্ড পিছু চার থেকে ছ'ডলার পর্যন্ত দাম বাঁধা থাকে। আর ভারী মহার্ঘ বস্তু হল চিংড়ি মাছ। একটি লবস্টার সাড়ে তিন-চার ডলারের কমে পাওয়া যায় না। তবে ওই, সাপ্লাই-এর ব্যাপারও আছে। হয়তো মেইন স্টেট থেকে বাক্স বাক্স লবস্টার (গলদা চিংড়ি) বাজারে এসে গেছে। এদের কখনও মরা অবস্থায় দেখতে পাই না। মাছের বাজারে, সুপার বাজারে, জলভর্তি কাচের বাক্সে দাঁড়া নেড়ে নেড়ে রীতিমত ডাকাডাকি করে। হয়তো তখন লবস্টারের সেল চলছে। চিমটে দিয়ে তুলে ঠোঙায় ভরে ওজন করে দাম দেওয়া। সে সময় একটির দাম বড় জোর দু'ডলার। এভাবেই ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হয় অ্যালাস্কার কাঁকড়া। তারাও রীতিমত হাত পা নেড়ে জানান দেয়—প্রাণ আছে! প্রাণ আছে! যদি বধ করতে চান, সেলের মরশুমে এক ডলারে সাত আটটাও পেয়ে যেতে পারেন। জ্যান্ত কাঁকড়া, যদি আবার রাজবংশের হয়, অর্থাৎ কিং ক্র্যাব, তবে একটু বেশি দাম পড়বে। সেল থাকলেও এক ডলারে বড় জোর তিনটি পাবেন। এরপর আছে চিংড়ির শ্রেণী বিভাগ। জাম্বো চিংড়ি হলে এক পাউন্ডের জন্যে আট থেকে ন'ডলার পড়বে। তাও কবন্ধ স্টাইল। মাথা তো আপনাদের কাছে বিকিয়ে এসেছে। লার্জ চিংড়ি হলে অন্তত পক্ষে সাত ডলার করে পাউন্ড পিছু দাম। মিডিয়াম হলে ছয়ের কম নয়। আর স্মল মানে কুচোগুলোর অন্তত পক্ষে ৫ ডলার করে পাউন্ড পিছু দাম পড়ে যায়। চিংড়িরও সেল দেয় অবশ্য। কিন্তু সেও জোর করে অত্যধিক চিংড়ি গছানোর কায়দা। একসঙ্গে কুড়ি পাউন্ডের বাক্স নিলে নাকি সস্তায় দেবে। অত চিংড়ি একা একা খাওয়া সম্ভব, নাকি খাওয়া উচিত? যেই আপনি কম করে নেবেন, অমনই আট কি ন'ডলার করে পাউন্ড হয়ে গেল।

আগে রুই বা অন্যান্য বড় মাছের মুড়োগুলো মাছের দোকান থেকেই ফেলে দিত। সাহেবরা, কালোরা, ওরিয়েন্টালরা মুড়ো বাদ দিয়ে মাছ কাটিয়ে নিয়ে যেত। দেখতাম, গারবেজ ভ্যানে মুড়ো জমে যাচ্ছে। এক আধজন বুড়ি মেম এসে নিজের পোষা বেড়ালের জন্যে বিনে পয়সায় দু'চারটে মুড়ো নিয়ে যেত। বাঙালি তো দেখে শুনে তাজ্জব। নিজের মাছ কাটিয়ে নেবার সময় প্রথমেই চিৎকার—'কিপ দ্য হেড অন'। সাহেব মাছ কাটিয়েগুলো অবিশ্বাসের চোখে তাকায়। বাঙালির ততোধিক চিৎকার—'আই সে, ডোন্ট কাট অফ দ্য হেড। জাস্ট লিভ ইট লাইক দ্যাট'। মাছওলা হাসে—'তোমারও বেড়াল আছে?'—'অ্যাঁ! বেড়াল? ওহঃ ইয়েস! সিওর আই হ্যাভ...।

ক্রমশ দেখা গেল সব বাঙালিই যেন বেড়াল পুষছে। না হলে 'মুণ্ডু চাই, মুণ্ডু চাই' বলে

মাছের বাজারে মুড়ো চাওয়া যায়? এমনিতেই আমাদের নানা বদনাম। আর ইমেজ নষ্ট করার দরকার নেই। সব মুড়ো কাল্পনিক বেড়ালের নামে চালানো হল। বেড়ালের নাম কুইনি, আমরাও কুইনি। নিজের সংসারে কে সম্রাজ্ঞী নয়? সেই হিসেবে প্রথম কয়েক বছর বাঙালি কুইনিরা খুব মুড়ো টুড়ো খেয়ে ফেলেছিল। মাছের দোকানের গারবেজ ভ্যানে মুড়ো পৌঁছতেই পারে না। অন্যের কেনা মাছের পরিত্যক্ত রক্তাক্ত 'মুণ্ডু'ও বাঙালির ঠোঙায়। বাঙালির বাড়িতে প্রতিটি ডাল, তরকারি কণ্টকময়। ঘটিরা প্রতিবাদ জানায়।

হঠাৎ বড় দুঃসংবাদ এল। রুইমাছের মুড়োয় ক্যানসারের বিষ থিকথিক করছে। লেক মিশিগানের জলে নাকি শুধুই কেমিকেল আবর্জনা। আর সেখানকার মোটা মোটা রুইগুলো তাদের কানকোর মধ্যে তাবৎ দূষিত পদার্থ জমিয়ে রাখে। ব্যস! সেই থেকে মাছের বাজারে বাঙালির ফতোয়া জারি।

—'কিপ দ্য হেড অফ'! রোহিতবাবুর ধড় থেকে মুণ্ডু ফেলে দাও।

—'কেন স্যার? তোমার বেড়াল? কুইনির জন্যে হেড নেবে না?'

—'নাঃ দরকার নেই আর।'

মাছওলাটা বেড়াল মরে গেছে ভেবে মুখে চুকচুক শব্দ করে। বাঙালি কথা বাড়ায় না। এতদিন বাদে নিজে হাতে বউকে বিষ তুলে দিয়েছে ভেবে চোখ উলটানো কাতলার মাথাগুলো থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

এও অনেক আগের ঘটনা। বাঙালির শনিবারের আড্ডায় খবর এসেছিল—হাডসন নদীর ধারে জেলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে জ্যান্ত ইলিশ ধরছে। মাত্র এক ডলারে আস্ত একখানা ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে। এমনিতে মাছের বাজারে একটা ইলিশের দাম পড়ে কম করেও সাত ডলার। অবশ্য সেখানে মাছ কেটে দেয়। হাডসনের তীরে মাছ কাটার বালাই নেই। কিন্তু মেয়েরা বিচলিত হয় না। আমেরিকায় এসে কত কঠিন কাজ শিখতে হল। ইলিশ মাছ কাটতে পারবে না?

তাদের ভরসাতেই আইস বক্স বগলে ভোর রাতে বাঙালির সমুদ্র যাত্রা। অন্তত ডজন খানেক তো আনতেই হবে। সদ্য জল থেকে লাফানো জালে পড়া চকচকে ইলিশ! ভাবলে শরীরে রীতিমত রোমাঞ্চ জাগে। ভোরের জোলো হাওয়া লেগে ডবল শিহরন...ইলশে গুঁড়ি ইলশে গুঁড়ি, ইলিশ মাছের ডিম...।

ভাবছেন, আমেরিকায় ইলিশ কোথায়? ইলিশের ইতিহাস লিখতে হয় তবে। জেলেদের কাছ থেকে অনেক খবর নিয়েছি। গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে হাডসন নদীর জল থেকে প্রচুর ইলিশ ধরা হচ্ছে। প্রতি বছর এপ্রিল নাগাদ মাত্র পাঁচ-ছ সপ্তাহের জন্যে অ্যাটলান্টিক থেকে ইলিশের ঝাঁক এখানে ডিম ছেড়ে যেতে আসে। মাঝ রাতে চোদ্দো ফুট নৌকো আর নাইলনের জাল নিয়ে জেলেরা এসে অপেক্ষা করে। বহির্মুখী স্রোতের শেষ সময়ে জাল ফেলে রেখে অন্তর্মুখী স্রোতের শেষ পর্যায়ে জাল তোলে। ওই কয়েক সপ্তাহ ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ওঠে। এরা বলে শ্যাড মাছ। শ্যাডের ডিম আলাদা করে বরফে রেখে মাছের বাজারে চালান দেয়। আমেরিকানদের কাছে ইলিশের ডিম ক্যাভিয়ারের মতোই সুখাদ্য। দামও বেশি। তুলনায় আস্ত মাছের দাম সস্তা। আমরা এখনও আপস্টেট

নিউ-ইয়র্কের ওই মোহনা অঞ্চলে গেলে শ্যাডের সিজনে এক ডলার করে একটি আস্ত ইলিশ পাই। আর ডিম সমেত মাছ হলে তিন ডলার দিই।

ইলিশের 'ফিলে' অর্থাৎ কাঁটা ছাড়ানো চ্যাটালো টুকরো দিয়ে স্মোকড শ্যাড, পিকলড শ্যাড ধরনের খাবার মশলাও আরেক ভিজিয়ে টিনবন্দি করে বিক্রি করে। এক একটি ইলিশ সাধারণত অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে চার বছর পর্যন্ত বাঁচে। পরিণত অবস্থায় প্রতি বছর হাডসনে আসে আর ডিম পাড়ার ছ'সপ্তাহের মধ্যে সমুদ্রে ফিরে যায়। এখানকার জেলেরা ইলিশ মাছ ধরাকে সাময়িক পেশা আর নেশা বলেই মনে করে। কারণ মাত্র ছ'সপ্তাহের উপার্জনের ভরসায় তো বছর চলে না। এমনিতে পেশায় তারা কেউ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কেউ ওয়েল্ডার, কেউ বা রেস্তোরাঁয় মাছের চালান দেয়। কেউ কেউ হচ্ছে বড় বড় মাছের বাজারের স্থায়ী কর্মচারী।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের নায়াক, পিয়েরমন্ট, হ্যাভার স্ট্র, এজ ওয়াটার ইত্যাদি ফিশারিগুলিতে স্থানীয় জেলেরা পারিবারিক ব্যবসা হিসেবে ইলিশ মাছ ধরে চলেছে। মেয়াদ কয়েক সপ্তাহের হলেও রাত জেগে পরিশ্রম খুবই হয়।

শুনেছি আমাদের দেশে ইলিশ মাছ ধরার জালগুলি নাকি ৩০/৪০ ফুটের মতো লম্বা হয়। এদের জালের মাপ তিনশো থেকে চারশো ফুট। ইলিশের কাঁটা ছাড়ানোও মস্ত কাজ। ফিলের জন্যে কাঁটা বাদ না দিলে আমেরিকানরা কিনবে না। কীভাবে মোট ৭৬৯টি কাঁটা বাদ দিয়ে ইলিশের ফিলে কাটতে হয়, সেও এদের শিখতে হয়। ইলিশের ব্যবসায় আমেরিকান জেলেদের রোজগারটি একেবারে বাঁধাধরা। হাডসনের জলে রুই অর্থাৎ কার্পও প্রচুর জন্মায়। কিন্তু ওখানকার জলে কলকারখানার বিষাক্ত আবর্জনা মিশে যাওয়ার কারণে '৭৬ সাল থেকে মার্কিন সরকার এই জলে অন্যান্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ইলিশ ধরার বাধা নেই। কারণ, অল্প কয়েক সপ্তাহের জন্যে ইলিশের ঝাঁক আসে। পলি ক্লোরিনেটেড বাইফেনিল নামে দূষিত রাসায়নিক পদার্থের মাত্রা ইলিশের মধ্যে খুবই সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য মাছে সংক্রমণের মাত্রা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য এখন হাডসনের জল অনেক নিরাপদ হয়েছে। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় আইন জারি করে নদীর জলে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা গেছে।

ইদানীং বাংলাদেশি দোকানে চালানি পদ্মার ইলিশ আসছে। সেই জলে কাঠ হওয়া চালানি মাছে স্বাদ, গন্ধ বলে কিছুই পাইনি। বাংলাদেশ আর থাইল্যান্ড থেকে চালানি পাবদা, ট্যাংরা, কইও আসছে। তেমন জনপ্রিয় হচ্ছে বলে মনে হয় না। স্থানীয় টাটকা মাছের কাটতি অনেক বেশি। সম্ভবত খাদ্য গুণের চিন্তা থেকেই লোকে বিদেশের ফ্রোজেন মাছ নিয়মিত কিনতে চায় না। ওই মাছগুলি শুধু বাংলাদেশের দোকানেই ফ্রিজারে রাখা অবস্থায় বিক্রি হয়। শখ হলে কেউ কেউ মাঝে মধ্যে কিনে আনেন।

চায়না টাউনে গেলে মাথাসুদ্ধু চিংড়ি পাওয়া যায়। এছাড়া নিউ অর্লিয়েন্স থেকে আস্ত চিংড়ির ক্রেট আনিয়েছি কয়েকবার। দামও অনেক কম পড়ত এখানকার বাজারের তুলনায়। কেউ অফিসের কাজে নিউ অর্লিয়েন্স গেলে প্লেনে চিংড়ির ক্রেট নিয়ে ফিরতেন। আমরা ভাগাভাগি করে কিনে নিতাম। ইলিশের বেলা এখনও তাই হয়। বাঙালি মহলে

ইলিশ কেনার অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন বিষ্ণু জোয়ারদার। ইলিশের মরশুমে শেষ রাতে উঠে হাডসনের ধারে জেলেদের নৌকোর কাছে চলে যান। নৌকোর ইলিশ তাঁর চরণ স্পর্শ করে। তারপর গাড়ির ছাদে আইস বক্সে ডজন দুই/তিন আস্ত ইলিশ চাপিয়ে বাড়ি ফেরেন। বন্ধুবান্ধবরা যে যার কিনে নেওয়ার পর, নিজেদের সঞ্চয়ের ডজন খানেক নিয়ে শুরু হয় সংরক্ষণ পর্ব। বড় বড় প্লাস্টিকের ঠোঙার জামা পরিয়ে সব ক'টা মাছকে সযত্নে শুইয়ে দেন মস্ত ডিপ ফ্রিজে। তারপর তিন/চার মাস নিশ্চিন্ত। ইচ্ছে হলেই সর্ষেবাটা, ভাপা ইলিশ, নয়তো কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কার পাতলা ঝোল। এক একটি ইলিশ কাটলে অন্তত পনেরো/কুড়ি টুকরো মাছ পাওয়া যায়। স্বাদ, গন্ধে দেশের ইলিশের মতোই তো লাগে।

এমন হতে পারে, আমরা গঙ্গার ইলিশের স্বাদ ভুলে গেছি। হয়তো একদিন মাছের ঝোল রাঁধতেও ভুলে যায়। মাইক্রোওয়েভে সংক্ষিপ্ত সময়ে যা তৈরি করা যায়, ছেলেমেয়েরা আপত্তি না করে যা খেয়ে নেয়, শুধু সেইভাবেই বেকিং আর বয়েলিং করে যাব। আমি তো জন্ম বেকার। শেষ বয়সে কাজটা আরও পাকাপাকি হয়ে যাবে। আমাদের ছেলেমেয়েরা ক্রমশই নর্থ ইন্ডিয়ান রান্নার ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমেরিকাতেও ভারতীয় রেস্তোরাঁর ব্যবসা সেই পাঞ্জাবিদের হাতে। ছেলেমেয়েরা অন্যরকম রান্নার স্বাদ পেয়ে গেছে। কলেজ ক্যাম্পাসের ধারে কাছে এখন কত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট! ওরা তন্দুরি চিকেন আর চিকেন টিক্কা মাসালা, রেশমী কাবাব, চিকেন মাখনি আর ল্যাম ভিন্ডালুকে স্ট্যান্ডার্ড ভারতীয় রান্না বলে বিশ্বাস করে। আমেরিকান বন্ধুবান্ধব নিয়ে, অবাঙালি সহপাঠীদের নিয়ে 'ক্যাম্পাস ইন্ডিয়া'তে বসে বসে এইসব পদই খায়। মাছের ঝোল খাবে কে?

মাছ রান্নার মাইনাস পয়েন্ট ক্রমশই বেশি হয়ে যাচ্ছে। 'গন্ধ বিদায়' পর্ব তো আছেই। একসময় এ বাড়িতে মঙ্গলবারে মাছ ভাজা যেত না। এখন অবশ্য পিয়ানোর টিচার আসে না। তবু একটা মঙ্গলবারই বেছে নেব। মাছের রকমারি পদ রাঁধার বাংলা বইগুলো লাল শালু দিয়ে মুড়ে ফেলব। বেশ উজ্জ্বল কালি ঝরানো ফেলট পেন দিয়ে লিখে দেব—মৎস্যপুরাণ। তারপর ভক্তি ভরে তুলে দেব অ্যাটিকের ঘরে। পদাবলী, পুরাণাদি তো হামেশাই চালের বাতায় গোঁজা থাকত। মৎস্যপুরাণ থাকবে ছাদের ঘরে। কাঠের সিলিং-এর আড়ালে।

১৩ নভেম্বর ১৯৯৩

ক্রমশ অরন্ধন

রান্নার বই কেনার বাতিক থেকে নিজেকে একরকম মুক্ত রেখেছি বলা যায়। তবু কীভাবে যে দীর্ঘদিন ধরে দেশি, বিদেশি, বহুধারার পাক-প্রণালী আমার রান্নাঘরের ড্রয়ার থেকে ড্রয়ারে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে এক বিস্ময়। রোগা, মোটা বইয়ের চাপে ড্রয়ার খোলে তো বন্ধ হতে চায় না। ঠেলাঠেলি করে শুয়ে থাকে গ্রেট কুকিং আইডিয়াস, অভিনব রন্ধন শিক্ষা, অথেনটিক চাইনিজ কুকিং, লীলা মজুমদার আর কমলা চট্টোপাধ্যায়ের রান্নার বই, প্রেসার কুকার আর ফুড প্রসেসরের সঙ্গে ফোকটে পাওয়া রন্ধন পুস্তিকা, মাইক্রোওয়েভে নিমেষে রাঁধার সহজ পন্থার বই, ইওরোপিয়ান কুক বুক, মধুর জাফরির উত্তর ভারতীয় রান্না, লেডিজ হোম জার্নালের পুরনো কাটিং, অধুনালুপ্ত ইত্যাদি প্রকাশনীর প্রয়াত কন্যা সুকন্যা-র মোগলাই খাদ্য সম্বলিত সচিত্র ছিন্নপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আছে আটষট্টি সালের একখানা খয়েরি ডায়েরি। পুরুষের পাকস্থলীর ভেতর দিয়ে তার হৃদয় জয় করো—এই নির্দেশে অনুপ্রাণিত নববধূর নব নব কালেকশন...

হ্যাঁ, টোকাটুকি নিশ্চয়ই করেছি। তবে, রান্নার বই আর কিনিনি। উপহার টুপহারে কাজ চলে গেছে। ওই যে বহু ধারার পাক-প্রণালীর প্রবাহের কথা বলেছি, এবার তার উৎস সন্ধানে চলে যাই।

'ছেলের টিফিন', তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? উত্তর—জিলা তো একই বা। বিহারের পাটনা হইতে আসিয়াছি। আমার সংগ্রহশালায় সবচেয়ে পুরনো বইটির নাম ছেলেদের টিফিন। বহু যুগের ওপারের কথা তো। তখন মেয়েরা টিফিন খেত না। লেখিকার নাম—শ্রীমতী বীণাপানি দেবী সাহিত্য সরস্বতী। প্রকাশক—দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং। মূল্য এক টাকা। বাংলার ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত ওই বই আমার হাতে এল কী করে?

সরাসরি দৌহিত্রাধিকার সূত্রেই পাওয়া গেছে। অবশ্য কোথাও আমার নাম ধাম উল্লেখ নেই। সামান্য হলদে হয়ে যাওয়া কাপড়ের মলাট, পাতাগুলি জীর্ণ হয়ে এসেছে, এমন একখানি বইতে উপহারের জায়গায় ডবল করে কালো কালি বুলিয়ে লেখা হয়েছে—শ্রীযুক্তা প্রভাবতী প্রিয়তমাসু।

নাঃ, লেখক সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। কারণ, যে কোনও চিকিৎসকের মতোই আমার দাদামশাই-এর হস্তাক্ষরও ছিল রীতিমতো জড়ানো। তিনি ব্যক্তিগত চিঠিতে আবেগ প্রচ্ছন্ন রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের চিঠি লিখে নীচে নিজের নাম সই করতেন। সেই মানুষ ছেলেদের টিফিনে মুক্তোর মতো গোটা গোটা হরফে নিজের স্ত্রীকে 'প্রিয়তমাসু' লিখে পাশে আঁকাবাঁকা ঢেউ খেলিয়ে দেবেন—একেবারেই 'পেত্যয়' হচ্ছে না। হয়তো বইটি কিনে এনে দিয়েছিলেন। আর উৎসাহ ভরে তাঁর 'প্রিয়তমা'ই সম্ভবত নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। অথবা কৌতুকবশত তাঁর পুত্রবধূ, নয়তো কন্যারাও এমন কাজ করে থাকতে পারেন। মোট কথা, পাটনা জেলার রান্নাঘর থেকে বইটি নানা পথ ঘুরে আপাতত আমার হেফাজতে এসেছে। মাঝে মাঝে ইতিহাস পড়ার মতো ভক্তি নিয়ে বইখানার পাতা উলটে

দেখি। সের, 'পুয়া', ছটাকের ওজন ভুলে গেছি। সিকি তোলা গুঁড়ো হলুদ, আধ তোলা লঙ্কার গুঁড়ো—কতটুকু হয় আপনিও মোটেই জানেন না। বলুন তো দোবরা চিনি কাকে বলে? খামি বা খাম্বির মানে কী? আর জানলেই বা কী লাভ? লেখিকার কথামতো ব্রেড ট্যাবলেট কিনতে হলে আপনাকে চৌরঙ্গির 'ল্যাজারাস্ কোম্পানি' আর ধর্মতলার 'ম্যাডান কোম্পানি' প্রভৃতির দোকানে গিয়ে খোঁজ করতে হবে। ভূতপূর্ব বাজারে গিয়ে ভূতের মতো ঘুরে বেড়াবেন নাকি? বরং এ বই মহাফেজখানার জন্যে সযত্নে রাখা দরকার। উপকৃতও আমি কম হইনি। সবেদা মানে যে চালের গুঁড়ো, আগে কি জানতাম? তাড়ু মানে কী বলুন তো? দেদো মণ্ডার নাম শুনছেন? ছেলেদের টিফিন থেকে কয়েকটা রান্না তো শিখেইছি। উপরন্তু ভাষাজ্ঞানও বেড়ে গেছে।

অভিনব রন্ধন শিক্ষার লেখিকা আরতি দেবী। মলাটে ওই নাম। ভেতরে লেখা আধুনিক রন্ধন শিক্ষা। ১৩৭৫ সালে দেওয়ালির দিন প্রকাশিত হয়েছিল। মূল্য—তিন টাকা। ইনফ্রেশনের প্রভাব। বইয়ের ভেতরে পেনসিল দিয়ে অপটু হস্তাক্ষরে সমর্পণ—মাকে উপহার দিলাম, নব মিলন সংঘ।

দেশে সরস্বতী পুজোর মুখে পাড়ায় পাড়ায় রাতারাতি 'সংঘ' গড়ে ওঠে না? এরকমই একদল ছোট্ট ছোট্ট ছেলে পাড়ার আদি ক্লাব 'মিলন সংঘে' পাত্তা না পেয়ে নিজেরা নব মিলন সংঘ গড়েছিল। সামান্য চাঁদা আদায় করতে সকাল, বিকেল ঘুরে বেড়ায়। নিষ্ফল অভিযান। বয়সটাই তাদের প্রধান সমস্যা। চেয়ে চিন্তে যা জোগাড় হল, তা দিয়ে ছোট্ট একটি প্রতিমা হয়, তো প্রসাদ হয় না। প্রসাদ হয়, তো প্যান্ডেল হয় না। শেষে বড়দের দয়া হল। তবু সব কিছুর ব্যবস্থা করেও ঢাক, কাঁসির খরচ আর ওঠে না। আদি মিলন সংঘ নিজেদের ট্রাকে ওদের ছোট্ট ঠাকুর ভাসানও করিয়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু ঢাক ছাড়া কি সরস্বতী পুজো হয়? লক্ষ্মীপুজো তো নয় যে চাঁদার অভাব অনটনের কথা চেপে যাওয়া যাবে। সে পুজোর হট্টগোলের দরকার নেই। কিন্তু নব মিলন সংঘের প্রথম 'বাণী বন্দনা'য় ঢাক বাজবে না? দলপতির হাহাকার কান্নায় দ্রবীভূত হয়ে তার মা শেষে ঢাকের খরচও দিয়েছিলেন। পুজোর পরে তাদের হাতে এগারো টাকা উদ্বৃত্ত থাকায় তা থেকে সদলবলে আট টাকার জিলিপি খেয়েছিল। আর দলপতির মাকে তিন টাকা দিয়ে রান্নার বই কিনে দিয়েছিল।

নব মিলন সংঘের দেওয়া সেই হার্দিক উপহার আমেরিকায় এসে পৌঁছল কেমন করে? দলপতির মা তাঁর কন্যাকে বইটি দান করেছেন বলে। ওই বই দেখেও কিছু কিছু রান্না শিখেছি! তবে লজেন্স তৈরির উপকরণ হিসেবে 'একাসিয়া গঁদ', আর 'ট্রাগাকান্ত গঁদ' যে কী বস্তু বুঝতে পারিনি। গঁদের আঠার নাম 'ট্রাগাকান্ত' হয়, আপনি কি শুনেছেন?

উৎস সন্ধানে আর বেশি দূর যাব না। আসল কথা হল, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, নানা ভাবে এইসব রান্নার বই আমার ভাঁড়ারে ঢুকে বসে আছে। আজকাল বিশেষ খুলেও দেখি না। রান্নাঘর বিপ্লবের মূল মন্ত্র হল—রসনারে সামলে রেখো, সে যেন না উদব্যস্ত রাখে। শরীর স্বাস্থ্যের কথাও বিবেচনা করতে হয়। এ জন্যে আর অযথা পরিশ্রম বাড়াই না।

আমেরিকানদের বাড়িতেও একই অবস্থা। সকলেই সহজিয়া পন্থী হয়ে উঠেছে। রাঁধছে কম, অথচ বই জমাচ্ছে গাদা গাদা। প্রতি বছর অন্তত হাজার খানেক নতুন রান্নার বই প্রকাশিত হয়। বিক্রিও কিছু কমতি নেই। রান্নার বইয়ের ব্যবসা ভালভাবেই চলে এদেশে। বৈচিত্র্যের জন্যে কতরকম আবিষ্কার। কলা প্রেমিকদের রন্ধন প্রণালী-তে পাবেন কলা দিয়ে কী কী সুখাদ্য তৈরি করা যায়, তার দীর্ঘ ফিরিস্তি। ধরুন আপনাদের কলাবাগান আছে। এই বই হাতে পেলে শুধু কলার বিভিন্ন পদ খেয়েই বেঁচে থাকতে পারবেন। 'দ্য ব্যানানা লাভার্স কুক বুক'-এ শুয়োরের মাংস আর এক কাঁদি কলা চটকে অপূর্ব ব্যানানা হ্যাম লোফ তৈরির নমুনা দেওয়া আছে। মুশকিল হচ্ছে বইগুলোর এমন ঝলমলে চেহারা আর চড়া দাম করেছে যে, কিনেও আপনি চট করে ব্যবহার করতে চাইবেন না। রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে তেল, মশলার ছিটে লাগলেই তো হয়েছে! তার চেয়ে বুক শেলফে সাজিয়ে রাখা ভাল।

ইদানীং আমেরিকান মহিলাদের যে মোটে রান্নাবান্নায় মন নেই, এ সম্পর্কে নানা দিক থেকে সমীক্ষা ইত্যাদিও নেওয়া হয়েছে। আমেরিকাতে যত নতুন নতুন রান্নার বই বের হচ্ছে, অপটু রাঁধুনির সংখ্যা ততই বেড়ে যাচ্ছে। বলা যায় অজ্ঞ রাঁধুনিতে দেশ ভরে যাচ্ছে। সারা বছর মুদির দোকান আর কাঁচাবাজারে তাঁরা যা খরচ করছেন, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করছেন রেস্তোরাঁয় খেয়ে। গত বছরে মোট খাওয়ার খরচের শতকরা ২৯.৪ ভাগ (জাতীয় খরচ হিসেবে) ব্যয় হয়েছে শুধু রেস্তোরাঁর পেছনে। পনেরো বছর আগে এই বাবদ খরচ হত শতকরা ২১.৭ ভাগ। সে সময় মোট খাওয়ার খরচের শতকরা ৫৯.৩ ভাগ ব্যয় করা হত মুদির দোকান আর কাঁচা বাজারের জন্যে। এখন তা পৌঁছেছে ৫০.৬%-এ। অর্থাৎ রান্নার উপকরণ কেনার চেয়ে বাইরের তৈরি খাবার কেনার ঝোঁক বাড়ছে।

এদিকে বাড়িতে নতুন নতুন রান্নার বই আসছে, সর্বাধুনিক বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জামে রান্নাঘরের কাউন্টার ভরে যাচ্ছে, অথচ নিয়মিত রান্নার পাট নেই। এক সঙ্গে বসে প্রতি রাতে বাড়ির রান্না খাওয়ার রেওয়াজ আগের মতো আর বজায় থাকছে না। যাঁদের রান্নার সময় বা ইচ্ছে কোনওটিই তেমন নেই, তাঁরাই কিনে আনছেন দামি দামি ফুড প্রসেসর, এসপ্রেসো-কফি মেকার, রাইস স্টিমারস, স্লো কুকার, ইলেকট্রিক ফ্রাই-প্যান, পাসতা তৈরির মেশিন, চীনেদের কড়াই, রুটি তৈরির মেশিন এবং অন্যান্য নতুন নতুন সরঞ্জাম।

কারা রাঁধতে পছন্দ করেন না? এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে, সাধারণত বাইরের কাজে ব্যস্ত মহিলারা রান্নাঘরে বেশিক্ষণ সময় দিতে পারেন না। এক প্রফেশনাল মহিলা গত চার বছরে মোট ষোলোটি দামি দামি রান্নার বই কিনেছেন। আবার চাঁদা দিয়ে কয়েকটি 'সুখাদ্য' এবং 'মদ্য' পত্রিকার গ্রাহক হয়েছেন। খাদ্য সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ, মদ্য সংক্রান্ত তাবৎ তথ্য তাঁর চোখের সামনে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি গত চার বছরে গুছিয়ে রেঁধে উঠতে পারেনি। শেষবার নাকি ভালমন্দ রেঁধেছিলেন সেই '৯১ সালের বসন্তকালে। একেবারে ঋতুরঙ্গ। আপাতত সেই তাঁর লাস্ট সাপার। এদিকে গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেছে ক্রমে। গ্রামের মহিলারাও রান্নাঘর বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। তাঁদের ঘরে ঘরে নতুন নতুন রান্নার বই জমা হচ্ছে। অথচ ছোটখাটো চাকরির পরে আর রান্নাঘরে বসে থাকার সময় নেই। সকলের কথা বলছি না। কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে এরকম সময় ও

ইচ্ছের অভাব দেখা দিয়েছে।

অথচ আমেরিকাতে এতকাল পর্যন্ত রান্নায় উৎসাহী মহিলার সংখ্যা কিছু কম ছিল না। এদেশে সারাদিনের শেষে মাত্র একবারই বড় করে খাওয়ার ব্যবস্থা। ডিনার টেবিলে সপরিবারে বসে গৃহিণীর শ্রীহস্তের রান্না ও পরিবেশনে পরিতৃপ্ত হওয়া—এখনও এই হচ্ছে আদর্শ মার্কিন পরিবারের প্রতিচ্ছবি। অনেকের খাওয়ার ঘরের দেওয়ালে এ জাতীয় ছবিও টাঙানো থাকে। এইসব মহিলারা রান্নার বই দেখে রান্না শিখেছেন। দ্য জয় অফ কুকিং, দ্য ফ্যানি ফার্মার কুক বুক—পড়ে পড়ে কত শত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। মেয়েরা স্কুলে পড়ার বয়স থেকে মায়ের কাছে, ঠাকুমা, দিদিমার কাছে কেক, বিস্কুট, পাই, পেস্ট্রি কেক করা শিখেছে। স্কুলে হোম ইকনমিক্স কোর্স নিয়ে সংসারধর্মে ট্রেনিং পেয়েছে। ফলে এরা যখন বিয়ের পরে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়েছে, তখন বেশ তৈরি হয়েই এসেছে। রান্নাবান্নার পেছনে সময় দেওয়া, আগ্রহ, পরিশ্রম, সবই দৈনন্দিন কাজের মধ্যে স্থান পেয়েছে। রান্নার বই সংগ্রহ করার নেশা কিন্তু সেই তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। হয়তো স্ত্রীরা মনে করতেন—সারাদিন বাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়েছেন, সময় সাপেক্ষ রান্নাগুলো করেই বরং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাক। রোজগারপত্র করছেন না বটে। কিন্তু তাঁদের কর্মক্ষমতা কিছু কম নয়। রাতে খাবার টেবিলে স্বামী আর ছেলেমেয়েদের সুস্বাদু রান্না খাইয়ে তার প্রমাণ দেবেন। বেশ একটি আগ্রহ, উদ্দীপনার ব্যাপার ছিল তখন। প্রিয়জনদের খুশি করার জন্যে সারাদিনের প্রস্তুতি পর্ব। কিন্তু ক্রমশ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। একজনের উপার্জনে সাচ্ছল্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে ওঠার ফলে দু'জনকেই চাকরির প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হচ্ছে। শুধু আর্থিক প্রয়োজনেই নয়, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হার বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা কর্মজীবনেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রমশ ক্রমশ সংসারের কাজকর্ম নিয়ে বেশি সময় ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। রান্নার বই কেনা সত্ত্বেও তার ব্যবহারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

রান্নার বইয়ের প্রকাশকরা বলছেন—রন্ধন শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে ঘন ঘন এত বই লেখা হচ্ছে যে, প্রায় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। ব্যানট্যাম বুকস নামে প্রকাশক সংস্থা তো ভবিষ্যৎ লেখিকাকে রীতিমতো নিরুৎসাহ করে ছেড়েছে। লাগাতার এত রান্নার বই ছাপিয়ে ক্রেতাদের অর্থ নষ্ট করতে প্রকাশকেরই ঘোর আপত্তি দেখা যাচ্ছে।

তবে সব রান্নার বই-ই যে অকারণ ছাপা হচ্ছে এমন নয়। ডায়াবেটিসের রোগীর বিশেষ খাদ্য, মধ্য বয়স্কা মহিলার ঋতুবন্ধের পর উপযুক্ত খাদ্য ইত্যাদি বিষয়েও মোটা মোটা রান্নার বই লেখা হয়েছে। রান্নার বই যে কত বৈচিত্র্যময় হতে পারে তার কিছু উদাহরণ দিই। কারেজ বুকস নামে প্রকাশক সংস্থার একটি বইয়ের নাম দ্য সিভিল ওয়ার কুক বুক। ভাবছেন রান্না ঘরে খণ্ড প্রলয়? নাঃ, এ একেবারে কুরুক্ষেত্র পর্ব। আমেরিকান সৈন্যরা যখন লড়াইয়ের জন্যে বাইরে যাবে, তখন তারা কী কী রান্না খাবে, তারই ফিরিস্তি। ঐতিহাসিক তথ্যও মজুত আছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের সময় মিলিটারি ছাউনিতে কী কী পদ খেতে দেয়, কী কী রাঁধা সম্ভব, স্থানীয় খাদ্য তার মার্কিন রুচির সমাহারে কেমন করে নতুন নতুন পদাবলি রচিত হয়—এই নিয়েই খুঁটিনাটি তথ্য সাজিয়েছে। তবে উপকরণের মধ্যে

কেবলই আটা, ময়দার আধিক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। ঢেলা মার্কা বিস্কুট কীভাবে বানানো যায়, গুচ্ছের ময়দার পুলটিস দিয়ে শুয়োরের মাংসের 'পাই' কেমন করে তৈরি করতে হয়, রাঙা আলুর অনবদ্য পুডিং—এর পাক-প্রণালী, গাছের পাতার মার্কিন পকোড়া ভাজা—সব আপনি ওই বই দেখে শিখতে পারেন। আবার ছবির কী বাহার। নুনে মাখামাখি কচি বাঁদরের মাংস, পাঁউরুটি, অসমান টিপি—পাতায় পাতায় ছেপে দিয়েছে। সৈন্যরা নাকি খাবারের সব আজেবাজে নাম দেয়। ভিয়েতনামে গিয়ে পোকা ভর্তি পাঁউরুটি খেয়েছিল সেই কোনকালে। এখনও সে রুটির নাম 'ওয়র্ম কাসলস'।

একটা বইয়ের নাম কুকিং উইথ ফায়ার। এও ঐতিহাসিক রান্নার বই। ফেয়ার ফিল্ড হিসটোরিক্যাল সোসাইটি থেকে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। সতেরোশো শতাব্দীতে আগুনে ঝলসে কী কী রান্না হত, তার সচিত্র বিবরণ। এখনও প্রত্যেকটি পদ পরীক্ষা করে দেখা এবং খাওয়া যায়। রান্নার বর্তমান, ভবিষ্যৎ চুলোয় গিয়ে এখন অতীতের চুলো নিয়ে টানাটানি।

একটা বইয়ের নাম শুনবেন? গারাম অ্যান্ড সলসমেন্টা। গরম গরম কী কেস দেখা যাক। দাম করেছে ৮৫ ডলার। প্রকাশকের নাম ই জে ব্রিল। এদের আবার পচা মাছের ওপর খুব ভক্তি। প্রাচীন রোমান সভ্যতায় কী ভাবে দু'রকম মাছকে পচিয়ে, গেঁজিয়ে নিয়ে তোফা আচার বানানো হত—তারই আদ্যোপান্ত ইতিহাস। এরা মৎস্যাচারেই পাতা ভরিয়েছে। কুকিং উইথ রেজিস অ্যান্ড ক্যাথি লি-র লেখক লেখিকা টেলিভিশনের বিখ্যাত শিল্পীদের কাছ থেকে পদাবলি সংগ্রহ করেছেন। চলচ্চিত্র শিল্পীদের কাছ থেকে রান্না জেনে নিয়ে আপনারাও এরকম বই লিখলে কাটতি হবেই উত্তমকুমার যা যা ভাল বাসতেন নাম দিয়ে রান্নার বই লিখেই দেখুন না। অথবা সুচিত্রার রান্নাঘর নিয়েও কাজে নেমে পড়তে পারেন। ওই রেজিস আর ক্যাথি লি তো এই করে বড়লোক হয়ে গেছেন। এমন কিছু আহামরি রান্নাও নয় সে সব। নামের মাহাত্ম্যে কাটছে। কবে লুসিল বল বলেছিলেন—টার্কি মারসালাতে রসুন পাউডারের বদলে থেঁতো করে রসুনও দিতে পারো—তো সেই এক বেদবাক্য হয়ে গেল। এই সেদিন ক্যান্ডিস বার্গেন বলেছে—নোনতা বিস্কুটের ওপরে আলতো করে বাদামের মাখন মাখাবে। তারপর এক ফোঁটা স্ট্রবেরি জ্যাম ফেলে দাও। ব্যস! এই হয়ে গেল অবাক জলপান! ঢুকে গেল রেজিসদের রেসিপি বুকে! হলিউডের প্রভাব রান্নার বইতে কী ভাবে পড়েছে দেখুন। এত্রেন্দুল সিটি প্রেস প্রকাশ করেছে এমন একটি বই, যেখানে অতীতের খ্যাতনামা শিল্পীদের নিজস্ব উদ্ভাবন ছাপা হয়েছে। তাঁরা কবেই মারা গেছেন। কিন্তু সব দেশেই বিখ্যাত লোকেদের কিছু চ্যালা চামুণ্ডা থাকে তো। সেই চ্যালাদের বংশধররা, নয়তো বৃদ্ধ 'চামচা'রা প্রয়াত শিল্পীদের রন্ধন প্রণালী প্রমাণ সমেত উপস্থিত করছেন। হ্যাঁ, প্রমাণ দেখাতেই হবে। আপনার পিসিমার রান্নাকে তো আর সুপ্রিয়া দেবীর মালাইকারি বলে ছেপে দিতে পারেন না। আমার এত ভুল হয়ে যায় এসব ব্যাপারে! সুচিত্রা মিত্র ভীষণ ভাল রাঁধেন ওঁর কাছে একবার মহারাষ্ট্রিয়ান ছানার ভর্তা শিখেও অকুস্থলে একটা ছবি পর্যন্ত তুলে রাখা হয়নি। যাক গে, আমি তো আর রান্নার বই লেখার দুঃসাহস প্রকাশ করব না।

সিনেমার নাম দিয়েও রান্না বই লেখা হয়েছে। দ্য ক্যাসাব্ল্যাংকা কুক বুক, লাস্ট প্লেন আউট, গন উইথ দ্য উইন্ড আর দ্য উইজার্ড অফ অস নামে বইগুলোতে মাছ, মাংস আর কাঁকড়া, চিংড়ির বহু রান্না ছাপা হয়েছে। নামগুলো কেন দিয়েছে বলুন তো? ব্যঞ্জনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফল। গন উইথ দ্য উইন্ড বুক হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া পুরনো দিনের যত রান্না। আপনি চন্দ্রপুলি, সরু চাকলি, থোড় ছেঁচকি, মোচার ঘণ্টকে নব রূপে উপহার দিন না। বইয়ের নাম দিন হারানো সুর কিংবা চন্দ্রনাথ। দ্য উইজার্ড অফ অস কুক বুকে আছে আশ্চর্য সব সহজ রান্না। যা কিনা নিমেষেই এটা ওটা মিশিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায়। আপনার রান্নার বইয়ের নাম রাখুন—জাদুটোনা। পাতায় পাতায় কীভাবে ভূষিমাল দিয়েও মোগলাই খানা বানানো সম্ভব। এভাবেই ভারত বন্‌ধ-এর দিনকে স্মরণ করে লিখুন লাস্ট প্লেন আউট-এর ধাঁচে ভাঁড়ে মা ভবানী। আলু, পেঁয়াজ, ডিম আর চাল, ডালের ওপর ভিত্তি করে শ'খানেক পদরচনা করতে পারবেন না? বন্ধের দিনের জন্যে খুবই জনপ্রিয় হবে দেখবেন। তবে ছবি আঁকার শিল্পীদের তো মান মর্যাদা আলাদা। তাঁদের কিন্তু গুরুভোজনের বইতে ঢোকানো ঠিক নয়। বিমূর্ত ভাবনাকে রূপায়িত করতে বসেছেন যাঁরা, তাঁদের বড়জোর চা, কফির টেবিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়। এ জন্যে আমেরিকাতে জলখাবারের বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে মানেস টেবল, রেমব্রাঁস টেবল। এইসব বইতে আছে শিল্পীদ্বয়ের দ্বারা উদ্ভাবিত, পরীক্ষিত এবং আস্বাদিত প্রিয় জলখাবার ইত্যাদি। এ বছর প্রকাশিত হচ্ছে রেনোয়াঁস টেবল। আপনি নিশ্চয়ই খুব অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন? অবনী বৈঠক, যামিনী আসর, নন্দলাল চাতাল নাম যদি দেন, কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ফর্দ লেখার সময় আমাকে ভুলে যাবেন না। ওঁরা কী কী জলখাবার খেতেন বা আদৌ কখনও কিছু রেঁধেছিলেন কিনা, শিষ্যদের কাছ থেকে জেনে যাবেন। তারপর তো টোকাটুকি আর প্রচ্ছদ নির্বাচন।

অ-স্বাস্থ্যকর রান্না নিয়েও বেশ একজন জবরদস্তি এক বই লিখেছেন। তার বক্তব্য—স্বাদই হচ্ছে আসল। প্রতি রান্নায় মনের সুখে ঘি, মাখন, নুন, চিনি, চিজ আর যাবতীয় প্রাণিজ প্রোটিন ব্যবহার করতে শিখিয়েছে। বই এর নাম : ব্যাড ফর ইউ কুক বুক। জ্ঞানপাপী স্পেশ্যাল। কেবলই বলছে—ছাঁকা তেলে ভেজে খাও। পোচ নয়, সেদ্ধ নয়, স্টিমড নয়, বেকড, বয়েল্ড একদম নয়। অখাদ্য বর্জন করো। চর্বি দিয়ে আলু ভাজো। মুরগি ভাজা এমনি খাবে না। ওপরে মুঠো মুঠো বেকন ভাজা কুচিয়ে দেবে। কেক-এর ওপর আইসক্রিম চাপাবে। আইসক্রিম খাবে, সঙ্গে কেক ভেঙে ভেঙে মুখে দেবে। চর্বির ওপরে লেখকের দারুণ আসক্তি। যে কোনও খাবারের মধ্যেই একগাদা চর্বি মিশিয়ে দিতে বলেছেন।

এদেশে অধিকাংশ খাবারের প্যাকেটের পেছনে আপনি অন্তত দু-চারটি রান্নার রেসিপি ছাপা অবস্থায় পেয়ে যাবেন। আটা, ময়দার ঠোঙা থেকে শুরু করে, চালের প্যাকেট, সিরিয়ালের বাক্স, টিনে বন্দি খাবারের কৌটো, ফ্রোজেন ভেজিটেবিলের প্যাকেট, গুঁড়ো দুধের বাক্স—সর্বত্র নানা ধরনের রান্নার উপকরণ ও প্রণালী সংক্ষেপে লেখা থাকে। সাইমন অ্যান্ড শুমটার পাবলিশিং কোম্পানি এগুলো নিয়েই বই ছাপিয়েছে। নাম দিয়েছে—মোর ব্যাক অফ দ্য বক্স গোরমে। মোট ১২০টি রেসিপি আছে। শুধু সিরিয়াল দিয়েই কত জলখাবার বানানো যায়। কর্ণ ফ্লেক্স মিশিয়ে নানারকম রান্না হয়। সিরিয়াল দিয়ে বাঙালি

মহিলারা এখানে ডালমুট তৈরি করেন। রাইস পাক সিরিয়াল আর মোলাসিস অর্থাৎ আখের গুড় মিশিয়ে খইয়ের মুড়কি, মোয়া, তৈরি করা হয় পুজোর সময়। রাইস ক্রিসপি নামে মুড়ির ধরনের সিরিয়াল আর গুড় দিয়ে কেউ বানান মুড়ির মোয়া। হুইট পাফ সিরিয়াল আর মধু দিয়েও মোয়ার মতো মিষ্টি তৈরি করা যায়। সুতরাং সিরিয়ালের ব্যবহার অনেক ভাবেই হতে পারে।

গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে তার ওপর রান্না হয় শুনেছেন? ভিলার্ড বুকস কোম্পানি তেমন বইও ছেপেছে। দূর পাল্লার যাত্রীদের নাকি এ বই খুব দরকার হবে। অন্তত লেখিকার তাই ধারণা। গাড়ির বনেটের ওপর মুরগির রোস্ট করতে হলে মোট কত মাইল হু হু স্পিডে যেতে হবে, তার হিসেব দেওয়া হয়েছে। রান্নার জন্যে সময়ের হিসেব নয়, মাইলের হিসেব রাখতে হবে। এক এক গাড়িতে এক এক নিয়ম। আবার পথঘাটের প্রভাবও আছে। নদী বা সমুদ্রের ধার দিয়ে গাড়ি যখন ছুটবে, তখন যেন মাছ বা গেঁড়ি, গুগলির স্টু রান্না চাপানো হয়। কোস্টাল কুকিং। আবার ক্যানসাসের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় মাংসের স্টেক দমে চাপিয়ে দিলেই হবে। মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল হচ্ছে মাংসের বলয়। সেখানে গাড়ির ইঞ্জিনের উত্তাপে হ্যাম, পর্ক, বিফ, ভিল সেদ্ধ করতে করতে চলে যাওয়া যাবে। সত্যিই কি এরকম রান্না সম্ভব? লেখিকার বক্তব্য—রসরচনা হিসেবেই না হয় বইটা রান্নাঘরে শোভা পেল। বুঝুন একবার। রসনা নিয়ে রসিকতা। ট্রাফিক জ্যামে ভাপা ইলিশ বই লিখলে যা দাঁড়ায়।

রান্না সম্পর্কে রস রচনাও কিন্তু আছে। ক্রনিকল বুকস-এর রেসিপিস ফর ডিমারটার বইতে যত রাজ্যের হাস্যকর ঘটনা আর কার্টুনের ছড়াছড়ি। দশজনকে নেমন্তন্ন করে রাঁধতে ভুলে যাই। কার্টুনে আঁকা হয়েছে—দশজন নিমন্ত্রিত বিষ মুখ করে বসে আছে। কাঁচা মুরগি ডিপ ফ্রিজে চিৎ পটাং। মহিলা অসম্ভব সেজে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। ওই বইতে আরও একটা মুরগি ভোলার রান্না আছে। মহিলা বাজার ফেরত মুরগি পুরে দিয়ে এলেন লনড্রির ড্রাইং মেশিনে। আর বাড়ি এসে আগুনে ময়লা কাপড় ঢোকাচ্ছেন। ওদিকে পাড়ার লনড্রিতে ধুন্দুমার বেঁধেছে। এগুলো ব্যঙ্গাত্মক রচনা বই। আমাদের রান্নার প্রতি অনীহা লক্ষ করে লেখকের কষাঘাত! আইনস্টাইন যে ধরনের জাগতিক ভ্রান্তির জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন, আমাদের কি তা শোভা পায়? রান্না থেকে কান্না-তেই মেয়েদের জগৎ আর সীমাবদ্ধ নেই, এ যেমন সত্যি কথা, তেমন এত স্বীকার না করে উপায় নেই যে—রুটিন ভেঙে দেব মনে করলেই কার্যক্ষেত্রে তা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর যদি ভাবি—পরিবারের জন্যে শুধু নয়, নিজের জন্যও তো রাঁধতে হয়—তবে বোধহয় রান্নাঘর বিপ্লবের উত্তেজনা ঝিমিয়ে পড়বে। ঘুরে, ফিরে দায়িত্ব কিছু থেকেই যাবে। কাঁধে রাখবেন, না নামিয়ে দেবেন, সে আপনার বিবেচনা।

২৩ এপ্রিল ১৯৯৪

তেলের খোঁজে

এমন নাম দিলাম, যেন সদ্য অফ্-শোর ড্রিলিং সেরে এসেছি। গত বছর অ্যালাস্কা গিয়েছি, এ বছর মাথায় গামছা এঁটে মরুসাগর। নাঃ, তেলের খোঁজে অত দূর যাই না। জ্বালানির সন্ধানে সুপার বাজারে গিয়ে তেল, চর্বি, মাখন, মার্জারিনের লেবেল পড়ে পড়ে জ্ঞান সঞ্চয় করি। মাঝে মাঝে ডাক্তার আর ডায়োটিশিয়ানদের কাছে তৈল উপাখ্যান শুনি। রান্নার মাধ্যম নিয়ে আলোচনাচক্র শুনে আসি। শিব্রামের 'সরিষামর্দনের' মতো এ দেশে আছে ভুট্টামর্দন, তিলমর্দন, জলপাইমর্দন, তুলোর বীজমর্দন, চীনেবাদাম মর্দন, সবজি মর্দন, সূর্যমুখীবীজ মর্দন ইত্যাদি রকমারি তেল ব্যবসায়ীর বিবিধ সংগ্রহ। পেট্রোলিয়ামের চেয়ে এদের স্বাদ ভাল। ভ্যারাইটিও কত বেশি।

আমেরিকায় তেলতত্ত্ব ইদানীং পাঁজির তিলতত্ত্বের মতোই কৌতূহল সৃষ্টি করছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সুপার বাজারে মহিলাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করছে। মাখন, তেল, বনস্পতি, মার্জারিন—কে যে কী ব্যবহার করবে—সে এক ধাঁধা। লাল মাংস, ফ্রায়েড ফুড, আইসক্রিম খাওয়ার সুখ তো আগেই ঘুচেছে। এখন আবার তেল নিয়ে তুলকালাম। কোন মর্দনে যে কী ধরনের ফ্যাট লুকিয়ে আছে, না জানলেই বিপদ। এতকাল 'স্যাচ্যুরেটেড' লেখা তেলের টিন বাতিল করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল। এখন শুনছি 'পলি-আন্‌স্যাচ্যুরেটেড' তেলও নাকি সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। সরর্ষের কারবার নেই। তবু সে তেলের মধ্যে ভূত!

গত বছর মার্জারিন খাওয়া নিয়ে হুলস্থূল হয়েছে। মাখনের চেয়ে মার্জারিন নিরাপদ শুনে গত দশ পনেরো বছরে ওই বিকল্পই চালিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য মাখন ছেড়েছি এমন নয়। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন যথেষ্টই হয়েছে। আর এতখানি ত্যাগ স্বীকারের পরে শুনছি মার্জারিন নাকি বেশি ক্ষতিকর! হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াল্‌টার উইলেট বিস্তর গবেষণার শেষে এই খবর দিয়েছেন। মার্জারিন বেশি খেলেই নাকি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে।

আমেরিকান খাদ্য তালিকায় ফ্যাটের পরিমাণ আগের তুলনায় এমনিতেই কমে এসেছে। এখন সারাদিনের খাদ্য তালিকায় শতকরা ৩৪ ভাগ ফ্যাট বরাদ্দ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন' সন্তুষ্ট নয়। তারা বলছে—মোট খাবারের শতকরা তিরিশভাগ পর্যন্ত ফ্যাট রাখা যেতে পারে। তার বেশি নয়। স্যাচ্যুরেটেড ফ্যাটই (যা বেশি ক্ষতিকর) হক আর আন-স্যাচ্যুরেটেড ফ্যাট্‌ই হক—পরিমাণ এর চেয়ে বাড়ানো উচিত নয়।

স্যাচ্যুরেটেড (সম্পৃক্ত) ফ্যাট্ থেকে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গিয়ে হৃদরোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। প্রাণীজ প্রোটিন অর্থাৎ মাংস, ডিম, চর্বি থেকে তৈরি তেল, ঘি, দুধ, মাখন ছাড়াও নারকেল তেল আর তালের তেল (পাম্ ওয়েল) এই অর্থে বিপজ্জনক কোলেস্টেরলের (লো-ডেন্‌সিটি লিপো প্রোটিনের) মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আর আন্-স্যাচ্যুরেটেড ফ্যাট অর্থাৎ যা প্রধানত তরি-তরকারি থেকে তৈরি করা হয়, তার

প্রভাবে রক্তে ওই কোলেস্টেরলের মাত্রা তেমন বাড়ে না।

কোলেস্টেরল শরীরের প্রোটিনকে কেন্দ্র করে হয় হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, নয় তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এ কথাও ঠিক, ডায়েটই হাই কোলেস্টরল হওয়ার একমাত্র কারণ নয়। দেখা গেছে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রক্তে হাই কোলেস্টেরলের মাত্রা নামানো যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ওষুধ দিয়ে কমাতে হচ্ছে। এর কারণ চিকিৎসকদের মতে—পারিবারিক ধারা। অন্যান্য অনেক রোগের মতো হাই কোলেস্টেরল ও বংশগত উপসর্গ, যা কিনা সব সময় খাদ্য নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে না।

আমেরিকায় ষাটের দশক থেকেই ফ্যাট নিয়ে খাদ্য সচেতনতা শুরু হয়েছিল। পলি-আন-স্যাচ্যুরেটেড অয়েল বলতে ভুট্টার তেল আর স্যাফ্লাওয়ার অয়েল (বনফুলের তেল) খুব বিক্রি হতে শুরু করেছিল। এদের গুণ বলতে এল.ডি.এল. কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে উপকারী প্রোটিন এইচ. ডি. এল. (হাই-ডেনসিটি লিপো প্রোটিন) এর মাত্রাও কমিয়ে দেয়। যেন হরেদরে লাভ বিশেষ হচ্ছে না।

এরপর এল মনো-আন্স্যাচ্যুরেটেড অয়েল.এর যুগ। অলিভ অয়েল আর ক্যানোলা অয়েল এর গুণ নিয়ে প্রচার শুরু হল। ক্যানোলার শিশির গায়ে দেখেছি হলুদ রঙের বনফুলের ছবি। ফুলেল তেল দিয়ে রান্নাও শুরু করেছি। যাই হোক, মনো-অন-স্যাচ্যুরেটেড তেল সম্পর্কে পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে—এ তেল দুদিকই সামাল দেয়। একদিকে যেমন এল.ডি.এল-এর মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি এইচ.ডি.এল-এর মাত্রাও ঠিক রাখে। অলিভ অয়েল হচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য তালিকার প্রধান উপাদান। হৃদরোগ ছাড়াও ব্রেস্ট ক্যানসার প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রেও নাকি অলিভ অয়েলের কিছু অবদান আছে। তবে এ নিয়েও এখনও সেভাবে গবেষণা হয়নি। দুটি স্টাডির ফলাফল থেকে এই পর্যন্ত জানা গেছে।

উপকারী তেলের ফর্দ এখানেই শেষ নয়। মাছের তেলে পাওয়া গেছে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। সেও নাকি হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারে। আমরা মাঝে স্বাস্থ্যরক্ষার চিন্তায় স্রেফ ঝর্ণার জলে ভেজানো টিনবন্দী টুনা ফিশ কিনছিলাম। তখন তেলে ডোবানো টুনা ফিশের চাহিদা কমে গিয়েছিল। এখন আবার ওমেগা-থ্রির মাহাত্ম্য জেনে 'টুনা ইন্ অয়েল' খুব বিক্রি হচ্ছে। 'জলের দর' কমে গেছে। তেলের খাতির বেড়েছে। আঁশটে গন্ধ টুনা, স্যামন তেলের গুণেই মান পেয়েছে। এছাড়া আছে উপকারী উপাদান অ্যাল্ফা লাইনোলেনিক অ্যাসিডের দ্রব্যগুণ। তার জন্যে আবার ওই ক্যানোলা তেলই কিনতে হবে। সয়াবিনের তেল, কিছু সবজি আর বাদামেও ওই অ্যাসিড থাকে। এসবই হৃদরোগের সঙ্গে লড়াই করতে পারে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন তেলের গুণাগুণ পরীক্ষার পাশাপাশি মার্জারিন নিয়েও গবেষণা চলছিল। গত বছর হার্ভার্ড এর এই গবেষণা সবাইকে চমকে দিয়েছে।

শুধু তো মার্জারিনই নয়, হাইড্রোজেনেটেড অয়েল দিয়ে তৈরি খাবার ও ঘন ঘন খাওয়া উচিত নয়। প্যাকেটে বন্দী কেনা জলখাবার বলতে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, মিষ্টি বিস্কুট, নোনতা

বিস্কুট—অনেক জিনিসই ওই তেল দিতে তৈরি হয়। সুপার বাজারে বারো মাস সাজিয়ে রাখা কেক, পেস্ট্রি, রোল ইত্যাদির বাক্সে লেখা থাকে কি তেল বা কুকিং মিডিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশই মাখনে তৈরি হলেও ফ্যাটবর্জিত সেকশনে বহু বিকল্প জিনিস সাজিয়ে রাখে। তার মধ্যে কিছু কিছু খাবার হাইড্রোজেনেটেড অয়েল দিয়ে তৈরি বলে লিখে দেয়। প্রথমে দেখবেন 'লো ইন্ স্যাচ্যুরেটেড ফ্যাট' বলে লিখে দিয়েছে। তার নীচেই স্বীকার করছে হাইড্রোজেনেটেড অয়েল মিশিয়েছে। 'স্ট্যান্স্ প্যাটি অ্যাসিড্স্' নামে অস্বাস্থ্যকর উপাদানে তৈরি ওই খাবার কিন্তু মোটেই নিয়মিত কেনা ঠিক নয়।

'দ্য সেন্টার ফর সায়েন্স ইন দ্য পাবলিক ইনটারেস্ট' থেকে এ বিষয়ে প্রতিবাদ উঠেছে। ওই কেন্দ্র 'ফেডারেল ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনস্ট্রেশন'কে অনুরোধ করেছে যে—ভবিষ্যতে 'ট্র্যানস্ ফ্যাটি অ্যাসিডস্' যুক্ত খাবারের বাক্সের গায়ে অবশ্যই যেন 'স্যাচ্যুরেটেড ফ্যাট দিয়ে তৈরি' বলে লিখতে বাধ্য করা হয়। তবেই ক্রেতারা বুঝেশুনে কিনবেন। ওই অ্যাসিড-এ এত ফ্যাট আছে যে খাবারের গায়ে 'লো ইন্ স্যাচ্যুরেটেড ফ্যাট' লেখা কখনই চলবে না।

তবে সায়েন্স সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে মাখনের তুলনায় মার্জারিন নিরাপদ। ফ্যাট অনেক কম। কিন্তু একেবারে যে নির্ভেজাল, স্বাস্থ্যকর খাদ্য, তা ঠিক নয়।

ফ্যাট যুক্ত খাবারের বিপক্ষে প্রবল মতামত দিয়েছেন কার্ডিয়াক রিসার্চার ডক্টর ডিন অরনিশ। তিনি ডায়েট নিয়ন্ত্রণের ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য—মার্জারিন তো একমাত্র সমস্যা নয়। আসল সমস্যা হল গরগরে রান্না খাওয়ার লোভ। তৈলাক্ত রান্না, ভাজাভুজি, মাখন, কেক, পেস্ট্রি, চকলেট, আইসক্রিম—হার্ট ভাল রাখতে গেলে ওই সবই নামমাত্র খাওয়া উচিত। বাদ দিতে পারলে সবচেয়ে ভাল। পিত্জার ওপর চিজ-এর গাদি কমিয়ে দিলে, স্যালাডের ওপর থক্থকে ড্রেসিং দেওয়া বন্ধ করলে, ফ্রুট স্যালাডে ক্রিম ঢালা থেকে নিরস্ত হলে অনায়াসে অন্তত শতকরা দশ ভাগ ফ্যাট কম খাওয়া সম্ভব। আসলে ফ্যাট মানেই হচ্ছে মুখরোচক সংযোজন।

স্যালাডে অলিভ অয়েল মিশিয়ে খেলেও দেখা যাচ্ছে মাখন, মার্জারিনের মতোই এক চামচে যাচ্ছে। কোলেস্টেরল না বাড়ুক ওজন বাড়বেই।

হৃদরোগের সম্ভাবনার কথা ভেবে তবে কি যাবতীয় সুখাদ্য ত্যাগ করতে হবে? বিশেষজ্ঞরা অনেকে বলেছেন—মাত্রা বজায় রেখে সব কিছুই খাওয়া চলে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্যরুচি অনুযায়ী রুটি, মাংস, পাস্তা, শাক-সবজি, প্রচুর ফল, অলিভ অয়েলের সঙ্গে অপর্যাপ্ত চিজের পরিমাণ যদি কমানো যায়, তাহলেই স্বাস্থ্যকর খাওয়া হবে। সঙ্গে লাল আঙুরের মদও হয়তো রক্ষাকবচের কাজ করতে পারে। আবার এশিয়ার লোকেদের ভাত, তরকারি, মাছের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দুগ্ধজাত খাবার খেলে ক্ষতি নেই। মোট কথা ফ্যাট-এর মাত্রা বাড়ানো ঠিক নয়।

আমিও একটা ছোটখাটো তেলের দোকান দিয়েছি। অবশ্য আমার স্টকে নারকোল তেল, রেপসিড অয়েল কিংবা বাদাম তেল কখনও ছিল না। এখনও নেই। যা আছে, তার মধ্যে ক্যানোলাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছি ইদানীং। বনফুল মর্দন দিয়ে যাবতীয় রন্ধন

চলছে। অলিভ অয়েল, স্যালাড অয়েল, সেসিমি অয়েল এমন কি চীনে পট্টি থেকে রেড চিলি অয়েলও এনে রেখেছি মাঝে মধ্যে ইটালিয়ান নয়তো চীনে রান্নার কাজে লাগে। ভুট্টার তেল তো এই সেদিনও এনেছি। এখন বনফুলের জন্যে ভুট্টা মার খেয়েছে। হ্যাঁ, 'সরিষামর্দন'ও আছে। আগে আগে এখানকার ভারতীয় দোকান থেকে 'এরোপ্লেন মার্কা' এক শিশি সরষের তেল কিনে আনতাম। নয়তো বোম্বাই থেকে আমদানি করা লক্ষ্মী ব্র্যান্ডের তেল। কিন্তু সে যে আসলে কিসের তেল বুঝে উঠতে পারিনি। ফ্যাকাশে হলুদ রঙের ট্যাল্‌ট্যালে চেহারা। ঝাঁজ, গন্ধের বালাই নেই। কিছুদিন পড়ে থাকলেই চটের বস্তামার্কা অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরয়। পরে খেয়াল করে দেখেছি শিশির গায়ে লেখা থাকে 'মাস্টার্ড ফ্লেভার্ড ব্লেনডেড অয়েল।' তার মানে ঘানির খাঁটি সরিষার তৈল আদপেই নয়। তেলের কক্‌টেলে সামান্য সরষের ফোড়ন দিলে যা হয়। বিরক্ত হয়ে এরোপ্লেনের তেল কিনে আনা বন্ধ করেছি। এখন ইঞ্জিনের তেল খাই। আসল এরোপ্লেনে চাপিয়ে নিয়ে আসি কলকাতার লেক বাজারের ইঞ্জিন মার্কা সরষের তেল। প্লাস্টিকের এক বোতল আনলে এক বছর চলে যায়। টুথপেস্টের স্টাইলে টিপে টিপে খরচ করি। বছর বছর নতুন ইঞ্জিন নিয়ে চলে আসি। হ্যাঁ, এত যে তেলের ফিরিস্তি দিলাম এ দেশে আমরা বাঙালিরা কেমন তৈলাক্ত আছি দেখা যাক। সারা সপ্তাহ দরাজ হস্তে তেল ঢালার উপায় নেই। এক তো তরিবতের রান্নার সময় নেই। তার ওপর ছেলেমেয়েরা তেল চায় না। রান্নার ওপর সামান্য তেলের ছায়া দেখলে 'গ্রিজি ফুড' বলে নাক শিঁটকোবে।

কিন্তু এ তো গেল পারিবারিক স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্যে কৃচ্ছসাধন। সামাজিক জীবনে কুকিং মিডিয়ামের ভূমিকা কী? ওঃ, সে এক উষ্ণ প্রস্রবণ! অভিবাসী বাঙালি প্রত্যেক উইক এন্ডে গড়ে দুটো করে নেমন্তন্ন খায়। কোলেস্টেরল এখন হৃদয়ের ভূষণ। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলেই মুখে মুখে এল.ডি.এল-এর হিসেব। অবশ্য সকলেই যে ভারাক্রান্ত, তা নয়। তবে যাদের কাউন্ট আড়াইশো ছুঁয়েছে, তারা এল.ডি.এল-কে শায়েস্তা করার জন্যে 'জোকর' কিংবা 'মেভাকোর' ট্যাবলেট খাচ্ছে। ফ্যাট ফ্রি ডায়েট, হেলথ্ স্পা, বাড়িতে ফ্রি হ্যান্ড, ঘরের মধ্যে টিভি দেখতে দেখতে বন্‌বন্ বেগে ঘণ্টি দেওয়া সাইকেল চালানো (ব্রেক দেওয়া সাইকেল অবশ্য), টেনিস, ওয়েদার বুঝে পাড়ার মধ্যে হন্‌হন্ করে হাঁটতে যাওয়া—ব্যায়ামের ব্যাপারে অনেকেই ভারী সিরিয়াস। গাড়ির ওপর নির্ভরশীল জীবনযাত্রা। হাঁটাচলা তো সেরকম হয় না। তার ওপর বারো মাসে তেরো পার্বণে নেমন্তন্ন পেয়ে অতিরিক্ত তেল মশলা দেওয়া রান্না, ভাজাভুজি, আর দই, মিষ্টি খাওয়া। সঙ্গে উইক ডে-তে বিজনেস লাঞ্চ, ডিনার কনভেনশন—বোঝার ওপর শাকের আঁটি তো আছেই।

গত কুড়ি, পঁচিশ বছর ধরে এই চলছে। ইদানীং রান্নার ধরন বদলানো চেষ্টাও হচ্ছে অবশ্য। তবে বড় বড় অনুষ্ঠানে তো আর ঘরোয়া রান্নাবান্না হয় না। কেটারিং-এর রান্না কেমন হয় সে তো জানেন। পাঞ্জাবি রেস্তোরাঁ, তেল-ঘি আর হেভি ক্রিম ছাড়া কিছু ঢালবেই না। এ দেশে আসার পর প্রথম প্রথম অনুষ্ঠান বলতে ছিল বাচ্চার জন্মদিনের পার্টি। তখন কেটারিং এর সুবিধে ছিল না। বাড়ির রান্নাই প্রশস্ত ছিল। এখন প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, বেবি শাওয়ার (মার্কিন প্রথায় সাধ ভক্ষণ), ব্রাইডাল শাওয়ার,

(আইবুড়ো ভাত), বিয়ে, স্কুল পাস করার গ্র্যাজুয়েশন পার্টি, সুইট সিক্সটিন, কলেজ পাস করার গ্র্যাজুয়েশন পার্টি, পঁচিশ বছরের বিবাহ বার্ষিকী, পুরুষদের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন (বউ ও ছেলেমেয়েদের উদ্যোগে সারপ্রাইজ পার্টি), নতুন বাড়ি কেনা উপলক্ষে হাউস ওয়ার্মিং, বিয়ের এনগেজমেন্ট পার্টি, ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণ পুজো, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বন্দনা, বারোয়ারি দুর্গোৎসব (একমাস ধরে), বারোয়ারি সরস্বতী পুজো (দু'মাস ধরে), কালীপুজো, ক্রিসমাস পার্টি, নিউ ইয়ার্স পার্টি—খাওয়াদাওয়ার বহরটা চিন্তা করে দেখুন। এর ওপর আছে আরও গুরুভার। অচেনা অজানা বাড়িতে শ্রাদ্ধশান্তি নয়তো তাদের বাবা মার বাৎসরিকের জন্য ডাক পেয়ে উপস্থিত হওয়া। স্পর্শকাতর ইস্যু। খেতে না চাইলেও উপরোধে পড়ে ছানার ডালনা, ধোঁকার ডালনা, ঘি ফোড়ন দেওয়া চাপ চাপ ডাল, ওপরে ভাজা নারকোলের কারুকার্য! এল. ডি. এর কাউন্ট যে এখনও কেন হাজার দু'হাজারে পৌঁছয়নি—সে এক মিরাকল।

তবে, ওই তেলের নিত্য ব্যবহার দিয়ে প্রসঙ্গ শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাই। অভিবাসনের প্রথম পর্বে বাঙালি খুব করে ঘি, মাখন খেয়েছে বলেই আমার ধারণা। বাড়ির রান্নাবান্নার জন্যে ক্রিস্‌কো কোম্পানির ভেজিটেবল অয়েলের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। মাখন লাগিয়ে বাড়িতে ঘি তৈরি হত। এখন ভারতীয় দোকানেই পাওয়া যায়। শার্টেনিং নামে ডাল্‌ডার মত বনস্পতি দিয়ে আমাদের বাঙালি খেত খাস্তা লুচি। মাঝে মাঝে তাই দিয়ে কচুরি, সিঙ্গাড়া আর পান্তুয়া ভাজত। এখন ওই সব 'মিডিয়াম' বিষবৎ পরিত্যজ্য হওয়াতে আর বাড়িতে ঢোকে না। ভেজিটেবল অয়েল যুগ শেষ হয়েছিল সত্তর দশকের শেষাশেষি। আশিতে আসিল ভুট্টা সভ্যতা। বেশ অনেকদিন রাজত্ব চালিয়েছিল। ভুট্টা সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ফুলেল তেলেল আক্রমণ। বনফুল যুগ চলেছে এখন। লক্ষ করে দেখুন তেলের বিবর্তনে 'সরিষামর্দন' কিন্তু ঠিক ধোপে টিকে আছে। আপনারা যে 'রিফাইন্ড, টিফাইন্ড' কত কী ব্যবহার করছেন, তাও এক শিশি সরষের তেল কি রান্নাঘরে রাখেন না? আমরা বিদেশের বাঙালিরা যে এত তেলের যুগ পার হয়ে এসেছি, তবু 'সিরিষামর্দ্দন চক্রবর্তীকে' ভুলিনি। হাজার শিশির ভিড়ে 'ইঞ্জিন' লুকিয়ে থাকে। তবু যেদিন ঢাকনি খুলি—কী ভীষণ তেজ বিকিরণ করে। কবে কোন কলুপাড়ায় সরিষা মর্দন হয়েছিল! ইঞ্জিনে চড়ে এসে এখনও কী দাপট! নাক চোখ ঝাঁ ঝাঁ করে। 'গর্জন তেল' কে নমস্কার করি।

২৬ আগস্ট ১৯৯৫

লক্ষ্মীবারে পক্ষীভোজন

প্রতিবছর নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে থাকে থ্যাংকস গিভিং হলিডে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর উৎসব। চারদিনের ছুটিতে পারিবারিক ও সামাজিক সম্মেলনে পক্ষীভোজন। রামপাখির বদলে অ্যামপাখি! আমেরিকাতেই তো টার্কির সবচেয়ে কদর। এদেশে ঔপনিবেশিক আমলের ঐতিহ্য অনুযায়ী নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবার হচ্ছে থ্যাংক গিভিং ডে। ওই দিন সপরিবারে টার্কি খাওয়ার প্রচলন ক্রমশ অভিবাসী সমাজেও জনপ্রিয় হয়েছে। ক্রিসমাসের মতো থ্যাংকস গিভিং হলিডে আমাদের সারা বছরের পালাপার্বণের তালিকায় ঢুকে গেছে। ঘরে ঘরে রোস্ট টার্কি ও আনুষঙ্গিক নিয়ে জব্বর খাওয়া দাওয়া। ভোজ কয় যাহারে। গুরুবারে গুরুভোজন শুরু করার আগে কিঞ্চিৎ ঈশ্বরভজন। ওই, ধন্যবাদজ্ঞাপন আর কি?

সবাই যে রাতারাতি সাহেব হয়েছিলাম, তাও নয়। শাকাহারি ভারতীয়রা তো টার্কি ডিনারের স্বাদ, গন্ধই জানে না। তা বলে সহিংস সম্প্রদায় কেন বঞ্চিত হব ভোজনে? দেশে থাকতেই বালিহাঁস, পাতিহাঁস দিয়ে যারা হাঁসের বংশ উজাড় করেছে, তারা বিদেশে এসে টার্কির অংশ খেয়ে দেখবে না? তাছাড়া পুত্রকন্যাদের ব্যাপারও তো আছে। তাদের চোখে মেঘ করিলে মোদের চোখে আসে জ...ল। সে কোন কালের ঘটনা। থ্যাংকস গিভিং হলিডের পরে স্কুলে গিয়ে একটি ছোট্ট মেয়ের কী দুঃখ! তখনও তাদের বাড়িতে টার্কি ঢোকেনি। পাঁচ বছরের মেয়ে বাড়ি ফিরে কেঁদে কেঁদে বলেছিল—টিচার জিজ্ঞেস করল—কে কে গ্র্যান্ড মার বাড়ি গিয়েছিলে? সবাই হাত তুলল। আমি তুললাম না। টিচার জিজ্ঞেস করল— কে কে টার্কি রোস্ট করার সময় হেল্প করেছ? কী সাইড ডিশ বানিয়েছ? কতজন হাত তুলল। আমি তুললাম না। আমার গ্র্যান্ড মা নেই, আমি টার্কি খাইনি...।

সেই ছোট্ট মেয়ের কান্না দেখে পরের বছর থেকে তার মা থ্যাংকস গিভিং ডে-তে টার্কি রান্না করা শুরু করেছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে। ভদ্রমহিলা এখন নিজেই গ্র্যান্ড মা। তাঁর ছেলে, মেয়েরা সপরিবারে থ্যাংকস গিভিং ডিনার খেতে আসে। এভাবেই পক্ষীভোজন অনেক ভারতীয় পরিবারের প্রথা হয়ে গেছে।

প্রতিবছর লক্ষ্মীবারে পক্ষীভোজন হয় বটে, কিন্তু বুধবার থেকেই ছুটির মেজাজ বোঝা যায়। এয়ারপোর্টে লম্বা লাইন। ট্রেন স্টেশনে ভিড়। হাইওয়েতে প্রত্যাশিত যানজট। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি আসছে। মধ্যবয়স্ক মানুষজন সপরিবারে বৃদ্ধ বাবা, মায়ের বাড়ি যাচ্ছে। নয়তো তাঁরা আসছেন। সুপারবাজারে শেষ মুহূর্তেও টার্কি কেনার হুড়োহুড়ি। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অনুযায়ী কেউ কিনেছেন পঁচিশ পাউন্ড ওজনের টার্কি। কেউ কিনছেন ছোটখাট এগারো পাউন্ডের পাখি। সবই মুণ্ডচ্ছেদের পরে সাফ-সুতরো অবস্থায় প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে সিল করা। ডিপ ফ্রিজে ঢোকালে সেই হিম শরীরকে নরম করতে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা লেগে যায়। তারপরেও ছোট গাদার মতো একজোড়া ঠ্যাং পেটের সঙ্গে সেঁটে বসে থাকে এ জন্যে বুধবার টার্কি কিনে এনে ডিপ-ফ্রিজে না ঢুকিয়ে একেবারে ভিনিগার, পেঁয়াজের

রসে ভিজিয়ে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলে সুবিধে। পরদিন আভন-এ পাঁচ ঘণ্টায় বেকড হয়ে যায়। বেক করার আগে গলার ভেতর দিয়ে পেটের খোলে মাখন আর স্টাফিং ভরে দিলে সে সবও অন্তরে অন্তরে মাখো মাখো হয়ে ওঠে। ডিনার টেবিলে ছুরি দিয়ে পাখির পেট কাটার পরে সুস্বাদু স্টাফিং বেরিয়ে আসে। টার্কি ডিনারে সাইড ডিশ বলতে ক্র্যানবেরি সস, দুধ আর মাখন দিয়ে চটকানো আলু সেদ্ধ, টার্কির ব্রথ দিয়ে তৈরি গ্রেভি (সঙ্গে চিকেন ব্রথও, মেশানো যায়) সুইট পোট্যাটো অথবা ইয়্যাম স্যুফলে, স্যালাড ও রুটি।

টার্কির ওজন সম্পর্কে সঠিক আন্দাজ না থাকায় প্রথম প্রথম 'উদ্বৃত্ত' আতঙ্কে ভুগেছি। আড়াই জনে মিলে ঢাউস ওই পাখির মাংস শেষ করা যায়? বকরাক্ষস নাকি? পরের বার আত্মীয়স্বজন, ডেকেও বোঝা নামাতে পারি না। কারণ তারাও মহা উৎসাহে আস্ত টার্কি বেক করে এনেছে। তার পরের বছর আনুষঙ্গিকের নাম করে মাংসের চপ, ফ্রায়েড রাইস, নুডলস নিয়ে হাসি হাসি মুখে ঢুকছে। থ্যাংকস গিভিং মানেই নাকি সবাই একটু কিছু রাঁধবে। আমি কেক বেক করে রাখি তো এক আত্মীয়া স্বরচিত 'পাম্‌কিন পাই' নিয়ে ঢোকেন। হলদে রঙের পাকা কুমড়োর গ্যাদগেদে মিষ্টি। আনুষঙ্গিকের চাপে গোদা পাখির ভগ্নাংশ পড়ে থাকে। ছেলে, মেয়েরা যতই টার্কি টার্কি করে অস্থির হোক, ও মাংসের স্বাদ কিছু আহামরি নয়। আনুষঙ্গিকের বহর দেখে বাবা, মা'রা অনেকেই তখন মাংসের চেয়ে সাইড ডিশ বেশি খায়।

ভুল করে জটায়ুমার্কা মস্ত পাখি কিনে কম পণ্ডশ্রম গেছে আমার? লেফট ওভার নিয়ে কাকস্য পরিবেদনা! প্রায় মশলাবিহীন সাদাটে মাংসের ঢ্যাবলা তিনদিন ধরে কেউ খাবে না বুঝে স্যান্ড-উইচে চালিয়েছি। খানিক চটকে নিয়ে চপ বানিয়েছি। টার্কির টুকরো দিয়ে স্যুপ। কখনও একথালা চাও-মিন। কোনওটা পদের হয়নি। আসলে অত বড় পাখির মাংস বেক করার পরে প্রথম দিনে যেমন স্বাদ গন্ধ থাকে, পরে আর তেমন থাকে না। নেহাত ঘোর মাংসাশী না হলে ওই ফ্যাকাশে মাংস লাগাতার খেয়ে যাওয়া অসম্ভব।

এইসব দেশে শুনে থ্যাংকস গিভিং ডিনারের পর্ব কিছুটা বদল করা হল। আমেরিকানদের মতো আমাদের সকলেরই তো আর নিকট আত্মীয়স্বজন কিংবা কুটুমবাড়ি নেই। অথচ প্রথা বজায় রাখতে গিয়ে প্রত্যেকেই খেটেখুটে মরছি। শেষে মাংস ফেলা যাচ্ছে। তখন আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নয়তো কাছাকাছি আত্মীয় যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়ে পুল পার্টির মতো করে থ্যাংকস গিভিং ডিনার শুরু করলাম। এক এক বছর একজনের বাড়িতে হয়। তবে ওই কুড়ি-পঁচিশ জনের বেশি নয়। লোকের আন্দাজে টার্কি বেক করেন সেই বাড়ির কর্তা এবং গিন্নি। আমরা অন্যান্য ডিশ করে নিয়ে যাই। এই সূত্রে সেই সব পরিবারের সঙ্গেই পার্টি হয়, যাদের ছেলে, মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। থ্যাংকস গিভিং ডিনার আর ক্রিসমাস ডিনার প্রতিবছর একই দলের সঙ্গে করতে করতে পারিবারিক অনুষ্ঠানের মতোই হয়ে যায়। ইদানীং স্ন্যাকস আর সাইড ডিশের ছুতোয় মুখরোচক কিছু ভারতীয় খাবারও ঢুকে গেছে। আমরা যে আমেরিকার মেলটিং পটে নয়, গোটা অবস্থায় 'স্টু পটে' আছি, তার প্রমাণ এবারও থ্যাংকস গিভিং ডিনারে টার্কির সঙ্গে কাবাব খেয়েছি। ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা করেছে এবং ঘুগনি খেয়েছে। দেশে থাকতে ঈশ্বর আমাদের যা যা খাইয়েছিলেন, থ্যাংকস গিভিং-এর রাতে তার কিছু নমুনা না রেখেই কেন তাঁকে ধন্যবাদ

দেব? এ জীবনে যত হাতা ঘুগনি খেয়েছি, টার্কির মাংস তার সিকিভাগও খেয়েছি কিনা সন্দেহ। উলটোপালটা কারণে ধন্যবাদ দেন কেন? এ বছর আমার বন্ধু সুনন্দা 'হে করুণাময় ঈশ্বর' বলে যেই তাঁকে ধন্যবাদ জানাল অমনি আমি টার্কির চাকলার পাশে জয়ার তৈরি আলুর দম তুলে নিলাম। সুইট পোট্যাটো সুফলে ক্যারট কেকের পাশে সুনন্দা কখন নিঃশব্দে কটা হলদে সন্দেশ এনে রেখেছিল। 'আজ আবার সন্দেশ কেন?' বলতে বলতে কারা যেন তাও খেয়েছে। লেফট ওভার থেকে অবশ্য এখনও রেহাই পাই না। এবার আমার কাছেও গজিয়েছিল অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে সুইট পোট্যাটো স্যুফলে। ওপরে গুঁড়ো আখরোট আর ক্রিমের বাহার। নীচে রাঙাআলুর পিণ্ডি।

আমেরিকায় থ্যাংকস গিভিং হলিডে মানে চারদিন ধরে সপরিবারে ছুটি উপভোগ। খাওয়া দাওয়া, আড্ডা, বড় শহরে গিয়ে নাটক কিংবা অপেরা দেখা। এছাড়া দল বেঁধে ক্রিসমাস শপিং। তবে ওই বৃহস্পতিবারে দোকান, বাজার সবকিছু বন্ধ থাকে। আগে অনেক রেস্তোরাঁও বন্ধ থাকত। টার্কি খেতে হলে আগে থেকে কোনও বাড়িতে নেমন্তন্ন পেতে হবে। তবে একবার ওইদিন ফ্লোরিডা যাচ্ছিলাম। প্লেনে টার্কি দিয়েছিল।

এদেশে বহুদিন পর্যন্ত টার্কি ডিনার ছিল পারিবারিক ভোজন উৎসব। কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ রেস্তোরাঁগুলি থ্যাংকস গিভিং নাইটে টার্কি ডিনার পর্ব শুরু করল। দেখা গেল, সেখানেও ভিড় হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন পরিবার, ভৌগোলিক দূরত্ব, অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা, ইত্যাদির কারণে পারিবারিক জমায়েতে যোগ দেওয়া যাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তারা রেস্তোরাঁয় গিয়ে সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর সঙ্গে থ্যাংকস গিভিং সারছে। চারদিনের টানা ছুটিও সকলের থাকে না। বিশেষ করে ব্যাঙ্ক, সরকারি দপ্তর ও কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শুধু ওই বৃহস্পতিবারই ছুটি দেয়। এসব কারণে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে মা, বাবা, ভাই, বোনদের সঙ্গে ছুটি কাটানো সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। রেস্তোরাঁগুলি এদের জন্যেই টার্কি ডিনার চালু করেছিল। তারপর দেখা গেল, যারা বাড়িতে রান্নাবান্নার ঝামেলায় যেতে চায় না, তারাও সপরিবারে 'সেখানে খেতে যাচ্ছে। সারাদিনের পরিশ্রম বাঁচিয়ে, বাজার খরচ বাঁচিয়ে রেস্তোরাঁতেই বাড়ির মতো রান্না পেয়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর সাজানোর ব্যস্ততা নেই, অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব নেই, ধোয়ামাজার পর্ব নেই, এমনকি উদ্বৃত্ত আতঙ্কও নেই। সুতরাং যারা ঝুট ঝামেলায় চায় না, তাদের খুবই সুবিধে। যা ছিল একান্ত ঘরোয়া নেমন্তন্ন, তা হয়ে দাঁড়াল রেস্তোরাঁর থ্যাংকস গিভিং পার্টি।

ইদানীং শুরু হয়েছে টেক-আউট টার্কি ডিনার। শুধু অবিবাহিত লোকজন বা টোনাটুনির সংসারেই যে কেনা খাবার আসছে তা কিন্তু নয়। বড় বড় পারিবারিক জমায়েতেও টেক-আউট টার্কি আর সাইড ডিশ অর্ডার দিয়ে বাড়িতে থ্যাংকস গিভিং পার্টি হচ্ছে। ইচ্ছে করলে তারা রেস্তোরাঁয় যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ দিন ওই পরিবেশ তাদের পছন্দ নয়। বাড়ির মস্ত ডাইনিং টেবিল ঘিরে সবাই বসবে, সাবেকি ডিনার সেট আর রুপোর ফ্ল্যাটওয়ার (কাটলারি সেট) দিয়ে টেবিল সাজানো থাকবে। দিদিমার টেবল ক্লথ, দাদুর ওয়াইন গ্লাস এসব কি আর রেস্তোরাঁয় পাওয়া যাবে? অতএব সাজসজ্জার জন্যেই বাড়ির ডাইনিং রুমে বসে খাওয়া। এলিজাবেথ নামে একজন আমেরিকান মহিলা এখন এভাবেই টার্কি ডিনারের

আয়োজন করেন। কারণ অফিসে তাঁর এত কাজের চাপ যে ছুটির দিনে আর রান্নাঘরে সময় কাটাতে চান না। থ্যাংকস গিভিং ডে কাটিয়েছেন নিজের পরিবার আর আত্মীয়দের সঙ্গে গল্পগুজব করে। কিন্তু খাইয়েছেন একেবারে পেটপুরে। চিংড়িমাছ আর পেঁয়াজকলি কুচো দিয়ে টার্কির পেটে স্টাফিং ভরা হয়েছিল। সঙ্গে কর্ন ব্রেড, সুইট পোট্যাটো ক্যাসেরাল, গ্রেভি আর মাশড পোট্যাটো। টার্কি রান্না হয়ে এসেছে রেস্তোরাঁ থেকে। কর্ন ব্রেন এসেছে স্থানীয় বেকারি থেকে। টিনবন্দী মাংসের গ্রেভি। পেস্টি শপ থেকে সুইট পোট্যাটো ক্যাসারোল আর সুপারবাজার থেকে প্যাকেটের আলুর গুঁড়ো এনে দুধ, মাখন মিশিয়ে মাইক্রোওয়েভে তিন মিনিটের মণ্ড বানিয়ে ফেলেছেন। এলিজাবেথের কয়েকজন বন্ধুও নাকি এ বছর এভাবেই টেক-আউট পদ্ধতিতে থ্যাংকস গিভিং ডিনারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ তাঁদেরও ছুটির দিনে 'ব্যাগার' খাটার ইচ্ছে হয়নি।

এঁদের সুবিধের জন্য এখন বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, গোরমে ফুড শপ, সুপার মার্কেটগুলি ফুল কোর্স হলিডে ডিনার প্রস্তুত করছে। কলেরাডো রাজ্যের একটি রেস্তোরাঁ কোম্পানির নাম বস্টন চিকেন ইনকরপোরেটেড। আমেরিকার নানা শহরে এদের শাখা আছে। এবছর থ্যাংকস গিভিং উপলক্ষে তারা যে টেক-আউট ডিনারের ব্যবস্থা করেছিল, তার বিক্রির হার দেখে বোঝা গেছে, কত বাড়িতে ওই খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। টার্কি তো ছিলই, সঙ্গে বেকড গ্লেজড হ্যাম, ক্র্যানবেরি ওয়ালনাট চাটনি, হলুদ স্কোয়াশের স্যুফলে, পাসতা স্যালাড, চিজ ম্যাকারনি ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ পদাবলী।

গত বছর থেকে শিকাগোতে শেরাটন শিকাগো হোটেল অ্যান্ড টাওয়ারে ওই ধরনের ডিনার প্যাকেট বিক্রি করা শুরু হয়েছে। প্যাকেটের নাম দিয়েছে—থ্যাংকস গিভিং টু গো। চার থেকে ছ'জনের হিসেবে রোস্ট টার্কি, গ্রেভি, ম্যাশড পোট্যাটো, সুইট পোট্যাটো আর অ্যাপল পাই। পঁয়ষট্টি ডলার দিয়ে ওই প্যাকেট কিনে ছ'জন লোক ভালভাবে খেয়েছে। প্রথম বছর বলে আন্দাজে দুশোর বেশি প্যাকেট তৈরি করা হয়নি। সব বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এবছর শেরাটন দ্বিগুণ হারে থ্যাংকস গিভিং টু গো বিক্রি করেছে এবং দাম বাড়ায়নি।

এ তো গেল দামি হোটেলের কথা। আরকানসও রাজ্যে লিটল রক শহরে আরও সস্তায় টার্কি ডিনারের প্যাকেট বিক্রি হয়েছে। সেখানকার ব্যাপটিস্ট মেডিকেল সেন্টারের ক্যাফেটেরিয়ায় আটত্রিশ ডলারে ফ্যামিলি প্যাকেট তৈরি করে বিক্রি করেছে। তিনশোর মতো পরিবার কিনেছে।

সুপারমার্কেটরাও পিছিয়ে নেই। এমন সব প্যাকেট বানিয়েছে, যা মাইক্রোওয়েভে গরম করলেই উপাদেয় ডিনার হয়ে যায়। গত তিন-চার বছর ধরে নিউ ইয়র্ক আর পেনসিলভানিয়ার ওয়েজম্যানস ফুড মার্কেটে ক্রিসমাসের সময় আর থ্যাংকস গিভিং-এর সময় রেডি-টু-ইট টার্কি ডিনার বিক্রি হচ্ছে। চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। শিকাগোর সুপারমার্কেট চেইন ডমিনিকস ফাইলার ফুডস-ও একই ধরনের প্যাকেট বিক্রি করছে।

কেনা খাবার দিয়ে পার্টি করার ব্যাপারে অধিকাংশ মহিলারই তেমন আপত্তি নেই। তাঁদের যুক্তি—আমাদের মায়েরা রান্নাঘরে হয়তো সময় কাটিয়েছেন, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সে যুগে বাইরের খাবারের এত চল ছিল না বলেই তাঁদের এত পরিশ্রম করতে

হত। উপায় থাকলে এতখানি সময় রান্নাঘরে থাকব কেন? একদিনের খাওয়াদাওয়ার পর্ব করতে যা খাটতে হয়, ছুটির আনন্দই মাঠে মারা যায়। কেনা খাবার দিয়ে পার্টি করার ব্যাপারে আমাদের কোনও অস্বস্তি বা অপরাধবোধ নেই। যুগ পালটে যাচ্ছে। ছুটি মানেই সকলের জন্য গাদা গাদা খাবার তৈরি করতে হবে—মেয়েদের কাছে এমন প্রত্যাশাই বা থাকবে কেন? তবে তো আর আমাদের জীবনে ছুটি বলে কিছু থাকে না। তা সত্ত্বেও এ বছরে প্রতি তিনটি পিছু একটি পরিবারে বাড়িতে থ্যাংকস গিভিং-এর জন্যে টার্কি বেক করা হয়েছে। এছাড়া টার্কির বদলে কেউ কেউ চিকেনও বেক করেছে। শতকরা দশজন গেছে রেস্তোরাঁয়। বাকিরা আত্মীয়, বন্ধুর বাড়িতে নয়ত সাদামাটা পদ্ধতিতে অন্য কিছু রান্না করে খেয়েছে।

দেখা যাচ্ছে রেস্তোরাঁও নয়, সুপার বাজারের ফ্রোজেন ডিনারও নয়, টেক-আউটই বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। না রান্না করেও বাড়ির পরিবেশে বসে সদ্য কিনে আনা টার্কি ও সাইড ডিশ নাকি অনেক বেশি উপাদেয় মনে হয়। আমেরিকান এক উকিল দম্পতি এবছর থ্যাংকস গিভিং-এ তাঁদের বাড়িতে কুড়িজন লোক নেমন্তন্ন করেছিলেন। 'ফুডস্টাফস ইনকরপোরেটেড' নামে গোরমে ফুডস্টোর থেকে খাবার এসেছিল। উকিল সগর্বে ঘোষণা করেছেন—আমার বউ অসাধারণ রাঁধে! কিন্তু সময় কোথায়?

আর, যারা অসাধারণ রাঁধে না তাদেরও যুক্তি আছে। অন্য এক মহিলা এত ব্যস্ত থাকেন না বটে, কিন্তু রান্না করা পছন্দ করেন না। সারা বছর তাঁরা স্বামী ও তিন পুত্রসহ কেনা খাবার খান। থ্যাংকস গিভিং-এর সময়ই বা টার্কির হাঙ্গামা করবেন কেন? কোনওদিনই নাকি পাখির ঝঞ্ঝাটে যাননি। টেক-আউট দিয়ে ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন।

বউয়ের গজগজানি শুনে একবার এক তরুণ ডাক্তার চাল মেরে বলেছিল—আমি সব করব। টার্কি নিয়ে এত টেনশন কিসের?

বউ বাধা দেয়নি। থ্যাংকস গিভিং-এর সকালে ডাক্তার গিয়ে এক বরফজমাট পঁচিশ পাউন্ডের টার্কি কিনে আনল। দুপুরের শেষাশেষি খাওয়া দাওয়া হবে। অন্তত পাঁচঘণ্টা দরকার শুধু আভনে বেক করার জন্য। এদিকে গোদা টার্কি হিমদেহ নিয়ে কিচেন সিঙ্কে পড়ে আছে। কখনই বা নরম হবে, কখনই বা মালমশলা মাখিয়ে ভেজানো হবে, আর কখনই বা পেটে স্টাফিং পুরে, গায়ে, পায়ে মোটা সুতো বেঁধে আভনে ঢোকানো হবে? এদিকে নেমন্তন্ন পার্টি আসতে শুরু করে দিয়েছে।

ডাক্তার আসলে সার্জেন। ডাইনিং টেবিলে লম্বা প্লেটের ওপর রোস্ট টার্কিকে পেড়ে ফেলে নিপুণ হাতে ছুরি চালাবে ভেবেছিল। স্লাইসিং কাকে বলে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু এমনই বরাত যে, যথাকালে পাখি রান্না হল না। মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে যে একটু হিম ঝরিয়ে নেবে, সে উপায়ও নেই। অত বড় অ্যামপাখি ঢুকবে কোথায়?

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার ছুটল সুপার বাজারে। প্রি-কুকড টার্কি কিনে এনে গরম করে মান আর পিত্তিরক্ষা হল। সেই থেকে হাতে কলমে শিক্ষা হয়েছে। এমন প্রি-কুকড টার্কিই আসে।

যারা নিজে হাতে খাবার বানায়, তাদের ধারণা বাড়িতে রান্নার সুগন্ধই যদি না বেরল,

তবে আর ছুটির দিনে লোক নেমন্তন্ন করা কেন? সারা বাড়ি বেকিং-এর গন্ধে ভরপুর থাকবে, মাখন, গোলমরিচের সুবাস ছড়াবে, মিষ্টি আলু আর ডিম, মাখন, ময়দা, ক্রিম, আখরোট গুঁড়ো দিয়ে ইয়্যাম স্যুফলে তৈরির সময় মিষ্টি মিষ্টি সুবাস ভাসবে, তবে না থ্যাংকস গিভিং ডিনার বলে মনে হবে।

পরিবেশটি চিন্তা করে অরন্ধনের সমর্থকরা কেউ কেউ গন্ধচুরির কথা ভাবছে। দোকানের কেনা মাংসের ঝোল যদি বাড়িতে ফোটানো যায়, মনে হবে না সত্য রান্না হয়েছে? সুতরাং টিনবন্দী টার্কিং বা চিকেনের গ্রেভি নিজের বাসনে ঢেলে ঢিমে আঁচে ফুটতে দিলেই হল। অন্য বার্নারে দু-টুকরো আপেল সেদ্ধ করলেই মনে হবে ক্র্যামবেরি আর আপেলের কোনও সাইড ডিশ হচ্ছে। ফ্রাইপ্যানে মাখন গলিয়ে ম্যাশড পোট্যাটো। আর একবার নেড়ে নিলেই হয়। গন্ধের সন্ধানে রন্ধন ছাড়াই যাওয়া যায়।

কারও মতে বাসনপত্রই হচ্ছে ধন্দ সৃষ্টির উৎকৃষ্ট পন্থা। কেনা রান্না প্যাকেট থেকে যদি সুদৃশ্য সব চায়না আর কর্নিং-এর পাত্রে বদলি হয়ে যায়, তবেই রূপ খুলে যাবে। অতিথিদের মিথ্যে কথা বলারও দরকার নেই। কেনা রান্নাও লোকে পছন্দ করে। শুধু প্ল্যাস্টিক, ফয়েল আর ফোমের বাসন থেকে খেতে চায় না। সেখানে ইংলিশ বোন চায়নায় খাবার নিয়ে রুপোর ছুরি, কাঁটা দিয়ে খেলে আবার খুঁতখুঁতানি কিসের? আপনি শালপাতার ঘুগনি কাচের বাটিতে খেয়ে দেখুন না। মনে হবে লীলা মজুমদারের বই থেকে রান্না উঠে এসেছে। অবশ্য ভাঁড়ের চা কাপে ঢাললে নির্ঘাৎ পদমর্যাদা হারাবে। যাইহোক, পাত্রের গুণাগুণ কিছু আছেই।

থ্যাংকস গিভিং ডিনারের প্রচলন যে ঔপনিবেশিক আমলেই আরম্ভ হয়েছিল, তা নয়। তখন হয়তো জাঁকজমক বেড়েছিল। কিন্তু পিলগ্রিমসরা এদেশে এসেছিলেন প্রায় চারশো বছর আগে। অত্যাচার ও ধর্মীয় অনাচারের কারণে বিক্ষুব্ধ ওই পৃথক ধর্মসম্প্রদায় ইংল্যান্ডের প্রতি আস্থা হারিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। সঙ্গে আরও কিছু লোক পালিয়ে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নতুন দেশে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা। আমেরিকায় আসার পর প্রথম ও প্রধান সমস্যা ছিল খাদ্য সঙ্কট। না ছিল অর্থবল, না পৃষ্ঠবল। সেই সময় স্থানীয় আদিবাসীরা তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সহায়তায় ব্রিটিশ পিলগ্রিমরা চাষবাস, পশুপালন ইত্যাদি করে খাদ্যসঙ্কট দূর করেন। আমেরিকার জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নতুনভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হন। সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। শীতের আগে মার্চের ফসল খামারে তোলার পর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর এবং আদিবাসীদের সম্মানে এক নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন। সেই হল থ্যাংকস গিভিং ডিনারে সূচনা। সেদিনের খাদ্য তালিকায় ছিল ঝলসানো বুনো টার্কি, ভুট্টা, রাঙা আলু, ক্র্যানবেরি ফল আর পাকা কুমড়োর মিষ্টি জাতীয় কোনও পদ।

চারশো বছরে মূল তালিকায় বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শুধু বিভিন্ন যুগে অভিবাসী সমাজের খাদ্যরুচির প্রভাবে নতুন নতুন পদের সংযোজন হয়েছে। ইটালিয়ানরা পাসতা এনেছে। জার্মানরা গ্লেজড হ্যাম এনেছে। আমেরিকায় দক্ষিণ অঞ্চলে মানুষ টার্কির পেটে

কাঁকড়া, চিংড়ির বর্ণসংকর ক্রফিশের পুর ভরেছে। আমরা সাইড ডিশে ভুট্টার বদলে ঘুগনি রেখেছি। দেখছি আমেরিকার অ্যামপাখির সঙ্গে হ্যামও ভাল, ইয়্যামও ভাল। এবং পাসতা যদি জায়গা পায়, খাস্তা লুচি কেন নয়? নিউ জার্সির বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে থ্যাংকস গিভিং উপলক্ষে মাদ্রাজি, গুজরাতিরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে লুচি খেয়েছেন। আমরা সহিংস সদস্য বলে সে নেমন্তন্নে যাইনি। সুনন্দার প্রার্থনার শেষে সুগন্ধি মোমবাতি জ্বেলে তার বাড়িতেই লক্ষ্মীবারে পক্ষীভোজনের মার্কিনি ঐতিহ্য অনুসরণ করেছি।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৫

খাইবার পাস

কী যেন একটা গান ছিল? জিন্দগিকে রাহোমে, জিন্দগিকে রাহোমে...”। প্রেমযাত্রায় পথের যে কী অসাধারণ ভূমিকা, সে আপনি ওই হামরাহি আর হামসফর মার্কা চলিষ্ণু গানগুলোতেই টের পেয়েছেন।

অসম্ভব দূরে এক অজানা গন্তব্য স্থান। দূর মেরি মঞ্জিল। পেয়ার-কা রাহিরা কুচকাওয়াজ করতে করতে চলে যাচ্ছে। চড়াই, উতরাই, খানা, খন্দ পেরিয়ে যাচ্ছে। সেই দুর্গম গিরিপথেও খাইবার পাস আছে। প্রায় প্রথম দিকেই আছে। সচরাচর রেস্তোরাঁতেই প্রথমবার দেখা হয় তো! কিন্তু খাইবার জন্যে নয়। কথা বলা আর শোনার জন্যে। প্রথম ডেট মানে আড়ালে আবডালে না গিয়ে চোখের আলোয় দেখে নেওয়া। মাথার ভেতর এক ক্যালকুলেটর কাজ করে। ব্যক্তিত্বের অ্যাভারেজ কষে। চোখের লেন্স ছবি তোলে। বাড়ি ফেরার পরে ফার্স্ট-ইমপ্রেশন নিয়ে ভাবনার যোগান দেয়।

এদিকে ওয়েটার ঘুর ঘুর করছে। অর্ডার নিয়ে টেবিলে খাবার রেখে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি পট করে খাইবেন না। খাইবার পাস পেরনোর এটাই টেকনিক। খাদ্যে অনীহা দেখাবেন। অলস অন্য মনে কফিপটের কারুকার্য দেখবেন। নিঃশব্দে কফি কিংবা ওয়াইন গ্লাসে চুমুক দেবেন। কিন্তু নো সুরুৎ! কোল্ড ড্রিংক নিলে তলানি পর্যন্ত স্ট্র চালিয়ে ফড় ফড় শব্দ করবেন না। আঁতলামো খুব চলবে। মাতলামো একদম নয়। মনে রাখবেন—খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ হচ্ছে নিজেকে হৃদয়হরণ স্টাইলে উপস্থিত করা। প্রথম ডেট-এর সন্ধেবেলায় এই হচ্ছে ভাবমূর্তি তৈরির কায়দা। খাইবার গিরিবর্তে ঢুকে খাইবার পরিবর্তে অনীহার কৌশল।

তবে মানে কি খাওয়ার মধ্যে সফিস্টিকেশন নেই? প্রথম আলাপে খাই খাই করলে লোকে লোভী ভাববে? খাইবার পাসেই অনুরাগের সমাধি হয়ে যাবে?

অসম্ভব নয়। এমনিতেই আমরা খাওয়ার ব্যাপারে একটু লজ্জা দেখানো পছন্দ করি। ছোটবেলার ট্রেনিং মনে নেই? বাড়িতে সব খাচ্ছেন। কিন্তু অন্য বাড়িতে গেলেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। যে বাড়িতেই বেড়াতে যাচ্ছেন, তারা এক প্লেট খাবার ধরিয়ে দিচ্ছে। ছোট বলে

হেনস্থা করছে না। কিন্তু আপনার বাড়ির লোকেদের ইন্টারফেয়ারেন্সে কোনওদিন কি পুরো প্লেট শেষ করতে পেরেছেন? ততক্ষণে তো ডায়ালগ শুরু হয়ে গেছে—'ওমা, ওকেও আবার প্লেট সাজিয়ে দিয়েছেন। না, না, অত কখনও খেতে পারে? চপ, সিঙাড়া, সব তুলে নিন...। সন্দেশটা থাক।'

ওই সমূহ বঞ্চনার মুহূর্তেও আপনি কি 'অসভ্যতা' করতে পেরেছেন? চপ, সিঙাড়ার গন্ধে খেপে গিয়ে প্লেট কেড়ে নিয়ে বলতে পেরেছেন—ম্যায় ভুখা হুঁ? আমি তো পারিনি। সেই অক্ষমতাই আসলে লজ্জা। বাইরের লোক আমাকে পেটুক ভাববে, অবাধ্য মনে করবে, এই লজ্জা থেকেই মুখ গম্ভীর করে অসহ্য লেবু সন্দেশ আর চমচম খেয়ে নিয়েছি।

এ তো অন্য বাড়ির ব্যাপার। নিজেদের বাড়িতে আর এক কায়দা। যত লোক আসবে, দৌড়ে এসে প্রণাম করো। কিছুক্ষণ নম্র ভঙ্গীতে বসে থাকো। পা নাচাবে না। তারপরেই জলসা। হয় একটা গান করো। নয় একটু নাচো। বোনেরা মিলে চিত্রাঙ্গদার 'খণ্ডাংশ!' কিছু না পারলে ভাঙা গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত।' অরুন্ধতী রায়ের 'গড অফ স্মল থিংস'-এর এক জায়গায় পড়ছিলাম ছোটদের লম্বা লম্বা ইংরেজি কবিতা বলার বর্ণনা। আশাপূর্ণা দেবীর গল্পটা মনে পড়ছিল। যাই হোক, অতিথিদের জন্যে কালচারের পরেই ফুড-কালচার। যেই তাদের জন্যে খাবার আসবে, আমাদের পড়া আছে বলে ওপরে চলে যেতে হবে। কিন্তু তারা তখন ক্ষীরকদম্ব হাতে নিয়ে ডাকাডাকি করবে। আমরা সমানে মাথা নাড়ব। তারপর, যেন ভদ্রতা করছি ভাব করে খেয়ে নেব।

এই যদি শৈশবের শিষ্টাচার হয়, তবে যৌবনে আপনার ভাবমূর্তি কেমন হওয়া উচিত ভেবে দেখুন। প্রেম বিশেষজ্ঞরা হাজার গণ্ডা উপদেশের সঙ্গে এই খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও সমঝে দিয়েছেন। অন্তত প্রথম দিনে ভোজন বৈরাগ্য দেখাতে হবে। অনুরাগভাজন হওয়ার আশায় অগ্নিমান্দ্য ভাব!

মনে করুন, সুন্দর একটি রেস্তোরাঁয় আধো আলো আধো ছায়াতে বসে আছেন। টেবিলে বেঁটে মোমবাতি। দু'জনেই কম্পমান শিখার দিকে চেয়ে আছেন। রীতিমত সম্ভাবনাপূর্ণ সন্ধ্যা। হ্যাঁ, রেস্তোরাঁ বাছাই করার সময়ও ইমপ্রেস করতে হবে। চাল মারার জন্যে এমন জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই, যেখানে নিজে কখনও যান না। রাতারাতি নিজেকে বিরাট খর্চে আর উন্নাসিক বলে প্রমাণ করে কী হবে? বাজে পয়সা ওড়ায় আর 'স্নব' ভেবেও হয়তো সঙ্গীটি আপনাকে পছন্দ না করতে পারে। ভুল ইমেজ দিয়েও তো লাভ নেই। বেশিদিন বজায় রাখতে পারবেন না। যদি সত্যিই খুব শৌখিন হন, বিলাসিতা পছন্দ করেন, উন্নাসিক হন, তা হলে আলাদা কথা। নিজের পছন্দমত রেস্তোরাঁয় যাবেন, কিন্তু নিজেকে নাক উঁচু বলে বুঝতে দেবেন না। ওদিকের লাইট অফ হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, তাই বলে মামুলি রেস্তোরাঁতেও যাবেন না। প্রথম ডেট-এর পরেই কিপটে নয়তো স্ট্যান্ডার্ড নেই বলে বাতিল হয়ে যেতে পারেন। সুতরাং যেখানে রুচিসম্পন্ন লোকেরা যান, অথচ একেবারে প্রথম সারির হোটেল, রেস্তোরাঁও নয়—এমন জায়গা বেছে নিতে পারেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মোমবাতির নাচন দেখছেন। কিন্তু খাবেন কী? সুখাদ্য তো অনেক আছে। কিন্তু আপনাকে ভেবে দেখতে হবে খাওয়ার সময় মুখখানা কেমন দেখাচ্ছে। এদেশে

প্রথম ডেট্-এ অনেকে ব্রেড-স্টিক দিয়ে কথা শুরু করে। ছোট ছোট পাঁউরুটি। মোটা কাঠির মতো দেখতে। তার সঙ্গে ফিকে সবুজ রঙের অলিভ অয়েল। তেলে কাঠি ডুবিয়ে ডুবিয়ে কুট কুট করে খাচ্ছেন আর টুক টুক করে কথা বলে যাচ্ছেন। তেল কাঠি না খেতে চান, এমন কিছু দিয়ে শুরু করুন, যা ধীরে ধীরে পাশ থেকে ছোট্ট কামড় দিয়ে খাওয়া যায়। বেশ বাঁশি বাজানোর মতো করে কায়দা করে ধরবেন। গালে বা ঠোঁটে যেন গুঁড়ো টুঁড়ো লেগে না থাকে। সন্দেহ হলেই ন্যাপকিন দিয়ে আলতো করে মুছে নেবেন। ঠোঁটে তেল ব্যাড় ব্যাড় করতে দেবেন না। ন্যাপকিন দিয়ে শুষে নেবেন। চিবোতে চিবোতে কথা নয়। মুখ বন্ধ করে চিবোবেন। দাঁত দেখাই যাবে না। গিলে নেওয়ার পরে বাক্য রচনা করবেন। এদেশে প্রথম ডেট-এ অ্যাপেটাইজারে রসুন দেওয়া খাবার নিয়ে রসিকতা চালু আছে। যদি রোস্টেড গার্লিক অ্যাপেটাইজার নিতে ইচ্ছে হয়, তবে দু'জনকেই খেতে রাজি হতে হবে। কেননা বাড়ি ফেরার সময় একটু ঘনিষ্ঠতা হলে বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি একজন রসুন দেওয়া খাবার খায়, তবে অন্য জন উগ্র গন্ধে দূরে সরে যেতে পারে। হাওয়ায় চুম্বন ছুঁড়ে দিয়ে আবার দেখা হবে বলে চিরকালের মতো কেটে পড়তে পারে। এ কথা ঠিক, প্রেমের অনুষঙ্গের ফর্দে যে যে সুগন্ধের নাম আছে, পেঁয়াজ, রসুনের গন্ধ মোটেই তার মধ্যে পড়ে না। বিয়ের পরে বরদাস্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম ডেট-এ টলারেট করা অসম্ভব!

এদেশে ডেলিকেসি'র নাম করে পালং শাকের নানা খাবার সাজিয়ে দেয়। স্পিনাচ কিশ, স্পিনাচ পাই, ক্রিম অফ স্পিনাচ স্যুপ থেকে শুরু করে মাছ, মাংসের প্ল্যাটারের সঙ্গেও এক খাবলা স্টিমড পালং শাক বসিয়ে দেবে। অলিভ অয়েলের সঙ্গে রোমানো আর পারসেসান চিজের গুঁড়ো দিয়ে, নয়তো মাখন, গোলমরিচ ছড়িয়ে শাকসবজি খেতে ভালই লাগে। কিন্তু প্রথম ডেট-এ নাকি একদম ছোঁওয়া উচিত নয়। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে শাক ঢুকে যাবে। হাসলেই সবুজ বিপ্লব। কথা বললেই শাকের কণা উঁকি দেবে। টুথপিক দিয়ে খোঁটা মানে প্রথম ডেট-এর পক্ষে যা তা ব্যাপার! কুলকুচি করে নামানোও সমান দৃষ্টিকটু। প্রেমের কাঙালকে এ শাকের খেত দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে পালং শাক না খাওয়াই বুদ্ধির কাজ। কর্ন বা ভুট্টা সেদ্ধ নিলেও একই সমস্যা।

এরকমই ঝুঁকিসম্পন্ন পদ হচ্ছে রোস্ট মাংস, ফাইবার ওলা ব্রয়েল্ড মাছ আর অন্যান্য সি ফুডের ডিশ। এক তো টুক করে গিলে ফেলা যাবে না। মুখ বন্ধ করে একমনে খেয়ে যেতে হবে। তখন কথা বলার সময় কমে যাবে। ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করলে খেতে বহুক্ষণ। আর বড় বড় টুকরো করলে মুখের ভূগোলে গণ্ডগোল। কথা শুনবেন? না পেশির কম্পন দেখবেন? তারপর তো ওই দাঁতের আনাচে-কানাচে মাংস ঢুকে পড়ার ব্যাপারটা আছেই। ইমেজ বাঁচানোর জন্যে দাঁত খোঁচাতেও পারবেন না। কাঁকড়া, চিংড়ি, লবস্টার নিয়ে বসলেও খুব সুবিধে হবে না। এদেশে স্টিমড লবস্টার, কাঁকড়া সব আস্ত আস্ত সাজিয়ে দেয়। ছোট্ট জাঁতি দিয়ে মটকে মটকে দাঁড়া ভেঙে চুষে চুষে শাঁস খাওয়া, কড়মড়, হুশহাশ শব্দ, ঠোঁট আর হাতের আঙুল গলদা চিংড়ির ঘিলু আর মাখনে চপচপ করছে—এ দৃশ্য রচনা করে কাকে ইমপ্রেস্ করবেন? তার চেয়ে মাছের কাঁটা ছাড়া "ফিলে" খাওয়াই

সুবিধে। প্রায় নিঃশব্দে চালান দেওয়া যায়। সবচেয়ে মুশকিল বাধায় স্প্যাগেটি। যেরকমই নুডলস বা পাসতা নেওয়া হোক, পাকিয়ে পাকিয়ে মুখে চালান দেওয়ার সময় ভালই মুখ ব্যাদান করতে হয়। ঠোঁটে টমেটো সস লেগে যায়। এ জন্যে প্রথম দিনের ডেট-এ ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় গেলে 'রিসোটো' অর্ডার দেয় লোকে। ভাতের সঙ্গে চিকেন ব্রথ, গুঁড়ো মশলা আর চিজ দিয়ে বেশ মাখো মাখো পদ।

এবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। না, আমার লেখা নয়। সে একটু বাকি আছে। আমি বলছি ওই প্রথম ডেট-এ আইসক্রিম আর কফি দিয়ে সমাপ্তির কথা। এতক্ষণ খাওয়া নিয়ে যত ন্যাকামোই হোক, আইসক্রিম নিতেই হবে। কিন্তু একজনের জন্যে। তিনি আর একজনকে একটু ভাগ দেবেন। এক চামচে ভ্যানিলা আইসক্রিম অপূর্ব মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে। এ হচ্ছে একটা ইঙ্গিত। মধুর রসের আদান প্রদান। এক পেয়ালা কফির মতো রহস্য না থাক, রোমাঞ্চ আছে। এদেশে খাদ্য গবেষকরা বলেন—গেঁড়ি গুগলি, মাশরুম আর রসুন হচ্ছে কামনা উত্তেজক খাবার। তার সঙ্গে যদি এক খাবলা চকোলেট খাইয়ে দেওয়া যায়, তবে নাকি উত্তেজনা তুঙ্গে উঠবে।

কিন্তু খাওয়া নিয়ে এই নাটক কতদিন চালানো যায়? পছন্দের রান্না বাতিল করে হাবিজাবি নিয়ে বসে থাকা আর মোমের আলোয় গুনগুন ফিসফিস বেশিদিন চালানো যায় নাকি? নাঃ, সে কথা কেউ বলছে না। ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা দিবসের পরেই আপনি ঘুড়ির সুতো ছাড়তে পারেন। তবে ধীরে ধীরে। যদি বুঝে যান, দুজনের পরস্পরকে ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে 'হামরাহি'-র দেখা পেয়েছেন, তবে তো কুচকাওয়াজ শুরু হল! বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। ভড়ং করে তেল মাখানো রুটির কাঠি আর ভাতের ঘণ্ট খাবেন কেন? মোট পাঁচটা ডেট অবধি অপেক্ষা করুন। তারপর যা খুশি খেতে থাকুন। ঢেঁকুর তোলা, গলা খক খক করে ওয়াক তোলার চেষ্টা আর প্রকাশ্যে দাঁত খোঁটা যদি শুরু না করেন, মনে হয় ধোপে টিকে যাবেন। যে আমারে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায় ভেবে ওই ভুলগুলো করবেন না।

খাওয়া নিয়ে দুটো ঘটনা জানি, রেজাল্ট ভাল হয়নি। প্রথমটা কলকাতায় ঘটেছিল। ভদ্রলোক শান্তিনিকেতনের পুরনো ছাত্র। তখন কলকাতায় স্কুলের মাস্টার ছিলেন। এখন অবশ্য খবরের কাগজের অফিসে আছেন। যাই হোক, বাংলার মাস্টারমশাই সেসময় একজন বান্ধবী খুঁজছিলেন। রিকোয়্যারমেন্ট বলতে—'একটু গভীরতা বোধ থাকা দরকার।' শেষ পর্যন্ত এক মহিলার সঙ্গে কোথায় যেন আলাপ হল। গভীরতা মাপার জন্যে মাস্টারমশাই তাঁকে 'কাফে-ডি মনিকো'-য় (মেট্রোর পাশে ছিল না?) কফি খেতে ডাকলেন। প্রথম ডেট। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গেছেন। মহিলা অফিস ফেরত এলেন। মাস্টারমশাই কফির অর্ডার দিয়ে ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন—'কিছু খাবেন?' মহিলা নিজের ব্যাগ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন—'কার্টলেট'। খাবার আসার পর চটপট কাঁটা, ছুরি বাগিয়ে খেয়ে নিলেন। সঙ্গে গল্পও করছিলেন। দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে ঢক করে ঢেঁকুর তুললেন। মাস্টারের স্বপ্নভঙ্গ। কত ইচ্ছে ছিল, কফি শেষ করে একটু হাঁটতে বেরবেন। ট্যাক্সি নিয়ে ভিক্টোরিয়ার দিকে যাবেন। সাহিত্য টাহিত্য নিয়ে কথা হবে। কোথায় কী?

দু'খানা কাটলেট খেয়ে মহিলা তখন ঢেঁকুর তুলছেন। স্যালাডের পেয়াঁজ বিট সব মেরে দিয়েছেন! এর সঙ্গে স্বভাব কবি বাংলার মাস্টারের কোনও কথা থাকতে পারে না। তিনি ঝোলা কাঁধে নিয়ে উঠে পড়লেন। মহিলাকে বাসে তুলে দিলেন। দুটো কাটলেট আর তিনটে ঢেঁকুরের জন্যে প্রথম ডেট পণ্ড হয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঘটনাটা এখানকার। এক মহিলা তাঁর অবিবাহিতা দিদির বিয়ের চেষ্টা করছিলেন। শিলচরের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে ট্যুরিস্ট ভিসায় দিদিকে আনিয়ে এখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিলেন। প্রথমে বাড়িতেই আলাপ পরিচয় করানো হল। তারপর বাইরে খেতে গিয়ে তর্কাতর্কি। ফুড-হ্যাবিট নিয়ে ইনি ওঁকে অপমান করেছেন। দু'জনের বয়সই পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। মতামত বেশ স্ট্রং। ভদ্রলোক মহিলাকে স্টেক হাউসে খেতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা বলেছেন—"বিফ খাই না।" ভদ্রলোক বলেছেন—'আমি যদি খাই আপত্তি আছে? আমার বাড়িতে বিফ, ভিল, পর্ক সব আসে।' মহিলা বলেছেন—'আমি কিন্তু রাঁধতে পারব না। এক ফ্রিজে রাখলেও অসুবিধে হবে।'

ভদ্রলোক নাকি মহিলার ওরকম আগ বাড়িয়ে রান্নার কথা বলায় আর ফ্রিজের কথা তোলায় একটু অবাক হয়েছেন। তিনি তো এখনও ম্যারেজ প্রোপোজালই দেননি! এখনই এত 'পজেসিভ' হাবভাব, তাহলে পরে কী হবে? ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেলেন। স্টেক হাউসে না গিয়ে ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন। কিন্তু আলোচনার সূত্র ছাড়লেন না। বিফ নিয়ে মহিলার আপত্তির কারণ জানতে চাইলেন। তাঁর সোজা উত্তর—'ঘেন্না করে। কোনওদিন খাইনি। খেতেও চাই না।' ভদ্রলোক তখন রসিকতার ছুতোয় অপমান করেছেন—'আপনাদের ফুড হ্যাবিট তো বার্মিজদের মতো। শুঁটকি মাছ খান! পোকা লাগা পচা পচা মাছ খান।'

সেদিন সারা সন্ধে এই চলেছিল। মহিলা খুব অপমানিত হয়েছিলেন। ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁয় দামি ওয়াইন খাইয়েও কেউ যদি জাতীয় ফুড-হ্যাবিট নিয়ে অপমান করে, পচা মাছ খান, পোকা লাগা মাছ খান বলে টিটকিরি দেয়, ভাল লাগে? ওদিকে ভদ্রলোক ভাবছেন এ মহিলা তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়লে ষাঁড়ের কালিয়া বন্ধ করে ছাড়বেন। এতদিনের ফুড-হ্যাবিট ঘুচিয়ে দেবেন। পাগল নাকি? এই বয়সে জরুর জন্যে গোরু ত্যাগ?

দুজনেই সেদিন ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে গেলেন। অয়েস্টার, ওয়াইন, চকোলেট ম্যুস্ বৃথা গেল। কোনও আবেগ সৃষ্টি করল না। পচা মাছ ভার্সেস গোরুর ঝগড়ায় অনুরাগ শুরুতেই সারা হয়ে গেল। প্রথম দিনের দেখায় খাওয়া খাওয়া করলে যা হয়! গরু খাব, গরু খাব করে হল্লা করতে করতে খাইবার পাস পার হওয়া যায়? যায় না। ভদ্রলোকের এখনও বিয়ে হয়নি। ভদ্রমহিলা ডঃ যাদুগোপালের দুঃসম্পর্কের ভাইকে বিয়ে করেছেন। সিলেট/চট্টগ্রাম কম্বিনেশন। বিয়ের আগে ওঁরা কিন্তু কোনও রেস্তোরাঁয় যাননি। খাইবার পাস বাইপাস করে বিয়ের পরে শুঁটকি সম্মেলন করেছেন।

৬ জুন ১৯৯৮

রন্ধন পটিয়সী জুলিয়া চাইল্ড

কয়েক বছর আগে নিউ ইয়র্কে 'সিক্স ডিগ্রিস অফ সেপারেশন' নামে একটা নাটক দেখেছিলাম। নাটকে একজনের সংলাপ ছিল—'রেস্তোরাঁগুলো? হুঁ! নিউ ইয়র্ক তো এখন সিক্সটিনথ সেঞ্চুরির ফ্লোরেন্স হয়ে গেছে। পাড়ার মোড়ে মোড়ে জিনিয়াস।'

রসিকতার লক্ষ ছিল নিউ ইয়র্কের শৌখিন রেস্তোরাঁ আর তার রাঁধুনিরা। এমন তাদের প্রচারের বহর, যেন রান্নাঘরে সূক্ষ্ম চারুকলা প্রদর্শনী চলেছে। শুধু সেখানেই নয়, ফ্যান্সি ফুডের জন্যে কিছু কিছু সুপারমার্কেটেও বেশ খাদ্যরসিক লোকের ভিড় হয়। অথচ প্রত্যেক জিনিসের দাম বেশি। কারণ সবই নাকি 'ফ্রেশ', অরগ্যানিক, আর শৌখিন ক্রেতাদের বিশেষ রুচির কথা ভেবে আমদানি করা। কেমিক্যাল সার না দেওয়া এই টুকুনি ফুলকপির দাম সাড়ে চার ডলার। ওই দামে অন্য সুপারমার্কেটে ফ্লাড লাইটের সাইজের দুটো ফুলকপি পাওয়া যাবে। গুজরাতির দোকানে তো আরও সস্তা। কিন্তু 'ফ্যান্সি ফুলকপি' হবে না। 'কিং সুপার মার্কেট' নামে ওইরকম একটা ফ্যান্সি বাজারে টমেটো কেচ আপ খুঁজতে গেলে সারি সারি আন্তর্জাতিক চাটনির বোতল পেরিয়ে যেতে হবে। টমেটো কেচ-আপ তো আর ফ্যান্সি ব্যাপার নয়। সে হচ্ছে 'ম্যাঙ্গো সালসা'। সাউথ আমেরিকার আম আর মেক্সিকোর টমেটো' পেঁয়াজ ঝাল লঙ্কা মেশানো ককটেল চাটনি। আমেরিকানদের বাড়িতে গেলে অলিভ অয়েল আর ক্যানোলা অয়েলের 'লঘুত্ব' নিয়ে আলোচনা। কোন রান্নায় এক চিমটে 'রোজমেরি' ছিটিয়ে দিলে কী স্বাদ হয়, কোন রান্নায় 'বেসিল লিপ' কুচিয়ে দিলে কী সুবাস ছড়ায়—তারই অনুপুঙ্খ বর্ণনা। বেসিল লিফের গন্ধ তো একদম তুলসী পাতার মতো। মাংসে মধু, তুলসী সব চালাচ্ছে! একেই বলে ফ্যান্সি একাকার। দিনে দিনে সূক্ষ্ম রন্ধন শিক্ষার বই-এরও কদর বাড়ছে। 'বার্নস অ্যান্ড নোবল'-এর মতো বিখ্যাত বইয়ের দোকানে চারটি লাইন ধরে রান্নার বই সাজানো তাক। আঞ্চলিক রান্না, বিভিন্ন গ্যাজেটের সাহায্যে রান্না, আগুনের তাপের তারতম্য ইত্যাদি নিয়ে কত গবেষণা। খাদ্যরুচি যেহেতু সংস্কৃতির অঙ্গ, সেহেতু খানা আর খিলানার চর্চায় খানদানি হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শহরতলির ছোট ছোট কফিশপে যান। সুইস মোকা, ক্যাপুচিনো, ম্যাকাডেমিয়া নাটস কফি, হাওয়াইয়ের কোনা কফি, মোকালাতে আর সঙ্গে চকোলেট মুস কেক পেয়ে যাবেন। 'বার্গার কিং'-এর মতো সাধারণ ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁও কম যায় না। হ্যামবার্গারের পাশাপাশি চিকেন আর মাছ দিয়েও বার্গার বানাচ্ছে বহুকাল ধরে। শামুকের খোলের ডিজাইনের দুটো রোলের মধ্যে ডিমভাজা, সসেজ আর চিজ ভরে একটা ফ্রেঞ্চ নাম ঠুকে দিয়েছে। ফ্যান্সি জনতারা হ্যামবার্গারের বদলে সেটাও খেতে পারে।

পঞ্চাশ বছর আগে কিন্তু এদেশে খাওয়া-দাওয়ার এত বৈচিত্র্য ছিল না। আমেরিকানদের প্রাত্যহিক খাওয়া-দাওয়া বলতে মাংস, ভুট্টা, আলু—এই ছিল প্রধান। তখনও অবশ্য মহিলারা রান্নার বইয়ের পত্রিকা থেকে সহজ রান্নার পদ্ধতি খুঁজতেন। মিট লোফ, লিভার অ্যান্ড অনিয়ন, কর্নড বিফ, হ্যাশ, স্টু—এগুলিকে খুব স্বাস্থ্যকর আর উপাদেয় রান্না বলে

রোজই খাওয়া হত। অধিকাংশ গৃহিণীর কাছে রান্নার কাজটি ছিল সময় এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ, এবং প্রাত্যহিক কর্তব্যের মতো। নব নব উদ্ভাবনে তেমন আগ্রহ বোধ করতেন না। জীবনধারণের পক্ষে নেহাত জরুরি কাজ মনে করেই বোধহয় রান্না করার মধ্যে বৈচিত্র্য খুঁজে পেতেন না। সে যুগে এত রকম ব্যবস্থাও ছিল না। পুরুষরা সাহায্য করতেন না। একঘেয়ে ক্লান্তিকর কাজ হিসেবে রান্না করা ছিল মহিলাদের বরাদ্দ রুটিন।

ক্রমশ পঞ্চাশ দশকের শেষাশেষি আমেরিকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পরিবর্তনের হাওয়া এল। সে সময় অধিকাংশ পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আসছে। ভোগ বিলাসিতার অধিকার কেবল মাত্র একশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। ব্রিটিশ আর উত্তর ইউরোপীয় বংশধররা আমেরিকায় এসে কৌলিন্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এক স্বতন্ত্র অভিজাত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের পরিবর্তনের হাওয়ায় নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের ওই 'ওয়াসপ' কালচার ক্রমশ স্বাতন্ত্র্য হারাতে থাকল। কেন না, মূল সমাজে উচ্চ শিক্ষিত মানুষের হার বেড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী 'জি আই বিল' অনুসারে সামরিক খরচে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধা বেড়ে গেছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী কলেজ ডিগ্রি নিয়েছে। শিক্ষা ও পেশার দৌলতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এরকম অবস্থায় মানুষের পদমর্যাদাগত উদ্বেগ থাকে। জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক ভাবমূর্তির দিকে নজর দিতে হয়। 'সংস্কৃতি মনস্ক' হওয়ার উদ্যোগ নিতে হয়। ইংরেজি উচ্চারণের মতোই ব্রুকলিনের ইতালিয়ান পাড়ার প্রভাব থাক, কিংবা মিসিসিপি রাজ্যের গ্রাম্য ভাব থাক, আধুনিক নাগরিকের তাতে কিছু এসে যায় না। সে লেখাপড়া শিখেছে। সম্মানজনক পেশায় যুক্ত আছে। নিউ ইয়র্কের মতো কসমোপলিটন অঞ্চলে তার নিজস্ব পরিচয় আছে। সুতরাং কালচার নিয়ে দু'কথা বলারও সে অধিকারী হয়েছে। সে সময় এরা গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে প্রভাবিত করত। যেমন ধরুন, কথার ফাঁকে প্যারিস বেড়িয়ে আসার খবর দেওয়া হল। প্যারিসে কোন নামকরা রেস্তোরাঁয় খেয়েছে, কী বিশেষ ধরনের রান্না আর ওয়াইন দিয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি...মানে, রান্না ব্যাপারটা যে শুধু পেটপুজো নয়, জঠরাগ্নি নির্বাপন নয়, সে যে কতবড় শিল্প—তারই আলোচনা চলতে লাগল।

ফরাসি রন্ধন শিল্পের সমঝদারদের চাহিদা বুঝেই যেন এক মহিলা রান্নার বই লিখে ফেললেন। তাঁর নাম—জুলিয়া চাইল্ড। ঊনপঞ্চাশ বছরের সেই গৃহবধূ 'ম্যাস্ট্যারিং দ্য আর্ট অফ ফ্রেঞ্চ কুকিং' লিখেছিলেন একষট্টি সালে। ফরাসিদের কাছে রান্নার কিছু কোর্স নিয়ে 'বই টই' পড়ে আর হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি বেশ ভালই লিখে নিয়েছিলেন। বনেদি ফরাসি রান্নার মূল পদ্ধতি ও কলাকৌশল আয়ত্ত করে বই লিখেছিলেন। হার্ড কভার প্রথম সংস্করণ ছ'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কপি হু হু করে বিক্রি হয়ে গেল। সে সময় আমেরিকানদের রান্নার কালচার বলতে সময় বাঁচানোই প্রধান কথা। ক্যানের স্যুপ, ফ্রোজেন সবজি আর টিভি ডিনারের যুগ। সুপার মার্কেট থেকে ফ্রোজেন রান্না কিনে এনে (ফয়েল ট্রের খোপে খোপে সাজানো) বাড়ির ফ্রিজারে জমিয়ে রাখা আর দরকার মতো ওভেনে গরম করে খাওয়া। রান্না, বাসন মাজা কোনও কিছুরই বালাই নেই।

এরকম সময়ে জুলিয়া চাইল্ডের ফরাসি রান্নার বই কিছু সংখ্যক লোকের আগ্রহ সৃষ্টি করল। দু'বছর পরে জুলিয়া পাঠকের বদলে দর্শকের দরবারে উপস্থিত হলেন। এখন যেমন পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেম নামে শিক্ষামূলক, অ-ব্যবসায়িক টিভি চ্যানেল আছে, সেরকম ষাটের দশকের প্রথমে ছিল 'ন্যাশনাল এডুকেশন চ্যানেল।' জুলিয়া চাইল্ড ওই চ্যানেলে 'দ্য ফ্রেঞ্চ শেফ' নামে রান্নার ক্লাস শুরু করলেন। টিভিতে দিনের পর দিন ফরাসি রান্নার ক্লাস দেখতে দেখতে লোকেদের উৎসাহ বেড়ে গেল। প্রথমে ওই কালচার মনস্ক যুব সমাজ আকৃষ্ট হলেন। কেন না ফরাসি রান্না জানা ও খাওয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম খাদ্যরুচির পরিচয় আছে। ক্রমশ সারা আমেরিকায় মাংস, আলু, ভুট্টা দিয়ে রাতের খাওয়া চালিয়ে যাওয়ার বদলে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগল। ধনী পরিবারের মেয়ে, বউরা রান্নার ক্লাসে ভর্তি হতে শুরু করলেন। '৬৩ সালে 'উইলিয়ামস সোলোমা' নামে স্পেশালটি স্টোর খোলা হল। সেখানে ফরাসি রান্নার যাবতীয় উপকরণ আর বাসনপত্র বিক্রি হত। এখন তো এদেশের বড় বড় শপিং মলে উইলিয়ামস সোলোমা-র দোকানে ফ্যান্সি ছুরি কাঁটা থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ ওয়াইন গ্লাস কাট গ্লাসের বাসন—সবই পাওয়া যায়। বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেও থাকে। জুলিয়া চাইল্ডের টিভি প্রোগ্রামের সময় থেকেই আমেরিকার বড় শহরগুলিতে তিন তারা মার্কা ফরাসি রেস্তোরাঁর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। শহরতলিতে 'বঁ আপেতিতো' আর 'প্যারিস ইন' নামে চেইন রেস্তোরাঁ চালু হল। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ কেউ গ্র্যাজুয়েট কোর্সে রান্না শিখছে। গ্যাসট্রোনামি নিয়ে পাস করে নিউ ইয়র্কের নামকরা 'ক্যালেন্যারি ইনস্টিটিউটে' ভর্তি হচ্ছে। সেখানকার ডিপ্লোমা নিয়ে বড় বড় হোটেলে মোটা মাইনের শেফ-এর চাকরি পাচ্ছে। এতদিন ছিল রান্নার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি। সম্প্রতি বস্টন ইউনিভার্সিটি এদেশে প্রথম রান্নার মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স খুলেছে।

এ যুগে যুগে রান্না হচ্ছে অনেকের কাছে বিশেষ শৌখিনতা ও রুচিপূর্ণ বিষয়। অবসর কাটানোর প্রিয় পন্থা। সকলেই তো আর পেশাদারি রাঁধুনি নন। কিংবা রান্না নিয়ে ডিগ্রি, ডিপ্লোমাও করেননি। কিন্তু এঁদের রান্নার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দেশি, বিদেশি রান্নার বই ঘেঁটে প্রায়ই দারুণ দারুণ পদ রাঁধেন। আত্মীয়, বন্ধুদের রসনা তৃপ্তি করে প্রশংসা পেলে খুশি হন।

এদেশের খাবারের দোকানগুলোও হাওয়া বুঝে একটু ফরাসি স্বাদ বজায় রাখছে। 'ব্যাসকিনস রবিনস' বহুদিনের আইসক্রিম কোম্পানি, উৎকৃষ্ট বানায়। কিন্তু তারাও বরফ আর সিরাপ মেশানো 'সরবেট' বিক্রি করছে। যেহেতু একসময় কমলালেবু কিংবা লেবুর গন্ধ দেওয়া বরফকুচির আইসক্রিম ছিল ফরাসি মিষ্টি। তাই 'ফ্রেঞ্চ সরবেট'ও আইসক্রিমের মর্যাদা পেয়েছে।

জুলিয়া চাইল্ড আমেরিকায় ফরাসি রন্ধন বিদ্যাকে জনপ্রিয় করেছেন। এখন তাঁর পঁচাশি বছর বয়সে এমনই খ্যাতি যে, এয়ারপোর্টে গেলে লোকেরা ঘিরে ধরে। মার্কিন পপ-কালচারের সূচনায় গানের জগতে যেমন ছিলেন এলভিস প্রেসলি, সেরকম জুলিয়া চাইল্ড ছিলেন রান্নার রাজ্যে। যৌন বিজ্ঞানে যেমন অ্যালফ্রেড কিনসির বিশেষ অবদান, কিংবা পপ-সঙ্গীতে এলভিসের, জুলিয়া চাইল্ডের দান কিন্তু সে তুলনায় কম নয়। তফাৎ হচ্ছে—

কিনসি রিপোর্ট নিয়ে যত উত্তেজনা আর প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিংবা রক-এন-রোল নিয়ে যত নাচানাচি হয়েছে, ফরাসি রান্না নিয়ে তেমন হওয়া সম্ভব নয়। জুলিয়া চাইল্ড যে শুধু আমেরিকানদের খাদ্যরুচির মধ্যে পরিবর্তন এনেছিলেন তা নয়, এরই সঙ্গে মহিলাদের ভাবমূর্তি সম্পর্কে বাঁধাধরা ধারণাও বদলে দিয়েছিলেন। আমেরিকায় নারী আন্দোলনের পুরোধা বেটি ফ্রিড্যান নারীর অধিকারকে যেভাবে চিন্তিত করেছিলেন, জুলিয়া চাইল্ড নিজের জীবনে অন্যভাবে তার উদাহরণ রেখেছেন। ছ'ফুট দু ইঞ্চি লম্বা এই মহিলার চেহারায় পেলবভাব কোনওদিনই ছিল না। বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন। সন্তান হয়নি। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ পাঠক, দর্শক সকলেই উপভোগ করতেন। পেশাদারি রাঁধুনি হিসেবে পুরুষদের একচ্ছত্র আধিপত্যের জগতে জুলিয়া সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একেবারে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছিলেন। অথচ কখনও পুরুষ বিদ্বেষের কথা ঘোষণা করেননি। সম অধিকারের ক্ষেত্রে দাবি আদায়ের জন্যে আন্দোলন করেননি। রান্নাঘরকে নারীর বন্দীশালা বলে বিপ্লবের ডাক দেননি। সে সময় ফেমিনিস্টরা মেয়েদের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রেরণা দিচ্ছেন, সে সময় জুলিয়া চাইল্ড তাঁদের রান্নাঘরে আসতে বলছেন। কিন্তু একা নয়, স্বামী নয়তো পুরুষসঙ্গী সহ। মহিলাদের উপকার হয়েছে। সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব ছাড়াও দেশি-বিদেশি রান্নায় পারদর্শী হয়ে ঘরে বাইরে বাড়তি সম্মান পেয়েছেন। খানা আর খিলানার খানদানি কালচার তাঁদের 'গোরমে কুক'-এর মর্যাদা দিয়েছে। হেঁজিপেঁজি লোকেরা কি আর ফরাসি রান্না জানে? না কি শেখাতে পারে?

জুলিয়ার বিয়ের আগের পদবি ছিল ম্যাক উইলিয়ামস। ১৯১২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছিলেন। ছোট থেকেই দলের নেতা হওয়ার চেষ্টা। বয়সের অনুপাতে বেজায় লম্বা। স্বভাবে অত্যন্ত রসিক। মাথায় নানা দুষ্টুবুদ্ধি খেলত। পাড়ার ছেলে মেয়ে জুটিয়ে এখানে সেখানে উৎপাত করে বেড়াতেন। যে কোনও পার্টিতে জুলিয়া ছিলেন মধ্যমণি। একাই আসর জমিয়ে দিতেন। একে লম্বা চেহারা, তায় অফুরন্ত প্রাণশক্তি। জুলিয়ার ঘন ঘন খিদে পেত। কিন্তু খাবারের সন্ধানে গিয়ে সবচেয়ে হতাশ হতেন নিজেদের বাড়িতে। বড়লোকের বাড়ি। রাঁধুনির হাতে রান্নাবান্নার ভার। সে মহিলা নাকি অখাদ্য রাঁধতেন, অন্তত জুলিয়ার বিচারে। বিফ বেশি সেদ্ধ হয়ে গ্যাদগেদে হয়ে যেত। আঁশটে গন্ধ কড মাছের গুলি গুলি বড়া আর ছাই ছাই রঙের ভেড়ার মাংসের স্টু দেখলেই জুলিয়ার খাওয়ার ইচ্ছে চলে যেত।

১৯৩০ সালে জুলিয়া 'স্মিথ কলেজে' ভর্তি হয়েছিলেন। সে সময় মাত্র ৫% আমেরিকান মেয়ে কলেজে যেতেন। আবার তাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ চার বছর পর্যন্ত পড়ে ডিগ্রি নিতেন। জুলিয়া গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন। কিন্তু কলেজে পড়া মেয়েদের যা ঘটত, অর্থাৎ সহপাঠী বা অন্য কোনও সূত্রে প্রেমের অভিজ্ঞতা থেকে এনগেজমেন্ট এবং বিয়ে, জুলিয়ার তা হয়নি। তাঁর ধারণা অস্বাভাবিক লম্বা বলে ছেলেরা তাঁর কাছে ঘেঁষেনি। বি-এ পাশ করলেন, অথচ বিয়ের যোগাড় হল না দেখে তেমন নিরাশ হয়নি। জুলিয়া সে সময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। প্যাসাডেনায় ফিরে গিয়ে কিছুদিন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি আর হই-হুল্লোড় করে কাটালেন। তারপর নিউ ইয়র্কে চাকরি নিয়ে চলে এলেন। বিভাগীয়

দোকানে জন-সংযোগের কাজ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগল। জুলিয়া ওয়াশিংটনে গিয়ে অফিস অফ দ্য স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসেস-এ যোগ দিতে চাইলেন। ভীষণ ইচ্ছে গুপ্তচর হবেন। ওই সার্ভিসেস পরবর্তীকালে সি. আই. এ.-র সূচনা করেছে। জুলিয়ার গুপ্তচর হওয়ার ইচ্ছেকে আমল না দিয়ে নতুন চাকরিতে তাঁকে সিলোনে (শ্রীলঙ্কায়) অফিস ম্যানেজার করে পাঠানো হল। সেখানেই তাঁর প্রেমের সূত্রপাত। '৪৩ সালের ঘটনা। ফ্রান্সে বড় হওয়া এক ছবি আঁকিয়ে যুবক ওই সময় সিলোনে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত ম্যাপ আঁকার চাকরি করছিলেন। যুবকের পদবি চাইল্ড! নাম পল। বয়সে জুলিয়ার চেয়ে দশ বছরের ছোট। মাথাতেও বেশ কয়েক ইঞ্চি ছোট। নাগরিক রুচি সম্পন্ন, মননশীল যুবকটিকে দেখে জুলিয়া মুগ্ধ হলেও, অপরপক্ষ একেবারেই নিরুত্তাপ। জুলিয়া দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়ে। প্রাণবন্ত, উচ্ছল বহির্মুখী স্বভাব। পলের ভাল লাগলেও, প্রেমিকা বা সম্ভাব্য স্ত্রী হিসেবে ভাবতে পারতেন না। তাঁর পছন্দ ছোটখাট গড়নের সুন্দরী, কমনীয়, রোম্যান্টিক মেয়ে। জুলিয়ার স্বভাবে ভাবপ্রবণতার আভাস নেই। দু'জনের মধ্যে একটাই শুধু মিল। দু'জনেই সুখাদ্য সন্ধানী। জুলিয়ার ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচণ্ড খিদে। পল ফ্রান্সের কালচারে বড় হয়ে মুখরোচক রান্নার খোঁজে ব্যস্ত। ফলে সিলোনে থাকাকালীন প্রায়ই সন্ধেবেলা দুই বুভুক্ষু খাদ্য সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন। এমনকি খাই খাই করতে করতে চীনেও চলে গিয়েছিলেন।

যুদ্ধ থামতে পল আর জুলিয়া আমেরিকায় ফিরে এলেন। তখনও পর্যন্ত জুলিয়া রান্নায় একফোঁটা কেরামতি দেখাতে পারেননি। কোনও রান্নাই পলের খাদ্যরসিক রসনার উপযুক্ত হয়নি। তা সত্ত্বেও '৪৬ সালে পল চাইল্ড জুলিয়াকে বিয়ে করে নিলেন।

বিয়ের পর চাইল্ড দম্পতি ওয়াশিংটন ডি সি-র জর্জ টাউনে ছিলেন। 'জয় অফ কুকিং' বই থেকে জুলিয়া হ্যামবার্গার, ক্যাসেরোল, কেক, পাই বানাতে শিখলেন। তারপর পল চাকরি সূত্রে ফ্রান্সে বদলি হলেন। জুলিয়া খাদ্যরসিক। প্যারিসে গিয়ে আবিষ্কার করলেন— এ হচ্ছে রান্নাচর্চার শহর। গেঁড়ি, গুগলি, শামুক, মাছ, যাই-ই খাচ্ছেন অনবদ্য। ফরাসি রান্না শেখার জন্যে জুলিয়া প্যারিসের বিখ্যাত রান্নার স্কুল কর্ডন ব্লেও'তে ভর্তি হলেন। এছাড়া উনিশ শতকের বিখ্যাত রাঁধুনি অ্যাগস্টে এস ফোকারের শিষ্য ম্যাক্স বাগানার্ডের কাছে ক্লাস করতে লাগলেন। তখন জুলিয়ার ৩৭ বছর বয়স। ছ মাস পরে স্কুল ছেড়ে দিয়ে শুধু ম্যাক্সের কাছে আরও কিছুদিন রান্না শিখলেন। ইতিমধ্যে সমানে রেঁধে যাচ্ছেন। সেই সব পদাবলী খেয়ে পল মতামত দিচ্ছেন। রাতের নেমন্তন্নে অতিথিরা এসে ভালমন্দ খেয়ে যাচ্ছেন। ভূতপূর্ব সামরিক মহিলা কর্মীদের মধ্যে জুলিয়া একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি রান্নাঘরে দীর্ঘ সময় কাটাতে লাগলেন। ক্রমশ জুলিয়ার ফরাসি রান্নার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। সিমোন, 'সিমকা' বেক নামে এক রন্ধনপটিয়সী ফরাসি মহিলা, জুলিয়াকে শহরের বনেদি রান্নার ক্লাব সার্কল ডে গোরমের সদস্য করে নিলেন। ফরাসি মহিলাদের মধ্যে যাঁরা দেশিয় রান্নায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাঁরাই শুধু ওই ক্লাবের সদস্য হতে পারেন। জুলিয়া সেই সম্মান পেলেন শুধু রান্নার জোরে। আমেরিকান মহিলারা প্যারিসে গিয়ে জুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইতেন। রান্না শিখতে চাইতেন। সে জন্যে তিনি নিজের বাড়িতেই সিমোনের

সহযোগিতার রান্নার স্কুল খুললেন। সেই সময় এই ফরাসি মহিলাদের ক্লাবে গিয়ে আমেরিকানদের উপযোগী ফরাসি রান্নার বই লেখার কাজেও সাহায্য করতেন। ক্রমশ ক্রমশ জুলিয়ার সঙ্গে তাঁদের রান্না বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানের কাজ বেড়ে যাচ্ছিল। জুলিয়ার উদ্ভাবনী শক্তি একই নিয়মাবলীর মধ্যে আরও উৎকর্ষ সৃষ্টি করেছিল। তিনি সব সময় প্রতিটি রান্নার খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দিলেন। শেখাতেনও সেভাবে। ইতিমধ্যে তাঁর স্বামী পল চাকরি বদলে বদলে বন, ওয়াশিংটন, অসলো—নানা শহরে গেছেন। জুলিয়া সেখানেও রান্নার চর্চা চালিয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ছ'বছরের গবেষণা আর সাতশো পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি নিয়ে জুলিয়া বই প্রকাশ করতে চাইলেন। প্রথম প্রকাশক সেই রন্ধন মহাভারতের ওজন দেখে বাতিল করে দিলেন। দু'বছর ধরে পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন করে জুলিয়া আবার তাঁকে পাঠালেন। এবারও বাতিল হয়ে গেল। 'হটন মিফলিনের' মতো বনেদি প্রকাশক ধরেই নিয়েছিলেন রান্নার বই বিক্রি হবে না। তখন 'নফ' পাবলিশিং হাউস ছাপতে রাজি হল। জুলিয়ার দশ বছরের প্রস্তুতি ফলাফল হিসেবে '৬১ সালে 'মাস্টারিং দ্য আর্ট অফ ফ্রেঞ্চ কুকিং' বাজারে এল। নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রশংসা করে সমালোচনা বের করল। তিন মাসের মধ্যে কুড়ি হাজার কপি নিঃশেষ। তখন তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। এই বইয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে—ফরাসি রান্নার উপকরণ ও যাবতীয় খুঁটিনাটির পাশাপাশি স্পষ্টভাবে পদ্ধতিগুলি বুঝিয়ে দেওয়া। জটিলতা ও অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে সহজ ভাষায় সঠিক পন্থা শিখিয়ে দেওয়া।

এদেশে বইটি এত জনপ্রিয় হল কেন? আসলে মধ্যবিত্ত সমাজে 'ফরাসি রান্না' ছিল সূক্ষ্ম কালচারের ব্যাপার। সামাজিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে আবশ্যিক হাতিয়ার। ওই বই যখন বাজারে এসেছে, তার ঠিক ছ'মাস আগে কেনেডি পরিবারে ফ্রান্স থেকে রাঁধুনি আনা হয়েছে। দেশের এইসব সম্ভ্রান্ত পরিবারে যখন ফরাসি রাঁধুনি রাখা হচ্ছে, তখন হাতের কাছে এমন রান্নার বই পেলে নিজেরাও তো একটু চেষ্টা করা যায়? ফরাসি রান্না রেঁধে, খেয়ে, বন্ধুদের খাইয়ে সূক্ষ্ম রুচিবোধের প্রমাণ দেওয়া যায়। কেনেডিরা ফরাসি রাঁধুনির হাতে খাচ্ছে। আমরা নিজে রেঁধে ফরাসি রান্না খাব। এরকমই মনোভাব হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, জুলিয়া চাইল্ডের বইয়ের চাহিদা মেয়েদের উৎসাহিত করল। সৃষ্টিমূলক শিল্প হিসেবে গৃহকর্মের এই সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তাঁদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করল। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। আমেরিকার মেয়েরা তখনও পুরুষের কর্মজগতে সেভাবে সুযোগ পাননি। চাকরির বাজারে তাঁদের সুযোগ খুবই সীমিত। মেয়েদের রাজনৈতিক সচেতনতাও মুষ্টিমেয় সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এইরকম সময় মেয়েদের নিজস্ব একটি কাজ যে এমন মান মর্যাদা পেতে পারে, সেই উদাহরণ দেখে তাঁরা খুশি হলেন। অবশ্য খুব বেশি দিন এই অভিভূত ভাব বজায় থাকল না। সত্তরের দশকে এল মুক্তির হাওয়া। দিনে তিনবার খেতে দেওয়ার চেয়েও যে কাজের মতো কাজ আছে, নিজের শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী জীবিকা বেছে নেওয়ার অধিকার আছে—এই সত্য উপলব্ধি করে মেয়েরা রান্নাঘরে সময় সংক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন। আর ওই সময়ই পুরুষরা রান্নাঘরে উঁকিঝুঁকি দিতে গিয়ে প্রাণের দায়েই হোক কিংবা প্রাণের টানেই হোক, হাতা, খুন্তি ধরলেন। কেন না, এ জাত ভোজনপ্রিয় তার

সঙ্গে আন্তর্জাতিক রান্নার প্রতি আকর্ষণও যুক্ত হয়েছে। জুলিয়ার বই থেকে যেমন ফরাসি রান্না শিখছেন, তেমনি অভিনেত্রী মধুর জাফরের বই থেকে ভারতীয় রান্না। আমেরিকার বহুজাতিক সভ্যতায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের খাদ্যরুচির প্রভাব অনেক আগেই পড়েছে। ক্রমশ থাইল্যান্ড, কোরিয়া, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, ইথিওপিয়া, জামাইকা—সব দেশের রান্নাই আমেরিকানদের শখের রান্নাচর্চায় যোগ হয়েছে।

জুলিয়া চাইল্ড-এর জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ '৬৩ সাল থেকে '৭৩ সাল পর্যন্ত একটানা টেলিভিশনে রান্নার ক্লাস নেওয়া। তাঁর শিক্ষয়িত্রীসুলভ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রসবোধের সংমিশ্রণ হওয়াতে দর্শকরা অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ করতেন। ফরাসি রান্নার মতো উঁচুদরের শিক্ষা আয়ত্ত করার পাশাপাশি অনাবিল হাস্যরস উপভোগ—সব মিলিয়ে দর্শকরা 'দ্য ফ্রেঞ্চ শেফ' শোটি ছাড়তে পারতেন না। ওই শোতে জুলিয়া চাইল্ড কখনও পেশাদারি রাঁধুনির মতো সর্বজ্ঞ ভাব করতেন না। ফরাসি রান্না জানার সঙ্গে যে উন্নাসিকতার কোনও সম্পর্ক নেই, সাধারণবাড়ির যে কোনও ছেলে মেয়েই যে এ রান্নায় সফল হতে পারে, তাই-ই প্রমাণ করার জন্যে কেবল নিখুঁত পারিপাট্যের ওপর জোর দিতেন না। অথচ খুঁটিয়ে রান্না শেখাতেন। তিনি রঙ্গ রসিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে কঠিন রান্নার পদ্ধতিকে সহজভাবে শেখাতে চাইতেন। শোর প্রথমে এমনভাবে কথা শুরু করতেন, যেন রান্নাঘরে আপনমনে বক বক করছেন। ঘুরছেন, ফিরছেন, জিনিস ছড়াচ্ছেন। এটা নাড়তে গিয়ে ওটা উথলে পড়ছে। একা হাতে সংসার করার ছবি। হাতের কাছে জিনিস না পেলেই আঃ। ওয়াইন ঢেলে রান্না করতে গিয়ে দপ করে আগুন জ্বলতেই 'এই মরেছে'। (বাংলা করে লিখলে যা দাঁড়ায়)। জুলিয়া করতাল বাজানোর কায়দায় বাসনের ওপর সশব্দে ঢাকনি বসাচ্ছেন। অনবরত স্বগতোক্তি। অনবরত মন্তব্য। অথচ শো চলাকালীন প্রত্যেকটি কাজ শেষ করে সময়মতো রান্না নামাচ্ছেন। একজন ঢিলেঢালা গোছের অপটু রাঁধুনির মতো ভাব করে জুলিয়া দেখাতে চাইতেন, ইচ্ছে থাকলে সবাই ফরাসি রান্না শিখে নিতে পারে। নিজে আসলে খুবই গোছালো এবং পরিপাটি করে কাজ করতে জানেন। 'দ্য ফ্রেঞ্চ শেফ' ছিল আধঘণ্টার অনুষ্ঠান। জুলিয়া প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের জন্যে ১৮/১৯ ঘণ্টা ধরে প্রস্তুত হতেন। প্রথমে তাঁর দর্শক ছিলেন শিক্ষিতা মহিলারা। ক্রমশ জনপ্রিয় এমন পর্যায় পৌঁছল যে, নারী/পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের লোকজন জুলিয়া চাইল্ডের শোর নিয়মিত দর্শক হয়ে উঠতেন। এই শোর পরেও জুলিয়া পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের' জন্যে আরও ছটি সংক্ষিপ্ত সিরিজ করেছিলেন। টিভি থেকে 'এমি অ্যাওয়ার্ড' ও 'পি বডি' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। আমেরিকায় এখন পাবলিক ব্রডকাস্টিং চ্যানেলে যা কিছু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হয়, তার এক তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকে রান্নার ক্লাস। এছাড়া 'কেবল ফুড নেটওয়ার্ক' প্রতিদিন কুড়ি ঘণ্টা ধরে রান্নার শো দেখায়। এককালে অ-ব্যবসায়িক টিভি চ্যানেলে নীরস তথ্যমূলক আলাপ, আলোচনা চলত ভেবে অনেকেই দেখতেন না। জুলিয়া চাইল্ডের 'দ্য ফ্রেঞ্চ শেফ' প্রথমে ব্যতিক্রম এনেছিল। দর্শকরা ওই শো দেখার আগ্রহ থেকেই ক্রমশ অন্যান্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানও দেখতে শুরু করেছিলেন।

জুলিয়া চাইল্ডের জনপ্রিয়তা অবশ্যই কিছু বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার

প্যাসাডেনার মেয়ে, যিনি প্যারিসে পড়াশোনাও করেননি, মাত্র ছ মাসের ট্রেনিং নিয়ে আমেরিকায় ফরাসি রান্নার দিদিমণি হয়ে গেলেন? ফ্রেঞ্চ অ্যারিস্টোক্র্যাটরা কীভাবে খাওয়াদাওয়া করেন, সেই বনেদি আদবকায়দা, আর পদ্ধতিকে আমেরিকা সাধারণ মানুষের কাছে সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন? ক্যারেন হেস নামে এক মহিলা খাওয়া দাওয়ার ইতিহাস লেখিকা। তিনি তো স্পষ্টই বলেছেন—'জুলিয়া চাইল্ড কোন যুক্তিতে নিজেকে ফরাসি রাঁধুনি বলে দাবি করেছেন? তিনি ফরাসিও না। সুশিক্ষিত পেশাদারি রাঁধুনিও না। কোন সালে কী একটু শিখে এসেছিলেন। এখন আর ওসব টেকনিক চলে না।

জুলিয়া সবিনয়ে উত্তর দিয়েছেন—'সত্যিই আমি পেশাদারি রাঁধুনি না। ফরাসি তো নই-ই। 'ফ্রেঞ্চ শেফ' ছিল আমার টিভি শো'র নাম। প্রোডিউসার দিয়েছিল। আমি না। কিন্তু এখনও সেলিব্রিটি শেফ বলতে তাঁকেই বোঝায়। এত খ্যাতি এদেশে রান্নার জগতে কেউ পাননি। রান্নাকে তিনি সম্মানজনক পেশায় রূপ দিয়েছেন। মেয়েদের একঘেয়ে কাজকে সর্বজনীন আগ্রহের বিষয়ে পরিণত করেছেন। আমেরিকায় এখন তিনশোটি রান্নার কলেজে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি দেওয়া হয়। এক তৃতীয়াংশ গ্র্যাজুয়েটই হচ্ছেন মেয়েরা। নামী, দামি হোটেল রেস্তোরাঁয় পুরুষ 'শেফ'-এর আধিপত্য কমে যাচ্ছে। জুলিয়া চাইল্ডের প্রেরণায় মেয়েরা প্রফেশনাল শেফ হয়েছেন। পুরুষরা বাড়ির রান্নাঘরে ঢোকার উৎসাহ পেয়েছেন। রান্নাঘরেই জুলিয়ার ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন।

১০ জানুয়ারি ১৯৯৮

সাহেবদের গোবরডাঙা

নিজেদের গোবরডাঙার সন্তান ভাবতে কত লোকের গর্বে বুক ফুলে ওঠে। গাঁজা পার্কের হাওয়া খেয়ে বড় হওয়া বাঙালি পাড়া চেনাতে গেলে আগে গাঁজা পার্কের নাম বলেন। তাঁর কাছে 'দেশপ্রিয়' এবং 'গাঁজা' সমার্থক শব্দ। নিজের পাড়া সম্পর্কে সকলেরই ভারী টান থাকে। তখন গোবর, গাঁজা তুচ্ছ হয়ে যায়। অবশ্য পবিত্র বস্তু হিসেবে গোবরের প্লাস পয়েন্টও অস্বীকার করা যায় না। পাড়ার নাম, রাস্তার নাম যেমনই হোক, সেখানে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে জায়গাটা কয়লাঘাটা না পগেয়াপট্টি—কে আর সে সব নিয়ে মাথা ঘামায়।

পৃথিবীর সব দেশেই বোধহয় এমন নামধাম চালু আছে। নিউ ইয়র্ক শহরে একটি এলাকার নাম ফ্লাশিং। বাঙালিরা হাসাহাসি করে বলে 'টয়লেট ফ্লাশিং।' কম বাঙালি ছিল সেখানে? পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, চমৎকার পাড়া। দোকান বাজারে ছড়াছড়ি। ফ্লাশিং নাম তো হয়েছে কী? মেরিল্যান্ডের একটা বড় গ্রামের নাম বোরিং। সেখানকার ছেলে কলেজে ভর্তি হবার সময় নিজের গ্রামের নাম বলতেই তার নিজের নাম পালটে গেল। নতুন নাম হল

গ্রেট বোর। পেনসিলভেনিয়ার একটি মেয়ের অবস্থা আরও কঠিন। সে 'ইন্টারকোর্স' নামে একটি শহর থেকে নিউ ইয়র্কে চাকরি করতে এসেছে। আদি বাসস্থান কোথায় সহজে ভাঙতে চায় না।

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো থেকে মায়ামি যাবার পথে একটা জায়গার নাম দেখেছিলাম—'বোকা রাটন'। আমাদের পরিচিত রডনের বউ রীনার ওই নামটা ভারী পছন্দ। আর একটা নাম মনে পড়ছে। অনেকদিন আগে এক ভদ্রলোক নতুন বাড়ি কিনে চেনাশোনাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। তাঁর বাড়ির রাস্তার নাম কে রটিয়ে দিল—গেঁড়ে প্লেস। বানান অনুযায়ী নাকি গেঁড়েই হওয়া উচিত। অথচ আসল উচ্চারণ হল—গিয়র প্লেস। তা সেই গেঁড়ে প্লেসই চালু হয়ে গেল। ভদ্রলোক খুব রেগে উঠতেন।

আমেরিকানদের ধারণা, উদ্ভট নাম দেবার ব্যাপারে নাকি ইংল্যান্ডকে কেউ হারাতে পারবে না। তারা যত রাজ্যের হাস্যকর নাম বহু আগেই কায়েমি করে ফেলেছে। ক্র্যাকপট (মাদক দ্রব্য, গাঁজা পার্কের দেখাদেখিই মনে হয়), ডরবিং, ফ্যাট অ্যাহেড, গিগলস উইক, নেদার পপলটন, ওর্মেলো টাম্প, (পোকামাকড়ের চাষ), ইয়ন্ডার বগলি—যত অদ্ভুত নামের ছড়াছড়ি। একটা গ্রামের নাম হচ্ছে লিটল স্নোরিং (মৃদু নাসিকা ধ্বনি)। সেখানকার লোকেরা আর ঠাট্টা ইয়ার্কি সহ্য করতে পারছে না। গাঁজা পার্কের লোকেদের বাড়িতে কড়া নেড়ে নেড়ে মিস্টার গেঁজেল বাড়ি আছেন? বললে তাঁদের মনে কেমন লাগবে? 'লিটল স্নোরিং-এ ঠিক তাই হয়েছে। ইয়ার্কিবাজ ছেলেরা ফোন করে বলছে—অ্যাই, নাক ডাকা থামাও। সবচেয়ে দুঃখ পাচ্ছেন একটি বিশেষ পদবিওলা পরিবার। তাঁরা বুড়ো বুড়ি আপন মনে থাকেন। বুড়োর নাম এরিক গো টু বেড। বুড়ির নাম মেরি গো টু বেড। এঁরা দিনের বেলা একটুও ঘুমোন না। নাক ডাকা তো দূরের কথা। বুড়ো বাগান করেন। ব্যবসাপত্র দেখেন। বুড়ি বাড়ির কাজকর্ম করেন। অথচ সারাদিন দুষ্টু ছেলেদের ফোন নয়তো দরজায় ঘণ্টি বাজানো—মিস্টার গো টু বেড। আপনি কি একটু একটু নাক ডাকছেন? আসলে ওঁদের পদবির উচ্চারণ হবার কথা গোটাবেড। সে আর কে বলছে? আরও সমস্যা হয় যখন কোথাও চেক পাঠিয়ে কিছু কিনতে চান। শহরের নাম মৃদু নাসিকা ধ্বনি, চেকে নাম সই করেছেন বিছানায় চলে যাও—অচেনা দোকানদার বিশ্বাসই করতে চায় না। দশবার খোঁজ করতে লোক পাঠায়। বুড়ো বুড়ি এই বয়সে আর কোথায় যাবেন? পদবিও পালটানো মুশকিল। লিটল স্নোরিং-এ বাস করে ফোনের জ্বালায় বিরক্ত।

ইংল্যান্ডে একটা গ্রামের নাম আগলি ভিলেজ। সেখানে আগলি উইমেনস ইনস্টিটিউট এর সদস্য হচ্ছেন গ্রামের সব শিক্ষিত মহিলারা। তাঁরা প্রায়ই বড় বড় জ্ঞানী ও গুণী মানুষদের আমন্ত্রণ জানান। সেমিনার হয়, লেকচার হয়, টি পার্টি হয়। আগলি ভিলেজ হলে তাঁরা প্রতিমাসে মিটিং করেন। ৭৫ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান। কত জ্ঞানীজন এসেছেন। বড় বড় সভা হয়েছে। আগলিরা নিজেরা দেশে বিদেশে কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন। কত টি পার্টি, কত বিদগ্ধ জনসমাবেশ। তবু আগলি নাম নিয়ে হাসাহাসির অন্ত নেই। এঁরা সমানে বলে যাচ্ছেন—উইমেনস ইনস্টিটিউট অব আগলি বলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দেওয়া হোক। কিন্তু সেই আগলি উইমেনসই চলে আসছে এখনও। ব্রিটেনের অন্যান্য

জায়গায় যখন মহিলাদের জাতীয় অধিবেশন হয়, এঁরাও যোগ দেন। অন্য সকলে কী সুন্দর সব জায়গার নাম বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। আর এঁরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে বাধ্য হন—আমরা আগলি মেয়েরা আগলি গাঁ থেকে আসছি। জাতীয় অধিবেশনে দাঁড়িয়ে নিজেদের জলার পেত্নি বলতে কার ইচ্ছে করে?

অথচ আগলি গ্রামের সৌন্দর্য আর ঐতিহ্যর কথা অনেকেই জানে। বহু আগে অ্যাংলো স্যাকসন বাগ বৈশিষ্ট্য থেকে এই নামের উদ্ভব হয়েছে। এই উদ্ভট নামের মূল আছে পুরনো দিনের বিশেষ প্রকাশভঙ্গির প্রভাব। সমুদ্রের ধারে সুদৃশ্য একটি জায়গার নাম—ন্যাস্টি। আদি পর্বে বলা হত 'প্লেস অ্যাট দ্য ইস্ট সেটলমেন্ট।' এই অঞ্চলে বহুকাল আগে এসে বসবাস করেছে এমনই একটি পরিবারের পদবি ছিল স্নোরিং।

ইংল্যান্ডে ইংলিশ প্লেস নেম সোসাইটি থেকে ৫৫ ভলিউমের একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিস্তারিত বইটিতে নানা উদ্ভট নামের সম্ভাব্য কার্যকারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। সোসাইটির ডিরেক্টর কেনেথ ক্যামেরন বহু ভাষাবিদ। কিছু অপ্রচলিত ভাষাও তিনি আয়ত্ত্ব করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ক্র্যাকপট মোটেই নেশাভাঙের ব্যাপার নয়। এটি প্রাচীন ডেনিশ শব্দ। অর্থ হচ্ছে কাকের বাসা তৈরির উপযুক্ত জায়গা। গ্রামের নাম পায়রাডাঙা হয় না? বাড়ির নাম আশিয়ানা? তাহলে বিলেতে একটা গ্রামের নাম কাককুঞ্জ হতেই পারে।

নটিংহ্যাম নাকি আসলে ছিল স্নটিংহ্যাম। ব্যাখ্যা—হোমস্টেট অফ স্নটস পিপল অর্থাৎ নাকে নোংরাওলা লোকেদের জায়গা। কিন্তু ১০৬৬ সালে স্ন বাদ চলে গেল। নর্মানরা নাকি স্ন উচ্চারণ করতে পারেন না। সেই থেকে নটিংহ্যাম।

ইংল্যান্ডের শহরে, গ্রামে যত অদ্ভুত নাম শোনা যায় তার মূলে আছে সে দেশে দীর্ঘ সময়ে বহু জাতির আগমন ও সংস্কৃতির প্রভাব। রোম্যান, স্যাকসন, ভাইকিংস ইত্যাদিরা বসবাস করার ফলে তাদের ভাষা থেকে নানা ভৌগোলিক স্থান চিহ্নিত হয়েছিল। পরে ইংরেজি ভাষায় ওই শব্দগুলির অর্থ বদলে গিয়েছে। ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাকার, করণিক, লেখক আর জরিপ বিভাগের ভাষা, লেখালেখির মধ্যে দিয়ে আরও দ্রুত শব্দের পরিবর্তন হয়েছে। ভুল বানানও এ জন্যে দায়ী। একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকা সত্ত্বেও পাঠকের অজ্ঞতার কারণে সেটিকে ভুল প্রয়োগ ভেবে বদলে দেওয়াতে অন্য শব্দ এসে বসেছে। ফলে সম্পূর্ণ বাক্যটিতে ওই নতুন আরোপিত শব্দটির ব্যবহার একেবারে সঙ্গতিবিহীন হয়ে গেছে।

ব্লাবার হাউসেস নামে একটি শব্দ আছে। আমেরিকাতে এই শব্দটিকে তিমি মাছের চর্বি বা বড় সামুদ্রিক প্রাণীর চর্বি সংক্রান্ত শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার অভিধানে দেখছি এর অন্যান্য প্রয়োগও আছে। ব্লাবার মানে ফুঁপিয়ে কাঁদা। নাকে, মুখে ফেনা বা গাঁজলা তোলা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইংল্যান্ডে ব্লাবার হাউসেস নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানকার লোকেদের ধারণা, ওই গ্রামের একটি কারখানাতে এক দল ছোট ছেলে মেয়ে কোনওকালে ভীষণ কান্নাকাটি জুড়েছিল। সেই ফোঁপানো থেকে ওই নাম হয়েছে। ডঃ ক্যামেরনের দেওয়া ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বলেছেন—মধ্যযুগের ব্লাবার হাসান নামে প্রচলিত শব্দ থেকে এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল। মনে হচ্ছে—হাউসেস নিয়র এ বাবলিং

স্প্রিং। এখন বুঝে দেখুন একই গ্রামের নাম কত রকম হতে পারে। মোটাতিমি, হেঁচকিতোলা, না পাগলাঝোরা—কোনটা আপনার পছন্দ?

ব্রিটেনের পুরনো দিনের কৃষি সভ্যতার প্রভাব তার গ্রাম গঞ্জের নামকরণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। চষা খেত, খামার, আস্তাবল, সবজি বাগান, সবই পাওয়া যাবে। গ্রামের নাম হরসি, বানি, কর্নি, সোয়াইন স্টাই, পিস স্ট্রিট, ডগ ভিলেজ, ডংকি টাউন, টোডস মাউথ, ম্যাগটস এন্ড। ঘোড়ামারা, খরগোশপাড়া, শুকর মরনি, কুকুর তলা, গাধানগর, ব্যাংমুখী, ছুঁচোগ্রাম, বলদাপাড়া—এভাবেই হয়ে যায়।

ইংল্যান্ডের আর্দ্র জল হাওয়া, ভেজা মাটি থেকেও কত জায়গার স্যাঁতস্যাঁতে নাম দেওয়া হয়েছে। গ্রামের নাম ফাউলবগ, ডাল, মাক, মোল্ড, মস অফ বারমাকিটি। পচাপুকুর, ভ্যাদভেদিয়া, গোবরপাড়া, ছাতাপাড়া, শ্যাওলাবাড়ি, সোঁদামাটি—কীভাবে মিলিয়ে যাচ্ছি।

সাহেবরা হজম নিয়ে খুব মাথা ঘামান মনে হয়। শহরের নাম বেলচফোর্ড, বারফ্যাম, লিকি এন্ড, স্পিট ইন দ্য স্ট্রিট। অগ্নিমান্দপুর, বাতাসপুর, চাটিগাঁ, বমনপাড়া, অম্বলপুর, হজমিনগর। বড় বড় গ্রামেরও তো সাব ডিভিশন থাকে। ইংল্যান্ডে গ্রামবাসীরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে আরও নাম বানিয়েছিল। গ্রেট স্নোরিং, লিটল স্নোরিং, মিডল ওয়ালপ, নেদার ওয়ালপ (ঘুঁসি) হেলিয়নস বামপস্টেড (রামধাক্কা), স্টিপল বামপস্টেড, শিপি ম্যাগনা (দামড়া), শিপি পারভা (খুদে), এ ভাবে নতুন নামকরণ হয়েছিল। ইংরেজরা আবার খুব উত্তম, অধম নিয়ে মাথা ঘামান বরাবর। যেমন আপার ডার্বি, লোয়ার ডার্বি। সমুদ্রের ধারে গ্রামের সীমানা এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এ ভাবে বোঝানো হত। হাই স্ট্রিট, আপার হ্যামলেট। আমাদের নিউ জার্সিতে এসেও সাহেবরা সেই ট্র্যাডিশন চালিয়ে গেছে। আপার মন্টব্লেয়ার, আপার স্যাডল রিভার—এই সব নামের শহর এখানেও আছে। আপার সার্কুলার রোড আর লোয়ার সার্কুলার রোড, লোয়ার রেঞ্জ—কারা বানিয়েছিল মনে নেই?

শুরুতেই যে লিখেছি নিজের পাড়ার নাম নিয়ে বেশিরভাগ লোকই আসলে মাথা ঘামায় না—কথাটা একেবারে অবান্তর নয়। সোয়াইনফিলড নামে একটি ছোট্ট শহরের মহিলা পোস্ট মাস্টার খুবই বিনীতভাবে জানিয়েছেন—আজ্ঞে না। আমরা শুয়োর কোথাও দেখি না। শুধু ভেড়া দেখতে পাই। ইয়ার্কিবাজ ছেলেদের ফোন পেলে তিনি সমানে এরকম উত্তর দিয়ে যান। ওদিকে গিগলস উইকের লোকেরা বলে—আমাদের গ্রাম নিয়ে হাসার কী আছে? আমরা তো বরং হেসে মরি পাশের গ্রাম উইগলস ওয়ার্থ-এর লোকদের নিয়ে। বুঝুন একবার। উল্টোডাঙার নাম শুনে নাকতলার হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছে। আবার শিপি ম্যাগনার লোকেরা দূরের গ্রাম বাটন ইন দ্য বিনস এর নাম নিয়ে হেসে গড়াগড়ি। দামড়াপল্লী হাসছে ডালমিয়ানগরের নাম শুনে।

ইংল্যান্ডের দক্ষিণ প্রান্তে কর্নওয়ালে গিয়েছিলাম। সেখানে শুধুই গুণের গুনগান। কর্ণিশ শব্দ 'গুন' মানে হল পশুচারণ ভূমি। চার্চে বড় ঘণ্টার নাম গুনবেল। গুন আর্ল, গুন ও গুনিনিজ, গুনের ছড়াছড়ি। এদিকে আমেরিকাতে গুন মানে বোকা লোক। আবার মার্কিন অভিধানে দেখছি গুন মানে ভাড়া করা মারকুট্টে লোক। গুণ্ডার সঙ্গে মিলছে না? অথচ

কর্নিশ শব্দ হিসেবে মেষপালক যিশুর সঙ্গে অনুষঙ্গ রেখেই হয়তো কর্নওয়ালের চার্চের সব কিছুর আগে গুন বসানো হয়েছিল। কর্নওয়ালের লোকদের এতে কিছু ভাবান্তর হয় না। তারা যথার্থ গুণগ্রাহী। বরং তাদের মধ্যে কারও কারও ধারণা, ইংল্যান্ডে পিডল নামে একটা জায়গা আছে, সেটাই সবচেয়ে হাস্যকর নাম। এ শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে জানা যায়নি। মানে হল কুঁড়ের সর্দার। গ্রামের নাম এরকম হলে স্থানীয় লোকেদের হাসির পাত্র হতেই হয়। তারা বাইরে একটু আয়েস করতে ভরসা পায় না। অচেনা লোকেরা এসে 'কুঁড়ে গ্রামের' কুঁড়ের সর্দারদের ছবি তুলে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ কেউ পাশের শহর আপটন স্নডসবেরিতে থাকেন বলে সেখানকার নাম দিয়ে টেলিফোন নিয়েছেন। অন্তত গাইডে কুঁড়ে গ্রামের ঠিকানা থাকবে না।

অন্য কোনও উচ্চারণের কায়দা রপ্ত করতে পারলে বরং একই জায়গার নাম স্টাইল করে বলা যায়। কেওড়াতলাকে অস্ফুট স্বরে কেয়াতলা বলার চেষ্টা করুন তো। গোবরডাঙাকে গৌরডাঙা? আলতো ভাবে বললেই হবে। বিলেতে 'সোয়াইনি' গ্রামের একটি মেয়ে অন্য পাড়ায় গিয়ে 'সুইনিতে থাকি' বলতে চেষ্টা করেছিল। আর সেই আগলি গ্রামের মেয়েরাও কম যায় না। তাদের মধ্যে ক'জন দূরের শহরে গেলে বলে 'উজলি থেকে এসেছি।' সত্যি বলতে কি ভিকটোরিয়ান যুগে আগলি গ্রামের প্রধান পুরোহিত অনেক চেষ্টা চরিত্র করে নামটাকে 'ওকলি' করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। এক তো লোকে সহজে মনে রাখতে পারত না। তার ওপর আগলি গ্রামের সব চিঠিপত্র বিলি হয়ে যেতে লাগল পুরনো ওকলি নামে আর একটি গ্রামে। তখন গ্রামের লোক আবার আগলি নিবাসী হয়ে গেছে। কিছু কিছু মহিলার বক্তব্য—এতে লজ্জার কী আছে? বাইরে চেহারাই কি আসল? তাঁরা সগর্বে একটি স্কুলের নাম রেখেছেন—আগলি ডাকলিং নার্সারি স্কুল।

খবরের কাগজের লোকদের স্বভাব তো আপনারা জানেন। এইসব নাম নিয়ে রঙ্গ করে হেডলাইন লিখতে তাদের অদম্য উৎসাহ। কবে নাকি তারা শুভবিবাহের খবর ছেপেছিল—'ন্যাস্টি বর আগলি বধূ।' আসলে ন্যাস্টি গ্রামের ছেলে আগলি গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। নরফোক অঞ্চলের কাগজে একবার বেরিয়েছিল 'স্নোরিং ম্যান টেকস সিথিং ব্রাইড।' সিথিং হচ্ছে আর একটি গ্রামের নাম। খবর হল উত্তেজনায় টগবগে বউ ঘরে আনল নাক ডাকা বর।

বিজ্ঞাপনের জগতেও এই ধরনের নামকে কাজে লাগানো হয়। ইংরেজিতে 'প্র্যাট' শব্দটি স্ল্যাং হিসেবেও চলে। আমেরিকান ছেলে মেয়েরা যেভাবে কাউকে জের্ক বলে, সেই অর্থে তার মানে অভব্য আচরণ করা। অকারণ আজে বাজে মন্তব্য করা যার স্বভাব সে হচ্ছে জার্ক। প্র্যাটিং বলতে সেই রকমই বিরক্তিকর ব্যবহার বোঝানো হয়। এছাড়া মেয়েদের শরীর সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য হিসেবেও ইংরেজিতে 'প্র্যাট' শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে। ইংল্যান্ডে প্র্যাট বটম নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানকার মেয়েদের খুব লজ্জা করে। কারণ 'প্র্যাট' আর বটম দুই-এ মিলে তাদের বিস্তর অসভ্য কথা হজম করতে হয়। এমনকি একটি ডেনিম জিনস কোম্পানিও বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—তাদের তৈরি শক্ত পোক্ত জিনস নাকি টাফার টু লিভ ইন দ্যান প্র্যাটস বটম।

অর্থাৎ আরও ভারী শরীরের উপযুক্ত। প্র্যাটস মানে ফালতু লোক। প্র্যাটস বটম, মানে আপত্তিজনক ইঙ্গিত—এই সব কথা অগ্রাহ্য করে গ্রামবাসীরা অন্যভাবে গ্রামের নামকে কাজে লাগিয়েছে। তাদের গ্রামে যে কমিউনিটি হল আর, সেটি মেরামত করার জন্যে বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। বুদ্ধি করে তারা ডিজাইনার পোশাকের দোকান খুলে ফেলল। জিনস আর শর্টস কোম্পানিকে অর্ডার দিয়ে নিজেদের গ্রামের নাম মনোগ্রাম করিয়ে নিল। সেই জিনস শর্টস নিজেরা বিক্রি করেছে। আবার বড় শহরের বড় দোকানেও স্টক পাঠিয়ে দেওয়াতে ভালমত বিক্রি হয়েছে। পোশাকগুলোর পেছন দিকে সেলাই করে লেখা ছিল—প্র্যাটস বটমওয়্যার। এমন বিক্রি হয়েছে যে, কমিউনিটি হল সারিয়েও অনেক পাউন্ড বেঁচে গেছে।

লিটল স্নোরিং গ্রামে গো টু বেড পরিবারের একজন ইচ্ছে করেই তার বাড়ির নাম রেখেছিল 'ড্রিম কটেজ।' নাক ডাকা, শুতে যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, পরপর মিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইদানিং তাদের জ্ঞাতিগুষ্টিরা আর হাস্যস্পদ হতে চাইছে না। তারা পদবি সামান্য বদলে নিয়ে এখন হয়েছে গটাবেড। তাই শুনে বেডিং কোম্পানির মহা উৎসাহ। তারা ধরে পড়ল সেই বুড়ো এরিককেই। বেডিং কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখানো হবে মোটা গদির ওপর বুড়ো এরিক গট আ বেড চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছেন। মজার মজার কথা বলছেন। বুড়ো প্রথম রাজি হয়েও পরে না বলে দিয়েছেন। বলেছেন—নিজেদের পদবি নিয়ে গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট হাসির খোরাক হয়েছি। আর বিশ্বশুদ্ধ লোককে বলে বেড়াতে চাই না। নতুন করে তাঁর গদিয়ান হবার কোনও ইচ্ছে নেই।

ব্রিটেনের গ্রামে, গঞ্জে অদ্ভুত নাম শোনা যায় বলে আমেরিকানরা হাসাহাসি করলে কী হবে, রেড ইন্ডিয়ানদের দৌলতে এদেশে তো দুর্বোধ্য নামের ছড়াছড়ি। ওমাহা, আইডাহো, কেনটাকি, ওকলাহোমা, কনেকটিকাটি, সিন্‌সিনাটি—শুধু ট এর টক্কর। আমাদের শহরে একটা লেকের নাম প্যাকন্যাক লেক। অন্যটার নাম নয়নস হেড লেক। প্রথমটা তো ঘোর ন্যাকান্যাকা শোনায়। দ্বিতীয়ই বা কী? সিংহমাথা হ্রদ? পাশের শহরের নাম পিকুয়ানক। নদীর নাম র‍্যামাপো। পাহাড়ের নাম র‍্যামালায়নস্। জঙ্গলের নাম র‍্যামাপো। হযবরল-র এমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ সত্ত্বেও আমাদের শহরটার নাম অবশ্য সাহেবি ধাঁচের। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল বলে এখনও উত্তর নিউ জার্সির শহরে শহরে রাস্তাঘাটের নাম বদলানো হয়নি। মিনেহা বুলেভার্ড, কাচিনা ড্রাইভ, লেনপি রোড, হোপি কোর্ট, মোক্কাসিন ড্রাইভ—এমন কত রাস্তা আছে।

এদেশে জন্তু জানোয়ারের নামে রাস্তা বা শহরও কিছু কম নেই। 'বাফেলো'তে যারা থাকে ওই মহিষাদলের লোক বলে ধরে নিন। বাফেলোরুন রোড আছে বেশ কয়েকটা শহরে। এক কালে মোষ দৌড়োনোর জমি ছিল বোধ হয়। ডিয়ার প্যাথ অবশ্য বেশ শোনায়। হরিণবাড়ির কাছাকাছি। কিন্তু ডগউড ড্রাইভ? ডগউড একটা বুনো গাছের নাম বটে। কিন্তু রাস্তাটা কুকুর গলির মতো শোনায় না? কীভাবে রোড চিমমাংক কোর্ট (কাঠবেড়ালি কোর্ট) কী নেই? বললে বিশ্বাস করবেন? আমি গোবরডাঙাও দেখেছি। পেনসিলভানিয়ার একটি পোলট্রি ফার্মে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। একদিন ভোরবেলা

হাঁটতে বেরিয়ে একটা ছোট্ট রাস্তা আবিষ্কার করি। খুঁটির গায়ে টিনের পাত ঝুলছে। লেখা—কাও ডাঙ রোড।

এদেশে সমুদ্রের কাছাকাছি শহরে গেলে শুধুই গেঁড়ি গুগলির নামে রাস্তা ঘাট চোখে পড়বে। আয়েস্টার বে ড্রাইভ, ক্ল্যামবেক কোর্ট, সি শেল লোড। ম্যাসাচুসেটস-এ যেখানে কেনেডির বসতবাড়ি সেই শহরের নাম হায়ানিজ পোর্ট। একেবারে উত্তর পূর্ব উপকূলের সীমান্তবর্তী দ্বীপ না হলেও সামান্য দক্ষিণে আটলান্টিকের বুকের ওপর ভাসছে ন্যানটাকেট আইল্যান্ড। ওই হায়ানিজ পোর্ট থেকেই জাহাজে যেতে হয়। তিনঘণ্টা মতো লাগে। ওই দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলাম শুধু শঙ্খের নামেই ছোট ছোট কত রাস্তা। ন্যানটাকেট আইল্যান্ডে কনচশেল রোড, কনচা কোর্ট দেখেছি। সাহেবদের শাখারিপাড়া।

নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে আছে গ্রেট নেক, মিডল নেক আর লিটল নেক। বড় গলা শহর, মাঝারি গলা অ্যাভিনিউ আর সরু গলা রোড। খুনোখুনির রাস্তাও এদেশে পাবেন। ফিশকিল শহর আছে আপস্টেট নিউ ইয়র্কে। ক্যাটসকিল, কিলিংটন, আর্থার কিল কিলমারার জায়গা ঢের আছে। ভেবে দেখুন পূর্ব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দক্ষিণ নেভাডা পর্যন্ত বিস্তৃত মরুভূমির নাম ডেথ ভ্যালি। থর মরুভূমির নাম যদি হত থরহরি কম্প, সেই রকমই ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভৌগোলিক বিবরণ আর কি?

এখানে বাড়ির ঠিকানা আর পথ নির্দেশ দেওয়ার সময় এক ভদ্রলোক বেশ স্বদেশিয়ানার পরিচয় দেন। ফোনে বলতে থাকেন—হাইওয়ে থেকে ন নম্বর একশিট নিলেন তো? আচ্ছা বেশ এবার পড়লেন ওল্ড স্টেড রোডে। মানে, পুরনো থিয়েটার পাড়া রোড। ডান দিকে বেঁকবেন। একটু গিয়েই বাঁ দিকে ওয়ার্ট, মানে আঁচিল কোর্ট। আবার ডানদিকে ট্যাডপোল লেন, বাইশ নম্বর। মনে থাকবে তো? আঁচিল থেকে বাঙাচিতে ঢুকবেন...। একজন বন্ধুর বাড়ি যাই কোর‍্যাল, অনিকস, রুবি এমারেল্ড—এই সব ছোট্ট ছোট্ট রাস্তা ধরে। তার পথে পথে পাথর ছড়ানো। এতক্ষণ এমন সব গ্রাম, শহর আর রাস্তার খবর দিলাম যা থেকে হাস্যরস আর অদ্ভুত রসের সামান্য জোগান দেওয়া যায়। তারপরেও কিছু থাকে। পরিচিত একজন বিবাহ বিচ্ছেদের পরে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে অন্য শহরে চলে গেছে। এতকাল যে বাড়িতে থাকল সেই রাস্তার নাম রিটার সুইট লেন।

এ বছর জানুয়ারির প্রথমে শ্মশানযাত্রা। দীর্ঘদিনের বন্ধু পৃথা ঘোষাল কলকাতায় গিয়েছিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চিরকালের মতো চলে গেল। তার স্বামী আর দুটি ছেলে এদেশে। শেষকৃত্যের জন্য দেহ নিয়ে আসা হল। দাহকার্যের দিন ভোর থেকে অবিশ্রাম বরফ পড়ছে। প্রায় ঘোরের মধ্যে সত্তর মাইল পথ পার হয়ে ওদের বাড়িতে পৌঁছেছি। পৃথার মা, ছোট ভাই, বোন, স্বামী, ছেলে দুটি ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল, বোধশক্তিহীন। কাসকেডে সাজানো পৃথার দেহ। সে দৃশ্য সহ্য করা কঠিন।

শেষ যাত্রার সময় হল। পৃথার বাড়ির সামনে কালো গাড়িতে ফুলে ঢাকা ওর কাসকেড। পেছনে আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিতজনের সারবন্দি গাড়ি। এই বিশেষ দিনে সব গাড়িতে হেড লাইট জ্বালিয়ে দিতে হয়। সামনে ধীর মন্থর গতিতে পৃথার গাড়ি চলেছে। আমাদের নিঃশব্দ অনুসরণ। এই মিছিল পথে কোথাও থামবে না। হর্ন বাজাবে না। ট্রাফিক আলোর সংকেত

মানবে না। শবযাত্রীর মিছিলের জন্যে অন্য সব গাড়ি পথ ছেড়ে দেবে। আমাদের যাত্রা শেষ হবে ক্রিমেটোরিয়ামে পৌঁছে। রাস্তা যেখানে মোড় ঘুরছে, একবার ওর বাড়িটা দেখার চেষ্টা করলাম। পৃথার বড় সাধের সাজানো সংসার। ১৫ নম্বর হক ড্রাইভ। বাজপাখির নামে রাস্তার নাম। সেই প্রথম মনে হল—এক শ্যেনপক্ষী কোথাও অপেক্ষায় ছিল।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

· মরণের ডাক

নামটা জব্বর দিয়েছি না? 'যমদূতের হাতছানি'ও দিতে পারতাম। শুধু যমালয় সম্পর্কে জীবন্ত মানুষের ঘোরতর সংশয় বিবেচনা করে ও পথে গেলাম না। তার চেয়ে মরণ ভাল। সদ্য নিকসন মারা গেছেন। তবলা বিহীন করুণ বেহালার বদলে প্রচার মাধ্যম আপাতত মৃত্যুর মহিমা প্রচারে ব্যস্ত। বেঁচে থাকতে যত সমালোচনাই হোক, মৃত্যুর পরে আর নতুন করে শব-ব্যবচ্ছেদ নয়। ধর্মযাজক বিলি গ্রেহাম বেশ বলেছেন। মৃত্যুর কাজ হল ঢেলে সাজানো। জীবনের তাবৎ অসঙ্গতি কেটে, ছেঁটে সমান করে দেওয়া।

আমি মনে করছি 'দুরমুশ' শব্দটা আরও লাগসই শোনাবে। মৃত্যুদণ্ডের কাজ কী? জীবনের অসমান জমিকে পিটিয়ে একেবারে ঝাঁ চকচকে উঠোন বানানো। সেখানে আমি নেই, তুমি নেই, কেউ নেই, আছে শুধু এক ঝাঁক পায়রা। মানে অনাবিল শান্তি আর কি! কমিউনিজমের গুলগল্পে উদ্দীপ্ত এক বাঙালের উত্তেজনা মনে পড়ছে— চিতাভইস্মে হইতে হইবো তাগো সবার সমান...।

এবারে লেখার বিষয় হল—জনপ্রিয় বই। অথচ শুরু করলাম শোক সংবাদ দিয়ে। পরীক্ষাকে যাঁরা শিয়রে শমন ভাবতে অব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা যদি বা নামকরণের মধ্যে সামান্য সঙ্গতি খুঁজে পান, অন্যেরা তো বিলক্ষণ বিরক্ত হবেন। বইয়ের দোকান আর শ্মশান এক হল? জল আর জলপাই কি এক? না, এমন বিশ্রী তুলনা কখনও দেওয়া যায় না। শুধু একটি কারণে মরণকে ডাকাডাকি করেছি। কারণটি হল—বইয়ের বাজারে এখন মৃত্যুর সাংঘাতিক ডিম্যান্ড! পাঠকরা সকলেই এখন দল বেঁধে মারের সাগর পাড়ি দিতে চায়। বইগুলো হল ভয় ভাঙানোর নৌকো।

এ শহরে মোট ছ'টি বইয়ের দোকান। মাঝে মাঝে 'বার্নস অ্যান্ড নোবল' আর 'ওয়ালডেন বুক স্টোর'-এ নতুন বইয়ের সম্ভার দেখতে ঢুকে পড়ি। জমে থাকা পুরনো স্টকের সেল দেয়। তবে সেও ভাল মন্দ মিশিয়ে। লাইব্রেরির সুবাদে এমনিতেও ঝট করে আনকোরা বই কেনা হয় না। একবার তো রুশদি সাহেবের সেটানিক ভার্সেস কিনতে গিয়ে কী উত্তেজনা! সেদিন 'ওয়ালডেন বুক স্টোর'-এর টেলিফোনে কে বা কাহারা হুমকি দিয়েছে! বোমা মেরে বইয়ের দোকান উড়িয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে। সলমান রুশদির

'শয়তান'-কে ঠোঙায় ভরে, সিকিউরিটি গার্ডকে একটিবার ঠোঙা পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে, শেষমেশ বই সমেত অক্ষত দেহে মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মতো বেরিয়ে এলাম। সন্ত্রাসবাদীরা অবশ্য ওয়ালডেন বুক স্টোরে হানা দেয়নি। তবু হুমকি তো দিয়েছিল! যাই হোক, মাঝে মাঝে বইয়ের দোকানে ঢুকে দিব্যি সময় কেটে যায়। বেস্ট সেলারের ফর্দ দেখি। পরে লাইব্রেরিতে গিয়ে ফোকটে পেয়ে যাই।

বার্নস অ্যান্ড নোবল দোকানে নিউ এজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি অংশ আছে। সেখানে, সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে—এমন ধরনের বইয়ের সমাবেশ। বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক নয়। বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী নানা বিষয়ে সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে লেখা নির্বাচিত কিছু বই ওই বিভাগে পাওয়া যায়। গত দেড়/দু'বছর ধরে নিউ এজ ডিপার্টমেন্টে যমরাজত্ব বিরাজ করছে। মরণের আগে, পরে—সব আছে। মৃত্যু নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাদের জনপ্রিয়তাও এক কথায় অভূতপূর্ব! ভূতপূর্ব লোকজন সম্পর্কে আগ্রহ থেকেই হোক, কিংবা নিজের ভূত, ভবিষ্যৎ ভেবেই হোক,—পাঠক অভিভূত হয়ে সে সব পড়ছে। আপনাদেরও একটা ফর্দ ধরিয়ে দিই। অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছে—এমব্রেসড বাই দ্য লাইট, হাউ উই ডাই, দ্য টিবেটান বুক অফ লিভিং অ্যান্ড ডাই, এ নেসেসারি এন্ড, সেভ্ড্ বাই দ্য লাইট, ফাইন্যাল গিফটস্, ফাইন্যাল একজিট্, লাইফ আফটার লাইফ, রি-ইউনিয়নস : ভিশনারি এনকাউন্টারস উইথ ডিপার্টেড লাভড ওয়ানস্।

বইগুলোর নামের মধ্যেই কত রহস্য উঁকি দিচ্ছে। 'এমব্রেসড বাই দ্য লাইট'-এর মানে কী? এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে? লেখিকার নাম বেটি জে ইডি। প্রকাশনা—গোল্ড লিফ প্রেস। নন ফিকশন বেস্ট সেলার লিস্টের এই বইটি সারা আমেরিকার বইয়ের দোকানে এক মিলিয়ন কপির বেশি বিক্রি হয়েছে। এ তো হল হার্ড কভারের কপির বিক্রির হিসেব। পেপার ব্যাক কপির জন্য অকশনে দস্তুর মতো ১.৫ মিলিয়ন ডলার দিয়ে ব্যানট্যাম বুক কোম্পানিকে ছাপানোর রাইট পেতে হয়েছে। পেপার ব্যাক সংস্করণ বেরবে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। জেনে আশ্চর্য হবেন, লেখিকার এটি প্রথম বই। গোল্ড লিফ প্রেসও নতুন প্রকাশক সংস্থা। দুই নবাগত মিলে মৃত্যুর কারবার করে প্রকাশনার জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। মহিলা কী এমন লিখেছেন যে বইটি জনপ্রিয় বইয়ের তালিকার শীর্ষে পৌঁছে গেল? এমব্রেসড বাই দ্য লাইট-এর বিষয়বস্তু হল—স্বর্গীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ। বেটি জে ইডি ব্যক্তিগত জীবনে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেই সময় কীভাবে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনি যিশুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন—লেখার মধ্যে তারই বর্ণনা আছে। বৈজ্ঞানিক ভাবনার আলোকে নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। '৯২ সালে বইটি বাজারে এলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিছু সময় লেগেছে। লেখিকা এতকাল কোনওরকম লেখালেখিও করেননি। এ জন্যে বই তেমন বিক্রি হচ্ছিল না। হঠাৎ গত বছরে সেপ্টেম্বর নাগাদ টেলিভিশনের একটি টক্-শো-তে ডাক পেলেন। উইক ডে-তে বিকেল চারটের সময় অপরা উইনফ্রে শো—এদেশে রীতিমতো রীতিমত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই মহিলাটিকে হয়তো আপনারা 'কালার পার্পল' সিনেমায় প্রধান ভূমিকা অভিনয় করতে দেখে থাকবেন। তিনিই টক শো পরিচালনা করেন। অপরার ডাক

পেয়ে লেখিকা বেটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। সেখানে নিজের বই প্রসঙ্গে, মৃত্যুর সান্নিধ্যে পৌঁছে অসাধারণ অনুভূতি প্রসঙ্গে এবং যিশুকে দেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এমন কথাবার্তা বললেন যে, দর্শকরা বহু প্রশ্নের পরেও তাঁর অভিজ্ঞতাকে 'কাল্পনিক' বলে অমর্যাদা করতে পারলেন না। এর পরে বেটি অন্যান্য টক-শোতেও এসেছেন। তাঁর বলার ভঙ্গির মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য কিছু ছিল। নিজেকে তিনি কোথাও মস্ত বড় ভক্ত বলে প্রচার করেননি। ঘটনাচক্রে যেন একজন সাধারণ মাপের মানুষ ওই অপার্থিব অভিজ্ঞতার শরিক হতে পেরেছেন। এই ব্যাপারটি পাঠকদের আকর্ষণ করেছে। দ্বিতীয়ত মৃত্যুকে কখনও বিয়োগান্ত পরিণতি হিসেবে চিহ্নিত করেননি। তাঁর রচনায় মৃত্যু একাধারে আধ্যাত্মিক এবং আনন্দময় অনুভূতির চূড়ান্ত উপলব্ধি। প্রকাশকরা মনে করছেন—মৃত্যু সম্পর্কে এমন ভাল ভাল কথা সাধারণ মানুষের পড়তে ভাল লাগে। শেষের সে দিন যে ভয়ঙ্কর নয়, জানলে একটু সাহস পাওয়া যায়।

বেটি জে ইডি-র জনপ্রিয়তা লক্ষ করে অন্য এক প্রকাশক সংস্থা খুব আশা করেছিল তাদের বই রি-ইউনিয়নস : ভিশনারি এনকাউন্টারস উইথ ডিপার্টেড লাভড ওয়ানস-এর লেখকও বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবেন। তাঁর নাম রেমন্ড মুডি। ইনি এমনিতেই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। প্রায় কুড়ি বছর আগে—'লাইফ আফটার লাইফ' লিখেছিলেন। বিষয় ছিল—প্রায় শ'খানেক মৃত্যুপথ যাত্রীর পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতার বিবরণ। এদের প্রত্যেকের নাকি হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাইরে থেকে বায়ু সঞ্চালন করে অর্থাৎ রিসাসিটেশনের সাহায্যে হৃদযন্ত্র চালু করা হয়েছিল। মধ্যবর্তী সময়ে তাঁদের যে অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল—রেমণ্ড মুডি তারই ওপর বই লিখেছিলেন। বইটি প্রায় কয়েক লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাঁর দ্বিতীয় বই 'রি ইউনিয়নস : ভিশনারি ওয়ান্স' যে আবার সাড়া জাগাবে, এ নিয়ে তাঁর বা প্রকাশকদের বিশেষ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এ যাত্রা 'অপরা উইনফ্রে' শোতে দর্শকরা আদৌ অভিভূত হলেন না। রেমন্ড মুডির দ্বিতীয় বইয়ের বিষয়বস্তু হল—মৃত আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার বর্ণনা। যে কোনও কারণেই হোক, ঠিক জমাতে পারেননি। যিশুর সঙ্গে দেখা হওয়া এক কথা। লোকের আগ্রহী হতে পারে। কিন্তু কে ওই মুডি সাহেবের চন্দ্রবিন্দু প্রাপ্ত জ্যাঠা, খুড়ো, মাসি, পিসির গল্প শুনতে যাবে? মনে হয় স্বর্গীয় গুষ্টিবর্গের সঙ্গে জনে জনে দেখা করতে গিয়েই গণ্ডগোল হয়ে গেছে! অবশ্য 'টক শো'-তে লোকেরা অবিশ্বাসী মুখ করে চ্যালেঞ্জ করেছে মানে এই নয় যে বইয়ের দোকানে তার কাটতি হবে না। কারণ বইতে নাকি তিনি ভারী মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। প্রকাশকদের বক্তব্য এ বই ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশি বিক্রি হবে।

ওই প্রকাশনা সংস্থার নাম র‍্যানডাম হাউস। এদের আর একটি অলৌকিক জলযানও বাণিজ্যপথে নেমে পড়েছে। বইয়ের নাম সেভড বাই দ্য লাইট। লেখকের নাম ড্যানিয়ন ব্রিংকলি। তিনি নাকি সর্ব সাকুল্যে দুবার মারা গিয়েছিলেন। প্রথমবার বাজ পড়ে শক খেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে শেষ এবং অশেষ। এখন তাঁর সাংঘাতিক ক্ষমতা হয়েছে অর্থাৎ সাইকিক শক্তির অধিকারী হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে

ড্যানিয়নের সেভড বাই দ্য লাইট পাঠকদের বন্দরে ভিড়ে যাবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—বিদ্যুৎ চমকে, বাজ পড়ে মারা যাবার পর 'সেভড বাই দ্য লাইট' হল কোন যুক্তিতে? স্ট্রাক বাই দ্য লাইট হবে তো? বুঝেছি, এ আলো সে আলো নয়! বাজপড়া সাহেব পরে আলোকের ঝর্নাধারায় স্নান করে এসেছিল। পাঠকদের সেই আলোর কণা বিচ্ছুরণ করতে এসেছে।

মৃত্যু নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বই লেখা অবশ্য নতুন ঘটনা নয়। পঁচিশ বছর আগে এলিজাবেথ কাবলার রসের লেখা অন ডেথ অ্যান্ড ডাইংও ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম ওই বিষয়ে বেস্ট সেলার বই হিসেবে দারুণ বিক্রি হয়েছিল। তারপর থেকে প্রকাশকরা এই ধরনের বইয়ের ওপর নির্ভর করে ভাল রকম ব্যবসা করছেন। এমব্রেসড বাই দ্য লাইট এখন প্রকাশকের ঘরে প্রভূত ডলার আনছে।

শেরউইন বি নিউল্যান্ডের লেখা হাউ উই ডাই কয়েকমাস হল বাজারে এসেছে। এ বইটিতে লৌকিক তত্ত্ব, তথ্যের উপাদান-ই বেশি। কীভাবে নানা রোগে মানুষ মারা যায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে জীবনী শক্তি ক্ষয় হতে থাকে, অসুস্থ মানুষের কষ্ট, অশক্ত বৃদ্ধের অসহায় অবস্থা, প্রিয়জন বিয়োগের আগে এবং পরে মন শান্ত রাখার প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্দেশ্য—যা অনিবার্য, তার সম্মুখীন হয়ে ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া। নিজের বই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য—মৃত্যু বিষয়ে লেখা বই যে ক্রমশ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তার কারণ আমরা জীবনের শেষ রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছি। ষাটের দশকের শুরুতে আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকে চূড়ান্তভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। যৌন উন্মাদনার মধ্যে দিয়ে তার স্বরূপ দেখাই ছিল সে বয়সের ধর্ম। মৃত্যুও এমনই এক রহস্য, যাকে আমরা গোপনে, গভীরভাবে চিন্তার মধ্যে লালন করি।

লেখকের উদ্দেশ্য যদি মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন হয়, তবে সে কাজে তিনি একান্তই বাস্তবসম্মত উপায় অবলম্বন করেছেন। আমরা কী ভাবে মরি—তার তিল তিল বর্ণনায় কোনও কার্পণ্য করেননি। সেই করুণ ও যন্ত্রণাদায়ক পরিণতি সম্যক বুঝিয়ে দিয়ে মোকাবিলার সাহস সঞ্চয় করতে বলছেন। বইটি আঞ্চলিক জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে বেস্ট সেলার লিস্টে এসেছে।

বার্নস অ্যান্ড নোবলের মতো বিখ্যাত দোকানে নিউ এজ বিভাগে মরণের পরে জাতীয় বইয়ের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। পাঁচ বছর আগে সাইকোলজি বইয়ের বিভাগে মৃত্যু বিষয়ে যত বই এনে রাখা হয়। অথচ নিউ এজ বিভাগে মৃত্যু বিষয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যায় বিক্রি ইতিমধ্যে ছ'গুণ বেশি হয়ে গেছে। জনপ্রিয় বইগুলির অন্যতম হল—দ্য টিবেট্যান বুক অফ লিভিং অ্যান্ড ডাইং। '৯২ সালে প্রকাশিত বইটিতে—মৃত্যু প্রসঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

'ডাবল ডে' প্রকাশনা থেকে সদ্য বাজারে এসেছে 'এ নেসেসারি এন্ড।' লেখকের নাম নিক টেলর। তাঁর বাবা, মায়ের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকে স্মৃতিচারণ করেছেন। বইয়ের পাতায় পাতায় তাঁর বাবার আঁকা উডকাটের ছবি।

মৃত্যুর এমন রমরমা দেখে নার্সরাও বসে নেই। তাঁদের তো দৈনিক অভিজ্ঞতা থেকেই কত 'মরণের আগে' লিখে ফেলা সম্ভব। তা, দুই নার্স মিলে মিশে এমন একটি বই লিখেও ফেলেছেন। তাঁরা আসন্ন মৃত্যুপথ যাত্রীদের সেবা করেন। নিদেনকালে মানুষ কী চায়, কী বলে, কী করে—সব দেখে শুনে 'ফাইনাল গিফট্স' লিখেছেন। অন্তিমের জ্বালা, যন্ত্রণার পরে—এই কি গো শেষ দান। অবশ্যই ঈশ্বরের উপহার। নার্সদ্বয়ের সাহিত্যকর্মও ভালই বিক্রি হচ্ছে। মাসে খানকুড়ি করে অন্তত অনেক দোকানেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

বেটি জে ইডি-র জনপ্রিয়তা থেকে বহু লেখক লেখিকা প্রেরণা পেয়েছেন। প্রকাশকের কাছে ঘন ঘন মৃত্যু প্রসঙ্গে লেখা পাণ্ডুলিপি জমা পড়ছে। বইয়ের দোকানের মালিকরা আশা করছেন ক্রমশই আরও বই বাজারে আসবে। আমেরিকায় প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি বই-এর দোকানে পরলোক বিষয়ে বই-এর সংখ্যা গত কয়েক বছরের তুলনায় অনেক বেশি রাখা হয়েছে।

মৃত্যু সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়ার কাজে এদেশে কিছু সভা সমিতিও ভীষণ তৎপর। হেম্লক সোসাইটি আছে। চয়েস ইন ডাইং দল আছে। তারা আপনাকে বোঝাতে চায়—মৃত্যুকে কব্জা করো। কোনকালে তোমার শেষ উপহারের লগ্ন হবে বলে, জরদগব হয়ে পড়ে থাকবে? কম বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে অসহ্য কষ্ট ভোগ করবে? তার চেয়ে সময় থাকতে প্রস্থান করো। লিভিং উইলে লিখে রাখো—কখনও যেন তোমাকে নাকে, মুখে যন্ত্রপাতি পরিয়ে নলরাজার মতো বাঁচিয়ে রাখা না হয়। হুইল চেয়ারে বসে অবলা প্রাণীর মতো চেয়ে থাকার চেয়ে অগৌরব আর কিছু নেই। অসহ্য রোগ যন্ত্রণাই বা সহ্য করতে হবে কেন? সোজা লিখে দাও—আমি মরতে চাই। তারপর আত্মহত্যা করতে পারো, কিংবা খুনে ডাক্তার ক্যাবোরকিয়ান মার্কা কাউকে সাহায্য করতে পারো। যা তোমার পছন্দ। মোট কথা, হয় দেহে, মনে সুস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকো। নয়তো জহরব্রত পালন করো। ইচ্ছা মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কী আছে?

এইসব ফুসলানি দিয়ে এক বিজ্ঞানী বই লিখেছেন। তাঁর নাম ডেরেক হামফ্রে। বছর তিনেক আগে—'সেলফ ডেলিভারেন্স' নামে লেখা বইটির মধ্যে প্রেসক্রিপশনের ছড়াছড়ি। কোন অবস্থায় কী ওষুধ কিনে খেলে মৃত্যু অবধারিত, সে বেশ খোলসা করে দেওয়া আছে। ডাক্তারের সাহায্য নিতেই হবে। কারণ প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধগুলো কেনা যাবে না। ডেকের হামফ্রের বই পড়ে পড়ে কেউ আত্মহত্যার ব্যবস্থা করেছে কিনা জানা যায়নি। তবে তাঁর 'সেলফ ডেলিভারেন্স'-এর সাড়ে চারশো হাজার কপি ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে।

মোটামুটি এই হচ্ছে বইয়ের ফর্দ। ইদানীং এ ধরনের বইয়ের পাঠক সংখ্যা কেন বেড়ে যাচ্ছে, সেও এক লক্ষণীয় বিষয়। কারা মৃত্যু বিষয়ে এত বেশি চিন্তা করছেন? দেখা যাচ্ছে, এও সেই ষাটের দশকে যৌবনে পা দেওয়া ছেলে মেয়ের দল। এখন অবশ্য তাঁদের আর যুবক, যুবতী বলা যাবে না। মধ্যবয়সী বললেই যথার্থ শোনায়। আমেরিকায় যারা এক সময় প্রথা আনুগত্যের বিরোধিতা করেছিল, ফ্লাওয়ার চিলড্রেন, হিপি কালচার, যে নামেই তাদের বৈশিষ্ট্য বোঝানো যাক, এখন তারা এবং তাদের সমসাময়িক মানুষ জীবনের অন্য রূপ প্রত্যক্ষ করছে। বিশেষ করে বাবা, মায়ের মৃত্যু তাদের মনের ওপর গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করছে। বিচ্ছেদ বেদনায় সান্ত্বনা পাওয়া যাবে—এই আশায় তারা মৃত্যু সম্পর্কে গবেষণামূলক বইপত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেখানেই কিছু ব্যাখ্যা বা আলোচনার সূত্র পাওয়া গেছে, সেইসব বই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শুধু বাবা, মায়ের মৃত্যুই প্রধান কারণ নয়, নিজেদের পরিণতি নিয়েও প্রশ্ন জাগছে। সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় মন বিচলিত হচ্ছে। পারিবারিক জীবনে মৃত্যু এক অপ্রতিরোধ্য নির্মম ঘটনা উপলব্ধি করে এদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। মৃত্যুকে সহজে, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এরা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ বহু ধরনের বইপত্র পড়ছে। শোক, বিচ্ছেদ বেদনা ও মৃত্যুভয় জয় করার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে রাখা। ধর্মগ্রন্থের ওপর নির্ভর করে অথবা চার্চ, সিনাগগে সাপ্তাহিক সমাবেশে যোগ দেওয়ার পরেও এদের অজানাকে জানার আগ্রহে খামতি নেই। জীবন জিজ্ঞাসা বলে কথা। অনেকেই পরলোক সংক্রান্ত সভাসমিতির সদস্য হয়। বৈতরণী পার হওয়ার আগে ঘাটে বসে সন্দেহ নিরসনের সেমিনার। ধর্মযাজক, নিরীশ্বরবাদী, দার্শনিক, জীব-বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী—কতজনের কত ব্যাখ্যা শোনা যায়। আর বইগুলি যে ইদানীং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তার কারণ সম্ভবত মৃত্যু বিষয়ে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। অর্থাৎ পাঠক লেখকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারছে। তত্ত্ব আর তথ্যের নীরস বিশ্লেষণে যারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তাদের কাছে, ওই বইগুলির আন্তরিক প্রতিবেদনের মূল্য অধিক হওয়াই সম্ভব।

বলছেন অজানাকে জানার জন্যে গীতা, উপনিষদই যথেষ্ট? নচিকেতা থেকে অভেদানন্দ, বিভূতিভূষণের দেবযান—সব পড়ে ফেলেছেন? মরণ যে শ্যামসমান, এমন ভরসা পেয়েই সাহসে বুক বেঁধে বসে আছেন? ভাল। 'বেস্ট সেলার' পড়ার দরকার হবে না। অন্ধকার টানেল পার হয়ে ওপারে পৌঁছে জ্যোতি দর্শন, অপারেশন থিয়েটারে সূক্ষ্ম দেহে মিলিং-এর সঙ্গে মিশে গিয়ে নীচের টেবিলে নিজের স্থূল দেহে রক্ত গঙ্গা দর্শন ও বিচ্ছিন্নতাবোধ—কিছুই বিশ্বাস করেন না? আর ঈশ্বরের সঙ্গে গল্পগাছা? সেও 'কল্পনা কবি কথন?' তবে আর আমার ভেবে রাখা বইয়ের নামগুলো কী কাজে লাগবে? বেস্ট সেলার লিস্টের অনুপ্রেরণায় আরও জব্বর সব নাম ঠিক করেছিলাম। জীবন নদীর ওপারে কোথায় আলো, কেমন করে পটল তোলে? তিব্বত মওত্ ঔর মহব্বৎ, শেষের প্রলাপ, আত্মহত্যার সরল পন্থা, আত্মার আত্মীয়—ইত্যাদি সব নির্বাচন বৃথা গেল! ভারী পছন্দ হয়েছিল শীর্ষেন্দু মুখার্জির লেখা থেকে চুরি করা নাম—আবার দেখা হবে। রেমন্ড মুডির রিইউনিয়নস্ : ভিশনারি এনকাউন্টারস উইথ ডিপার্টেড লাভড ওয়ানস-এর অনুবাদ করলে নির্ঘাৎ ওই নামটা দিতাম।

লক্ষ করছি মরণের রহস্য সন্ধানে সাহেবরা ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠেছে। জ্ঞান পিপাসায় অধীর! ইউনিটেরিয়ান চার্চে সর্ব ধর্মের সমন্বয় হয়। একদিন এক সাহেবের বক্তৃতায় শুনলাম—দ্য সোওল ক্যান নেভার বি কাট টু পিসেস বাই এনি ওয়েপন, নর বার্নড বাই ফায়ার, নর ময়স্টেনড বাই ওয়াটার, নর উইদারড বাই দ্য উইন্ড...

দিস ইনডিভিউজুয়াল সোওল ইজ আনব্রেকেবল অ্যান্ড ইন্সলিউব্‌ল, অ্যান্ড ক্যান বি

নিদার বার্ন্ড নর ড্রায়েড। হি ইজ এভার লাস্টিং, প্রেজেন্ট এভরি হোয়ার, আনচেনজেব্‌ল অ্যান্ড ইটারনালি দ্য সেম...।

কোন বেস্ট সেলারের কত নম্বর অধ্যায় থেকে অনুবাদ আপনি বিলক্ষণ জানেন।

৪ জুন ১৯৯৪

বার্ধক্যে দারিদ্র্যের কষ্ট

কুড়ি বছরের বেশি হয়ে গেল আমেরিকায় দরিদ্র বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্যে ফ্রি মিল ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী—যাঁদের বয়স ষাট বছরের ওপরে, তাঁদের যদি দু বেলা খাওয়ার সংস্থান না থাকে, তবে সরকার থেকে প্রতিদিন দু বেলা পর্যাপ্ত খাবার পাঠানো হবে। বহু বছর ধরেই অভাবগ্রস্ত বয়স্ক মানুষরা সরকারের দাক্ষিণ্যে পেট ভরে খেতে পাচ্ছেন। কিন্তু ক্রমশ বৃদ্ধ সমাজে দারিদ্র্য দশা এমন হারে বেড়ে চলেছে যে, ইদানীং কয়েক লক্ষ মানুষ ওই ফ্রি মিলের জন্যে সরকারি তালিকাভুক্ত হবার অপেক্ষায় রয়েছেন। ফেডারেল ফুড প্রোগ্রাম ওই চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস-এর 'এজিং' দফতর থেকে জানিয়েছে—এই প্রথম বৃদ্ধ মানুষদের ওয়েটিং লিস্টে রাখতে হয়েছে। পুষ্টির অভাবে দুর্বল, ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করতেও সময় লাগছে।

সত্তরের দশকে এই সমস্যা এমন গুরুতর ছিল না। বৃদ্ধ সমাজে খাদ্যের অভাব, অনটন বিশেষ প্রকট ছিল না। তা সত্ত্বেও সরকারি উদ্যোগে 'মিলস অন হুইলস' মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল। প্রোগ্রাম অনুযায়ী রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে কমিটি গঠন করে, সরকারি অর্থে ঘরে ঘরে দু বেলার খাবার পৌঁছে দেওয়া হত।

ক্রমশ চাহিদা বাড়তে থাকল। গত বছরের হিসেব অনুযায়ী—৮২৭,০০০ বৃদ্ধ বৃদ্ধা ওই ফ্রি মিল পেয়েছেন। এছাড়া সারা আমেরিকায় যত সিনিয়র সিটিজেন সেন্টার আছে, সেখানে ২.৫ মিলিয়ন মানুষ সরকারি সহায়তায় সাবসিডাইজড লাঞ্চ খেয়েছেন।

- কিন্তু গত দশ বছরের মধ্যেই এদেশে এক ধনী বৃদ্ধ সমাজও গড়ে উঠেছিল। আগের পুরুষের তুলনায় যেহেতু এঁরা বেশি কৃতী, বেশি অর্থবান, এঁদের সাচ্ছল্য ও সুস্বাস্থ্যের ছটায়, অন্য দল ম্লান হয়ে গেলেন। তখন আর বার্ধক্যে খাদ্যাভাব নয়, ইস্যু ঘুরে গেল অন্যদিকে। ওয়াশিংটনে জাতীয় ইস্যু হিসেবে গুরুত্ব পেল হেলথ কেয়ার রিফর্ম, সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটের উন্নতি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত বৃদ্ধ সমাজের অবসর জীবনের নানা সুখ সুবিধার কথা ভাবতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অভাবী মানুষদের এলডারলি নিউট্রিশন প্রোগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারল না। ওদিকে রাষ্ট্রের

কেন্দ্রীয় অর্থাগারে ঘাটতি কমাতে গিয়েও অনেক সোস্যাল প্রোগ্রাম অর্থাৎ দান ধ্যান বন্ধ করে দিল।

ফলে, অবস্থা যে কী দাঁড়াবে অনুমান করে নিয়েই ওয়াশিংটনের দ্য আরবান ইনস্টিটিউট একটি স্টাডি এবং সমীক্ষা পরিচালনা করল। ওই ইনস্টিটিউট হচ্ছে একটি বেসরকারি, অলাভজনক, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান। বার্ধক্যে খাদ্যাভাব নিয়ে এরা সারা আমেরিকার মধ্যেই একটি স্টাডি পরিচালনা করেছে। ফলাফল হচ্ছে—প্রায় ৪.৯ মিলিয়ন বৃদ্ধ বৃদ্ধা, (যাট বছরের ওপরে যত মানুষ আছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ১৬ ভাগ) হয় পেট ভরে খেতে পান না, নয় অপুষ্টির জন্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারণ প্রথমত দারিদ্র্য, দ্বিতীয়ত শারীরিক অবস্থার জন্যে বাজারে যেতে পারেন না, রান্নাবান্নাও করতে পারে না। অর্থাৎ অর্থবল, লোকবল দুয়েরই অভাব।

ওই স্টাডি থেকে আরও জানা গেছে—অভাবী ওইসব বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মোট তিনভাগের মধ্যে দুভাগেরই এমন দুরবস্থা যে তাঁদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের ফুড অ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্টের সাহায্যই পৌঁছয়নি। সরকারি ফুড স্ট্যাম্প অর্থাৎ সুপার বাজারে যা দেখিয়ে বাজার করা যায়, তাও পৌঁছয়নি। দ্য আরবান ইনস্টিটিউট এ জন্যে ওয়াশিংটনের সরকারি বিভাগের গাফিলতিকে অংশত দায়ী করেছে। 'এডিং' দফতরে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা এতকাল এদেশে বার্ধক্যের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে খাদ্যাভাবকে সমান গুরুত্ব দেননি। ওদিকে খাদ্যাভাব ও দারিদ্র্য নিয়ে সরকারের যে বিভাগ কাজ করছে, তারা বার্ধক্যের দিকে নজর দেয়নি। মাঝখান থেকে গরিব ও ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধারা দুই দফতরেই দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থাগারে ঘাটতির দরুন সমস্যা আরও গভীর হয়েছে। অভাবী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। বাজারে খাদ্যামূল্যও বেড়ে গেছে। অথচ সেই অনুপাতে ফেডারেল নিউট্রেশন প্রোগ্রাম বাজেট বাড়ানো হয়নি। শেষের দশ বছরে বাজেট সামান্য বেড়েছে। ওদিকে শুধু আশির দশকেই বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা কুড়ি ভাগের ওপরে। এখন তো আরও বেশি হয়েছে।

ফ্রি মিলের ভরসায় বসে আছেন ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ জন ফিশার। অবসরপ্রাপ্ত ট্রাক ড্রাইভার জনের মাসিক আয় হচ্ছে ৫৪১ ডলার। সোশ্যাল সিকিউরিটি ভাতা হিসেবে পাওয়া অর্থ দিয়ে বাড়িভাড়া, ইউটিলিটি বিল আর অন্যান্য দরকারি খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। দু বছর হল তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। জন আথ্রাইটিসের জন্যে ভাল করে হাঁটতে চলতে পারেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করার মতো ক্ষমতা নেই। বাড়ি থেকে সুপার বাজারের দূরত্ব এক মাইলের বেশি। অতদূর হাঁটতে পারেন না। ডায়াবিটিস আছে, চোখে গ্লকোমা আছে, খুবই অশক্ত শরীর। কোনওমতে লাঠি নিয়ে হেঁটে হেঁটে রোজ একটা সস্তার ডাইনিং প্লেসে যান। সাড়ে তিন ডলার দিয়ে মাছ ভাজা আর আলু ভাজার প্লেট নেন। অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা রাতের জন্যে ঠোঙায় মুড়ে নিয়ে আসেন। ফেরার সময় হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। এখন একমাত্র আশা ফ্রি মিলের ডেলিভারি পাবেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে খিদের জ্বালায় পথে বেরতে হবে না।

আর এক বৃদ্ধের নাম ক্যারলোস ক্যাসটিনো। এঁর একাত্তর বছর বয়সে খুব বড় অসুখ হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে একান্ত নিরুপায় হয়ে ফ্রি মিলের জন্য সরকারকে চিঠি লিখেছিলেন। সাত মাস অপেক্ষা করে মারা গেলেন। অবশ্য খাদ্যাভাবে নয়। আবার অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতাল আর নার্সিংহোমে দাতব্য চিকিৎসা চলাকালীন মারা গেলেন।

ওয়াশিংটন অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস থেকে ঠিক দু বছর আগে ফেডারেল মিল প্রোগ্রামের পরিস্থিতি এবং ঠিক কত সংখ্যক লোক ওয়েটিং লিস্টে আছেন—তা খতিয়ে দেখার জন্যে স্টাডি শুরু হয়েছিল। আপাতত সরকারের কৃষি দফতরকেও এ কাজে যুক্ত করা হয়েছে। বৃদ্ধ মানুষদের দু বেলা পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ করার জন্যে কৃষি বিভাগের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

সমস্যার সমাধান কিছু সহজ নয়। উপরন্তু অর্ধাহারী বৃদ্ধা মানুষের সংখ্যা নানা কারণেই বাড়তে থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এখন এদেশে যাঁদের বয়স পঁয়ষট্টি বছরের বেশি, এমন ৯ মিলিয়ন মানুষ একা থাকেন। এঁদেরই অপুষ্টি ও খাওয়াদাওয়ার সমস্যা বেশি হয়। আগামী দশ বছরের মধ্যে ১১ মিলিয়ন বৃদ্ধ বৃদ্ধা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করবেন। সেবাযত্নের অভাবে তাঁদের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে যাবে।

একেক শহরে একেক পরিস্থিতি। ডেট্রয়েটে মোট ২,২০০ জন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে রোজ বাড়িতে ফ্রি মিল সরবরাহ করা হয়। আবার গত বছর থ্যাঙ্কস গিভিং আর ক্রিসমাস হলিডের সময় শহরবাসীরা দয়াপরবশ হয়ে বেশ ডোনেশন দেওয়াতে ডেট্রয়েটের গরিব, গৃহবন্দী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সবাইকে (সাড়ে চার হাজারেরও বেশি) কয়েকদিন ধরে দু বেলা ফ্রি মিল পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু উৎসবের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার পরে তো আর এই ব্যবস্থা চালু রাখা গেল না। আবার ওই ২,২০০ জনই শুধু ফ্রি মিল পেতে শুরু করলেন। বাকিরা পেলেন না। এ জন্যে মিশিগান রাজ্যের 'এজিং' দফতর খুবই চেষ্টা করছে, যাতে অন্যদের তালিকাবদ্ধ করা যায়।

আমেরিকার যে যে শহরে ওই মিল প্রোগ্রাম চালু হয়েছে, সেখানে প্রধান অর্থসাহায্য আসে কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগ থেকে। এক্ষেত্রে হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেসের কাজ হল রাজ্য এবং শহরের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী ফান্ড ভাগ করে দেওয়া। তারপর রাজ্যকে উদ্যোগ নিতে হবে। গরিব মানুষদের খাদ্য সরবরাহ খাতে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকেও অর্থ সাহায্য দিতে হবে।

এরপর কাজ করবে আঞ্চলিক কমিটি। লোকাল এজিং এজেন্সি ঠিক করবে কীভাবে তারা খাবারের ব্যবস্থা করবে। কোথাও বাড়িতে বাড়িতে রান্নাবান্না হয়। নয়তো কমিউনিটি সেন্টারের রান্নাঘরে। অধিকাংশই ভলান্টারি সার্ভিস। কোথাও কেটারিং-এর সাহায্য নেওয়া হয়। বাড়ি বাড়ি রান্না পৌঁছে দেওয়ার জন্যে রোজ রোজ লোক পাওয়া সম্ভব না হলে ড্রাইভার ভাড়া করতে হয়। কখনও সমাজকর্মীদের সাহায্য, কখনও লোকজনকে পারিশ্রমিক দিয়ে বৃদ্ধ মানুষদের খোঁজখবর নিতে হয়। কে কোথায় কতখানি পরনির্ভরশীল হয়ে আছেন, তার তালিকা তৈরি করে সেইমত দিনে দুবার করে খাবার পাঠাতে হয়। কখনও একবেলাই দুবারের রান্না পৌঁছে দেওয়া হয়।

ডেট্রয়েটের 'এডিং এজেন্সি' ফ্রি মিল প্রোগ্রামের জন্য কেটারিং কোম্পানিকে দিয়ে রান্না করায়। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে দেয় মোট তিনশোজন ভলান্টিয়ার। তাঁরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে সারা সপ্তাহে বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ বৃদ্ধার কাছে খাবার দিয়ে আসেন। দিনে কুড়ি পঁচিশ মাইল করে গাড়ি চালান। ডেট্রয়েটে দশ বার বছর আগে ছ হাজার গরিব বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ফ্রি মিল দেওয়া হত। এখন দিনে ৪,৮০০ জনকে দেওয়া হয়। সারা মিশিগান রাজ্যের জন্যে এ বাবদ ১৩.৮ মিলিয়ন ডলার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেয়। ডেট্রয়েট শহর পায় মাত্র ৩.৩ মিলিয়ন। তার ওপর খাবারের দাম ক্রমশই বাড়ছে। এই সব কারণেই ওই শহরে ফ্রি মিলের সরবরাহ করিয়ে দিতে হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক স্টেটেও আড়াই হাজার বৃদ্ধ বৃদ্ধা ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন। বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দু বেলার খাবারের জন্যে তাঁরাও আশা করে বসে আছেন। এখন এই রাজ্যে মোট ৬২ হাজার মানুষ ফ্রি মিল পাচ্ছেন। কিন্তু সার্ভে রিপোর্ট থেকে জানা গেছে—আরও দশ হাজার জন প্রকৃত প্রার্থী আছেন, যাঁদের পক্ষে আহার সংস্থানের ব্যাপারটি ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক শহরের নিম্নবিত্ত এলাকায় ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টে বহু বৃদ্ধ বৃদ্ধা একরকম ঘরবন্দী হয়ে আছেন। বয়স, অক্ষমতা, অসুস্থতা ও দারিদ্র্যের জন্যে প্রায় অর্ধ উপবাসে দিন কাটাচ্ছেন।

এককালে বলা হত শারীরিক অক্ষমতার প্রধান কারণ হচ্ছে বয়স। চোখে ছানিপড়া, মানসিক ক্লান্তি, বিস্মরণ, দুর্বলতা, যে কোনও ক্ষত সারতে দেরি হওয়া—এসবই হচ্ছে বুড়ো হওয়ার জন্যে। কিন্তু এখন চিকিৎসকরা বলছেন, আসলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভ্যাব, ভিটামিনের অভাবই হচ্ছে শরীর ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণ। পরিণত বয়সে উপযুক্ত খাওয়া দাওয়ার অভাব, অযত্ন আর অপুষ্টি থেকে ওই উপসর্গগুলি দেখা দেয়।

শুধু যে অভাব অনটন থেকেই এঁদের শরীর ভেঙে যায়, এমন নয়। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে অনীহাও অন্যতম কারণ। অল্প বয়সে ওজন বেড়ে যাওয়ার চিন্তায় অনেকেই স্বল্প ক্যালরি যুক্ত খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস করে। কিন্তু সে ডায়েটিং আর বৃদ্ধদের স্বল্পাহার এক নয়। এঁরা যে খেতে চান না, অপুষ্টির দরুন অস্বাভাবিক রোগা হয়ে যান, তার কারণ কিন্তু অন্য। দুশ্চিন্তা, মনোকষ্ট, একাকিত্ববোধ, মানসিক বৈকল্য ছাড়াও শারীরিক সমস্যা, বাঁধানো দাঁতের অসুবিধে ইত্যাদির জন্যেও খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়। নিজের জন্যে রান্না করতে হবে, একা একা বসে খেতে হবে—এই একঘেয়ে রুটিন তাঁদের ভাল লাগে না। খাওয়ার রুচি, আগ্রহ কিছুই থাকে না। তখন খাওয়া দাওয়ার পাট প্রায় তুলে দিতে চেষ্টা করেন। দারিদ্র্য থেকে নয়, নিঃসঙ্গতার জন্যেই এঁদের দু'বেলা খাওয়া হয় না। জাতীয় নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে—ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে আমেরিকায় প্রতি পাঁচজন বৃদ্ধ বৃদ্ধার মধ্যে একজনেরও বেশি মানুষ একবেলা খান। অন্য বেলা না খেয়ে কাটিয়ে দেন। সুষম খাদ্যের অভাবে শরীর দুর্বল থাকে। পড়ে গিয়ে আঘাত পান। আঘাত অনেক সময় গুরুতর হয়। তারপর হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ বাড়ে।

আমেরিকায় মানুষের আয়ু যত বাড়ছে, সুদীর্ঘ জীবনের সম্ভাবনার পাশাপাশি বার্ধক্যের বিভিন্ন সমস্যাও তত বাড়ছে। বার্ধক্যে দেহপুষ্টির গুরুত্ব নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলাপ,

আলোচনা শুরু হয়েছে অনেকদিন। ইদানীং সমাধানের জন্যে নানা স্তরে কাজ কর্ম চলছে। এদেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনা মতো কাজ করলে অর্থবল জনবলের অভাব হয় না। বৃদ্ধ সমাজের জন্যে তাঁদের আত্মীয়স্বজন, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং আঞ্চলিক সমাজ সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগ একত্র করলে—কোনও কাজ অসম্পূর্ণ থাকার কথা নয়। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন—দীর্ঘস্থায়ী সমাধান চাই। এ জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সুপরিকল্পনা ছাড়াও বাজেট বাড়ানো প্রয়োজন। এমনও করা যেতে পারে, যারা বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজনকে দু বেলা খাবার দিতে আসবে তাদের আয়কর থেকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। সাধারণত নিঃসন্তান, দরিদ্র বৃদ্ধ বৃদ্ধারাই অর্থাভাব থেকে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট পান। এ ক্ষেত্রে কোনও আত্মীয় যদি আয়কর থেকে কিছু ছাড় পাবেন জেনে তাঁদের জন্যে রেঁধে বেড়ে দিয়ে আসেন, কিংবা রোজ খাবার কিনে দিয়ে আসেন, তবে সেও এরকম সাহায্য হবে।

কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকারকেই ফেডারেল নিউট্রিশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হচ্ছে। '৬৫ সালে যখন লিনডন জন্মসন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, সেই বছরে ওল্ডার আমেরিকান অ্যাক্ট অনুমোদিত হয়েছিল। ফেডারেল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম তখন থেকেই সরকারি বাজেটে স্থান পেয়েছে। হয় কোনও কমিউনিটি সেন্টারে, নয় নার্সিং হোমে, নয়তো বাড়িতে বাড়িতে দু বেলা খাবার পৌঁছে দেওয়ার ফলে দেশের বহু দরিদ্র বৃদ্ধ, বৃদ্ধা উপকৃত হয়েছেন। অধিকাংশেরই ফ্রি মিল ছাড়া খাওয়া দাওয়ার আর কোনও সংস্থান নেই। তবে যাঁদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তাঁরা কিন্তু একেবারে নিখরচায় খান না। নিয়মিত সামান্য পরিমাণ ডোনেশন দেন। পুরোপুরি দাতব্যের ওপর নির্ভর করতে হয়তো আত্মসম্মানে বাধে।

বৃদ্ধদের জন্য মিল প্রজেক্ট অনুমোদন করানো এবং এ বাবদ সরকারি বাজেটের অঙ্ক বাড়ানো ইত্যাদি কাজে বিভিন্ন লবিইং গ্রুপ কাজ করে চলেছে। আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ রিটায়ার্ড পার্সনস, দ্য ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ মিল প্রোগ্রামস, ফ্রেন্ডলি নেবারহুড সেন্টার—নামে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকায় বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্য ব্যাঙ্ক পরিচালনা করার সঙ্গে ওয়াশিংটনে নিজেদের প্রতিনিধির মারফত দাবি দাওয়া জানাচ্ছে। তবু সর্বত্র অভাব দূর হচ্ছে না। শিকাগো শহরের পৌর কর্তৃপক্ষ সাতশো হাজার ডলার শহর উন্নয়ন প্রকল্পের খাতে না রেখে মিল প্রজেক্টে ব্যবহার করেছে। ফলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা বাকি সাড়ে ছশো দরিদ্র বৃদ্ধ বৃদ্ধা দু বেলার খাবার পেতে শুরু করেছেন। কিন্তু লুইসিয়ানার ব্যাটন রুশ শহরে এমনই আর্থিক সমস্যা যে সরকারি এজিং অফিস থেকে উলটে ওই গরিব মানুষদের কাছ থেকে কিছু ডোনেশন চেয়েছে। ফলে কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধা মিল প্রোগ্রাম থেকে বাদ হয়ে গেছেন। ইউটা রাজ্যের সল্ট লেক সিটিতে মিল প্রোগ্রাম চালু রাখতে গিয়ে অন্যান্য সোশ্যাল সার্ভিস বন্ধ রাখতে হয়েছে। অথর্ব মানুষদের চান করানো, পোশাক বদলানো, কাপড়জামা কেচে দেওয়া, ঘর পরিষ্কার ইত্যাদি কাজের জন্যে এখন সোশ্যাল এজেন্সিকে পুরোপুরি ভলান্টিয়ারদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আগে ওই খাতে যে অর্থ ব্যয় করা হত, এখন শুধু ফ্রি মিলের চাহিদা মেটাতেই ওই অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। তাও কোথাও কোথাও কমিউনিটি ডাইনিং সেন্টারে মাত্র একবেলা খেতে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে জীর্ণ শীর্ণ

চেহারার একদল বুড়ি মানুষ রোজ আসেন। ভলানটিয়াররা বলে—কাটি বুড়ি। সারাদিনে ওই একবার খাওয়া জোটে। অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা বাঁচিয়ে ঠোঙায় মুড়ে বাড়ি নিয়ে যান।

ফ্লোরিডা রাজ্যের একটি কাউন্ট্রিতে এক চতুর্থাংশ বাসিন্দা হলেন ষাটের বেশি বয়স্ক মানুষ। বছর দুই আগে যখন কেন্দ্রীয় সরকার ফ্রি মিল খাতে বাজেট বৃদ্ধি করল না, তখন থেকেই কাউন্ট্রির এজিং ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে শুরু করল। প্রথমে স্থানীয় রেস্তোরাঁগুলির কাছে আবেদন জানাল। তারা পঞ্চাশ হাজার ডলারের মতো খাদ্য সরবরাহ করছে ইদানীং। কিন্তু ফ্রি মিলের চাহিদা যে হারে বেড়ে চলেছে, তার ফলে ওয়েটিং লিস্টও বাড়ছে। এ জন্যে শেষপর্যন্ত জেলখানার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অসিওলা কাউন্টি জেল নিয়েছে কেটারিং-এর দায়িত্ব। চোর, ডাকাত, খুনের দল রান্না করছে। প্যাকেটে প্যাকেটে খাবার ভরছে। জেল ওয়ার্ডেন বিনা পারিশ্রমিকে ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছে। খাবারের খরচও সস্তা পড়ছে। এক ডলার আটাত্তর সেন্টের বদলে মিল পিছু মাত্র আটান্ন সেন্ট পড়ছে। ধরে নিন ষাট পয়সার খাবার। কিন্তু সস্তার সাত অবস্থা প্রবাদটিও যে বেশ কাল উপযোগী, সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। জেলখানার কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে খাবারের প্যাকেট এ ধারে আসতে কয়েকদিনই ঝঞ্ঝাট হয়েছে। দু ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। অথচ প্যাকেট সীমানা পার হচ্ছে না। কী ব্যাপার? না জেলখানায় কয়েদিরা মারামারি করছে। একবার পেঁয়াজ কাটার ছুরি নিয়ে এক গাঁটকাটা কোন ডাকাতের ওপর চড়াও হয়েছিল বলে মাঝপথে রান্নাবান্না বন্ধ হয়ে গেল। দু ঘণ্টা পরে খাবার তৈরি হল। ওদিকে উপোসী বুড়ো বুড়িরা শুকিয়ে মরছেন। আর একদিন বিমর্ষ এক ড্রাগ পুলার রান্নাঘরের মধ্যে গলায় তোয়ালে বেঁধে আত্মহত্যার চেষ্টা করাতে ভীষণ আলোড়ন হয়েছিল। তবে জেল ওয়ার্ডেনের দাবড়ানি খেয়ে সকলেই আবার কুকিং আর প্যাকেজিং-এ মন দিয়েছে। জেলখানার খাবার এখনও নিয়মিত কেনা হচ্ছে।

এদেশে ফ্রি মিল প্রোগ্রামে নাম লেখানোর জন্যে আবেদনপত্র পাঠানোর নিয়ম যেমন চালু আছে, সেভাবেই প্রার্থী বেছে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাছাড়াও প্রার্থী বেছে নেওয়া হয় প্রধানত তাঁদের চূড়ান্ত দুরবস্থা দেখে। যেমন কিছুদিন আগে জানা গেল এক অতি বৃদ্ধ দম্পতি প্রতিদিন গাড়ি নিয়ে খাবার কিনতে যান। ৮৭ বছরের স্বামী একরকম অন্ধই হয়ে গেছেন, তিনি গাড়ি চালান। ৮৩ বছরের স্ত্রী পাশে বসে নির্দেশ দেন। তিনি বাতে প্রায় পঙ্গু, স্টিয়ারিং ধরার ক্ষমতা নেই। এঁরা বাজার করেন, বাড়ি ফিরে রান্না করতে চেষ্টা করেন। এঁদের অবস্থা জেনে বাড়িতে ফ্রি মিল দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

ভলানটিয়ারদের সাহায্য না থাকলে প্রতিদিন আমেরিকায় ফ্রি মিল প্রোগ্রাম কার্যকর রাখা অসম্ভব হত। নিজেদের সময়, পরিশ্রম তো দিতেই হচ্ছে, তার ওপর গাড়ি চালানো, তেলের খরচ। ভলানটিয়াররা সমাজসেবা করতে গিয়ে এমন অনেক এলাকায় যান, যেখানে ড্রাগ ডিলার ও অন্যান্য সমাজবিরোধীদের আস্তানা। ফলে ঝুঁকি কিছু কম নয়। তা সত্ত্বেও গত কুড়ি বছরের ওপর এঁরা বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। মানবিকতার জন্যেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও জনসেবায় নিয়োজিত আছেন। এঁরা বলেন, খাবার তৈরি করে পৌঁছে দেওয়া, দরকার হলে অথর্ব মানুষকে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া—এ কাজ অনেক

সহজ। কঠিন হল ক্ষুধার্ত মানুষকে আপনার নাম তালিকায় ওঠেনি বলে ফোন রেখে দেওয়া। আর সেই করুণ আবেদন ভুলে থাকা।

বছর দু তিন আগে প্রবাসীর চিঠিতে ক্যাথি পাওয়েলের দায়ভার নামে একটি লেখা লিখেছিলাম। ক্যাথি কয়েকটি সোশ্যাল এজেন্সির হয়ে ভলানটারি কাজ করে। আমার আগের পাড়ার প্রতিবেশী। সে বলেছিল, এমন বৃদ্ধাকে জানি, যিনি সকালের দিকে খাবারের প্যাকেটের আশায় মেঝেতে বসে থাকেন। স্ট্রোক হওয়ার জন্য দাঁড়াতে পারেন না। চুরাশি বছর বয়স। হুইল চেয়ার থেকে নামা ওঠা কষ্টকর বলে ব্যবহার করেন না। দাঁড়িয়ে রান্না করার ক্ষমতা নেই। কুকিং রেঞ্জ ভর্তি মাকড়শার জাল। নিচু বিছানায় শোন। ফ্রি মিল পৌঁছনোর অনেক আগে থেকে হাঁটু ঘষে ঘষে দরজার কাছাকাছি বসে থাকেন। ডোরবেল বাজলে দরজা খুলে প্যাকেট নিয়ে নেন। একদিন বলেছিলাম, আপনার পক্ষে তো রান্না করা সম্ভব নয়। মানতে রাজি হননি। বলেছিলেন, কেন? কফি তো নিজেই করে নিই। দেখেছিলাম নিচু টেবিলে ইলেকট্রিক কেটলি আর কফির সরঞ্জাম রেখেছেন।

ক্যাথির দেখা সেই বৃদ্ধার মতো এদেশে আরও কত অসহায় মানুষ আছেন। নতজানু অবস্থায় বেঁচে থাকা, তবু সহজে মাথা নত হয় না। একেবারে যে অক্ষম নন, কিছু যে পারেন, সেই বোধ থেকেই বোধহয় ওই উত্তর দিয়ে থাকবেন।

আমি চেষ্টা করি লেখার মধ্যে দিয়ে এদেশের সমাজ আর মানুষদের আপনাদের সঙ্গে যথাসাধ্য পরিচয় করিয়ে দিতে। অক্ষমতা, অসম্পূর্ণতা, যতই থাক, আপনাদের আগ্রহ আর কল্পনা শক্তি মিলিয়ে মিশিয়ে দিলে অন্তত আংশিক ছবি ফুটে উঠতে পারবে। বাস্তবের উদাহরণে যাব না। বিভূতিভূষণেই ফিরে যাচ্ছি। অথবা সত্যজিতে। মাথায় কদম ছাঁট শীর্ণ দেহ, ক্লান্ত ক্ষুধার্ত সেই বৃদ্ধাকে মার্কিন পোশাক পরিয়ে দিন। তাঁর আকাঙ্ক্ষার গায়ের চাদরের বদলে একটা ঝলমলে ওভারকোট পরিয়ে দিন। এবার দেখুন তো দু বেলা খাওয়া জোটে না এমন একজন 'কাটি বুড়ি'কে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কিনা?

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

স্টার্লিং সেন্টার

জগন্ময় মিত্রের গান আর আপনাদের ধৈর্য—এই দুটি প্রেরণার ওপর ভর করে টিকে আছি। যত লিখে যাই...লেখা তো হয় না শেষ...। 'ছ'বছর আগে সেই যে ছপ্পর ফুঁড়ে উদয় হয়েছিলাম, তারপর থেকে ক্রমাগত 'আপোনারা কতো...ও দূরে" ভাবতে ভাবতে খসখস করে চিঠি লিখে যাচ্ছি। বছরে আটচল্লিশ খানা করে ধরলে, এ বছরেই আমার পত্রনবীশ উপাধি পাওয়ার কথা। আগে অবশ্য লিখে উঠতে পারিনি। মাঝে মধ্যে ডুব মেরেছি। তাহলেও তো চিঠির সংখ্যা নেহাৎ কম হবে না?

এ সপ্তাহে কিছুই লেখা হল না। পাঁচটা বিষয় ভাবতে গিয়ে শুক্রবার এসে গেল। আজ আবার ধোলাই দিবস। সাপ্তাহিক বস্ত্র সম্মেলন। প্রভাতে উঠিয়া রামী রজকিনী চলিল বস্তা ঘাড়ে। বেতের ঝুড়িতে জামাকাপড়ের ডাঁই নিয়ে দোতলা থেকে নীচে নামতে নামতে গুণগুণ...সুখের লাগিয়া বিদেশে আসিনু খাটিতে জনম গেল...।

ওয়াশিং মেশিনে প্রথম দফা উষ্ণ প্রশ্রবনে আড়ং ধোলাই এর নম্বর টিপে ছিলাম। সাদা এবং মোটা কাপড় চোপড় সব চালান হয়ে গেল। এবার লাগাতার উত্তম মধ্যম চলবে। লন্ড্রি রুমের দরজাটা বন্ধ করে এলাম। কারণ, খুললেই পাগলা ঝোরার আওয়াজ। একটু যদি হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে উঁকি মারি, ঝর্ণাতলার গর্জনে কান ছাপিয়ে যাবে। বরং তোয়ালে, চাদর, গেঞ্জি, মোজা সব দুরন্ত ঘুর্ণিতে পাক খেতে থাকে, আমি পাকশালায় যাই।

আজকাল সুপার মার্কেটে নতুন মাছের 'ফিলে' রাখছে। প্ল্যাস্টিকের মোড়কের গায়ে নাম লেখা—টিলাপিয়া। ছ'ডলার করে পাউন্ড। স্যামন, ফ্লাউন্ডারের মতোই দাম। নামটা দেখেই সন্দেহ করেছিলাম। তেলাপিয়া ছাড়া কী হবে?

আজ সেই টিলাপিয়াই রাঁধব। ইন্ডিয়ান দোকানে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় একগাদা ট্যাড়শ আর স্ট্যালেগ্‌টাইট্‌ এর মতো দুখানা লাউ কিনে এনেছি। তারও সদ্ব্যবহার করতে হবে। দেখেছি বেশি দেরি করলে লাউগুলোর বীচি বেরিয়ে দাঁত ছরকুট্টে চেহারা হয়। কাঠবেড়ালিকে দিলেও খায় না। বোতামের মতো চোখ ঘুরিয়ে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে। লাউখোর পাখিও দেখিনি। সুতরাং সাধের লাউ এখনই রেঁধে ফেলতে হবে। ট্যাড়শের ঠোঙা বসে আছে। ধপধপে দুটো সাদা মুলো গজদন্ত দেখাচ্ছে। আর পারা যায় না। লাউ-এর দাঁত ওঠার আগে তাকে সামলাব? না, ট্যাড়সের সরসভাব থাকতে থাকতে তাকে রেঁধে ফেলব? একলা একলা মুলো দিয়ে কী তরকারি হয় জানি না। নাঃ লাউ-ই রাঁধব। খানিকটা দিয়ে তরকারি হবে। খানিকটা মুগের ডালে চালিয়ে দেব। ধনেপাতা, বড়ি সব আছে। কোলেস্টেরলের ভয়ে বাড়িতে চিংড়ি আসা কমেছে। নয়তো লাউ চিংড়ি করা যেত। যাক গে, আপাতত ফিকে সবুজ গদাসদৃশ জোড়া লাউ বলি দেওয়া যাক।

ঠিক ফোড়ন দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফোন এল। এরকমই আসে। এত বিরক্ত লাগে! ফোড়নের ঝাঁপটাই নষ্ট করে দেয়।

ফোন এল স্টার্লিং সেন্টার থেকে। ইচ্ছে করলে আজই একবার দেখে আসতে পারি। না, রূপোর ব্যবসাদারের দোকান নয়। যাঁদের মাথার চুল রূপালি হয়ে গেছে, তাঁদের বিচরণ ক্ষেত্র। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সারাদিনের দেখাশোনার জন্যে এই কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আমাদের শহরের হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত বলে কেন্দ্রটিকে অ্যাকাউন্ট ডে-কেয়ার সেন্টারও বলা যায়। একদিন দেখে এসে "প্রবাসীর চিঠিতে" লিখব ভেবে হাসপাতালে বলে রেখেছিলাম। তা আজই যেতে বলছে। এখন লাউ নিয়ে কী করি? ডাল মধ্যপথে ফুটি ফুটি করছে। তেলাপিয়ার 'গায়ে হলুদ' হয়ে গেছে। নাঃ, রান্না শেষ করেই যাব। নয়তো ওবেলা মুড নষ্ট হয়ে যাবে। রান্নার মেজাজ আনতে সময় লাগে। তাছাড়া, নিঝুম সন্ধ্যায় মাছের গন্ধ ভাল লাগে না।

কাজকর্ম শেষ করে স্টালিং সেন্টারে গেলাম। যাঁরা দিনের বেলা এখানে আসেন, তাঁদের

দেখে শুনে যা খবরাখবর পেলাম, সে বিষয়ে লেখার আগে, আমেরিকানদের সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটি ধারণা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাচ্ছি।

ধারণাগুলি এই—আমেরিকায় বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনা করার কেউ থাকে না। ছেলে মেয়েরা, বাবা, মাকে দেখে না। দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেও অনেকে প্রয়োজনীয় খরচপত্র দেয় না। অবসরভাতা আর সরকারি স্বাস্থ্যবীমার ওপর নির্ভর করে এঁরা বেঁচে থাকেন। আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষ জীবন খুবই একাকিত্বের মধ্যে কাটে।

প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে হলে সরকারি/বেসরকারি সমীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়। দেখা যাচ্ছে, সব বাবা, মার ক্ষেত্রে বৃদ্ধাবাসই শেষ আশ্রয় নয়। দশ বছর আগের সার্ভে থেকে জানা গিয়েছিল—আমেরিকায় ৭ মিলিয়ন লোক হয় নিজেদের সংসারে, নয় কাছাকাছি বাড়িতে থেকে, বাবা, মার দেখাশোনা ও পরিচর্যা করেন। সাম্প্রতিক সার্ভে থেকে জানা যাচ্ছে—এখন, এর থেকে তিন গুণেরও বেশি পরিবার বৃদ্ধ বাবা, মা অথবা আত্মীয়ের দায়িত্ব বহন করছেন। আমেরিকার এক চতুর্থাংশ পরিবারে অর্থাৎ ২২.৪ মিলিয়ন বাড়িতে এই দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। যিনি পরিচর্যা করেন, তাঁর সময়ের গড় হিসেবও নেওয়া হয়েছে। পরিচর্যাকারীদের সময়ের গড় হিসেব হচ্ছে সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা। ৪ মিলিয়নেরও বেশি পরিবার সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টার ওপর বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সেবা ও পরিচর্যা করেন। ১.৬ মিলিয়ন পরিবারে ছেলে মেয়েরা কুড়ি থেকে চল্লিশ ঘণ্টা এ দায়িত্ব পালন করেন। "আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ্ রিটায়ার্ড পারসন্স, ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর কেয়ার গিভিং" এবং ওষুধ কোম্পানি গ্ল্যাবেসা ওয়েলকাম থেকে যৌথভাবে এই সমীক্ষা নেওয়া হয়েছে। সব পরিবারেই বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা যে খুব অসুস্থ বা অথর্ব, তাও নয়। দীর্ঘজীবী আমেরিকানরা অনেকেই বয়স অনুপাতে সুস্থ থাকেন। তাহলেও বার্ধক্যের কারণে ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। শেষদিকে স্বাভাবিকভাবেই আরও বেশি দেখাশোনার প্রয়োজন হয়। এ দায়িত্ব সচরাচর মহিলারা পালন করেন। স্বামী, সংসার, ছোট ছেলে মেয়ে এবং নিজের চাকরির দায়িত্ব বজায় রেখে বৃদ্ধ বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ির পরিচর্যার জন্যে পর্যাপ্ত সময় দিতে চেষ্টা করেন। খুব কম সংখ্যক পুরুষ একা এসব কাজ করেন। বাবা, মা এক বাড়িতে থাকলে একরকম। কাছাকাছি বা ঘণ্টা দেড়/দুই-এর দূরত্বে থাকলে নিয়মিত যাতায়াত এবং কাজকর্ম সেরে দিয়ে আসতে হয়। রান্না, বাড়িঘর পরিষ্কার, ধোয়া-কাচা, বাজারহাট, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, দোকানে বাজারে নিয়ে যাওয়া, অবস্থা বুঝে স্নান করানো, পোশাক বদলানো, খাওয়ানো, ওষুধপত্র দেওয়া—পরিচর্যা যাঁর যেমন প্রয়োজন, সে ভাবেই করতে হয়। শয্যাশায়ী অথবা অসুস্থ, অথর্ব অবস্থায় এঁদের আর অন্য বাড়িতে রাখা যায় না। ছেলে মেয়েরা নিজেদের কাছে এনে রাখেন। অনেকদিন বাড়িতে এরকম মাসি, পিসি, মামা, কাকারও দেখা পাওয়া যাবে। এই যে ২২.৪ মিলিয়ন পরিবারের কথা বলছি, বৃদ্ধ আত্মীয়ের জন্যে এঁদের মাসিক খরচের যোগফল হচ্ছে দুই বিলিয়ন ডলার। পুরুষরা অবশ্য খরচপত্র সবই দেন। শুধু বাবা, মার জন্যে নয়, বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজনের জন্যে অনেক পুরুষ নিয়মিত মাসোহারা দেন। নিজেদের ছুটিছাটার মধ্যে বেড়াতে নিয়ে যান।

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ ইয়র্কে এসে তাঁদের পরিচর্যা করেন। সাধারণত ৬৪% পরিবারেই দুজনে ফুলটাইম নয়তো স্ত্রী পার্ট টাইম চাকরি করেন। যিনি পরিচর্যার দায়িত্বে থাকেন, তাঁর চাকরির ক্ষেত্রে কিছুটা সমঝোতা করতে হয়। কখনও কাজে যেতে দেরি হয়। কখনও আগে উঠে পড়তে হয়। হঠাৎ হঠাৎ ছুটি নিতে হয়। গড়ে ৫.১ বছর পর্যন্ত এঁরা পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করেন। 'ন্যাশনাল কাউনসিল অফ এজিং' জানিয়েছেন—শতকরা ১৫ জনেরই মাঝে মাঝে মাইনে কাটা যায়। শতকরা ৫০ জন প্রয়োজন হলেই পরিচর্যার জন্যে ছুটি নেন। বেশ কিছু কোম্পানি এখন কর্মীদের এ জন্যে ফ্রেকস্ টাইম্ এর সুবিধা দিচ্ছে। সন্তান প্রতিপালন ও অভিভাবক পরিচর্যার জন্যে প্রয়োজনীয় ছুটি নেওয়া যাবে। অন্য সময় বেশিক্ষণ অফিসে থেকে তা পূরণ করে দিতে হবে। এরফলে পরিচর্যাকারীর পরিশ্রম বেশি হলেও চাকরি হারানোর দুশ্চিন্তা থাকবে না। যখন তখন অফিস থেকে চলে যাওয়ার দরকার হলে অনুমতি অথবা কৈফিয়তের প্রশ্ন থাকবে না। 'এলডার কেয়ার' নিয়ে এখন ওয়াশিংটনেও চাপ দেওয়া হচ্ছে। মে মাসে কংগ্রেসের অধিবেশনে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এজিং' থেকে এল্ডার কেয়ার ইস্যু নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছে। সোশ্যাল সার্ভিস এজেন্সির সাহায্যে বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের সারাদিনের পরিচর্যার ব্যবস্থা আছে। এখন ছেলে মেয়েদের চাকরি ক্ষেত্রেও 'ফ্লেক্সটাইম' বিধিবদ্ধ করার জন্যে সরকার থেকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ আসছে। আগে মাতা, পিতা, তারপরে অন্নদাতা।

চল্লিশোর্ধে পৌঁছে অনেক ছেলে মেয়েই একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। যে বাড়িতে শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম সময় কেটেছিল, সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যার জন্যে বাবা, মা, বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। তারপর কয়েক বছর টার্বল্-হাউস বা কনডোমিনিয়ামে থেকেছেন। ক্রমশ শরীর, স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়ার ফলে তাঁদের নিয়মিত দেখাশোনার দরকার হচ্ছে। ছেলে মেয়েরা রোজ, টানাপোড়েন নিতে না পেরে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। হয়তো সকলেই অসুস্থ নন। কিন্তু দূরের শহরে থাকলে দুশ্চিন্তা হয়। কাছাকাছি, বিশেষত এক বাড়িতে থাকতে এত উদ্বেগ থাকে না।

ফলে বাবা, মা, ছেলে-মেয়ের কাছে চলে আসছেন। বাড়িতে নতুন ঘর তুলে নেওয়া হচ্ছে। একতলার একটি বাড়তি অংশ সংযোজন হচ্ছে। কিন্তু সারাদিন তো তাঁরা একাই থাকবেন? ছেলে মেয়েদের চাকরি আছে। কে তাঁদের দিনের বেলার সঙ্গ দেবে? শরীরগতিক ভাল না থাকলেও চিন্তা। হয়তো দুজনের মধ্যে একজন বেঁচে নেই। সারাদিন একটি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে নিরবচ্ছিন্ন একা রাখাও কি নিরাপদ? হয়তো ওষুধ খেতে ভুলে গেলেন। হয়তো বাথরুমে পড়ে গেলেন। ছোটখাট বিপদ তো হতেই পারে।

এরপরেও আছে নিঃসঙ্গতার কষ্ট। নিরাপত্তাই তো সব নয়। সারাদিন বাড়ির মধ্যে বন্দী থাকলেও ভাল লাগে না। দীর্ঘ সময় একাকিত্বের ফলে মানসিক অবসাদ, বিষণ্ণতা আসতে পারে। সুস্থ মানুষও একঘেয়ে জীবনযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে ওঠেন।

এইসব সমস্যার সমাধান করতেই আমাদের শহরের 'ওয়েন্ জেনারেল' হাসপাতাল

কর্তৃপক্ষ স্টার্লিং সেন্টার খুলেছে। চমৎকার সাজানো গোছানো একটি বাড়ি। সাজসজ্জার পাশাপাশি নিরাপত্তার দিকটিও গুরুত্ব পেয়েছে। বৃদ্ধ মানুষদের সুবিধে অনুযায়ী প্রত্যেক দরজায় বিশেষ ব্যবস্থা। প্রতিবন্ধীদের জন্যে যেমন করা হয়। সিঁড়ির বদলে রেলিং দেওয়া চালু পথ। কোথাও কাচের বাড়াবাড়ি নেই। ময়দানবের প্রাসাদের মতো দৃষ্টিবিভ্রমের আশঙ্কা নেই। ঘরে ঘরে শক্তপোক্ত আসবাবপত্র। গুঁতো খাওয়ার ভয় নেই। টেবিলের ধারগুলি গোলালো মসৃণ। উলটে পড়ার মতো হালকা চেয়ার, অতিরিক্ত নরম গদিওলা সোফাও নেই, যাতে বসে পড়লে ওঠার জন্যে হাঁচোড় পাঁচোড় করতে না হয়। কোথাও ছোট ছোট আলগা কার্পেট নেই। যাঁদের অ্যালার্জি নেই, তাঁদের জন্যে কার্পেট মোড়া ঘর। যাঁদের ধুলোয় অ্যালার্জি হয়, তাঁদের জন্য কাঠের মেঝেওলা হলঘর। স্টার্লিং সেন্টার-এর মেডিকেল ডিরেক্টর হচ্ছেন একজন ভারতীয় ডাক্তার। নাম—রঘু ভি. বাল্লাল। ইন্টারনিস্ট হিসেবে জেরিয়াট্রিক মেডিসিনে স্পেশালাইজ্ করেছেন। বার্ধক্যের রোগ ও উপসর্গই ডক্টর বাল্লালের চিকিৎসার বিষয়। তিনি এখানে যে দলটির নেতৃত্ব দেন, তাঁদের মধ্যে নার্সরা ছাড়াও সমাজকর্মীরা আছেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিজস্ব চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ডঃ বাল্লাল তাঁদের প্রতিদিনের ওষুধপত্র, খাওয়া দাওয়া, ব্যায়াম, বিশ্রামের সময় ইত্যাদি ঠিক করে দেন। কিন্তু এটি কোনও সাময়িক বন্দোবস্ত নয়। যে আটচল্লিশ জন বৃদ্ধা বৃদ্ধা দিনের বেলা এখানে থাকেন, তাঁদের সার্বিক চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের দিকে লক্ষ রেখেই এঁরা কাজ করেন।

এঁদের মধ্যে আল্‌ঝাইমার্সের রোগী আছেন। পারকিনসন্‌স্ ডিজিজের রোগী আছেন। ডিপ্রেশন, ইন্‌কন্‌টিনেস্ (যাঁরা প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতায় ভোগেন), স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক ও অ্যাকসিডেন্টের পরে অসুস্থ রোগীরাও আছেন। এইসব অসুস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। রেজিস্টার্ড নার্সরা প্রত্যেক বৃদ্ধ, বৃদ্ধার ব্যক্তিগত রেকর্ড তৈরি করেন। হাসপাতালের ফার্মাসিস্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধপত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা, মাত্রা, সময়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, খাবারের সঙ্গে ওষুধের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া—সব কিছুর তত্ত্বাবধান করেন। বৃদ্ধা মানুষদের স্বাস্থ্যের প্রতি প্রতিদিন এভাবে লক্ষ রাখলে, অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ সহজেই বোঝা যায়। তখন চিকিৎসকদের জানালে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসকরা মনে করেন বয়স্ক মানুষদের সুস্থ রাখার জন্যে তাঁদের মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করা দরকার। প্রতিদিন তাঁদের বয়সের উপযুক্ত বিনোদন ও বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা থাকলে তাঁরা মানসিক স্ফূর্তি ফিরে পেতে পারেন। স্টালিং সেন্টারে মস্ত একটি অ্যানাউন্সমেন্ট বোর্ড টাঙ্গানো আছে। সেখানে রোজ সকালে সারাদিনের প্রোগ্রাম জানানো হয়। একেক দিন একেক পরিকল্পনা। কফি-আওয়ার, লাঞ্চ ব্রেক আর এক্সারসাইজ আওয়ার প্রতিদিনই থাকে। এছাড়া সারা সপ্তাহে কোনও দিন কুকিং ক্লাব, কোনও দিন 'মেমরি গেম' নয়তো ক্রস্‌ওয়ার্ড প্রতিযোগিতা অন্ত্যাক্ষরী, বাজনার প্রথম লাইন শুনে গান বলে দেওয়া, একক, দ্বৈত ও সমবেত সঙ্গীতের আসর, বিংগো (হাউসির মতো খেলা), পোকেনো ধরনের খেলা, সপ্তাহে একদিন বড় পর্দায় সিনেমা দেখা, সপ্তাহে একদিন ভিডিওতে পুরনো দিনের সিনেমা দেখা, ডিবেট ক্লাব—এরকম নানা প্রোগ্রাম আছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা প্রোগ্রাম

নির্বাচনের কাজে অংশ নেন। তাঁদের পছন্দ, অপছন্দ অনুসারে পরিকল্পনার কিছু অদল-বদল হয়।

শিভেন্ কুইন-পাপান্টোনিস নামে এক গ্রিক মহিলা হচ্ছেন অ্যাক্টিভিটিস কো-অর্ডিনেটর। দেখলাম তিনি প্রায় কুড়ি পঁচিশজন বৃদ্ধ, বৃদ্ধাকে নাচের কায়দায় ব্যায়াম শেখাচ্ছেন, তিনি সামনে পা তুলে পা নাচচ্ছেন। মুখোমুখি ট্র্যাক্ স্যুট পরা দাদু, দিদার দল পা ওঠাচ্ছেন। মহিলা তালে তালে বলছেন—'মনে করুন পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটি ক্রেয়ন ধরেছেন...এবার আপনি ওইভাবেই মস্ত গোল আঁকছেন...।' দেখলাম দাদু, দিদারা পায়ের বুড়ো আঙুল চেপে রেখে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলপনার স্টাইলে মেঝেতে গোল্লা এঁকে যাচ্ছেন। তারপরেই গ্রিক তরুণী গেয়ে উঠলেন—'এবার সামনে ঝুঁকে/কোমর ধরে/পাশাপাশি দুই পা/ব্যস!' পুরো দল একেবারে সাঁওতালি থেকে কথকে ব্লেন্ড করে দিলেন। শুনলাম যাঁদের বেঁকেচুরে নাচতে কষ্ট হয়, তাঁরা চেয়ারে বসে বসে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাল্পনিক আলপনা দেন।

এ তো দেখলাম অঙ্গ সঞ্চালনের নমুনা। এরপর সমাজকর্মী আইলিন পোর্ট-এর সঙ্গে কথা হল। আইলিন ওই বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের নিয়ে 'ফ্যামিলি অ্যান্ড পিয়ার সার্পোট গ্রুপ' পরিচালনা করেন। এঁদের অনেকের জীবনেই নানা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। কেউ স্বামীকে হারিয়েছেন। কেউ স্ত্রীকে। সন্তান হারিয়েছেন, এমন বৃদ্ধ, বৃদ্ধাও আছেন। অর্থকষ্ট, নিজের বাসস্থান হারানোর দুঃখ, শারীরিক অক্ষমতার দরুন পরনির্ভর হওয়ার মনোকষ্ট, স্বাধীনতার অভাব, রোগযন্ত্রণা—বৃদ্ধ মানুষদের অনেক সমস্যা। স্টালিং সেন্টারে ওই গ্রুপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য—এঁরা পরস্পরের দুঃখ বুঝবেন। একে অন্যকে সান্ত্বনা ও মনোবল দিতে চেষ্টা করবেন। ছেলে, মেয়ের সংসারে থেকে সেবা, যত্ন সবই হয়তো পান। কিন্তু বয়সের পার্থক্যের জন্যে কোথাও একটি বড় রকমের ফাঁক থেকে যায়। নিজের একান্ত সুখ, দুঃখের কথা বলা যায় না। অনুযোগ করলে তারা কষ্ট পাবে। সমস্যাগুলি হয়তো তাদের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার মতো নয়। এই যে একটি আপেক্ষিক প্রয়োজনবোধ, দুই প্রজন্মের মধ্যে যা ভিন্নভাবে বিচার্য হয়, সেই নিয়েই বৃদ্ধরা কষ্ট পান। 'সার্পোট গ্রুপ' সেইখানে সমর্থন দেওয়ার ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সঙ্গে সমঝোতা করতেও সাহায্য করে। রোগ, শোক, বিচ্ছেদের কষ্ট লাঘব করতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়। তাঁরা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতারা খোলাখুলি কথা বলার সুযোগ পান।

স্টার্লিং সেন্টারের নিজস্ব ভ্যান আছে। আমেরিকার 'বেল্ অ্যাটল্যান্টিক' ফোন কোম্পানি এ জন্যে অর্থ সাহায্য দিয়েছে। 'আমেরিকান টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাম' ও আরও কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দানে অন্যান্য খরচ বহন করা হচ্ছে। অধিকাংশ বৃদ্ধ, বৃদ্ধাই ভ্যানে যাতায়াত করেন। কারও কারও ছেলে মেয়েরাও অফিস থেকে ফেরার পথে বাবা, মাকে তুলে নিয়ে যান।

'স্টার্লিং সেন্টারে' বৃদ্ধ বৃদ্ধারা রোজই প্রায় আসতে চান। ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে না, ততক্ষণ এঁরা এখানে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। কেউ কেউ অবশ্য সপ্তাহে

তিনদিন আসেন। মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক—তিনভাবে ভর্তি হওয়া যায়। তাঁদের নিজস্ব অবসরভাতা থেকেই খরচ দিতে পারেন। নয়তো ছেলেমেয়েরা দেন। শহর কর্তৃপক্ষ 'ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'-এ কিছু সাহায্য করার ফলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকদের বিশেষ ছাড় ও সুবিধা দেওয়ার জন্যে—স্টার্লিং সেন্টারের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিজস্ব খরচ আয়ত্বের মধ্যেই থাকে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট অনুষ্ঠান হয়। জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষে ঘরোয়া উৎসব হয়। সোম থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্টার্লিং সেন্টার খোলা থাকে। স্বাধীনতা বজায় রেখে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকার ফলে বৃদ্ধদের মনে হয় না যে তাঁরা বাধ্য হয়ে ডে-কেয়ারে আছেন। ক্র্যাফ্‌ট প্রজেক্ট, মিউজিক লেসন্, তাই-চি নাচ, মেমারি গেম, সাহিত্য আলোচনা, সিনেমা দেখা, রান্না নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধর্ম ও দর্শন আলোচনা, বক্তৃতা শোনা—একই সেন্টারে এসে সারা সপ্তাহ কত কিছুর মধ্যে যোগ দিতে পারছেন। আটচল্লিশজন মিলে দলবেঁধে খাই খাই করে আহারে বসা এবং আজব ভোজ খাওয়া। সুখ দুঃখের গল্প করা। জন্মদিনের টুপি মাথায় দিয়ে এক টুকরো কেক খাওয়া। মনে দুঃখ হলে কাউনসেলদের কাছে একটু 'ঝেড়ে কাশা'—এই নিয়েই তো জীবন। রূপালি ক্লাবের সদস্য হয়ে এঁরা বেশ আনন্দেই আছেন।

মা, বাবাকে বৃদ্ধাবাসে রাখার পরিবর্তে যাঁরা নিজেদের কাছে অথবা কাছাকাছি বাড়িতে রাখেন, তাঁদের সারাদিনের কর্মব্যস্ততার কারণে এই ধরনের অ্যাডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টারগুলি ক্রমশই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। বিশেষ অসুস্থ ও অক্ষম মানুষদের নিরাপত্তার জন্যেই এ ব্যবস্থার প্রয়োজন হচ্ছে। আবার সন্ধের পর থেকে এঁরা পারিবারিক পরিবেশে ফিরে আসছেন। ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনীর সঙ্গ পাচ্ছেন। যাঁরা ডে-কেয়ারে যেতে চান না, তাঁদের জন্যে পার্ট-টাইম হেল্‌পার, বিভিন্ন নার্সিংহোম থেকে পাঠানো সেবাকর্মী, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করেন। আমেরিকান পরিবারে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের দেখাশোনা প্রয়োজনেই বিভিন্ন সোশ্যাল এজেন্সিগুলি ইদানীং কেয়ার গিভিং সার্ভিসের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছে। স্টার্লিং সেন্টারের ব্যবস্থা দেখে সেরকমই ধারণা হল গত চিঠিতে আল্‌ঝাইমার্স রোগ নিয়ে লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম এবার আর আশিতে আসিব না। বিষয়ান্তরে যাব। লাউ রাঁধলেও গয়া, কাশীর দিকে যাব না। কিন্তু রজত-কেন্দ্রের ডাক এসে গেল। অতএব আবার বার্ধক্য ইস্যু। শিব্রামের প্রোগ্রামের মতো—'আবার হাঁসের ডাক'।

৭ জুন ১৯৯৭

যখন একা

একাকিত্বের সঙ্গে বেদনাকে বেশ ডালভাতের স্টাইলে চটকে ফেলায় খুব হাতযশ আমাদের। যাদের চিনি না, তাদেরও বিয়ে হয়নি শুনলে চিন্তা হয়। বেজোড়ে থাকতে থাকতে শেষে বেঘোরে না মরে যায়! শেষ বয়সে দেখবে কে? নিঃসঙ্গতার ব্যাখ্যা দি—'ওর মনের কথা বলার একটা লোক নেই। শোনারও লোক নেই।' যেন আমাদের মাথাপিছু একটি করে শ্রুতিধর মজুদ আছে। ঘরে ঘরে উৎকর্ণ কর্ণ! তার যে ওদিকে প্যাচাল শুনতে শুনতে কানের দুয়ারে কপাট লেগেছে, মুখের দুয়ারে তালা কিংবা জ্বালা—সে খবর চেপে যাই। জোড়া বলদে ভোট দিন! ভোট দিন—বলে সমস্বরে দৌড়ে যাচ্ছি। একা বলদ যে কত সুখে জাবর কাটে, জানতেই পারি না। ইয়ে জালিম দুনিয়া, ইয়ে তনহাইয়াঁ ইয়ে বরবাদিয়াঁ গোছের যত হু হু করা গান, বিরহী একানড়েদের মুখে বসিয়ে দিয়ে শিবনেত্রে চেয়ে থাকি। গজল শুনে শুনে এমন সজল ভাব আসে যেন 'পারা পারা হুয়াইএ জাম্...।' সাথীহারাদের দুঃখে কেঁদে কেঁদে আমারই পানপাত্র কানায় কানায় ভরে উঠেছে। গুলামি আলি বহত্ই রুদালি। অন্যের বিরহে খুব কাঁদালি!

অথচ এত কান্নাকাটির দরকার নেই। গায়ে পড়া সহানুভূতির দরকার নেই। বহু লোক দিব্যি আছে। সংসারী মানুষের তুলনায় একক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের সংখ্যা কোনও দেশেই নেহাৎ কম নয়। আমেরিকায় প্রায় দু'কোটি লোক হয় পরিস্থিতির কারণে, নয়তো স্বেচ্ছায় একক জীবনযাপন করছেন। পঞ্চাশ বছর আগেও সংখ্যা খুব কম ছিল না। তখন চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ একা থাকতেন। স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদির জন্য যাঁরা সঙ্গীহীন হয়ে গেছেন, তাঁদের কাছে এমন জীবনযাত্রায় মাধুর্য না থাক তাঁরা কিন্তু একদিন থেকে বেশ নির্ঝঞ্ঝাট, স্বস্তিদায়ক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বিধবা, বিপত্নীক, বিবাহ বিচ্ছিন্ন মধ্যবয়সী মানুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ছাড়াও অনেক অবিবাহিত কমবয়সী উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ ও মহিলা ইদানীং একা থাকা পছন্দ করছেন। আমেরিকায় যাঁরা একক জীবনযাপনে অভ্যস্ত তাঁদের মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বয়স ৪৫ বছরের নীচে।

কেন এঁরা একা থাকেন? প্রথমত, এদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের হার এত বেশি যে জোড় ভাঙা স্বামী, স্ত্রী দ্বিতীয়বার অন্য কাউকে নির্বাচন না করা পর্যন্ত, অথবা আবার বিয়ের ইচ্ছে না থাকলে একা থাকার সিদ্ধান্ত নেন। বিধবা বা ডিভোর্সি মেয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসবেন, আমেরিকান মেয়েদের এরকম নির্ভরশীলতা নেই। অতএব চাকরি করুন, কি প্রতিমাসে প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে মাসোহারাই পান, থাকেন কিন্তু একাই। স্বাধীনতাই প্রধান কথা। নতুন করে প্রেম, ভালবাসা শুরু করার ক্ষেত্রে একা থাকার অনেক সুবিধে। অনেক অবিবাহিত পুরুষও তড়িঘড়ি বন্ধনে পড়তে চান না। বান্ধবীর অভাব নেই। সুতরাং ছুটির দিনে সময় কাটানোর সমস্যা নেই। বাড়িতে রান্না করা, অফিস ফেরত খাবার কিনে আনা, বাজারের ঠাণ্ডা জমাট খাবার মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাওয়া—কিছুতেই অসুবিধে নেই। বরং কারও সান্নিধ্য, যত্ন, আদর অতিরিক্ত মনে হবে এই ভয়েই এঁরা

চিন্তিত। সারাক্ষণের সাহচর্য থেকে একঘেয়েমির দুশ্চিন্তা আছে। ইচ্ছে হলে বান্ধবীকে এড়ানো যায়, বউকে নয়। অধিকাংশ আমেরিকান বউ তার অধিকারবোধ সম্পর্কে ভীষণ সচেতন। অবহেলা থেকে গৃহবিবাদের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। এইসব ভেবে আমেরিকান পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ বিয়ের দায়িত্ব এড়াতে চান। আমাদের দেশে অফিস ফেরত আড্ডা দিয়ে বিজনেস ডিনার আর বিজনেস মিটিং-এর জন্যে ক্লাবে, রেস্তোরাঁয় কাবার করে অথবা ছুটির দিনে শুধু পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলে কফি হাউসে আসর জমিয়ে যেসব স্বামীরা বাড়ি ফেরেন, তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না এদেশে তাঁদের কী গঞ্জনা সহ্য করতে হবে। এদেশে কিন্তু যতদিন ধোপে টিকে আছে, আদর্শ দম্পতি মানেই বিকেলের পর তারা দু'জনে মুখোমুখি, গভীর সুখে সুখী। হানাহানি হবার আগে পর্যন্ত মুখে 'হানি' 'হানি' রব! এখানে বাঙালি স্বামীরাও জলহাওয়ার গুণে ভারী বশংবদ। বউ ঠ্যাঙানো, দু-চারটে কুলাঙ্গার বাদে বেশির ভাগই বামারঞ্জন। নির্দিষ্ট সময়ের বেশি অফিসে থাকার চাপ নেই, উইক-ডেতে বন্ধুদের আড্ডা নেই, অফিস ফেরত গাড়ি ঘোড়ার সমস্যা নেই, আত্মীয়স্বজনের পাট নেই, বিনা নোটিশে লোকজন আসা নেই, হানাহানি করার মতো তেজ নেই। হাওয়া বুঝে 'হানি', 'হানি' দিব্যি রপ্ত হয়ে গেছে। মোট কথা সময়ের ব্যাপারে বউরা রীতিমত ডিম্যান্ডিং।

যাই হোক, বউ মানেই এঁটেল মাটি ভেবে যেমন কিছু আমেরিকান পুরুষ একা থাকা পছন্দ করেন, তাঁদেরই মতো অনেক একলা স্বভাবের যুবতীও আছেন। ভাল উপার্জন, কর্মজীবনের ব্যস্ততা, উন্নতির সোপান এমনই আকর্ষণ করছে যে, কে আবার স্বামী, সংসার, ছেলে, মেয়ের ঝক্কি পোয়াতে চায়? অন্তত তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাধীনতার সুখ বজায় থাক। তারপর দেখা যাবে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী থেকে শুরু করে অভিনেত্রী, শিল্পী, সাংবাদিক—এরকম বহু মহিলাই মনে করেন চাকরির জন্যে অন্তত কিছুকাল একা থাকা দরকার। নিজেকে গড়ে নেবার মতো সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়। অতিরিক্ত সময় বাইরে কাটাতে হলেও কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না।

অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একা থাকার পক্ষপাতী। প্রশ্ন করে দেখেছি, তাঁরা ছেলেমেয়েদের সংসারে থাকতে চান না। এঁদের ক্ষেত্রেও সেই স্বাধীনতা বোধ আত্মকেন্দ্রিকতা মিশে আছে। কেউ বলেছেন—বেশিক্ষণ হট্টগোল, লোকজন ভাল লাগে না। কেউ বলেছেন—যখন খুশি খাব, যা খুশি খাব—যেখানে ইচ্ছে যাব। যার সঙ্গে ইচ্ছে ঘুরব! রাত জেগে টেলিভিশন দেখব, পরদিন বেলা পর্যন্ত ঘুমোব। কারও সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে না।

আমার আগের পাড়ার প্রতিবেশিনী ফ্রান্সিসের মা এরকমই স্বাধীনচেতা মহিলা ছিলেন। মেয়ের বাড়ির থেকে পাঁচ মাইল দূরে থাকতেন। তখন তাঁর ষাট বছর বয়স। চাকরি থেকে সদ্য অবসর নিয়েছিলেন। বিধবা মহিলা। তাঁর একটি মধ্যবয়সী পুরুষ বন্ধু ছিলেন। দুজনে প্রায়ই ডিনার, সিনেমা নয়তো নাচের পার্টিতে যেতেন। ফ্রান্সিস তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। কারণ মা তাঁর নিজের সংসারে নিজের মতো করে আছেন। মেয়ের বাড়িতে থেকে রোজ রোজ রাত করে ফিরে লোকের কাঁচা ঘুম ভাঙলে অশান্তি অনিবার্য হত।

কিন্তু নিঃসঙ্গতা যাঁরা স্বেচ্ছায় বরণ করেননি, তাঁদের পক্ষে এটি বড় নৈরাশ্যজনক হয়ে

ওঠে। চাকরির পরেও অনেক কাজ ঘাড়ে এসে পড়ে। রোগে, বিপদে প্রকৃত সমব্যথী কেউ নেই। নিঃসঙ্গতা ও স্বেচ্ছায় একা থাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য। যিনি নিঃসঙ্গ, তাঁর কাছে সঙ্গী, সাহচর্য ও সাহায্যের অভাব প্রতিটি দিনই ক্লান্তিকর। কিন্তু যিনি একক জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছেন তাঁর নিজের মধ্যেই নিজেকে ভরিয়ে তোলার উপাদান আছে। কম বয়সীদের ক্ষেত্রে একক জীবনের অর্থ ঠিক নিঃসঙ্গতা নয়। কাজের আনন্দ চ্যালেঞ্জ, বন্ধুবান্ধবীদের সাহচর্যের পরে উদ্বৃত্ত সময়টুকু তাঁরা আপন মনে কাটাচ্ছেন। কিন্তু বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের কাছে ওই জাতীয় কর্মব্যস্ততা বা সামাজিক আকর্ষণ, কিছুই নেই। ফলে অবসাদ আসছে। ৫৫ বছরের এক বিধবা ইতালিয়ান মহিলা আমাকে বলেছিলেন—'একা থাকা বড় কষ্টের। কোনও মতে মানিয়ে নিয়েছি। মেয়ে, জামাই জার্মানিতে থাকে। ছেলে বউ পেনসিলভানিয়ায়। ওখানে ভাল লাগে না। এখানে তবু পুরনো চেনাশোনা লোকজন খোঁজখবর করে। তাও কিছু ভাল লাগে না। মনে হয় কারও কাছে আমার কোনও দাম নেই। স্বামী ছাড়া এত সহানুভূতি কারুর থাকে না। যে কাজ সর্বদা দুজনে মিলে করেছি, সে কাজের ভার একা বয়ে যাচ্ছি। লোকজনের মধ্যে গেলে নিজেকে আরও বেশি বেমানান লাগে। সবচেয়ে শক্ত হচ্ছে কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এসব তো আগে আমাকে করতে হয়নি। সবই স্বামীর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর তাই সবদিক থেকেই অসহায় হয়ে গেছি।'

পুরুষদের অবস্থাও তাই। এদেশের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠানো অনুযায়ী বৃদ্ধ-আত্মীয়স্বজনের জন্যে আত্মীয়তা, সামাজিকতা ও লৌকিকতা কেবলমাত্র বছরের নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সীমাবদ্ধ। ইস্টার, থ্যাংকস গিভিং, ক্রিসমাসে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ কাকা, জ্যাঠা মামাদের নেমন্তন্ন করা, বাবা, মার কথা আলাদা। তাঁদের জন্যে আরও অনেক উৎসব আছে। কিন্তু নিঃসন্তান অথবা অবিবাহিত বৃদ্ধ আত্মীয় সর্বদা ডাক পান না। বিনা আহ্বানে কোথাও যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

আমেরিকার ভৌগোলিক পরিবেশের ওপরেও নাগরিকদের বিচ্ছিন্ন বসবাস ও নিঃসঙ্গতার কারণ নির্ভর করে। শীতপ্রধান রাজ্যগুলিতে, বড় বড় শহরে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে দৈনন্দিন দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপের সময় কম থাকে। কিন্তু ফ্লোরিডা বা গ্রীষ্ম প্রধান দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষত গ্রামের দিকে মানুষ অনেক বেশি আলাপী এবং আন্তরিক। পাড়া, প্রতিবেশী এবং আন্তরিক। পাড়া, প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনের আগ্রহে অনেক নিঃসঙ্গ মানুষ ছুটির দিনে সমুদ্র উপকূলে বেড়াতে যাবার উৎসাহ পান। এদেশের বিধবা মহিলারা গ্রামাঞ্চলে অনেকে বেশি সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পান। বিশেষত বৃদ্ধারা। তবে ধনী, উন্নাসিক বৃদ্ধারা শহর ছাড়েন না। সমাজবিজ্ঞানীরা সমীক্ষা নিয়ে দেখেছেন—যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে যৌবনে একা কাটিয়েছেন, তাঁরাই কিন্তু বার্ধক্যে পৌঁছে একাকীত্ব নিয়ে বেশি বিচলিত হয়ে পড়েন। তারচেয়ে কম বিচলিত হন ডিভোর্সিরা। আর নিঃসঙ্গতার মধ্যেই সমাহিত থাকেন বৃদ্ধ বিপত্নীক বা বৃদ্ধা বিধবা। বোধহয় দিল্লিকা লাড্ডু না খেয়ে পস্তানোর দুঃখেই প্রথম দল আক্ষেপ করেন। কিছুটা সিনিক হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় দল অন্ততপক্ষে খেয়ে পস্তানোর জন্যেই 'কি পাইনি' দুঃখে মুহ্যমান থাকেন না। আর তৃতীয়

দল নিশ্চয়ই দিল্লিকা লাড্ডুর হারিয়ে যাওয়া স্বাদের ভাবনায় মশগুল হয়ে বেশ প্রশান্ত থাকেন।

একা জীবন কাটানোর আর্থিক দিকটিও অবহেলা করার বিষয় নয়। বয়স এবং আয়ু অনুযায়ী এর সমস্যা কমে, বাড়ে। এদেশে কমবয়সী একা মানুষের অধিকাংশ সময়েই ব্যয়ের কোনও মাত্রা থাকে না। অবশ্য ইহুদি পরিবারে তা নয়। যাই হোক অবিবাহিত পুরুষের অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে যায়। রেস্তোরাঁ, বার-এ আড্ডা দিতে দিতে পকেট তো হালকা হয়ই, উপরন্তু মদ্যপান অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে এর ফলে সবসময় ভাল হয় না। সংসারী হবার ইচ্ছে থাকলেও তখন অন্তরায় হয় অমিতব্যয়ী ও নেশাগ্রস্ত স্বভাব। এছাড়া নিঃসঙ্গ মানুষদের মধ্যে আর্থিক কারণে অসুবিধে ভোগ করেন বৃদ্ধা মহিলারা। যদি সঞ্চয় না থাকে, শুধু সোশ্যাল সিকিউরিটির ভাতার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

একাকিত্ব দূর করার উপায় কী? সম্ভবত প্রথম জীবন থেকেই প্রস্তুতি দরকার। কেউ কেউ শেষের দিনগুলির কথা ভেবে প্রথম জীবনেই এক বা একাধিক শখ বা 'হবি'-র চর্চা শুরু করেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে গলফ খেলা, দাবা খেলা, বাগান পরিচর্যা, মাছ ধরা, বাড়িতে জীব-জন্তু পোষা, বয় স্কাউটে কাজ করা এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী দলে যোগ দেওয়া ইত্যাদি। মহিলাদেরও নিজস্ব হবি অনুযায়ী কাজকর্ম করার অভ্যাস থাকলে, স্বেচ্ছাসেবিকা হলে জীবন সেরকম একঘেয়ে লাগে না। লাস ভেগাসের একটি হোটেলে এক বৃদ্ধা বেবি সিটার বলেছিলেন—আর্থিক প্রয়োজনের চেয়ে তাঁর সময় কাটানোর সমস্যাই প্রধান ছিল। তাই বাড়িতে শুয়ে বসে না থেকে হোটেলে, মোটেলে বেবি সিটিং-এর কাজ করছেন। স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতেন। বেবি সিটার হয়েও সে অভ্যাস ছাড়েননি। ছোটদের সঙ্গ দেওয়ার সময় ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসেন। তাদের আঁকতে শেখান। উপার্জন ও সময় কাটানোর জন্যে এরকম হালকা কাজ বেছে নিয়েছেন।

এক বৃদ্ধ আমেরিকান বলেছিলেন—প্রত্যেকটি দিনকে আগে থেকে তাৎপর্যপূর্ণ করার কথা ভাবতে হবে। সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙে তখন যদি ভাবতে বসি, কী করে দিনটা কাটাব—সেটাই হবে সমস্যা। তার চেয়ে ২/১ দিন আগে ভেবে রাখব। সেই মতো আগে কারও বাড়িতে, সভা-সমিতিতে বা অন্য কোনও জায়গায় খবর দিয়ে রাখব। কারও মতে —ধারাবাহিক একটি পরিকল্পনা থাকলে, তার জন্যে বেশ আগ্রহ থাকে। লেখালেখি, কোনও সংখ্যা বা পত্রিকার জন্যে ছবি তুলতে যাওয়া, কোনও ভাষা বা গান বাজনা শেখা অথবা শেখানো, কাঠের কাজ, খেলনা তৈরি, বেবি সিটিং, লাইব্রেরিতে কাজ, সেলাই বা রান্না শেখানো, দল বেঁধে প্রতি রবিবার কোথাও বেড়াতে যাওয়া, হাসপাতালে অল্প পরিশ্রমের ভলান্টারি কাজ,—সবই তাঁরা পরিকল্পনা-মাফিক করতে চেষ্টা করেন। একবার হাসপাতালে থাকাকালীন দেখেছি—শেষ রাতে এক বৃদ্ধা টর্চ জ্বেলে রোগীদের অন্ধকার ঘরে এসে দাঁড়াচ্ছেন, লক্ষ করছেন কেউ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন কিনা। কিছু দরকার আছে কিনা। তিনি বলেছিলেন—রাতে একটানা ঘুম হত না। মাঝ রাতে উঠে বসে থাকতে থাকতে অসহ্য লাগত। শেষে হাসপাতালে ভলান্টারি কাজ নিলাম। রাত চারটের মধ্যে চলে আসি।

রোগীদের খোঁজখবর, সদ্যোজাত শিশুদের দেখাশোনা, রাতের ডিউটির নার্স, ডাক্তারদের সঙ্গে গল্পগুজব সেরে সকালে হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়াতে দলবেঁধে ব্রেকফাস্ট খাই। তারপর বাড়ি চলে যাই।

নিঃসঙ্গতা থেকে যাঁদের বিষণ্ণতা আসে, তাঁদের সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদেরা নানা গবেষণা করেছেন। তাঁদের মতে—অ্যালকোহল, সিগারেট বা স্নায়ু-উত্তেজক ওষুধের সাহায্যে নয়, ঘুমের ওষুধের নির্ভরতায় নয়, হালকা কাজকর্মের মধ্যে এবং বাইরের জগতে কিছু সময়ের জন্যে এলে তবেই নিঃসঙ্গ লোকেরা মানসিক আনন্দ পাবেন।

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে নিঃসঙ্গতার সমস্যা এত প্রকট হয়তো নয়। তবে ক্রমশ যুগধর্মের প্রভাবে সামাজিক গঠন রীতির পরিবর্তন ঘটেছে। শখ করে যিনি একা থাকেন, অথবা বাধ্য হয়ে, অবকাশকে পূর্ণ করবার উপাদান স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা খুঁজে নিতে পারছেন। কেউ তর্ক তুলতে পারেন—বস্তুতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার লোক সর্বদা কাজ খুঁজে মরে। কারণ একে তো শরীর স্বাস্থ্য দীর্ঘদিন ভাল থাকে, তার ওপর মনকে বিমূর্ত চিন্তায় ডুবিয়ে রাখতে জানে না, কিন্তু বাণপ্রস্থের দেশের মানুষদের অবসর কাটানোর জন্যে মনোবিজ্ঞানীদের উপদেশের দরকার হয় না।

কথাটি আংশিক সত্যি। সম্পূর্ণভাবে নয়। যথার্থ বিমূর্ত চিন্তা, বিষয়বহির্ভূত চিন্তা, দর্শন, অধ্যাত্ম ভাবনার চর্চা আর তার ভানের মধ্যে তফাত আছে। যাঁরা প্রকৃতভাবে ওই চিন্তার সাহায্যে নিজেদের ভরিয়ে তুলতে জানেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যিনি মনকে আঁখি টেরে, মুখে ত্যাগের বুলি আউড়ে, সারাদিন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সংসারে বসে অশান্তি করছেন, তিনি যদি তাঁর 'উচ্চস্তরের অবকাশ যাপন' সাময়িক স্থগিত রেখে কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানে বা সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থায় দুদণ্ড কাজ করে আসেন, মন্দ কী? পরিবারের মধ্যে থেকে যে কাজকে অপ্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে মনে হচ্ছে, একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়লে সেই কাজই সাময়িক আনন্দের খোরাক সরবরাহ করবে কিনা—কে বলতে পারে।

একাকিত্ব থেকেই এক জীবনে কত অভিজ্ঞতা। গজল থেকে ভজন, আবার ভজন থেকে গজলে ট্রান্সফার—অনুভূতির নাম অনুপ জালোটা। আপন মনে মহানন্দে থাকার উপায় হিসেবে যাঁরা স্বেচ্ছায় একক জীবন বেছে নিয়েছেন তাঁরা আরও ভাল জানেন।

১০ মে ১৯৯৭

শেষের কবিতা

একগোছা ফুল হাতে সেদিন এক বেঁটে সাহেব এসে হাজির। বগলে মস্ত বড় খাম। খুব আকুলিবিকুলি করছিল, যদি আমার কবরের জন্যে ওদের হোলি ক্রস চ্যাপেলের সর্বাধুনিক কবরখানায় অগ্রিম বুকিং করে রাখি।

ভবানীপুরের সিনেমা পাড়ায় বহুবার অগ্রিম বুকিং করেছি। তাই বলে যমালয়ের জন্যে জীবন্ত মানুষের অগ্রিম বুকিং? এই বসন্ত দিনে? প্রস্তাবটা একদম মনঃপূত হল না।

সাহেব খাতাপত্র খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার কবরে যাবার একটুও ইচ্ছে নেই শুনে বেশ দমে গেল। সামান্য কেশে, গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল—'আই হোপ ইউ হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো...বাট ইভেনচুয়্যালি দেয়ার উইল বি আ টাইম...'।

বেঁটে যমদূতকে আশ্বস্ত করে বললাম, মরিব মরিব সখা নিশ্চয় মরিব। কিন্তু কবরে যাইব না। আমার রিলিজিয়ন অনুযায়ী ক্রিমেশন হবে।

মৃত্যুর আশ্বাস পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত মুখ চুন করেই ফিরে গেল। হোলি ক্রস চ্যাপেল মসোলিয়ন থেকে প্লট বিক্রি করতে এসে গোড়াতেই তাড়া খেলে যা হয়। নেহাত নাছোড়বান্দা গোছের সেলস পার্সন বলে ফুলের গোছার সঙ্গে চট করে একটা কাগজ গছিয়ে দিয়ে গেল। ফুলের গোছাটা ওদের চ্যাপেলের কবরখানা থেকে তুলে আনেনি বুঝেও বাগানে রেখে দিলাম। কাগজটা ফেলে দিইনি ঠোঙা পড়ার অভ্যেস থেকে গেছে বলে।

রঙিন ছবি সুদ্ধু বিজ্ঞাপনের কাগজ। কবরখানা তো নয়, যেন নব বাসগৃহ নির্মাণের বিজ্ঞাপন ছেপেছে।...'এই বসন্তেই অগ্রিম বুকিং-এর জন্যে আবেদন করুন! নিউ চ্যাপেল মসোলিয়ম নির্মাণকার্য অবিলম্বে শুরু হবে। আর্চ বিশপ থিওডোর ম্যাকারিও প্রথম কোদাল চালিয়ে মাটি কেটেছেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়ে গেছে। হ্যানোভার শহরে তৈরি হচ্ছে 'গেট অফ হেভেন'। কালোনিয়া শহরে হবে 'গুড শেপার্ড চ্যাপেল মসোলিয়ম'। নর্থ আর্লিংটনে হবে 'হোলি ক্রস চ্যাপেল মসোলিয়ম'। প্রি-কনস্ট্রাকশন প্রাইস কিন্তু বেশিদিন থাকবে না। ফর লিমিটেড টাইম ওনলি। দাম বাড়ানোর কথা সময়মতো জানানো হবে। বিস্তারিত খবরের জন্যে যোগাযোগ করুন—রোমান ক্যাথলিক আর্চ ডায়োসিস অফ নু-আর্ক—ক্যাথলিক সেমেট্রিস...।"

জানি, সাহেবটা আমার উপকার করতেই এসেছিল। গেট অফ হেভেনের ছবিও রাজকীয় সিংহদ্বারের ডিজাইনে স্বর্গদ্বার। কিন্তু ভেতরে যা ব্যবস্থা, আমাদের মতো সংকীর্তন পার্টির সুবিধে হবে না। মসোলিয়ম মানে জানেন তো? উন্মুক্ত পরিবেশে যেমন সমাধিভূমি থাকে, তেমন নয়। বড় বাড়ির মধ্যে হলঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে কফিন সুদ্ধু গেঁথে দেওয়া হয়। সেখানেই নাম, ধাম লেখা ফলক বসিয়ে কফিনগুলিকে চিহ্নিত করে রাখে। ভেতরে গেলে মনে হয় খুব উঁচু সিলিং-এর হলঘরে ঢুকেছি। বিশাল বিশাল এরকম কয়েকটি হল নিয়ে মসোলিয়ম বা বহুতলবিশিষ্ট সমাধি মন্দির। ভেতরেই গির্জা আর

শবযাত্রীদের বসার ঘর। সারা বছর যে কোনও সময় আত্মীয়, বন্ধুরা মৃত ব্যক্তির কবরের ফলক স্পর্শ করতে আসতে পারেন। ফুল রাখার জন্যে খাঁজ কাটা আছে। এই শীতপ্রধান দেশে বৃদ্ধ মানুষরা অনেক সময়ই উন্মুক্ত সমাধি ভূমিতে গিয়ে প্রিয়জনের সমাধির কাছে বসতে পারেন না। তাঁদের পক্ষে মসোলিয়মে যাওয়া অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর।

নানা কারণেই মসোলিয়ম তৈরি হচ্ছে। প্রথম স্থানাভাব। যে হারে শহর ও গ্রামে বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, তার ফলে জমি জায়গা ফেলে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বসতবাড়ি, বাণিজ্য কেন্দ্র, সরকারি ভবন, পার্ক, সাঁতারের পুল, খেলার মাঠ—কোনও না কোনও ভাবে জমি জায়গার সদ্ব্যবহার হচ্ছে। অবশ্য সেই হিসেবে বেশ কয়েক একর জমি নিয়ে তৈরি কবরখানার সংখ্যাও কিছু কম নয়। তবে এগুলি অনেক পুরনো দিনের গির্জা সংলগ্ন জমি। ইদানীং নতুন করে কয়েক একর জমি কিনে কবরখানার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে কোনও কোনও গির্জা থেকে 'মসোলিয়ম' তৈরির কাজ শুরু করেছে। 'প্লট' কেনা বলতে সেখানে ওই চত্বর বা দেওয়াল কেনা বোঝাচ্ছে। কোথাও বলা হয় 'ভল্ট বেরিয়াল'। জায়গা অনুযায়ী দামের তফাত। কবরের কাছাকাছি ঘেরা বারান্দায় বসার জায়গা থাকলে দাম একটু বেশি পড়বে। এই রকমই কিছু সুবিধে, অসুবিধে থাকে।

সেমেট্রি পার্ক বলতে যে উন্মুক্ত এলাকাগুলি বোঝায়, সাধারণত সেখানেই অধিকাংশ আমেরিকান পারিবারিক প্লট কিনে রাখতে চান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও প্রথা অনুগত্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অথবা নৈসর্গিক পটভূমির কথায় মনে পড়ছে ওয়াশিংটনের কাছে আর্লিংটন সেমেট্রির কথা যেখানে জন এফ কেনেডির সমাধি আছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগোয় দেখেছিলাম মার্কিন সৈনিকদের সমাধি ক্ষেত্র। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে দিগন্ত বিস্তীর্ণ পাহাড়। তার ঢালু অংশে সারি সারি ক্রুশ গাঁথা সমাধি ভূমি। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুময়। পাহাড়ে হেলান দিয়ে চির নিদ্রায় রণক্লান্ত সৈনিক।

তবু কি শান্তি আছে? মাঝে মাঝে 'গোরস্থানে গণ্ডগোল'-ও হয়। সেমেট্রি পার্কের লোহার গেটের তালা ভেঙে বাজে লোকজন ঢুকে পড়ে। কবরের ফলক ভেঙে দেয়। গত বছর ইলিনয় রাজ্যের স্প্রিং ফিল্ড শহরে এই কাণ্ড হয়েছে। বোধহয় টিন-এজারদেরই কাজ। আশি নব্বইটি কবরের ফলক উলটে দিয়েছে। একশো বছরেরও পুরনো কয়েকটি কবরের ওপর ইচ্ছেমতো দাগ কেটে পালিয়েছে। গত আগস্টে ভার্জিনিয়ার পোর্টসমাথে পঞ্চাশটি কবরের স্মৃতিস্তম্ভে লেখা নাম, ধাম নষ্ট করা হয়েছে। উইসকনসিনের ওরিগনে কবরখানায় দৌরাত্ম্যের ফলে ত্রিশটি কবর ভেঙে চুরে গেছে। এইসব উপদ্রবের জন্যে ফ্লোরিডায় কয়েকটি শহরে কর্তৃপক্ষ থেকেই কবরখানাগুলির চারপাশে উঁচু পাঁচিল তৈরি করে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, কালো এলাকায় এই জাতীয় উপদ্রব শুরু হয়েছে। পাঁচিল তোলার ফলে ভবঘুরে মানুষদের বেড়ানোর জায়গা কমে যাচ্ছে। শ্মশান ঘোরা দার্শনিকের মতোই এঁরা হলেন কবরঘেঁষা দার্শনিক। সেখানে বসে বই পড়েন। ছবি আঁকেন, গিটার বাজিয়ে গান করেন। "নীরব" শ্রোতা অথবা দর্শক (এমন বিপুল সংখ্যক হারে) আর তো কোথাও পাওয়া যায় না।

পুরনো দিনের কবরখানায় দর্শনযোগ্য কত কিছুই পাওয়া যায়। ম্যাসাচুসেটসের কনকর্ড শহরের কবরখানায় ১৭৮০ সালের একটি কবরের ফলকে লেখা আছে—সিজার দ্য ইথিওপিয়ান, ক্রীতদাস। তার ঈশ্বর বিশ্বাসী আত্মা স্বর্গীয় জ্যোতির স্পর্শ লাভ করতে চলেছে এবং যিশুর যে রক্তক্ষরণ হয়েছিল—এই দুই ঘটনার জন্য তার কালো চামড়া সাদায় রূপান্তরিত হবে।

অর্থাৎ ওই সময় কালোদের বিশ্বাস ছিল যে স্বর্গলাভ হলেই তাদের গায়ের রঙ ফর্সা হয়ে যাবে।

বস্টনের কাছে দুশো বছরের পুরনো একটি কবরখানা আছে। সেখানে একটি কবরের ফলকের লেখা পড়লে বোঝা যায় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে কম বয়সে মেয়েরা মারা যেত। লেখা আছে—জীবনের আঠারো বছর কুমারী ছিলাম। এক বছর স্ত্রী ছিলাম। একদিনের জন্যে, মা হয়েছিলাম। তারপর আমার জীবন শেষ হয়ে গেল।

স্বামী পরিত্যক্তা দুঃখী মহিলার কথা লেখা আছে রোড আইল্যান্ডের লিটল কম্পটন শহরের একটি কবরের স্মৃতিফলকে।—'এখানে শায়িত আছে এলিজাপেথ ককরিলের দেহ। যাঁর পরিচয় হতে পারত মিস্টার সিমন পামারের স্ত্রী হিসাবে।'

যাই হোক, গোরস্থানে গণ্ডগোলের ঘটনা অবশ্য খুব বেশি শোনা যায় না। তবে দু' বছর আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মিডওয়েস্ট অঞ্চলে নদীতে বন্যা হবার ফলে তুমুল জলস্রোতে কয়েকটি সেমেট্রি পার্ক নষ্ট হয়ে গেল। বন্যার জলে কফিন ভেসে যাচ্ছে, ডালা খুলে দেহাবশেষ জলে তলিয়ে যাচ্ছে—এই বেদনাদায়ক দৃশ্য টি ভি-তে দেখে লোকেদের মনে খুবই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তারপর থেকে সেমেট্রির জায়গা নির্বাচন, অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে কত ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া দরকার—ইত্যাদি ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ইদানীং যে মসোলিয়মের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তার কারণ, সেখানে প্লট কেনা সহজসাধ্য এবং সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা নেই।

আমেরিকায় ইহুদি ও মুসলমানদের জন্যে আলাদা ফিউনারাল হোম ও সেমেট্রি আছে। ধর্মের প্রকার ভেদের জন্যেই এই ব্যবস্থা। যেমন 'বেথ এল সেমেট্রি', 'কিং সলোমন মেমোরিয়াল পার্ক', 'স্যাংচুয়ারি অফ অ্যাব্রাহাম অ্যান্ড সারা'। ইহুদিদের সমাধি ভূমি সংলগ্ন হলঘরে 'মনোরাহ' নামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। 'জিইউশ মেমোরিয়্যাল চ্যাপেল', 'শামন মেনোরাহ চ্যাপেল', 'সিডার সাইনাই সেমেট্রি'—এগুলি সবই হচ্ছে আমেরিকান ইহুদিদের শেষকৃত্যের জায়গা। মুসলমানদের জন্যে আছে মরক্কো ফিউনারাল সার্ভিস, দাউদ ফিউনারাল হোম, আমির বেরিয়াল সার্ভিস ইত্যাদি। উত্তর নিউ জার্সিতে ইসলাম ধর্মের কোনও গোরস্থান বা ফিউনারাল হোম না থাকায় নিউ ইয়র্কে নয়তো নিউ জার্সির দক্ষিণ অঞ্চলে ফিউনারাল সার্ভিসের জন্যে ব্যবস্থা করতে হয়।

এছাড়া আছে মিশ্র সম্প্রদায়ের সুবিধের জন্যে 'ম্যাডোনা মাল্টি ন্যাশনাল হোম' নামে সর্বজাতিক সংস্থা। মাল্টি কালচারাল কমিউনিটির জন্যে প্রয়োজনীয় সব বন্দোবস্তই তাদের থাকে। হিস্প্যানিকদের সুবিধের জন্যে আছে 'মার্টিনেজে ফিউনারারিয়া ল্যাটিনা',

'ফিউনারারিয়া লাস আমেরিকাস' ইত্যাদি। গ্রিকদের নিজস্ব সেমেট্রির নাম 'সেন্ট পিটার্স গ্রিক ক্যাথলিক সেমেট্রি'। তবে অধিকাংশ ফিউনারাল হোম এবং সেমেট্রিতেই ইদানীং বিভিন্ন এথনিক সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। ফিউনারাল ডিরেক্টর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নেন। শোকগ্রস্ত পরিবারকে সে জন্যে চিন্তা করতে হয় না। কোথায় কখন কী কী হবে, সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা—সবই ফিউনারাল হোমের দায়িত্ব।

কবরখানার খবরাখবর তো অনেক দিলাম। এবার শ্মশানঘাটের সমাচার। সিডারলন সেমেট্রির কারুকার্য করা বিশাল লোহার গেট থেকে বেরিয়ে শ্রীপর্ণা বলেছিল—জায়গাটা দেখে গেলাম।

সেদিন আমরা শবযাত্রী। কথা বেশি হয়নি। পরে একদিন শ্রীপর্ণা বলল—গাছপালায় ঘেরা আশ্রমের মতো ওই শান্ত সুন্দর পরিবেশেই ও শেষমেশ মিশে যেতে চায়। স্বামী আর ছেলেদের সে কথা বলে রেখেছে। আমিও সায় দিয়েছি। ভাবছি, যথাকালে নিজেও ওই কুঞ্জছায়ায় মিলিয়ে যাব। দৃশ্যান্তরের জন্যে বড় মনোরম ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া গেছে। নিমতলা, কেউড়াতলার বদলে সারি সারি ঝাউতলা। ঝাউয়ের ঢেউ পার হয়ে দেবদারু বন কাঁপে দুরু দুরু। সত্যি বলতে কি, পঞ্চভূতে বিলীন হবার পক্ষে অমন শ্মশান বাগান আর এ তল্লাটে নেই। আমাদের শহর থেকে সিডারলন সেমেট্রি মাত্র পঁচিশ মাইল। মহাযাত্রার দিনের লক্ষ যোজন দূরত্বের তুলনায় সে তো প্রায় হাঁটাপথ। এমনিতেই সত্যি সত্যি হাঁটব না তো!

ভাবছেন বিদেশে আছি বলে হিন্দু হয়েও প্রথমে গোরস্থানে 'স্টপ ওভার' নিয়ে তবে মহাপ্রস্থানে যাব? গোড়ায় গোড়ায় এখানেও কেউ এমন কথা ভেবেছিল। দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলত—'আমেরিকায় বুড়ো বয়সে থাকব না। মরলে কবর দিয়ে দেবে।'

মধ্য বয়সের আগেই সে ক্যালিফোর্নিয়ায় মারা গেল। স্যানহোজের কাছাকাছি ক্রিয়েটোরিয়ামে তাকে দাহ করা হল। যে ধর্মের যে বিধান। আমেরিকায় হিন্দু, জৈন, শিখদের জন্যে যেমন, সেরকম অন্যান্য ধর্মের লোকেদের জন্যেও মৃতদেহ দাহ করার ব্যবস্থা আছে। সব ক্ষেত্রে ধর্মের বিধিনিষেধে নয়, মৃত ব্যক্তির 'ইচ্ছাপত্র' নয়তো তাঁর আত্মীয়স্বজনের নির্দেশ অনুযায়ী দাহকার্য সম্পন্ন হয়। খরচ তুলনামূলকভাবে কমই। কবরের জন্যে জমি বা প্লট কেনার খরচ অনেক বেশি পড়ে। কফিন বা ক্যাসকেটের দামও কয়েক হাজার ডলার। তবে যে বাক্স আগুনে পুড়ে যাবে, তার জন্যে চার পাঁচ হাজার ডলার দেওয়াও অনেক পরিবারের কাছে অপব্যয় বলে মনে হতে পারে। এ জন্যে ফিউনারাল ডিরেক্টর বহুমূল্য মেহগনি কাঠের বাক্স থেকে আরম্ভ করে সস্তার বাক্স—সবই মজুদ রাখেন। কবরের জন্যে সুরক্ষার যুক্তি দিয়ে খুব দামি দামি ক্যাসকেট বিক্রি করা যায়। কিন্তু দাহকার্যের পরে তো আর স্থায়ীত্ব বা সুরক্ষার প্রশ্ন নেই। নির্ভর করে মৃতের পরিবার কী সিদ্ধান্ত নেবেন, তার ওপর। সাধ্যের কথাই সব নয়, ইচ্ছে অনিচ্ছেরও প্রশ্ন থাকে। অনেক জীবিত অবস্থাতে অনাড়ম্বর শেষকৃত্যের কথা বলে যান। তখন তাঁর নির্দেশ মেনে সাধারণ দামের ক্যাসকেট কেনা হয়। দেশেও দেখবেন শবযাত্রার জন্যে বিশাল, সুদৃশ্য খাট কেনার ক্ষমতাই বড় কথা নয়। শ্মশান যাত্রার জাঁকজমক নির্ভর করে সেই পরিবারের অভিরুচির

ওপর। আওরঙ্গজেবের অনাড়ম্বর সমাধি কোনও নজিরবিহীন ঘটনা নয়।

আমেরিকায় শবাধার বলতে সকলের জন্যেই ওই কফিনের বিছানা। শ্মশান বলতে সেমেট্রির এক প্রান্তে ইলেকট্রিক ফার্নেস সহ ক্রিমেটোরিয়াম। যেমন ওই সিডারলন সেমেট্রি। বিরাট বাগানের এক পাশে সমাধিস্থান। তার গেট, রাস্তা সবই অন্যদিকে। এ প্রান্তে ক্রিমেটোরিয়াম। ভেতরে লাস্ট রাইটের জন্যে ছোট হলঘর। সারি সারি চেয়ার পাতা। সামনে রাখা কফিন তখন খুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহ সৎকারের আগে ভারতীয় পুরোহিত আসেন। গীতা পাঠ, গঙ্গাজল স্পর্শ, অন্নদান, ধূপকাঠি জ্বেলে প্রদক্ষিণ ও মুখাগ্নির শেষে হরিধ্বনি। শ্মশানযাত্রীরাও ফুল দিয়ে প্রদক্ষিণ করেন। তারপর হলঘরে অপেক্ষা করেন। মৃতদেহের সঙ্গে আত্মীয় আর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুই কেবল-ফার্নেসের আর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুই কেবল-ফার্নেসে ঘরে যেতে পারেন। ক্যাসকেট ফার্নেসে তুলে দেবার পর ফিউনারাল কর্মী সুইচ চালু করে দেন। তবে অগ্নিসংযোগে পরিবারের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে কোনও কোনও সময় ছেলে, মেয়েরাও ওই কাজটি করে। সবশেষে সবান্ধবে ঘরে ফেরা।

ভস্ম নেওয়ার জন্যে একদিন অপেক্ষা করতে হয়। ক্রিমোটোরিয়ামে যাওয়ার দরকার নেই। সেও ফিউনারাল হোমের কাজ। তামার পাত্রে ভস্ম সংগ্রহ করে রাখে এবং পরিবারকে পাঠিয়ে দেয়।

এই হল হিন্দুদের জন্যে মার্কিনি শ্মশানের ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে জানাই, আমেরিকায় বাড়িতে মৃতদেহ রাখার নিয়ম নেই। ফিউনারাল পার্লারে দেহ ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখে। পোশাক-পরিচ্ছদ তারাই পরিয়ে দেয়। ভারতীয় পোশাক হলে বন্ধুরা সাহায্য করেন। অন্যান্য স্টেট থেকে লোকজন আসার জন্যে সময় দিতে হয়। অন্তত একদিন থেকে দেড়দিন ভিইউং বা দেখার জন্যে দু' বেলা দু'ঘণ্টা করে শবাধার খুলে রাখা থাকে।

ফিউনারাল হোম থেকে ক্রিমেটোরিয়ামে যাওয়ার জন্যে শ্মশানযাত্রীরা ঘড়ির কাঁটা ধরে সকাল বেলায় উপস্থিত হবেন। পুরোহিত আসবেন। তারপরে শববাহী কালো গাড়িতে শবাধার ওঠানো হবে। পেছনে কালো লিমোজিনে বসবেন মৃতের পরিবার, পরিজন। পার্কিং লট থেকে একে একে প্রত্যেকটি গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে ফিউনারাল প্রসেশনে যোগ দেবে। ট্র্যাফিক লাইটে থামবে না। ধীরগতিতে দীর্ঘপথ যাবে। আমেরিকার সরকারি কর্মচারী যাঁরা, যেমন পুলিস, সেনাবাহিনীর লোক, স্কুলের শিক্ষক, পোস্ট অফিসের কর্মী, মেইলম্যান—এঁরা শবযাত্রার গাড়ি দেখলে স্যালুট করেন।

হ্যাঁ, আমাদের ঘাট খরচের বদলে স্যাটিনের গদি আঁটা 'খাটখরচ' নিয়ে ওই হাজার ছয়, সাত ডলার মতো দাঁড়ায়। ঢাকিসুদ্ধু অগ্নিতে বিসর্জন! শ্রীপর্ণা বা আমি যে কেওড়াতলার বদলে ঝাউতলা বেছে নিয়েছি, সে ওই কেওড়াতলার লম্বা ওয়েটিং লিস্ট দেখে। শ্মশানবন্ধুদের হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়ে যায় দেখে এসেছি তো। রাজদ্বারে সঙ্গে নেবার সময় হল না, এখন বলা যায় তোরা সব হরিবোল দিতে দিতে সঙ্গে চল? তাছাড়া, এদেশেও শ্মশানবন্ধুর ছড়াছড়ি এখনও। অনেকদিন বিবেচনা করে দেবদারু বন বেছে নিয়েছি।

আসলে এসবই তো কথার কথা। শেষের কবিতা কোথায় কখন লেখা হবে, কেউ কি জানে? এমন বিয়োগান্ত বিষয় নিয়ে কেন যে লিখতে বসেছি, ভেবে দেখি। বোধহয় আমাদের 'সদ্‌গতি' সম্পর্কে বেঁটে সাহেবটাই চেতনা দিয়ে গেল। কবরের জমি গছাতে এসে স্মরণ করিয়ে দিল—ইভেনচুয়ালি দেয়ার উইল বি আ টাইম...

বসন্তের সকালে কৃতান্তের নোটিশ পেয়েই কলম ধরেছি। 'শেষের কবিতা'-র মলাট পরিয়ে 'ঘাটের কথা'। লেখাটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল? নিতান্তই অ-রম্য রচনা?

১৮ মে ১৯৯৬